গীতা-দর্পণ

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচিপত্র

পূর্বার্ধ

বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

বিষয় পৃষ্ঠা-সংখ্যা

উত্তরার্ধ

পরিশিষ্ট

পূর্বার্ধ

ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

গীতা-দর্পণ

স্বাত্মীয়প্রিয়ভক্তপার্থগতয়ে গুহ্যং হি গুহ্যাৎ পরং
যেন স্বং প্রকটীকৃতং চ হৃদয়ং গীতাভিধেয়াত্মকম্॥
যস্যাং প্রাপ্তপরিস্থিতৌ তু মনুজঃ প্রাপ্নোতি মুক্তিং স্থিত
এষা যেন কলা নবা নিগদিতা কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ॥

যিনি তাঁর প্রিয় ভক্ত অর্জুনের কল্যাণের জন্য অতি গোপনীয় 'গীতা' নামক স্বীয় হৃদয় প্রকাশ করেছেন এবং 'মানুষ যে কোনও পরিস্থিতির মধ্যে থেকেই নিজ-কল্যাণ সাধন করতে পারে', এই চিন্তায় নতুন পথ দেখিয়েছেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

যে বাঞ্ছন্তি নিজং মতং তু ঘটিতুং পশ্যন্তি গীতামিমাং
তেষাং দর্শয়িতুং স্বপক্ষবদনং গীতা স্বয়ং দর্পণঃ।
যে নিষ্পক্ষনিরাগ্রহাস্তু মনুজা ইচ্ছন্তি গীতামতং
গীতাদর্পণ এষ বেত্তুমথ মে তেভ্যঃ কৃতো বাদ্ভুতঃ॥

যারা নিজের সিদ্ধান্তকেই গীতার প্রতিপাদ্য-রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে গীতার বিচার করেন, তাদের নিজ মতবাদরূপ মুখের প্রতিচ্ছবি দর্শন করানোর জন্য গীতা স্বয়ং দর্পণ স্বরূপ। কিন্তু যাঁরা শুধুমাত্র গীতার মতটিকেই দুরাগ্রহরহিত এবং পক্ষপাতশূন্য হয়ে জানতে চান তাঁদের জন্য আমি এই বিশিষ্ট 'গীতা-দর্পণ' রচনা করেছি।

(১) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের তাৎপর্য

গীতাধ্যায়স্য নিষ্কর্ষং জ্ঞাতুমিচ্ছন্তি যে জনাঃ।
তৈঃ সুখপূর্বকং গ্রাহ্যস্ততঃ সারোঽত্র লিখ্যতে॥

প্রথম অধ্যায়

মোহে বশীভূত হয়ে মানুষ, 'কি করব, কি করব না'—এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় কর্তব্যচ্যুত হয়ে পড়ে। মানুষ যদি মোহের বশীভূত না হয় তবে সে কর্তব্যচ্যুত হতে পারে না।

যে সকল ব্যক্তি ভগবান, ধর্ম, পরলোক ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাশীল তাঁরা প্রায়ই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, যদি আমি কর্তব্য কর্ম সম্পাদন না করি তাহলে আমার পতন হবে, কেবল সাংসারিক কাজেই যদি লিপ্ত থাকি তাহলে আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না,—ব্যবহারিক কাজে মজে থাকলে পরমার্থ ঠিক থাকবে না, আবার যদি পরমার্থ ধরে থাকি তবে ব্যবহারিক কাজকর্ম ঠিকমত হবে না ; যদি আত্মীয়-কুটুম্বদের পরিহার করি তবে আমার পাপ হবে আর যদি আমি শুধু তাদেরই নিয়ে থাকি তাহলে আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না ইত্যাদি। এর তাৎপর্য হিসাবে বলা যায় যে, সকলে নিজের কল্যাণ তো চায় কিন্তু মোহ এবং সুখের প্রতি আসক্তির কারণে তাদের সংসারবন্ধন কাটে না। এই প্রকার অস্থিরতা অর্জুনের মধ্যেও এসেছিল, তাই তিনি ভেবেছিলেন, 'আমি যদি যুদ্ধ করি তবে সমস্ত কুল নষ্ট হবে আর আমার অকল্যাণ হবে, আবার যদি যুদ্ধ না করি তাহলেও কর্তব্যচ্যুতির অপরাধে কল্যাণে অন্তরায়ের সৃষ্টি হবে।'

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিজ বিবেককে গুরুত্ব দেওয়া এবং নিজ কর্তব্য পালন, এই দুটি পথের যে কোন একটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করলে মানুষের শোক ও চিন্তার অবসান ঘটে।

প্রত্যেক দেহই বিনষ্ট হবে, মৃত্যুমুখী হবে। কিন্তু এই দেহের মধ্যে যিনি দেহিরূপে অবস্থান করছেন তাঁর মৃত্যু নেই। একটি শরীর যেমন বাল্যাবস্থা থেকে যুবাবস্থা এবং যুবাবস্থা থেকে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই শরীরে অবস্থানকারীও এক শরীর ত্যাগ করে অপর শরীর ধারণ করেন। মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহধারীও তেমনি এক দেহখোলস পরিত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করেন। অনুকূল বা প্রতিকূল কোনও পরিস্থিতিই আগে থেকে থাকে না, পরেও থাকবে না এবং অন্তবর্তী সময়েও প্রতিক্ষণেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে অর্থাৎ কোনও পরিস্থিতিই চিরস্থায়ী নয়, সদা আসে ও যায়—এইরূপ স্পষ্ট বিবেক ভাব বা অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হলে চঞ্চলতা, শোক ও চিন্তা দূরীভূত হয়। শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্মের সমাপ্তি-অসমাপ্তি এবং ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি বিষয়ে নির্বিকার থেকে যিনি তা সম্পাদন করতে পারেন তাঁর কোনরূপ অস্থিরতা থাকে না।

তৃতীয় অধ্যায়

এই মনুষ্যলোকে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কর্তব্য নিষ্কাম ভাবে তৎপরতার সঙ্গে পালন করা উচিত, তা তিনি জ্ঞানী, অজ্ঞানী বা ভগবৎ অবতার যাই-ই হোন না কেন। কারণ সৃষ্টিচক্র চালিত থাকে প্রত্যেক প্রাণীর নিজ নিজ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে।

মানুষ কর্ম আরম্ভ না করলে যেমন সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, তেমনি কর্মত্যাগ করেও সিদ্ধি পেতে পারে না। প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে প্রজাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোমরা নিজ নিজ কর্তব্যকর্মের দ্বারা একে অন্যের সহায়তা কর ও অন্যের উন্নতির সহায়ক হও, তাহলেই তোমরা সেই পরম শ্রেয়কে লাভ করবে।' সৃষ্টিচক্রের মর্যাদা অনুসারে যে সকল মানুষ নিজ নিজ কর্তব্য পালন

করে না, এই সংসারে তাদের বেঁচে থাকা অর্থহীন। মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হলে ভগবানের কর্তব্যকর্ম বলে কিছু থাকে না বটে, তবে লোকশিক্ষার জন্য নিজ কর্তব্য তিনি তৎপরতার সঙ্গে পালন করেন। জ্ঞানী মহাপুরুষগণেরও নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম দক্ষতার সঙ্গে পালন করাই বিধেয়। নিজ কর্তব্য নিষ্কাম ভাবে পালন কালে মানুষ যদি মৃত্যুমুখেও পতিত হয় তাতে তার কল্যাণই হয়ে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

সমস্ত কর্ম ক্ষয় করার এবং সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার দুটি উপায় আছে—কর্মের তত্ত্ব জানা এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানকে উপলব্ধি করা।

ভগবান তো সৃষ্টি কার্য করেনই কিন্তু তাতে তাঁর কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলাসক্তি না থাকায়, বন্ধনের কারণ হয় না। যে ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত থেকেও কর্মফলের কামনা, মমতা পোষণ করেন না, অর্থাৎ যিনি সর্বদা কর্মফলে নির্লিপ্ত থাকেন এবং নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করেন তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। যিনি সমস্ত কর্মে সংকল্পবিহীন ও কামনারহিত হয়েছেন, তাঁর কর্ম বলে আর কিছু থাকে না। যিনি কর্ম ও কর্মফলে আসক্তিবিহীন তিনি যথাযথ ভাবে কাজ করলেও কর্ম তাঁকে বন্ধনে ফেলে না। কেবলমাত্র শরীর নির্বাহের জন্য যিনি কর্ম করেন এবং যিনি সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্বিকার থাকেন তাঁর কৃতকর্ম বন্ধনের কারণ হয় না। যে ব্যক্তি কেবল কর্মের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখবার জন্যই কর্ম করে, তার কর্ম সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়ে যায়।

এই কর্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবহিত হলে মানুষ কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

জড়ত্ব (বিষয়) থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হওয়াই হল তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া। এই তত্ত্বজ্ঞান নানা সামগ্রীর সাহায্যে সাধিত যজ্ঞের থেকেও শ্রেষ্ঠ। তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হলে মানুষের সকল কর্ম সমাপ্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে মোহগ্রস্ত হতে হয় না। অত্যন্ত পাপী ব্যক্তিও যদি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তবে সেও সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। অগ্নি যেমন সমস্ত ইন্ধনকে ভস্মীভূত করে, তেমনি জ্ঞানরূপ অগ্নি মানুষের সকল কর্ম ভস্মীভূত করে।

পঞ্চম অধ্যায়

অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষের সুখী-দুঃখী বা রাজী-নারাজ হওয়া উচিত নয়; কারণ যে সকল মানুষ সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বে প্রভাবিত হয়, তারা সংসার চেতনার ওপরে উঠতে পারে না।

স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বা ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। যিনি রাগ-দ্বেষ বর্জিত হয়ে আপন কর্তব্য পালন করেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। অনুকূল পরিস্থিতিতে যিনি পুলকিত হন না এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও উদ্বিগ্ন হন না, এইরূপ দ্বন্দ্ব-রহিত ব্যক্তিই স্ব-রূপে (পরমাত্মায়) স্থিত থাকেন। সাংসারিক সুখ-দুঃখ এবং অনুকূলতা-প্রতিকূলতা ইত্যাদি দ্বন্দ্বই দুঃখের কারণ। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির কখনও তাতে বদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যে কোনও সাধনপথ অবলম্বন করা হোক না কেন, পরিণামে মনে (অন্তঃকরণে) সমত্ব-ভাব আসা চাই। কারণ, সমত্ব না এলে মানুষ অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এবং মান-অপমানে নির্বিকার থাকতে পারে না। এর তাৎপর্য এই যে, অন্তঃকরণে সমত্ব না এলে সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের প্রভাব দূর হয় না এবং মন ধ্যানে সমাহিত হতে পারে না।

যে ব্যক্তি নিজ প্রারব্ধ (ভাগ্য) অনুযায়ী প্রাপ্ত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, বর্তমান কর্মের সমাপ্তি-অসমাপ্তি কিংবা সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে, মান-অপমান, বিষয়-আশয়

ইত্যাদি এবং ভাল-মন্দ ব্যক্তির সান্নিধ্যে অবিচলিত থাকতে পারেন, তিনি-ই শ্রেষ্ঠ। যিনি সাধ্যরূপ সমতা সাধনের উদ্দেশ্যে মন ও ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক পরমাত্মার ধ্যানে নিরত হন, তাঁর সকল প্রাণী এবং তাদের সুখ-দুঃখে সমত্ববুদ্ধি প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি এই সমত্ব লাভ করার ইচ্ছা রাখেন, তিনি বেদোক্ত সকাম কর্ম অতিক্রম করেন। সমদর্শী ব্যক্তি সকামভাবসম্পন্ন তপস্বী, জ্ঞানী বা কর্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সপ্তম অধ্যায়

সবকিছু ভগবান বাসুদেবেরই রূপ,—এই সত্য মানুষকে অনুভব করতে হবে।

সূত্র দ্বারা নির্মিত মণিগুলি[১] যেমন মালায় গ্রথিত থাকে, তেমনি ভগবান সমস্ত সংসারে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি তত্ত্বে; চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি রূপে ; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবে এবং সকল কর্মে সর্বতোভাবে ভগবানই বিরাজিত। ব্রহ্ম, জীব, ক্রিয়া, সংসার, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপেও ভগবানই প্রকাশিত। এই প্রকার তত্ত্বরূপে সবকিছু অবশ্যই ভগবানেরই প্রকাশ।

অষ্টম অধ্যায়

মৃত্যুকালীন চিন্তাধারা অনুযায়ী জীবের গতি লাভ হয়, সেইজন্য মানুষের সবসময় সাবধান থাকা উচিত। যেন অন্তিম সময়ে ভগবৎস্মৃতি জাগরূক থাকে।

অন্তিমকালে অর্থাৎ শরীর ত্যাগ করার সময় মানুষ যে বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির বিষয়ে চিন্তা করে, সেই অনুসারেই তাঁর পরজন্মে নতুন শরীর প্রাপ্তি ঘটে। যিনি মৃত্যুসময়ে ভগবানের চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি ভগবানকেই পান। তাঁর আর 'জন্ম-মৃত্যু' হয় না। সুতরাং মানুষের সর্ব সময়ে, সর্ব অবস্থাতে এবং শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্ম করার সময় ভগবানকে স্মরণ রাখা উচিত, যাতে অন্তিমকালে তাঁর ভগবৎ-স্মরণ হয়। সারাজীবন মানুষ অনুরাগ সহকারে যে কাজ করতে ভালবাসে, মৃত্যুকালে প্রায়শঃ সেইটিই তার স্মরণে আসে।

নবম অধ্যায়

ব্যক্তি যে কোন বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, দেশ বা জাতিরই হোন না কেন, প্রত্যেকেই ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকারী। সকলেই ভগবানের প্রতি অগ্রসর হতে পারেন এবং ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁকে লাভ করতে পারেন।

ভগবান সখেদে বলেছেন যে, 'জীব মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়ে, আমাকে পাওয়ার অধিকার পেয়েও আমাকে না চেয়ে, আমার দিকে না এসে বৃথাই জাগতিক বন্ধনে (জন্ম-মৃত্যুচক্রে) পতিত হয়। আমার প্রতি বিমুখ হয়ে কেউ আমাকে অবহেলা করে, কেউ আসুরী বৃত্তি আশ্রয় করে আবার কেউ সকাম ভাবসম্পন্ন হয়ে যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। কিন্তু কেউ যদি অত্যন্ত পাপীও হয় বা কারও অতি নীচ কুলে জন্ম হয়, তবে তার বর্ণ-আশ্রম-দেশ আচার-ব্যবহার যা-ই হোক না কেন সে ব্যক্তি আমার আশ্রয় গ্রহণ করলে আমাকেই পাবে। অতএব মনুষ্যদেহ লাভ করে জীবের আমাকেই ভজনা করা উচিত।'

দশম অধ্যায়

মানুষের চিন্তাশক্তিকে ভগবৎ চিন্তাতেই নিয়োজিত করা উচিত।

সংসারে কোন ব্যক্তি-বিশেষে বা কোন বস্তুতে বিশেষ লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য, মহত্ত্ব, অলৌকিকত্ব, সৌন্দর্য ইত্যাদি যা কিছু দেখা যায়, মন যাতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়—সেই সবই প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই

[১]সুতো দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি সূত্র-গুটিকা বা 'মণি'।
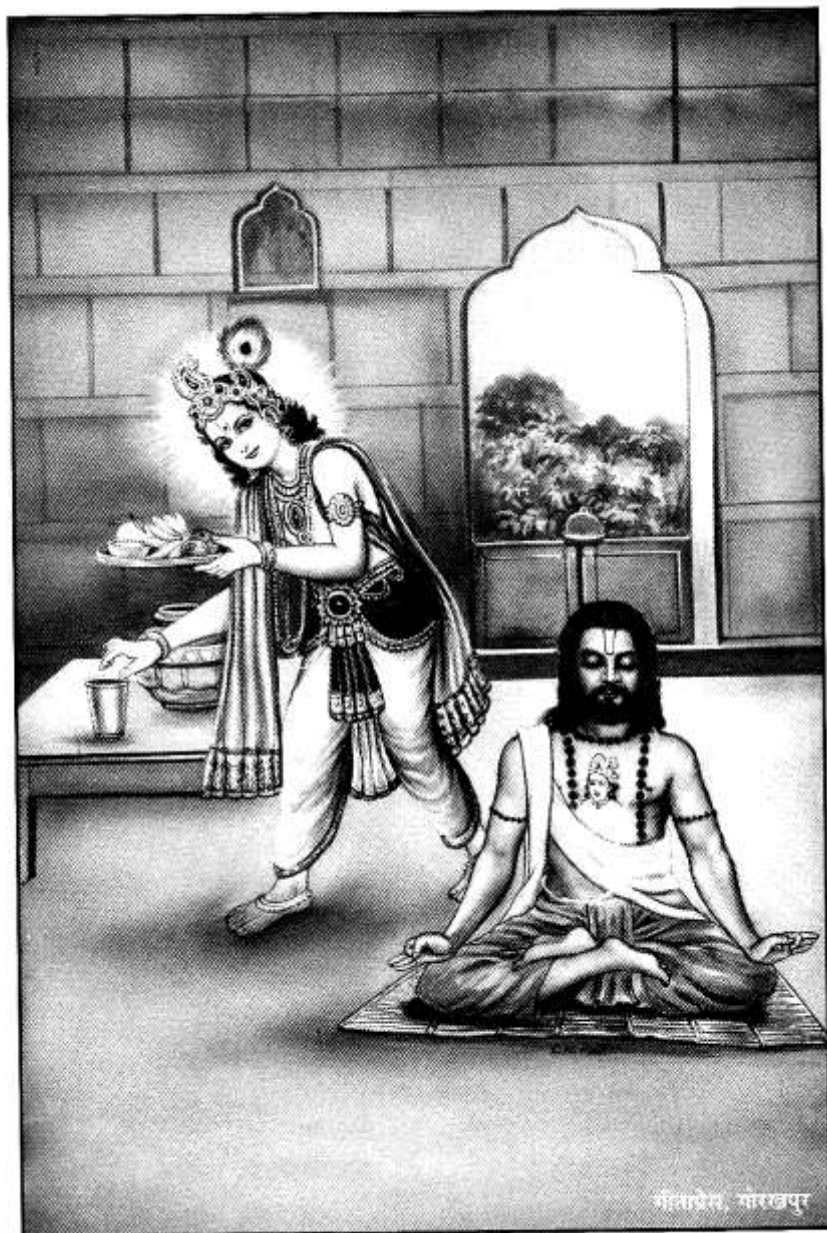
योगक्षेम-वहन

Sustaining Yoga and Kshema

नटवर

The Cosmic Dancer
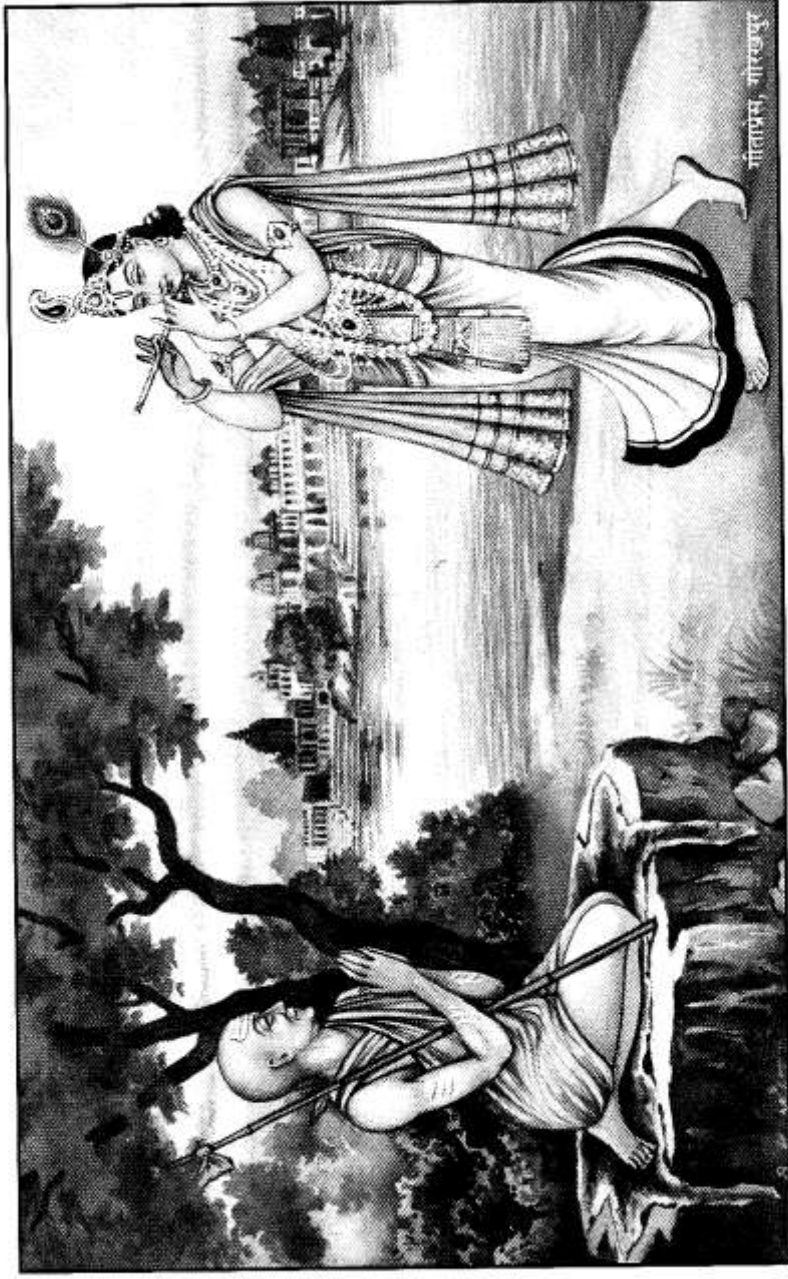
मधुसूदन सरस्वतीको परमतत्त्वके दर्शन

Vision of Supreme Reality to Madhusudan Saraswati
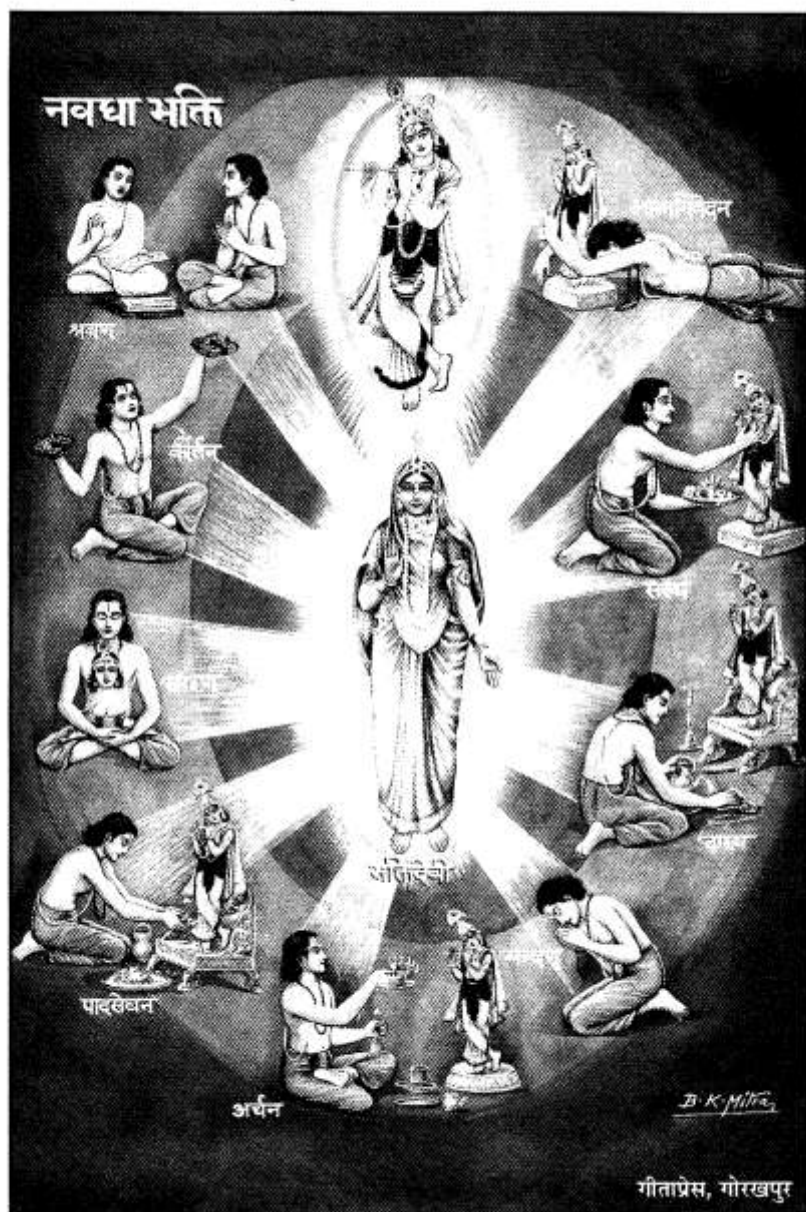
नवधा भक्ति Ninefold Devotion

বিশেষত্ব। অতএব ঐ সমস্ত বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুতে মোহিত না হয়ে ভগবানেরই মনন করা উচিত। এই-ই হল বিভূতিসমূহ বর্ণনা করার তাৎপর্য।

একাদশ অধ্যায়

ভগবৎকৃপায় অর্জুন যে দিব্য বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন তা সকল মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু আদি অবতার রূপে প্রকটিত এই জগৎ-সংসারকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানেরই রূপ মনে করতে পারলে প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারে।

অর্জুন বিনম্রভাবে ভগবানের কাছে বিশ্বরূপ দর্শন করাবার প্রার্থনা জানালে ভগবান তাঁকে দিব্যচক্ষু প্রদান করে নিজ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। এর ফলে অর্জুন ভগবানের দেহে অনেক মুখ, চোখ, হাত ইত্যাদি দর্শন করলেন ; দর্শন করলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্করকে এবং আরো দেখলেন দেবগণ, গন্ধর্বগণ, সিদ্ধগণ ও সর্প ইত্যাদিকে। এছাড়াও অর্জুন বিশ্বরূপে দর্শন করলেন সৌম্য, উগ্র, অত্যুগ্র ইত্যাদি বিভিন্ন স্তর।

এই দিব্য বিশ্বরূপ আমাদের মতো সাধারণ মানুষ দর্শন করতে পারে না, কিন্তু চর্মচক্ষে যে জগৎ-সংসার ধরা পড়ে তাকেই ভগবানের রূপ মনে করে আমরা নিজেদের উদ্ধার করতে পারি। কারণ এই জগৎ-সংসার ভগবানের থেকেই প্রকটিত, তিনিই সবকিছু হয়ে আছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, কারণ তিনি শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিসহ নিজেকে ভগবানের নিকট সমর্পণ করেন।

যিনি পরম শ্রদ্ধাপূর্বক নিজ চিত্তকে ভগবানে নিবিষ্ট করেন সেই ভক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবৎপরায়ণ ভক্ত যদি নিজ সম্পূর্ণ কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে অনন্য নিষ্ঠায় তাঁর উপাসনা করেন, তবে তাঁর সংসার-সাগর থেকে উদ্ধারকারিরূপে সক্রিয় হন স্বয়ং ভগবান। যিনি নিজ মন-বুদ্ধি ভগবৎ চিন্তায় নিবিষ্ট করে রাখেন তিনি ভগবানের সঙ্গেই বসবাস করেন। যাঁর প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি বন্ধুত্ব এবং করুণার ভাব থাকে, যিনি অহংকার ও মমতারহিত, যিনি কোন প্রাণীকে উদ্বিগ্ন করেন না বা নিজেও কারও দ্বারা কখনও উদ্বিগ্ন হন না, যিনি নতুন কর্ম প্রারম্ভে অনুৎসুক, যিনি অনুকূল বা প্রতিকূল উভয় অবস্থায় মান-অপমানে সম-ভাবাপন্ন এবং সকল অবস্থাতেই সতত সন্তুষ্ট, তিনিই ভগবানের প্রিয় ভক্ত। মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়ে যদি তাঁর সঙ্গে একত্ব অনুভব করে, তবে তারা সকলেই ভগবানের প্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জগৎ-সংসারে একমাত্র পরমাত্ম-তত্ত্বই হচ্ছে জ্ঞাতব্য বিষয়। সম্যক্‌রূপে তাঁকেই জানা উচিত। এই তত্ত্ব যিনি সম্যক্‌রূপে জানতে পারেন তিনি সেই পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করেন।

যে পরমাত্মাকে জানলে মানুষ অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, সর্বত্রই সেই পরমাত্মার হস্ত, পদ, মস্তক, চক্ষু এবং কর্ণ বিরাজমান। তিনি সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত হলেও সমস্ত বিষয় তাঁর দ্বারাই প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ গুণরহিত হয়েও তিনি সমস্ত গুণের ভোক্তা, আসক্তিহীন হয়েও তিনি সমস্ত প্রাণীর পালক ও পোষক। সর্বভূতের অন্তরে তিনি, বাহিরেও তিনি এবং সমস্ত জড় তথা চরাচর প্রাণিরূপেও এক তিনিই বিদ্যমান। সমগ্র প্রাণিকুলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হলেও তিনি এক এবং অবিচ্ছিন্ন। সকল জ্ঞানের তিনিই প্রকাশক। ভিন্ন-ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে তিনি সমভাবে বিরাজ করেন। গতিশীল প্রাণীর মধ্যে তিনি গতিহীন অবস্থায় বিরাজিত, (মরণশীল) প্রাণীর মধ্যে তিনি অবিনাশিরূপে অবস্থিত। এই প্রকারে যিনি পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ অবগত হন, তিনি পরমাত্মাকেই লাভ করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

সমস্ত জগৎ-সংসার ত্রিগুণাত্মক; ত্রিগুণের অতীত হতে হলে গুণসমূহ এবং তাদের বৃত্তিগুলিকে অবশ্যই জানা প্রয়োজন।

প্রকৃতিজাত তিনটি গুণ—সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ জীবাত্মাকে শরীর ও সংসারে আসক্তি, মোহ ইত্যাদির দ্বারা বদ্ধ করে রাখে। সত্ত্বগুণ সুখ এবং জ্ঞানের প্রতি আসক্তি দ্বারা, রজোগুণ কর্মের আসক্তি দ্বারা ও তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রার দ্বারা আবদ্ধ করে রাখে। রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে যখন সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হয় তখন অন্তঃকরণে রজঃ ও তমোগুণের বিরোধী বৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়। সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে দমিত করে যখন রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন অন্তঃকরণে লোভ, ক্রিয়াশীলতা ইত্যাদি সত্ত্ব ও তমোগুণের বিরুদ্ধ বৃত্তিগুলি বেড়ে যায়। সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে দমিত করে যখন তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন হৃদয়ে অবিবেচনা, কর্মে অনীহা, প্রমাদ, মোহ ইত্যাদি সত্ত্ব ও রজোগুণের বিরুদ্ধ বৃত্তিসমূহ বেড়ে ওঠে। এইরূপে এই গুণগুলির বৃত্তিসমূহের বৃদ্ধিতে মৃত্যু-পথযাত্রী (প্রাণী) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বৃত্তি অনুযায়ী উচ্চ, মধ্য বা নিম্নলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু যিনি এই গুণগুলি ব্যতীত আর কিছুকে কর্তা বলে মনে করেন না অর্থাৎ 'সম্পূর্ণ ক্রিয়া গুণ দ্বারাই ঘটিত, আমার দ্বারা নয়' বলে জানেন তিনি এই গুণগুলির অতীত হয়ে ভগবৎপ্রাপ্ত হন। অনন্য ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেও মানুষ ত্রিগুণাতীত হতে পারে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

'জগৎ-সংসারের মূল আধার তথা শ্রেষ্ঠতম পরম পুরুষ হলেন পরমাত্মা'। প্রথমাবধি দৃঢ়তাপূর্বক এই সত্যটি ধারণ করে থাকলে মানুষ সর্বজ্ঞ ও কৃতকৃত্য হয়ে যায়।

অনাদিকাল থেকে যাঁর দ্বারা সংসার-চক্র প্রবাহিত এবং যাঁকে পেলে জীব সংসারে পুনরায় ফিরে আসে না, সেই পরমাত্মার অনুসন্ধানই কর্তব্য। জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন সাধক নিজের মধ্যেই সেই পরমাত্মাকে অনুভব করেন। সেই পরমাত্মাই সূর্য, চন্দ্র আর অগ্নিতে তেজরূপে থেকে জগৎকে প্রকাশিত করেন। তিনিই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট থেকে তাকে ধারণ করে আছেন। তিনিই রসময় চন্দ্ররূপে বৃক্ষ, লতা আদি সবকিছুর পুষ্টিসাধন করেন। তিনি সর্বপ্রাণীর দেহে জঠরাগ্নিরূপে খাদ্যসমূহ পরিপাক করেন। তিনিই সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, বেদসমূহের স্রষ্টা, বেদসমূহের জ্ঞাতা ও বেদসমূহে জ্ঞাতব্য। তিনি সমস্ত সংসারের পালন ও পোষণ করেন। তিনি এই নশ্বর সংসারের অতীত তথা অবিনাশী জীবাত্মার চেয়ে উত্তম। ত্রিলোকে এবং বেদসমূহে তিনিই পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ। তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে বরণ করে অনন্যচিত্তে তাঁর ভজন করা উচিত।

ষোড়শ অধ্যায়

দুর্গুণ দুরাচারের ফলেই মানুষ চুরাশী লক্ষ যোনি প্রাপ্ত হয় এবং নরকে গমন করে। সুতরাং মানুষের সদ্‌গুণ এবং সদাচার অবলম্বন করে সংসার-বন্ধন এবং জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

যে ব্যক্তি দম্ভ, দর্প, অভিমান, কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি আসুরী প্রকৃতি ত্যাগ করে অভয়-অহিংসা-সত্য-অক্রোধ-দয়া-যজ্ঞ-দান-তপস্যা ইত্যাদি দৈবী সম্পদের গুণসমূহ ধারণ করেন, তিনি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল অন্যায়, দুরাচার, কাম, ক্রোধ, লোভ, চিন্তা, অহংকার ইত্যাদিকে আশ্রয় করে সেই নিয়েই ব্যাপৃত থাকে, সেই আসুরী প্রকৃতির মানুষ চুরাশী লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করে এবং নরক প্রাপ্ত হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

যাঁরা শাস্ত্রের বিধান জানেন কিংবা যাঁরা শাস্ত্রবিধি জানেন না, তাঁদের সকলেরই উচিত যে কোন শুভকর্ম ভগবানকে স্মরণ করে, ভগবানের নাম উচ্চারণ করে আরম্ভ করা।

যাঁরা শাস্ত্রবিধি জানেন না, কিন্তু শ্রদ্ধা সহকারে পূজা অর্চনা করেন তাঁদের শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা তিন প্রকারের হয়—সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তমসী। নিজ নিজ ভাব অনুসারে তাঁদের পূজিত দেবতাও তিন প্রকারের। যিনি পূজা আদি ক্রিয়া করেন না তাঁর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর আহার্য দ্বারা। কারণ সকলকেই আহার করতে হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মানুষের উদ্ধারের উপায় হিসাবে তার রুচি, যোগ্যতা ও শ্রদ্ধানুযায়ী তিন প্রকার সাধন প্রণালীর উল্লেখ করা হয়েছে—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বা শরণাগতি। এর কোন একটি প্রণালী অনুসারে সাধন করলেই মানুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হবে।

আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে যে ব্যক্তি যজ্ঞ-তপস্যা-দান ও নিত্য কর্তব্য-কর্ম করেন এবং যিনি কুশল-অকুশল কর্মে রাগ-দ্বেষ করেন না, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ত্যাগী। নির্দিষ্ট কর্ম করলেও তিনি পাপভাগী হন না এবং তাঁর ইহলোক বা পরলোকে কোথাও কোন কর্মফল ভোগ করতে হয় না। সমস্ত সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত হয়ে তিনি নিজ স্বরূপে স্থিত হন। একেই কর্মযোগ বলা হয়।

যে ব্যক্তি সাত্ত্বিক জ্ঞান, কর্ম, বুদ্ধি, ধৃতি এবং সুখকে অবলম্বন করে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব থেকে মুক্ত হন, তিনি যদি সমস্ত প্রাণিকুল ধ্বংসও করেন তবুও তাঁর কোনও পাপ হয় না। নিজ স্বরূপে স্থিত হওয়ায় তাঁর পরাভক্তি প্রাপ্তি হয় এবং এর ফলে তিনি পরমাত্মাতত্ত্বকে যথার্থ-রূপে জেনে তাতে প্রবেশ করেন। একে বলা হয় জ্ঞানযোগ।

যে ব্যক্তি ভগবৎ আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বদা শুভকর্ম যথাযথভাবে সাধন করেন, তিনি ভগবৎ কৃপায় অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি ভগবৎ পরায়ণ হয়ে সম্পূর্ণ কর্ম ভগবানে অর্পণ করেন, তিনি ভগবৎকৃপায় সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করেন। যিনি স্বয়ং শরীর-মন-ইন্দ্রিয়সহ ভগবানে নিয়োজিত হন, তিনি তাঁকেই লাভ করেন। যিনি সর্ব ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে অনন্যভাবে কেবল ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করেন, তাঁকে ভগবান সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করেন। এই হল ভক্তিযোগ।

(২) গীতা-সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর

গীতাভ্যাসেন যে জাতাঃ সাধকেঽপি সংশয়াঃ।
অত্র তেষাং সমাধানং ক্রিয়তে হি সমাসতঃ॥

প্রশ্ন—কৌরবপক্ষের সেনারা শঙ্খ, ভেরী, ঢোল ইত্যাদি নানাপ্রকার বাদ্য বাজালেন (১।১৩), কিন্তু পাণ্ডবপক্ষের সেনারা কেবল শঙ্খ (১।১৫-১৯) বাজালেন কেন?

উত্তর—যুদ্ধে বিপক্ষ সেনাদের উপর কেবল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রভাবই পড়ে, সাধারণ ব্যক্তিদের নয়। কৌরবপক্ষের সেনাপতি ভীষ্ম প্রথম শঙ্খ বাজানোর পরে অন্যসকলে নানা বাদ্য বাজালেন কিন্তু ঐ সব বাদ্যধ্বনির প্রভাব পাণ্ডবসেনাদের উপর কিছুমাত্র পড়ে নি। অথচ পাণ্ডবপক্ষের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা যখন নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন তাতে কৌরবসেনাদের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল, সেই ধ্বনির এমনই প্রভাব!

প্রশ্ন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো জানতেনই যে, ভীষ্ম দুর্যোধনকে খুশী করবার জন্যই শঙ্খ বাজিয়েছেন (১।১২), যুদ্ধারম্ভের ঘোষণা করেন নি। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কেন শঙ্খ বাজালেন (১।১৪)?

উত্তর—ভীষ্ম শঙ্খবাদন করামাত্র কৌরবপক্ষের সমস্ত বাদ্য একসঙ্গে বেজে ওঠে, সেই সময়ে পাণ্ডবপক্ষ থেকে কোন বাদ্যধ্বনি না হলে যুদ্ধের রীতি-বিরুদ্ধ কাজ হত। কারণ তাতে পাণ্ডবপক্ষের হার মেনে নেওয়া বোঝাতো। সুতরাং ভক্তপরায়ণ ভগবান পাণ্ডব-সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের অপেক্ষা না করে নিজেই সর্বপ্রথম শঙ্খধ্বনি করে ওঠেন।

প্রশ্ন—প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন ধর্মসম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন, তিনি যখন ধর্মসম্বন্ধে এতকিছু জানতেন, তাহলে তিনি মোহগ্রস্ত হলেন কেন?

উত্তর—আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মমতা বিবেককে দাবিয়ে রাখে এবং বিবেকের প্রাধান্য নষ্ট করে মায়া-মমতায় ভুলিয়ে রাখে। অর্জুনেরও আত্মীয়-স্বজনের মমতায় মোহ উৎপন্ন হয়েছিল।

প্রশ্ন—অর্জুন যখন লোভই পাপের কারণ বলে জানেন (১।৩৮, ৪৫) তাহলে 'মানুষ না চাইলেও কেন পাপ করে' এই প্রশ্ন (৩।৩৬) কেন করলেন?

উত্তর—কুটুম্ব-জনিত মোহে অর্জুন (প্রথম অধ্যায়ে) যুদ্ধ থেকে বিরত থাকাকে ধর্ম এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াকে অধর্ম বলে মনে করেছিলেন অর্থাৎ শরীরাদিসহ সব-কিছুকেই তিনি পার্থিব দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছিলেন। সেইজন্যই অর্জুন লোভকেই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বজন বধের হেতু হিসাবে মনে করেছিলেন। কিন্তু পরে গীতার উপদেশ শ্রবণ করে তাঁর মধ্যে নিজের প্রকৃত কল্যাণের জন্য আগ্রহ জাগ্রত হয় (৩।২)। তাই তাঁর প্রশ্ন যে, মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেন অনুচিত কার্য করে? লক্ষণীয় হল যে এই অর্জুনই প্রথম অধ্যায়ে মোহবিষ্ট অবস্থায় প্রশ্ন করেছিলেন এবং তিনিই তৃতীয় অধ্যায়ে সাধকের মতো প্রশ্ন করছেন।

প্রশ্ন—জীবাত্মা (শরীরী) অবিনাশী, এঁর বিনাশ কারও দ্বারা সম্ভব নয় (২।১৭), ইনি কাকেও হত্যা করেন না এবং নিজেও হত হন না (২।১৯), তাহলে মানুষ প্রাণী হত্যা করলে তো তার পাপ হওয়া উচিত নয়?

উত্তর—দেহগত প্রাণকে দেহচ্যুত করলে পাপ হয়, কারণ প্রত্যেক প্রাণীই দেহাশ্রয়ে বেঁচে থাকতে চায়। সিদ্ধ মহাত্মাগণের বেঁচে থাকার কোন আগ্রহ না থাকলেও তাঁদের হত্যা করলে গুরুতর পাপের ভাগী হতে হয়। কেননা তাঁদের জীবন সকলেরই রক্ষণীয়, সকলেই চান তাঁরা বেঁচে থাকুন। তাঁরা জীবিত থাকলে প্রাণী মাত্রেরই অতীব হিত সাধিত হয় এবং সকল প্রাণী শাশ্বত শান্তির সন্ধান পায়। যে বস্তু প্রাণীদিগের জন্য যত বেশী আবশ্যক, তা নষ্ট করলে তত বেশী পাপের ভাগী হতে হয়।

প্রশ্ন—আত্মা নিত্য, সর্বব্যাপী ও স্থির স্বভাবসম্পন্ন (২।২৪)। তাহলে পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করে অপর নতুন শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কিভাবে সম্ভবপর হয় (২।২২)?

উত্তর—প্রকৃতির অংশরূপ শরীরকে আত্মা যখন নিজের বলে মেনে নেন, সেটিকে তাঁর সঙ্গে একাত্ম মনে

করেন, সেই সময় আত্মা প্রকৃতির এই অংশের আসা-যাওয়া, বাঁচা-মরা, ইত্যাদিকে নিজেরই আসা-যাওয়া বা বাঁচা-মরা বলে মনে করেন। সেই দৃষ্টিতেই আত্মার অন্য শরীরে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে তত্ত্বতঃ আত্মার আসা-যাওয়া অথবা বাঁচা-মরা বলে কিছু নেই-ই।

প্রশ্ন—ভগবান বলেছেন যে, ক্ষত্রিয়দের জন্য (অন্যায়ের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ ছাড়া কল্যাণের আর কোন উপায় নেই (২।৩১), তাহলে কি কেবল লড়াই করলেই ক্ষত্রিয়দের কল্যাণ হয় ? অন্য কোন সাধনা দ্বারা কল্যাণ লাভ সম্ভব নয় ?

উত্তর—কথাটি ঠিক তা নয়। সেই সময় যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা ছিল এবং অর্জুন যুদ্ধ পরিত্যাগ করে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন। সেইজন্যই ভগবান বলেছেন যে, এইরূপ ধর্মযুদ্ধ স্বতঃ প্রাপ্ত হওয়া যে কোন যুদ্ধবীর ক্ষত্রিয়ের কল্যাণ লাভের এক মস্ত বড় সুযোগ। এইরূপ সুযোগ পেয়েও যদি কোন যুদ্ধবীর ক্ষত্রিয় যুদ্ধ না করেন তবে তাঁর অপযশ হয়, তিনি সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে লঘুতা প্রাপ্ত হন, শত্রুরাও নিন্দা করে তাঁর সম্বন্ধে অকথ্য কথা বলতে থাকে (২।৩৪-৩৬)। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, সেই সময় যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা থাকায় ভগবান অর্জুনকে 'যুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ সাধন' বলে বলেছেন। একথা ঠিক নয় যে, যুদ্ধ ছাড়া অন্য সাধনায় ক্ষত্রিয় নিজকল্যাণ করতে পারে না। কেননা পূর্বেও বহু রাজা চতুর্থ আশ্রমে বনবাসী হয়ে সাধন ভজন করেছেন এবং তাতে তাঁদের কল্যাণ সাধিত হয়েছে।

প্রশ্ন—কর্ম শুরু না করা এবং কর্মত্যাগ করা—এই দুটি একই কথা, কেননা দুটিতেই কর্মের অভাব আছে। অতএব 'কর্মের অভাবে সিদ্ধি হয় না'—এইরূপ বলাই সঙ্গত ছিল। তবুও ভগবান (৩।৪) উপরিউক্ত দুটি কথা একই সাথে বলেছেন কেন ?

উত্তর—ভগবান ঐ দুটি কথা কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন। কর্মযোগে নিষ্কামভাবে কর্ম করলেই সমত্বের উপলব্ধি হয় ; কারণ মানুষ যদি কর্ম না করে তাহলে 'সিদ্ধি অসিদ্ধিতে আমার সমত্ব আছে কি নেই'— তা সে কি করে জানবে ? সেইজন্যই ভগবান বলেছেন, কর্ম আরম্ভ না করলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞানযোগে বিবেক দ্বারা সমত্ব প্রাপ্তি হয়, কেবল কর্ম ত্যাগ করলেই হয় না। তাই ভগবান বলেছেন কর্মত্যাগ করামাত্রই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। এর তাৎপর্য এই যে, কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ দুই পথেই কর্ম কোনো প্রতিবন্ধক নয়, দুই পথেরই মুখ্য বিষয় হল কর্তৃত্ববোধের ত্যাগ।

প্রশ্ন—কোনো মানুষই সারাক্ষণ কাজ করে না বা ঘুমানো, শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, চোখ বন্ধ করা খোলা ইত্যাদি কাজ 'আমি করি'— এইরূপ মনে করে না। তাহলে তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে কী করে বলা হল যে, মানুষ কোনো অবস্থায়ই ক্ষণমাত্র সময়ও কর্ম ছাড়া থাকে না ?

উত্তর—যতক্ষণ কেউ প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে সম্বন্ধ বলে মনে করেন, ততক্ষণ তিনি কোন কর্ম করুন বা না করুন তাতে ক্রিয়াশীলতা থাকে। এই ক্রিয়া দুই প্রকারের, ক্রিয়া করা এবং ক্রিয়া হওয়া ! দুটি বিভাগই প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধবশতঃই ঘটে থাকে। কিন্তু যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, তখন 'করা' বা 'হওয়া' বলে কিছুই থাকে না ; তখন 'হয়'ই থাকে, 'করলে' কর্তা, 'হলে' ক্রিয়া আর 'হয়'তে তত্ত্বটি থাকে। বাস্তবে কর্তৃত্ব থাকলেও 'হয়' থাকে আর ক্রিয়া থাকলেও 'হয়' থাকে। অর্থাৎ কর্তা ও ক্রিয়া দুটিতেই 'হয়'-এর অভাব ঘটে না। কিন্তু 'হয়'তে কর্তা ও ক্রিয়া দুইয়েরই অভাব হয়।

প্রশ্ন—বারিপাতের সঙ্গে হোমরূপ যজ্ঞের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ বিধিপালন পূর্বক হোম (যজ্ঞ) করা হলে বৃষ্টিপাত হয়, তবুও তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে 'যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যঃ' এই অংশে যজ্ঞ শব্দটি হোমরূপী যজ্ঞরূপে গ্রহণ না করে কর্তব্য কর্মরূপ অর্থে কেন গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে কর্তব্যচ্যুত হয়ে অকর্তব্য ঘটালে যথাযথভাবে বর্ষা হয় না, আকাল হয়। কর্তব্য কর্ম করলে সৃষ্টিচক্র সুচারুরূপে চলে আর কর্তব্য কর্ম না করলে সৃষ্টিচক্রের গতি ব্যাহত হয়। গোরুর গাড়ীর চাকা যদি ঠিক থাকে গাড়ীও ঠিকভাবে চলে, কিন্তু চাকার যদি কোন অংশ ভেঙ্গে যায় তবে সমস্ত গাড়ীটির উপরই তার প্রভাব পড়ে। এইরূপ কেউ যদি নিজ কর্তব্য থেকে চ্যুত হয়,

তাহলে তার প্রভাব সমস্ত সৃষ্টিচক্রের উপরই পড়ে। বর্তমানে মানুষ নিজ নিজ কর্তব্য ঠিকমত পালন করে না এবং অকর্তব্যমূলক ব্যবহার করে, এইজন্যই আকাল হয় এবং কলহ-অশান্তি ইত্যাদি বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ যদি নিজ নিজ কর্তব্য ঠিকমতো পালন করে, তাহলে দেবগণও তাঁদের কর্তব্য ঠিকমতো পালন করবেন এবং বৃষ্টিও সময় মতই হবে।

দ্বিতীয়তঃ অর্জুনের প্রশ্ন (৩।১-২) এবং ভগবানের উত্তর (৩।৭-৯) তথা প্রকরণ(৩।১০-১৩) বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, কর্তব্যকর্মের প্রবহমানতা বিদ্যমান এবং পরের শ্লোকগুলিতেও (৩।১৪-১৬) সেই কর্তব্যকর্মের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে কর্তব্যকর্মকে যজ্ঞরূপে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন—পরমাত্মা যদি সর্বব্যাপীই হন তাহলে তাঁকে (৩।১৫) কেবল যজ্ঞেই নিত্য প্রতিষ্ঠিত কেন বলা হয়, তিনি দ্বিতীয় কোন স্থানে কি প্রতিষ্ঠিত নন্‌?

উত্তর—সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে যজ্ঞে অর্থাৎ কর্তব্য কর্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলার তাৎপর্য এই যে, যজ্ঞ হল তাঁর উপলব্ধির স্থান। যেমন জমিতে সর্বত্র জল থাকলেও তা কুয়ো হতে পাওয়া যায়, তেমনি পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম নিষ্কামভাবে করলে তবেই তাঁকে পাওয়া যায়। এর গূঢ়ার্থ এই যে, যিনি নিজ কর্তব্য কর্ম সঠিকভাবে পালন করেন, তিনি সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে অনুভব করতে পারেন!

প্রশ্ন—ভগবান বলেন যে, 'আমিও কর্তব্য পালন করি, কেন না আমি যদি সাবধানতাপূর্বক কর্তব্য পালন না করি, তবে লোকেরাও কর্তব্যচ্যুত হবে' (৩।২২-২৪)। তাহলে এখন লোকে কর্তব্যচ্যুত হয়ে পড়ছে কেন?

উত্তর—ভগবানের উক্তি এবং আচরণের প্রভাব তাঁদের ওপরই পড়ে যাঁরা আস্তিক, যাঁরা ভগবানের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখেন। যাঁরা ভগবানে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস রাখেন না, তাঁদের ওপর ভগবানের উক্তি বা আচরণের প্রভাব পড়ে না।

প্রশ্ন—জ্ঞানী পুরুষ নিজ প্রকৃতি বা স্বভাব অনুসারে কর্ম করেন (৩।৩৩), কিন্তু তার দ্বারা তিনি বদ্ধ হন না। অন্য প্রাণিসকলও নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম করে, কিন্তু তারা তাতে আবদ্ধ হয়।—এরূপ কেন হয়?

উত্তর—জ্ঞানী মহাপুরুষগণের প্রকৃতি রাগ-দ্বেষরহিত, শুদ্ধ; তাঁরা নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে কর্ম করেন, তাই তাঁদের কর্ম বদ্ধ করতে পারে না। অপরপক্ষে, অন্য প্রাণী প্রকৃতির বশীভূত হয়ে রাগ ও দ্বেষপূর্বক কর্ম করে, তাই তারা কর্মজালে বদ্ধ হয়ে পড়ে। সুতরাং মানুষের উচিত নিজ প্রকৃতি এবং স্বভাবকে নির্মল ও শুদ্ধ করা এবং নিজ অশুদ্ধ স্বভাবের বশীভূত হয়ে কোন কর্ম না করা।

প্রশ্ন—চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'আমি সাকার রূপে নিজেকে প্রকটিত করি', আবার নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন যে, 'আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছি'। তাহলে যিনি একস্থানে প্রকট হন, তিনি সর্বস্থানে কিভাবে ব্যাপ্তরূপে থাকেন, যিনি সর্বব্যাপক তিনি আবার একটি নির্দিষ্ট স্থানে কিভাবে প্রকটিত হতে পারেন?

উত্তর—প্রাকৃত অগ্নি (সূক্ষ্মাবস্থায়) সর্বত্র ব্যাপক রূপে থেকেও যখন কোন একটি স্থানে প্রকটিত হতে পারে এবং একস্থানে প্রকটিত হয়েও সেই অগ্নির অভাব যদি অন্য কোথাও না হয়, তাহলে প্রকৃতির অতীত যে ভগবান, যিনি অলৌকিক, যাঁর সমস্ত কিছু করার সামর্থ্য আছে, তিনি যদি সমস্ত জায়গায় ব্যাপকভাবে থেকেও একটি স্থানে প্রকটিত হন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অর্থাৎ অবতারত্ব গ্রহণ করলেও ভগবানের সর্বব্যাপকতা যেমন তেমনি থাকে।

প্রশ্ন—এই 'মনুষ্যলোকে কর্ম-জনিত সিদ্ধি শীঘ্র লাভ করা যায়'—(৪।১২), কিন্তু তাতো দেখা যায় না! এরূপ কেন?

উত্তর—কর্ম-জনিত সিদ্ধি অর্থাৎ কর্মফল দুই প্রকার—তাৎকালিক এবং কালান্তরিক। তাৎকালিক ফল শীঘ্রই দেখা যায় এবং কালান্তরিক ফল পরে যথাসময়ে বোঝা যায়, শীঘ্র দেখা যায় না। খাদ্য গ্রহণ করলে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, জল খেলে পিপাসা মেটে, শীতবস্ত্র পরিধান করলে শীতানুভূতি কমে—এই সমস্ত হল তাৎকালিক ফল। এই রূপ কাউকে প্রসন্ন করতে হলে তাঁর স্তুতি বা প্রার্থনা করলে, সেবা করলে তিনি প্রসন্ন হন। গ্রহশান্তির জন্য বিধিপূর্বক পূজা করলে গ্রহশান্তি হয়। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করলে রোগাদি দূর হয়, গয়াতে

বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধ করলে জীব প্রেতযোনি থেকে মুক্তি পায় এবং তার সদ্‌গতি হয়—এই সবই কর্মের তাৎকালিক ফল। এই তাৎকালিক ফলের কথা চিন্তায় রেখেই লোকে দেবতাদের উপাসনা করে। তাই 'মনুষ্যলোকে কর্ম-জনিত সিদ্ধি শীঘ্র প্রাপ্ত হওয়া যায়'—এইরূপ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী, কুকুর ইত্যাদিতে সমদর্শী হয়ে থাকেন (৫।১৮)। তাহলে বর্ণ-আশ্রম ইত্যাদির বাধানিষেধ কিজন্য ?

উত্তর—জ্ঞানী পুরুষদের ব্যবহার ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী প্রভৃতির সঙ্গে তাদের শরীর অনুযায়ী যথাযোগ্যরূপে হয়ে থাকে। শরীর নিত্য পরিবর্তনশীল, এইরূপ পরিবর্তনশীল শরীরে বিষমবুদ্ধি থাকবে এবং সেটি থাকাই উচিত। সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ব্যবহারে একত্ব বা সমানতা রক্ষা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, অর্থাৎ সকলের সঙ্গে ব্যবহারে পার্থক্য থাকবেই ; এরূপ পার্থক্যের মধ্যেও তত্ত্বদর্শী এক পরমাত্মাকেই সবার মধ্যে সমরূপে বিরাজমান দেখতে পান। এইজন্যই ভগবান তত্ত্বদর্শী মানবকে **'সমদর্শিনঃ'** বলে অভিহিত করেছেন **'সমবর্তিনঃ'** বলে নয়। 'সমবর্তী' অর্থাৎ সম ব্যবহার যে করে তা হল যম বা মৃত্যুর নাম[1] অর্থাৎ যিনি সকলের সঙ্গে একই ব্যবহার করেন, সমানভাবে মৃত্যুমুখে আকর্ষণ করেন।

প্রশ্ন—ভগবান প্রাণিমাত্রেরই সুহৃদ (৫।২৯), কোন কারণ ব্যতিরেকেই তিনি সকলের হিত কামনা করেন। তাহলে তিনি প্রাণিকুলকে উচ্চ-নিম্ন নানা গতিতে কেন প্রেরণ করেন ?

উত্তর—সকলের সুহৃদ বলেই তো ভগবান সমস্ত প্রাণীকে তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুসারে উচ্চ-নিম্ন গতিতে প্রেরণ করে তাদের পাপ-পুণ্য থেকে শুদ্ধ করেন ও পাপ-পুণ্যের বন্ধন থেকে মুক্ত করে ঊর্ধ্বলোকে প্রেরণ করেন (৯।২০-২১, ১৬।১৯-২০)।

প্রশ্ন—গীতাতে কোথাও বলা হয়েছে যে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ইত্যাদি গুণ ভগবান থেকে উৎপন্ন (৭।১২), কোথাও বলা হয়েছে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন (১৩।১৯, ১৪।৫), আবার কোথাও স্বভাবজাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে (১৮-৪১)। তাহলে গুণগুলি ঠিক ঠিক কোথা হতে উৎপন্ন, ভগবান থেকে, না প্রকৃতি থেকে, নাকি স্বভাব থেকে ?

উত্তর—যেখানে ভক্তির প্রকরণ আছে, সেখানে গুণগুলি ভগবান থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে, যেখানে জ্ঞানের প্রকরণ সেখানে বলা হয়েছে গুণগুলি প্রকৃতিজাত এবং যেখানে কর্মবিভাগের বর্ণনা আছে সেখানে গুণগুলি স্বভাবজাত বলে বর্ণিত হয়েছে। ভগবান সকলের প্রভু, সুতরাং প্রভুর দৃষ্টিতে যদি দেখা যায় তাহলে গুণগুলি ভগবান থেকেই উদ্ভূত। সব কিছু উৎপত্তির কারণ প্রকৃতি, কারণের দৃষ্টিতে দেখলে গুণসমূহ প্রকৃতি হতে জাত। আবার ব্যবহারিক দৃষ্টিতে গুণগুলি প্রাণীদের স্বভাব থেকে উৎপন্ন হয়। এর তাৎপর্য এই যে, গুণগুলি প্রভুর বিবেচনায় ভগবানের থেকে জাত, কারণের দৃষ্টিতে প্রকৃতির এবং সাংসারিক অভিব্যক্তির দৃষ্টিতে ব্যক্তির নিজস্ব। সুতরাং তিনটি কথাই ঠিক।

প্রশ্ন—যিনি বহু জন্ম ধরে সাধন করে এসেছেন ও সিদ্ধ হয়েছেন তিনিই পরমগতি প্রাপ্ত হন (৬।৪৫)। তাহলে যে সব মানুষ অনেক জন্ম সংসিদ্ধ নন অর্থাৎ পূর্বের অনেক জন্মে সাধনা করে সিদ্ধ হননি, তাঁরা এই জন্মে কীভাবে উদ্ধার পেতে পারেন ?

উত্তর—এই শ্লোকটি যোগভ্রষ্টের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। পূর্বের মনুষ্যজন্মে সংসারে বীতরাগ হয়ে সাধনা করাতে শুদ্ধি লাভ হয়েছে কিন্তু জীবনের অন্তিমক্ষণে সাধনায় বিচলিত হওয়ায় তাঁর হয়তো স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তি হল এবং সেখানে ভোগে অরুচি হওয়ায় শুদ্ধি প্রাপ্তি হয় এবং শুদ্ধাচারী এবং শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহে জন্ম হয়। এই জন্মে পরমাত্মাপ্রাপ্তির জন্য সাধনা করায় তাঁর শুদ্ধি হয়। এইরূপ তিন জন্মে শুদ্ধি ঘটাকেই বহুজন্মের দ্বারা সিদ্ধিলাভ বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, মানুষমাত্রই বহুজন্ম-সংসিদ্ধ অর্থাৎ বর্তমান মনুষ্য জন্মের পূর্বে সে যদি স্বর্গাদিলোকে গিয়ে থাকে, তাহলে স্বর্গবাস দ্বারা পুণ্যের ফল ভোগ করায় পুণ্যফল থেকে শুদ্ধ হয়েছে আর

[1]'সমবর্তী পরেতরাট্' (অমরকোষ ১।১।৫৮)

যদি নরকবাস ঘটে, তাহলে সে পাপের ফল নরক ভোগ করে পাপ থেকে শুদ্ধ হয়েছে। আর যদি চুরাশী লক্ষ জন্ম প্রাপ্ত হয়, তাহলে চুরাশী লক্ষ জন্মের দ্বারা প্রাপ্ত কর্মফল ভোগ করে তার শুদ্ধি হয়েছে। এইভাবে শুদ্ধ হওয়াকেই বহুজন্ম দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া বলা হয়। সুতরাং প্রত্যেক মানুষই নিজের উদ্ধার ও কল্যাণ করতে পারে। প্রত্যেক মানুষই ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকারী। যদি মানুষ ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকারী না হয়, তাহলে ভগবান কেন এই মনুষ্য শরীর দেবেন ?

প্রশ্ন—অনেক জন্মের পর 'সব কিছুই ভগবান বাসুদেব'—এইরূপ জ্ঞান হয় (৭।১৯), তাহলে এই জন্মে মানুষের ভগবৎপ্রাপ্তি কীরূপে হবে ?

উত্তর—এই শ্লোকে '**বহূনাং জন্মনামন্তে**' পদটির অর্থ 'অনেক জন্মের শেষে' নয়, পক্ষান্তরে 'অনেক জন্মের পর শেষ জন্মে, এই মনুষ্য শরীরে',— এইরূপ অর্থ হয়। কারণ এইবারের মনুষ্যজন্মই তার সমস্ত জন্মের শেষ জন্ম। ভগবান মানুষের কল্যাণের জন্যই নিজে থেকে তাদের মনুষ্যজন্ম দিয়েছেন অর্থাৎ মানুষকে তার কল্যাণ করার পুরো অধিকার দিয়েছেন। এখন সে পুনরায় জন্মগ্রহণের জন্য সচেষ্ট হবে, না নিজের উদ্ধার করবে এই বিষয়ে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

গীতাতে ভগবান বলেছেন যে, 'মৃত্যুকালে মানুষ যে ভাব স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়' (৮।৬)। 'মানুষ যে যে দেবতাকে যেমন ভাবে পূজা করতে চায় আমি সেই সেই দেবতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি অচলা করে দিই' (৭।২১)। ভগবানের এইরূপ বাক্যে মনুষ্যজন্মের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়। মানুষ সকামভাবে শুভকর্ম করে স্বর্গেও যেতে পারে, পাপকর্ম করে পশু-পক্ষী, ভূত-পিশাচ ইত্যাদি জন্ম তথা নরক গমনও করতে পারে; আবার পাপ-পুণ্যরহিত হয়ে ভগবানকেও পেতে পারে। এই অন্তিম মনুষ্য জন্মে সে যা চায় তাই করতে পারে।

এই মনুষ্য জন্ম যেমন সমস্ত জন্মগুলির অন্তিম জন্ম, তেমনি সমস্ত জন্মের আদিও এই জন্মই। কারণ বহু জন্মের কর্মের ফলেই স্বর্গ, নরক এবং চুরাশী লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করতে হয়। এই মনুষ্যজন্মেই সমস্ত জন্মগুলির বীজ বোনা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—ভগবান অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত প্রাণীকেই জানেন (৭।২৬), সুতরাং কোন প্রাণী কোন্ গতি প্রাপ্ত হবে—তা ভগবান নিশ্চয়ই জানেন অর্থাৎ ভগবানের জ্ঞাতসারে যার যেমন গতি হবার, সে সেই গতিই পায়, তাহলে মানুষের নিজের উদ্ধারের স্বাতন্ত্র্য কোথায় ?

উত্তর—ভগবান সকল প্রাণীর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের খবর যে জানেন তা কোন্ প্রাণী কোন্ গতিতে যাবে সেই গতিবিধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভগবান অংশীরূপে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর অংশরূপ সকল প্রাণীর বিষয় অবহিত আছেন, তথা সমস্ত প্রাণীর সকল বিষয় ভগবানের জ্ঞানগোচরে স্বতঃই রয়েছে, এই হল উপরিউক্ত বক্তব্যের তাৎপর্য। প্রাণিকুলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্যই যদি ভগবান তাদের সম্বন্ধে সব জানতেন তাহলে, 'মানুষ আমাকে লাভ না করে জন্ম-মৃত্যুর চক্র পথে যাচ্ছে (৯।৩)'; 'আমাকে না পেয়ে নিম্নগতির দিকে চলে যাচ্ছে (১৬।২০)', এইরূপ খেদ করতেন না। কেননা তিনি যদি মানুষের গতিবিধি নিশ্চিত করে থাকেন তাহলে তাঁর দুঃখ কিসের ? দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতি ও স্মৃতিকে ভগবানেরই নির্দেশ বলে মান্য করা হয়—'**শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে**'। শ্রুতি এবং স্মৃতিতে বিধি-নিষেধ দেওয়া আছে যে, 'শুভকর্ম কর, নিষিদ্ধ কর্ম করো না', 'শুভকর্ম করলে তোমার সদ্গতি হবে এবং নিষিদ্ধ কর্ম করলে দুর্গতি হবে'। ভগবান যদি প্রাণীদের গতিবিধি আগে থেকেই ঠিক করে রাখেন, তাহলে শ্রুতি-স্মৃতির বিধি-নিষেধ কাদের ওপর প্রযোজ্য হবে ? এর তাৎপর্য এই যে মানুষ নিজ উদ্ধার করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন—নবম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত প্রাণিকুল আমাতে স্থিত এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ত্রিংশ শ্লোকে বলেছেন যে, সকল ভাব, প্রাণী ইত্যাদি একই প্রকৃতিতে স্থিত। তাহলে বাস্তবে প্রাণী ভগবানে স্থিত, না প্রকৃতিতে স্থিত ?

উত্তর—তত্ত্বগতভাবে ভগবানের অংশ হওয়াতে সকল প্রাণী ভগবানেই স্থিত এবং তাদের কখনো ভগবান হতে আলাদা হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু প্রাণিসকলের শরীর প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হওয়ায় অর্থাৎ প্রকৃতির অংশ হওয়ায় প্রকৃতিতেই স্থিত।

প্রশ্ন—'আমি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সমানরূপে অবস্থিত, কিন্তু যাঁরা আমার ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে অবস্থিত, আমিও তাঁদের মধ্যেই অবস্থিত (৯।২৯)',—ভগবানের এই পক্ষপাত কেন ? যদি পক্ষপাত থাকেই তবে, 'আমি সমস্ত কিছুর মধ্যে সমভাবে অবস্থিত' একথা কিভাবে সঠিক হয় ?

উত্তর—এই পক্ষপাতই তো সমত্ব ! যাঁরা ভজনা করেন আর যাঁরা করেন না, তাঁদের মধ্যে ভগবান যদি একই সমান ভাব রাখেন তাহলে সমতা কিভাবে হয় ? ভজনা করার মাহাত্ম্যই বা কি ? সুতরাং যাঁরা ভজনাদি করেন এবং যাঁরা করেন না তাঁদের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করাই হল ভগবানের সমত্বভাব। তিনি যদি তা না করতেন সেটাই হত বিষম ব্যবহার। বাস্তবিক বিবেচনায় দেখা যায় ভগবানে বিষমতা বলে কিছু নেই-ই। আসলে এই যে বিষমতা দেখা যায় তা ঘটেছে তাঁদেরই জন্য যাঁরা সংসারে নিরাসক্ত হয়ে ভগবানে শরণাগত হন। তাঁদের অনন্য ভাবের কারণেই ভগবানের মধ্যে এই বিষমতা আপনা থেকে হয়ে যায়, তিনি যেচে করেন না।

প্রশ্ন—ভগবৎ দর্শন হলে আর মোহ থাকে না। অর্জুন ভগবানের বিরাটরূপ, চতুর্ভুজরূপ ও দ্বিভুজরূপ—তিনরূপই দর্শন করেছিলেন, তবুও তাঁর মোহ দূরীভূত হয়নি কেন ?

উত্তর—দর্শন দেওয়ার পর ভক্তের মোহ দূর করা এবং তত্ত্বজ্ঞান করানোর দায়িত্ব স্বয়ং ভগবানের। অর্জুনের মোহ পরে দূর হয়েছিল (১৮।৭৩), তাতে এই সিদ্ধ হয় যে ভগবৎ দর্শনের পরে অবশ্যই মোহ দূর হয়। কিন্তু অর্জুন নিজ মোহ নষ্টের কারণ হিসাবে গীতোপদেশকে মনে করেন নি বা ভগবৎ দর্শনকেও নয়। তিনি ভগবৎকৃপাই এর কারন বলে স্বীকার করেছেন—'**ত্বৎপ্রসাদাৎ**' (১৮।৭৩)।

প্রশ্ন—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে পরমাত্মাকে 'জ্ঞেয়' বলা হয়েছে, আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে জগৎ-সংসারকে 'জ্ঞেয়' বলা হয়েছে । এর তাৎপর্য কি ?

উত্তর—দুটি বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে পরমাত্মাকে জানা অবশ্য কর্তব্য, কেননা পরমাত্মাকে যথার্থরূপে জানতে পারলে প্রকৃত কল্যাণ হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যা কিছু দৃশ্য বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় তাই হল সংসার। সংসারে ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যসিদ্ধি হয়।

প্রশ্ন—ভগবান সবার হৃদয়ে বসবাস করেন (১৩।১৭, ১৫।১৫, ১৮।৬১), কিন্তু আজকাল ডাক্তাররা হৃদয়কে নতুন করে প্রত্যারোপণ করেন, তাহলে ভগবান কোথায় থাকেন ?

উত্তর—ভগবান সমস্ত স্থানেই বিরাজমান, হৃদয় তাঁর উপলব্ধির স্থান ; কারণ হৃদয় শরীরের প্রধান অঙ্গ এবং সমস্ত শ্রেষ্ঠভাব হৃদয়েই উৎপন্ন হয়। যেমন গরুর সারা শরীরে দুধ থাকলেও তা কেবল তার স্তন হতেই পাওয়া যায় অথবা পৃথিবীর সর্বত্র জল থাকলেও তা যেমন কেবল কূপাদি হতে পাওয়া যায় তেমনি ভগবান সর্বত্র সমানভাবে বিরাজ করলেও হৃদয়েই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়।

চিকিৎসক যে হৃদয় প্রত্যারোপণ করেন তাকে হৃৎপিণ্ড বলে। হৃৎপিণ্ডে যে হৃদয়-শক্তি থাকে, সেই শক্তিতে ভগবান থাকেন। চিকিৎসা এই হৃৎপিণ্ডেরই হয়, তার শক্তির নয়। শক্তি তার নিজস্ব স্থানে যেমন তেমনি থাকে। যেমন চোখকে দেখা যায়, চোখের শক্তি বা নেত্রেন্দ্রিয় দেখা যায় না, কারণ এটি সূক্ষ্মশরীরে অবস্থান করে। ঠিক এইভাবে হৃৎপিণ্ড দেখতে পাওয়া যায়, তার শক্তিকে নয়।

প্রশ্ন—নিজেকে শরীরে স্থিত বলে মনে করলেই পুরুষ (চেতন) ভোক্তা হয়, কিন্তু ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে ভগবান প্রকৃতিতে অবস্থিত পুরুষকে ভোক্তা বলেছেন—তা কি করে হয় ?

উত্তর—পুরুষ (চেতন) প্রকৃতিতে স্থিত—একথার তাৎপর্য এই যে, যেমন বিবাহের দ্বারা স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সকল আত্মীয়গণের সম্পর্ক গড়ে উঠে, ঠিক তেমনই এই শরীরে নিজের স্থিতি মেনে নিলে অর্থাৎ একটি শরীরের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্বীকার করলে সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে, সকল শরীরের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন—নিজেকে শরীরে স্থিত বলে মেনে নিলেই পুরুষ কর্তা এবং ভোক্তা হয়ে থাকে ; কিন্তু ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একত্রিংশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, এই পুরুষ শরীরে স্থিত থেকেও কর্তা এবং ভোক্তা নয় । এর

তাৎপর্য কি ?

উত্তর—এখানে ভগবান প্রাণীদের যথার্থ স্বরূপ জানাচ্ছেন এই বলে যে, বাস্তবে অত্যন্ত অজ্ঞান মানুষও স্বরূপতঃ কখনও কর্তা বা ভোক্তা হয় না অর্থাৎ তার মধ্যে কোনরূপ কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব আসে না। কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে মানুষ নিজেকে কর্তা বা ভোক্তা বলে মনে করে (৩।২৭, ৫।১৫) এবং সে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ হয়। মানুষের মধ্যে যদি কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাব না থাকে, তাহলে সে সারা পৃথিবীকে ধ্বংস করলেও কাউকে মারেও না এবং বদ্ধও হয় না (১৮।১৭)।

প্রশ্ন—রজোগুণের তাৎকালিক বর্ধিত বৃত্তিতে এবং রজোগুণের আধিক্যে প্রাণী দেহত্যাগ করলে সে মনুষ্য শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করে (১৪।১৫, ১৮)— এই দুটি বাক্যে প্রমাণিত হয় যে, এই মনুষ্যলোকে সমস্ত মানুষই রজোগুণসম্পন্ন, অর্থাৎ সাত্ত্বিক বা তামসিক গুণসম্পন্ন নয়। কিন্তু গীতাতে স্থানে স্থানে তিনটি গুণের কথাই আলোচিত হয়েছে, (৭।১৩, ১৪।৬-৮, ১৮।২০-৪০ ইত্যাদি)। এর অর্থ কি ?

উত্তর—ঊর্ধ্বগতি, মধ্যগতি এবং অধোগতি— এই তিনটিতে তিনটি গুণ থাকে। কিন্তু ঊর্ধ্বগতিতে সত্ত্বগুণের, মধ্যগতি বা মনুষ্যলোকে রজোগুণের এবং অধোগতিতে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে। সেইজন্যই তিনটি গতিতেই প্রাণী সাত্ত্বিক, রাজস বা তামসিক স্বভাব সম্পন্ন হয়।[1]

প্রশ্ন—চতুর্দশ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে অজ্ঞান উৎপন্ন হয় তমোগুণ থেকে এবং অষ্টম শ্লোকে অজ্ঞান থেকেই তমোগুণের জন্ম জানানো হয়েছে, এর অর্থ কি ?

উত্তর—যেমন গাছ থেকে বীজ জন্মায় এবং ঐ বীজ থেকে পুনরায় গাছ, তেমনি তমোগুণ থেকে অজ্ঞানতা আসে এবং ঐ অজ্ঞানতা থেকে আবার তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, পুষ্টিলাভ করে।

প্রশ্ন—অশ্বত্থগাছ বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে পূজ্য বলে মনে করা হয়, তাহলে ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে সংসাররূপ অশ্বত্থ গাছকে কাটতে বলেছেন কেন ?

উত্তর—অশ্বত্থগাছ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভগবান এই গাছকে নিজ স্বরূপ হিসাবে দেখিয়েছেন (১০।২৬)। ঔষধরূপেও এর অনেক মহিমা। কথিত আছে যে, এই গাছের শিকড় বেটে খেলে বন্ধ্যা নারীও পুত্রলাভ করতে পারে। অশ্বত্থ সকলকে আশ্রয় দেয়। এর নীচে ছোট ছোট গাছ বেড়ে ওঠে। অশ্বত্থ কাউকে বাধা দেয় না, সেইজন্য অশ্বত্থ গাছ কেউ কাটে না ; যে জন্য বাড়ির দেওয়াল, ছাদের ওপর, কুয়োর মধ্যে যত্র তত্র এই গাছ বেড়ে ওঠে। অশ্বত্থ, বট, পাকুড় ইত্যাদিকে যজ্ঞবৃক্ষ বলা হয় অর্থাৎ এইসব গাছের কাঠে যজ্ঞের হোমাদি কাজ সম্পন্ন হয়। অতএব ভগবান জগতের রূপক হিসাবে অশ্বত্থ গাছকে দেখিয়েছেন। কারণ এই জগৎ-সংসার কাউকে কিছুতে বাধা দেয় না। জগৎ-সংসার ভগবানেরই রূপ। আসলে নিজস্ব অনুরাগ-বিদ্বেষ, কামনা-মমতা-আসক্তি ইত্যাদিই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই ভগবান জগৎ-সংসার রূপ অশ্বত্থবৃক্ষ ছেদন করতে বলেননি— এতে যে কামনা-মমতা-আসক্তি ইত্যাদি আছে, যার জন্য মানুষ জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হয়, সেইগুলিকে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করতে বলেছেন।

প্রশ্ন—পঞ্চদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'সেই আদি পুরুষ পরমাত্মারই আমি শরণ লই'—তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে,—তাহলে ভগবানও কি কারোর শরণ গ্রহণ করেন ?

উত্তর—ভগবান কারোর শরণ নেন না, তিনি তো সকলের উপর। লোকশিক্ষার জন্য ভগবান সাধকের ভাষাতে বলে সাধককে বোঝাচ্ছেন যে তাঁরা যেন, 'সেই আদি পরমাত্মারই আমি শরণাগত', এই প্রকার চিন্তা করেন।

প্রশ্ন—জীবসকল পরমাত্মারই অংশ (১৫।৭), তাহলে কী জীবগণ পরমাত্মা থেকেই জন্মগ্রহণ করেছে ? না কি পরমাত্মার খণ্ডবিশেষ ?

উত্তর—তা ঠিক নয়। জীবসকল অনাদি এবং সনাতন, পরমাত্মা পূর্ণ-স্বরূপ ; সুতরাং জীব কিভাবে পরমাত্মার অংশবিশেষ হতে পারে ? আসলে জীবও

[1]এই বিষয়ে বিশদ জানতে হলে গীতার 'সাধক-সঞ্জীবনী' টীকার চতুর্দশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকটি দ্রষ্টব্য।

পরমাত্মস্বরূপ, কিন্তু জীব যখন প্রকৃতির অংশ শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতিকে 'আমি-আমার' বলে মনে করে, তখন সে অংশ-বিশেষ হয়। যখন সে ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করে, তখনই সে পূর্ণ স্বরূপ হয়ে যায়।

প্রশ্ন—প্রথমে সাত্ত্বিক আহারের ফল বা পরিণাম বর্ণনা করে তারপর ভোজ্য পদার্থের বর্ণনা করা হয়েছে এবং রাজসিক আহারের প্রথমে ভোজ্য পদার্থের বর্ণনা করে পরে ফলের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তামসিক আহারে ফলের বর্ণনা করাই হয় নি (১৭।৮-১০), এরকম কেন ?

উত্তর—সাত্ত্বিক মানুষ প্রথমে খাদ্যের ফল বা পরিণামের কথা ভাবেন, তারপর তিনি আহারাদিতে প্রবৃত্ত হন, সেইজন্যই প্রথমে পরিণাম ও পরে খাদ্য-পদার্থের বর্ণনা করা হয়েছে। রাজসিক মানুষের দৃষ্টি প্রথমে খাদ্য পদার্থের দিকে, বিষয়েন্দ্রিয় ইত্যাদির দিকে যায়, পরিণামের দিকে নয়। রাজসিক ব্যক্তির দৃষ্টি যদি প্রথমে পরিণামের দিকে যায়, তাহলে তাঁর রাজসিক আহারাদিতে প্রবৃত্তি হবে না। সেইজন্যই রাজসিক আহারের প্রথমে খাদ্য পদার্থ এবং পরে পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। তামসিক ব্যক্তি মূঢ়তায় আচ্ছন্ন থাকে তাই তার আহার এবং তার পরিণাম নিয়ে কোনো বিচার বিবেচনার দৃষ্টি থাকে না। আহার ন্যায়যুক্ত কিনা, তাতে আমাদের অধিকার আছে কি না, শাস্ত্রের কোনো বাধা বা নিষেধ আছে কিনা এবং তার পরিণাম আমাদের পক্ষে শুভকর কিনা এইসব ব্যাপার নিয়ে তামসিক ব্যক্তি কখনও বিচার-বিবেচনা করে না। এইজন্য তামসিক আহারের পরিণাম নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি।

প্রশ্ন—ঈশ্বর নিজ মায়া দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে সংসারে পরিভ্রমণ করান (১৮।৬১)। তাহলে কি ঈশ্বরই প্রাণিদিগকে পাপ পুণ্যে নিয়োজিত করেন ?

উত্তর—মানুষ যেমন রেলগাড়ীতে উঠলে সেই গাড়ী অনুসারেই বাধ্য হয়ে তাকে যেতে হয়, তেমনি প্রাণী শরীররূপী যন্ত্রে যখন আরূঢ় হয় অর্থাৎ শরীর-যন্ত্রের সঙ্গে 'আমি-আমার' সম্বন্ধ পাতিয়ে বসে, তখন সেই জীবকে তার স্বভাব এবং কর্ম অনুসারে পরিভ্রমণ করতে হয়, কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, পাপ বা পুণ্য তিনি করান না।

প্রশ্ন—ভগবান প্রথমে অর্জুনকে '**তমেব শরণং গচ্ছ**' বাক্য দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করতে বলেছেন (১৮।৬২), পরে আবার '**মামেকং শরণং ব্রজ**' বাক্য দ্বারা নিজ শরণে আসতে বলেছেন (১৮।৬৬)। অর্জুনকে যদি নিজ শরণে আনারই তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাহলে অন্তর্যামী পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করার কথা কেন বলেছিলেন ?

উত্তর—ভগবান প্রথমে বলেছেন যে, 'আমার শরণাগত ভক্ত আমার কৃপায় শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হয় (১৮।৫৬)', আরও বলেছেন যে, 'মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে চিত্ত রেখে তুমি সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করে যাবে (১৮।৫৭-৫৮)'। ভগবানের এইরূপ আশ্বাসেও অর্জুন কিছু বলেন নি, স্বীকার করেন নি। তখন ভগবান বললেন, 'যদি তুমি আমার শরণ না নিতে চাও, তাহলে সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার শরণ নাও। আমি অতি গোপনীয় জ্ঞান তোমাকে বলে দিলাম, এখন তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর (১৮।৬৩)'। এই কথায় অর্জুন ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলেন যে ভগবান তাহলে তাঁকে ত্যাগ করছেন। তখন ভগবান অর্জুনকে সর্বগুহ্যতম কথাটি বললেন, 'তুমি কেবল আমারই শরণাগত হও'।

প্রশ্ন—ভগবান গীতায় তিনস্থানে (৩।৩, ১৪।৬, ১৫।২০তে) অর্জুনকে '**অনঘ**' নামে সম্বোধন করেছেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে ভগবান অর্জুনকে পাপরহিত ব্যক্তি বলে মানেন, তবে তিনি আবার কেন বলেছেন যে, 'আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করে দেব (১৮।৬৬) ?'

উত্তর—যে ব্যক্তি ভগবানের সম্মুখীন হয়, তার পাপের অন্ত ঘটে। অর্জুন (২।৭) ভগবানের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাই তিনি পাপরহিত হন, ভগবানের দৃষ্টিতেও তিনি পাপরহিত। অর্জুন মনে করতেন যে, 'যুদ্ধে কুটুম্ব বধ করলে পাপ হবে (১।৩৬, ৩৯, ৪৫)।' অর্জুনের এরূপ মনে করার কারণেই ভগবান বলেছেন, 'আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করে দেব।'

প্রশ্ন—অর্জুন যখন প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন যে, 'আমার মোহ দূর হয়েছে'—'**মোহোহধ্যায়ং বিগতো মম**'

(১১।১) তাহলে দ্বিতীয়বার বলার কী প্রয়োজন ছিল যে, 'আমার মোহ নষ্ট হয়েছে'—**'নষ্টো মোহঃ'**(১৮।৭৩)?

উত্তর—সাধন পথে অগ্রসর হওয়ার সময় সাধকের পারমার্থিক লক্ষণসমূহ অনুভূত হতে থাকে ; তখন তিনি মনে করেন যে, পরমতত্ত্ব তিনি সম্যক্‌ভাবে জেনে গেছেন, কিন্তু আসলে পূর্ণতা না পাওয়া পর্যন্ত তা সামগ্রিকভাবে জানা যায় না। এইরূপ অর্জুনও দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত ভগবানের প্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং মনে করেন যে, 'আমার মোহ দূর হয়েছে'। তাই নিজের দৃষ্টিতে তিনি বলেছিলেন, **'মোহোঽয়ং বিগতো মম।'** কিন্তু ভগবান তা স্বীকার করেন নি। পরে অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে ভীত হয়ে পড়লে ভগবান তাঁকে জানান, —এটিই হচ্ছে তোমার মূঢ়ভাব বা মোহ। এতে অর্জুনের মোহিত হওয়া উচিত নয় —**'মা চ বিমূঢ়ভাবঃ'** (১১।৪৯)। ভগবানের এই কথায় প্রমাণিত হয় যে, অর্জুনের মোহ সর্বতোভাবে তখনও দূরীভূত হয় নি। সেইজন্যই পরে যখন অর্জুন সর্বগুহ্যতম কথা শুনে বললেন, 'আপনার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হয়েছে এবং স্মৃতি প্রাপ্ত হয়েছি'—**'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত'** (১৮।৭৩), তখন ভগবান কোন উত্তর না দিয়ে মৌন রইলেন এবং উপদেশ দেওয়া বন্ধ করলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ভগবানও স্বীকার করে নিয়েছেন যে অর্জুনের মোহ তখন দূরীভূত হয়েছে।

প্রশ্ন—গীতার শেষে সঞ্জয় কেবলমাত্র বিরাটরূপটিই স্মরণ করেছেন কেন (১৮।৭৭)? চতুর্ভুজ রূপের স্মরণ করেন নি কেন?

উত্তর—ভগবানের চতুর্ভুজরূপ প্রসিদ্ধ কিন্তু বিরাটরূপ ততো প্রসিদ্ধ নয়। বিরাটরূপ যতো দুর্লভ, চতুর্ভুজরূপ ততো দুর্লভও নয়। কারণ ভগবান তাঁর চতুর্ভুজরূপ দেখার উপায় বলেছেন (১১।৫৪), কিন্তু বিরাটরূপ দর্শন করার উপায় তিনি বলেন নি। সেইজন্য সঞ্জয় অত্যন্ত অদ্ভুত সেই বিরাটরূপ স্মরণ করেছেন।

প্রশ্ন—অর্জুনের মোহ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়েছিল এবং মোহ একবার দূর হলে পুনরায় তা আসতেই পারে না —**'যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি'** (৪।৩৫)। তাহলে যখন অভিমন্যুর মৃত্যু হল, তখন অর্জুনের আত্মীয়বোধক মোহ হল কেন?

উত্তর—ওটি মোহ নয়, বস্তুতঃ লোকশিক্ষা। মোহ দূর হওয়ার পর মহাপুরুষরা যে আচরণ করেন, তা সকলের জন্য শিক্ষামূলক, আদর্শস্বরূপ। অভিমন্যুর মৃত্যুতে কুন্তী, সুভদ্রা, উত্তরা সকলে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। তাই তাঁদের দুঃখ প্রশমনের জন্য অর্জুনের মাধ্যমে এইরূপ শোক ও মোহের যেন অভিনয় হয়েছিল, লীলা ঘটেছিল। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, অভিমন্যুর মৃত্যুর পর অর্জুন জয়দ্রথ বধের জন্য যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা সব শাস্ত্র এবং স্মৃতির নির্দেশ অনুসারেই (মহাভারত দ্রোণ ৭৩।২৫-৪৫)। যদি অর্জুন মোহগ্রস্ত থাকতেন, তাহলে কি তাঁর শাস্ত্র এবং স্মৃতির উপদেশ মনে থাকত? কি করে এত সাবধান হতে পারতেন? কারণ মোহগ্রস্ত ব্যক্তি পুরানো কথা মনে রাখতে পারেন না এবং নতুন কিছুও ঠিক করতে পারেন না (২।৬৩)। কিন্তু অর্জুনের সব কথাই মনে ছিল, তিনি শোকগ্রস্ত ছিলেন না। তাতেই প্রমাণিত হয় যে অর্জুনের শোক লীলামাত্র ছিল।

প্রশ্ন—মোহ দূর হলে এবং স্মৃতি প্রাপ্ত হলে আর কখনও বিস্মৃতি আসে না। তাহলে 'অনুগীতা'তে অর্জুন কী করে বললেন যে, 'আমি তো সেই জ্ঞান ভুলে গেছি' (মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব ১৬।৬)?

উত্তর—ভগবান গীতোপদেশের সময় অর্জুনকে ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগের অধিকারী মনে করে (মধ্যম পুরুষের সম্বোধনে) ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন। অর্জুন ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের কথা ভোলেন নি, তিনি আসলে জ্ঞানযোগের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এইজন্য অনুগীতায় ভগবান জ্ঞানেরই উপদেশ দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন—অনুগীতাতে ভগবান বলেছেন, সেই সময় আমি যোগে স্থিত হয়ে গীতা উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমি আর সেইরূপ উপদেশ দিতে পারব না (মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব, ১৬।১২-১৩)। তাহলে কি ভগবান কখনও যোগে স্থিত থাকেন, কখনও থাকেন না? ভগবানের জ্ঞানও কি স্থির নয়?

উত্তর—গো-বৎস যখন দুধ পান করে, তখন গাভীর

শরীরে যত দুধ সব স্তনে এসে যায়, সেইরূপ শ্রোতা উৎকণ্ঠিত হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলে বক্তার মধ্যে বিশেষ ভাব স্ফুরিত হতে থাকে। গীতায় অর্জুন উৎকণ্ঠিত হয়ে ব্যাকুলতাপূর্বক নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেইজন্য তখন ভগবানের মধ্যে বিশেষ ভাব উৎপন্ন হয়েছিল। কিন্তু অনুগীতাতে অর্জুনের মধ্যে সেইরূপ ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা ছিল না, তাই গীতার বর্ণনা যেরূপ সরস হয়েছে অনুগীতাতে ঠিক সেরূপ হয়নি।

প্রশ্ন—গীতার দশম অধ্যায়ে যেমন ভগবান অর্জুনকে নিজ বিভূতি সম্বন্ধে বলেছেন তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান উদ্ধবকেও নিজ বিভূতি জানিয়েছেন। গীতা এবং ভাগবতে বক্তা যখন সেই এক ভগবান শ্রীকৃষ্ণই, তাহলে দুটি গ্রন্থে বলা বিভূতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য কেন ?

উত্তর—আসলে ভগবানের বিভূতি সম্বন্ধে বলার উদ্দেশ্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তি ইত্যাদির মহত্ত্ব জানানো নয়, আসলে নিজের (ভগবানের) চিন্তন করাবার জন্যই এইসব বলা। গীতা এবং ভাগবতে দুই স্থানে বলা বিভূতিগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের চিন্তন করানো। এই অর্থেই যেখানে কোন বিশিষ্ট ভাব দেখা যায়, সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তিতে বিশেষ ভাব না দেখে কেবল ভগবানের বিশেষত্বই দর্শনীয় এবং ভগবানের প্রতিই মনের বৃত্তিকে চালিত করা উচিত। এর তাৎপর্য এই যে, মন যে কোনো স্থানেই যাক না কেন সেখানেই ভগবানের কথা ভাবতে হবে। এইজন্য ভগবান বিভূতিসমূহের বর্ণনা করেছেন (১০।৪১)।

প্রশ্ন—ভাগবতে ভগবান উদ্ধবকে উপদেশ দিয়েছিলেন বলে তা যেমন 'উদ্ধবগীতা' নামে পরিচিত, তেমনি গীতার নামও 'অর্জুনগীতা' হওয়া উচিত ছিল, তা না হয়ে এর নাম 'ভগবদ্গীতা' হল কেন ?

উত্তর—ভাগবতে উদ্ধব স্বয়ং ভগবানের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেইজন্য সেই কথোপকথন-এর নামকরণ 'উদ্ধবগীতা' রাখাই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু 'গীতা' উপদেশ দেওয়ার কথা স্বয়ং ভগবানের মনেই এসেছিল, কারণ অর্জুন যুদ্ধ করতেই এসেছিলেন, উপদেশ শুনতে নয়। গীতা উপদেশ দেবার কথা মনে আসাতেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথ পিতামহ ভীষ্ম এবং গুরু দ্রোণাচার্যের সামনে উপস্থিত করেন এবং বলেন, 'হে পার্থ! কুরুবংশীয়দের দেখ',—'**কুরূন্ পশ্য**' (১। ২৫)। ভগবান যদি ঐরূপ না বলে, বলতেন যে 'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে দেখ'—'**ধার্তরাষ্ট্রান্ পশ্য**', তাহলে অর্জুনের মধ্যে এই মোহ জাগ্রত হত না, যুদ্ধ করার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগত এবং ভগবানেরও গীতা বলার সুযোগ হত না। গীতা উপদেশ দেবার সুযোগ হয়েছিল 'কুরুবংশীয়দের দেখ', এই কথাটি বলাতেই, কারণ কুরুবংশ বললে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং পাণ্ডবগণ উভয়কেই বোঝায়। অতঃপর নিজ আত্মীয়গণকে দেখে অর্জুনের সুপ্ত মোহ জাগরিত হয়েছিল, ফলে তিনি নিজ কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ণয় করতে অসমর্থ হয়ে ভগবানের শরণাগত হলেন এবং নিজ কল্যাণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। এইজন্যই ভগবানের দেওয়া উপদেশের নাম ভগবদ্গীতা রাখাই যুক্তিযুক্ত বা উচিত।'

প্রশ্ন—যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে, এইরকম (অল্প) সময়ে ভগবান এইরূপ গীতার মত বিরাট উপদেশাবলী কিভাবে দিলেন ?

উত্তর—ভগবানের মায়াই যখন অঘটন-ঘটন-পটীয়সী তখন স্বয়ং ভগবান অল্প সময়ে অনেক কিছুই যে বলতে পারবেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ?

মহাভারত দেখলে মনে হয় তখন সময় অল্প ছিল না। অর্জুন ভগবানকে দুই পক্ষের সেনাদের মাঝে রথ উপস্থিত করতে বলায় ভগবান অর্জুনের রথকে দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যে স্থাপিত করেন। যখন রথ দুটি পক্ষের মধ্যে অবস্থান করছে এবং একই পরিবারভুক্ত সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন তখন দুই পক্ষের সেনারা কী করে যুদ্ধ করবে ? সুতরাং তারা শান্তভাবেই অপেক্ষা করছিল।

গীতার উপদেশাবলী শেষ হলে যুধিষ্ঠির নিঃশঙ্কচিত্তে কৌরবসেনাদের মধ্যে গেলেন, তাঁর সঙ্গে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং শ্রীকৃষ্ণও গেলেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রমুখের সঙ্গে মিলিত হয়ে কথাবার্তা বললেন। সেখান থেকে ফেরার সময় যুধিষ্ঠির ঘোষণা করলেন যে, 'এই সমস্ত কৌরবসেনা যুদ্ধে ধ্বংস হবে,

যদি কারো বাঁচার ইচ্ছা থাকে, তাহলে তারা আমাদের সেনাদলে যোগ দিতে পারে।'

যুধিষ্ঠিরের এইরকম ঘোষণা শুনে দুর্যোধনের ভাই যুযুৎসু নাকাড়া বাজিয়ে পাণ্ডবসেনাদের মধ্যে চলে এলেন। এর পর যুদ্ধ শুরু হল। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, গীতার উপদেশ দেওয়ার যথেষ্ট সময় ছিল।

প্রশ্ন—ভগবান গীতা গদ্যে বলেছিলেন না পদ্যে ?

উত্তর—সেইসময় যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই ভাষাতেই অর্জুন প্রশ্ন করেছেন এবং তাতেই ভগবান উত্তর দিয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন। আসলে যেখানে জিজ্ঞাসা সমাধানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা থাকে সেখানে বক্তা বা শ্রোতা কারোরই মন ভাষার দিকে থাকে না, তাদের মন তখন ভাবের দিকে থাকে। বলার সময় যদি কোন উদাহরণ মনে পড়ে তখন সেই উদাহরণটি যে ভাষায় থাকে, সেই ভাষাতেই বলা হয়। এইভাবেই ভগবান অর্জুনকে সরল গদ্যেই উপদেশ দিয়েছেন এবং যেখানে উদাহরণ স্বরূপ শ্রুতি থেকে কিছু উল্লেখ করেছেন সেখানে সেগুলি যেমন শ্রুতিতে আছে তেমন পদ্যেই বলেছেন, যেমন 'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি' (৮।১১) ইত্যাদি। তাৎপর্য হচ্ছে গীতার উপদেশ গদ্যে ও পদ্যে, দুভাবেই বলা হয়েছে। উপদেশগুলি শ্লোকবদ্ধ করেছেন শ্রীবেদব্যাস।

প্রশ্ন—শ্রীবেদব্যাস এগুলি শ্লোকবদ্ধ করলে গীতা ভগবানের বাণী কি করে হল ?

উত্তর—বেদব্যাসের (কর্ম) কৃতি এতই বিলক্ষণ যে, বক্তা যেভাবেই বলুন না কেন তিনি তা ঠিক সেই ভাষাতেই প্রকাশ করতে পারতেন। ভাগবতে ব্রহ্মা, গোপবালক, গোপিনীদের এবং ভগবানের উক্তিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ব্রহ্মার কথনরীতি একরকমের, গোপবালকদের কথা গ্রাম্য ধরনের, গোপিনীদের ভাষা স্ত্রীলোকদের মত এবং ভগবানের ভাষা অন্য আর এক ধরনের। সেইরকম শ্রীবেদব্যাস গীতায় ভগবানের বাণীগুলিও তাঁর ভাষারই মতো শ্লোকবদ্ধ করেছেন। সুতরাং গীতা যে ভগবানেরই বাণী—তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন—গীতা অনুযায়ী কর্মযোগ জ্ঞানযোগেরই সাধন না স্বতন্ত্র ?

উত্তর—গীতাতে কর্মযোগকে জ্ঞানযোগের সাধন-রূপেও বলা হয়েছে এবং স্বতন্ত্ররূপেও দেখান হয়েছে। যেমন 'কর্মযোগ ছাড়া জ্ঞানযোগীর সিদ্ধি লাভ করা কঠিন (৫।৬)', 'যিনি কর্মযোগ দ্বারা নিজ অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করেন নি, তিনি নিজ মধ্যস্থিত পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হন না (১৫।১১)'—এইস্থানে ভগবান কর্মযোগকে জ্ঞান-যোগের প্রাক-সাধন হিসাবে দেখিয়েছেন।

'জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ, এই দুটি পথই পরমাত্মার কাছে পৌঁছবার সমোপযোগী' (৫।৫), 'কর্মযোগ দ্বারা মানুষ তার নিজ মধ্যে স্থিত পরমাত্মতত্ত্বকে অনুভব করে' (১৩।২৪)। এইস্থানে ভগবান কর্মযোগকে 'স্বতন্ত্র' বলেছেন। এর তাৎপর্য এই যে, কর্মযোগ জ্ঞানযোগের সাধন হিসাবেও চিহ্নিত এবং স্বতন্ত্রভাবেও তা কল্যাণ সাধন করে।

প্রশ্ন—কর্মযোগের সাধনে সেবাই মুখ্য, কিন্তু গীতায় কর্মযোগ প্রকরণে সেবার কথা আসে নি কেন ?

উত্তর—গীতার মধ্যে 'যজ্ঞার্থ-কর্ম', 'লোক-সংগ্রহ' ইত্যাদি যে সমস্ত শব্দ আছে সেগুলি সেবামূলক বলেই মনে করতে হবে। কারণ লোকমর্যাদা সুরক্ষিত রাখবার জন্য নিজ স্বার্থ এবং অহংকার ত্যাগ করে শুধুমাত্র বিশ্বের জন্য যে কাজ করা যায়, সেগুলিকে 'সেবা'-ই বলা হয়।

(৩) গীতায় ঈশ্বরবাদ

ষট্স্বেব দর্শনেষ্বীশো ন তথাপেক্ষিতো মতঃ।
কল্যাণার্থং তু জীবানাং গীয়তে গীতয়েশ্বরঃ॥

অন্যান্য দর্শন থেকে গীতায় ঈশ্বরবাদ বিশেষরূপে বলা হয়েছে। ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, সাংখ্য, পূর্ব-মীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা—এই ছয়টি দর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবের কল্যাণসাধন। কিন্তু এতে মুখ্যভাবে ঈশ্বরের বর্ণনা নেই। এর মধ্যে ন্যায়দর্শনে, 'যা কিছু হচ্ছে সব ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে'—এইরূপে ঈশ্বরকে বরণ করা হলেও, মুক্তির জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয় নি। এই দর্শন একুশ প্রকারের দুঃখের বিনাশকেই মুক্তির কারণ বলে জানিয়েছেন। 'বৈশেষিক দর্শনে'-ও জীবকল্যাণে ঈশ্বরের প্রয়োজনের কথা না বলে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই ত্রিতাপনাশেরই আলোচনা করা হয়েছে। 'যোগদর্শনে' প্রধানতঃ চিত্তবৃত্তি-নিরোধের কথাই বলা হয়েছে। চিত্তবৃত্তি-নিরোধে স্বরূপে স্থিতি হয়ে যায়। হ্যাঁ, চিত্তবৃত্তি-নিরোধের সাধনায় ঈশ্বরের প্রণিধান বা শরণাগতিকেও একটি উপায় হিসাবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু সেই উপায়কে মুখ্যভাবে ধরা হয় নি। 'সাংখ্যদর্শন' এবং 'পূর্ব মীমাংসা' জীবের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। 'উত্তর মীমাংসা'-তে (বেদান্ত-দর্শনে) ঈশ্বরের প্রসঙ্গ বিশেষ-ভাবে আসে নি, বস্তুতঃ জীব এবং ব্রহ্মের একত্বের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বৈষ্ণব আচার্যগণ ঈশ্বরের বিশেষত্বের কথা জানালেও, গীতাতে যে ভাবে বিবৃত হয়েছে, সেইভাবে তাঁরা প্রকাশ করেন নি।

গীতায় ঈশ্বরভক্তির কথা প্রধানরূপে এসেছে। অর্জুন যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শরণাগত না হয়েছেন, ততক্ষণ ভগবান কোন উপদেশ দেন নি। যখন অর্জুন ভগবানের শরণাগত হয়ে নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ভগবান গীতার উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। উপদেশের শেষেও ভগবান **'মামেকং শরণং ব্রজ'** (১৮।৬৬) বলে নিজের প্রতি শরণাগতিকে অত্যন্ত গোপনীয় এবং শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন এবং অর্জুনও **'করিষ্যে বচনং তব'** (১৮।৭৩) বলে পূর্ণ শরণাগতি স্বীকার করেছেন।

গীতোক্ত কর্মযোগেও ঈশ্বরের আদেশরূপে ঈশ্বরেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন **'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'** (২।৪৭) ; **'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (২।৪৮) ; **'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্'** (৩।৮) ; **'কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বম্'** (৪।১৫) ইত্যাদি। এইরূপে গীতোক্ত জ্ঞানযোগেও ঈশ্বরের অব্যভিচারিণী ভক্তিকে জ্ঞান-প্রাপ্তির সাধন বলে জানানো হয়েছে (১৩।১০, ১৪।২৬)।

গীতার মূল শ্লোকসমূহ অবলোকন করলে দেখা যায় যে জীবের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন অত্যধিক।

জ্ঞাতব্য

প্রশ্ন—ঈশ্বরকে আমরা কেন মানব (স্বীকার করব) ?

উত্তর—ঈশ্বর আছেন, তাই মানতে হয়।

প্রশ্ন—ঈশ্বর যে আছেন, তার প্রমাণ কি ?

উত্তর—জগতে যে সকল বস্তু দেখা যায় তার কেউ না কেউ নির্মাণকর্তা আছেন ; কেননা, সৃষ্টিকর্তা ব্যতিরেকে কোন বস্তু তৈয়ারী হয় না। তেমনই সমুদ্র, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, নক্ষত্রাদি যা কিছু আমরা দেখতে পাই তারও কেউ নির্মাণকারী নিশ্চয়ই আছেন। এই সমস্ত জিনিসের রচয়িতা আমাদের মতো সামান্য মানুষ নিশ্চয়ই নন। এর নির্মাণকর্তা বা রচয়িতা এক সর্বসমর্থ ঈশ্বরই হতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, সমুদ্রের নিজ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা, চন্দ্র-সূর্যের নিয়মিত সময়ে উদয়-অস্ত হওয়া, এসবের নিয়ামক বা সঞ্চালক নিশ্চয়ই কেউ আছেন। এদের নিয়ামক সর্বসমর্থ ঈশ্বরই হতে পারেন।

প্রশ্ন—সমুদ্র, পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদির সৃষ্টি এবং পরিচালনা তো প্রকৃতি করে। সব কিছু প্রকৃতির দ্বারাই হয়। তাহলে ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা এবং নিয়ামক বলে কেন মানব ?

উত্তর—আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, প্রকৃতি জড়, না চেতন অর্থাৎ তাতে চৈতন্য আছে কি নেই ? যদি আপনি প্রকৃতিকে জ্ঞান- চৈতন্যসম্পন্ন বলে মনে করেন, তাহলে তাকেই আমি 'ঈশ্বর' বলছি। আমাদের শাস্ত্রে শক্তিকেও ঈশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব আপনার এবং আমার মেনে নেওয়াতে মাত্র শব্দের প্রভেদ, আসল তত্ত্বে কোনো ভেদ নেই। আর যদি মনে করেন প্রকৃতি জড় পদার্থ, তাহলে জড় প্রকৃতির দ্বারা জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়া কখনও হওয়া সম্ভব নয়। প্রাণী সৃষ্টি, তাদের শুভাশুভ কর্মের ফল দেওয়া ইত্যাদি কর্ম জড় প্রকৃতির দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। কারণ জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়া ছাড়া জগতের প্রাণীদের সুচারুভাবে সঞ্চালন হতে পারে না। জড়প্রকৃতিতে পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু তাতে জ্ঞানপূর্বক কর্ম সম্পাদনের শক্তি নেই। সেইজন্য 'ভগবান আছেন'— তা মানতেই হবে।

এক পক্ষ বলছেন 'ঈশ্বর নেই', দ্বিতীয় পক্ষ বলছেন 'ঈশ্বর আছেন'। যদি 'ঈশ্বর নেই'—একথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলেও আস্তিক এবং নাস্তিক দুই পক্ষই সমান ভাবে থাকবে অর্থাৎ যাঁরা ঈশ্বর মানেন তাঁদের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি 'ঈশ্বর আছেন'—এই কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে যাঁরা ঈশ্বর মানেন তাঁদের ঈশ্বর প্রাপ্তি হবে এবং ঈশ্বরকে যাঁরা মানেন না তাঁরা রিক্ত থেকে যাবেন। সুতরাং 'ঈশ্বর আছেন' এরূপ স্বীকার করাই সকলের পক্ষে লাভজনক। কিন্তু শুধু ঈশ্বরকে মেনে সন্তুষ্ট হলেই চলবে না, তাঁকে লাভ করতে হবে ; কারণ, তাঁকে পাবার সামর্থ্য সকল মানুষেরই আছে।

প্রাপ্তিযোগ্য কোন বস্তু থাকলে তবেই তার সম্বন্ধে বিধিনিষেধ বাক্য প্রযোজ্য হয়—'প্রাপ্তৌ সত্যাং নিষেধঃ'। এ কথা কেউ বলা প্রয়োজন মনে করে না যে, 'ঘোড়ার ডিম হয় না'। কারণ যা হতেই পারে না তার প্রসঙ্গে নিষেধ করাই অবাস্তব। তেমনি যদি ঈশ্বর না-ই থাকেন তাহলে— 'ঈশ্বর নেই'—একথা বলার মানেই হয় না। সুতরাং 'ঈশ্বর নেই' বলাতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি আছেন।

যে ব্যক্তি ইংরাজী ভাষার অস্তিত্ব মানেন, তিনিই তা শেখবার চেষ্টা করতে পারেন, পড়াশুনা করে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করতে পারেন। কিন্তু যাঁরা ইংরাজী ভাষার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, তাঁরা তা শেখবার প্রয়াস কেন করবেন ? যেমন, কারোর যদি ইংরাজীতে 'তার' (টেলিগ্রাম) আসে, সে ইংরাজী জানা ব্যক্তির দ্বারা তার মর্মোদ্ধার করে জানতে পারে যে তার কেউ খুব অসুস্থ এবং সেস্থানে গিয়ে সত্যই সে যদি জানতে পারে লোকটি ঠিকই অসুস্থ ছিল তখন তাকে বিশ্বাস করতেই হয় যে তারটি যখন ইংরাজী ভাষাতে লেখা তখন ইংরাজী ভাষা যথার্থই আছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য সত্যি সত্যি আগ্রহী তাঁর সঙ্গে সাধারণ ব্যক্তির (যাঁরা ঈশ্বর লাভের জন্য সচেষ্ট নন) অনেক পার্থক্য দেখা যায়। তাঁর সঙ্গ করলে, কথা শুনলে মনে শান্তি পাওয়া যায়। শুধু মানুষের নয়, বস্তুতঃ পশুপক্ষী ইত্যাদিও তাঁর কাছে গেলে শান্তি পায়। যাঁর ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটেছে তাঁর মধ্যে অনেক বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়, যা কিনা সাধারণ মানুষের থাকে না। ঈশ্বর না থাকলে তাঁদের মধ্যে এই বিশেষ লক্ষণ কোথা থেকে আসে ? সুতরাং মানতেই হবে যে ঈশ্বর আছেন।

মনুষ্যমাত্রই নিজের মধ্যে কিছু অপূর্ণতা, শূন্যতা অনুভব করে। এই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার যদি কোন কিছু না থাকত, তাহলে মানুষ এই অপূর্ণতা অনুভবই করত না। যেমন মানুষের খিদে পেলে প্রমাণিত হয় যে খাবার বস্তু কিছু আছে। যদি খাদ্যবস্তু না থাকত, তাহলে মানুষের খিদে পেত না। পিপাসা পেলে প্রমাণিত হয় পানীয় বস্তু কিছু আছে, পানীয় না থাকলে মানুষ পিপাসা অনুভব করত না। সেভাবেই মানুষের অপূর্ণতা অনুভব হলে প্রমাণিত হয় যে, সেটি পূর্ণ করার মতো কোন কিছু আছে। যদি না পূর্ণতত্ত্ব থাকত তাহলে মানুষ অপূর্ণতা অনুভব করত না। এই পূর্ণতত্ত্বকেই ঈশ্বর বলা হয়।

কোন বস্তু থাকলে সেটি পাবার ইচ্ছা হয়। যে বস্তু নেই, সেটি পাবার ইচ্ছাও হয় না। যেমন কারো কখনও আকাশের ফল খেতে বা আকাশের ফুলের আঘ্রাণ নিতে ইচ্ছা করবে না ; কারণ, আকাশে ফল বা ফুল হয়ই না। মানুষমাত্রেরই এই ইচ্ছা হয় যে 'আমি যেন চিরজীবী হই (কখনও না মরি)', 'সমস্ত কিছুর জ্ঞান প্রাপ্ত হই (যেন অজ্ঞান না থাকি)', এবং 'সদা সুখী হই (কখনও দুঃখ যেন না পাই)'। আমি 'চিরকাল জীবিত থাকি'— এই হল 'সৎ'-এর ইচ্ছা, 'সকল জ্ঞান প্রাপ্ত হই'— এ হচ্ছে

'চিৎ'-এর ইচ্ছা, 'সদা সুখে থাকি'—এই হচ্ছে 'আনন্দের' ইচ্ছা। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলে এমন কিছু আছে যা পাবার ইচ্ছা সকল মানুষের মধ্যেই আছে। এই তত্ত্বকেই ঈশ্বর বলা হয়।

কোনো মানুষ যখন অন্য মানুষকে নিজের চেয়ে বড় বলে মেনে নেয়, তাতে আসলে সে ঈশ্বরবাদকেই স্বীকার করছে বোঝায়। কেননা এই বড় হওয়ার পরম্পরা যেখানে পৌঁছায়, সেটিকেই ঈশ্বর বলে। **'পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।'** (পাতঞ্জল যোগদর্শন ১।২৬)। কোন মানুষ থাকলেই তার একজন বাবাও থাকবেন এবং তাঁর বাবারও একজন বাবা থাকবেন। এই পরম্পরা যেখানে সমাপ্ত হয়, তারই নাম ঈশ্বর—**'পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য'** (১১।৪৩)। একজন বলশালী থাকলে বুঝতে হবে, তার চেয়েও একজন বেশী বলশালী আছেন। এই উত্তরোত্তর যেখানে গিয়ে সমাপ্ত হয়, তারই নাম ঈশ্বর, কেননা তাঁর তুল্য বলশালী কেউ নেই। কেউ বিদ্বান হলে, তাঁর চেয়েও বেশী বিদ্বান আর কেউ থাকবেন। এই বিদ্যাবত্তার যেখানে সমাপ্তি তিনিই ঈশ্বর, কারণ তাঁর সমান বিদ্বান কেউ নেই—**'গুরুর্গরীয়ান্'** (১১।৪৩)। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, যোগ্যতা, ঐশ্বর্য, শোভা ইত্যাদি গুণগুলির যেটি শেষ সীমা, অর্থাৎ পূর্ণতা, তাকেই ঈশ্বর বলা হয়; কেননা তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই,—**'ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ'** (১১।৪৩)।

বস্তুতঃ ঈশ্বর মেনে নেবারই বিষয়, বিচার করবার বিষয় নয়। বিচার্য বিষয় সেটাই হতে পারে যাতে জিজ্ঞাসা থাকে এবং জিজ্ঞাসা সে বিষয়েই হতে পারে যার সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা জানা আর কিছু অজানা। কিন্তু যাঁর সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসা বা বিচার করা যায় না। তাঁকে আমরা মানি বা না মানি এ ব্যাপারে আমরা স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। এই জগৎ-সংসার দৃষ্টিগোচর হলেও এর আসল তত্ত্ব কি তা আমরা জানি না; অতএব জগৎ-সংসার বিচার করে বোঝার বিষয়। তেমনি জীবাত্মা স্থাবর বা জঙ্গমরূপে শরীরধারীরূপে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকেন। কিন্তু জীবাত্মা আসলে কি তা আমরা জানি না, অতএব জীবাত্মাও বিচার করে বোঝার বিষয়। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, সুতরাং ঈশ্বর বিচার বা তর্কের বিষয় নয়, বস্তুতঃ তিনি শ্রদ্ধা এবং মান্য করারই বিষয়। শাস্ত্রের দ্বারা অথবা তত্ত্বদর্শী বা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন এমন সাধু ও মহাপুরুষের কাছে শুনেই ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাস করা হয়। শাস্ত্র এবং সাধু দুই-ই বিশ্বাস করার বিষয়। যেমন বেদ ও পুরাণ ইত্যাদিতে হিন্দুদের বিশ্বাস আছে কিন্তু মুসলমানদের নেই, তেমনি সাধু মহাপুরুষদেরও কেউ মান্য করেন, কেউ করেন না; বস্তুতঃ তাঁদের সাধারণ মানুষ বলে মনে করেন।

প্রশ্ন—ঈশ্বর না মেনেও কি মানুষ উদ্ধার পেতে পারে, সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে?

উত্তর—হ্যাঁ, হতে পারে। এমন সম্প্রদায়ও আছে, যারা ঈশ্বর মানে না, সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের নীতি-নির্দেশগুলি তৎপরতার সঙ্গে পালন করলে মানুষ সংসার থেকে মুক্ত হয়। সাংসারিক দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু ভগবৎপ্রেমে মানুষ যে ক্রমবর্ধমান পরমানন্দ অনুক্ষণ অনুভব করে সেই প্রাপ্তি তাদের হয় না। তবে যদি তাদের ঈশ্বরের প্রতি কোন বিরোধ বা দ্বেষ বা মতান্তর না থাকে তাহলে তাদের ভগবৎ-প্রেম প্রাপ্তি হতে পারে, তা তারা ঈশ্বর মানুক বা না মানুক। বক্তব্য এই যে, নিজের সিদ্ধান্তের প্রতি অনুরাগ আছে এবং অপরের সিদ্ধান্তে বিরোধ না করে যিনি নিরপেক্ষ থাকেন, মুক্তির পর ভগবানের প্রতি তাঁর প্রেম জাগ্রত হতে পারে। মানুষ ভগবানকে স্বীকার করলেই যে তিনি তত্ত্বজ্ঞান করাবেন নচেৎ নয়, এমন নয়।

বাস্তবে উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থের প্রতি আকর্ষণই মুক্তির পথে প্রধান বাধা। মানুষ যদি এই উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থে সর্বতোভাবে মমতাহীন এবং রাগ-রহিত হয় তাহলে সে মুক্ত হবে অর্থাৎ তার পরাধীনতা ঘুচবে।

প্রশ্ন—গীতায় ঈশ্বরকে কতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে?

উত্তর—গীতায় ঈশ্বরকে তিনটি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সগুণ-সাকার, সগুণ-নিরাকার এবং নির্গুণ-নিরাকার। তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বরকে যদি 'সগুণ' ও 'নির্গুণ' বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে 'সগুণ'-এর দুটি ভেদ হয়—'সগুণ-সাকার' এবং 'সগুণ-নিরাকার' কিন্তু নির্গুণের একটিই ভেদ—'নির্গুণ-নিরাকার।' যদি ঈশ্বরকে 'সাকার-নিরাকার' বলে মানা হয় তবে

'সাকার'-এর একটি প্রকার হয় 'সগুণ-সাকার', তথা নিরাকার-এর দুটি প্রকার হয় 'সগুণ-নিরাকার' এবং 'নির্গুণ-নিরাকার'। গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে উনত্রিংশ-ত্রিংশ শ্লোকগুলিতে, অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক থেকে ষোড়শ শ্লোক পর্যন্ত এবং একাদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে ঈশ্বরের সগুণ-সাকার, সগুণ-নিরাকার এবং নির্গুণ-নিরাকার—এই তিনরূপের বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—কিছু ব্যক্তি ঈশ্বরকে মায়াময় বলে মানেন। তাঁরা মনে করেন যে নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মই একমাত্র মায়ারহিত, ঈশ্বর তো মায়াদ্বারা যুক্ত। এইরূপ মনে করা কতদূর যুক্তিযুক্ত ?

উত্তর—গীতা এইরূপ মনে করেন না। গীতা ঈশ্বরকে মায়ার অধিপতি বলে মানেন। মায়া ঈশ্বরের বশেই থাকেন। ভগবান বলেছেন, 'আমি নিজ প্রকৃতিকে বশে এনে নিজ যোগমায়া দ্বারা প্রকট হই' (৪।৬)। আসল বক্তব্য এই যে, যে সকল জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ, তাদের শিক্ষার জন্য ঈশ্বর এই মায়াকে স্বীকার করে নিজ ইচ্ছায় অবতাররূপ গ্রহণ করেন। যেমন, যে ইংরেজ হিন্দী ভাষা জানে না তাকে হিন্দী ভাষা বোঝাতে হিন্দী এবং ইংরাজি জানা এমন ব্যক্তির প্রয়োজন যিনি তাকে ইংরাজিতে বোঝাতে পারেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি, যিনি ইংরাজিতে তর্জমা করে দেন, তিনি ইংরেজের অধীন বা আশ্রিত নন। কেন না তিনি অপরকে বোঝাবার জন্য এই কাজ করছেন, নিজের জন্য তাঁর ইংরাজি জানার কোন প্রয়োজন নেই। এইরূপ মায়াবদ্ধ জীবের জন্য, তাদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর প্রকৃতিকে বশীভূত করে অবতাররূপে জীবের মধ্যে আবির্ভূত হন।

ঈশ্বর মায়ার অধিপতি বা মালিক একথা তিনি গীতায় স্পষ্টভাবে বার বার বলেছেন—যেমন ঈশ্বর জীবজগতের অধিপতি হয়েও অবতাররূপ গ্রহণ করেন (৪।৬), ঈশ্বর গুণ এবং কর্ম অনুসারে চার বর্ণের সৃষ্টি করেছেন (৪।১৩) ; যে ব্যক্তি সকাম ভাবে দেবতার উপাসনা করেন, তাঁর ফল দানের ব্যবস্থা ঈশ্বরই করেন (৭।২২), মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীবজগৎ প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় এবং পুনরায় মহাসর্গ বা কল্পের সুরুতে ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেন (৯।৭-৮)। সমস্ত প্রজাতিতে যত জীব জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতি তাদের মায়ের মত এবং ঈশ্বর তাদের পিতার মত (১৪।৩-৪), ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং তাদের নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী পরিভ্রমণ করান (১৮।৬১)। যেমন স্বর্ণকার যন্ত্রপাতির দ্বারা গহনা তৈরী করেন কিন্তু তিনি নিজে সেই সব যন্ত্রের অধীন নন, কেননা তিনি গহনা তৈরী করার উদ্দেশ্যেই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, তেমনি ঈশ্বর জগৎ-সংসার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই এই প্রকৃতিকে স্বীকার করেন।

যে নিজে বদ্ধ সে অপরকে বন্ধন মুক্ত করবে কি করে ? তা সে করতেই পারে না। জীব স্বয়ং বদ্ধ হয়ে আছে, সুতরাং সে কি করে অপরকে বন্ধন থেকে মুক্ত করবে ? কিন্তু ঈশ্বর বন্ধনবিরহিত, অতএব (জীব যদি চায় তাহলে) জীবকে বন্ধন এবং পাপ থেকে মুক্ত করতে একমাত্র তিনিই পারেন (১৮।৬৬)। মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ জীবের উপাসনা করে উপাসক বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা করলে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বর কখনও জীব হন না এবং জীবও কখনও ঈশ্বর হয় না। হ্যাঁ, অনন্যভক্তি দ্বারা জীব ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে, ঈশ্বরে লীন হতে পারে কিন্তু ঈশ্বর হতে পারে না।

প্রশ্ন—ঈশ্বরের নমুনা কি ?

উত্তর—ঈশ্বরের নমুনা জীবাত্মা, কেননা ঈশ্বর নিত্য ও নির্বিকার এবং জীবাত্মাও নিত্য এবং নির্বিকার। কিন্তু জীবাত্মা প্রকৃতির বশ হয় আর ঈশ্বর কখনও প্রকৃতির বশ হন নি এবং হবেনও না।

সকলেরই 'আমি আছি' নিজের এই সত্তার অনুভূতি হয়। তাদের কখনও সন্দেহ হয় না যে, 'আমি আছি, না নেই' ; বা কখনও পরীক্ষা করে দেখে না অথবা নিজের অস্তিত্বের অভাবও অনুভব করে না। শরীর আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না, কিন্তু নিজ অস্তিত্বের উপর নজর দিলে এমন অনুভূতি হয় না যে, 'আমি ছিলাম না।' হ্যাঁ, এই বিষয়ে 'জানা নেই' এরূপ বলা গেলেও 'আমি ছিলাম না'—এরূপ বলা যায় না। কেননা নিজের অস্তিত্ব কখনও ছিল না এই অভাবাত্মক অনুভূতি কারোরই হয় না। বর্তমানেও শরীর প্রতিক্ষণেই ক্ষয় হচ্ছে, মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু 'আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি'—এরকম কেউ অনুভব করে

না বরং অনুভব করে যে 'এই শরীর লয়ের দিকে এগোচ্ছে'। শরীরের অ-ভাব তিনিই অনুভব করতে পারেন যিনি নিজে ভাবরূপ। 'নেই'কে জানতে 'আছে' রূপ সত্তাই সক্ষম হতে পারে। সুতরাং এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, শরীরের অ-ভাব বোধকারী জীবাত্মা অবশ্যই স্বয়ং ভাবরূপ তথা সৎরূপ।

দেখা শোনা এবং বোঝার যে জগৎ তা আগে ছিল না, পরে থাকবে না এবং বর্তমানে নিত্য ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সংসার কাল যেমন ছিল আজ তেমন নেই, এমন কি এক ঘণ্টা আগে যা ছিল একঘণ্টা পরে তা আর থাকে না। অতএব জগৎ প্রতিক্ষণ ধ্বংসের পথে, ফুরিয়ে যাবার পথে এগোচ্ছে। কিন্তু যে আধারের ওপর নির্ভর করে এই সংসার বিরাজ করছে তিনি এমন এক প্রকাশক, রচয়িতা, আধার বা সর্বসমর্থ অস্তিত্ব যাঁর কখনও কোন পরিবর্তন হয় না। এই জগতে দেশ, কাল, বস্তু ব্যক্তি বা পরিস্থিতির যে সব পরিবর্তন হয় তা সবই সেই অপরিবর্তনীয় সত্তাকে অবলম্বন করে হয়। যেমন স্বচ্ছ আকাশে মেঘ ঘনায়, বৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয় এবং মেঘ গর্জন শোনা যায়। বিদ্যুৎ চমকায়, বৃষ্টি পড়তে থাকে, কখনও শিলাও পড়তে থাকে, তা সত্ত্বেও কিন্তু আকাশ যেমন তেমনই থাকে, আকাশের কোন পরিবর্তন হয় না। ঈশ্বর এইরূপ আকাশেরই মতো। তাঁতে জগৎ উৎপন্ন এবং লয় হওয়া, দেশ-কাল, বস্তু-ব্যক্তি, ঘটনা-পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়া, ইত্যাদি বিবিধ কার্যসকল হয়ে যায়, কিন্তু ঈশ্বর যেমন নির্বিকার ও পরিবর্তন-রহিত তেমনি একইরূপে থাকেন।

(৪) গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা

নরো ন যোগী ন তু কারকশ্চ নাংশাবতারো ন নয়প্রবীণঃ।
ভবাশ্রয়ত্বাচ্চ গুণাশ্রয়ত্বাৎ কৃষ্ণস্তু সাক্ষাদ্ ভগবান্ স্বয়ং হি॥

শাস্ত্রে ভগবত্তার লক্ষণ জানাতে গিয়ে বলা হয়েছে—

উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৮)

'যিনি সমস্ত প্রাণিকুলের উৎপত্তি, বিনাশ এবং আগমন-নির্গমন ও বিদ্যা-অবিদ্যাকে জানেন, তিনিই ভগবান নামে অভিহিত।'

মনোযোগ সহকারে গীতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, উপরি-উক্ত সমস্ত লক্ষণই ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান রয়েছে।

যেমন ভগবান গীতায় বলেছেন—'মহাসর্গের (কল্পের) প্রারম্ভে আমি নিজ প্রকৃতিকে বশ করে সমস্ত প্রাণিকুল সৃজন করে থাকি এবং মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাণিজগৎ আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয় (৯।৭-৮)। ব্রহ্মার দিবস আরম্ভে (কল্পের শুরুতে) প্রাণিজগৎ ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীর হতে জন্ম নেয় এবং ব্রহ্মার রজনী সমাগমে (প্রলয়কালে) সমস্ত প্রাণী ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীরে লীন হয় (৮।১৮-১৯)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাণিজগতের এইরূপ উৎপত্তি ও প্রলয় বিষয়ে অবহিত থাকেন।'

ভগবান বলেছেন, 'আমি সমস্ত প্রাণীর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ও তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে অবহিত আছি (৭।২৬)'। যে ব্যক্তি স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ, দান ইত্যাদি শুভকর্ম করে স্বর্গলোকে গমন করেন তিনি সেখানে নিজ পুণ্যফল ভোগ করে পুনরায় এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন (৯।২০-২১)। শুক্ল এবং কৃষ্ণ দুটি গতি বা পথ আছে। যেসব প্রাণী শুক্লপক্ষে গত হয়, তাদের আর ফিরে আসতে হয় না এবং কৃষ্ণপক্ষে গত প্রাণীকে আবার জন্ম নিতে হয় (৮।২৬)। আসুরী স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি বারংবার আসুরী জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় অধমগতি অর্থাৎ ভয়ংকর নরকে গমন

করে (১৬।১৯-২০)। এইরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত প্রাণীর যাতায়াত গমনাগমন সম্বন্ধে অবহিত আছেন।

অর্জুন ভগবানকে বলেছেন, 'প্রাণিকুলের গতির বিষয়ে আপনি ব্যতীত আর কেউ বলতে পারে না, আপনি প্রাণীদের গতি-বিষয়ক আমার এই সন্দেহ দূর করতে পারেন (৬।৩৯)'। অর্জুনের এই কথায় প্রমাণিত হয় যে, প্রাণীদের গতিবিধি এবং গমনাগমন সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্নরূপে অবগত।

ভগবান বলেছেন, 'আমি সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এবং প্রাণিসকলও আমাতে স্থিত, কিন্তু আমি প্রাণিসমুদয়ে স্থিত নই বা প্রাণিসকল আমাতে নেই, অর্থাৎ সবকিছুই আমি (৯।৪-৫), এই বিদ্যাই রাজবিদ্যা।' 'আসুরী ভাবাপন্ন মূঢ় মানুষ আমার শরণাগত হয় না (৭।১৫)। এই হচ্ছে অবিদ্যা।' বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে শ্রীকৃষ্ণ এরূপই জানেন।

সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও প্রলয়, গমনাগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যাকে এরূপ জানেন বলেই শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ ভগবান—তা প্রমাণিত হয়।

যে মানুষ সৎ কর্ম করে সাধনা দ্বারা উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হন তাঁকে সকলে মহাপুরুষ বলে। যাঁরা মনে করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন মহাপুরুষ মাত্র ছিলেন, তাঁদের সে ধারণা একেবারেই ভুল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার ছিলেন। যে ব্যক্তি সাধনা দ্বারা উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হন তাঁকে 'উত্তার' বলে, অবতার নয়। অবতার তাঁরই নাম—যিনি নিজ স্থিতিতে স্থিত থেকেও কোন বিশেষ কার্য করার জন্য অবতরণ করেন অর্থাৎ মনুষ্যাদিরূপে আবির্ভূত হন। কোন শিক্ষক যখন কোন শিশুকে বর্ণমালা শেখান তখন তিনি 'অ, আ, ই, ঈ' ইত্যাদি স্বরবর্ণ এবং 'ক, খ, গ, ঘ' ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বয়ং উচ্চারণ করে শিশুটিকে শেখান এবং তার হাত ধরে তাকে দিয়ে লেখান। শিশুটিকে শেখাতে গিয়ে তাঁকেও বারংবার লিখতে এবং পড়তে হয়, এইসময় শিক্ষককে শিশুদের স্তরে নেমে আসতে হয়। কিন্তু শিশুদের মধ্যে অবতরণ করলেও তাঁর বিদ্যাবত্তা যেমন ছিল তেমনই থাকে। এইভাবে সাধুগণের রক্ষা ও দুষ্টের বিনাশ এবং ধর্ম স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তিনি অজ(জন্মরহিত) হয়েও জন্মগ্রহণ করেন, অবিনাশী হয়েও বিনাশী (অপ্রকট) হন এবং সমস্ত প্রাণীর প্রভু বা ঈশ্বর হয়েও মাতাপিতার আজ্ঞাকারী সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন (৪।৬)। অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর অজ, অবিনাশী এবং ঈশ্বর ভাব কিছুমাত্র কমে না, তিনি যেমন ছিলেন তেমনই থাকেন।

যাঁরা মনে করেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন যোগী ছিলেন, ভগবান ছিলেন না তাঁদের ধারণা একেবারেই ভুল। তিনিই যোগী যাঁর মধ্যে যোগ থাকে। যোগের আটটি অঙ্গ, যার সর্বপ্রথম হল 'যম'। যম পাঁচপ্রকার—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। অতএব যিনি যোগী তিনি সর্বদা সত্যই বলেন, যদি অসত্য বলেন, তবে তিনি যোগী পদবাচ্য নন, কারণ তিনি যোগের প্রথম অঙ্গেরও পালন করেন নি। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যোগী মেনে নিলে তাঁকে ভগবান বলেও মানতে হবে। কেননা গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্থানে স্থানে নিজেকে ভগবান বলে ব্যক্ত করেছেন ; যেমন—

'আমি সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর হয়েও অবতাররূপে আবির্ভূত হই (৪।৬)। আমি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (১৫।১৫)। যে সকল ব্যক্তি স্বদেহে ও পরদেহে অবস্থিত আত্মরূপী ঈশ্বরকে দ্বেষ করেন তাদের আমি আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি (১৬।১৮-১৯)। যে সমস্ত অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি দম্ভ, অহংকার, কামনা, আসক্তি এবং বলগর্বিত হয়ে শাস্ত্রবিধিবিরুদ্ধ কঠোর তপস্যা করেন, তারা নিজ পঞ্চভূতবিশিষ্ট দেহ তথা অন্তঃকরণে স্থিত আমাকেও কষ্ট দেন (১৭।৫-৬)।'

অন্বয়-ব্যতিরেকেও নিজ ঈশ্বরত্ব বর্ণনা করে ভগবান বলেছেন, 'যিনি আমাকে সর্বলোকের মহান ঈশ্বর বলে মানেন, তিনি পরমা শান্তি লাভ করেন (৫।২৯), যিনি আমাকে অজ, অবিনাশী, মহান ঈশ্বর বলে মানেন তিনি মোহ ও সকল পাপ হতে মুক্ত হন (১০।৩)। কিন্তু আমার ঈশ্বর ভাব না জেনে যারা আমাকে মানুষ ভেবে অবহেলা করে তারা মূঢ় (মূর্খ) (৯।১১)। যারা আমাকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা তথা সমস্ত জগৎ সংসারের অধীশ্বর বলে মানে না, তাদের পতন অনিবার্য (৯।২৪)।'

যে জ্ঞেয়-তত্ত্বকে জানলে অমরত্ব প্রাপ্তি হয় (১৩।১২), আমিই সেই জ্ঞেয়-তত্ত্ব ; কারণ সমস্ত বেদ দ্বারা জ্ঞাতব্য যে তত্ত্ব তা আমিই (১৫।১৫)। আমি এই

জগৎ-সংসারের সৃষ্টিকর্তা। আমি এই জগৎ-সংসার রচনা করি। আমি ব্যতীত এই সৃষ্টির রচনাকারী আর কেউ নেই। এই জগতে আমিই ওতপ্রোত হয়ে আছি (৭।৬-৭)। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব (ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদি) আমা হতেই জাত (৭।১২)। প্রাণিগণের বুদ্ধি, জ্ঞান, মোহহীনতা ইত্যাদি ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয় (১০।৪-৫)। চর-অচর, স্থাবর-জঙ্গমে এমন কোন বস্তু বা প্রাণী নেই যা আমার সঙ্গে সম্বন্ধ-রহিত (১০।৩৯)। এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশেই স্থিত (১০।৪২)।

আমি নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে এই জগৎ সৃষ্টি করি (৯।৮), আমার অধিষ্ঠানবশতঃই অর্থাৎ আমার সত্তা থেকে জীবনীশক্তি পেয়ে প্রকৃতি এই জগৎ চরাচরের সৃষ্টি করে (৯।১০)।

দশম অধ্যায়ের বিংশ শ্লোক থেকে অষ্টত্রিংশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান নিজ বিভূতির প্রকাশ করেছেন। আবার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তাঁর অব্যয়, অবিনাশী, দিব্য, বিরাট-রূপ দেখিয়েছেন। এই অত্যুগ্র বিরাটরূপ দেখে অর্জুন ভীত হলে ভগবান তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়ে অর্জুনকে সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং পরে আবার দ্বিভুজরূপে ফিরে আসেন ইত্যাদি। এর তাৎপর্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ যদি যোগী হন তাহলে তিনি সত্য বলেন, এবং যদি সত্য বলেন তাহলে তিনি ঈশ্বর, কেননা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন। অতএব যিনি শ্রীকৃষ্ণকে যোগী বলে মানেন, তাঁকে 'শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর'—একথা মানতেই হবে।

(৫) গীতায় অবতারবাদ

সর্বাগমেষু যে প্রোক্তা অবতারা জগৎপ্রভোঃ।
তদ্রহস্যং হি গীতায়াং কৃষ্ণেন কথিতং স্বয়ম্ ॥

যিনি নিজ স্থিতি থেকে নিম্নে অবতরণ করেন তাঁকে 'অবতার' বলা হয়। যেমন কোন শিক্ষক কোন বালককে পড়াবার সময় তার সমকক্ষ হয়ে পড়াতে থাকেন, অর্থাৎ তিনি নিজে 'ক, খ, গ, ঘ' ইত্যাদি অক্ষর উচ্চারণ করে বালককে উচ্চারণ শেখান এবং হাত ধরে তাকে অক্ষরগুলি লিখতে শেখান, এটি হল সেই বালকের কাছে শিক্ষকের অবতার অর্থাৎ অবতরণ। গুরুও যেমন নিজ শিষ্যের সম-স্থিতিতে এসে অর্থাৎ শিষ্য যাতে বুঝতে পারে, এমনভাবে তার যোগ্যতা অনুসারে উপদেশ দেন, তেমনি ভগবান মানুষকে ঠিকমত ব্যবহার এবং পারমার্থিক শিক্ষা দেবার জন্য মানুষের সম-স্থিতিতে আসেন, অবতাররূপ ধারণ করেন।

ভগবান সাধারণ মানুষের মতো জন্মান না। জন্ম না নিলেও তিনি জন্মের লীলা করেন, অর্থাৎ মাতৃগর্ভেই আসেন, কিন্তু মানুষের মতো গর্ভে প্রবিষ্ট হন না। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর আশ্রয় নিলেন, তখন প্রথমে তিনি বসুদেবের মনে উদয় হলেন ও চক্ষু দ্বারা দেবকীর মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন এবং দেবকী মনের দ্বারা তাঁকে ধারণ করলেন।[১] গীতায় ভগবান বলেছেন—'আমি অজ (জন্মরহিত) হওয়া সত্ত্বেও জন্মগ্রহণ করি, অর্থাৎ আমার

---

[১]ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী। দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথাঽঽনন্দকরং মনস্তঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।১৮)

'...যথা দীক্ষাকালে গুরুঃ শিষ্যায় ধ্যানমুপদিশতি শিষ্যশ্চ ধ্যানোক্তাং মূর্তিং হৃদি নিবেশয়তি তথা বসুদেবো দেবকীদৃষ্টৌ স্বদৃষ্টিং নিদধৌ। দৃষ্টিদ্বারা চ হরিঃ সংক্রামন্ দেবকীগর্ভে আবির্বভূব। এতেন রেতোরূপেণাধানং নিরস্তম্।' (অন্বিতার্থ-প্রকাশিকা)

জন্মরহিত স্বভাব যেমন তেমনি থাকে। আমি অব্যয় (স্বরূপে নিত্য) আত্মা হয়েও অন্তর্ধান হই অর্থাৎ আমার তাতে নিত্য-প্রকাশিত স্বভাবের কিছুমাত্র হানি হয় না। আমি সমস্ত প্রাণিকুলের, সমস্ত জগৎ-সংসারের ঈশ্বর বা প্রভু হওয়া সত্ত্বেও অবতাররূপে মাতাপিতার আজ্ঞা পালন করি, তাতে আমার ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্য কিছুমাত্র কমে না। মানুষ নিজ-স্বভাবের বশ হয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু আমি আমার স্বভাবকে বা প্রকৃতিকে বশ করে স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করি (৪।৬)।'

ভগবান নিজের অবতারত্ব গ্রহণের কাল চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন, 'যখন ধর্ম হ্রাস পেয়ে অধর্ম বর্ধিত হয়ে ওঠে তখনি আমি অবতারূপে জন্মগ্রহণ করি, জগতে প্রকাশিত হই' (৪।৭)। নিজের অবতরণের প্রয়োজন জানাতে গিয়ে বলেছেন, 'ভক্তদের এবং তাদের ভাব রক্ষার জন্য, অন্যায়-অত্যাচারকারী দুষ্টদের দমনের জন্য, ধর্মের সংস্থাপন বা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য আমি যুগে যুগে অবতাররূপে জন্ম নিই, অবতার গ্রহণ করি (৪।৮)। এইরূপ জন্মরহিত অবিনাশী এবং ঈশ্বররূপ আমার মহেশ্বর পরমভাবকে না জেনে যেসব মানুষ আমাকে অবহেলা করে, তিরস্কার করে, তারা মূর্খ। এইসব মূর্খ, মূঢ় ব্যক্তি আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী প্রকৃতির বশবর্তী হয়ে যা কিছু আশা করে, যা কিছু শুভকর্ম করে, যে বিদ্যা আহরণ করে, তা সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যায় অর্থাৎ তাতে কোনও সৎ ফল পাওয়া যায় না (৯।১১-১২)। যে মানুষ আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অবিনাশী পরম ভাবকে না জেনে অব্যক্ত পরমাত্মাকে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ বলে মনে করে, সে ব্যক্তি বুদ্ধিহীন। এইরূপ ব্যক্তির নিকট আমি আমার আসলরূপে প্রকাশিত হই না (৭।২৪-২৫)।'

নাটকের সময় কেউ সঙ্ সাজলে তখন সে অন্যদের কাছে তার আসল পরিচয় দেয় না। কারণ সে তার আসল পরিচয় দিয়ে দিলে খেলাই পণ্ড হয়ে যাবে। এইরূপ ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তখন সকলের কাছে নিজের আসল রূপ প্রকাশিত করেন না, সকলকে নিজ পরিচয়ও দেন না, —'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য' (৭।২৫)। কেননা নিজ পরিচয় দিয়ে দিলে আর লীলা করতে পারবেন না। যেমন নাটকের সময় ভয়ংকর রূপের কোন সঙ্কে দেখলে তার আত্মীয়স্বজনও চিনতে পারে না, ভয় পায়। তখন সঙ্ সাজা লোকটি কিন্তু নিজের প্রিয়জনকে সঙ্কেতে নিজ পরিচয় দিয়ে বলে, 'অরে! তুই ভয় পাসনি, আমি তো সে-ই।' তেমনি ভগবানের অবতার-দেহ দেখে কোন ভক্ত ভয় পেলে ভগবান তাকে নিজ পরিচয় দিয়ে বলেন, 'ভাই! ভয় পেয়ো না, আমিই তো সে-ই।'

দুই বন্ধু ছিল। একজন বাজারে গিয়ে দোকান খুলল এবং জিনিসপত্র সাজাল, যাতে খরিদ্দার জিনিসপত্র দেখে কিনতে পারে। অন্যজন পুলিশের বেশ ধারণ করে তার কাছে গিয়ে তাকে খুব ধমক দিতে লাগল। 'আরে! তুই এই রাস্তার ওপর কেন দোকান খুলেছিস, শিগ্‌গির সব ওঠা, নাহলে তোর নামে নালিশ পাঠাচ্ছি।' তার কথায় সেই দোকানদার বন্ধুটি ভয় পেয়ে দোকান গোটাতে লাগল। তার এই ভীত ভাব দেখে পুলিশ সাজা বন্ধুটি বলল, 'আরে! তুই ভয় পাস্‌নি, আমি তোর সেই বন্ধু।' এইরূপ অর্জুনের সামনে ভগবান যখন বিরাটরূপে প্রকটিত হলেন, তখন অর্জুন ভয় পেয়েছিলেন। তখন ভগবান নিজের সত্য পরিচয় দিয়ে অর্জুনকে সান্ত্বনা জানালেন।

এখানে মানুষের মনে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, বর্তমানে ধর্ম লোপ পাচ্ছে এবং অধর্ম বেড়ে যাচ্ছে এবং উন্নতমনা পুরুষেরাও দুঃখ পাচ্ছেন, তবুও ভগবান কেন অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করছেন না! এর উত্তর হচ্ছে যে, এখনও ভগবানের অবতরণের সময় হয় নি। কারণ শাস্ত্রে, কলিযুগে যেরূপ অধঃপতনের কথা বলা আছে, তার থেকেও বেশী অধঃপতন যদি হয় তবেই ভগবান অবতার- দেহ ধারণ করেন। এখনও সেই সময় হয় নি। ত্রেতাযুগে রাক্ষসেরা ঋষি-মুনিদের মেরে খেয়ে হাড়ের পাহাড় তৈরী করেছিল, তবেই ভগবান অবতরণ করেছিলেন। বর্তমান কলিযুগে দেখা যায় যে, সেইরূপ অত্যাচার-অনাচার এখনও হয় নি। ধর্ম যদি সামান্য মাত্রায় হ্রাস পায়, ভগবান আধিকারিক পুরুষদের পাঠিয়ে তা ঠিকমতো চালাবার ব্যবস্থা করেন অথবা স্থানে স্থানে সাধু-মহাত্মা প্রকটিত হয়ে তাঁদের আচরণ এবং ভাষণ দ্বারা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন।

একভাবে দেখতে গেলে ভগবানের অবতার নিত্য। এই জগৎ-সংসার ভগবানেরই অবতার-রূপ।

সাধকগণের কাছে সাধ্য এবং সাধনরূপেই ভগবান অবতীর্ণ। ভক্তদের জন্য ভক্তিরূপে, জ্ঞানযোগিগণের কাছে জ্ঞেয়রূপে, কর্মযোগিগণের কাছে কর্তব্যরূপে ভগবানই অবতার! ক্ষুধিতের কাছে অন্নরূপে, পিপাসার্তদের কাছে জলরূপে, বস্ত্রহীনদের কাছে বস্ত্ররূপে এবং রোগিগণের কাছে ঔষধরূপে তাঁরই অবতাররূপ। ভোগিগণের কাছে ভোগরূপে, লোভীদের কাছে অর্থ, বস্ত্র ইত্যাদি রূপেই তিনি অবতীর্ণ। গরমে শীতল ছায়া, শীতে উষ্ণ বস্ত্র ভগবানের অবতার রূপ। এর তাৎপর্য এই যে জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি সকল রূপই তাঁর অবতার রূপ, কেননা বাস্তবে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯) **'সদসচ্চাহম্'** (৯।১৯)। কিন্তু যে ব্যক্তি জগৎ-সংসার রূপে প্রকটিত প্রভুকে ভোগ্য মনে করে নিজেকে তার অধিকারী ভাবে, তার পতন হয় এবং সে জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

যাঁরা মনে করেন ভগবান শুধুই নিরাকার, সাকার হন না, তাঁদের সে ধারণা একেবারেই ভুল। কেননা প্রাণিমাত্রই অব্যক্ত (নিরাকার) এবং ব্যক্ত (সাকার) হয়ে থাকে। এর অর্থ এই যে সমস্ত প্রাণী প্রথমে অব্যক্ত, মাঝে ব্যক্ত এবং শেষে আবার অব্যক্ত হয়ে যায় (২।২৮)। পৃথিবীরও দুই রূপ নিরাকার এবং সাকার। পৃথিবী তন্মাত্ররূপে নিরাকার এবং স্থূলরূপে সাকার হয়ে আছে। জল পরমাণুরূপে নিরাকার এবং মেঘ, বৃষ্টি, শিলারূপে সাকার হয়ে আছে। বায়ু নিস্পন্দরূপে নিরাকার, স্পন্দনরূপে সাকার। দিয়াশলাই, কাঠ, পাথর ইত্যাদিতে আগুন নিরাকাররূপে অবস্থিত এবং ঘর্ষণ ইত্যাদি সাধন দ্বারা সাকার রূপ ধারণ করে। এইরূপে সৃষ্টিমাত্রই নিরাকার এবং সাকার হতে থাকে। প্রলয় এবং মহাপ্রলয় কালে সৃষ্টি নিরাকার থাকে এবং কল্প ও মহাকল্পের সময়ে সাকার রূপ ধারণ করে। যদি প্রাণিকুল নিরাকার ও সাকার হতে পারে, পৃথিবী, জল ইত্যাদি মহাভূত নিরাকার ও সাকার হতে পারে, সৃষ্টিও নিরাকার-সাকার হতে পারে, তাহলে ভগবান কি নিরাকার ও সাকার হতে পারেন না? তাঁর নিরাকার ও সাকার হওয়াতে কিসের বাধা? এইজন্য ভগবান গীতায় বলেছেন, 'সমস্ত জগৎ আমার অব্যক্ত স্বরূপে ব্যাপ্ত হয়ে আছে'—**'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা'** (৯।৪)। এখানে ভগবান নিজেকে **'ময়া'** পদ দ্বারা ব্যক্ত বা সাকার এবং **'অব্যক্তমূর্তিনা'** বাক্য দ্বারা অব্যক্ত বা নিরাকার বলে জানিয়েছেন। সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্বিংশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন, 'যারা আমাকে অব্যক্ত বা নিরাকার বলেই শুধু মানে, ব্যক্ত বা সাকার বলে নয়, তারা বুদ্ধিহীন আর যারা ব্যক্ত বা সাকার বলে মনে করে, অব্যক্ত বা নিরাকার বলে নয়, তারাও বুদ্ধিহীন। কেননা এই দুই পক্ষই আমার পরম ভাবকে জানে না।'

প্রশ্ন—অবতারী ভগবানের দেহ কেমন হয়?

উত্তর—আমাদের জন্ম কর্ম অনুযায়ী হয় কিন্তু ভগবানের অবতার-দেহ ধারণ কর্মের জন্য হয় না। অতএব আমাদের শরীর যেমন মাতাপিতার রজ-বীর্যের থেকে সৃষ্ট হয়, ভগবান সেই ভাবে শরীর ধারণ করেন না। জীবনকালে ইনি সাধারণ মানুষের মতোই লীলা করেন বটে কিন্তু ইনি জন্মান না, আবির্ভূত হন **'সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া'** (৪।৬)। আমাদের আয়ু কর্ম অনুযায়ী সীমিত কিন্তু ভগবানের আয়ু সীমিত হয় না। তিনি নিজ ইচ্ছানুসারে যতদিন পৃথিবীতে প্রকটিত থাকতে চান, ততদিন থাকতে পারেন। আমাদের অজ্ঞতার জন্য অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজ কর্মফল ভোগ করতে হয়, কিন্তু ভগবানকে এসব ভোগ করতে হয় না, তিনি কখনও সুখী বা দুঃখী হন না।

আমাদের শরীর পঞ্চভূতের উপাদানে সৃষ্ট; কিন্তু ভগবানের অবতার-দেহ পঞ্চভূত হতে সৃষ্ট নয়। আসলে ইনি সচ্চিদানন্দময় **'সচ্চিৎসুখৈকবপুষঃ পুরুষোত্তমস্য'**; **'চিদানন্দময় দেহ তুম্হারী'** (শ্রীরামচরিতমানস ২।১২৭।৩)। 'সৎ' দ্বারা ভগবানের অবতার-দেহ সৃষ্ট হয়, 'চিৎ' দ্বারা হয় তাঁর শরীরের প্রকাশ, 'আনন্দ' দ্বারা তাঁর শরীরে আকর্ষণ ঘটে। সেই শরীর, যাঁরা ভগবান মানেন এবং মানেন না, উভয়ের কাছেই স্বতঃপ্রিয় বলে মনে হয়। সুতরাং ভগবানের শরীর মানুষের মতো কেবল হাড়, মাংস, রক্ত ইত্যাদির সমাহার নয়। কিন্তু অবতার লীলার সময় তাঁর চিন্ময় শরীর পাঞ্চভৌতিক শরীরের মতো দেখায়। ভক্তের ভাব অনুযায়ী তাঁরও খিদে পায়, পিপাসা লাগে, ঘুম পায়, তিনি গরম-ঠাণ্ডা অনুভব করেন এবং ভয়ও পান।

দেবতাদের দেহ যদিও দিব্য বলা হয়, তবু তাঁদের দেহও পাঞ্চভৌতিক। স্বর্গের দেবতাদের শরীর তেজঃ তত্ত্বপ্রধান, বায়ু দেবতার শরীর বায়ুতত্ত্ব প্রধান, বরুণ দেবতার শরীর জলতত্ত্ব প্রধান, মানুষের শরীর পৃথিবীতত্ত্ব প্রধান হয়। কিন্তু ভগবানের শরীর এইসব তত্ত্বরহিত, চিন্ময়। দেবতাদের শরীর দিব্য হলেও নিত্য নয়, তাঁরা মরণশীল। যাঁরা আজান দেবতা তাঁরা মহাপ্রলয়ে ভগবানে লীন হয়ে যান; যাঁরা পুণ্য কর্মের ফলে স্বর্গে গিয়ে সেখানে দেবতা নামে অভিহিত হন, তাঁরা তাঁদের পুণ্যকর্ম ক্ষয় হলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আসেন এবং জন্ম-মরণ চক্রে বাহিত হন। (ভগবানের পাপ-পুণ্য হয় না, কারও দেওয়া অভিশাপ তাঁর লাগে না, কিন্তু অভিশাপের মর্যাদা রক্ষার্থে তিনি তা স্বীকার করে নেন।)

প্রশ্ন—যোগী এবং ভগবানের সর্বজ্ঞতায় কি প্রভেদ? কেননা যোগীও সবকিছু জানতে পারেন, আবার ভগবানও তা পারেন।

উত্তর—যিনি সাধনা দ্বারা শক্তিলাভ করেন, তাঁর সামর্থ্য ও সর্বজ্ঞতা সীমিত হয়। তিনি দূরের কোন বিষয়, কারও মনের কথা জানতে চাইলে তা জানতে পারেন। কিন্তু তা জানবার জন্য তাঁর নিজ সাধনক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। ভগবানের সামর্থ্য ও সর্বজ্ঞতা অসীম। অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎকে জানবার জন্য শক্তি বিশেষ ভগবানকে প্রয়োগ করতে হয় না, তিনি স্বতঃ স্বাভাবিকভাবেই তা জানেন, কারণ তাঁর সর্বজ্ঞতা স্বতঃ ও স্বাভাবিক।

প্রশ্ন—যোগী যতদিন ইচ্ছা নিজ শরীর রক্ষা করতে পারেন। ভগবানও তাই, তাহলে দুজনের পার্থক্য কি?

উত্তর—যোগী প্রাণায়ামের দ্বারা নিজ শরীর অনেকদিন পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে প্রাণায়ামের পরাধীন হয়ে থাকতে হয়। ভগবানকে মানুষরূপে প্রকট থাকতে হলে কারও পরাধীন হতে হয় না। তিনি সদা-সর্বদা স্বাধীন। বিশেষত্ব এই যে, যোগীর শক্তি সাধনা দ্বারা লব্ধ, অতএব তা সীমিত, অপরপক্ষে ভগবানের শক্তি স্বতঃসিদ্ধ, তাই তা অসীম।

প্রশ্ন—যোগীকেও ভগবান বলা হয় এবং অবতারী ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়, তাহলে দুইয়ে কি প্রভেদ?

উত্তর—ষড়ৈশ্বর্য সম্পন্ন হলে—অণিমা, মহিমা, গরিমা ইত্যাদি সিদ্ধি লাভ হলে যোগীকে ভগবান বলা হয়, কিন্তু তার দ্বারা তিনি ভগবান হয়ে যান না। কেননা তিনি ভগবানের মতো স্বাধীনভাবে সৃষ্টি-রচনা ইত্যাদি কাজ করতে পারেন না। বিশেষ তপোবল সহায়তায় বিশ্বামিত্রের মতো কিছু সৃষ্টি রচনা করতে পারলেও, তাঁর সেই শক্তি সীমিতই হয়ে থাকে এবং তাতেও তপোবলের প্রভাব থাকেই।

ভগবত্তা দুই প্রকারের—সাধনা দ্বারা সাধ্য এবং স্বতঃসিদ্ধ। যোগ ইত্যাদি সাধনা দ্বারা যে ভগবত্তা (অলৌকিক ঐশ্বর্য ইত্যাদি) প্রকাশ পায় তা সীমিত হয়, অসীম নয়; কেননা তা আগে ছিল না, সাধনা করার পরেই এসেছে। কিন্তু ভগবানের ভগবত্তা অসীম, অনন্ত; কারণ তা কোন উপায় দ্বারা লব্ধ নয়, তা স্বতঃসিদ্ধ।

প্রশ্ন—বেদব্যাস আদি কারক[১] পুরুষদেরও ভগবান বলা হয় এবং অবতাররূপী ঈশ্বরকেও ভগবান বলা হয়, দুইয়ের তফাৎ কি?

উত্তর—বেদব্যাস ইত্যাদি কারক-পুরুষকে ভগবানের কলাবতার বা অংশাবতার বলা হয়। তাঁরা ভগবানের ইচ্ছাতেই এখানে অবতার শরীর ধারণ করেন। অবতার হয়ে তাঁরা ধর্মের স্থাপনা এবং সাধুগণের রক্ষার ব্যবস্থা করেন বটে কিন্তু দুষ্টের দমন করেন না। কারণ দুষ্টের বিনাশ একমাত্র ভগবানেরই কাজ, কারক পুরুষদের নয়।

আজকাল কিছু লোক কিছু বিশেষত্ব অর্জন করে নিজেকে 'ভগবান' বলে প্রচার করে এবং নামের সঙ্গে 'ভগবান' শব্দ যোগ করে নেয়, এরা সব আসলে পাষণ্ড। নিজেকে ভগবান বলে নিজের পূজা করাতে চায়, নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য লোক ঠকাতে চায়। মানুষের এইসব চক্রান্তে পড়ে নিজের সর্বনাশ করা উচিত নয়। এই তথাকথিত ভগবানদের থেকে দূরে থাকাই উচিত।

কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্প্রদায়ের মূল আচার্য পুরুষকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অবতার বা ভগবান বলে

[১]কারক-পুরুষ তাদের বলা হয় যাঁরা ঈশ্বর লাভ করে ভগবদ্ধামে নিবাস করেন এবং ভগবদ্ ইচ্ছায় লোক-হিতার্থে পৃথিবীতে আসেন।

বিবৃত করেন, কিন্তু আসলে তিনি ভগবান নন। এইসব আচার্য মানুষকে ভগবানের দিকে নিয়ে যান, কুপথ থেকে সুপথে নিয়ে যান। এইজন্য তাঁরা সেই সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ভগবানের চেয়েও বেশী পূজনীয় হতে পারেন[১] কিন্তু ভগবান হতে পারেন না।

(৬) গীতায় মূর্তিপূজা

যে সনাতনধর্মস্থাঃ শ্রদ্ধাপ্রেমসমন্বিতাঃ।
মূর্তিপূজাং ন কুর্বন্তি মূর্তৌ তু প্রভুপূজনম্॥

আমাদের সনাতন বৈদিক সিদ্ধান্তে ভক্তগণ মূর্তিপূজা করেন না, তাঁরা পরমাত্মার পূজা করেন। বিশেষত্ব হল এই যে, যে পরমাত্মা ব্যাপ্তিস্বরূপ, তাঁকে বিশেষভাবে অনুধ্যান করার জন্যই মূর্তি করা, ঐ মূর্তির মধ্যেই ধ্যান এবং চিন্তন সহজসাধ্য হয়।

যদি মূর্তিরই পূজা করা হোত তাহলে পূজকের ভিতর সেই পাথরের মূর্তি সম্পর্কে এরূপ ভাব হোত যে, 'তুমি কোন একটি পর্বত হতে এসেছ, কোন এক ব্যক্তি তোমায় তৈরী করেছে, কোন এক ব্যক্তি দ্বারা তুমি এখানে আনীত। অতএব হে প্রস্তরদেব ! তুমি আমার কল্যাণ করো।' কিন্তু এমন তো কেউ বলে না, তাহলে মূর্তির পূজা কিভাবে হল ? ভক্তেরা মূর্তির পূজা করেন না, তাঁরা মূর্তিতে ভগবানেরই পূজা করেন অর্থাৎ মূর্তিভাব দূর করে ভগবদ্‌ভাবে পূজা করেন। এইভাবে মূর্তিতে ভগবানের পূজা করলে সর্বত্রই ভগবানের অনুভব হয়। ভগবৎপূজায় ভগবানের প্রতি ভক্তিভাবের প্রথম সঞ্চার হয়। পরে ভক্ত সিদ্ধ হয়ে গেলেও তাঁর ভগবানের পূজা চলতেই থাকে।

মূর্তিতে তাঁকে পূজার বিষয়ে গীতায় ভগবান বলেছেন, 'ভক্তগণ ভক্তিপূর্বক আমাকে নমস্কার করে আমার পূজা করেন (৯।১৪)', 'যে ভক্ত শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ পূর্বক পত্র-পুষ্প, ফল-জল ইত্যাদি আমাকে অর্পণ করেন, তাঁদের দেওয়া উপচার আমি গ্রহণ করে থাকি' (৯।২৬)। দেবগণ (বিষ্ণু-শিব-শক্তি-গণেশ-সূর্য, ঈশ্বর কোটির এই পঞ্চ দেবতা), ব্রাহ্মণগণ, আচার্যগণ, মাতা-পিতা প্রমুখ গুরুজনগণ এবং জ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের পূজা করাকে শারীরিক তপ বলা হয় (১৭।১৪)। যদি সামনে এঁদের মূর্তি না থাকে তাহলে কাকে নমস্কার করা হবে ? কাকে পত্র-পুষ্প, ফল-জল ইত্যাদি প্রদান করা হবে, কারই বা পূজা করা হবে ? এতে এই প্রমাণিত হয় যে, গীতায় মূর্তিপূজার কথাও বলা হয়েছে।

এইরূপ গাভী, তুলসী, অশ্বত্থ, ব্রাহ্মণ, তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি, গিরিগোবর্ধন, গঙ্গা-যমুনা ইত্যাদিকে পূজা করাও ভগবানকেই পূজা করা। এঁদের পূজা করলে 'সমস্ত স্থানেই পরমাত্মা আছেন', এই কথা অতি সরলভাবে অনুভব করা যায়। অতএব সর্বত্র পরমাত্মাকে অনুভব করতে গাভী ইত্যাদির পূজা অত্যন্ত সহায়ক হয়। কেননা যে পূজা করে, 'সর্বত্রই পরমাত্মার অধিষ্ঠান' এই কথা সে মানতে আরম্ভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি পূজার ধার দিয়েও যায় না, কেবল বাক্-সর্বস্ব, তার 'সর্বত্র পরমাত্মার অধিষ্ঠান' এই অনুভব সম্ভব হয় না। বিশেষত্ব এই যে মূর্তিদ্বারা ভগবৎপূজন, কল্যাণের এবং শ্রেয়ের সাধন।

ভগবৎপূজন ছাড়া অস্থি-মাংসের পূজা অর্থাৎ নিজ শরীরকে দামী দামী অলঙ্কার ও কাপড় দিয়ে সাজানো, নিজ গৃহ সুন্দর ভাবে তৈরী করা, সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র দিয়ে মনোহর রূপে সাজানো—এও এক প্রকারের মূর্তিপূজা কিন্তু এই পূজা মানুষকে নিম্নগামী করে দেয়।

জ্ঞাতব্য

প্রায় সব আস্তিক ব্যক্তিই মানেন যে ভগবান সর্বত্র পরিপূর্ণ রূপে বিরাজিত। বাস্তবিক পক্ষে এটা তাঁরাই

[১] মোরে মন প্রভু অস বিশ্বাসা। রাম তে অধিক রাম কর দাসা।
রামসিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা। চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১২০।৮-৯)

মানেন যাঁরা মূর্তি, বেদ, সূর্য, অশ্বত্থ, তুলসী, গাভী ইত্যাদিকে ভগবান মনে করে পূজা শুরু করেছেন। কারণ যাঁরা ঐসব বস্তু এবং প্রাণীতে ভগবান আছেন বলে মনে করেন, তাঁরা স্বতঃই সকল বস্তু এবং সকল প্রাণীতে ভগবানের উপস্থিতি রয়েছে বলে মেনে নেবেন। যাঁরা মনে করেন কেবল মূর্তিতেই ভগবান আছেন তাঁদের 'প্রাকৃত (আরম্ভিক) ভক্ত বলা হয়[১] কেননা তাঁরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে ভগবানের পূজা শুরু করেছেন। অতএব তাঁরা ভগবানের মুখোমুখি হয়েছেন।' কিন্তু যিনি 'ভগবান সর্বত্র আছেন'—এইরূপ বলেন অথচ তাঁর মধ্যে কোনকিছুর প্রতিই ভালবাসার ভাব, পূজার ভাব, শ্রেষ্ঠত্বের ভাব কিছুমাত্র নেই, তাঁকে ভক্ত বলা যাবে না, কেননা তিনি শুধু কথার কথা বলেন যে 'ভগবান সর্বত্র আছেন', সত্যিই তা তিনি মানেন না, অতএব এই ব্যক্তি ভগবানের সম্মুখীন হন নি।

মূর্তিতে ভগবানের পূজা শ্রদ্ধার বিষয়, তর্কের নয়। যাঁর শ্রদ্ধা আছে, তাঁর কাছে ভগবানের মহত্ত্ব প্রকটিত হয়। তাঁর করা পূজাও ভগবান গ্রহণ করেন, তাঁর হাত থেকে খাবার গ্রহণ করেন। যেমন ভক্তিমতী করমার কাছ থেকে ভগবান খিচুড়ী খেয়েছিলেন, ধন্না ভক্তের থেকে পরোটা খেয়েছিলেন, ভক্তিমতী মীরার হাত থেকে দুধ খেয়েছিলেন ইত্যাদি। এর বিশেষত্ব এই যে শ্রদ্ধা ও ভক্তিদ্বারা ভগবান মূর্তির মধ্যে জীবন্তরূপ পরিগ্রহ করেন।

প্রশ্ন—ভক্তেরা ভগবানকে যে ভোগ অর্পণ করেন, তা যে ভগবান গ্রহণ করেন তার প্রমাণ কি ?

উত্তর—ভগবানের রাজত্বে বস্তুর প্রাধান্য নেই, আছে ভাবের প্রাধান্য। ভাবের জন্যই ভগবান ভক্ত-অর্পিত বস্তু এবং পূজাদি ক্রিয়াকর্ম স্বীকার করেন। ভক্তের যদি ভাব হয় ভগবানকে খাওয়াবার তখন ভগবানেরও খিদে পায় এবং তিনি প্রকট হয়ে ভোজন করেন। ভক্তের ভাবে বা ভালোবাসাতে ভগবান যে বস্তু গ্রহণ করেন, সে বস্তু আর বিনষ্ট হয় না। তা দিব্য বা চিন্ময় হয়ে যায়। যদি এইরূপ ভাব না-ও হয়, কিছু কম হয়, তাহলেও ভক্ত ভোগ অর্পণ করলেই ভগবান সন্তুষ্ট হন। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বস্তু বা ক্রিয়ার প্রাধান্য নেই, শুধু ভাবেরই প্রাধান্য। সাধুরা বলেন—

ভাব ভগত কী রাবড়ী, মীঠী লাগে 'বীর'।
বিনা ভাব 'কালূ' কহে, কড়বী লাগে খীর॥

আমার সঙ্গে এক ব্যক্তির দেখা হয়েছিল। তাঁর একজন সাধুর উপরে খুব শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি সাধুর খুব যত্ন করতেন। তিনি বলতেন, 'সাধুর যখনই পিপাসা লাগত আমার মনে হতো যে তাঁর পিপাসা পেয়েছে, অতএব আমি জল নিয়ে যেতাম এবং তিনি জল পান করতেন।' সেইরূপ যাঁরা পতিব্রতা রমণী, তাঁরাও স্বামীর ক্ষুধা-তৃষ্ণার খবর ঠিক মতো বুঝতে পারেন এবং স্বামী কি খেতে ভালোবাসেন তাও তাঁরা বুঝতে পারেন। স্বামীকে খেতে দিলে তিনিও বলে ওঠেন, 'আজ আমার এইটাই খাবার ইচ্ছা হয়েছিল।' এইভাবেই যাঁর মনে ভগবানকে ভোগ দেবার আন্তরিক বাসনা হয় তাঁর স্বতঃই ভগবানের রুচি এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণার বিষয়ে ধারণা হয়ে যায়।

এক মন্দিরে একজন পূজারী ছিলেন। তাঁর ইষ্ট ছিলেন গোপাল। তিনি রোজ ছোট লাড্ডু বানাতেন এবং রাত্রে যখন গোপালকে শয়ন করাতেন, মাথার কাছে লাড্ডু রেখে দিতেন। কারণ বালকের রাত্রে ক্ষুধা পেয়ে যায়। একদিন পূজারী লাড্ডু রাখতে ভুলে যান, তখন গোপাল পূজারীকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং বলেন তাঁর খিদে পেয়েছে। এইরূপ আর একটি ঘটনা আছে। এক সাধু ছিলেন। ইনি প্রতিবছর দেওয়ালীর পর ঠাণ্ডার সময় ভগবানকে কাজু, বাদাম, পেস্তা, আখরোট ইত্যাদি ভোগ দিতেন। পরে কাজু, বাদাম ইত্যাদির দাম খুব বেড়ে যাওয়ায় তিনি চীনা বাদাম দিয়ে ভোগ দিতে শুরু করলেন। একদিন রাত্রে ভগবান স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, তুই আমাকে শুধু চীনা বাদামই খাওয়াবি ?' সেইদিনের পর থেকে পুনরায় ভগবানকে কাজু ইত্যাদি দিয়ে ভোগ দিতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে তাঁর মনে কিছু দ্বিধা ছিল যে, 'কি জানি ভগবান ভোগ গ্রহণ করেন কিনা ?' যখন ভগবান স্বপ্নে এইভাবে বললেন তখন তাঁর দ্বিধা দূর হল। এর তাৎপর্য এই যে কেউ ভগবানকে আদর করে ভোগ দিলে তাঁরও ক্ষুধা পায় এবং

[১]অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃস্মৃতঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪৭)

তিনি তা গ্রহণ করেন।

এক সাধু ছিলেন তাঁর আহার অত্যন্ত বেশী ছিল। একবার তাঁর দেহ রোগগ্রস্ত হয়। কোন এক ব্যক্তি তাঁকে পরামর্শ দেয় যে, 'মহারাজ, আপনি গরুর দুধ খান এবং বাছুরটি দুধ খাওয়ার পর যেটুকু বাঁচবে মাত্র সেইটুকুই খাবেন।' তিনি সেই মত করতে লাগলেন। গো-বৎস পেট ভরে মায়ের দুধ খাওয়ার পর তিনি গরুর দুধ দোহাতেন, তাতে মাত্র একপো বা দেড়পো দুধ পেতেন, কিন্তু তাতেই তাঁর পেট ভরে যেত। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর অসুখ সেরে গেল এবং তিনি সুস্থ হলেন। যদি ন্যায়সঙ্গত বস্তুতে এতো শক্তি থাকে যে অল্পমাত্রায় গ্রহণ করলেও তৃপ্তি হয় এবং অসুখ সেরে যায় তাহলে যে বস্তু ভাবপূর্বক দেওয়া হয় তার সম্বন্ধে কিছু আর বলার অপেক্ষা থাকে না।

সকলেই অনুভব করে থাকেন যে কেউ যদি ভাব দ্বারা বা অনুরাগ সহকারে ভোজন করায় তাহলে সেই আহারে সুস্বাদ পাওয়া যায় এবং সেই আহার দ্বারা বৃত্তিসকলও ভালো থাকে। শুধু মানুষের ওপর নয়, পশুদের ওপরও এর প্রভাব পড়ে। যে গোবৎসের মা-গাভীটি মারা যায়, লোকে তাকে অন্য গাভীর দুধ খাওয়ায়, অতে সেই বাছুরটি বেঁচে যায় ঠিকই কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট হয় না। কিন্তু যদি সেই গোবৎসটি তার নিজের মায়ের দুধ খেত তাহলে অল্প খেলেও সে হৃষ্টপুষ্ট হতো, কেননা তার মা তাকে দুধ খাওয়াবার সময় আদর করত, গা চেটে দিত, সেই ভালোবাসাতেই সে পুষ্ট হোত। যদি মানুষ বা পশুর ওপরে ভাবের প্রভাব পড়ে তাহলে অন্তর্যামী ভগবানের ওপরেও যে ভাবের প্রভাব পড়বে তাতে আর বলার কি আছে? বিদুরের স্ত্রীর এইরূপ ভাব ছিল বলেই ভগবান তাঁর হাত থেকে কলার খোসা পর্যন্ত খেয়েছিলেন। গোপিনীদের এইভাব ছিল বলেই ভগবান তাঁদের হাত থেকে কেড়ে দই, মাখন খেয়েছিলেন। শ্রীব্রহ্মাকে ভগবান বলছেন—

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং চক্ষুষা গৃহ্যতে ময়া।
রসং চ দাসজিহ্বায়ামশ্নামি কমলোদ্ভব॥

'হে কমলোদ্ভব! আমার সামনে অর্পিত ভোগসমূহ আমি নেত্র দ্বারা গ্রহণ করি; কিন্তু তার স্বাদ আমি ভক্তদের জিহ্বাদ্বারাই গ্রহণ করি।'

একথা সাধুদের কাছে শুনেছি যে, ভাবদ্বারা অর্পিত ভোগদ্রব্য ভগবান কখনও দৃষ্টি দ্বারা, কখনও স্পর্শ দ্বারা আবার কখনও স্বয়ং কিছুটা গ্রহণও করেন।

হামাগুড়ি দেওয়া শিশু কোন বস্তু নিয়ে তার বাবাকে দিলে যেমন তিনি খুব খুশী হন এবং অনেক উঁচুতে হাত দেখিয়ে বলেন, 'বাছা, তুই এতবড় হ, অর্থাৎ, আমার থেকেও বড় হয়ে ওঠ।' কেন, বস্তুটি কি অলভ্য ছিল যে শিশুটি সেটি দেওয়ায় তার বাবা বিশেষ কিছু পেলেন? না, তা নয়! কেবল শিশুর দেবার ভাবটি দেখে বাবা প্রসন্ন হলেন। এইরূপ ভগবানেরও কোন জিনিসের অভাব নেই, অথবা তাঁর কোন কিছু প্রাপ্তিরও ইচ্ছা নেই, কেবল ভক্তের দেবার ভাবটির জন্যই তিনি প্রসন্ন হন। কিন্তু যারা লোক দেখানোর জন্য বা লোক ঠকানোর জন্য মন্দির সাজায়, ভগবানের বিগ্রহ সাজায়, ভাল ভাল জিনিস দিয়ে ভোগ অর্পণ করে, তাদের নৈবেদ্য ভগবান গ্রহণ করেন না। কেননা তা ভগবানের প্রকৃত পূজা নয়, সেটি আসলে ব্যক্তিগত স্বার্থের ও অর্থেরই পূজা।

যেভাবেই সম্ভব হোক না কেন, যাঁরা ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেন এবং তাঁর পূজা-অর্চনা করেন, এইরকম ব্যক্তিকে যারা পাষণ্ড বলে এবং অহংকারবশতঃ ভাবে, 'আমি ওদের চেয়ে ভাল, আমি পাষণ্ড নই' তাদের কখনো কল্যাণ হয় না। যে সব ব্যক্তি যে ভাবেই হোক কোন উত্তম কর্ম করেন, তাঁদের কাজের সেই অংশ তো ভাল হয়ই, তাঁদের ব্যবহার, চলাফেরার মধ্যেও ভালত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু যারা অহংকারবশতঃ উত্তম ব্যবহার পরিত্যাগ করে, পরিণামে তাদের অকল্যাণই হয়।

প্রশ্ন—অসৎ ব্যক্তিগণ যখন মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে তখন ভগবান নিজের প্রভাব ও অলৌকিকত্ব কেন প্রদর্শন করেন না?

উত্তর—মূর্তির উপর যার কোন ভালবাসা নেই, যার মূর্তিপূজক ব্যক্তিদের ওপর হিংসাভাব থাকে, সেই হিংসাভাব নিয়ে যারা মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে তাদের জন্য ভগবান তাঁর প্রভাব এবং মহিমা কেনই বা প্রকাশিত করবেন? ভগবানের মহত্ত্ব শ্রদ্ধাভাবের ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হয়।

যাঁরা মূর্তিপূজা করেন তাঁদের 'মূর্তিতে ভগবান আছেন', এই বিশ্বাস পূর্ণভাবে না থাকার জন্যই অধার্মিক ব্যক্তি মূর্তি ভাঙ্গতে চায় এবং ভগবানও তাঁর মহিমা

তাদের কাছে প্রকাশ করেন না। আবার যে সব ভক্তের 'মূর্তিতে ভগবান আছেন' এরূপ দৃঢ়শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে, সেখানে ভগবান নিজ মহিমা প্রকাশ করেন। যেমন, গুজরাটে সুরাটের কাছে এক শিবের মন্দির আছে। তাতে যে শিবলিঙ্গ আছে, তাঁর গাত্রে অসংখ্য ছিদ্র। তার কারণ যখন মুসলমানেরা সেই শিবলিঙ্গটি ভাঙ্গতে এসেছিল তখন সেই লিঙ্গ থেকে অসংখ্য বড় বড় ভ্রমর বেরিয়েছিল এবং দুর্বৃত্তদের তাড়িয়ে দিয়েছিল।

যে ছাত্র পরীক্ষায় পাস করতে চায়, সে-ই পরীক্ষককে সম্ভ্রম জানায়, তাঁর আজ্ঞাবহ হয় ; কারণ পরীক্ষক যদি উত্তীর্ণ করান তবে সে উত্তীর্ণ হবে আর ফেল করালে অনুত্তীর্ণ থেকে যেতে হবে। কিন্তু ভগবানের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দরকার হয় না, কারণ তাতে তাঁর মহত্ত্ব কিছু বাড়বে না। আবার উত্তীর্ণ না হলেও তাঁর মহত্ত্ব কিছু মাত্র কমবে না। রাবণ যখন ভগবান রামের পরীক্ষা নেবার জন্য মায়াবী মারীচকে স্বর্ণমৃগ করে পাঠিয়েছিলেন এবং ভগবান রাম স্বর্ণমৃগের পিছনে দৌড়েছিলেন অর্থাৎ রাবণের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েছিলেন, দুষ্ট রাবণের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়ে ভগবানের কোন প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন ছিল কি ? সেইভাবেই অসৎ লোকেরা ভগবানের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মন্দির ভাঙ্গেন এবং ভগবান তাঁদের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন, তাঁদের সামনে নিজ প্রভাব প্রকাশিত করেন না, কারণ অসৎ লোকেরা অসৎভাব নিয়েই তাঁর সম্মুখীন হয়ে থাকে।

একটিকে বস্তুগুণ এবং অপরটিকে ভাবগুণ বলা হয়। এই দুটি গুণ পৃথক। যেমন স্ত্রী, মা এবং বোন — এদের তিনজনের শরীর একই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রীর শরীর যেমন, মায়েরও তেমন এবং বোনের শরীরও সেই একই রকম ভাবে গঠিত। অতএব এই তিনেতেই বস্তুগুণ অভিন্ন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে একভাব, মায়ের সঙ্গে আরেক ভাব এবং বোনের সঙ্গে অন্যপ্রকার ভাব থাকে। সুতরাং বস্তুগুণ একপ্রকার হলেও ভাবগুণ পৃথক্ পৃথক্ হয়ে থাকে। জগতে বিভিন্ন স্বভাবের ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদি আছে, অতএব তাদের বস্তুগুণ বিভিন্ন, কিন্তু সবার মধ্যেই ভগবান পূর্ণরূপে আছেন—এই ভাবগুণটি একই। এইরূপ মূর্তিতে যাঁর শ্রদ্ধা আছে, তাঁর মধ্যে 'মূর্তিতে ভগবান বিরাজ করেন,'—এই ভাবগুণ থাকে। মূর্তিতে যাঁর শ্রদ্ধা নেই, তিনি 'মূর্তি পাথর, পিতল, রূপো ইত্যাদির তৈরী'—এই বস্তু-গুণসম্পন্ন হন। এর বিশেষত্ব এই যে, পূজকের যদি মূর্তিতে ভগবৎভাব থাকে তাহলে তাঁর কাছে মূর্তি সাক্ষাৎ ভগবানই। যদি পূজকের ভাব এই হয় যে, মূর্তি পিতলের, পাথরের বা রূপার তাহলে তার কাছে সেই মূর্তি কেবলমাত্র পাথর বা পিতল ইত্যাদির হয়েই প্রতিভাত হয়। কারণ ভগবান ভাবেই বিরাজিত—

> **ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন শিলায়াং ন মৃৎসু চ।**
> **ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ ভাবং সমাচরেৎ॥**
> (গরুড়পুরাণ, উত্তরখণ্ড ৩।১০)

দেবতা কাঠেও থাকেন না এবং পাথর বা মাটিতেও না, ভাবেই দেবতার বাস, সেইজন্য ভাবকেই প্রধানরূপে মানা উচিত।

এক বৈরাগী বাবাজী ছিলেন। তাঁর কাছে দুটি স্বর্ণের মূর্তি ছিল। একটি গণেশের অপরটি ইঁদুরের। দুটিই সম ওজনের ছিল। বাবাজী একবার রামেশ্বর যাওয়া স্থির করলেন। সেইজন্য তিনি এক স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভাই! এই মূর্তি দুটির বদলে কত টাকা দেবে ?' স্বর্ণকার সে দুটি ওজন করে দুটিরই পাঁচশত টাকা করে দাম, অর্থাৎ দুটিই সমমূল্যের বলে জানালেন। বাবাজী বললেন, 'আরে! তুমি দেখতে পাচ্ছ না, একজন প্রভু, অপর জন তাঁর বাহন ? যা দাম গণেশের সেই একই দাম ইঁদুরের ? তা কেমন করে হয় ?' স্বর্ণকার উত্তর দিলেন, 'বাবা, আমি গণেশজী আর তাঁর ইঁদুরের দাম বলিনি, আমি তো সোনার দাম বলেছি।' এর বিশেষত্ব হল যে বাবাজীর দৃষ্টি ছিল গণেশ এবং ইঁদুরের ওপর আর স্বর্ণকারের দৃষ্টি ছিল সোনার ওপর অর্থাৎ বাবাজী ভাবগুণ দেখেছেন, আর স্বর্ণকার বস্তুগুণ বিচার করেছেন। তেমনি যারা মূর্তি ভাঙ্গে তারা বস্তুগুণ দেখে অর্থাৎ সেটি পাথরের না পিতলের এরূপই বিচার করে। ভগবানও তাদের ধারণা অনুযায়ী পাথর ইত্যাদি রূপেই অবস্থান করেন।

বাস্তবে দেখতে গেলে স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি ভগবৎস্বরূপই। যাঁর মধ্যে ভাবগুণ অর্থাৎ ভগবানের ভাবনা আছে তিনি সব কিছুই ভগবৎস্বরূপ দেখতে পান। কিন্তু যাঁর মধ্যে বস্তুগুণ অর্থাৎ জড়বস্তুর ভাবনা-চিন্তা থাকে, তিনি স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি সবকিছুকে পৃথক্ পৃথক্

ভাবে দেখেন। এই কথাই মূর্তির বিষয়েও বুঝে নিতে হবে।

মানুষ শ্রদ্ধা-ভাব রেখে মূর্তির পূজা করে, স্তুতি ও প্রার্থনা করে। কারণ সে মূর্তির মধ্যে বিশেষ ভাব দেখতে পায়। যে ব্যক্তি মূর্তি ভাঙ্গে, সেও মূর্তির মধ্যে তারই মতো বিশেষরূপ অবলোকন করে। যদি তা না দেখবে, তবে সে মূর্তিগুলি ভাঙ্গবেই বা কেন ? অন্য পাথর ইত্যাদি ভাঙ্গে না কেন ? সুতরাং সেই ব্যক্তিও মূর্তিতে বিশেষরূপ আছে বলেই মানে। শুধু মূর্তিতে যাঁরা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখেন তাঁদের ওপর ঈর্ষ্যাবশতঃ, তাঁদের দুঃখ দেবার জন্য তারা মূর্তি ভাঙ্গে।

যে সব ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি অনুসারে নির্মিত মন্দির এবং সেখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে স্থাপিত মূর্তিগুলি ভগ্ন করে তারা নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করার জন্য, পূজকদের মর্যাদা নষ্ট করার জন্য, নিজ অহংকার ও নাম স্মরণীয় করার জন্য এবং ভগ্নমূর্তি দর্শনে বহু প্রজন্ম পর্যন্ত হিন্দুদের যন্ত্রণায় দগ্ধ করার জনাই হিংসাবশে তা করে। পরিণামে তারা ঘোর নরকে পতিত হয় ; কেননা তাদের নীতিই হচ্ছে অন্যকে দুঃখ দেওয়া, অন্যকে নাশ করা। খারাপ উদ্দেশ্যের ফলও খারাপই হয়। আবার যে সব ব্যক্তি মন্দির এবং মূর্তিগুলি রক্ষা করার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন, নিজেদের প্রাণ সমর্পণ করেন— তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ হওয়ায় তাঁরা সদ্‌গতি প্রাপ্ত হন।

আমরা যখন কোন বিদ্বান ব্যক্তিকে সম্মান জানাই, তাতে আমরা তাঁর বিদ্যাকেই সম্মান জানালাম, হাড়মাংসের শরীরটিকে নয়। এইরূপই যে ব্যক্তি মূর্তিতে ভগবানকে মানেন, তাঁরা আসলে ভগবানকেই সম্মান জানিয়ে থাকেন, মূর্তিকে নয়। সুতরাং যাঁরা ভগবানকে মানেন না, তাঁদের নিকট ভগবানের মহিমা প্রকটিত হতে পারে না। অপরপক্ষে যাঁরা মূর্তিতে ভগবান মানেন, তাঁদের নিকট ভগবানের মহিমা প্রকটিত হয়।

প্রশ্ন—আমরা মূর্তিপূজা কেন করব ? মূর্তিপূজার আবশ্যকতা কি ?

উত্তর—নিজের ঈশ্বরানুরাগ বাড়াবার জন্য, তা জাগ্রত করার জন্য এবং ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য মূর্তিপূজা করা উচিত। আমাদের অন্তঃকরণে সংসারের যে বিশেষ রূপ অঙ্কিত আছে, যে মমতা-আসক্তি ইত্যাদি আছে, তা দূর করার জন্য ঠাকুরের পূজা করা উচিত। ফুলমালা দিয়ে সাজানো, সুন্দর বস্ত্রাদি পরানো, আরতি করা, নৈবেদ্য নিবেদন করা ইত্যাদির খুবই প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ মূর্তিপূজার দ্বারা আমাদের দুই প্রকার লাভ হয়—ভগবদ্‌ভাব জাগ্রত হয় তথা বৃদ্ধি পায় এবং সাংসারিক বস্তুর প্রতি মমতা ও আসক্তি দূর হয়।

মানুষের জীবনে অন্ততঃ এমন একটি আশ্রয় থাকা প্রয়োজন যার জন্য সে নিজের সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। সেই স্থান হতে পারে ভগবান বা কোন সাধু-মহাত্মা বা হতে পারে মাতা-পিতা বা আচার্য-শিক্ষক। এর ফলে মানুষের পার্থিব চিন্তা কমে যায় এবং ধার্মিক তথা আধ্যাত্মিক ভাবনা বাড়ে।

একবার কয়েকজন তীর্থযাত্রী কাশী পরিক্রমা করেছিলেন। সেখানকার এক পাণ্ডা যাত্রীদের মন্দিরের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছিলেন, শিবলিঙ্গকে প্রণাম করাচ্ছিলেন এবং পূজাআচ্চা করাচ্ছিলেন। সেই যাত্রীদের মধ্যে কিছু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ছোক্‌রা ছিল। তাদের স্থানে স্থানে প্রণাম ইত্যাদি করা পছন্দ হচ্ছিল না। সেইজন্য তারা পাণ্ডাকে বলল, 'পাণ্ডাজী, স্থানে স্থানে মাথা ঠুকে কি লাভ ?' সেখানে এক সাধু দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি তাদের বললেন, 'ভাই, যেমন এই হাড়-মাংসের মধ্যে তোমরা আছ, এই মূর্তির মধ্যে তেমনি ভগবান আছেন। তোমাদের বয়স তো অল্প, কিন্তু এই শিবলিঙ্গ বহু বছরের, সুতরাং বয়সের দৃষ্টিতে এই শিবলিঙ্গ তোমাদের থেকে বড়। শুদ্ধতার দৃষ্টিতে দেখলে হাড়-মাংস অশুদ্ধ কিন্তু পাথর শুদ্ধ। স্থায়িত্বের কথা ভাবলে হাড়ের থেকে পাথর অনেক বেশি মজবুত। যদি পরীক্ষা করতে চাও তো নিজের মাথা পাথরে ঠুকে দেখতে পারো তোমাদের মাথা ভাঙ্গে, না মূর্তি ! তোমাদের অনেক প্রকারের দুর্গুণ বা দুরাচার থাকতে পারে, মূর্তিতে কিন্তু কোন দুর্গুণ বা দুরাচার নেই। তাই যে ভাবেই দেখ না কেন মূর্তি সব প্রকারেই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং মূর্তি পূজনীয়। তোমরা তোমাদের নামের নিন্দাকে নিজের নিন্দা এবং নামের প্রশংসাকে নিজের প্রশংসা বলে মনে কর ; শরীরের অনাদরে নিজেদের অনাদর এবং শরীরের আদরে নিজেদের আদর বলে মনে কর। তাহলে মূর্তিতে ভগবানের পূজা, স্তুতি-প্রার্থনা ইত্যাদি করলে ভগবান কি সেই পূজা স্তুতি-

প্রার্থনাকে গ্রহণ করেন না ? আরে ভাই ! লোকে তোমার যে নাম ও রূপের সম্মান করে, তা তোমার স্বরূপ নয়, তবু তাতে তুমি খুশী হও। ভগবানের স্বরূপ তো সর্বব্যাপী, অতএব এই মূর্তিতেও তাঁর স্বরূপ বিরাজিত। কাজেই আমরা যদি এই মূর্তিকে পূজা করি, তবে কি তিনি প্রসন্ন হবেন না ? আমরা যত বেশী আন্তরিকতায় তাঁর পূজা করব, তিনি ততো বেশী প্রসন্ন হবেন।'

কোন আস্তিক ব্যক্তি যদি মূর্তিপূজায় অনিচ্ছুকও হন তবুও তাঁর দ্বারা প্রকারান্তরে মূর্তিপূজা হয়ই। কেমন করে ? তিনি যদি বেদাদি গ্রন্থ মানেন এবং সেই অনুযায়ী চলার প্রয়াস করেন, তাহলে প্রকারান্তরে তাঁর দ্বারা মূর্তিপূজাই হয়। কারণ বেদও (লিখিত পুস্তক হিসাবে) তো মূর্তিই। বেদ ইত্যাদি গ্রন্থকে সম্মান জানানোও একপ্রকার মূর্তিপূজা। এই রূপেই মানুষ গুরু, মাতা-পিতা-অতিথি প্রমুখের যে সম্মান করে ও সৎকার করে, অন্ন-জল-বস্ত্রাদি দ্বারা সেবা করে—এসবই মূর্তি পূজা। কারণ গুরু, মাতা-পিতা প্রমুখের দেহ জড় হলেও সেই দেহকে সম্মান জানালে তাঁদেরই সম্মান জানানো হয়। ফলে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। এর তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ যখন কাউকে কোনরূপে সম্মান বা সৎকার করে তা মূর্তি পূজারই নামান্তর হয়ে ওঠে। মানুষ যদি ভাবদ্বারা মূর্তিতে ভগবৎ পূজন করে তা হলে তাও ভগবানেরই পূজা হয়।

এক বৈরাগী বাবাজী ছিলেন। তিনি একটি বারান্দার তলায় থাকতেন ও সেইস্থানেই শালগ্রাম শিলার পূজা করতেন। যারা মূর্তিপূজা মানতো না তাদের বাবাজীর মূর্তিপূজাদির ক্রিয়াকলাপ পছন্দ হতো না। সেইসময় সেখানে হুক সাহেব নামে একজন ইংরেজ অফিসার এসেছিলেন। সেই অফিসারের কাছে অন্যান্য ব্যক্তিরা নালিশ করল যে, এই ব্যক্তি মূর্তিপূজা করে সর্বব্যাপী পরমাত্মার অপমান করছে ইত্যাদি ইত্যাদি। হুক সাহেব ক্রোধান্বিত হয়ে বাবাজীকে ডাকলেন এবং তাঁকে সেই স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। পরের দিন বাবাজী হুক সাহেবের এক মূর্তি তৈরী করে সারা শহর ঘুরতে লাগলেন। সবাইকে দেখিয়ে সেই মূর্তিতে জুতো মারতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন যে, হুক সাহেব একেবারে বেআক্কেল, এর কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই ইত্যাদি। লোকেরা তাই দেখে আবার হুক সাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ করল যে, বাবাজী তাঁকে গালি দিচ্ছেন এবং তাঁর মূর্তি তৈরী করে তাতে জুতো মারছেন। হুক সাহেব বাবাজীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমার অপমান করছ কেন ?' বাবাজী বললেন, 'আমি আপনার কোনরকম অপমান করিনি, আমি তো এই মূর্তির অপমান করছি, কেননা এ বড় মূর্খ।' এই বলে তিনি আবার মূর্তিতে জুতো মারলেন। হুক সাহেব বললেন, 'আমার মূর্তিকে অপমান করা মানেই আমার অপমান করা।' বাবাজী বললেন, 'আপনি এই মূর্তিতে অবস্থিত নন তবুও শুধুমাত্র উপলক্ষরূপে মূর্তির অপমান করলে তার প্রভাব আপনার উপর পড়েছে। আমার ভগবান সর্বত্র, সর্বকালে সর্ববস্তুতে বিরাজিত। সুতরাং কেউ যদি শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁর মূর্তিতে পূজা করে তাহলে ভগবান কি প্রসন্ন হন না ? আমি যদি মূর্তিতে ভগবানকে পূজা করি তবে তাতে তাঁর সম্মান করা হয়, না অসম্মান ?' হুক সাহেব বললেন, 'যাও, তুমি এখন থেকে স্বাধীনভাবে মূর্তিপূজা করতে পারো।' বাবাজী নিজ স্থানে গমন করলেন।

প্রশ্ন—কিছুলোক মন্দিরে অথবা মন্দিরের কাছে বসে মাংস, মদ ইত্যাদি নিষিদ্ধ জিনিস খায়, তবুও ভগবান তাদের বাধা দেন না কেন ?

উত্তর—মা-বাবার সামনে শিশুরা দুষ্টুমি করলে তো মা-বাবা তাদের দণ্ড দেন না ; কারণ তাঁরা বোঝেন, 'এরা আমাদেরই সন্তান, অবুঝ, সব কিছু জানে না।' এইরূপ ভগবানও বোঝেন যে, 'এরা আমারই অবুঝ সন্তান।' তাই ভগবানের দৃষ্টি তাদের আচার-ব্যবহারের দিকে যায়ই না। কিন্তু যারা মন্দিরে নিষিদ্ধ পদার্থ সেবন করে ও নিষিদ্ধ আচরণ করে, তাদের এই অন্যায়-কর্মের কর্মজনিত-ভোগ অবশ্যই ভুগতে হয়।

প্রশ্ন—পূর্বে কবীর প্রভৃতি কিছু সন্ত মূর্তিপূজা নিষেধ করেছিলেন কেন ?

উত্তর—যে সময়ে যেটি প্রয়োজন হয়, সাধু এবং মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হয়ে তখন সেইরূপ কার্য করেন। যেমন, পূর্বে যখন শৈব এবং বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে প্রচুর কলহ হোত, সেই সময় তুলসীদাসজী 'শ্রীরামচরিতমানস' রচনা করলেন, যার ফলে দুই পক্ষের ভক্তগণের কলহ দূরীভূত হল। গীতার ওপরও অনেক টীকা রচিত হয়েছে, কারণ যে সময় যেমন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে,

মহাপুরুষগণের হৃদয়ে তেমনি প্রেরণা জেগেছে এবং তাঁরা গীতার ওপর সেইরূপ টীকা রচনা করেছেন। যে সময়ে বৌদ্ধ মতের বাড়াবাড়ি, তখনই শঙ্করাচার্য আবির্ভূত হলেন এবং সনাতন ধর্ম প্রচার করলেন। এইরূপ যখন মুসলমানদের শাসন ছিল, তখন তারা মন্দির, দেবমূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করত। অতএব সেই সময় কবীর আদি মহাপুরুষগণ বলেছিলেন, 'আমাদের মন্দিরের বা মূর্তিপূজার কোন প্রয়োজন নেই ; কারণ পরমাত্মা কেবল মন্দির বা মূর্তিতে থাকেন না, তিনি সর্বস্থানে বিরাজিত রয়েছেন। আসলে ঐ সন্তগণের মূর্তিপূজা বন্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না ; তাঁরা যে কোনও ভাবে জনসাধারণের মনকে ফেরাতে চেয়েছিলেন পরমাত্মার দিকে।'

প্রশ্ন—এখন তো সময় বদলে গেছে, মুসলমানেরা মন্দির বা মূর্তি ভাঙ্গছে না, তবুও কেন সেই সম্প্রদায়ের অনুগামীরা মূর্তিপূজা বা সাকার ঈশ্বর-রূপের বিরোধিতা করেন ?

উত্তর—নিজ মতবাদের প্রচার প্রতিষ্ঠার আগ্রহ থাকার জন্যই অপরের মতকে খণ্ডন করা হয়ে থাকে। কারণ এখন যেসব ব্যক্তি মন্দির, মূর্তিপূজা বা অপরের মতবাদকে খণ্ডন করতে চায়, সেই বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিরা আসলে পরমাত্মতত্ত্বকে চায় না, নিজ উদ্ধার চায় না, তারা নিজেদের পূজা চায়, নিজেদের দল ভারী করতে চায়, নিজেদের সাম্প্রদায়ের প্রসার চায়। এইরূপ মতবাদীদের পরমাত্মপ্রাপ্তি ঘটে না। যারা নিজেদের মতেই শুধু আগ্রহী থাকে, তারা গোঁড়া হয় এবং তাদের কথা গ্রহণীয় হয় না—

বাতুল ভূত বিবস মতবারে।
তে নহিঁ বোলহিঁ বচন বিচারে॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।১১৫।৪)

এইরূপ 'মতবাদী' ব্যক্তি আসল তত্ত্ব জানতে পারে না—

হরীয়া রত্তা তত্ত্বকা, মতকা রত্তা নাঁহি।
মতকা রত্তা সে ফিরৈ, তাঁয় তত্ত্ব পায়া নাঁহি॥
হরীয়া তত্ত্ব বিচারিয়ে ক্যা মত সেতী কাম।
তত্ত্ব বসায়া অমরপুর, মতকা যমপুর ধাম॥

নিরাকার মার্গের সাধক যদি সাকারবাদীর মূর্তির অবজ্ঞা করেন তাহলে তিনি নিজ ইষ্টদেবকেই হেয় করেন। কারণ তাঁর নিজ ধারণা অনুযায়ী এটাই প্রমাণিত হয় যে, যেস্থানে সাকার দেবতা আছেন সে স্থানে নিরাকারের স্থান নেই, অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপী নন, পরিচ্ছিন্ন বা একস্থান নিবাসী। যদি তিনি মনে করেন যে সাকার মূর্তির মধ্যেও নিজ নিরাকার ইষ্ট আছেন, তাহলে তিনি সাকার দেবতাকে অবজ্ঞা কেন করবেন ? দ্বিতীয় কথা, নিরাকার উপাসনাকারীরা মনে করেন, 'পরমাত্মা সাকার নন, তাঁর অবতারও হয় না, মূর্তিও না', তাহলে তাঁদের সর্বসমর্থ পরমাত্মা অবতার দেহ ধারণ করতে, সাকার হতে অসমর্থ বা কমজোরী, অর্থাৎ তাঁদের পরমাত্মা তাহলে সর্বসমর্থ নন। বাস্তবে পরমাত্মা এরকম নন। পরমাত্মা সাকার- নিরাকার সবকিছুই— **'সদসচ্চাহম্'** (৯।১৯)। অতএব বিচার করতে হয় এই যে, আমরা নিজেদের কল্যাণ চাইব, না সাকার নিরাকার মতবাদ নিয়ে ঝগড়া করব ? যদি আমরা আমাদের পছন্দ অনুযায়ী সাকার বা নিরাকারের পূজা করি তাহলে তাতেই আমাদের কল্যাণ সাধিত হবে।

তেরে ভাবৈ জো করৌ, ভলৌ বুরৌ সংসার।
'নারায়ন' তু বৈঠিকে, আপনৌ ভুবন বুহার॥

যদি ঝগড়াই করতে হয় তো পৃথিবীতে ঝগড়া করার অনেক বিষয় আছে। ধন-সম্পত্তি, জমি, বাড়ী-ঘর ইত্যাদির জন্য লোকে তো ঝগড়া করেই থাকে, এই পারমার্থিক পথে এসে আবার ঝগড়া কিসের ? আমি সাকার বা নিরাকার উপাসনায় যদি রতই থাকি তবে অপরের মতবাদ খণ্ডন করার আমার সময় কোথায় ? অপরের মতবাদ খণ্ডন করতে যে সময় ব্যয় হয় সেই সময়টুকু যদি নিজ ইষ্টের উপাসনায় ব্যয় করি তবে আমার অনেক লাভ হবে।

অপরের মতবাদ খণ্ডন করার তাৎপর্য হল নিজের উপাস্যকে অবজ্ঞা করবার জন্য অপরকে আমন্ত্রণ করা। এর ফলে আমার লোকসানই হবে। আমি যখন অন্যের নিরাকার মতবাদ খণ্ডন করলাম তখন তো আমি নিজ সাকার ইষ্টকে অবজ্ঞা করার জন্যই তাকে নিমন্ত্রণ করলাম, তাকে সুযোগ দিলাম যে, 'এবার তুমি আমার সাকারবাদ খণ্ডন কর'। এই মতবাদ খণ্ডনের দ্বারা না আমার কিছু লাভ হয়, না অপরের। দ্বিতীয় কথা, অপরের

মতবাদ খণ্ডন করলে নিজের যে কিছুমাত্র কল্যাণ হয় একথাও কেউ লেখেনি। যাঁরা অপরের মতবাদ খণ্ডন করেছেন, তাঁরাও বলেননি যে অপরের মতবাদ খণ্ডন করলে তোমার ভালো হবে, কল্যাণ হবে। আমি যদি কারো মতবাদ বা উপাস্যকে খণ্ডন করি তাহলে আমার অন্তঃকরণ অপবিত্র হবে, খণ্ডনের চিন্তা-ভাবনা অনুসারে দ্বেষ সৃষ্টি হবে, যার ফলে আমার পূজা উপাসনাতে বাধার সৃষ্টি হবে এবং আমি ইষ্টের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ব। সুতরাং মানুষের কারো মতের বা ইষ্টভাবের খণ্ডন করা উচিত নয়, কাউকে অপমান, ভর্ৎসনা করা উচিত নয়, কারণ সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ভাব এবং শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনুযায়ী নিজ ইষ্টের উপাসনা করেন। পরমাত্মা সাধকের ভাব, অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাসেই সাড়া দেন। অতএব নিজের মতে, উপাস্য দেবতায় শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রেখে সেই মত অনুযায়ী তৎপরতার সঙ্গে সাধনায় লেগে যাওয়া কর্তব্য। এটিই হল পরমাত্মাকে লাভ করার উপায়। অপরের মত খণ্ডন করা বা অপমান করা পরমাত্ম-প্রাপ্তির পথ নয়, তা পতনেরই পথ।

যে সমস্ত মহাপুরুষ মূর্তি পূজার মতবাদ খণ্ডন করেছেন তাঁরা সেই স্থানে নাম-জপ, সৎসঙ্গ, গুরুবাণী, ভগবৎ-চিন্তন, ধ্যান ইত্যাদির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অতএব যাঁরা মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছেন অথচ নিজের মতানুসারে নাম-জপ ইত্যাদিতে তৎপরতার সঙ্গে সাধন শুরু করেন নি, তাঁরা দুই দিক থেকেই রিক্ত হয়ে থাকেন। তাঁদের থেকে মূর্তি পূজনকারী শ্রেষ্ঠ, কেননা তিনি নিজ মতানুযায়ী তাঁর সাধনায় লেগে রয়েছেন।

এর পরেও যদি কেউ বলে যে, 'অপর ব্যক্তির মতবাদ খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি নিজের উপাসনাকে দৃঢ় করছি, নিজের অনন্য ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করছি',— তবে এর উত্তর হচ্ছে যে, অপরের মতবাদ খণ্ডন করলে নিজের অনন্য ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় না। অনন্যভাব হচ্ছে এই যে, আমার ইষ্ট ছাড়া দ্বিতীয় কোন তত্ত্বই নেই। আমার প্রভু সগুণও এবং নির্গুণও। সবই আমার প্রভুর রূপ। অপরে প্রভুর যা খুশী নাম দিক না কেন তিনি আমারই প্রভু! আমার প্রভুকে অনেক রূপে বিভিন্নভাবে উপাসনা করা হয়। অতএব যিনি নির্গুণকে মানেন তিনি আমার সগুণ প্রভুর মহিমা বাড়ান ; কেননা আমার সগুণ প্রভুই ওদের কাছে নির্গুণ। তাই যাঁরা নির্গুণের উপাসনা করেন তাঁরা আমাদের সম্মাননীয় ব্যক্তি। এইরূপ করলেই অনন্যভাব হয়। কোন মতবাদ খণ্ডন করা অনন্যভাব তৈরীর সাধন নয়। যিনি শ্রদ্ধা বিশ্বাসপূর্বক, সহজ-সরল ভাবে নিজের ইষ্টের উপাসনায় মগ্ন থাকেন, তাঁর ইষ্টের, তাঁর উপাসনায় ব্যাঘাত করলে তাঁর হৃদয়ে আঘাত লাগে, তিনি দুঃখিত হলে ব্যাঘাতকারীর খুব অপরাধ হয় যার ফলে তার সাধনা সিদ্ধ হয় না।

অনন্যতার নামে অপরের মতবাদ খণ্ডন করা ভালোত্বের অজুহাতে মন্দ করা। খারাপ ভাবেই যদি খারাপ জিনিস আসে, তা হলে ভালো লোক তার থেকে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু ভালোত্বের ছদ্মবেশে যখন খারাপ আসে তখন তার থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন সীতার কাছে রাবণ ও হনুমানের কাছে কালনেমি সাধুর বেশে এসেছিল বলে সীতা এবং হনুমান দুজনেই প্রতারিত হয়েছিলেন। অর্জুন যুদ্ধরূপী ঘোর কর্মের অজুহাতে নিজের কর্তব্য ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন— 'দুর্যোধনেরা ধর্ম কি তা জানে না, ওদের লোভ গ্রাস করেছে। কিন্তু আমি জানি ধর্ম কি, আমার লোভ নেই, আমি অহিংসক' ইত্যাদি। এভাবে অর্জুনের মধ্যেও ভালোর অজুহাতে (অছিলায়) মন্দ এসে উপস্থিত হয়েছিল। সেই মন্দমতিকে দূর করার জন্য ভগবানকে যথেষ্ট প্রয়াস করতে হয়েছে, সুদীর্ঘ উপদেশ দিতে হয়েছে। যদি খারাপ রূপে অর্জুনের মধ্যে এই মন্দমতি আসত, তাহলে তা দূর করতে এত সময় লাগত না। এইরূপ একনিষ্ঠতার অজুহাতে যদি অপরের মতবাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব আসে আর আমরা আমাদের অমূল্য সময়, সামর্থ্য বুদ্ধি ইত্যাদি অপরের মতবাদ খণ্ডনে ব্যয় করি, তাহলে আমাদের পতনই হবে। অতএব সাধকের উচিত তিনি যেন সাবধানতার সঙ্গে নিজ সময়, যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদি নিজের ইষ্টের উপাসনায় নিবিষ্ট রাখেন।

প্রশ্ন—ভগবানের স্বয়ম্ভূ মূর্তি কিভাবে তৈরী হয় ?

উত্তর—স্বয়ম্ভূ মূর্তি যদি তৈরী হয় তবেই এই প্রশ্ন ওঠে। স্বয়ম্ভূ মূর্তি তৈরীই হয় না, তিনি স্বয়ং প্রকটিত হন। তাই তাঁর নাম স্বয়ম্ভু, নাহলে তিনি স্বয়ম্ভূ কি করে হলেন ?

প্রশ্ন—মূর্তি স্বয়ম্ভূ বা কারো দ্বারা তৈরী, তা কি করে চেনা যায় ?

উত্তর—সকলেই তা চিনতে পারেন না। যেমন কোন ব্যক্তি একটি মানুষকে একবার যদি দেখে, পরে আবার দেখা হলে চিনতে পারে। তেমনি যিনি ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন, তিনিই স্বয়ম্ভু মূর্তি চিনতে পারেন।

প্রশ্ন—স্বয়ম্ভু মূর্তি এবং তৈরি করা মূর্তির দর্শন, পূজা ইত্যাদির মহিমা কিরূপ ?

উত্তর—শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস যদি থাকে, তাহলে 'দর্ভে' ঋষিদের এবং 'সুপারীতে' গণেশের পূজা করলেও লাভ হয়। তেমনি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যদি হয় এবং ভগবদ্‌ভাব যদি থাকে তাহলে তৈরী করা মূর্তির পূজা, দর্শন প্রভৃতিতে লাভ হয়। তবে স্বয়ম্ভু মূর্তিতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হলে বিশেষ ও শীঘ্র লাভ হয়। যেমন, কোন সাধুর লিখিত পুস্তক পড়ার থেকে তাঁর মুখ থেকে সরাসরি শোনায় বেশী লাভ হয়। সঞ্জয়ও গীতাগ্রন্থের বিষয়ে বলেছিলেন যে, 'আমি সাক্ষাৎ ভগবানকে এটি বলতে শুনেছি।' (১৮।৭৫)।

প্রশ্ন—সংসারের সব কিছুর সঙ্গে যেমন সহজ সরল ভাবে এবং অনায়াসে সম্বন্ধ পাতানো যায়, ভগবানের সঙ্গে তেমন সম্বন্ধ হয় না, এর কারণ কি ?

উত্তর—এর কারণ এই যে মানুষ শরীরকেই 'আমি' বলে মনে করে। নিজেকে শরীর বলে মনে করায় সংসারের সঙ্গে সহজে সম্বন্ধ তৈরি হয়ে যায়। কারণ শরীর এবং সংসারের মধ্যে ঐক্য-ভাব আছে। যার সঙ্গে একত্ব বা সমজাতীয়ত্ব হয় তার সঙ্গে অনায়াসে সম্বন্ধ জোড়া যায়। যেমন যে নিজেকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বলে মনে করে, তার ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ইত্যাদির সঙ্গে এবং যে নিজেকে বিদ্বান বা ব্যবসায়ী ইত্যাদি বলে মনে করে তার বিদ্বান বা ব্যবসায়ী ইত্যাদির সঙ্গে সহজেই সম্বন্ধ হয়ে যায়—**'সমানশীলব্যসনেষু সখ্যম্'**। ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না এবং নিজেকে মূর্তি (শরীর) বলে জানে, কাজেই তার পক্ষে দেবমূর্তিতে ভগবানের ভাব আনাই সহজ। অতএব যতক্ষণ শরীরকে আমি বলে মনে করা যাবে ততক্ষণ মূর্তিতে ভগবানপূজা অবশ্যই করা উচিত। ভগবৎপ্রাপ্তি হওয়ার পরেও মূর্তিপূজা ত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা যে সাধনা দ্বারা মানুষ লাভবান হয় তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত, তা ত্যাগ করা উচিত নয়।

(৭) গীতায় ভগবন্নাম

কৃষ্ণেতি নামানি চ নিঃসরন্তি রাত্রিন্দিবং বৈ প্রতিরোমকূপাৎ।
যস্যার্জুনস্য প্রতি তং সুগীতগীতে ন নাম্নো মহিমা ভবেৎ কিম্॥

নাম এবং নামী অর্থাৎ ভগবন্নাম এবং ভগবান অভেদ ; অতএব দুটিকে স্মরণ করার একই মাহাত্ম্য। ভগবন্নাম তিন রূপে নেওয়া যায়—

(১) **মনের দ্বারা**—মনের দ্বারা নাম স্মরণ হয়, যার বর্ণনা ভগবান **'যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ'** (৮।১৪) পদদ্বারা করেছেন।

(২) **বাণীর দ্বারা**—বাণীর দ্বারা নামজপ হয়, যাকে ভগবান **'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি'** (১০।২৫) পদদ্বারা নিজের স্বরূপ বলেছেন।

(৩) **কণ্ঠদ্বারা**—কণ্ঠদ্বারা জোরে উচ্চারণ করে কীর্তন করা হয়, যার বর্ণনা ভগবান **'কীর্তয়ন্ত'** (৯।১৪) পদদ্বারা করেছেন।

গীতায় ভগবান ওঁ, তৎ এবং সৎ পরমাত্মার এই তিন নাম বলেছেন—**'ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ'** (১৭।২৩)। প্রণব বা ওঁকারকে ভগবান নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন—**'প্রণবঃ সর্ববেদেষু'** (৭।৮)। **'গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্'** (১০।২৫)। ভগবান বলেছেন, যে মানুষ ওঁ—এই এক অক্ষর প্রণব উচ্চারণ করে এবং আমাকে স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয় (৮।১৩)।

অর্জুনও ভগবানের বিরাট রূপের স্তুতি দ্বারা নামের মহিমা কীর্তন করেছেন, যেমন—'হে প্রভু ! অনেক

দেবতা ভীত বিহ্বল হয়ে হাত জোড় করে আপনার মহিমা কীর্তন করছেন (১১।২১)' ; 'হে অন্তর্যামী ভগবান ! আপনার নাম ইত্যাদির কীর্তন করায় এই সম্পূর্ণ জগৎ আনন্দে বিভোর হয়ে প্রেমানুরাগ প্রাপ্ত হচ্ছে। আপনার নামাদি কীর্তনে ভীত হয়ে রাক্ষসগণ দশদিকে ছুটে পালাচ্ছে এবং সিদ্ধগণ আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছে। এসবই অত্যন্ত উচিত কাজ (১১।৩৬)।'

জ্ঞাতব্য

সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রার সময়ে সকল ইন্দ্রিয় মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি অহং-এ এবং অহং অবিদ্যাতে লীন হয়ে যায়, অর্থাৎ সুষুপ্তিতে অহংভাবের আভাসও থাকে না। গভীর নিদ্রাভঙ্গে প্রথমে অহংভাবের আভাস হয়, পরে ক্রমশঃ দেশ, কাল, অবস্থা ইত্যাদির আভাস হয়। কিন্তু গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ব্যক্তির নাম ধরে ডাকলে সে জেগে ওঠে, অর্থাৎ অবিদ্যাতে লীন হওয়া গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ব্যক্তি পর্যন্ত শব্দ পৌঁছায়। তাৎপর্য এই যে শব্দে অচিন্তনীয় শক্তি আছে, তাই শব্দ অবিদ্যাকে ভেদ করে অহং পর্যন্ত পৌঁছায়। যেমন অনাদিকাল থেকে অবিদ্যায় আচ্ছাদিত জ্ঞানহীন ব্যক্তির মতো সংসারে মোহগ্রস্ত ব্যক্তির গুরুমুখে উপদেশ শ্রবণ করলে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে বোধ জাগ্রত হয়, অর্থাৎ অবিদ্যাসম্পন্ন মানুষকে শব্দদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান করানো যায়।[1] এইরূপ যে ব্যক্তি তৎপরতার সঙ্গে ভগবৎ-নাম জপ করে, ঐ নাম তাকে স্বরূপের বোধ করায় এবং ভগবানের দর্শন পাইয়ে দেয়।

তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত বাণীতে যে শব্দ (উপদেশ) নিঃসৃত হয়, শ্রদ্ধাসহকারে যদি তা কেউ শোনে তবে তার আচরণ, ভাব, সবকিছু শুধরে যায় এবং অজ্ঞান দূরীভূত হয়ে সে বোধসম্পন্ন হয়। কিন্তু যার বাণীতে অসত্য, কটুত্ব, বৃথা বাগাড়ম্বর, নিন্দা, পরচর্চা ইত্যাদি দোষ থাকে তার কথায় কারো উপর কোন প্রভাব পড়ে না ; কারণ তার এরূপ আচরণের ফলে শব্দের শক্তি সংকুচিত হয়, তাতে শক্তি থাকে না। এইভাবেই স্বয়ং বক্তার মধ্যেও ভ্রম, প্রমাদ, লিপ্সা এবং করণাপাটব—এই চারপ্রকার দোষ থাকে। বক্তা যে বিষয়টির বর্ণনা করছেন, তিনি যদি তা ঠিকমতো না জানেন অর্থাৎ কিছুটা জানেন আর কিছুটা জানেন না—তবে একে **'ভ্রম'** বলা হয়। যিনি উপদেশ দেবার সময় সতর্ক থাকেন না, বেপরোয়া হয়ে কথা বলেন, শ্রোতা কোন শ্রেণীর, তারা কতটা বোঝে এই সমস্ত তিনি উপেক্ষা করেন—একে বলা হয় **'প্রমাদ'**। যে কোন ভাবে (আমার) পূজা হোক, সম্মান হোক, শ্রোতারা প্রচুর টাকা পয়সা দিক, আমার স্বার্থ সিদ্ধ হোক, শ্রোতারা কোন প্রকারে অধীন হোক, সব পরিস্থিতি অনুকূল হোক, বক্তা যদি এই সব ইচ্ছা রাখেন,—তাকে বলে **'লিপ্সা'**। বক্তব্যের শৈলীতে কুশলতা নেই, বক্তা শ্রোতার ভাষা জানেন না, শ্রোতা কি ধরনের কথা বুঝতে পারবে অর্থাৎ কিভাবে বর্ণনা করলে শ্রোতারা বুঝতে পারবে তা জানে না, একে করণাপাটব বলা হয়। এই চার দোষ বক্তার মধ্যে থাকলে তাঁর কথায় শ্রোতার জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এই সকল দোষরহিত যে সকল শব্দ, তার দ্বারা শ্রোতার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। শ্রোতাও যদি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, জিজ্ঞাসা, তৎপরতা, সংযতেন্দ্রিয়তা ইত্যাদিতে যুক্ত হয় এবং পরমাত্মপ্রাপ্তি যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বক্তার কথায় তাঁর জ্ঞান হয়। এর তাৎপর্য এই যে, বক্তা অযোগ্য হলে শ্রোতার ওপর কোন প্রভাব পড়ে না এবং শ্রোতা অযোগ্য হলে তার ওপর বক্তার কোন প্রভাব পড়ে না। দুজনের যোগ্যতা থাকলে তাহলেই বক্তার কথার প্রভাব শ্রোতার ওপরে পড়ে। কিন্তু ভগবানের নামে এমনই শক্তি যে, মানুষ যেভাবেই তাঁর নামজপ করুক না কেন তার তাতে মঙ্গলই হয়।

ভাঁয় কুভাঁয় অনখ আলসহূঁ।
নাম জপত মঙ্গল দিসি দসহূঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।২৮।১)

ভগবানের নাম যদি অবহেলা, সঙ্কেত বা পরিহাস ইত্যাদির ছলেও করা হয়, তাহলেও তিনি পাপের নাশ করবেনই।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।১৪)

ভগবান নিজের নাম সম্বন্ধে বলেছেন, 'যে জীব শ্রদ্ধা বা অবহেলাতেও আমার নাম উচ্চারণ করে, তার নাম

[1] শব্দে এমন বিশেষ শক্তি আছে যে, যা ইন্দ্রিয়ের সামনে নেই, শব্দ সেই পরোক্ষ বিষয়েরও জ্ঞান করিয়ে দেয়।

সর্বদা আমার অন্তরে থাকে'—

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ততে হৃদয়ে মম॥

প্রশ্ন—গুড়ের কথা বললে মুখে তো মিষ্টিভাব আসে না, তবে ভগবানের নাম করে কি হবে ?

উত্তর—যে বস্তুর নাম গুড়, তার সেই নামে গুড় নামক বস্তুর অভাব আছে অর্থাৎ গুড়ের নামটির মধ্যে গুড় নেই। যতক্ষণ রসনেন্দ্রিয় বা জিভের সঙ্গে গুড়ের সম্বন্ধ না করা হচ্ছে ততক্ষণ মুখ মিষ্টতা লাভ করে না, কেননা জিভে গুড় নেই। ঠিক এইরকমই ধনীর নাম নিলে ধন প্রাপ্ত হয় না। কেননা ধনী নামটির মধ্যে ধনের কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ভগবানের নামটির সঙ্গে ভগবান সর্বদা হাজির। নামী (ভগবান) থেকে নাম আলাদা নন এবং নাম থেকে নামী (ভগবান) আলাদা নন। নামীতে নাম উপস্থিত এবং নামেও নামী হাজির। অতএব নামীর অর্থাৎ ভগবানের নাম নিলে ভগবানকে পাওয়া যায়, নামী স্বয়ং প্রকটিত হন।

প্রশ্ন—নামতো কেবলমাত্র শব্দ, তার দ্বারা কী কার্য সিদ্ধ হবে ?

উত্তর—সাধারণভাবেও শব্দমাত্রে অচিন্ত্য শক্তি আছে এবং নামে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ তৈরি করার এক বিশেষ ক্ষমতা আছে। অতএব যে কোন প্রকারেই নাম নেওয়া হোক না কেন, তার দ্বারা মঙ্গলই হয়। যে বিশেষ ভাবসহ নাম জপ করে তার খুব শীঘ্রই লাভ হয়।

সাদর সুমিরন জে নর করহীঁ।
ভব বারিধি গোপদ ইব তরহীঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।১১৯।২)

নামজপের সময় যদি ভাব কম হয় তাহলেও নাম জপে লাভ হয়, তবে কতদিন পর হবে— তা বলা যায় না। নামজপের সংখ্যা বেশী বাড়িয়ে দিলে ভাব তৈরী হয় ; কেননা যাঁরা নাম জপ করেন, তাঁদের অন্তরে সূক্ষ্ম ভাব থাকেই, নামের সংখ্যা বাড়ালে সেই ভাব প্রকটিত হয়।

নামজপ কোন নিছক ক্রিয়া নয়। এটি এক প্রকারের উপাসনা ; কারণ নামজপে জপকারীর লক্ষ্য এবং সম্বন্ধ ভগবানের দিকেই থাকে। যেমন কর্মদ্বারা কল্যাণ হয় না, কর্ম নিজের ফল দান করে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কর্মের সঙ্গে মুখ্যভাবে যদি নিষ্কামভাব থাকে তাহলে সেই কর্ম কল্যাণকারী হয়ে ওঠে। তেমনি নামজপ যদি মুখ্যভাবে ভগবানকে লক্ষ্য রেখে করা হয়, তা হলে নামজপের দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়ে যায়। ভগবানকেই মুখ্যরূপে লক্ষ্য করলে নাম চিন্ময় হয়ে ওঠে এবং তা ক্রিয়ারূপে থাকে না। শুধু তাই নয়, সেই চিন্ময়তা জপকারীতেও নেমে আসে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি জপ করেন তাঁর শরীরও চিন্ময় হয়ে যায়, তাঁর শরীরের জড়ত্ব নষ্ট হয়। যেমন, সন্ত তুকারাম সশরীরে ঈশ্বরধামে গমন করেছিলেন, ভক্তিমতী মীরার দেহ ভগবানের বিগ্রহে মিশে গিয়েছিল, কবীরের দেহ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল এবং সেই স্থানে ফুল পাওয়া গিয়েছিল। চোখামেলার অস্থিতে 'বিঠ্‌ঠল' নামের ধ্বনি শোনা যেত।

প্রশ্ন—শাস্ত্র এবং সাধুসন্তগণ ভগবৎনামের যে মহিমা গান করেছেন, তা কতদূর সত্য ?

উত্তর—শাস্ত্র এবং সাধুসন্তগণ ভগবৎনামের যে মহিমা গান করেছেন, তা পুরোপুরি সত্য। শুধু তাই নয়, আজ পর্যন্ত যত নাম-মহিমা গীত হয়েছে তাতেও তাঁর নামমহিমা পুরোপুরি কীর্তন করা হয়নি। এখনো অনেক নামমহিমা বাকী আছে। কারণ ভগবান অনন্ত, তাই তাঁর নাম-মহিমাও অনন্ত—**'হরি অনন্ত হরিকথা অনন্তা'** (শ্রীরামচরিতমানস ১।১৪০।৩)। নামের পুরো মহিমা স্বয়ং ভগবানও বলতে সক্ষম নন—**'রামু ন সকহিঁ নাম গুন গাঈ'** (১।২৬।৪)।

প্রশ্ন—নামের যে মহিমা গীত হয়েছে, যে সমস্ত ব্যক্তি নাম জপ করেন তা তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না, এর কারণ কি ?

উত্তর—নামের মাহাত্ম্যকে স্বীকার না করলে নামকে অবহেলা বা অপমান করা হয়, তাই সেই নাম তত প্রভাব ফেলে না। মন দিয়ে নামজপ না করা, ইষ্টের প্রতি ধ্যান সহকারে নাম জপ না করা এবং হৃদয় থেকে নামকে মাহাত্ম্য না দেওয়া ইত্যাদি দোষ ঘটলে নামের মাহাত্ম্য শীঘ্র দেখা যায় না। হ্যাঁ, কোনভাবে মুখে নাম-জপ করতে থাকলে তাতেও লাভ হয়, তবে এতে সময় লাগে। মন লাগুক না লাগুক নিরন্তর নামজপ করলে, কখনো বাদ না দিলে নাম মহারাজের কৃপায় সব কাজ হয়ে যায় অর্থাৎ মন লাগতে থাকে, নামের ওপর শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়।

যদি ভগবৎনামে অনন্য ভক্তি থাকে এবং নিরন্তর

নামজপ হতে থাকে, তবে সত্যিই তাতে লাভ হয় ; কারণ, ভগবৎনাম জাগতিক নামের মতো নয়। ভগবান চিন্ময় ; তাঁর নামও তাই চিন্ময় বা চেতন। রাজস্থানে বুধারাম নামে একজন সাধু ছিলেন। তিনি তৎপরতার সঙ্গে নামজপ শুরু করলেন। ক্রমে এমন হল যে স্বল্প সময়ের জন্যও নামজপ বাদ পড়লে তাঁর অসহ্য মনে হতো। খাবার তৈরী হয়ে গেলে মা খেতে ডাকতেন, তিনি খেয়ে এসে আবার নামজপ করতে লেগে যেতেন। একদিন তিনি মাকে বললেন, 'মা, রুটি খেতে অনেক সময় লাগে, তুমি কেবল দালিয়া (গমের খিচুড়ি) করে থালায় পরিবেশন করবে, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আমাকে খেতে ডাকবে।' মা তখন সেইমত ব্যবস্থা করলেন। আবার কিছুদিন পর বুধারাম বললেন, 'মা খিচুড়ি খেতেও সময় লাগে, এবার থেকে রাব্ (আটা এবং জলের মিশ্রণ বিশেষ) কোরো আর ঠাণ্ডা হলে তখন খেতে ডেকো।' এইভাবে নামজপ করতে থাকলে তবেই বাস্তবিক লাভ হয়।

প্রশ্ন—শ্রদ্ধা-বিশ্বাস পূর্বক নামজপ করলেই যদি লাভ হয়, তাহলে আবার নামের কি মহিমা ? তাতে তো শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসেরই মহিমা হয় ?

উত্তর—যেমন রাজাকে রাজা বলে না মানলে রাজা-দ্বারা যে লাভ হবার সেটি হয় না, পণ্ডিতকে পণ্ডিত বলে স্বীকার না করলে তাঁর কাছে যে লাভ হবার কথা সেই লাভ পাওয়া যায় না, তেমনি সাধু ও মহাত্মাদেরও সাধু ও মহাত্মারূপে না মানলে তাঁদের কাছ থেকে যে উপকার হবার তা হয় না। ভগবান অবতার রূপে আত্মপ্রকাশ করলে তাঁকে ভগবান বলে না মানলে তাঁর কাছ থেকে যে লাভ পাবার থাকে তা হয় না। কিন্তু রাজা প্রভৃতির কাছ থেকে লাভ পাওয়া না গেলেও তাতে তাঁদের কিছু কি ক্ষতি হয় ? ক্ষতি হয় তাদেরই যারা না মানে। তেমনি যারা নামে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করে না তারা নামজপ থেকে যে লাভ হওয়ার তা পায় না। কিন্তু তাতে নামের মহিমা কিছু মাত্র কমে না। ক্ষতি তাদেরই হয় যারা নামে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করে না।

নামে অনন্ত শক্তি। শ্রদ্ধা-বিশ্বাসে নামের শক্তি বাড়ে এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাস না থাকলে কমে—একথা ঠিক নয়। তবে যাঁদের নামে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে তাঁরা নামের দ্বারা লাভবান হন এবং যাঁদের তা থাকে না তাঁদের লাভ হয় না। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা নামে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করেন না, তাঁদের নামাপরাধ হয়।

প্রশ্ন—শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ছাড়াও আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, তা হলে বিনা শ্রদ্ধা-বিশ্বাসে নাম করলে তৎক্ষণাৎ তার মহিমা প্রকটিত হয় না কেন ?

উত্তর—অগ্নি ভৌতিক বস্তু, তা শুধু ভৌতিক বস্তুকেই পোড়ায়। কিন্তু ভগবানের নাম অলৌকিক, দিব্য। নামজপকারী ব্যক্তির নামের দ্বারা যেমন ভাব বাড়তে থাকে, তেমনি নামের মহিমা তার কাছে প্রকটিত হতে থাকে, নাম-মহিমার অনুভূতি হতে থাকে এবং নামের মধ্যে বিচিত্র, অলৌকিক অনেক কিছু দেখতে থাকে। নামে এমন এক বিচিত্র ভাব আছে যে মানুষ বিনা ভাবে বা শ্রদ্ধায় যদি সব সময় নাম করতে থাকে, তাহলেও তার সামনে নামের শক্তি প্রকটিত হয়ে পড়বে, তবে তাতে কিছু সময় লাগতে পারে।

প্রশ্ন—একবার নাম করলেই কি সব পাপ নষ্ট হয়ে যায় ?

উত্তর—হ্যাঁ, আর্তভাবে যদি একবার নাম করা যায় তাহলে সব পাপ নষ্ট হয়ে যায়। অন্তিম সময়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষাকারী কাউকে সামনে দেখতে পাওয়া যায় না, সব দিক থেকেই নিরাশ হতে হয় ; সেই সময় আর্তভাবে একবার যদি মুখ থেকে ভগবানের নাম উচ্চারিত হয়, তাহলে সেই একবার করা নামই সমস্ত পাপরাশিকে নষ্ট করে দেয়। যেমন গজেন্দ্রকে কুমীর টেনে জলে নিয়ে যাচ্ছিল, গজেন্দ্র দেখল, 'এখন আমাকে রক্ষা করার কেউ নেই। সাক্ষাৎ মৃত্যু হাজির হয়েছে, তখন সে আর্তভাবে একবার তাঁর নাম স্মরণ করল। নাম স্মরণ করামাত্র ভগবান এলেন এবং কুমীরকে মেরে গজেন্দ্রকে রক্ষা করলেন।'

ভগবানের নামে যাঁর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এবং অনন্যভাব আছে, তিনি একবার নাম করলেই কল্যাণ হয়।

প্রশ্ন—যদি একবার নাম করলেই সব পাপ দূরীভূত হয়, তাহলে বার বার নাম নেওয়ার কি প্রয়োজন ?

উত্তর—বার বার নাম নিতে নিতেই সেই আর্তভাব আসে। মোটরের ইঞ্জিনকে চালু করতে গেলে যেমন বার বার হাতল ঘোরাতে হয়। হাতল ঘোরানোয় ইঞ্জিন

প্রথমবারেই চালু হবে, না আরও পাঁচ-দশ বার হ্যাণ্ডল ঘোরাতে হবে তা বলা যায় না ; কিন্তু হ্যাণ্ডল ঘোরাতে ঘোরাতে কোন একবার ইঞ্জিন চালু হয়ে যায়। তেমনি বার বার ভগবানের নাম নিতে নিতে কোন না কোন সময় সেই বিশেষ আর্তভাব এসে যায়। তাই বার বার নাম করা খুবই প্রয়োজন।

প্রশ্ন—যে সমস্ত মানুষ নাম জপ করেন এবং নিষিদ্ধ কর্মও করেন, তাঁদের কি উদ্ধার হবে ?

উত্তর—সময় এলে তাদের উদ্ধার তো হবেই। কেননা, যে কোন প্রকারেই ভগবানের নাম নেওয়া হোক না কেন তা নিষ্ফল হয় না। কিন্তু নামজপের যে প্রত্যক্ষ প্রভাব, তা তারা দেখতে পাবে না। আসলে যাঁর পরমাত্মাকে পাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তাঁর দ্বারা নিষিদ্ধ কর্মও হয়। যাঁর উদ্দেশ্য একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি, তাঁর দ্বারা কোন নিষিদ্ধ কর্ম হওয়া সম্ভব নয়। যেমন যার লক্ষ্য একমাত্র উপার্জন ও সঞ্চয়, সে এমন কোন কাজ করে না যাতে অর্থের অপচয় হয়। সে অর্থের ক্ষতি সহ্য করতে পারে না। যদি কোন কারণে অর্থক্ষতি হয় তো সে অস্থির হয়ে যায়। তেমনি যাঁর ধ্যেয় পরমাত্মপ্রাপ্তি, তিনি সাধনার বিপরীত কোন কাজ করেন না। যদি কোন ব্যক্তি এমন বিপরীত কাজ করে, তাহলে প্রমাণিত হয় যে এখনো পরমাত্মপ্রাপ্তি তার ধ্যেয় নয়।

সাধকের উচিত পরমাত্মপ্রাপ্তিকেই দৃঢ়ভাবে ধ্যেয় করে রাখা এবং নাম জপ করতে থাকা, তাহলে তার দ্বারা আর কোন গর্হিত কাজ হয় না। যদি কোন নিষিদ্ধ কাজ তার দ্বারা হয়েও যায়, তাতে সে এতো অনুতপ্ত হয় যে পরে আর কখনও সেই কাজ তার দ্বারা হয় না।

প্রশ্ন—যে অনেক পাপ করেছে, সে ভগবানের নাম করতে পারে না, তাহলে সে কি করবে ?

উত্তর—একথা ঠিক। যার পাপ বেশী, সে ভগবানের নাম নিতে পারে না।

বৈষ্ণবে ভগবদ্ভক্তৌ প্রসাদে হরিনাম্নি চ।
অল্পপুণ্যবতাং শ্রদ্ধা যথাবন্নৈব জায়তে ॥

অর্থাৎ যার অল্প পুণ্য, তার ভক্তে, ভক্তিতে, ভগবৎপ্রসাদে এবং ভগবৎ নামে শ্রদ্ধা হয় না।

যেমন শরীরে পিত্তের প্রকোপ বাড়লে রোগীর মিছরীও তেতো লাগে, কিন্তু যদি সে মিছরী খেতে থাকে, তাহলে তার পিত্ত শান্ত হয় এবং ক্রমশঃ মিছরী মিষ্টি লাগে। তেমনি পাপ বেশী হলে নাম ভালো লাগে না ; কিন্তু যদি নাম জপ শুরু করে দেওয়া হয়, তবে পাপ নাশ হয়ে যায় এবং নাম ভালো লাগতে থাকে, মিষ্টি লাগতে থাকে এবং নামজপের প্রত্যক্ষ লাভও দেখতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন—যার ভাগ্যে নামজপ লেখা আছে, সে তো নাম নিতে পারে, তার মুখে নাম উচ্চারণ হতে পারে ; কিন্তু যার ভাগ্যে নামজপ লেখা নেই, সে কি ভাবে নাম নেবে ?

উত্তর—এক 'হওয়া' আর অন্যটি 'করা'। ভাগ্য অর্থাৎ পুরানো কর্মের ফল 'হওয়া', আর নতুন কর্ম 'করা' হয়, তা 'হওয়া'-র অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ব্যবসা হল 'করা' ও তাতে লাভ বা লোকসান হল 'হওয়া' ; কৃষিকাজ হল 'করা' এবং ফল হল ফসল 'হওয়া' বা 'না হওয়া'; মন্ত্র সকামভাবে জপ বা অনুষ্ঠান হল 'করা' এবং নীরোগ হওয়া না হওয়া ইত্যাদি ফল হল 'হওয়া'। বদ্রীনাথ যাওয়া—এই যাত্রারূপী কর্ম হল 'করা' আর চলতে চলতে পৌঁছানো— এটা হল 'হওয়া'। লাভ-ক্ষতি, বাঁচা-মরা, যশ-অপযশ এ সমস্তই হল 'হওয়ার' অন্তর্ভুক্ত কেননা এ সমস্তই পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল[১]। কিন্তু নাম জপ 'করা' হল নতুন কর্ম। এটি নবীন কর্মের অন্তর্ভুক্ত ; 'হওয়ার' অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি করার ক্ষেত্রে সকলেই স্বাধীন। হ্যাঁ, তাতে এই কথা হতে পারে যে যদি কেউ পূর্বে নাম জপ করে থাকে, তাহলে নামজপের মহিমা শুনলেই তার মনে নাম জপ করবার ইচ্ছা জাগবে এবং সে সেটি অত্যন্ত সহজভাবে করতে থাকবে। কিন্তু যে পূর্বে নাম জপ করেনি, সে যদি নামজপের মহিমা

---

[১]সুনহু ভরত ভাবী প্রবল বিলখি কহেউ মুনিনাথ। হানি লাভু জীবনু মরনু জসু অপজসু বিধি হাথ॥
(শ্রীরামচরিতমানস ২।১৭১)

শোনেও তবু তার শীঘ্র নামজপের ইচ্ছা হবে না। কিন্তু যিনি নামজপের মহিমা জানাচ্ছেন তিনি যদি অনুভবী হন তাহলে তাঁর কাছ থেকে যে শোনে, তার নামে রুচি আসে এবং ঐ অনুভবী ব্যক্তির সঙ্গে থাকতে থাকতে তারও নামজপ করা সহজ হয়ে যায়।

ভাগ্যে যা লেখা থাকে সেটি হল 'ফল', নতুন কর্মের ফল নয়। নামজপ করা যদি একবার শুরু হয় তা হতেই থাকবে ; কেননা, নামজপ করা নতুন কর্ম, নতুন উপাসনা। সুতরাং 'আমার ভাগ্যে নামজপ করা, সৎসঙ্গ করা, শুভ কর্ম করা লেখা নেই'— এইসব বলা বাজে বাহানা মাত্র। 'নামজপ, সৎসঙ্গ ইত্যাদি আমার ভাগ্যে নেই'— এইরূপ ভাব পোষণ করা কুসঙ্গতুল্য, যা নামজপ ইত্যাদি করার ভাবকে নষ্ট করে।

প্রশ্ন—নাম জপের দ্বারা ভাগ্য বা প্রারব্ধ কি বদলাতে পারে ?

উত্তর—হ্যাঁ, ভগবৎনাম জপ করলে, কীর্তন করলে প্রারব্ধ বদলায়, নতুন প্রারব্ধ সৃষ্টি হয় ; যে বস্তু পাবার নয় তা পাওয়া যায়, অসম্ভব সম্ভব হয়—সাধু এবং মহাপুরুষ এটি অনুভব করেছেন। যিনি কর্মের ফল বিধান করেছেন, তাঁকে যদি কেউ ডাকে, তাঁর নাম নেয় তাহলে নামজপকারীর প্রারব্ধ যে বদলাতে পারে তাতে আশ্চর্য কি ? যারা ভিক্ষা করে, যাদের ভরপেট অন্ন জোটে না, তারা যদি পবিত্র হৃদয়ে নামজপ করতে শুরু করে, তাহলে তাদের খাদ্য এবং বস্ত্রের অভাব ঘুচে যায়। কোন জিনিসের আর অনটন থাকে না। কিন্তু নামজপকে প্রারব্ধ বদলানো বা পাপনাশক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। অমূল্য রত্নের বদলে যেমন কয়লা কেনা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, অমূল্য ভগবৎনামও তেমনি সাধারণ কাজে ব্যয়িত করা বুদ্ধিমানের পরিচয় নয়।

প্রশ্ন—কেবল নামজপের দ্বারাই যখন সর্ব পাপ নাশ হয়, তাহলে শাস্ত্রে পাপমুক্ত হওয়ার জন্য নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন বলা হয়েছে ?

উত্তর—নামজপের দ্বারা জ্ঞাত-অজ্ঞাত ইত্যাদি সমস্ত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়, সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। কিন্তু নামে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হয় না বলে শাস্ত্রে নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে। যদি নামের উপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে, তাহলে অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না। নামজপকারী ভক্ত দ্বারা যদি কোন পাপ হয়েও যায় বা কোন ভুলও হয়, তাহলে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন নেই। আন্তরিকতার সঙ্গে নামজপ করলে সব মোচন হয়ে যায়।

প্রশ্ন—কেউ যদি সকামভাবে নামজপ করে, তাহলে কি নামজপের মাহাত্ম্য নষ্ট হয়ে যায় ?

উত্তর—যদিও সাংসারিক তুচ্ছ কামনাগুলির পূর্তির উদ্দেশ্যে ভগবানের নাম নিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তবু সকামভাবেও যদি ভগবানের নামজপ করা যায় তাতে নামের মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না। নামজপকারীর পারমার্থিক লাভ হবেই। কেননা নামের সঙ্গে ভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। তবে হ্যাঁ, নামকে সাংসারিক কামনা পূর্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করে নামের যে অসম্মান হয়, তাতে তার পারমার্থিক লাভ কম হয়। যদি তৎপরতার সঙ্গে নামজপে লেগে থাকা যায়, নামপরায়ণ হওয়া যায়, তাহলে নামের কৃপায় সকামভাব দূর হয়। ধ্রুব রাজ্য পাবার আশায় সকামভাবে নামজপ করেছিলেন ; কিন্তু যখন তিনি ভগবানের দর্শন পেলেন, তখন রাজ্য এবং পদ পেয়েও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, তিনি নিজ সকামভাবের জন্য অনুতপ্ত হলেন। অর্থাৎ ভগবদ্ দর্শনেই তাঁর সকামভাব দূরীভূত হল।

যে ব্যক্তি সকামভাবে নামজপ করেন, তাঁরও নামের কৃপায় অন্তিম সময়ে নাম স্মরণে আসতে পারে এবং তাঁর কল্যাণ হতে পারে।

প্রশ্ন—শাস্ত্র তথা সাধুগণ বলেন যে, এত সংখ্যায় নাম জপ করলে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়, সত্যিই কি তাই হয় ?

উত্তর—হ্যাঁ,

> **'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।**
> **হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'**

এই মন্ত্র সাড়ে তিন কোটি জপ করলে ভগবদ্ দর্শন হয়—**'কলিসন্তরণোপনিষদ্'**-এ এইরূপ বলা আছে। **'রাম'** নাম তের কোটি বার জপ করলে ভগবদ্দর্শন হয়—সমর্থ রামদাসবাবাজী তাঁর 'দাসবোধ' গ্রন্থে এরূপ লিখেছেন। যদি নামে এবং ভগবানে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এবং অনুরাগ বেশী থাকে, তাহলে উপরিউক্ত সংখ্যায় জপ করার আগেই ভগবদ্ দর্শন হতে পারে।

প্রশ্ন—নহি কলি করম ন ভগতি বিবেকূ। রাম নাম অবলম্বন একূ। (শ্রীরামচরিতমানস ১।২৭।৪)—এইরূপ বলার অর্থ কি?

উত্তর—কলিযুগে যজ্ঞাদি শুভকর্মের আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে করা অত্যন্ত কঠিন এবং তার বিধি-বিধান ঠিকমত জানা ব্যক্তিও খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই কলিযুগে শুভকর্মের অনুষ্ঠান এবং বিধি পালন ঠিকভাবে না হওয়ায় যজ্ঞকারীর দোষ-স্পর্শ ঘটে।

বৈধীভক্তির সাধন বিধি ও বিধান দ্বারা করা হয়। কিন্তু কোন্ ইষ্ট দেবতাকে কোন্ বিধিতে পূজা করা উচিত — এইসব জানা ব্যক্তি আজকাল খুব কম আছে। তাই ঐরূপে পূজা অর্চনা করা কলিযুগে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

জ্ঞানমার্গ কঠিন এবং সেই জ্ঞানমার্গের সাধনা জানাবার মত সমর্থ পুরুষ পাওয়াও অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং বিবেকমার্গে চলা কলিযুগে খুবই দুঃসাধ্য। ফলতঃ কলিযুগে কর্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান এই তিনটি সাধনমার্গই কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু ভগবানের নামজপ স্মরণ করা কঠিন নয়। ভগবানের নাম সকলেই করতে পারে, কারণ তাতে কোন বিধিনিষেধ নেই। বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, রোগী প্রভৃতি সকলেই সবসময় সকল অবস্থাতেই তাঁর নাম করতে পারে।

নাম হচ্ছে একটি সম্বোধন, আহ্বান। তাতে আর্তভাবই মুখ্য, বিধিনিষেধ মুখ্য নয়। সুতরাং প্রত্যেক মানুষ আর্তভাবে ভগবানকে আহ্বান করতে পারে।

প্রশ্ন—নামজপে মন লাগে না আর মন না লাগলে নামজপ করে কিছু লাভ হয় না। বলাও হয়েছে—

মালা তো কর মেঁ ফিরে, জীভ ফিরৈ মুখ মাহিঁ।
মনুআঁ তো চহুঁ দিসি ফিরৈ, য়হ তো সুমিরন নাহিঁ॥

উত্তর—মন যদি না লাগে তাহলে স্মরণও হবে না—একথা সত্য, কিন্তু নামজপ হবে না একথা দোঁহাতে বলা নেই। মন না লাগলে স্মরণ হবে না তো নাই হোক। কিন্তু নাম জপ তো হবে। নাম জপ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না, অতএব মন লাগুক না লাগুক জপ করতে থাকা উচিত।

যখন মন লাগবে, তখন নামজপ করব— এইরকম হওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, যদি আমি নামজপ করতে থাকি তবে তাতে মনও লেগে যাবে, কেননা জপের পরিণামই হচ্ছে মন লাগা।

প্রশ্ন—শাস্ত্রে আছে, যে ব্যক্তি নাম না নিতে চায়, নামে যার কোন শ্রদ্ধা নেই তাকে নাম শোনান উচিত নয়, কেননা তাতে নামাপরাধ হয়। কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আদি মহাপুরুষগণ তবে যাদের নামে শ্রদ্ধা নেই তাদেরও কেন নাম শুনিয়েছিলেন ?

উত্তর—যে ব্যক্তি নাম শুনতে চায় না, মুখেও বলতে চায় না, নামের অপমান করে, তাকে নাম শোনান উচিত নয়—এই হচ্ছে বিধি ; শাস্ত্রের আদেশ । তবুও সাধু-মহাপুরুষগণ দয়াপূর্বক তাদের নাম শোনান। তাঁদের কৃপাদানে কোন বিধি-নিষেধের নিয়ম প্রযোজ্য হয় না। মহাপুরুষের দয়া-কর্ম সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত। মহাত্মাদের দয়া অহৈতুকী হয়, হেতু ছাড়াই করা হয়। যেমন, কোন ভগবৎপ্রাপ্ত সাধু বা মহাপুরুষ যদি নিজ সামর্থ্যে অপরকে কিছু দেন, তাহলে তা প্রাপকের পূর্বকর্মের ফল নয়, তা হল ঐ সাধু বা মহাপুরুষের দয়া। তেমনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দয়াপরবশ হয়ে অসৎ, পাপী ব্যক্তিদেরও ভগবৎ নাম শুনিয়েছেন।

প্রশ্ন—যদি মরণাপন্ন পশু বা পক্ষী ইত্যাদিকে ভগবৎনাম শোনান হয়, তাহলে কি তাদের উদ্ধার হতে পারে ?

উত্তর—পশু-পক্ষী ইত্যাদি ভগবৎনামের প্রভাব বোঝে না। তবে যদি আপনা থেকেই নামের প্রভাব এসে পড়ে, তবে তার বিরুদ্ধতাও করে না। তারা নামের নিন্দা, অপমান অথবা ঘৃণাও করে না। সুতরাং তাদের মৃত্যুর সময়ে যদি নাম শোনান হয়, তাহলে তাদের ওপর নামের প্রভাব কার্যকরী হয় অর্থাৎ নামের প্রভাবে তাদের উদ্ধার হয়ে যায়।

প্রশ্ন—মৃত্যুকালে কেউ যদি তার 'নারায়ণ' 'বাসুদেব' প্রভৃতি পুত্রদের নাম করে, ভগবান তা নিজের নাম বলেই মেনে নেন, এরূপ কেন হয় ?

উত্তর—ভগবান অত্যন্ত দয়ালু, তিনি আমাদের এই বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন যে যদি মানুষ শেষ সময়েও কোনও প্রকারে তাঁর নাম নেয়, তাঁকে স্মরণ করে, তাহলে তার কল্যাণ হবে। কারণ ভগবান জীবের কল্যাণের জন্যই তাকে মনুষ্য শরীর দিয়েছেন এবং জীব যদি কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হয়, তাহলে জীবকে

ভগবানের মনুষ্য শরীর দেওয়া এবং জীবের মনুষ্যশরীর গ্রহণ সার্থক হয়।

কিন্তু মানুষ নিজের কল্যাণ না করেই শরীর ত্যাগ করতে উদ্যত, তাই ভগবান তাকে সুযোগ দেন যে, 'এখন চলে যাওয়ার সময়েও যদি কোন প্রকারে তুমি আমার নাম করো, আমাকে স্মরণ করো তবে কল্যাণ হবে।' মৃত্যু সময়ে ভয়ানক যমদূতকে দেখে যেমন অজামিল নিজ পুত্র নারায়ণকে ডাকলেন, ভগবান সেটি তাঁর নামরূপে গ্রহণ করে নিজের চার পার্ষদকে পাঠালেন অজামিলের কাছে।

এর তাৎপর্য হল এই যে, মানুষকে রাত-দিন, খাওয়া-পরা চলায়-ফেরায়, শয়নে-জাগরণে সব সময় ভগবানের নাম স্মরণ রাখা উচিত।

(৮) গীতায় ফলসহ বিবিধ উপাসনার বর্ণনা

গোবিন্দাচার্যদেবানাং পিতৄণাং যক্ষরক্ষসাম্।
উপাসনা চ ভূতানাং ফলং প্রোক্তং তু ভাবতঃ॥

গীতায় ভগবান, আচার্য, দেবতা, পিতৃপুরুষ, যক্ষ-রাক্ষস, ভূত-প্রেত প্রভৃতির উপাসনা (বিস্তারিত ভাবে বা সংক্ষেপে) ফলসহিত বর্ণিত হয়েছে যেমন—

১) অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী (অনুরাগী) —এই চার প্রকারের ভক্ত ভগবানের ভজনা করেন অর্থাৎ তাঁর শরণাগত হন (৭।১৬)

ভগবানের ভজন-পূজনকারী ভক্ত ভগবানকে প্রাপ্ত হন—'মদ্ভক্তা যান্তি মামপি' (৭।২৩) ; 'যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্'[১] (৯।২৫)।

২) যিনি বাস্তবে জীবন্মুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ ও ভগবৎপ্রেমী মহাপুরুষ, যাঁর জীবনযাত্রা শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে নির্বাহ হয়, তিনিই প্রকৃত 'আচার্য'। এইরূপ আচার্যের আজ্ঞা পালন করা, তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজের জীবন তৈরী করাই হল তাঁর উপাসনা (৪।৩৪ ; ১৩।৭)। এইভাবে আচার্যের উপাসনাকারী মানুষও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন (৪।৩৫) ; (১৩।২৫)।

৩) যে সব ব্যক্তি কামনা-বাসনায় মগ্ন হয়ে থাকে এবং ভোগবিলাস ও অর্থসংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই করার নেই বলে মনে করে, তারা ভোগসামগ্রী প্রাপ্তির আশায় বেদোক্ত সকামকর্ম করে থাকে (২।৪২-৪৩)। কর্মের সিদ্ধি বা ফল আশা করেন যেসব ব্যক্তি, তাঁরা দেবতাদের পূজা করেন, কেননা মনুষ্যলোকে কর্মজনিত সিদ্ধি অত্যন্ত শীঘ্র পাওয়া যায় (৪।১২)। সুখভোগের কামনায় যাদের বিবেক রুদ্ধ, তারা ভগবানকে ত্যাগ করে দেবতাদের শরণাপন্ন হয় এবং নিজ নিজ স্বভাবের বশবর্তী হয়ে কামনাপূর্তির উদ্দেশ্যে অনেক নিয়ম এবং উপায় অবলম্বন করে (৭।২০)। ভগবান বলেছেন, যে ভক্ত যে দেবতাকে পূজা করতে চায়, আমি সেই দেবতার প্রতি তার শ্রদ্ধা দৃঢ় করে দিই। তখন সে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার পূজা করে। কিন্তু তার সেই উপাসনার ফল আমার বিধানমতই পেয়ে থাকে (৭।২১-২২)। তিনটি বেদে বর্ণিত সকাম কর্মপালনকারী, সোমরস পানকারী পাপরহিত ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করে স্বর্গ প্রাপ্তি কামনা করে (৯।২০)। যারা কামনা রেখে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্য অন্য দেবতার পূজা করে, বাস্তবে তারাও আমারই পূজা করে ; কিন্তু তাদের এই পূজা বৈধী পূজা নয়। (৯।২৩)।

দেবতাদের পূজনকারী ব্যক্তিগণ স্বর্গলোকে গমন করে

[১]গীতায় ভগবানের উপাসনার কথাই মুখ্য ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই 'গীতা-দর্পণ' পুস্তকটিতেও বিভিন্ন স্থানে ভগবানের উপাসনার অনেক প্রকারের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেইজন্য এখানে ভগবানের উপাসনার বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষেপে করা হল।

এবং সেখানে নিজ পুণ্য ফল ভোগ করে পুনরায় মর্তলোকে ফিরে আসে (৯।২০-২১)। দেবতাদের যারা পূজা করে, তারা দেবতাকে লাভ করে এবং দেবলোকে গমন করে **'দেবান্ দেবযজঃ'** (৭।২৩); **'যান্তি দেবব্রতা দেবান্'** (৯।২৫)।

৪) পূর্বপুরুষগণের ভক্তগণ পিতৃগণের পূজা করে এবং তার ফলস্বরূপ তারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পিতৃলোকে গমন করে—**'পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ'** (৯।২৫)। (কিন্তু যদি তারা নিষ্কামভাবে কর্তব্য মনে করে পূজাদি করে, তাহলে তারা মুক্ত হয়ে যায়।)

৫) রজঃগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ যক্ষ এবং রক্ষঃদের পূজা করে (১৭।৪) এবং তার ফলস্বরূপ যক্ষ এবং রক্ষঃলোক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঐসব যোনি প্রাপ্ত হয়।[১]

৬) তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তি ভূত-প্রেতাদির পূজা করে (১৭।৪)। যারা ভূত প্রেতাদির পূজা করে তারা ভূত-প্রেতলোক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেইসকল যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে—**'ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ'** (৯।২৫)।[২]

গীতায় নিষ্কামভাবে ব্যক্তি, দেবতা, পিতৃ, যক্ষ-রক্ষ ইত্যাদির সেবা ও পূজা নিষেধ করা হয় নি। উপরন্তু নিষ্কামভাবে সকলের সেবা এবং উপকার করার অনেক মহিমা কীর্তন করা হয়েছে (৫।২৫; ৬।৩২ ; ১২।৪)। এর তাৎপর্য এই যে নিষ্কামভাবে এবং শাস্ত্রের বিধানমত কেবল দেবতাদের পুষ্টির জন্য, তাঁদের উন্নতির জন্য যে কর্তব্যকর্ম, পূজা ইত্যাদি করা হয় তার দ্বারা মানুষ বদ্ধ হয় না, বরং সেই পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয় (৩।১১)। এইরূপই নিষ্কামভাবে এবং শাস্ত্র আজ্ঞায়, কর্তব্য মনে করে পিতৃগণের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করলে, তাতেও পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যক্ষ-রাক্ষস, ভূত-প্রেত ইত্যাদির উদ্ধারের জন্য, তাদের সুখ-শান্তি দানের উদ্দেশ্যে নিষ্কামভাবে, শাস্ত্রবিধিমতে তাদের নামে গয়াতে শ্রাদ্ধ তর্পণ, ভাগবত-পারণ, দান, ভগবৎ নামের কীর্তন, গীতা-রামায়ণ আদি পাঠ করলে তাদের উদ্ধার হয়, তারা সুখ-শান্তি পায় এবং সাধকগণের পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়। যদি ঐসব দেবতা, পিতৃ, যক্ষ-রক্ষ, ভূত-প্রেত ইত্যাদিকে নিজ ইষ্ট মনে করে সকামভাবে তাঁদের পূজা করা হয়, তবে তা বন্ধনের মুখ্য কারণ হয় এবং জন্ম-মৃত্যু ও অধোগতির কারণ হয়।

'ব্যক্তি-দেবতা-পিতৃ-যক্ষ-রক্ষ-ভূত-প্রেত-পশু-পক্ষী ইত্যাদি সকল প্রাণীর মধ্যে আমার প্রভুই আছেন, এই প্রাণীদের রূপেই আমার প্রভু বিরাজিত'— এইরূপ মনে করে ভগবদ্বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে সকলের সেবা করলে পরমাত্মাকে পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত দুটি বাক্যের তাৎপর্য এই যে, নিজের সকামভাব এবং যার সেবা করা হয় তাতে ভগবদ্বুদ্ধি না হওয়াই জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হওয়ার কারণ। যদি নিজের মধ্যে নিষ্কামভাব থাকে এবং যাঁর সেবা করা হবে, তাঁতে ভগবদ্বুদ্ধি থাকে, তাহলে সেই সেবাই পরমাত্মপ্রাপ্তি করাতে পারে।

একটি বিশেষ কথা হল এই যে, ভগবানের উপাসনা সকামভাবে করলেও সেই উপাসনার দ্বারাও উদ্ধার পাওয়া যায়, যদি তাঁতে অনন্যভাব থাকে। ভগবান গীতায় অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী এই চার প্রকার ভক্তকে উদার বা উৎকৃষ্ট রূপে অভিহিত করেছেন (৭।১৮)। তিনি বলেছেন 'আমাকে যারা পূজা করে তারা আমাকেই পায়' (৭।২৩, ৯।২৫)। মানুষ যে কোন ভাব নিয়েই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হোক না কেন তার উদ্ধার হবেই।

দেবতা আদির উপাসনার ফল বিনাশশীল (অনিত্য) হয় (৭।২৩) ; কারণ দেব উপাসক ব্যক্তি পুণ্য-ফলের

---

[১]গীতায় ভগবান যক্ষ-রক্ষ পূজার বর্ণনা তো করেছেন —'যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ' (১৭।৪) কিন্তু এই পূজা দ্বারা কি ফল হয় তা বর্ণনা করেন নি। এর তাৎপর্য এই যে যেমন দেবতাদের পূজা করলে দেবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় (৯।২৫), তেমনি যক্ষ-রক্ষ পূজা যারা করে, তারা যক্ষ-রক্ষঃলোক প্রাপ্ত হয়। কারণ যক্ষ-রাক্ষসও দেবযোনি হবার ফলে দেবতাগণের অন্তর্গত।

[২]সপ্তদশ অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে 'দেব-দ্বিজ-গুরু- প্রাজ্ঞপূজনং' পদ দ্বারা যে দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন এবং বিদ্বান প্রমুখ ব্যক্তির পূজার কথা বলা হয়েছে, তাকে এখানে বর্ণিত উপাসনার অন্তর্গত করা হয় নি। কারণ সেখানে শুধু 'শারীরিক তপের (কেবল শরীর সম্বন্ধীয় পূজা, আপ্যায়ন, সৎকার ইত্যাদি) কথাই বলা হয়েছে, যা অনাদিকাল থেকে মুক্তি লাভের একটি উপায়। দ্বিতীয়তঃ সেই দেবতা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদির পূজা কেবল শাস্ত্র-আজ্ঞা মনে করে কর্তব্যরূপে পালন করা হয়, তাঁদের ইষ্ট মনে করে নয়।'

শক্তিতে স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করে এবং পুণ্য ক্ষয় হলে পুনরায় মর্ত্যজগতে জন্ম নেয়। কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তি অবসিত হয় না (৮।১৬)। কারণ এই জীব পরমাত্মারই অংশ (১৫।৭)। সুতরাং জীব যখন নিজ অংশী পরমাত্মার কৃপায় তাঁকে প্রাপ্ত হয়, তখন সে আর সেখান থেকে ফিরে আসে না (৮।২১, ১৫।৬)। পরমাত্মার কৃপা নিত্য এবং স্বর্গাদিলোকে যাবার যে পুণ্য, তা অনিত্য।

জ্ঞাতব্য

প্রশ্ন—ভগবান বলেছেন যে, ভূত-প্রেতাদির উপাসনাকারী পরজন্মে ভূত-প্রেতই[1] হয়ে যায় (৯।২৫), এরূপ কেন হয় ?

উত্তর—ভূত-প্রেতাদির উপাসনাকারীর অন্তঃকরণে ভূত-প্রেতের প্রাধান্য থাকে এবং ভূত-প্রেতই তাদের উপাস্য হয়। অতএব মৃত্যুকালে তার মনে প্রেতাদির চিন্তাই থাকে এবং সেই চিন্তা অনুসারে সে ভূত-প্রেতের যোনিই লাভ করে (৮।৬)।

যদি কোন মানুষ এরূপ ভাবে যে, 'এখন আমি পাপ ব্যভিচার অত্যাচার যা করবার সব করে নিই, যখন মৃত্যুর সময় হবে তখন ভগবানের নাম নিয়ে নেব, ভগবানকে স্মরণ করে নেব'; এ চিন্তা একেবারেই ভুল। কারণ মানুষ সারাজীবন যেমন কর্ম করে, মনে যেমন চিন্তা করে, অন্তিম সময়ে প্রায়শঃ সেটিই তার স্মরণে আসে। সুতরাং দুরাচার ব্যক্তির মৃত্যুকালে নিজ দুরাচারের কথাই চিন্তায় আসবে এবং সে নিজ পাপকর্মের ফলস্বরূপ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করবে, ভূত-প্রেত হয়েই জন্ম নেবে।

যদি কোন ব্যক্তি কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যাদি ধামে বাস করে চিন্তা করে যে, 'তীর্থধামে বসবাস করলে এবং মৃত্যু হলে তার সদ্‌গতি হবে, দুর্গতি হতেই পারে না', এবং তারপরে সে পাপ, দুরাচার, ব্যভিচার, ছল-চাতুরি এবং চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়, তাহলে মৃত্যুর পর তার ভয়ঙ্কর দুর্গতি হয়। তার মৃত্যু প্রায়শঃ কোন কারণবশতঃ তীর্থস্থানের বাইরেই হয় এবং সে ভূত-প্রেত হয়। যদি তার তীর্থধামেও মৃত্যু হয়, তথাপি পাপ কর্মের জন্য সে ভূত-প্রেতই হয়।

প্রশ্ন—প্রেতযোনি যাতে না হতে হয় তার জন্য মানুষের কি করা উচিত ?

উত্তর—এই মনুষ্য শরীর পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং মানুষের উচিত সাংসারিক ভোগ এবং অর্থসংগ্রহের আসক্তিতে বদ্ধ না হয়ে ভগবানের শরণাগত হওয়া। এর দ্বারাই মানুষ অধোগতি এবং ভূত-প্রেত ইত্যাদির যোনি থেকে বাঁচতে পারে।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেত এবং পিতৃগণের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর—যদিও ভূত-প্রেত-পিশাচ-পিতৃগণ ইত্যাদি সকলকেই দেবযোনি বলে,[2] কিন্তু এতে কিছু পার্থক্য আছে। ভূত-প্রেতের দেহ বায়ুপ্রধান, অতএব সকলে এদের দেখতে পায় না। তবে এরা যদি কাউকে নিজরূপ দেখাতে চায়, তাহলে দেখাতে পারে। তাদের মলমূত্রাদি অশুদ্ধ বস্তু খেতে হয়, শুদ্ধ অন্ন, জল তারা গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি তাদের নামে শুদ্ধ পদার্থ দেয়, তারা তা খেতে পারে। ভূত-প্রেতাদির শরীর থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

পূর্বপুরুষ পিতৃগণকে ভূত-প্রেতের থেকে উচ্চাবস্থার বলে মনে করা হয়। তাঁরা প্রায়ই নিজ আত্মীয়গণের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন এবং তাদের রক্ষা করেন ও সহায়ক হন। আত্মীয়-কুটুম্বদের ব্যবসায়, চাকরি ইত্যাদিতে সৎ-পরামর্শ দিয়ে রক্ষা করেন। যদি গৃহস্থগণ সম্পত্তি ভাগ করতে চান, তবে তা ভাগ করে দেন ইত্যাদি।

পূর্বপুরুষগণ গোদুগ্ধে তৈরী গরম গরম পায়েস খেতে ভালোবাসেন এবং গঙ্গাজলের মত শীতল জল পান করেন, শুদ্ধ জিনিস গ্রহণ করেন। কেউ কেউ আবার গৃহস্থদের দুঃখও দেন, জ্বালাতন করেন। আসলে এ সবই

---

[1] যে এখান থেকে চলে যায় অর্থাৎ যার মৃত্যু হয়, তাকে 'প্রেত' বলা হয় এবং তার মৃত্যুর পরে তার জন্য যে ক্রিয়াকর্মাদি করা হয়, তাকে 'প্রেতকর্ম' বলা হয়। যে নিজ পাপ কর্মের ফলস্বরূপ ভূত এবং পিশাচ যোনিতে জন্ম নেয়, তাকেও 'প্রেত' বলা হয়। অতএব এখানে পাপের জন্য যারা নীচ যোনিতে জন্ম নেয়, তাদের বোঝাতে 'প্রেত' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

[2] বিদ্যাধরোঽপ্সরোযক্ষরক্ষোগন্ধর্বকিন্নরাঃ। পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ॥ (অমরকোষ ১।১।১১)

যার যার স্বভাবের পার্থক্য অনুযায়ী হয়।

মানুষের মধ্যে যেমন চতুর্বর্ণ, উচ্চ-নীচ এবং স্বভাব ইত্যাদির ভেদাভেদ থাকে, তেমনি পূর্বপুরুষগণ, ভূত-প্রেত, পিশাচ ইত্যাদিতেও বর্ণ, জাতি এইসবের ভেদাভেদ থাকে।

প্রশ্ন—কারা মৃত্যুর পর ভূত-প্রেত হয় ?

উত্তর—যে মানুষের খাওয়া দাওয়া অশুদ্ধ, যার আচরণ মন্দ, যে দুর্গুণ-দুরাচারে লিপ্ত, যার স্বভাব অপরকে দুঃখ দেওয়া, যে কেবল নিজ জেদ বজায় রাখে, এই প্রকার ব্যক্তি মৃত্যুর পর ক্রূর স্বভাববিশিষ্ট ভূত-প্রেত হয়। সে যার মধ্যে প্রবেশ করে, তাকে প্রভূত দুঃখ দেয় এবং মন্ত্রাদির দ্বারাও তাকে শীঘ্র অপসারণ করা যায় না।

যে মানুষের স্বভাব সৌম্য, যিনি অপরকে দুঃখ দিতে চান না ; কিন্তু সাংসারিক বস্তু, স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, সম্পত্তিতে আসক্ত ও মমতাসম্পন্ন, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর সৌম্যস্বভাববিশিষ্ট প্রেত হন। তিনি যদি কারো শরীরে প্রবিষ্ট হন, তাহলে তাকে দুঃখ দেন না এবং তাকে নিজ গতি সম্বন্ধে অবহিত করেন।

যার বিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক অহংকার ও অভিমান আছে এবং সেইজন্য সে অন্য ব্যক্তিকে হেয় মনে করে ও অপমান অবজ্ঞা করে, অপরকে বুঝতে চায় না, এই রকম ব্যক্তি মৃত্যুর পর ব্রহ্মদৈত্য বা জিন হয়। সে যদি কারো মধ্যে প্রবেশ করে বা ভর করে, তাহলে নিজের ইচ্ছা ছাড়া তাকে ত্যাগ করে না। এর ওপর কোন তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাব খাটে না। অপর কেউ তার ওপর মন্ত্র প্রয়োগ করতে গেলে সে স্বয়ং সেই মন্ত্র বলে দেয়।

একটি সত্য ঘটনা। দক্ষিণে মোরোজী পন্ত নামে এক মস্ত বড় বিদ্বান ছিলেন। তাঁর বিদ্যার খুব অহংকার ছিল। তিনি কাউকে নিজের সমান বিদ্বান মনে করতেন না এবং সকলকেই হেয় করতেন। একদিন দুপুরবেলা তিনি স্নান করার জন্য নদীতে যাচ্ছিলেন, রাস্তার ধারে গাছের ওপর দুটি ব্রহ্মদৈত্য বসেছিল। তারা নিজেরা কথাবার্তা বলছিল। একজন ব্রহ্মদৈত্য বলল, 'আমরা দুজন তো এই গাছের দুটি ডালে বসে আছি, তৃতীয় ডালটি খালি রয়েছে, এখানে বসার জন্য কে আসবে ?' অপর ব্রহ্মদৈত্য উত্তর দিল, 'এই যে ব্যক্তিটি নীচে দিয়ে যাচ্ছে সেই এসে ওখানে বসবে, কেননা এর নিজের বিদ্যাবত্তার দারুণ অভিমান'। এদের দুজনের আলোচনা মোরোজী পন্ত শুনতে পেয়ে থেমে গেলেন আর ভাবতে লাগলেন, আরে ! বিদ্যার অভিমানের জন্য আমাকে ব্রহ্মদৈত্য হতে হবে, প্রেতযোনিতে যেতে হবে ? নিজের দুর্গতির কথা ভেবে তিনি অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন এবং মনে মনে সন্ত জ্ঞানেশ্বরের শরণাগত হয়ে বললেন, 'আমি আপনার শরণাগত, আপনি ছাড়া আমাকে এই দুর্গতি থেকে রক্ষা করার কেউ নেই'। এইরূপ বিবেচনা করে তিনি সেখান থেকে সোজা আলন্দীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, যেখানে সন্ত জ্ঞানেশ্বর জীবন্ত সমাধিস্থ হয়েছেন। মোরোজী সারাজীবন সেখানেই থেকে গেলেন, নিজের বাড়িতে আর ফিরলেন না। সন্তের শরণাগত হওয়ায় তাঁর বিদ্যার অভিমান চলে গেল এবং তিনি নিজেও একজন সন্ত হলেন।

যে স্ত্রীলোক পরপুরুষকে চিন্তা করে তথা যার পুরুষদের উপর খুব বেশি আসক্তি থাকে, সে মৃত্যুর পর 'ডাইনী' হয়। ভূত-প্রেতাদির মধ্যে প্রায়শঃ এই নিয়ম দেখা যায় যে, পুরুষ ভূত-প্রেত পুরুষদের ওপরই চড়াও হয় এবং স্ত্রী ভূত-প্রেত স্ত্রীলোকদিগের ওপর চড়াও হয় ; কিন্তু ডাইনী কেবল পুরুষদেরই ধরে। ডাইনী দু'প্রকারের হয়—একপ্রকার হচ্ছে, যারা পুরুষদের শোষণ করে অর্থাৎ তাদের রক্ত চুষে খায়, যাতে তাদের শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। অন্যরা পুরুষদের পোষণ করে, সুখ-আরাম দেয়। এই দুইপ্রকারের ডাইনীই পুরুষদের নিজ বশে রাখে।

এক পুলিস ছিল। সে রাত্রিবেলা কোন এক স্থান থেকে ফিরছিল। পথিমধ্যে জোৎস্নালোকে এক গাছের নীচে সে একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে। সে ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা বলায় সেই মেয়েটি বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব ?' পুলিসটি বলল, 'আচ্ছা, এসো'। মেয়েটি আসলে ছিল এক ডাইনী, সে পুলিসের পিছন পিছন এল। তারপর থেকে সে রোজ রাত্রে পুলিসটির কাছে আসত, তার সঙ্গে শুত, তার সঙ্গে সঙ্গ করত এবং সকালবেলায় চলে যেত। এইভাবে সে পুলিসটিকে শোষণ করতে লাগল। এক রাত্রে দুজনে শুয়ে পড়েছে, কিন্তু ঘরের আলোটা জ্বলছে, তখন পুলিস মেয়েটিকে বলল, 'আলোটা নিভিয়ে দাও'। মেয়েটি শুয়ে শুয়ে নিজের হাত

লম্বা করে আলো নিভিয়ে দিল। পুলিসটি এবার বুঝতে পারল যে এ কোন সাধারণ মেয়ে নয়, এ এক ডাইনী। সে খুব ভয় পেয়ে গেল। ডাইনী তাকে ভয় দেখাল যে, 'তুমি যদি কাউকে আমার সম্বন্ধে বল, তাহলে আমি তোমাকে মেরে ফেলব।' এইভাবে সে প্রতি রাতে আসত এবং সকালে চলে যেত। পুলিসটির শরীর দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। সকলে তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'ভাই, তুমি এতো শুকিয়ে যাচ্ছ কেন ? কি হয়েছে, আমাদের বলো তো।' কিন্তু ডাইনীর ভয়ে সে কাউকে কিছু বলত না। একদিন সে দোকান থেকে ওষুধ আনতে গেছে। দোকানদার ওষুধের প্যাকেট করে দিয়েছে, পুলিস সেটি পকেটে করে ঘরে নিয়ে এসেছে। রাত্রে ডাইনী এসে দূর থেকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'তোমার পকেটে যে ওষুধ আছে সেটি বার করে ফেলে দাও।' পুলিসটির সন্দেহ হল যে, 'নিশ্চয়ই এই পুরিয়ায় এমন কোন কেরামতি আছে যে ডাইনী আমার কাছে আসতে পারছে না।' পুলিস ডাইনীকে বলল, 'আমি পুরিয়া ফেলব না।' ডাইনী অনেক করে বলল কিন্তু লোকটি তার কথা শুনল না। যখন তাকে দিয়ে কিছুতেই সেই পুরিয়া ফেলানো গেল না, তখন সে চলে গেল। পুলিসটি পকেট থেকে ওষুধের প্যাকেট বার করে দেখল যে সেটি গীতার ছেঁড়া পাতায় বাঁধা। এইরকম গীতার প্রভাব দেখে সে সবসময় নিজের পকেটে গীতা রাখতে লাগল। ডাইনীটি আর কখনও তার কাছে আসেনি।

যে ব্যক্তি মন্দিরে থাকে, গীতা, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি পাঠ করে, ভগবানের আরতি, স্তুতি, প্রার্থনা করে, ভগবৎ-নাম জপ করে এবং এরই সঙ্গে লোককে ঠকায়, ভগবানের ভোগ-সামগ্রী, বস্ত্রাদি চুরি করে, ঠাকুরকে পয়সা উপার্জনের উপায় হিসাবে নেয়, এইসব ব্যক্তি মৃত্যুর পর ভগবৎঅপরাধের জন্য ভূত-প্রেত হতে পারে। কিন্তু এ যদি কোনো ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে, তাহলে তাকে দুঃখ দেয় না। পূর্বজন্মে কৃত ভগবৎপূজা, আরতি, স্তুতি-প্রার্থনা ইত্যাদি তার স্বভাবে থাকার জন্য সে ভগবৎ-নাম জপ করে, হাতে 'গোমুখী, কমণ্ডলু রাখে' মন্দিরে যায়, পরিক্রমা করে এবং ভগবানের স্তুতি-প্রার্থনাও করে। কোন মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট না হয়ে এরা ভগবানের স্তুতি-প্রার্থনা করতে পারে না। বৃন্দাবনে বাঁকে বিহারীর মন্দিরে একটি ছোট বালক আসত। সে সংস্কৃত ভাষা জানত না, কিন্তু বিহারীজীর সামনে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতে জোরে জোরে ভগবানের স্তোত্র পাঠ করত। পাঠ করার সময় তার আওয়াজ বালকের মতো শোনাত না, বড়ো মানুষের কণ্ঠস্বর বলে মনে হোত। কারণ তার মধ্যে সেই সময় এক প্রেত প্রবিষ্ট হতো এবং সেই ভগবানের স্তুতি করত, কিন্তু সে কখনো বালকটিকে কষ্ট দিত না। ভগবৎ অপরাধের ফল ভোগ করার পর ভগবৎকৃপায় এরূপ ভূত-প্রেতের সদ্গতি হয়ে প্রেতযোনি থেকে মুক্তি হয়।

মানুষের মধ্যে যারা অত্যন্ত বেশী পাপী, দুর্গুণ-দুরাচার, হিংসাত্মক কার্যকারী, তারা যেমন ভগবানের কথা, কীর্তন, সৎসঙ্গ ইত্যাদিতে থাকতে পারে না, সেখান থেকে উঠে চলে যায়, এইরূপ ভয়ঙ্কর পাপের জন্য যারা ভূত-প্রেত প্রভৃতি নীচ যোনিতে যায়, তারা ভগবৎ-নাম জপ, কথা-কীর্তন এবং সৎসঙ্গ ইত্যাদির সংস্পর্শে আসতে পারে না। যেসব ব্যক্তি ভগবৎ-নাম, কথা-কীর্তন, সৎসঙ্গ ইত্যাদির বিরোধিতা করে, নিন্দা-অপমান করে, তারা ভূত-প্রেত যোনি প্রাপ্ত হয় এবং কথা-কীর্তন, সৎসঙ্গ ইত্যাদির কাছে আসতে পারে না। যদি কথা-কীর্তন ইত্যাদির কাছে এসে পড়ে তো তাদের গায়ে জ্বালা ধরে।

পূজারীর মনে যদি সাংসারিক বস্তুর ওপর কোন লোভ না থাকে, বিগ্রহের ওপর যদি শ্রদ্ধা থাকে, ঠাকুরে অর্পিত জিনিসে প্রসাদ-বুদ্ধি থাকে, ভগবানে নিবেদিত বস্তু প্রসাদরূপে পেয়ে ভক্তিতে গদ্গদ হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে, 'আমি কি সৌভাগ্যবান ভগবানে অর্পিত বস্তু প্রসাদরূপে পেয়েছি'—এইরূপ সব জিনিসে ভগবানের সম্বন্ধের জন্য মহত্ত্ব যে দেখে, সে ভগবানে অর্পিত বস্তু প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করলে তার ভগবৎ অপরাধ হয় না, তার অন্তঃকরণ ভগবানের মহত্ত্বে ভরপুর থাকায় সে ভূত-প্রেত হতেই পারে না। কিন্তু যার হৃদয়ে বস্তুর ওপর লোভ, কামনা, মমতা, বাসনা ইত্যাদি আছে, সে তীর্থস্থান, মন্দির, যে কোন স্থানে থাকুক না কেন মৃত্যুর পর কামনাদির জন্য ভূত ও প্রেত হয়ে থাকে। তারা ভগবানের পূজা আরতি ইত্যাদি ক্রিয়ারূপে করার জন্য ধর্মস্থানেই থেকে যায়। এইভাবে ভূত-প্রেত যোনিতে জন্ম হওয়ায় তার ভগবদপরাধের ফল পেয়ে যায় এবং

ভগবৎসম্বন্ধীয় ক্রিয়ার ফলও তীর্থস্থানাদিতে থাকায় পেয়ে যায়।

প্রশ্ন—যে ব্যক্তি ভগবৎনাম জপ, স্বাধ্যায় ইত্যাদি করে, সে কি মৃত্যুর পর ভূত-প্রেত হতে পারে ?

উত্তর—এইরূপ মানুষ সাধারণতঃ ভূত-প্রেত হয় না। কিন্তু নাম-জপে রুচির চাইতে যার সাংসারিক বিষয়াদি, নিজের সেবকদের এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী চলার লোকেদের ওপর বেশী মমতা বা আসক্তি হয় এবং মৃত্যুকালে সাধনে স্থিত না হয়ে সাংসারিক বিষয় এবং সেবাকারীর কথা মনে করে, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর ভূত-প্রেত হতে পারে। এরূপ ভূত-প্রেত কাউকে দুঃখ দেয় না বা কাউকে বিরক্ত করে না।

কর্মের গতি বড়ই দুর্জ্ঞেয়—**গহনা কর্মণো গতিঃ** (৪।১৭)। অতএব পাপ-পুণ্য, ভাব ইত্যাদির তারতম্যের ফলেও ভূত-প্রেতাদির যোনিতে জন্ম হতে পারে। ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে কর্ম এবং অকর্ম কি—এই বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতেরাও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যান, অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারেন না (৪।১৬)।

প্রশ্ন—দুর্ঘটনাতে মৃত ব্যক্তি বা আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি প্রায়ই ভূত-প্রেত কেন হয় ?

উত্তর—অসুখ হলে 'আমাকে মরতে হবে'—এইরূপ আশঙ্কা বা হুঁশ থাকে ; অতএব অসুস্থ ব্যক্তি সংসার থেকে বিমুক্ত হয়ে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু দুর্ঘটনার সময় মনে কিছু না কিছু মনোবাসনা, চিন্তা থাকে যেটি নিয়ে মানুষ হঠাৎ মারা যায়। যদি সেই সময়ে মনে কোন খারাপ ভাবনা থাকে, ভগবানের ভাবনা না থাকে, তাহলে ভূত-প্রেত হতে হয়। দুর্ঘটনার সময় আক্রমণকারীর প্রতি প্রতিহিংসার মনোভাব থাকায় সেই চিন্তা হতে থাকে, সেইজন্যও দুর্ঘটনাতে মৃত ব্যক্তি ভূত-প্রেত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সংসার বিমুখ হয়ে পারমার্থিক পথে চলে, সে দুর্ঘটনাদিতে মারা গেলেও ভূত-প্রেত হয় না। তাৎপর্য এই যে অন্তরে সাংসারিক অনুরাগ, আসক্তি, কামনা, মমতা আদি থাকলেই মানুষ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যার অন্তরে সংসারের প্রতি অনুরাগ, আসক্তি ইত্যাদি নেই সে যে কোন দেশে, যে কোন স্থানে, যে কোন সময়ে শরীর ত্যাগ করুক না কেন ভূত-প্রেত হবে না ; কারণ ভূত-প্রেত যোনিতে জন্মাবার মত নীচ মনোবৃত্তি তার অন্তঃকরণে থাকে না।

যে ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হয়ে বা কোনো কথায় দুঃখ পেয়ে আত্মহত্যা করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভূত-প্রেত-পিশাচ হয়ে থাকে। আত্মহত্যা করা মহাপাপ। কারণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্যই এই শরীরের সৃষ্টি ; অতএব ভগবৎপ্রাপ্তি না করে নিজের হাতে শরীরকে নষ্ট করা ভয়ানক পাপ, ভয়ংকর অপরাধ এবং অতীব দুরাচার। দুরাচরীর সদ্‌গতি হওয়া কঠিন। সুতরাং কখনো আত্মহত্যার চিন্তা মনে না আনা উচিত।

মানুষের যখন কোন বড় বিপদ আসে, ভয়ংকর কোন অসুখ হয়, তখন সে ভাবতে থাকে যে, 'আমি যদি মরে যাই তাহলে সব কষ্ট দূর হবে'। কিন্তু বাস্তবে আত্মহত্যা করলে কর্মের ভোগ বা কষ্ট সমাপ্ত হয় না, কোন না কোন যোনিতে জন্ম নিয়ে তাকে সেটি ভুগতেই হয়। আত্মহত্যার দ্বারা সে আর একটি নতুন পাপ কাজ করে, যার ফলে তাকে নীচ যোনিতে জন্ম নিতে হয়, ভূত-প্রেত হতে হয় এবং হাজার হাজার বছর ধরে দুঃখ পেতে হয়।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেত কোথায় থাকে ?

উত্তর—এরা প্রায়শঃ শ্মশানে এবং শ্মশানের বৃক্ষগুলিতে থাকে। পুকুর বা দীঘির পাড়ে বসবাস করে, দীঘির জল এরা খেতে না পারলেও, জলের ঠাণ্ডা হাওয়া এদের ভালো লাগে এবং তাতে এরা সুখ পায়। অশ্বত্থ গাছের স্বভাব সকলকে আশ্রয় দেওয়া, তাই এর ছায়াতেও তারা থাকে। কেউ তাদের নামে ঘর করে দিলে এরা তার মধ্যে থাকে। বাড়ি অনেকদিন খালি পড়ে থাকলেও ভূত-প্রেত সেখানে বসবাস করতে আরম্ভ করে।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেতের ভর হওয়া মানুষের শরীরের কোন্ দ্বার দিয়ে তারা প্রবেশ করে ?

উত্তর—ভূত-প্রেতের শরীর বায়ু-প্রধান, অতএব এরা যে কোন দ্বার দিয়েই মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এরা চোখ-কান-ত্বক ইত্যাদি যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এরা বেশীর ভাগ অশুচি দ্বার অর্থাৎ মলমূত্রের স্থান অথবা নিঃশ্বাস দ্বারা প্রবেশ করে।

প্রশ্ন—শরীরে প্রবেশ করে এরা কোথায় থাকে ?

উত্তর—এরা শরীরে প্রবেশ করে অহংবৃত্তি অর্থাৎ

অন্তঃকরণে থাকে।

'অহং' দুই প্রকারের হয়, ১) অহংভাব এবং ২) অহংবৃত্তি। অহংভাব জীবাত্মায় থাকে এবং অহংবৃত্তি অন্তঃকরণে থাকে। ভূত-প্রেত নিঃশ্বাস দ্বারা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে অহংবৃত্তিতে থেকে ইন্দ্রিয়ের স্থানগুলিকে কাজে লাগায়।

প্রশ্ন—শরীরে একের অধিক ভূত-প্রেত কি থাকতে পারে ?

উত্তর—হ্যাঁ, থাকতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির শরীরে একাধিক ভূত-প্রেত ঢুকে পড়ে। যখন তারা ঐ ব্যক্তির মুখ দিয়ে কথা বলে, তখন সবার পৃথক পৃথক আওয়াজ শোনা যায়।

প্রশ্ন—মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করে এরা কি সবসময় সেই শরীরেই বসবাস করে ?

উত্তর—এরা প্রায়শঃই আসা যাওয়া করে। ভূত-প্রেত ব্যক্তিটির কাছাকাছিই থাকে আবার হাওয়া নির্ভর হওয়ায় কখনো কখনো দূরেও চলে যায়। কোন কোন ভূত আবার সেই ব্যক্তির মধ্যেই সবসময় থাকে।

ভূত-প্রেত যে কোন ব্যক্তিকে দুঃখ দিতে বা যে কোন শরীরে প্রবেশ করার ব্যাপারে স্বাধীন নয়। এরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারে না। এরা যার অধীনে থাকে তার আদেশানুযায়ীই কাজ করে অর্থাৎ শাসকের ইচ্ছানুসারেই এরা কারো শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং কারোকে দুঃখ দেয়। যদি শাসক আদেশ না দেয় তাহলে কোন সময়েই এরা কারো শরীরে প্রবেশ করতে পারে না। যেমন, সুকর্মের ফলে যদি কেউ স্বর্গলোকে যায় এবং সে যদি মৃত্যুলোকের কারও সঙ্গে সম্পর্ক করতে চায় তাকে সেই লোকের শাসকের আজ্ঞানুসারেই তা করতে হয়। স্বাধীনভাবে সে মৃত্যুলোকে কারো সাথে বাক্যালাপও করতে পারে না। এইরূপ ভূত-প্রেতলোকেও শাসক থাকে, যার আদেশানুযায়ী ভূত-প্রেত সব কাজ করে।

যেমন নরকে ফুটন্ত তেলে জীবকে ফেলে দেওয়া হয়, তাদের শরীর টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়, তবুও যে পাপ কাজের জন্য এরা নরকগামী হয়েছে সেই কর্মভোগ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রাণীরা মরে না। তেমনি মানুষের কোন কুকর্ম ভোগের সময় এলে তাদের মধ্যে ভূত-প্রেত প্রবিষ্ট হয়। যতক্ষণ কর্মভোগ বাকী থাকে, ততক্ষণ যতই কিছু করা হোক, মন্ত্র-যন্ত্র ইত্যাদি প্রয়োগ করা হোক, ভূত-প্রেত ছাড়ে না। যখন কর্মভোগ শেষ হয়, তখন এরা নিজে থেকেই চলে যায়। তাৎপর্য এই যে, যার প্রারব্ধে দুঃখ ভোগ আছে, তার মধ্যেই ভূত-প্রেত প্রবেশ করে, তাকে দুঃখ দেয়।

এমন দেখা যায়, পূর্বপুরুষ কেউ মারা গেলে, আত্মীয়দের মধ্যে কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির শরীরেই সে প্রবেশ করে, সবার মধ্যে নয়। এর থেকে জানা যায় যে, যার সাথে তার দায়বদ্ধতা থাকে, তার মধ্যেই পিতৃপুরুষের প্রেত প্রবেশ করে। এইরূপ ভূত-প্রেতও তার মধ্যেই আসে যার সাথে তার দায়বদ্ধতা থাকে।

মানুষের আয়ু থাকলে ভূত-প্রেত কখনও তাকে মারতে পারে না। তার আয়ু শেষ হলে তবেই তাকে মারতে পারে। এই বিষয়ে আমি একটি ঘটনা শুনেছি। প্রায় একশো বছর আগেকার রাজস্থানের একটি ঘটনা। কিছু মুসলমান কসাইখানায় কিছু গোরু নিয়ে যাচ্ছিল। সেখানকার রাজা খবর পেয়ে নিজের সৈন্যদের পাঠালেন। সৈন্যরা মুসলমানদের মেরে গোরুগুলি ছাড়িয়ে নিল। এদের মধ্যে একটি মুসলমান মরে জিন হল এবং রাজার পিছনে লাগল। রাজা অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে ছাড়লো না। জিন বলতে লাগল 'আমি একটি লোকের জীবন নিয়ে তবে যাব'। অবশেষে এক রাজপুত বলল যে, 'আমি নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত'। জিন রাজাকে ছেড়ে দিল এবং তখনই সেই রাজপুতকে মেরে ফেলল। রাজপুতের উইল অনুযায়ী শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আগে তার মৃতদেহটি তার গুরুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। যখন লোকেরা রাজপুতের দেহটি গুরুর চারপাশে পরিক্রমা করে দাহ কার্য করার জন্য নিয়ে যেতে উদ্যত হল তখন গুরুর কাছে উপবিষ্ট এক সাধু গুরুকে বললেন, — 'শব কিছু না পেয়ে চলে যাচ্ছে, একে কিছু দেওয়া উচিত।' গুরু বললেন, 'কিছু করা সম্ভব নয়, এর আয়ু শেষ হয়ে গেছে।' তবুও বিবেচনা করে দু'জনে নিজেদের আয়ু থেকে বারো বছর আয়ু দিয়ে রাজপুতকে জীবিত করলেন। এর তাৎপর্য এই যে রাজার আয়ু পুরো হয়নি, তাই জিন রাজাকে মারতে পারে নি, কিন্তু রাজপুতের আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই জিন তাকে মেরেছিল।'

প্রশ্ন—মৃগীরোগী এবং ভূত আবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে

প্রায়শঃ একই ধরনের লক্ষণ দেখা যায়, তাদের চেনার উপায় কি ?

উত্তর—মৃগীরোগীর প্রায়ই মূর্ছা হয় কিন্তু ভূতে ধরা লোক মূর্ছা যায় না। তারা কিছু না কিছু বলতেই থাকে। মৃগীরোগীর দেহে একটি জীবাত্মাই থাকে, কিন্তু ভূতে ধরা শরীরে জীবাত্মার সঙ্গে প্রেতাত্মাও থাকে, যে আবিষ্ট ব্যক্তিটিকে নানাপ্রকারে দুঃখ দেয়, জ্বালাতন করে। মৃগীরোগগ্রস্ত ব্যক্তি ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি ওষুধে ঠিক হয় না।

প্রশ্ন—যে সব তান্ত্রিক ভূত-প্রেতের বাধা দূর করেন, মৃত্যুর পর তাদের কি গতি হয় ?

উত্তর—ভূত-প্রেতের বাধা দূরকারী তান্ত্রিকেরা মৃত্যুর পর প্রায়শই ভূত-প্রেত হয়ে জন্মায় ; তার অনেক কারণ থাকে, যেমন—

১) ভূত-প্রেতকে দূর করে যে সমস্ত তান্ত্রিক, তাদের বিদ্যা প্রায়ই মলিন হয়। তাদের খাওয়া-দাওয়া এবং চিন্তাও মলিন হয়। এই মলিনতার কারণেই তারা দুর্গতিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়।

২) ভূত-প্রেত কারো শরীরে প্রবেশ করলে, সেখানে সে সুখ পায়, খাওয়া-দাওয়ার জন্য ভালো জিনিস পায় ; সেইজন্য সে সেখান ছেড়ে যেতে চায় না। কিন্তু তান্ত্রিকেরা জোর করে সেখান থেকে তাদের দূর করে সুরার বোতলে ভরে মাটিতে পুঁতে ফেলে অথবা কোন গাছের মধ্যে মন্ত্র দ্বারা প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়, সেখানে এরা বহু বছর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ভীষণ কষ্ট পায়। তাদের এরূপ দুঃখ দেওয়া খুব অন্যায় কাজ। কাউকে দুঃখ দেওয়াই পাপ। তাই এই পাপের ফলস্বরূপ এই সব তান্ত্রিকেরা মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়।

৩) যারা ভূত-প্রেতের বাধা দূর করে সেইসব তান্ত্রিকদের প্রায়শই অপরের হিতসাধনের মনোভাব থাকে না। তারা শুধুমাত্র টাকা-পয়সার জনাই এই কাজ করে। তারা প্রতারণা এবং চালাকীও করে। সেইজন্য মৃত্যুর পরে তাদের ভূত-প্রেতের যোনিতে যেতে হয়।

যদি তান্ত্রিকদের মনে নিঃস্বার্থভাবে সকলের মঙ্গল করার, উপকার করার চিন্তা থাকে অর্থাৎ যাকে ভূত-প্রেতে ভর করেছে, তাকে মুক্ত করার এবং ভূত-প্রেতকে দেহ থেকে বাইরে এনে গয়াশ্রাদ্ধ ইত্যাদির দ্বারা সদ্গতি করার চিন্তা থাকে, চেষ্টা থাকে, তাহলে এমন তান্ত্রিকের প্রেতযোনিতে জন্ম হয় না। যার মনে সকলের জন্য মঙ্গল চিন্তা থাকে তার কখনও দুর্গতি হতে পারে না। ভগবান বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীর হিতে রত থাকে, সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়'—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (১২।৪)।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেতেদের বোতলে বদ্ধ হওয়া বা মন্ত্র দ্বারা পেরেকের সাহায্যে বৃক্ষে বন্দী হওয়া ইত্যাদি কি তাদেরই কর্মের জন্য, না যারা এই কাজ করে, তারাই এসবের কারণ ?

উত্তর—মুখ্যতঃ তাদের কর্মই এর কারণ। তাদের কোন পাপকর্মের ফলভোগ উপস্থিত হয়, তার জন্য এরা ধরা পড়ে। যদি তাদের ভাগ্যে না থাকে, তবে এদের কেউ ধরতে পারে না। কিন্তু যারা এদের বোতলে বা বৃক্ষাদিতে ধরে রাখার কাজ করে থাকে, তারা খুবই পাপ করে। সুতরাং মানুষের কখনও ভূত প্রেতকে বন্ধন বা মন্ত্র দ্বারা বৃক্ষে বন্দী করার কাজে নিমিত্ত হয়ে পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, তাদের উদ্ধারের জন্য তাদের নাম করে ভাগবত-সপ্তাহ, গয়াতে শ্রাদ্ধদান, ভগবৎনাম জপ ইত্যাদি করা উচিত অথবা এই সকল ভূত-প্রেত তাদের মুক্তির জন্য যে উপায় জানায়, তাই করা উচিত। যারা এইপ্রকার প্রেতাত্মাদের সদ্গতি করে বা করায়, তাদের খুব পুণ্য হয় এবং দুঃখী প্রেতাত্মারা প্রেতযোনি থেকে মুক্তি পেয়ে আশীর্বাদ করে।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেতেদের পেরেকের সাহায্যে বৃক্ষাদিতে আবদ্ধ করে তান্ত্রিকেরা তাদের কর্মফল ভোগ করতে তো সাহায্যই করে, তাহলে তান্ত্রিকদের কেন পাপ হয় ?

উত্তর—তান্ত্রিকরা যে পেরেকের সাহায্যে বৃক্ষাদিতে আবদ্ধ করে বা মাটিতে পুঁতে দেয়, তা সেই ভূত প্রেতেদের কর্মফলের ভোগ তো নিশ্চয়ই ; কিন্তু যারা তাদের মন্ত্র দ্বারা বদ্ধ করে, তাদের নতুন পাপ কর্ম যুক্ত হয়, যার শাস্তি তারা পরে পায়। যেমন, কেউ যখন কোন পশু হত্যা করে, সেই পশুটির মৃত্যুর সময় হয়েছিল বলেই সে মরে কারণ তার মৃত্যুর সময় না হলে কেউ তাকে মারতে পারে না। কিন্তু যে তার মৃত্যুর কারণ হয়, সে নতুন পাপভাগী হয়। কেননা সে লোভ, কামনা, স্বার্থাদির জন্যই সেই পশুটিকে হত্যা করে। কামনা রেখে

করা কোনও শুভকর্ম যদি বন্ধনের কারণ হতে পারে, তাহলে কামনা দ্বারা কৃত অশুভকর্ম তো তাকে পাপে বদ্ধ করবেই।

তাৎপর্য এই যে কাউকে দুঃখ দেওয়া, কষ্ট দেওয়া, মারা ইত্যাদি মানুষের কর্তব্য নয়, প্রত্যুত অকর্তব্যই। মানুষ কামনাবশেই অকর্তব্যে প্রবৃত্ত হয় (৩।৩৭)। সুতরাং মানুষের কামনা, স্বার্থ ইত্যাদি ত্যাগ করে সকলের হিতের জন্য কাজ করা উচিত।

প্রশ্ন—যে সব ভূত-প্রেতদের বোতলে বদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং মন্ত্র দিয়ে পেরেকের সাহায্যে বৃক্ষাদিতে বদ্ধ করে রাখা হয়েছে, তারা কতদিন সেখানে বন্দী থাকে ?

উত্তর—মন্ত্রশক্তিরও একটা সীমা থাকে, সময় থাকে। সময় পুরো হলে যখন মন্ত্রের শক্তি শেষ হয়ে যায় বা সেই প্রেতটির কর্মভোগ প্রেতযোনির সমাপ্তি হয়ে যায়, তখনই কেবল সেই প্রেতটি সেখান থেকে মুক্তি পায়। যদি তাদের ভোগসীমার মধ্যে কেউ অজানতে বৃক্ষ থেকে সেই পেরেক হটিয়ে দেয়, জমি চাষ করতে গিয়ে যদি বোতল ভেঙ্গে যায় বা গাছ ভেঙ্গে পড়ে তাহলে সেই প্রেত সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে যায় ও নিজের স্বভাব অনুসারে পুনরায় অপরকে দুঃখ দিতে আরম্ভ করে।

প্রশ্ন—যদি কোন ব্যক্তি গাছের সেই পেরেক তুলে দেয় বা জমিতে পোঁতা বোতলটি ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে তাতে বন্দী ভূতেরা ঐ ব্যক্তির ওপর ভর করে না তো ?

উত্তর—বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে ভূত-প্রেত ঐ ব্যক্তিকে ভর করতেও পারে, তাই কোন ব্যক্তির এমন কাজ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি ভগবৎপরায়ণ, যে ভগবানের আশ্রয়ে আছে, শ্রীহনুমানের আশ্রয়ে আছে, সে যদি ভূত-প্রেতদের ঐসব বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে, তাহলে ভূত তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। উল্টে তাদের দর্শন করলে ঐ ভূত-প্রেত উদ্ধার হয়ে যায়। সাধু-মহাত্মাগণ অনেক ভূত-প্রেতকে মুক্তি দিয়েছেন।

প্রশ্ন—কিছু তান্ত্রিক আছে যারা ভূত-প্রেতদের নিজের বশে এনে তাকে দিয়ে নিজের ঘরের, চাষের কাজ করায়, এরূপ করা উচিত না অনুচিত ?

উত্তর—কোন জীবকে বশে রাখা মানুষের উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, কোন ব্যক্তিকে মজুরী দিয়ে যেমন কাজ করানো হয়, তেমনি ভূত-প্রেতদের খাদ্য ঠিকমতো দিয়ে খুশী করে তাদের দিয়ে কাজ করালে কোন দোষ নেই। কিন্তু যেসব সাধক পারমার্থিক সাধনায় থাকেন, তাঁদের এরূপ করা উচিত নয়। যারা সংসারপঙ্কে জড়িয়ে থাকতে চায়, এইসব কাজ তারাই করে।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেতেরা খাদ্য কি ভাবে পায় ? এরা কিসে তৃপ্ত হয় ?

উত্তর—ভূত-প্রেতের শরীর বায়ুপ্রধান ; তাই আতর ইত্যাদি সুগন্ধে তারা তৃপ্ত হয় এবং তারা তাতেই অত্যন্ত খুশী হয়ে যায়। তার নাম করে কোন ব্রাহ্মণ বা নিজ ছোট বোন, মেয়ে বা বোনের মেয়েকে ভালো ভালো মিষ্টি খাওয়ালেও এতে তাদের তৃপ্তি হয়ে যায়।

দশ-বারো বছরের একটি ছেলে জলে ডুবে মারা যায় এবং প্রেতযোনি লাভ করে। সে তার বোনের মধ্যে ভর করত এবং নিজের দুঃখের কথা শোনাত। একদিন সে বোনের মধ্যে এল এবং বলল, 'আমি খুব ক্ষুধার্ত'। ছেলেটির পরিজনেরা তখন তার নামে এক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাল। ব্রাহ্মণ খেতে থাকলে, খাবার সময় তার মুখ যখন চর্বণ করতে আরম্ভ করল, অন্যঘরে বসে থাকা সেই ছেলেটির বোনের মুখও তেমনি চর্বণ করতে থাকল। ব্রাহ্মণের ভোজন শেষ হলে প্রেতটি তার বোনের মুখ দিয়ে বলল, 'আমার তৃপ্তি হয়েছে'। সুতরাং প্রেতাত্মার নামে যদি কোন শুদ্ধ-পবিত্র ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হয়, তবে সেই ভোজন প্রেতটির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

কাছেই পুকুর, নদী বয়ে যাচ্ছে, এই জল প্রেতরা দেখে, কিন্তু সে সেই জল পান করতে পারে না, পিপাসার্তই থাকে। স্নানের পর কোনো প্রেতের নামে বা 'অজ্ঞাতনামা প্রেতাত্মার জল প্রাপ্তি ঘটুক'— এই ভাব নিয়ে আর্দ্রবস্ত্র কোন স্থানে নিংড়ে দিলে প্রেত সেই জল পান করে নেয়। শৌচের অবশিষ্ট কোন কাঁটাগাছ বা আখগাছে ঢেলে দিলে সেই জল পান করে প্রেত তৃপ্ত হয়।

তুলসীদাস যখন শৌচে যেতেন, প্রতিদিন ফেরার সময় অবশিষ্ট জলটি একটি কাঁটাগাছে ঢেলে দিতেন। ঐ গাছে একটি প্রেত বাস করত, যে সেই অশুদ্ধ জল পান করত। একদিন সেই প্রেতটি তুলসীদাসের সামনে হাজির হয়ে বলল, 'আমি পিপাসায় কাতর হয়ে মরে যাচ্ছিলাম, তোমার জলে এখন আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছি। তুমি যা

আমার কাছে নিতে চাও, চেয়ে নাও'। তুলসীদাস মহারাজের ভগবদ্‌দর্শনের একান্ত আগ্রহ হয়েছিল, তাই তিনি বললেন, 'আমাকে ভগবান রামের দর্শন পাইয়ে দাও।' প্রেতটি বলল, 'দর্শন তো আমি করাতে পারব না, তবে তার উপায় বলতে পারি।' তুলসীদাস বললেন, 'ঠিক আছে, তাই বলো।' সে বলল, 'ঐস্থানে রাত্রে রামায়ণী কথা হয়, সেই কথা শোনার জন্য হনুমান আসেন। তুমি তাঁর পা ধরে থেকো, তিনি তোমাকে ভগবদ্দর্শন করিয়ে দেবেন।' তুলসীদাস বললেন, 'সেখানে তো নিশ্চয়ই অনেক লোক আসে, তার মধ্যে হনুমানকে কীভাবে চিনব ?' প্রেতটি বলল, 'হনুমান কুষ্ঠরোগীর রূপ ধরে এবং অত্যন্ত ময়লা, কুঁচকানো কাপড় পরে আসেন এবং কথা সমাপ্ত হলে সকলে চলে যাবার পর চলে যান। তুলসীদাস প্রেতের কথামত কাজ করলেন এবং তাতে তাঁর হনুমানের দর্শন হল এবং হনুমান ভগবান রামের দর্শন পাইয়ে দিলেন—

তুলসী নফা পিছানিয়ে, ভলা বুরা ক্যা কাম।
প্রেতসে হনুমত মিলে, হনুমত সে শ্রীরাম॥

প্রেতের নাম করে যদি জল ও পিণ্ড দেওয়া হয় বা কোন ব্রাহ্মণকে ছাতা ইত্যাদি দেওয়া হয় তাহলে তা সেই প্রেতই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যার নামে ছাতা উৎসর্গ করা হয়, তার সাথী কোন প্রেত যদি প্রবল পরাক্রমস্ত হয়, তবে সে মাঝপথে তা ছিনিয়ে নেয়, তাকে পেতে দেয় না। তাই যাকে দেওয়া হবে তার নামে জল ও পিণ্ড ইত্যাদি যদি খুব বিধি অনুসারে দেওয়া হয়, তবেই সে সেই সব সামগ্রী পায়।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেতের বাধা দূর করার উপায় কি ?

উত্তর—প্রেতবাধা দূর করার অনেক উপায় আছে, যেমন—

১) শুদ্ধ পবিত্র হয়ে, সামনে ধূপ জ্বালিয়ে পবিত্র আসনে বসতে হবে এবং হাতে জলের পাত্র নিয়ে 'শ্রীনারায়ণকবচ' (শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ ৬, অধ্যায় ৮এ আছে) পুরো পাঠ করে জলের পাত্রে ফুঁ দিতে হবে। এইভাবে কমপক্ষে একুশবার পাঠ করতে হবে এবং প্রত্যেক পাঠের শেষে জলপাত্রে ফুঁ দিয়ে যেতে হবে, তারপর সেই জলটি ভূতে ধরা ব্যক্তিকে পান করাতে হবে এবং কিছু জল তার গায়ে ছেটাতে হবে।

২) গীতাপ্রেস থেকে প্রকাশিত 'রামরক্ষাস্তোত্র' বইটিতে দেওয়া বিধি অনুসারে সিদ্ধ করে নিয়ে এবং রামরক্ষাস্তোত্র পাঠ করতে করতে ভূতে ধরা ব্যক্তিটিকে ময়ূরের পাখা দিয়ে ঝাড়তে হবে।

৩) শুদ্ধ পবিত্র হয়ে 'হনুমানচালীসা' সাত, একুশ বা একশো আটবার পাঠ করে জলকে অভিমন্ত্রিত করতে হবে এবং সেই জল ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে পান করাবে।

৪) গীতার **'স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা ------'** (১১।৩৬)—এই শ্লোকটি একশো আটবার পাঠ দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে পান করাবে।

৫) প্রেতগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভাগবতের সপ্তাহ-পারায়ণ শোনান উচিত।

৬) প্রেতের কাছ হতে তার নাম পরিচয় জেনে কোন শুদ্ধ পবিত্র ব্রাহ্মণকে দিয়ে ঠিকমতো বিধিপালনপূর্বক গয়া শ্রাদ্ধ করানো উচিত।

৭) প্রেতাবিষ্ট ব্যক্তির নিকট গীতা, রামায়ণ, ভাগবত রাখবে এবং তাকে 'বিষ্ণুসহস্রনাম' শোনাবে।

৮) যে স্থানে ভক্তিপূর্বক যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে গায়ত্রী মন্ত্রের পুরশ্চরণ, বেদপাঠ, পুরাণের কথা হয়, সেখানে প্রেতগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া উচিত। সেই স্থানে গেলেই প্রেতটি মানুষের শরীর থেকে বাইরে বের হয়ে পড়ে, কেননা ভূত-প্রেত কোনো পবিত্র স্থানে থাকতে পারে না। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে কিছুদিন সেখানে রেখে তাকে দিয়ে ভগবৎনামজপ, হনুমানচালীসা পাঠ, সুন্দরকাণ্ড পাঠ ইত্যাদি করানো উচিত যাতে প্রেত তার শরীরে পুনঃ প্রবেশ না করতে পারে। এরূপ না করলে প্রেতটি সেই স্থানের আশপাশেই ঘোরাফেরা করতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি সেই স্থান ত্যাগ করা মাত্র আবার তাকে ধরে নেয়।

৯) ষোলো কোষ্ঠকের **'চৌতীসা যন্ত্র'** সিদ্ধ করে নেবে[১] এবং মঙ্গলবার বা শনিবার কোন একদিন আগুনে-শুকনো নারিকেল, ঘি, যব, তিল এবং সুগন্ধী দ্রব্য ইত্যাদির দ্বারা ১০৮ বার আহুতি দেবে। প্রত্যেক বার

[১] চৌতীসা (চৌত্রিশ) যন্ত্র এবং তা লেখবার তথা সিদ্ধ করার বিধি—

আহুতি দেবার সময় বলবে, 'স্থানে হৃষীকেশ'---- (১১।৩৬), এবং প্রত্যেকটি আহুতি দেবার পর আগুনের ওপর 'চৌতীসা যন্ত্র' ঘোরাবে। পরে এই যন্ত্রটি তাবিজে ভরে লাল বা কালো সূতার দ্বারা প্রেতগ্রস্ত ব্যক্তির গলায় পরিয়ে দেবে।

শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসপূর্বক করলে কোন একটি উপায়ে প্রেতবাধা দূর হতে পারে। এইপ্রকার অনুষ্ঠানে প্রারব্ধের বলবত্তার প্রভাব পড়ে। যদি প্রারব্ধের চেয়ে অনুষ্ঠান বলবান হয়, তাহলে লাভ পুরো হয় অর্থাৎ কার্য সিদ্ধ হয় ; কিন্তু অনুষ্ঠানের থেকে যদি প্রারব্ধ বলবান হয়, তাহলে লাভ অল্প হয়, পুরো হয় না।

প্রশ্ন—ব্রহ্মদৈত্য (জিন) থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি ?

উত্তর—(ক) যে ব্যক্তি তৎপরতার সঙ্গে ভগবৎ ভজনা করেন, যাঁর সাধনার অগ্রগতি হয়েছে, যাঁর ভজন এবং স্মরণের জোর আছে, এইরূপ ব্যক্তির কাছে গেলে ব্রহ্মদৈত্য চলে যায়, কারণ ভাগবতী শক্তির সামনে তার শক্তি কাজ করে না।

(খ) ব্রহ্মদৈত্য ভর করা ব্যক্তি যদি কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট যায়, তবে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মদৈত্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যায় এবং সেই ব্রহ্মদৈত্যও মুক্তিলাভ করে।

(গ) যদি ব্রহ্মদৈত্য গয়াশ্রাদ্ধে আগ্রহী থাকে, তাহলে তার নামে গয়াতে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য, এর দ্বারা সে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেত কাদের কাছে আসে না ?

উত্তর—ভূত-প্রেতের সম্বন্ধ বা জোর সেইসব লোকের উপরই থাকে, যাদের সঙ্গে তাদের পূর্বজন্মের লেনদেন ছিল বা যাদের প্রারব্ধ খারাপ অথবা যেসব ব্যক্তি ভগবানের (পারমার্থিক) পথে বিচরণ করে না অথবা যাদের খাওয়া-দাওয়া অশুদ্ধ বা যারা স্নানাদিতে শুদ্ধি রাখে না বা যাদের আচরণ খারাপ। যাঁরা ভগবৎপরায়ণ, ভগবৎনাম জপ-কীর্তন করেন, ভগবৎকথা শোনেন, খাওয়া-দাওয়া-স্নানাদিতে শুদ্ধি রাখেন, যাঁদের আচরণ শুদ্ধ, তাঁদের কাছে ভূত-প্রেত প্রায়শঃ আসতেই পারে না।

যাঁরা প্রত্যহ শ্রদ্ধা সহকারে গীতা, ভাগবত, রামায়ণ ইত্যাদি সদ্গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁদের কাছেও ভূত-প্রেত যায় না। কিন্তু কিছু ভূত-প্রেত এমনও আছে যারা নিজেরাই গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি পাঠ করে। এরূপ ভূত সদ্গ্রন্থ পাঠকারীর কাছে গেলেও তাদের কষ্ট দিতে পারে না। যদি এইরূপ ভূত-প্রেত সদ্গ্রন্থ পাঠকারীর নিকটে আসে, তাহলে তাকে অনাদর করতে নেই ; কারণ অনাদর, অবহেলাতে এরা রেগে যায়।

যিনি প্রত্যহ গঙ্গাজলের চরণামৃত পান করেন, তাঁর কাছেও ভূত-প্রেত আসে না। হনুমানচালীসা বা বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ যারা করেন, তাদের কাছেও ভূত-প্রেত আসে না। একবার দুই ভদ্রলোক গরুর গাড়ীতে করে অন্য গ্রামে যাচ্ছিল। রাস্তাতে এক পিশাচ তাদের গাড়ীর সঙ্গ নিল। এই দেখে ভদ্রলোক দুজন ভয় পেয়ে গেল। একজন তখন বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করতে আরম্ভ করে। যতক্ষণ গাড়ী অপর গ্রামের সীমার কাছে না এল,

---

৯	১৬	৫	৪
৭	২	১১	১৪
১২	১৩	৮	১
৬	৩	১০	১৫

এই যন্ত্রকে সাদা কাগজ বা ভূর্জপত্রের ওপর আনারের কলম দিয়ে অষ্টগন্ধ (শ্বেত চন্দন, লাল চন্দন, কেশর, কুঙ্কুম,কর্পূর, কস্তুরী, অগর এবং তগর) দ্বারা লিখতে হবে। এই যন্ত্রে এক থেকে ষোল পর্যন্ত অঙ্কর আছে, কোনটি বাদ পড়েনি বা কোনটি দ্বিতীয়বার আসেনি। যন্ত্রটি লেখার সময় ১, ২ ইত্যাদি ক্রমানুসারে লিখবে।

এটি সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ বা দীপাবলীর রাত্রে ১০৮-বার লিখলে সিদ্ধ হয়। শীঘ্র সিদ্ধ করতে হলে কোন শনিবারে ধোবীঘাটে বসে যন্ত্রগুলি একে একে লিখে ধোবীর জলভরা গামলায় ফেলবে। এইভাবে ১০৮ টি যন্ত্র গামলায় ফেলার পর সেখান থেকে তুলে প্রবাহিত জলে ফেলবে। এরূপ করলে যন্ত্র সিদ্ধ হয়। যন্ত্র সিদ্ধ হলেও প্রত্যেক গ্রহণ এবং দীপাবলী ও হোলীর রাত্রিতে যন্ত্র ১০৮বার লিখবে ও নদীতে দেবে। (এই যন্ত্রকে 'চৌতীসা যন্ত্র' এজন্য বলা হয়, ৬৪ ভাবে গণনা করলেও এটির যোগফল ৩৪ হবে)। চৌতিসা যন্ত্রের এখানে মাত্র একটি প্রকার করা হয়েছে, এই যন্ত্রটি ৩৮৪ রকমে তৈরী করা যায়।

ততক্ষণ পিশাচ গাড়ীর পিছন পিছন চলছিল, গ্রামের সীমা আসতেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিষ্ণুসহস্রনামের প্রভাবে সে গাড়ী আক্রমণ করতে পারেনি।

যার গলায় তুলসী, রুদ্রাক্ষ বা বদ্ধ পারার মালা থাকে ভূত-প্রেত তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এক ভদ্রলোক ভোর চারটে নাগাদ ঘোড়ায় করে কোন এক প্রয়োজনে অন্য গ্রামে যাচ্ছিল। শীতের দিন, সূর্যোদয় হতে তখনো প্রায় দেড় ঘন্টা বাকী। সেই ব্যক্তি যেতে যেতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছল, যেটি ভূত-প্রেতের অবস্থান হেতু কুখ্যাত ছিল। সেখানে পৌঁছতেই লোকটির সামনে হঠাৎ একটি ভূত গাছের মত বিরাট আকার ধারণ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘোড়া ভয় পেয়ে লাফ মারতে লোকটি ঘোড়া থেকে পড়ে গেল এবং তার দুটি হাতই মচকে গেল। সেই লোকটি অত্যন্ত সাহসী ছিল, তাই পিশাচকে দেখেও ভয় পায়নি। যতক্ষণ না সূর্যোদয় হল, ততক্ষণ পিশাচ সেই লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকল, কিন্তু ভদ্রলোকের ওপরে কোন অত্যাচার করেনি এবং স্পর্শও করতে পারেনি, কারণ ভদ্রলোকের গলায় তুলসী মালা ছিল। সূর্যোদয় হলে পিশাচ অদৃশ্য হয়ে গেল এবং লোকটিও ঘোড়ায় করে নিজের বাড়ী ফিরে এল।

সূর্যাস্তের পর থেকে অর্দ্ধেক রাত পর্যন্ত এবং দুপুরের সময়ে ভূত-প্রেতের শক্তি বেশী থাকে এবং তারা বেশী জোর খাটাতে পারে। সকলেই অনুভব করেন যে রাত্রি এবং মধ্যাহ্ন সময়ে শ্মশানাদি স্থানে যেতে যেমন ভয় লাগে, সন্ধ্যা বা সকালে গেলে সেরকম লাগে না। যদি রাত্রে বা মধ্যাহ্নে কোন নির্জন স্থানে যেতে হয় এবং সেখানে পেছন থেকে কেউ ডাকে বা বলে 'আমি যাব', তাহলে কোন উত্তর দেওয়া উচিত নয় এবং চলতে চলতে ভগবৎনাম জপ, কীর্তন, বিষ্ণুসহস্রনাম এবং হনুমানচালীসা, গীতা ইত্যাদি পাঠ শুরু করে দেওয়া উচিত। উত্তর না দিলে প্রেত সেখানেই থেকে যাবে। আমরা যদি উত্তর দিই, বলি 'হ্যাঁ এসো' তাহলে সে আমাদের পিছন ধরবে।

ভূত-প্রেত যেখানে থাকে সেখানে প্রস্রাব করলেও তারা সেই লোকটিকে ভর করে, কেননা তাদের স্থানে প্রস্রাব করা অন্যায়। সুতরাং যে কোন স্থানে প্রস্রাব করা উচিত নয়।

দুর্গতিতে পড়ে আমাদের যাতে প্রেতযোনিতে যেতে না হয় এই সাবধানতার জন্য এবং যাতে গয়াশ্রাদ্ধ করে পিণ্ডজল দিয়ে প্রেতাত্মাদের উদ্ধারের প্রেরণা জাগে সেজন্য এইস্থানে প্রেত-বিষয়ক চর্চা করা হল।

♠ ♠ ♠

(৯) গীতায় আহারীর বর্ণনা

রস্যস্নিগ্ধাদিষু প্রীতিঃ সাত্ত্বিকানাং স্বভাবতঃ। তীক্ষ্ণরুক্ষাদিষু প্রীতী রাজসানাং সুদুঃখদা॥
যাতযামাদিষু প্রীতিস্তামসানাং স্বভাবজা। আহারিণঃ পরীক্ষার্থমাহারা বর্ণিতাস্ততঃ॥

মানুষের যে স্বাভাবিক বৃত্তি, স্থিতি, ভাব তৈরী হয়, সেটি তৈরী হওয়ার পিছনে কিছু কারণ থাকে, তার মধ্যে আহারও একটি কারণ। কথিত হয় 'যেমন অন্ন খাবে, তেমন মন হবে'। সুতরাং আহার যত সাত্ত্বিক হয়, মানুষের বৃত্তিও ততই সাত্ত্বিক হয় অর্থাৎ সাত্ত্বিক বৃত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করে সাত্ত্বিক আহার।

গীতায় খাদ্যের আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়নি, প্রত্যুত আহারী বা ব্যক্তির বর্ণনা হলে সেখানে আহারেরও বর্ণনা এসে যায়। যেমন সাত্ত্বিক ব্যক্তির প্রিয় বলে সাত্ত্বিক আহারের, রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় বলে রাজসিক আহারের এবং তামসিক ব্যক্তির প্রিয় বলে তামসিক আহারের বর্ণনা করা হয়েছে (১৭।৮-১০)। সুতরাং গীতায় যেখানে খাদ্যের কথা এসেছে, সেখানে ভগবান আহারী অর্থাৎ ব্যক্তিটির কথা বর্ণনা করেছেন ; যেমন **'নিয়তাহারাঃ'** (৪।৩০) পদ দ্বারা নিয়মিত আহারকারী **'নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ'** (৬।১৬) পদদ্বারা অধিক ভোজনকারী এবং অত্যল্প ভোজনকারী, **'যুক্তাহারবিহারস্য'** (৬।১৭) পদদ্বারা নিয়মিত ভোজনকারী **'যদশ্নাসি'** (৯।২৭) পদে ভোজ্য পদার্থ ভগবানে অর্পণকারী, এবং **'লঘ্বাশী'** (১৮।৫২) পদদ্বারা

অল্প ভোজনকারীর বর্ণনা করা হয়েছে।

গীতাতে যে তিনটি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) বর্ণনা করা হয়েছে তাতেও তারতম্য থাকে। সাত্ত্বিক মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হলেও সঙ্গে রাজসিক-তামসিক ভাব থাকে। রাজসিক মানুষের মধ্যে রজোগুণ প্রাধান্য পেলেও সঙ্গে সাত্ত্বিক ও তামসিক ভাব থাকে, তেমনি তামসিক মানুষের মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য থাকলেও সঙ্গে সাত্ত্বিক-রাজসিক ভাবও থাকে। এর কারণ এই যে সম্পূর্ণ সৃষ্টিই ত্রিগুণাত্মক (১৮।৪০)। দুটি গুণকে দমিত করে একটি গুণ প্রধান হয়ে ওঠে (১৪।১০)। সুতরাং সাত্ত্বিক মানুষের সাত্ত্বিক পদার্থ স্বাভাবিকভাবে প্রিয় লাগলেও তিনটি গুণের মিশ্রণ থাকার ফলে অথবা প্রথমে রাজসিক ও তামসিক ভোজ্য গ্রহণের অভ্যাসে অথবা শরীরে কোন পদার্থ কম হলে অথবা শরীর অসুস্থ হলে কখনও রাজসিক-তামসিক খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা হয়। যেমন খুব নুন বা নোন্তা জিনিস খাবার ইচ্ছা হয় বা আধাপক্ক শাক ইত্যাদি খেতে মনে ইচ্ছা আসে।

রাজসিক ব্যক্তির রাজসিক পদার্থ স্বাভাবিকভাবে প্রিয় লাগলেও তিনটি গুণের সংমিশ্রণ থাকায় অথবা আগে সাত্ত্বিক-তামসিক পদার্থ খাবার অভ্যাসে কিংবা অন্য কোন কারণবশতঃ কখনো কখনো সাত্ত্বিক-রাজসিক পদার্থের ইচ্ছা হয়ে থাকে। যেমন প্রথমে দুধ, কাজু, পেস্তা, বাদাম ইত্যাদি খাওয়া হয়েছে এবং অসুস্থতার জন্য শরীর কমজোরী বা দুর্বল হলে বল বাড়াবার জন্য ঐসব সাত্ত্বিক দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা হয়। এরকমই কখনো কখনো রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি তামসিক পদার্থ খাবার ইচ্ছা জাগে।

তামসিক মানুষের তামসিক পদার্থ স্বাভাবিকভাবে প্রিয় লাগলেও কখনো শরীর দুর্বল হলে বা অন্য কোন কারণেও দুধ, ঘি প্রভৃতি সাত্ত্বিক এবং টক, নোন্তা প্রভৃতি রাজসিক পদার্থ খাবার ইচ্ছা জাগে।

সাত্ত্বিক ব্যক্তির পূর্বসংস্কারের জন্য রাজসিক-তামসিক খাদ্য ভোজনের ইচ্ছা হলেও তিনি তা করেন না, কেননা সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকায় তাঁর বিবেক জাগ্রত থাকে, বিবেকই তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত করে। শুধু তাই নয়, সাত্ত্বিক পদার্থ স্বাভাবিকভাবে প্রিয় হলেও তাঁর মনে সাত্ত্বিক পদার্থের জন্য প্রবল ইচ্ছা থাকে না। তীব্র বৈরাগ্য হলে সাত্ত্বিক পদার্থের প্রতিও উপেক্ষা জন্মায়। রাজসিক মানুষও শরীর পুষ্ট ও ঠিক রাখার পক্ষে উপযোগী সাত্ত্বিক ও তামসিক খাদ্য পছন্দ করে। রাগের (আসক্তির) প্রাধান্য থাকায় এই ইচ্ছা বা পছন্দ ঐসব পদার্থ সেবন করতে তাকে বাধ্য করে। তামসিক ব্যক্তিদেরও সাত্ত্বিক ও রাজসিক মানুষের সাহচর্যে সাত্ত্বিক ও রাজসিক পদার্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা বা রুচি হয়। কিন্তু মোহ এবং মূঢ়তার প্রাধান্য থাকায় এই ইচ্ছা তাদের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে না।

সাত্ত্বিক ব্যক্তি যদি সাত্ত্বিক ভোজ্য পদার্থ রাগপূর্বক বেশী মাত্রায় সেবন করে, তবে সেই ভোজন রাজসিক হয়, যা পরিণামে দুঃখ, শোক এবং রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে অধিক মাত্রায় কোন পদার্থ সেবন করে, তবে সাত্ত্বিক ভোজনও তামসিক হয়ে যায় যা অধিক নিদ্রা এবং আলস্যের কারণ হয়।

রাজসিক মানুষও যদি আসক্তিপূর্বক রাজসিক ভোজন করে, তাহলে পরিণামে রোগ, পেট জ্বালা ইত্যাদি হবে। যদি ঐসব পদার্থ অধিক মাত্রায় সেবন করে, তাহলে জ্বালা, দুঃখ, রোগাদির সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা, আলস্য ইত্যাদিও বেড়ে যাবে। কিন্তু ঐ খাদ্যই সে বিচার-বিবেচনাপূর্বক অল্পমাত্রায় যদি নেয়, তাহলে তার পরিণাম রাজস (দুঃখ-শোক) না হয়ে সাত্ত্বিক হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণে নির্মলতা, শরীর হাল্কা, প্রফুল্লতা ইত্যাদি হয়। ঘুম কম পাবে এবং আলস্য হবে না, কেননা সে যুক্তাহার করেছে।

তামসিক মানুষ যদি মোহপূর্বক তামসিক ভোজন করে, তাতে তামসিক বৃত্তি অত্যন্ত বেড়ে যায়। যদি সেরূপ খাদ্যও সে অল্পমাত্রায় ভোজন করে, তাহলে ঐরূপ বৃত্তি হয় না ; খাদ্য অনুসারে স্বাভাবিক তামসিক বৃত্তি থাকে অর্থাৎ অধিক মোহজনক বৃত্তি হয় না।

ভোজ্যপদার্থ সাত্ত্বিক হলেও যদি তা ন্যায়ভাবে এবং সৎপথে উপার্জিত না হয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ রীতিতে অর্জন করা হয় তবে তার পরিণাম ভাল হয় না। তাতে কোন না কোন ভাবে রাজসিক, তামসিক বৃত্তি এসে যায়, ফলে ঐ খাদ্য-পদার্থের দ্বারা রাগ, নিদ্রা, আলস্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ভোজ্যপদার্থ সাত্ত্বিক হতে হবে, সত্যপথে উপার্জিত হতে হবে, শুদ্ধভাবে প্রস্তুত করতে হবে, ভগবানকে নিবেদন করে অল্পমাত্রায় গ্রহণ করতে হবে,

তাহলে তার ফল খুবই ভাল হবে।

রাজসিক খাদ্য ন্যায়যুক্ত এবং সত্যপথে উপার্জন করা হলেও খাবার সময়ে খাদ্যদ্রব্যের প্রভাব তো পড়বেই অর্থাৎ পেটে জ্বালা ইত্যাদি হবে। কারণ ভোজ্যপদার্থের শরীরের সঙ্গেই বেশী সম্বন্ধ হয়। তবে খাদ্য-পদার্থ যদি সৎপথে উপার্জন করা হয়, তবে পরিণামে বৃত্তিসকল ভাল হবে এবং রাজসিক বৃত্তি বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে না। বৃত্তিতে শোক, চিন্তা ইত্যাদির তীব্রতা থাকে না, শান্তি বজায় থাকে।

তামসিক খাদ্য সৎপথে উপার্জিত হলেও তার দ্বারা তামসিক বৃত্তি তৈরী হবেই। তবে একথা ঠিক যে, সৎপথে উপার্জিত অর্থের তামসিক খাদ্য দ্বারা যে বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তা স্থায়ী নয়, সাত্ত্বিক বৃত্তিও তার মধ্যে জেগে উঠবে।

সাত্ত্বিক মানুষের বিবেক জাগ্রত থাকে, সেইজন্য সে প্রথমে পরিণামের কথা ভাবে। সেইজন্যই সাত্ত্বিক আহারে প্রথমে ফল বা পরিণাম বলে পরে খাদ্য পদার্থের বর্ণনা আছে (১৭।৮)। রাজসিক মানুষের রাগ থাকে, ভোজ্যপদার্থে আসক্তি থাকে ; সেইজন্য তার দৃষ্টি খাদ্য-পদার্থের দিকে যায়। তাই রাজসিক আহারে প্রথমে খাদ্যবস্তু ও পরে তার ফল বা পরিণাম বলা হয়েছে (১৭।৯)। তামসিক মানুষের মোহ এবং মূঢ়তা থাকে ; সুতরাং সে মোহপূর্বক আহার করে। সেইজন্য তামসিক আহারে কেবল তামসিক পদার্থের বর্ণনাই আছে, ফল বা পরিণামের বর্ণনা নেই (১৭।১০)।

মানুষ যে কোন বর্ণ, আশ্রম বা সম্প্রদায়েরই হোক না কেন যদি সে পারমার্থিক পথের সাধনাকারী হয়, তাহলে তার রুচি বা আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই সাত্ত্বিক ভোজনেই হবে, রাজসিক বা তামসিক পদার্থে নয়। সাত্ত্বিক আহারে বৃত্তিসকল সাত্ত্বিক হয় এবং সাত্ত্বিক বৃত্তি উৎপন্ন হলে সাত্ত্বিক আহারই প্রিয় হয়ে ওঠে।

কর্মযোগে নিষ্কামভাবের, জ্ঞানযোগে বিবেকপূর্বক ত্যাগের এবং ভক্তিযোগে ভগবৎভাবের প্রাধান্য থাকে। এই সকল মার্গের সাধকগণের সম্মুখে খাদ্যবস্তু উপস্থিত হলে তাঁদের সেই খাদ্যবস্তুতে কোন আকর্ষণ বা ভালবাসা জন্মায় না। যেমন, কর্মযোগীর কাছে যদি খাবার আনা হয়, তাহলে তাঁর সুখ এবং ভোগবুদ্ধি না থাকায় তিনি রাগপূর্বক আহার করেন না। সুতরাং খাদ্যবস্তু পূর্ণরূপে সাত্ত্বিক না হলেও নিষ্কামভাব ভোজনের হেতু হওয়ায় সেই আহারটি সাত্ত্বিক হয়। জ্ঞানযোগী সমস্ত পদার্থ থেকে বিবেকপূর্বক সম্পর্ক ছেদ করে ; সুতরাং খাদ্যবস্তুর সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ না থাকায় তিনি যা ভোজন করেন তা সাত্ত্বিক হয়। ভক্তিযোগী খাদ্যবস্তু প্রথমে ভগবানকে অর্পণ করে পরে প্রসাদ মনে করে তা গ্রহণ করেন, সুতরাং সেই খাদ্যও সাত্ত্বিক হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য

প্রশ্ন—আয়ুর্বেদ এবং ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ কেন ? যেমন আয়ুর্বেদে অরিষ্ট, আসব, মদিরা, মাংস ইত্যাদি খাওয়ার বিধান আছে কিন্তু ধর্মশাস্ত্র এর বিরোধ করে ; এমন কেন হয় ?

উত্তর—শাস্ত্র চার প্রকারের—**নীতিশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র** এবং **মোক্ষশাস্ত্র**। নীতিশাস্ত্রে ধনসম্পত্তি, জমি-জায়গা ইত্যাদি লাভ করার এবং রক্ষা করার কথাই মুখ্যভাবে আছে। এতে কূটনীতির বর্ণনাও আছে, অপরের সঙ্গে ছল-চাতুরী, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি করার কথাও আছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শরীর সম্বন্ধীয় কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। সেইজন্য সেখানে এমনসব কথাই আছে যাতে শরীর ঠিক থাকে। যদিও এইসব কথা কোথাও কোথাও ধর্মশাস্ত্রের বিপরীত। ধর্মশাস্ত্রে সুখভোগের কথা প্রাধান্য পেয়েছে, সুতরাং এতে এমন সব কথা আছে যাতে ইহলোকেও সুখ পাওয়া যায় এবং পরলোকে (স্বর্গাদি লোকেও) সুখ পাওয়া যায়। মোক্ষশাস্ত্রে জীবের কল্যাণের কথা প্রাধান্য পেয়েছে, সেইজন্য এখানে সেইসব কথাই স্থান পেয়েছে যার দ্বারা জীবের কল্যাণ হয়, জীব উদ্ধার পায়। মোক্ষশাস্ত্রে ধর্ম-বিরুদ্ধ কথা আসেনি। এতে সকামভাবের বর্ণনাও আছে, কিন্তু তার মহিমা এখানে জানানো হয়নি বরং নিন্দাই করা হয়েছে। কারণ সাধকের যতক্ষণ সকামভাব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পরমাত্মপ্রাপ্তিতে বাধা ঘটে। ইহলোক এবং পরলোকে সুখের কামনা ত্যাগ করলে ধর্মশাস্ত্রও মোক্ষের সহায়ক হয়।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শরীরেরই প্রাধান্য থাকে। সুতরাং যে কোন প্রকারে শরীর সুস্থ ও নীরোগ যেন থাকে তার জন্যই আয়ুর্বেদে জড়ি-বুটি দ্বারা তৈরি ঔষধ তথা মাংস, মদ্য, আসব প্রভৃতি সেবনের বিধান দেওয়া আছে। ধর্মশাস্ত্রে সুখভোগের প্রাধান্য আছে। সুতরাং এতেও স্বর্গাদি

প্রাপ্তির জন্য কৃত অশ্বমেধাদি যজ্ঞে পশুবলি ইত্যাদি নানাপ্রকার হিংসার বর্ণনা আছে। বৈদিক মন্ত্র দ্বারা বিধি-নিয়ম পূর্বক কৃত হিংসাকে হিংসা বলে গণ্য করা হয় না। কিন্তু হিংসা বলে না স্বীকার করলেও হিংসার পাপ তো স্পর্শ করবেই।[1] তাছাড়া ভোজনে মাংস সেবন করতে থাকলে মানুষের স্বভাব খারাপ হয়। ফলে তার মধ্যে ক্রমে পরলোকের প্রাধান্য কমতে কমতে স্থূল শরীরেরই প্রাধান্য হয়ে যায় এবং সেই ব্যক্তি পরে শাস্ত্রীয় বিধান ব্যতীতই মাংস খেতে আরম্ভ করে।

আয়ুর্বেদে হিংসার কোন সীমা নেই, কারণ সেটিতে স্থূল শরীরকে ঠিক রাখাই মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব এতে পরলোক খারাপ হল কি না তা নিয়ে পরোয়া নেই। ধর্মশাস্ত্রে হিংসা সীমিতভাবে আছে ; যাতে পরলোক নষ্ট হয়ে যায়, এরূপ হিংসা এতে নেই। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রও মানুষের কল্যাণের বা মোক্ষের পরোয়া করে না। তাৎপর্য এই যে ধর্মশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদ দুই-ই প্রকৃতির রাজ্য নিয়ে। যতক্ষণ মানুষের হৃদয়ে বিনাশশীল পদার্থের গুরুত্ব থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পাপ এবং হিংসা থেকে দূরে থাকতে পারে না। সে নিজেরও হিংসা করে পতন ঘটায় এবং অপরেরও পতন ঘটায় । কিন্তু যার মধ্যে সকামভাব নেই, তার দ্বারা হিংসা হয় না। যদি তার দ্বারা কোন হিংসার কাজ হয়েও যায়, তাহলেও তার পাপ হয় না ; কারণ পাপ কামনা বা আসক্তিবশত হয়, কেবলমাত্র ক্রিয়াতে নয়।

মানুষের এমন একটি ধারণা প্রায়শঃই দেখা যায় যে, ঔষধ রূপে মাংসাদি অশুদ্ধ দ্রব্য খাওয়া অনুচিত নয়। কিন্তু যারা এই কথা মানে তারা ধর্ম বা নিজ কল্যাণের পরোয়া করে না, তারা শুধু নিজ শরীরকে ঠিক রাখা এবং সুখ ও আরামই প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করে। ঔষধরূপেও যদি অভক্ষ্য ভক্ষিত হয়, তাতেও হিংসা এবং অপবিত্রতা আসেই। সুতরাং ঔষধ রূপেও অভক্ষ্য ভক্ষণ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—যদি শরীর বেঁচে থাকে তবেই তো মানুষ সাধন ভজন করবে ; তাহলে অভক্ষ্য ভক্ষণে যদি শরীর বাঁচে, তাতে ক্ষতি কি ?

উত্তর—অভক্ষ্য ভক্ষণ করলেই যে শরীর বাঁচবে, মৃত্যু পিছিয়ে যাবে এমন কোন নিয়ম নেই। যদি আয়ু শেষ না হয়ে থাকে তো শরীর বাঁচবে এবং আয়ু শেষ হলে শরীর বাঁচবে না। কারণ শরীরের বাঁচা না বাঁচা প্রারব্ধের অধীন, বর্তমান কর্মের অধীন নয়। অভক্ষ্য ভক্ষণ দ্বারা শরীর বাঁচতে পারে না, কেবল শরীরের কিছু পুষ্টি সাধিত হতে পারে। কিন্তু অভক্ষ্য ভক্ষণে যে পাপ অর্জিত হবে, তার ফল তো ভুগতেই হবে।

মানুষ সাধন-ভজনের বাহানা তৈরী করে। বাস্তবে শরীরে রাগ-আসক্তি থাকার জন্যই সে অশুদ্ধ ঔষধ সেবন করে। যার শরীরে রাগ (আসক্তি) নেই, যার উদ্দেশ্য নিজ কল্যাণ করা, সে প্রতিক্ষণ নষ্ট হতে থাকা নশ্বর শরীরের জন্য অশুদ্ধ বস্তু সেবন করে কেন পাপভাগী হবে ?

প্রশ্ন—আজকাল অনেকে জীবরহিত ডিম খাওয়াকে দোষের বলে মনে করেন না। এটা কতটা উচিত কাজ ?

উত্তর—জীবরহিত হলেও এটি শাক-সব্জীর মতো শুদ্ধ নয়, বরং ভয়ানক অশুদ্ধ। কারণ এই ডিম মহা অপবিত্র রজঃ (রক্ত) এবং বীর্য থেকে সৃষ্ট।

মা-ভগিনীগণ রজস্বলা হলে তাদের স্পর্শ করা হয় না, দূর থেকে নমস্কারাদি করা হয়, কেননা তাদের ছুঁলে অপবিত্রতা হয়। রজস্বলা (মাসিক-ধর্মকালে) স্ত্রীলোকের ছায়া পড়লে সাপ অন্ধ হয়ে যায় এবং পাঁপড়ের রং কালো হয়ে যায়। কোন জলাশয় স্পর্শ করলে তাতে কীটাণুর জন্ম হয়। অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদিকে স্পর্শ করলে তা অপবিত্র হয়ে যায়। কেননা রজস্বলা স্ত্রীলোকের শরীর থেকে বিষ নির্গত হয়, যা দূরীভূত হলে শরীর শুদ্ধ হয়ে যায়। এইরূপে যে রজঃকে অপবিত্র বলে মনে করা হয়, সেই রজঃ থেকেই ডিম তৈরী হয়, সুতরাং সেই ডিম যারা খায় তারা তো অপবিত্র হবেই।

যে ব্যক্তি জীবরহিত ডিম খেতে আরম্ভ করে, সে পরে সজীব ডিমও খেতে থাকবে। তা ছাড়াও নির্জীব ডিমের সঙ্গে সজীব ডিমের যে ভেজাল নেই—তা কি করে বলা

---

[1]শতক্রতু ইন্দ্রও (শতযজ্ঞের দ্বারা ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত) দুঃখী হন, তাঁরও বিপদ আসে এবং মনে ঈর্ষা, ভয়, অশান্তি আদি হয় এবং চিন্তা আসে কেউ না আমার এই পদ ছিনিয়ে নেয়। এটি বৈদিক হিংসার পাপের ফল।

যাবে ? সুতরাং কোনভাবেই ডিম খাওয়া অনুচিত, এটি পাপকার্য।

প্রশ্ন—জড়ী-বুটির জন্য গাছ তোলাতেও হিংসা হয়, তাহলে তার দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ খাওয়া উচিত কি ?

উত্তর—চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী এবং ত্যাগী ব্যক্তি যদি গাছ-গাছড়া থেকে তৈরী শুদ্ধ ঔষধও না খান তাহলে ভালো হয়, কারণ ত্যাগই তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ত্যাগ সকলের পক্ষেই ভালো, তবু যদি গৃহস্থ আদি ব্যক্তি জড়ি-বুটির তৈরী ঔষধ সেবন করে, তাতে অত দোষ লাগে না। যেমন, যারা চাষ করে, তাদের দ্বারা অনেক জীবজন্তুর হিংসা হয়, কিন্তু তাতে অত দোষ লাগে না, কারণ চাষের দ্বারা উৎপন্ন অন্ন ইত্যাদির দ্বারা প্রাণীদের জীবন নির্বাহ হয়। সেইরূপই যারা ঔষধের জন্য গাছ-গাছড়া তুলে আনে, তাদের দ্বারা হিংসা কার্য হয় বটে কিন্তু তাতে তাদের ততো দোষ হয় না, কারণ ঐসব ঔষধ দ্বারা জনসাধারণ আরোগ্য লাভ করে।

পদ্মপুরাণে কথিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি জলাশয় থেকে জল পান করে, তবে সেই জলাশয়ের ধার থেকে সামান্য মাটি তুলে বাইরে ফেলে দিতে হয়। এর তাৎপর্য এই যে, জলাশয়টি কারো দ্বারা খোদিত হয়েছে, সুতরাং তার থেকে খানিকটা মাটি কেটে ফেললে সেই জলাশয়টিতে জল পানকারী ব্যক্তিরও অধিকার বর্তাবে, এরূপ করলে অপরের জলাশয়ের জল পানের দোষ হবে না। এইরূপই, যেসব গাছ থেকে ঔষধাদি প্রস্তুত হয়, সেগুলিকে ভালোভাবে সংরক্ষণ করলে এবং অনাবশ্যক ভাবে না ছিঁড়লে আমাদের পাপ হবে না।

প্রশ্ন—রোগের উৎপত্তি কিভাবে হয় ?

উত্তর—রোগ দু-প্রকারে হয়—প্রারব্ধ থেকে এবং কুপথ্য থেকে। পুরাতন পাপের ফল ভোগ করার জন্য শরীরে যে রোগ হয় তা প্রারব্ধের জন্য হয়ে থাকে। যে রোগ নিষিদ্ধ বস্তু খাওয়াদাওয়া থেকে হয় তা কুপথ্যের জন্য হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—আমরা কিভাবে বুঝতে পারব যে এই রোগ প্রারব্ধের ফলে এবং এই রোগ কুপথ্য থেকে হচ্ছে ?

উত্তর—পথ্য সেবন করে, সংযমপূর্বক থেকে এবং ঔষধ খেলেও যে অসুখ সারে না, তাকে প্রারব্ধের জন্য অসুস্থতা মনে করবে। যে অসুখ ঔষধ পথ্যাদি সেবনে ভালো হয়ে যায়, তার কারণ কুপথ্য বলে মনে করবে।

কুপথ্যের জন্য যে অসুখ হয় তা চার প্রকারের—সাধ্য, কৃচ্ছ্র-সাধ্য, যাপ্য এবং অসাধ্য। যে অসুখ ঔষধ খেলে সেরে যায়, তাকে বলে 'সাধ্য'। যে অসুখ অনেক দিন ধরে ঔষধ-পথ্য খেয়ে সাবধানে চললে সারে, তাকে বলে 'কৃচ্ছ্র-সাধ্য'। যে অসুখ ঠিকমতো ঔষধ-পথ্য সেবন করতে থাকলে চাপা থাকে, কিন্তু মূল থেকে সারে না তাকে 'যাপ্য' বলে। যে অসুখ ঔষধ-পথ্য খেলেও কিছুতেই সারে না, তাকে বলে 'অসাধ্য'।

প্রারব্ধ থেকে যে রোগ হয় তা অসাধ্যই হয়ে থাকে। কুপথ্য থেকে যে রোগ উৎপন্ন হয় তাও কখনো কখনো অসাধ্য হয়ে ওঠে। এইরূপ অসাধ্য রোগ প্রায়শঃই ঔষধে সারে না। কোন সাধু-সন্তের আশীর্বাদে, মন্ত্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞে এবং ভগবৎকৃপাতেই এই সমস্ত অসুখ সারতে পারে।

প্রশ্ন—কুপথ্য থেকে যে রোগ হয় তা অসাধ্য হবার কারণ কি ?

উত্তর—এতে কয়েকটি কারণ হতে পারে। যেমন—(১) রোগ খুব পুরানো হলে, (২) প্রলোভনে কুপথ্য সেবন করে, (৩) ঔষধ প্রস্তুতকালে মাত্রা কম বেশী হয়ে গেলে, (৪) যে জড়ী-বুটি দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করা হয়েছে তা হয়ত টাট্‌কা নয়, পুরোনো হয়ে গেছে, (৫) রোগীর চিকিৎসক এবং ঔষধে যদি বিশ্বাস না থাকে, (৬) রোগী খাওয়া-দাওয়াতে যদি সংযম না রাখে, (৭) রোগী যদি ব্রহ্মচর্য পালন না করে—ইত্যাদি কারণের জন্যও কুপথ্য দ্বারা উৎপন্ন রোগ শীঘ্র সারতে চায় না।

যে রোগী বারংবার নানারূপ ঔষধ সেবন করে, অধিক মাত্রায় ঔষধ সেবন করে, তার ঔষধে বিশেষ কোনো উপকার হয় না ; কারণ ঔষধ তার কাছে আহার্য বস্তুরূপে পরিগণিত হয়। গ্রামে যারা থাকে তারা সাধারণতঃ ঔষধ সেবন করে না, তারা যদি কখনো ঔষধ ব্যবহার করে তবে তা শীঘ্র কাজ করে। যে ব্যক্তি মদ, চা ইত্যাদি নেশার বস্তু খায়, তার লিভার খারাপ হয়ে যায়, যার জন্য তার শরীরে ঔষধের কোন প্রভাব পড়ে না। যে ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিরুদ্ধ খাওয়া-দাওয়া ও আহার-বিহার করে, তার কুপথ্যজনিত অসুখ ঔষধ সেবন করলেও দূর হয় না।

কুপথ্য ত্যাগ, পথ্যের সেবন এবং সংযতভাবে থাকা এই তিনটি উপায় ঔষধের থেকেও বেশী (রোগ দূর করতে) কাজ করে।

রোগীর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, রোগীর পাত্রে ভোজন করা, রোগীর বিছানায় বসা, রোগীর বস্ত্রাদি ব্যবহার করা ইত্যাদিতে সংকর বা মিশ্র রোগ উৎপন্ন হয়, যার সঠিক নির্ণয় করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। যদি রোগ ঠিকমতো না ধরা যায়, তবে ঔষধ কিভাবে তার ওপর কাজ করবে ?

যুগের প্রভাবে এই সমস্ত জড়ী-বুটির শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। কত দিব্য ঔষধ লুপ্ত হয়ে গেছে। যারা ঔষধ তৈরী করে তারা ঠিক মতো ঔষধ তৈরী করে না এবং অর্থের লোভে যে ঔষধে যে পদার্থ মেশাতে হবে, তা না দিয়ে অন্য সস্তার পদার্থ মেশায়, সুতরাং সেই ঔষধের সেরূপ গুণ থাকে না।

গ্রামের মানুষেরা চাষবাস ইত্যাদি পরিশ্রমের কাজ করে এবং মা এবং বোনেরা চাকি পেষণ করে এবং নানা পরিশ্রমের কাজ করে এবং বিশুদ্ধ অন্ন, জল এবং হাওয়া পায়, সেইজন্য কুপথ্যজনিত অসুখ তাদের হয় না। কিন্তু যারা শহরে থাকে তারা শারীরিক পরিশ্রম করে না এবং বিশুদ্ধ অন্ন, জল এবং হাওয়াও পায় না, সেইজন্য কুপথ্যজনিত রোগ তাদের হয়। তবে প্রারব্ধজনিত রোগ সকলেরই সমভাবে হয়, তা গ্রামেই হোক বা শহরে।

মানুষের শাস্ত্রের উপদেশ অনুযায়ী বিশুদ্ধ ঔষধ সেবন করা উচিত। যদি সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ রোগগ্রস্ত হয়েও ঔষধ সেবন না করেন তাহলেও অসুখ সেরে যায় ; কারণ ঔষধ ব্যবহার না করাও একপ্রকার তপস্যা, যার দ্বারা রোগবালাই দূর হয়। যে ব্যক্তি অসুস্থতার জন্য দুঃখী এবং অপ্রসন্ন হয়ে থাকে তার ওপরই রোগের প্রভাব বেশী হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবৎ স্মরণ-কীর্তন করে, সংযতভাবে জীবন যাপন করে এবং প্রসন্ন থাকে, তার ওপর রোগের বেশী প্রভাব পড়তে পারে না। চিত্তের প্রসন্নতায় তার রোগ দূর হয়।

প্রারব্ধজনিত যে রোগ তা সারাতে ঔষধ নিমিত্তের ন্যায় কাজ করে। আসলে তার প্রারব্ধে রোগমুক্তি থাকলে তবেই অসুখ সেরে যায়। যে কর্মের জন্য অসুখ হয়েছে, তার চেয়ে ভালো কোন পুণ্য কাজ, প্রায়শ্চিত্ত বা মন্ত্রাদি পাঠের অনুষ্ঠান যদি প্রবল হয়, তবে অসুখ সেরে যায় আর অনুষ্ঠানের থেকে যদি প্রারব্ধ প্রবল হয় তবে রোগ সারে না, হয়ত কিছুটা কমে।

প্রশ্ন—গলিতকুষ্ঠ, প্লেগ ইত্যাদি রোগীদের সংস্পর্শে এলে যদি সেই রোগ কারো হয়, তার কারণ কি বলা হবে প্রারব্ধ না অন্য কিছু ?

উত্তর—যার প্রারব্ধ ততো দৃঢ় নয় অর্থাৎ প্রারব্ধের কর্ম অনুযায়ী যার অসুখ হওয়ার আছে, তারই এই অসুখ হয়, সকলের নয়। প্রারব্ধে থাকার জন্যই গলিতকুষ্ঠ ইত্যাদি রোগীর সংস্পর্শে আসা তার পক্ষে নিমিত্ত হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন—অসুখ সারাবার জন্য কিরূপ চিকিৎসা করা উচিত ?

উত্তর—চিকিৎসা পাঁচ প্রকারের হয়, মানবীয়, প্রাকৃতিক, যৌগিক, দৈবী এবং রাক্ষসী। গাছ-গাছড়ার জড়ী-বুটি থেকে যে ঔষধ হয়, তার দ্বারা চিকিৎসাকে বলা হয় **'মানবীয় চিকিৎসা'**। খাদ্য-জল-হাওয়া-রৌদ্র-মাটি ইত্যাদির দ্বারা যে চিকিৎসা হয়, তাকে বলা হয় **'প্রাকৃতিক চিকিৎসা'**। ব্যায়াম, আসন, প্রাণায়াম, সংযম, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদির দ্বারা যে রোগ দূরীকরণের চেষ্টা, তাকে বলে **'যৌগিক চিকিৎসা'**। মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি তথা সাধু-সন্তদের আশীর্বাদ দ্বারা যে রোগ দূর করা হয়, তাকে বলে **'দৈবী চিকিৎসা'**। কাটা-ছেঁড়া তথা অপারেশান ইত্যাদির দ্বারা যে চিকিৎসা, তাকে বলা হয় **'রাক্ষসী চিকিৎসা'**। এইসবের মধ্যে শরীরের জন্য রোগ দূর করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হল 'যৌগিক চিকিৎসা'। কারণ এতে কোন ব্যয় বাহুল্য নেই, পরাধীনতা নেই, তাছাড়া আসন, প্রাণায়াম, সংযম করলে শরীরে রোগও হয় না।

প্রশ্ন—ব্যায়াম, প্রাণায়াম, সংযম ও ব্রহ্মচর্যপালন করলে কিরূপ অসুখ হয় না—কুপথ্যজনিত অসুখ, না প্রারব্ধজনিত অসুখ ?

উত্তর—আসন, প্রাণায়াম, সংযম, ব্রহ্মচর্যপালন ইত্যাদি করলে কুপথ্যজনিত রোগ তো হয়ই না, প্রারব্ধজনিত রোগও ততো প্রবল হতে পারে না এবং শরীরে রোগের প্রভাব কম পড়ে। কারণ আসন ইত্যাদি করাও একপ্রকার কর্ম এবং তারও ফল আছে।

প্রশ্ন—ব্যায়াম এবং আসনে পার্থক্য কি ?

উত্তর—ব্যায়ামেরই দুটি বিভাগ আছে— (১) (কুস্তি) পেশীর ব্যায়াম ; যেমন ডন-বৈঠক ইত্যাদি এবং

(২) আসন বা যৌগিক ব্যায়াম ; যেমন— শীর্ষাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন ইত্যাদি।

যারা (কুস্তি) পেশীর ব্যায়াম করে, তাদের মাংসপেশীগুলি মজবুত, কঠিন হয়ে যায় আর যারা আসনের ব্যায়াম করে তাদের মাংসপেশী নরম, পেলব হয়। দ্বিতীয়তঃ যারা (কুস্তির) পেশীর ব্যায়াম করে তাদের শরীর যৌবনকালে তো ঠিকই থাকে, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় ব্যায়াম না করার জন্য তাদের শরীরে অস্থি-সন্ধিতে বেদনা হতে থাকে। কিন্তু যারা আসনের ব্যায়াম করে তাদের শরীর যৌবনকালে তো ঠিক থাকেই এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও যদি তারা আসন না করে, তাহলেও কোন অসুখ তাদের হয় না।[১] তাছাড়া আসনের ব্যায়াম করলে রক্ত সঞ্চালন ঠিকমতো হয় যার জন্য শরীর নীরোগ ও সুস্থ থাকে। ধ্যানাদিতেও আসন খুব সাহায্য করে। সুতরাং আসন করাই সব থেকে ভালো বলে মনে হয়।

প্রশ্ন—অনেকে বলে আসন করলে শরীর কৃশ হয়ে যায়, তা কি ঠিক ?

উত্তর—হ্যাঁ, তা ঠিক ; কিন্তু আসন করলে শরীর কৃশ হলেও শরীর দুর্বল হয় না। আসন করলে শরীর নীরোগ থাকে, শরীরে স্ফুর্তি আসে এবং শরীরে হাল্কাভাব থাকে। আসন না করলে শরীর স্থূল হবার সম্ভাবনা থাকে, স্থূল হয়ে শরীর ভারী হয়ে যায়, শিথিলতা আসে, কাজ করার উৎসাহ কমে যায়, চলতে ফিরতে পরিশ্রম হয়, উঠতে বসতে কষ্ট হয়, কেবল শুয়ে থাকতে মন চায় এবং অসুখ-বিসুখও বেশী হয়। সুতরাং শরীর স্থূল হওয়া তো ভালো নয় বরং কৃশ থাকাই শ্রেয়। কারো শরীর যদি কৃশ অথচ নীরোগ থাকে আর যদি কেউ মোটা হয়েও রোগী হয়, তাহলে দুইয়ের মধ্যে কৃশ থাকাই ভালো।

প্রশ্ন—আসন করা কাদের পক্ষে বেশী উপযোগী ?

উত্তর—যারা চাষবাস করে, পরিশ্রমের কাজ করে তাদের স্বাভাবিকভাবে ব্যায়াম হয়ে যায় এবং বিশুদ্ধ হাওয়াও মেলে, সুতরাং তাদের ব্যায়াম করার ততো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যারা প্রধানত মস্তিষ্কের কাজ করে, অর্থাৎ দোকান, অফিস ইত্যাদিতে বসে বসে কাজ করে, তাদের জন্য আসন করা খুবই প্রয়োজনীয় ব্যায়াম।

প্রশ্ন—ব্যায়াম কতটা করা উচিত ?

উত্তর—পেশীর (কুস্তি) ব্যায়ামে ডন-বৈঠক দিতে দিতে শরীর যখন অবসন্ন হবে, পরিশ্রান্ত হবে, তখন তা ঠিক হয়েছে বুঝতে হবে। কিন্তু আসনের জন্য যে ব্যায়াম তাতে বেশী জোর দেওয়া চলে না, বরং শরীরে পরিশ্রম হচ্ছে বুঝতে পারলেই আসন করা বন্ধ করতে হবে। আসন করার মাঝে মাঝেই শবাসন করে নিতে হয়।

প্রশ্ন—কোন স্থানে ব্যায়াম করা উচিত ?

উত্তর—যে স্থানে বিশুদ্ধ হাওয়া চলাচল করে এবং গাছপালা আছে, সেইরূপ স্থানে ব্যায়াম করলে বিশেষ উপকার হয়। পেশীর ব্যায়ামে বিশুদ্ধ হাওয়া না হলেও চলে কিন্তু আসন করতে গেলে বিশুদ্ধ হাওয়া থাকা খুবই জরুরী। যারা শহরে থাকে তারা বাড়ীর ছাতে বা ঘরে অল্প পাখা চালিয়ে আসন করতে পারে।

প্রশ্ন—যারা ব্যায়াম করে তাদের কি খাওয়া উচিত ?

উত্তর—যেসব ব্যক্তি পেশীর ব্যায়াম করে তাদের দুধ ও ঘি খুব খাওয়া দরকার। দুধ, ঘি খেলে যদি বমনোদ্রেক হয় তাও গ্রাহ্য করতে নেই। তবে যতটা হজম করতে পারবে ততটা তো অবশ্যই খাওয়া উচিত। কিন্তু আসন যারা করে তাদের শুদ্ধ, সাত্ত্বিক এবং অল্প আহার করলেই হবে (৬।১৭)।

প্রশ্ন—শরীরের শক্তি কমে গেলে অসুখ বেশী হয়—একথা কতটা সত্য ?

উত্তর—এতে দুটি মত আছে—আয়ুর্বেদের মত এবং ধর্মশাস্ত্রের মত। আয়ুর্বেদের দৃষ্টি শরীর নিয়ে, সেইজন্য তাতে বলা হয়েছে যে, 'শরীরে শক্তি কম হলে রোগ বেশী উৎপন্ন হয়।' কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের দৃষ্টি শুভ ও অশুভ কর্মের ওপর থাকে ; সুতরাং তাতে রোগের কারণ হিসাবে পাপ কর্মাদিকে বলা হয়েছে।

যখন মানুষের ক্রিয়মাণ (কুপথ্যজনিত)কর্ম অথবা পূর্বের পাপ কর্ম নিজ ফল দেবার জন্য উপস্থিত হয় তখন কফ, বাত, পিত্ত এই তিনটি বিকৃত হয়ে রোগ উৎপন্ন করার হেতু তৈরী হয়। আর তখনই ভূত-প্রেতও শরীরে

[১] বৃদ্ধাবস্থায়ও হাল্কা ব্যায়াম করা উচিত, তাতে শরীরে স্ফূর্তি এবং হাল্কাভাব থাকে।

প্রবিষ্ট হয়ে রোগ উৎপন্ন করে। বলা আছে যে—

বৈদ্যা বদন্তি কফপিত্তমরুদ্বিকারান্
জ্যোতির্বিদো গ্রহগতিং পরিবর্তয়ন্তি।
ভূতা বিশন্তীতি ভূতবিদো বদন্তি
প্রারব্ধকর্ম বলবন্মুনয়ো বদন্তি॥

'বৈদ্যরা কফ, পিত্ত এবং বায়ুকে রোগের কারণ বলে মনে করেন, জ্যোতিষীরা গ্রহের গতিকে কারণ বলে মনে করেন, প্রেতবিদ্‌গণ ভূত-প্রেত প্রবিষ্ট হওয়াকেই রোগের কারণ বলে মনে করেন ; কিন্তু মুনিগণ মনে করেন প্রারব্ধ কর্মই এর আসল কারণ'।

(১০) গীতায় ভগবানের উদারতা (মহানুভবতা)

উদারা যে সৃষ্টৌ সহিতমমতাপাশনিহতা
অতস্তে সংযাতা জনিমরণদুঃখেষু সততম্।
বিনা স্বার্থং কামং স্বসকলজনানাং হিতকরো
ভবানেকঃ কৃষ্ণস্ত্রিভুবনমুদারো বরতমঃ॥

অর্জুন ভগবানের ঐশ্বর্য অর্থাৎ সশস্ত্র এক অক্ষৌহিণী সেনা গ্রহণ না করে কেবল ভগবানকেই আপন করে নিয়েছিলেন, তাই তাঁর ভগবানের প্রাপ্তিও হল, এর সঙ্গে ভগবানের ঐশ্বর্য প্রাপ্তিও হল। ভগবান অর্জুনের জন্য অত্যন্ত সাধারণ কাজও করেছেন, তিনি পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে অর্জুনের সারথির কাজ করেছেন (১।২১)— এ তাঁর বিশেষ উদারতা। যিনি অনন্ত সৃষ্টি-ধারণকারী, সমস্ত প্রাণিজগতের পালন-পোষণকারী ; তিনি ভক্তদের জন্য মনুষ্যরূপ ধারণ করেন (৪।৬)—এ তাঁর কি বিশেষ উদারতা!

যে ব্যক্তি সমত্বের জিজ্ঞাসু অর্থাৎ সমতা প্রাপ্ত হতে চায়, সেও বেদোক্ত সকাম অনুষ্ঠান এবং বড় বড় ভোগ অতিক্রম করে যায় (৬।৪৪)। সমতাপ্রাপ্ত যোগী বেদে, যজ্ঞে, তপে এবং দানে যত পুণ্যফলের উল্লেখ আছে, সমস্ত অতিক্রম করে যান (৮।২৮) অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন। সমত্ব লাভের উদ্দেশ্য হওয়ামাত্র ভগবান তাঁকে কত শ্রেষ্ঠ পদ দেন, ভগবানের বিধানে কত উদারতা!

বাস্তবে আর্ত এবং অর্থার্থী তো উৎকৃষ্ট ভক্ত নয়, কিন্তু ভগবানের মহানুভবতা এই যে, যে কেহ তাঁকে যে কোন ভাবে ভজনা করুক বা ভগবদ্মুখী হোক না কেন, ভগবান তাঁকেই উৎকৃষ্ট ভক্ত বলে মনে করেন—'উদারাঃ সর্ব এবৈতে' (৭।১৮)।

প্রায়শই মানুষ অপরের শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্য নানাপ্রকার অভিনয় করে, অন্যদের নিজের অধীন, শিষ্য বানাতে সচেষ্ট থাকে ; কিন্তু ভগবানের বিচিত্র মহানুভবতা এই যে, যে ব্যক্তি নিজ কামনা পূর্তির উদ্দেশ্যে অন্য কোন দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজার্চনা করে, ভগবান সেই ব্যক্তির শ্রদ্ধা সেই দেবতার প্রতি দৃঢ় করে দেন এবং সেই উপাসনার সুফলও পাইয়ে দেন (৭।২১-২২)।

মৃত্যুকালে মানুষ যেরূপ চিন্তা করে, শরীর ত্যাগ করার পর সে তাই প্রাপ্ত হয় (৮।৬)। এই বিধানেও ভগবানের উদারতার প্রকাশ! যেমন অন্তিমকালে হরিণের চিন্তা নিয়ে মৃত্যু হওয়ায় ভরত মুনি হরিণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তেমনি ভগবৎ চিন্তায় মৃত্যু হলে ভগবৎ প্রাপ্তি হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে অন্তিম সময়ে হরিণের চিন্তায় মানুষ যেমন হরিণত্ব পায়, তেমনি ভগবৎ চিন্তায় ভগবানকে পায়। ভগবানের এই মহানুভবতার কোন সীমা নেই!

ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত লোক আছে, সেখানে গেলে পুনরায় ফিরে আসতে হয়। মানুষকে বারংবার জন্ম-মরণ চক্রেই আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু ভগবৎপ্রাপ্তি হলে তাকে আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয় না

(৮।১৬)—এ তাঁর কী বিরাট উদারতা !

যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ চিত্তে ভগবানের উপাসনায় লেগে থাকে, ভগবান তার অপ্রাপ্তব্য বস্তু পাইয়ে দেন (৯।২২), তা লৌকিক প্রাপ্তি বা পারলৌকিক প্রাপ্তি, যাই হোক না কেন। লৌকিক প্রাপ্তিতে ভগবান তার দেহ-যাত্রা তথা আত্মীয়-পরিবার নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেন, ভক্ত ও তার আত্মীয়গণের রক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এতে একটি বিশেষ কথা আছে, যা প্রাপ্তি করালে ভক্তের হিত হয় এবং সংসারে তাকে আবদ্ধ করে না, সেই বস্তুর প্রাপ্তি ভগবান করিয়ে দেন। কিন্তু যা প্রাপ্ত হলে ভক্তের অহিত হয় এবং সে সংসারে বদ্ধ হয় তার প্রাপ্তি তিনি করান না। যেমন, নারদের মনে বিবাহের ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু ভগবান তার বিয়ে হতে দেন নি। কারণ তাতে নারদের উপকার হোত না। যদি লৌকিক প্রাপ্তির দ্বারা ভক্তের পতন না হয়, তাহলে তার লৌকিক চাহিদা না থাকলেও ভগবান লৌকিক প্রাপ্তি ঘটিয়ে দেন। যেমন, ধ্রুব প্রথমে সকামভাবে ভগবানের উপাসনা করেছিলেন। সেই উপাসনাতে তাঁর সকামভাব দূরীভূত হয়েছিল, তবুও ভগবান তাঁর জন্য ধ্রুবলোক সৃষ্টি করে ছত্রিশ হাজার বছরের রাজত্ব দিয়ে দিয়েছিলেন। এর তাৎপর্য এই যে তার অলৌকিক বা পারলৌকিক বিষয় তো তাকে পাইয়ে দেনই এবং লৌকিক বিষয়ে তার যদি কল্যাণ হয়, তাহলে তার প্রাপ্তিও ভগবান ভক্তকে করিয়ে দেন।

ভক্ত ভক্তিভাব দ্বারা যে সব বস্তু অর্থাৎ পত্র, পুষ্প, জল ইত্যাদি ভগবানকে অর্পণ করে, ভগবান তা গ্রহণ করেন, তিনি কখনো বিচার করেন না সেটি ফল না ফুল (৯।২৬)। ভগবান তাঁর উদারতায় ভক্তের ভাবে ভেসে যান। শুধু তাই নয় ভক্তের ভাবে ভেসে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেন—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

—ভগবানের এই উদারতার কোন সীমা নেই !

সংসারে পদ, অধিকার ইত্যাদি সকলে সমানভাবে পায় না, যোগ্যতা ইত্যাদি অনুসারেই তা মেলে। কিন্তু ভগবান তাঁর প্রাপ্তির জন্য এতো দরাজ ব্যবস্থা রেখেছেন যে, অত্যন্ত পাপী দুরাচার ব্যক্তিও তাঁর নামগান করতে পারে ; তাঁকে নিজের বলে ভাবতে পারে, তাঁর দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং তাঁকে পেতে পারে (৯।৩০-৩১)।

যে কেবল ভগবানের নাম-কীর্তনাদি ভজনে মগ্ন হয়ে থাকে, ভগবানের লীলা আস্বাদন করে, তার ইচ্ছা না থাকলেও যে জ্ঞান জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদেরও বহু কষ্টে প্রাপ্তি হয় তাকে সেই জ্ঞান প্রাপ্তি তিনি নিজের থেকে করিয়ে দেন, (১০।১১)। এ তাঁর কি বিশাল উদারতা !

গীতায় অর্জুন ভগবানকে অল্প কিছু জিজ্ঞাসা করলে ভগবান বিস্তারিতভাবে তার উত্তর দেন। অর্থাৎ অর্জুনের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পরও নিজে থেকে আরও ভালো করে বুঝিয়ে দেন। অর্জুন ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন, 'হে ভগবান ! আমি আপনার অবিনাশী রূপ দেখতে ইচ্ছুক (১১।৩)। ভগবান তখন দেবরূপ, উগ্ররূপ, অত্যুগ্ররূপ ইত্যাদি নানান্তরে নিজের অক্ষয় অবিনাশী রূপ দেখালেন। অর্জুন যদি তাঁর বিশ্বরূপ দেখে ভয় না পেতেন, তাহলে না জানি ভগবান অর্জুনকে তাঁর আরও কতরকম রূপ দেখিয়ে দিতেন। এ যে তাঁর কি বিরাট মহানুভবতা !'

নির্গুণ উপাসনাকারিগণ পরাভক্তিদ্বারা ভগবানের তত্ত্ব অবগত হয়ে ভগবানে প্রবিষ্ট হন (একাত্ম হয়ে যান) (১৮।৫৫)। কিন্তু যারা সগুণ উপাসনাকারী, তাদের ভগবান জ্ঞান দান করেন, দর্শন দেন এবং নিজ প্রাপ্তির ব্যবস্থাও করে দেন (১১।৫৪)। যে সব ভক্ত ভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট রাখেন, ভগবান স্বয়ং তাদের সংসার-সাগর থেকে উদ্ধারকারী হন (১২।৭)। ভক্তের প্রতি তাঁর কত দয়া !

যে অবিনাশী শাশ্বত পদ বহু কাল ধরে নির্জনে থেকে ধ্যান-ধারণা-সমাধি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই অবিনাশী পদ তাঁর কৃপাতে সাংসারিক সমস্ত কর্ম করেও অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় (১৮।৫১-৫৬)। যে শুধু ভগবানের শরণ নেয়, ভগবান তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন (১৮।৬৬)। এ তাঁর বিশাল মহানুভবতা !

যে ব্যক্তি ভগবদ্-ভক্তের মধ্যে গীতার প্রচার করে,

সে ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। তার মত আর কেউ ভগবানের অত প্রিয় হয় না। যদি কেউ প্রচার করতে না পারে, শুধু গীতা অধ্যয়ন ও পঠন-পাঠন করে তার দ্বারা ভগবানের জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। যে ব্যক্তি গীতা অধ্যয়ন করে উঠতে পারে না, শুধু দোষ-দৃষ্টিরহিত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক গীতা শ্রবণ করে, সে শরীর ত্যাগের পর ভগবদ্ধামে গমন করে (১৮।৬৮-৭১)। ভগবানের এই উদারতাকে কি বলা যায়!

কেউ ভগবানকে মানুক বা না মানুক, তাঁকে অভিনন্দিত করুক বা তাঁর মতবাদ খণ্ডন করুক, ভগবানের অস্তিত্ব ত্রিলোকের থেকে মুছে দিতেই চাক না কেন, তাহলেও ভগবানের সৃষ্ট এই পৃথিবী সবাইকেই সমানভাবে আশ্রয় দেয়। এই পৃথিবীতে সকলেই সমানভাবে ওঠা-বসা করে, প্রস্রাব-পায়খানা করে। কিন্তু পৃথিবী তার দোষাদির দিকে নজর দেয় না। ভগবানের সৃষ্ট জলে কেউ স্নান করে, কাপড় কাচে, আচমন করে বা মুখ ধোয় তবুও জল সমানভাবে সকলের পিপাসা মেটায়। ভগবানের সৃষ্ট অগ্নি সকলকে সমানভাবে আলো দেয়, প্রাণিগণের ভক্ষ্য চার প্রকারের খাদ্য হজম করায় এবং জ্যোতিঃপ্রকাশ দ্বারা সকলের ভয় দূর করে। ভগবানের সৃষ্ট বায়ু সকলকে সমানভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে সাহায্য করে, বাঁচতে সাহায্য করে। সবাইকে সমানভাবে শক্তি যোগায়। ভগবানের সৃষ্ট আকাশ সবাইকে সমান অবকাশ দেয়, দশদিকে বিস্তৃত হবার, বেড়ে ওঠবার জন্য সকলকে সমানভাবে অধিকার দেয়। এইরূপ যাঁর সৃষ্ট বস্তু এতো মহৎ, উদার, তিনি নিজে তাহলে কতো মহান!

কেউ যদি নিজ গৃহে কর্পোরেশনের জল ব্যবহার করে তাহলে তার জন্য কর দিতে হয়, কিন্তু ভগবান কত নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন, তার কোন কর ভগবানকে দিতে হয় না। এইরকমই কেউ যদি নিজ গৃহে বিদ্যুতের তার টানে তার জন্য তাকে কর দিতে হয়। কিন্তু ভগবান যে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন তার জন্য তাঁকে কোন কর দিতে হয় না। সবাই বিনামূল্যেই আলো-বাতাস পায়। এ যদি তাঁর অসীম মহানুভবতা না হয়, তাহলে একে কি বলা হবে?

ভগবান মানুষের শরীর ইত্যাদি এত সুন্দরভাবে তৈরী করেছেন, এত সম্পূর্ণতার সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন যে মানুষ এসব তার নিজস্ব বলে মনে করে। যদিও এসব নিজের বলে মনে করা বাস্তবে ভগবানের সৃষ্টির মহত্ত্বের প্রতি অবিচার করা।

ভগবান কখনো বলেন না যে, 'মানুষ আমাকে যদি মানে তবেই সে উদ্ধার পাবে।' এ তাঁর মস্ত বড় উদারতা। মানুষ তাঁকে মানল কি না মানল তাতে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু মানুষ তাঁর নিয়মগুলি যাতে পালন করে তাতে ভগবানের আগ্রহ আছে, কারণ মানুষ যদি ভগবানের নিয়ম-নীতি পালন না করে, তাহলে তার পতন হবে (৩।৩২)। সুতরাং মানুষ বিধাতা বা ভগবানকে না মেনেও যদি তাঁর বিধানগুলি মেনে চলে তাহলেও তার কল্যাণ হয়। হ্যাঁ, মানুষ যদি বিধাতাকে স্বীকার করে তাঁর বিধানও মেনে চলে, তবে ভগবান তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেন। কিন্তু যদি বিধাতাকে স্বীকার না করে শুধু তাঁর বিধানটি মেনে চলে, তাহলেও ভগবান তাঁকে উদ্ধার করেন। এর তাৎপর্য এই যে, যারা বিধাতাকে স্বীকার করে, তারা তাঁর প্রেম প্রাপ্ত হয় আর যারা তাঁর বিধানকে স্বীকার করে, তারা মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

বাস্তবে দেখতে গেলে বিধানকে মানা অথচ বিধাতাকে বা ভগবানকে স্বীকার না করা কৃতঘ্নতার কাজ। কারণ মানুষ যে কোন সাধন-ভজন করুক না কেন, তার সিদ্ধি ভগবৎকৃপাতেই হয়, যে সাধনাই মানুষ করুক তার সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ থাকেই। এই পৃথিবী তাঁর সৃষ্টি, জীব তাঁর সৃষ্টি, শাস্ত্র-বিধান সবই তাঁর সৃষ্টি—সবেতেই ভগবানের সম্বন্ধ আছে।

(১১) গীতায় ভগবানের ন্যায়কারিতা এবং দয়ালুতা

সংসারে যো দয়ালুশ্চ ন্যায়কারী ভবেন্ন সঃ।
কৃষ্ণে দয়ালুতা চৈব বর্তেতে ন্যায়কারিতা॥

যেখানে ন্যায় করা হয় সেখানে দয়া হতে পারে না, আর যেখানে দয়া করা হয় সেখানে ন্যায় করা যায় না। কারণ যেখানে ন্যায়ের কাজ হয় সেখানে শুভ-অশুভ কর্ম অনুসারে পুরস্কার অথবা শাস্তি বিধান করা হয় ; আর যেখানে দয়া করা হয়, সেখানে দোষীর অপরাধ ক্ষমা করা হয়, তাকে শাস্তি দেওয়া হয় না। এর তাৎপর্য এই যে, ন্যায় বিধান করা এবং দয়া করা—এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ আছে। এক স্থানে এই দুটি সহাবস্থান করতে পারে না। এই অবস্থায় ভগবানে ন্যায়কারিতা ও দয়ালুতা—এই দুটি কিভাবে একসঙ্গে থাকে ? কিন্তু একথা সেখানেই প্রযোজ্য যেখানে আইন বা বিধান সৃষ্টিকারী নির্দয় হন। যিনি দয়ালু তাঁর সৃষ্ট বিধানে ন্যায় এবং দয়া দুই-ই থাকে। তাঁর সৃষ্ট ন্যায়ে দয়া থাকে এবং তাঁর দয়াতেও ন্যায়কারিতা থাকে। ভগবান সকল প্রাণীর সুহৃদ—**'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (৫।২৯) ; সুতরাং তাঁর সৃষ্ট বিধানে দয়া এবং ন্যায় - দুই-ই থাকে।

ভগবান গীতায় বলেছেন যে, মানুষ মৃত্যুকালে যে ভাব স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মৃত্যুকালের স্মরণ অনুসারেই তার গতি হয় (৮।৬)। এ ভগবানের ন্যায়কারিতা, এতে কোন পক্ষপাত নেই। এই ন্যায়বিধানে ভগবানের দয়াই আছে। যদি অন্তিম সময়ে কেউ কুকুরের চিন্তা করতে করতে শরীর ত্যাগ করে, তবে সে কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয়। তেমনি যদি কেউ ভগবৎ-চিন্তা করতে করতে শরীর ত্যাগ করে, তবে সে ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য এই যে, যে মূল্যে কুকুর যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই মূল্যেই ভগবৎপ্রাপ্তি হতে পারে। এইপ্রকার ভগবানের বিধানে ন্যায়কারিতার সঙ্গে মহতী দয়াও থাকে।

অত্যন্ত সদাচারী ব্যক্তি যাঁরা, তাঁরা মৃত্যুকালে ভগবৎ চিন্তায় শরীর ত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ করেন। তেমনি অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি মৃত্যুর সময়ে কোন বিশেষ কারণবশতঃ ভগবানকে স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করে তাহলে তারও ঈশ্বর প্রাপ্তি (৮।৫) হয়। এ যে তাঁর কত দয়া এবং ন্যায়কারিতা !

ভগবান বলেছেন, 'অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে দৃঢ়সংকল্প হয়ে আমাকে স্মরণ করে তাহলে তাকে সাধু রূপে মান্য করা উচিত। সেই ব্যক্তি অতি শীঘ্র ধর্মাত্মা হয় এবং চির শান্তি লাভ করে (৯।৩০-৩১)। যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও ভগবৎভক্ত হতে পারে এবং শাশ্বত শান্তি লাভ করতে পারে, তাহলে ভগবৎভক্তও দুরাচার ও পাপাত্মা হয়ে উঠতে পারে এবং তারও পতন হতে পারে, কিন্তু ভগবানের নিয়ম সেরকম নয়। ভগবানের নিয়মে খুবই দয়া মিশে আছে যাতে দুরাচার ব্যক্তির কল্যাণ হতে পারে। কিন্তু ভক্তের কখনও পতন হতে পারে না—**'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'** (৯।৩১)। এতে ভগবানের ন্যায়কারিতা এবং দয়া দুই-ই আছে।

এখানে সংশয় হতে পারে যে, ভক্তের যদি কখনও পতন না হয়, তাহলে ভগবান অর্জুনকে নিজের ভক্ত রূপে স্বীকার করেও কেন বললেন—'যদি তুমি অহংকারবশতঃ আমার কথা মান্য না কর, তাহলে তোমার পতন হবে (১৮।৫৮)?' এর উত্তর হচ্ছে যে, ভক্ত যখন অহংকারবশতঃ ভগবানের আদেশ অমান্য করে, তখন সে আর ভক্ত থাকে না এবং তার পতন হয়। যে প্রকৃতই ভক্ত, সে ভগবানের আদেশ মানবে না এমন হওয়া অসম্ভব। অর্জুনকে ভগবান কেবল ধমক দিয়েছেন, ভয় দেখিয়েছেন, ফলতঃ অর্জুন ভগবানের আদেশ মান্য করেছিলেন এবং তাঁর পতন হয় নি (১৮।৭৩)।

যে ব্যক্তি সকামভাবে শুভকর্ম করে, তাকে শুভকর্ম অনুযায়ী স্বর্গাদিতে পাঠানো—এ ভগবানের ন্যায়-

বিচারের অঙ্গ। আর সেখানে পুণ্যকর্মের ফল ভোগের মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তিকে শুদ্ধ করা, পবিত্র করা—এই হল তাঁর দয়া। এইরূপই যে অশুভ কর্ম করে, তাকে নরকে এবং চুরাশী লক্ষ যোনিতে নিক্ষেপ করা—এ হচ্ছে ন্যায়বিচার ; সেখানে পাপের ফল ভোগ করিয়ে তাকে শুদ্ধ করে নিজের দিকে টেনে আনা, এই হচ্ছে তাঁর দয়া। যেমন, কেউ বহুদিন ধরে অসুখে কষ্ট ভোগার পর যখন সুস্থ হয়ে ওঠে, তখন তার ভগবৎকথা, ভগবৎনাম ভালো লাগে। এইরূপ কর্মের ফল অনুসারে যে অসুখ হয় তা তাঁর ন্যায়কারিতা এবং তার ফলস্বরূপ ভগবানে রুচি বা ভালোবাসা বৃদ্ধি পাওয়া হল তাঁর দয়ালুতা।

মানুষ জেনেশুনে পাপ, অন্যায় ইত্যাদি দুষ্কর্ম করে, কিন্তু সে না চাইলেও তাকে এর শাস্তিস্বরূপ জেল, জরিমানা ইত্যাদি ভোগ করতে হয়। এতে কর্মের অনুসারে শাস্তি ইত্যাদি যে ভোগ করতে হয় তা হল ভগবানের ন্যায়কারিতা এবং কখনও কখনও, 'আমি ভুল করেছি, তারই জন্য আমাকে এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে ; আমি যদি এই ভুল না করতাম তাহলে কি আমাকে এই শাস্তি পেতে হত ?'— এইরূপ যে বিচার এবং অনুশোচনা — তা হচ্ছে ভগবানেরই দয়া।

কর্ম অনুযায়ী অনুকূল-প্রতিকূল যে সমস্ত পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, সে সকলই ভগবানের ন্যায়বিধান আর যে ব্যক্তি অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিচলিত হয় না, তার কল্যাণ হয়—এটি হল তাঁর দয়ালুতা।

প্রশ্ন—শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে যে ঈশ্বর যাকে ঊর্ধ্বগতিতে নিয়ে যেতে চান, তাকে দিয়ে শুভ-কর্ম করান আর যাকে অধোগতিতে নিয়ে যেতে চান তাকে দিয়ে অশুভ-কর্ম করান—**এষ হ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ হ্যেবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে** (কৌষীতকি. ৩।৮)। তাহলে এতে ভগবানের ন্যায়কারিতা বা দয়ালুতা কোথায় ? এতো কেবল পক্ষপাত এবং বিষমতাই।

উত্তর—শুভকর্ম করিয়ে ঊর্ধ্বগতি পাওয়ানো এবং অশুভকর্ম করিয়ে অধোগতি করানো নয় বরং এ হল প্রারব্ধ অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করিয়ে তাকে শুদ্ধ করানো অর্থাৎ জীব নিজ শুভ-অশুভ কর্মফল যাতে ভোগ করতে পারে, সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে তার বিচারবোধ সৃষ্টি করা। যেমন, শুভকর্ম অনুযায়ী যদি কোন ব্যবসায়ীর লাভ হবার থাকে, তাহলে সেই সময় ভগবান তার সেইরূপ পরিস্থিতি এবং বুদ্ধি প্রদান করেন, যাতে সে সস্তায় জিনিসপত্র কেনে এবং বেশী দামে বেচে এবং তখন তার কেনা এবং বেচা দুইয়েতেই লাভ হয়। সেইরূপই অশুভকর্ম অনুযায়ী যদি কোন ব্যবসায়ীর লোকসান হবার থাকে, তবে ভগবান সেই সময় তাকে সেইরূপ পরিস্থিতি এবং বুদ্ধি প্রদান করেন, যাতে সে বেশী দামে জিনিস কেনে আর দাম পড়ে যায় যখন, তাকে সস্তায় বেচতে হয়। তখন কেনা এবং বেচা তার দুইয়েতেই লোকসান হয়। এইভাবে কর্ম অনুযায়ী লাভ ও লোকসান হওয়া ভগবানের ন্যায়বিচারের স্বরূপ এবং যাতে লাভ ও লোকসান হয়, সেই রূপ পরিস্থিতি ও বুদ্ধিতে প্রেরণা করা, যাতে সকলের শুভ-অশুভ কর্মবন্ধন কেটে যায়—এ ভগবানের দয়ারই নিদর্শন।

যদি শ্রুতির অর্থ এইভাবে করা হয় যে 'শুভ-অশুভ কর্ম করিয়ে মানুষের ঊর্ধ্ব এবং অধোগতি করানো' —তাহলে ভগবান যে ন্যায়কারী এবং দয়ালু—একথা সিদ্ধ হয় না। ভগবান সমস্ত প্রাণীতে সমভাব রাখেন, কারো ওপর তাঁর পক্ষপাত নেই—একথাও প্রমাণিত হয় না। যদি এরূপ মানা হয় তাহলে **'এই কাজ করা উচিত, ঐ কাজ করা উচিত নয়'**— শাস্ত্রের এইসব বিধি-নিষেধও মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং গুরুর শিক্ষা, সাধু ও মহাপুরুষদের উপদেশাদি সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। মানুষ যে বিবেকের দ্বারা কর্তব্য-অকর্তব্য বিচার করে— তাও ব্যর্থ হবে। মনুষ্যজন্মের যে বিশেষত্ব, স্বাতন্ত্র্য তারও কোন মূল্য থাকবে না এবং মানব পশু-পক্ষীর শ্রেণীতে নেমে আসবে অর্থাৎ নিজ উদ্যোগে কেউ আর কোন নতুন কাজ করতে পারবে না, নিজের উন্নতি এবং উদ্ধারও করতে পারবে না।

(১২) গীতায় ভগবানের বিবিধ রূপের প্রকাশ

স্বভক্তভাবেন পরিপ্লুতেন ভক্তস্য চাজ্ঞাপরিপালকেন।
স্বকং হি কৃষ্ণেন রথস্থিতেন বিভিন্নরূপং প্রকটী কৃতং চ॥

ভগবান যখন অবতাররূপে আসেন, তখন তিনি গুপ্তভাবে থাকেন, সকলের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন না (৭।২৫)। কিন্তু অর্জুনের ভাব দেখে ভগবান কৃপাপূর্বক তাঁকে গীতোক্ত তাঁর অনেক প্রকার রূপের প্রকাশ দেখালেন। যেমন—

'ভক্ত আমাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চায় আমি সেই কাজই করি এবং যেরূপে দেখতে চায় তার ভাব অনুযায়ী সেই রূপেই তার কাছে প্রকাশিত হই'—এইরূপে নিজেকে ভক্তের অধীন বোঝাবার জন্য ভগবান প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের কাছে **'সারথি'** রূপে প্রকটিত হন (১।২১-২৪)।

'যে ব্যক্তি কর্তব্য-অকর্তব্য, সৎ-অসৎ ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত, নিজে কোন মীমাংসা করতে অক্ষম হয়, সে যদি আমার শরণাগত হয়ে আমাকে ডাকে তাহলে আমি তাকে পরামর্শ দিই, তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিই'—এই কথা জানাবার জন্য ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং তাঁর শরণাপন্ন অর্জুনের কাছে **'গুরু'** রূপে প্রকটিত হলেন (২।৭)

'পরিস্থিতি অনুযায়ী যে বর্ণতে প্রকটিত হই বা যে আশ্রমে (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ইত্যাদি) থাকি সেই অনুসারে আমি আমার কর্তব্য পালন করি'—এই বার্তা জানাবার উদ্দেশ্যে ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'আদর্শ'** রূপে প্রকটিত হলেন (৩।২২-২৪)।

'আমি গুণ ও কর্ম অনুসারে প্রাণীদের সৃষ্টিই করি বা সূর্যাদিকে উপদেশ দিই অথবা অবতার রূপে এসে ধর্মের স্থাপনা করি বা দুষ্টের বিনাশ করে ভক্তদের রক্ষা করি বা পুত্ররূপে মাতা-পিতার আজ্ঞা পালনকারী হই বা সমস্ত প্রাণীদের মালিকই হই, এতে আমার ঈশ্বরত্বের কোনো হানি হয় না'—এই কথা জানাবার উদ্দেশ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান **'ঈশ্বর'**রূপে অর্জুনের সামনে প্রকটিত হলেন (৪।৬)।

'সকল যজ্ঞ এবং তপের ভোক্তা আমিই, আমিই সমস্ত লোকের পালক বা স্বামী এবং সমস্ত প্রাণীর অহৈতুক কল্যাণকারী'—এইরূপ নিজ মহত্ত্ব জানিয়ে অর্জুন তথা সমস্ত মানুষের হিতের উদ্দেশ্যে ভগবান পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুনের কাছে **'সর্বলোক-মহেশ্বর'** রূপে প্রকটিত হলেন (৫।২৯)।

'ধ্যানযোগী সাধকদের সকলের মধ্যে আমাকে এবং আমার মধ্যে সকলকে দর্শন করা অর্থাৎ যে যে স্থানে মন যায়, সেই সেই স্থানে (সর্বত্র) আমাকে অনুভব করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এইরূপ অনুভব হলে তবেই মন আমাতে লীন হওয়া সম্ভব'—এই কথা জানাতে ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ে **'ব্যাপক'** রূপে অর্জুনের সামনে প্রকটিত হলেন (৬।৩০)।

'সূত্রদ্বারা প্রস্তুত মণিসকলের (সূতোর গুটিকা) দ্বারা সূত্রে গ্রথিত মালার ন্যায় আমি সমস্ত জগৎ-সংসারে ওতপ্রোত হয়ে আছি, সকল প্রাণীর আদি ও সনাতন বীজ আমিই ; ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ রূপে তো আমিই আছি'—এইভাবে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**-এর বোধ করাবার জন্য ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'সমগ্র'** রূপে প্রকটিত হলেন (৭।২৯-৩০)।

'সগুণ-নিরাকার এবং নির্গুণ-নিরাকারের ধ্যানে যোগবলের আবশ্যক হয় বলে ঐ দুইয়ের ধ্যান করা কিছুটা কঠিন ; কিন্তু যে আমার অনন্য ভক্ত সে অতি সহজেই আমাকে প্রাপ্ত হয়'—এই কথা জানাবার জন্য ভগবান অষ্টম অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'সুলভ'** রূপে প্রকটিত হলেন (৮।১৪)।

'এই পৃথিবীতে সকলের মা, বাবা, ধাতা, পিতামহ, গতি, ভর্তা, নিবাসস্থান, বীজ ইত্যাদি সমস্তই আমি অর্থাৎ কার্য-কারণ, সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য ইত্যাদি সবকিছুই আমি'—এই কথা বলার জন্য ভগবান নবম অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'সৎ-অসৎ'** রূপে প্রকটিত হলেন (৯।১৯)।

'সকল প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্ত আমি ; সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত আমিই ; সমস্ত প্রাণীর মূল বীজও আমি ;

সাধক যে যে স্থানে সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, অলৌকিক কিছু দেখে, বাস্তবে সে সবই আমি'—এই কথা জানাতে ভগবান দশম অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'সর্বৈশ্বর্য'** রূপে প্রকাশ পেলেন (১০।৪১-৪২)।

'আমি আমার মাত্র একাংশের দ্বারা সমস্ত জগৎ-সংসারকে ব্যাপ্ত করে অবস্থিত আছি'—এই কথা জানাবার জন্য ভগবান একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়ে তাঁর সামনে **'বিশ্বরূপ'** রূপে প্রকটিত হলেন (১১।৫-৮)।

'যে ভক্ত আমার পরায়ণ হয়ে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, অনন্য ভক্তিযোগে আমার সগুণ-সাকার পরমেশ্বর রূপের ধ্যান ও আমার উপাসনা করে, তাকে আমি অতি শীঘ্র এই মৃত্যুরূপ জগৎ-সংসার-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করি'—এই কথা জানাবার জন্য ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের কাছে **'সমুদ্ধর্তা'** রূপে প্রকটিত হলেন (১২।৭)।

জ্ঞাতব্য যে সকল বিষয় আছে তার মধ্যে সবচেয়ে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় হল পরমাত্ম-তত্ত্ব। এই পরমাত্ম-তত্ত্ব ভিন্ন অপর যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, মানুষ তা যতই হৃদয়ঙ্গম করুক তবু তাতে সে পূর্ণতা লাভ করে না। কিন্তু যদি পরমাত্ম-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে, তাহলে তার আর কোন অপূর্ণতাই থাকে না—এই কথা জানাবার জন্য ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'জ্ঞেয়তত্ত্ব'** রূপে প্রকটিত হলেন (১৩।১২-১৮)।

'যে প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটিগুণ উৎপন্ন হয় তার অধিষ্ঠাতা বা স্বামী আমিই, মহাসর্গের শুরুতে আমিই এই জগৎ-সংসার রচনা করি। ব্রহ্ম, অবিনাশী, অমৃত, সনাতন ধর্ম তথা ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠাতাও আমি'—এই কথা জ্ঞাপন করার জন্য চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনের সামনে **'আদিপুরুষ'**রূপে প্রকটিত হলেন (১৪।২৭)।

'পৃথিবীর মূলে আমি ; সূর্য ও চন্দ্র ইত্যাদিতে আমারই তেজ আছে ; আমি নিজ ওজোবল দ্বারা এই পৃথিবীকে ধারণ করি ; আমি বেদসমূহের জ্ঞাতব্য এবং বেদের তত্ত্ব-নির্ণয়কারী ও বেদের দ্বারা জানার যোগ্য বিষয় ; আমি ক্ষরের বা সংসারের অতীত এবং অক্ষর বা জীবাত্মা থেকেও শ্রেষ্ঠ ; বেদে এবং শাস্ত্রে আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ নামে খ্যাত'—নিজের এই সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটি জানাবার জন্য ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ে অর্জুনের কাছে **'পুরুষোত্তম'** রূপে প্রকটিত হলেন (১৫।১৭-১৯)।

'দম্ভ, দর্প, অভিমান ইত্যাদি যত দুর্গুণ সবই মানুষের নিজের সৃষ্ট, এসব আমার নয় ; কিন্তু অভয়, অহিংসা, সত্য, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি যে সমস্ত উত্তম গুণ আছে তা সকলই আমার এবং যাদের এই গুণগুলি থাকে, তারা আমাকেই পায়'—এই কথা জানাতেই ভগবান ষোড়শ অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'দৈবী সম্পদ্'** রূপে প্রকটিত হলেন (১৬।১-৩)।

'যদি কেউ পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদি শুভকর্ম করে এবং তাতে কিছু ত্রুটি হয় বা অঙ্গবৈগুণ্য ঘটে, তাহলে যে ভগবানের উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ করা হচ্ছিল, তাঁর নাম করলে এই হানি বা অঙ্গ-বৈগুণ্য দূরীভূত হয়'—এটি জানাতে ভগবান সপ্তদশ অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'ওঁ তৎ সৎ'** নামের রূপে প্রকাশিত হলেন (১৭।২৩)।

'সমস্ত গীতা-উপদেশের কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি সমস্ত সাধনের সার হল আমাতে শরণাগতি'—এটি জানাবার জন্য ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'সর্বশরণ্য'** রূপে প্রকটিত হলেন (১৮।৬৬)।

তাৎপর্য এই যে, সাধকের ভগবানের প্রতি যেমন ভাব বাড়তে থাকে ভগবানও তেমনি তাঁর ভাব অনুযায়ী নিজেকে প্রকটিত করেন, এর ফলে সাধক ভক্তের ভাব, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত এতেই তাদের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। সাধককে কেবল একটি বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে, যেন তিনি তাঁর অনন্যভাব থেকে না সরেন অর্থাৎ অনন্যভাব থেকে কখনও বিচলিত না হন।

(১৩) গীতায় ধর্ম

বর্ণে তু যস্মিন্ মনুজঃ প্রজাতস্তত্রতাকার্যং কথিতঃ স্বধর্মঃ।
শাস্ত্রেণ তস্মান্নিয়তং হি কর্ম কর্তব্যমিত্যত্র বিধানমস্তি॥

গীতাতে ধর্মের বর্ণনাই মুখ্য। যদি গীতার আরম্ভ এবং শেষ অক্ষরগুলি ধরা হয় অর্থাৎ আরম্ভের '**ধর্মক্ষেত্রে**' পদ থেকে '**ধর্**' এবং শেষের '**মতির্মম**' পদ থেকে '**ম**' নেওয়া হয় তাহলে '**ধর্ম**' প্রত্যাহার হয়ে যায়, অতএব সমগ্র গীতাই ধর্মের অন্তর্গত হয়ে যায়।

গীতায় '**কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ**' (১।৪০),'**জাতিধর্মাঃ**' (১।৪৩) পদগুলির দ্বারা পরম্পরাগত কুলের মর্যাদা, রীতি এবং জাতির রীতিনীতিকেও 'ধর্ম' বলা হয়েছে ; '**ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ**' (২।৭) '**স্বধর্মম্ ধর্ম্যাৎ**' (২।৩১), '**ধর্মাম্,স্বধর্মম্**' (২।৩৩) '**স্বধর্মঃ**' (৩।৩৫ ; ১৮।৪৭) ইত্যাদি পদ দ্বারা নিজ নিজ বর্ণ অনুসারে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্মকেও 'ধর্ম' অথবা 'স্বধর্ম' বলা হয়েছে ; আর '**ত্রয়ীধর্মম্**' (৯।২১) পদ দ্বারা বৈদিক অনুষ্ঠানকেও 'ধর্ম' বলা হয়েছে। এই সমস্ত ধর্মগুলি কর্তব্যমাত্র মনে করে নিষ্কামভাবে তৎপরতার সঙ্গে পালন করলে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হয় (১৮।৪৫)।

যে ব্যক্তি যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করে, শাস্ত্রে সেই বর্ণের উপযোগী কর্তব্য-কর্ম ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা আছে ; সেই কর্মই সেই ব্যক্তির 'স্বধর্ম'। এবং শাস্ত্র যার জন্য যে কর্ম নিষেধ করেছে, তা অন্য বর্ণের ব্যক্তির পক্ষে বিহিতকর্ম হলেও (যার ক্ষেত্রে নিষেধ করা হয়েছে) তার পক্ষে 'পরধর্ম'। যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত 'পরধর্ম' অপেক্ষা স্বল্প-গুণসম্পন্ন নিজ ধর্মও শ্রেষ্ঠ। নিজধর্ম পালনকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হলেও, তা তার কল্যাণই করে। কিন্তু পরধর্ম আচরণ করলে বিপদকেই ডেকে আনা হয় (৩।৩৫)।

বর্ণাশ্রম কর্ম ব্যতিরেকেও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কর্তব্য-কর্ম উপস্থিত হয়, তা পালন করাও মানুষের স্বধর্ম। যেমন—তৎপরতার সঙ্গে অধ্যয়ন করাই বিদ্যার্থীর স্বধর্ম। অধ্যাপকের স্বধর্ম বিদ্যার্থীকে পড়ানো। কোন গৃহকর্মীর নিজ কাজটি ঠিকমত করাই তার স্বধর্ম। যে নিজ স্বীকৃত কর্ম (স্বধর্ম) নিষ্কামভাবে পালন করে, সে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় (১৮।৪৫)।

শম, দম, তপ, ক্ষমা ইত্যাদি ব্রাহ্মণের 'স্বধর্ম' (১৮।৪২)। এছাড়াও অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা, দান গ্রহণ করা ও দান করা ইত্যাদিও ব্রাহ্মণের 'স্বধর্ম'। শৌর্য, তেজ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের 'স্বধর্ম' (১৮।৪৩)। এছাড়া পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্তব্য ঠিকমতো পালন করাও ক্ষত্রিয়ের 'স্বধর্ম'। চাষ করা, পশুপালন করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করা বৈশ্যের 'স্বধর্ম' (১৮।৪৪)। তাছাড়া পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন কাজ এসে গেলে সুচারুরূপে তা সম্পন্ন করাও বৈশ্যের 'স্বধর্ম'। শূদ্রের 'স্বধর্ম' সকলের সেবা করা (১৮।৪৪)। এছাড়া পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাপ্ত অন্যান্য কর্ম করাও শূদ্রের 'স্বধর্ম'।

ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে অর্জুনের মাধ্যমে সমস্ত মানব জাতিকে এক বিশেষ বার্তা জ্ঞাপন করেছেন যে 'তুমি (উপরিউক্ত) সমস্ত ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে শুধু আমার শরণাগত হও, তাহলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব, তুমি চিন্তা কোরো না (১৮।৬৬)'। এর তাৎপর্য এই যে, নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমে মর্যাদার সঙ্গে থাকবার জন্য, নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবার জন্য উপরিউক্ত সকল ধর্মের পালন করা অত্যন্ত আবশ্যক। জগৎ-সংসার চক্রের সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালনের দৃষ্টিতেও এটি পালন করা অবশ্য কর্তব্য (৩।১৪-১৬)। কিন্তু একেই আশ্রয় করে থাকা উচিত নয়। আশ্রয় কেবল শ্রীভগবানেরই নেওয়া উচিত। কারণ বাস্তবে এটি নিজের ধর্ম নয়, শরীরকে নিয়ে ঘটে বলে এটি পরধর্মই।

ভগবান '**স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য**' (২।৪০) পদ দ্বারা সমত্বকে, '**ধর্মস্যাস্য**' (৯।৩) পদ দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এবং '**ধর্ম্যামৃতম্**' (১২।২০) পদ দ্বারা সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণগুলিকেও 'ধর্ম' বলে অভিহিত করেছেন। 'ধর্ম' বলার তাৎপর্য এই যে পরমাত্মার স্বরূপ হওয়ায় সমতা সকল প্রাণীরই স্বধর্ম (নিজের ধর্ম)। পরমাত্মার প্রাপ্তি করায় বলে জ্ঞান-বিজ্ঞানও সাধকের স্বধর্ম এবং স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় সিদ্ধ ভক্তের লক্ষণও সকলের স্বধর্ম।

(১৪) গীতায় সনাতন ধর্ম

বরিষ্ঠোঽখিলধর্মেষু ধর্ম এব সনাতনঃ।
জায়ন্তে সর্বধর্মাস্তু শাশ্বতো হি সনাতনঃ॥

জগতে মুখ্যভাবে চারপ্রকার ধর্ম প্রচলিত আছে — সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম। এই চারটি ধর্মের এক একটি ধর্মকে মানে এরূপ কয়েক কোটি করে লোক আছে। এই চারটি ধর্মের অন্তর্গত আরও কিছু উপধর্ম রয়েছে। সনাতন ধর্ম ছাড়া শেষ তিনটি ধর্ম প্রবর্তনার মূলে কোনও একজন ব্যক্তি রয়েছেন ; যেমন—ইসলাম-ধর্মের মূলে পয়গম্বর মোহম্মদ, বৌদ্ধ ধর্মের মূলে গৌতম বুদ্ধ এবং খ্রীষ্ট ধর্মের মূলে যীশুখ্রীষ্ট। কিন্তু সনাতন ধর্মের মূলে কাউকে পাওয়া যায় না। কারণ সনাতন ধর্ম কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্রবর্তিত ধর্ম নয়, এই ধর্ম অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। ভগবান যেমন শাশ্বত, (সনাতন), তেমনি সনাতন ধর্মও শাশ্বত। গীতায় সনাতন ধর্মকে ভগবান নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন —**ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং............শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য** (১৪।২৭)। যখন এবং যেই যেই যুগে এই সনাতন ধর্মের হ্রাস বা হানি হয়ে থাকে, সেই সেই সময় ভগবান অবতার হয়ে এসে এর সংস্থাপনা করেন (৪।৭-৮)। এর তাৎপর্য এই যে, ভগবানও এই ধর্ম সংস্থাপনা ও রক্ষাকল্পে অবতাররূপ গ্রহণ করেন ; একে তৈরী করতে বা সৃষ্টি করতে নয়। অর্জুনও ভগবানকে সনাতন ধর্মের রক্ষকই বলেছেন—'**ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা**' (১১।১৮)।

কোন বস্তু উৎপন্ন হয় আবার কোনওটির অনুসন্ধান করা হয়। যে বস্তু আগে থাকে না সেটি উৎপন্ন বা সৃষ্ট হয় এবং যে বস্তু আগে থেকেই থাকে তার কেবল অনুসন্ধান করা যায়। মুসলিম, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্ট—এই তিন ধর্মই কোন এক ব্যক্তির দ্বারা প্রবর্তিত ; কিন্তু সনাতন ধর্ম কোনও এক ব্যক্তির দ্বারা প্রবর্তিত নয়, এটি বিভিন্ন ঋষির দ্বারা অন্বেষণে প্রাপ্ত হয়েছে—'**ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ**'। সেইজন্য সনাতন ধর্মের মূলে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম বলা সম্ভব নয়। এই ধর্ম অনাদি, অনন্ত এবং শাশ্বত। অন্য সব ধর্ম তথা মত-মতান্তরও এই সনাতন ধর্ম থেকে উদ্ভূত। এইজন্য ঐ সকল ধর্মে মানবের কল্যাণের জন্য যেসব সাধনের কথা আছে, তা সব সনাতন ধর্ম থেকেই নেওয়া বলে মানতে হবে। অতএব ঐ সকল ধর্মে বর্ণিত অনুষ্ঠানাদি নিষ্কামভাবে কর্তব্য মনে করে পালন করলে উদ্ধারে কোনও সন্দেহ থাকে না।[১] প্রাণিসকলের কল্যাণের জন্য যে গভীর বিচার-বিবেচনা সনাতন ধর্মে করা হয়েছে, তা অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। সনাতন ধর্মের সমস্ত সিদ্ধান্ত পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকারী।

সনাতন ধর্মে যতপ্রকার সাধনপ্রণালী বর্ণিত হয়েছে, বিধি-বিধানের বর্ণনা আছে তা সবই সনাতন, অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। যেমন, ভগবান কর্মযোগকে অব্যয় বলেছেন—'**ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্**' (৪।১) আবার শুক্ল এবং কৃষ্ণ গতিপথকেও সনাতন বলা হয়েছে—'**শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে**' (৮।২৬)। গীতায় পরমাত্মাকেও সনাতন বলা হয়েছে— '**সনাতনস্ত্বম্**' (১১।১৮), জীবাত্মাকেও সনাতন বলা হয়েছে—'**জীবভূতঃ সনাতনঃ**' (১৫।৭), ধর্মকেও সনাতন বলা হয়েছে '**শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য**' (১৪।২৭), পরমাত্মার বর্তমানতাকেও সনাতন বলা হয়েছে— '**শাশ্বতং পদমব্যয়ম্**' (১৮।৫৬)। এর তাৎপর্য এই যে, সনাতন ধর্মে সমস্ত কিছুই সনাতন, অনাদিকাল থেকে

---

[১]প্রত্যেক ধর্মে কুধর্ম, অধর্ম এবং পরধর্ম—এই তিনটি থাকে। অপরের প্রতি অনিষ্টের ভাব, কূটনীতি ইত্যাদি হল 'ধর্মে কুধর্ম'। যজ্ঞে পশু বধ করা ইত্যাদি হচ্ছে 'ধর্মে অধর্ম' এবং যা নিজের জন্য নিষিদ্ধ, এইরূপ অপর বর্ণের ধর্ম ইত্যাদি হচ্ছে 'ধর্মে পরধর্ম'। কুধর্ম, অধর্ম এবং পরধর্ম— এই তিনটির দ্বারা কখনও কল্যাণ হয় না। কল্যাণ সেই ধর্মে হয়, যাতে নিজের স্বার্থ এবং অভিমান ত্যাগ হয় ও অপরের বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে হিত সাধিত হয়।

বহমান। সমস্ত ধর্মে এবং তার নিয়মে কখনও একভাব থাকতে পারে না, উপর থেকে দেখলে তাতে ভিন্নতা থাকবেই। কিন্তু এসবের দ্বারা প্রাপ্ত যে তত্ত্ব, তাতে কখনও ভিন্নতা থাকতে পারে না।

পহুঁচে পহুঁচে এক মত, অনপহুঁচে মত ঔর।
সন্তদাস ঘড়ী অরঠকী, ঢুরে এক হী ঠৌর॥
জব লগি কাচী খীচড়ী, তব লগি খদবদ হোয়।
সন্তদাস সীর্জ্যা পছে, খদবদ করৈ না কোয়॥

যতক্ষণ সাধনকারীর সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ মতভেদ, বাদ-বিবাদ থাকে। কিন্তু তত্ত্ব প্রাপ্তি হলে তত্ত্বভেদ আর থাকে না।

যে ব্যক্তি নিজের মতবাদ অনুযায়ী আশ্রম করতে সচেষ্ট থাকে সে সত্যকার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হয় না, আর আশ্রম দ্বারা সেই ব্যক্তির মহত্ত্ব কোন প্রকার বৃদ্ধি পায় না। আশ্রম তৈরী করে নিজের দল ভারী করার মতো লোক সকল ধর্মেই পাওয়া যায়। তারা ধর্মের নামে নিজের পূজা করে এবং করায়। কিন্তু যার মধ্যে সত্যকার তত্ত্ব জানবার ইচ্ছা থাকে, সে আশ্রম তৈরীতে আগ্রহী হয় না। সে তত্ত্বের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে। গীতাতেও আশ্রম সৃষ্টি করাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি, বরং মানবকল্যাণকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গীতার মত অনুযায়ী যে কোন ধর্মে বিশ্বাসকারী ব্যক্তি যদি নিষ্কামভাবে নিজের কর্তব্য পালন করে, তাহলে তার কল্যাণ হয়। গীতা সনাতন ধর্মকে শ্রদ্ধা দেখালেও কোন ধর্মে আগ্রহ দেখায় না বা কোন ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধভাবও দেখায় না। সুতরাং গীতা এক সার্বভৌম গ্রন্থ।

(১৫) গীতায় জ্যোতিষ

মহাপ্রলয়পর্যন্তং কালচক্রং প্রকীর্তিতম্।
কালচক্রবিমোক্ষার্থং শ্রীকৃষ্ণং শরণং ব্রজ॥

জ্যোতিষে কালই প্রধান অর্থাৎ এই কালকে ধরেই জ্যোতিষ চর্চা চলে। ভগবান বলেছেন 'কাল' হচ্ছে তাঁর স্বরূপ, 'গণনাকারীদের মধ্যে আমি কাল'—**'কালঃ কলয়তামহম্'** (১০।৩০)। কালের গণনা সূর্য থেকে হয়। এই সূর্যকে ভগবান **'জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্'** (১০।২১) বলে নিজের স্বরূপ হিসাবে দেখিয়েছেন।

সাতাশটি নক্ষত্র আছে। নক্ষত্রের বর্ণনা ভগবান **'নক্ষত্রাণামহং শশী'** (১০।২১) পদগুলির দ্বারা করেছেন। সওয়া দুই নক্ষত্রে এক একটি রাশি হয়। এইরূপ সাতাশটি নক্ষত্রে বারোটি রাশি হয়। ঐ বারো রাশির উপর সূর্য পরিভ্রমণ করে অর্থাৎ এক একটি রাশিতে সূর্য এক এক মাস থাকে। **'মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্'** (১০।৩৫) পদসমূহের দ্বারা ভগবান মাসগুলির বর্ণনা করেছেন। দুটি মাসে এক ঋতু হয় যার বর্ণনা **'ঋতূনাং কুসুমাকরঃ'** (১০।৩৫) বাক্যাংশে করা হয়েছে। তিনটি ঋতুতে এক একটি অয়ন হয়। অয়ন দুটি—উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন ; যার বর্ণনা অষ্টম অধ্যায়ের চব্বিশ-পঁচিশ সংখ্যক শ্লোকে আছে। দুই অয়ন মিলে এক বৎসর হয়। কয়েক লাখ বছরে এক একযুগ হয়[1] যার বর্ণনা ভগবান **'সম্ভবামি যুগে যুগে'** (৪।৮) পদে করেছেন। এইরূপ চার যুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি) নিয়ে এক চতুর্যুগ হয়। এইরূপ এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন (সর্গ) এবং এই এক হাজার চতুর্যুগেতেই

[1]সতের লাখ আটাশ হাজার বছরে 'সত্যযুগ', বারো লাখ ছিয়ানব্বই হাজার বছরে 'ত্রেতাযুগ', আট লাখ চৌষট্টি হাজার বছরে 'দ্বাপর যুগ' এবং চার লাখ বত্রিশ হাজার বছর হল কলিযুগের সময়কাল।

তাঁর একরাত (প্রলয়) হয়। যার বর্ণনা অষ্টম অধ্যায়ের সতের শ্লোক থেকে উনিশ শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে। এইভাবে ব্রহ্মার একশত বছর আয়ু হয়। ব্রহ্মার আয়ু পূর্ণ হলে মহাপ্রলয় হয়, যাতে সব কিছু পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়—**'কল্পক্ষয়ে'** (৯।৭) পদে ভগবান এর বর্ণনা করেছেন। এই মহাপ্রলয়ে কেবল 'অক্ষয়কাল' রূপ এক পরমাত্মা শেষ পর্যন্ত থাকেন, যার বর্ণনা ভগবান **'অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ'** (১০।৩৩) পদে করেছেন।

এর তাৎপর্য এই যে মহাপ্রলয় পর্যন্তই জ্যোতিষ গণনা চলতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্য পর্যন্তই জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধিকার।[1] সুতরাং সাধারণ মানুষের উচিত এই প্রাকৃত কালচক্র থেকে মুক্তি পাওয়া। এর অতীত হওয়ার জন্য অক্ষয়কালরূপ পরমাত্মার শরণ নেওয়া।

(১৬) গীতা এবং গুরুতত্ত্ব

গ্রন্থস্য কৃষ্ণস্য কৃপা সতাং চ সর্বত্র সর্বেষু চ বিদ্যমানা।
যাবন্ন তাঙ্খুদ্ধতে মনুষ্যস্তাবন্ন সাক্ষাৎ কুরুতে স্ববোধম্॥

অর্জুন সকল সময় ভগবানের সঙ্গেই থাকতেন, ভগবানের সঙ্গেই তাঁর খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ ; তবুও ভগবান অর্জুনকে গীতার উপদেশ তখনি দিলেন, যখন তাঁর মধ্যে নিজের শ্রেয়ের, কল্যাণের এবং উদ্ধারের ইচ্ছা জাগ্রত হল—**'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'** (২।৭)। এইরূপ ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ার পরই তিনি নিজেকে ভগবানের শিষ্য বলে মেনে নিলেন এবং ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য প্রার্থনা জানালেন—**'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'** (২।৭)। এইভাবে কল্যাণের ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ার পরই অর্জুন নিজেকে ভগবানের শিষ্যত্ব স্বীকার করে তাঁর কাছে শিক্ষা প্রার্থনা করলেন ; গুরু-শিষ্য পরম্পরার রীতি অনুযায়ী ভগবানকে তিনি গুরু করেন নি। ভগবানও যে, শাস্ত্রপদ্ধতি মেনে, অর্জুনকে শিষ্য করে, গুরুমন্ত্র দিয়ে, মাথায় হাত রেখে উপদেশ দিয়েছেন, তাও নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পারমার্থিক উন্নতিতে গুরু-শিষ্য রূপ সম্বন্ধ তৈরি করা অপরিহার্য নয়। বরং নিজের তীব্র জিজ্ঞাসা ও নিজ কল্যাণের তীব্র আগ্রহ হওয়াই অত্যন্ত আবশ্যক। নিজের উদ্ধারের তীব্র ইচ্ছা হলে সাধকের ভগবৎকৃপায়, সাধু-মহাপুরুষের অমৃতময় বচনে, শাস্ত্র দ্বারা, গ্রন্থ দ্বারা বা কোন ঘটনা, পরিস্থিতি বা সেই পরিবেশেই আপনা হতেই পারমার্থিক কথা, সাধন-সামগ্রী পাওয়া যায় এবং সাধকও তা গ্রহণ করেন।

গীতা বাহ্যিক বিধি, বাহ্যিক পরিবর্তনের তত সম্মান দেয় না যতটা সম্মান দেয় অন্তরের ভাব, বিবেক-বোধ, জিজ্ঞাসা এবং ত্যাগকে। গীতা যদি বাহ্য বিধিসমূহ, পরিবর্তন অথবা গুরু-শিষ্য সম্পর্ককে অধিক গুরুত্ব দিত, তবে এটি সকল সম্প্রদায়ের জন্য এত উপযোগী বা সম্মাননীয় গ্রন্থ হোত না, অর্থাৎ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বিধিসকল আলোচিত হলে সেই বিশেষ সম্প্রদায়ই এটি পালন করত এবং গীতা সমস্ত সম্প্রদায়ের উপযোগী হয়ে উঠত না বা এর পঠন-পাঠন, মনন-চিন্তন ইত্যাদিতে সকল সম্প্রদায়ের লোকের ইচ্ছা জাগত না। আসলে গীতার উপদেশ হচ্ছে সার্বভৌম, এটি বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তির জন্য নয়, বরং মনুষ্যমাত্রেরই জন্য।

গীতায় জ্ঞানের প্রকরণে **'প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন'** (৪।৩৪) এবং **'আচার্যোপাসনম্'** (১৩।৭) পদগুলির দ্বারা আচার্যের সেবা এবং উপাসনা করার কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে জ্ঞানমার্গী সাধকদের মধ্যে **'আমিই ব্রহ্ম'** এইরূপ আত্মাভিমান থাকার সম্ভাবনা থাকে। অতএব সাধকের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত আচার্য বা গুরুর অধিক প্রয়োজন থাকে। এই আবশ্যকতাও তখন থাকে যখন সাধকের তত তীব্র জিজ্ঞাসা থাকে না বা সে মনে করে নেয় যে গুরু উপদেশ

---

[1] প্রকৃতির অতীত যে পরমাত্মাতত্ত্ব রয়েছে সেখানে জ্যোতিষ পৌঁছতে পারে না।

দিলে তবেই জ্ঞান লাভ হবে। সাধকের মনে যখন তীব্র জিজ্ঞাসা জাগে তখন সে তত্ত্ব অনুভব না করা পর্যন্ত শান্তি পায় না, কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ে আটকে থাকে না এবং নিজের কোন বৈশিষ্ট্যের অহংকারও তার থাকে না। এইরূপ সাধকের জিজ্ঞাসা ভগবৎকৃপায় পূর্ণ হয় অর্থাৎ তিনি তত্ত্ব লাভ করেন।

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক হলেই জ্ঞান হবে, তেমন কথা নয়। কারণ যারা গুরুকরণ করেছে, গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্বীকার করেছে, তাদের সকলেরই যে জ্ঞান হয়েছে—তা নয়। কিন্তু জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে যে, জ্ঞান হয় এরূপ দেখা যায়— শোনাও যায়। জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যার থাকে তার গুরু-শিষ্য সম্পর্ক স্বীকার করা আবশ্যক হয় না। এর তাৎপর্য এই যে যতক্ষণ কোন ব্যক্তির মধ্যে তীব্র জিজ্ঞাসা না জাগে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্বীকার করলেও তার জ্ঞান হয় না, আর জিজ্ঞাসা তীব্ররূপ ধারণ করলে সাধক গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ছাড়াই যে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন। তীব্র জিজ্ঞাসু সাধককে ভগবান স্বপ্নে (শুকদেবাদি যাঁরা পূর্বে গুরু ছিলেন) সাধুদের দ্বারা মন্ত্র পাইয়ে দেন।

শিষ্য হলেই যে গুরুর উপদেশে জ্ঞান হবে এমন কোন নিয়ম নেই। কারণ উপদেশ শুনলেও শিষ্যের যদি নিজের জিজ্ঞাসা, আগ্রহ না থাকে তাহলে সে সেই উপদেশ ধারণ করতে পারে না। কিন্তু তীব্র জিজ্ঞাসা, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হলে মানুষ কোন সম্পর্ক ব্যতীতই উপদেশ ধারণ করতে পারে—**'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'**, (৪।৩৯)। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, জ্ঞান নিজ জিজ্ঞাসা এবং আগ্রহ দ্বারাই লাভ হয়, কেবলমাত্র গুরু করলেই হয় না।

যদি কারোর সত্যকার গুরু লাভ হয় এবং শিষ্য তাকে গুরু বলে, মহাত্মা বলে মানে, তাঁর ওপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রাখে, তবেই তার লাভ হবে। কিন্তু শিষ্যের যদি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না থাকে, তাহলে সাক্ষাৎ ভগবানের দেখা পেলেও তার কোন লাভ হয় না। দুর্যোধনকে ভগবান উপদেশ দিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করার জন্য অনেক বলেছেন, কিন্তু এ কথার কোন প্রভাবই দুর্যোধনের ওপর পড়েনি। সে না মানায়, ভগবানও কিছু করতে পারেন নি। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে নিজে মানলে, স্বীকার করলে তবেই কল্যাণ হবে। অতএব গীতা নিজেই নিজের উদ্ধার করার প্রেরণা জোগায়—**'উদ্ধরেদাত্মনাঽঽত্মানম্'** (৬।৫)।

গীতায় জ্ঞানমার্গে আচার্যাদির উপাসনার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কর্মযোগে এবং ভক্তিযোগে গুরুর আবশ্যকতার কথা বলা হয়নি। কারণ যখন কোন ঘটনা বা পরিস্থিতিতে মনে এই চিন্তা আসে যে, 'স্বার্থ দ্বারা কাজ করলে কখনও অভাব পূরণ হয় না, স্বার্থপরতা হচ্ছে পশুত্ব, এতে কোন মানবতা নেই', তখন মানুষ স্বার্থভাব পরিত্যাগ করে, কামনা পরিত্যাগ করে সেবাপরায়ণ হয়ে ওঠে। সেবাপরায়ণ হলে কর্মযোগীর মধ্যে স্বতঃই তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়—**'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি'** (৪।৩৮)।

একটি বিশেষ শক্তি আছে যার দ্বারা সমস্ত জগৎ-সংসার চালিত হয়। মানুষ যখন সেই শক্তিতে বিশ্বাস করে, তখনই ভগবদ্মুখী হয়। ভগবৎ-ভজনরত এইসব ব্যক্তির অজ্ঞান অন্ধকার স্বয়ং ভগবান দূর করে দেন (১০।১১) এবং তাকে মৃত্যুরূপ-সংসার-সাগর থেকে পরিত্রাণ করেন (১২।৭)।

ভগবানের এক বিশেষ উদারতা ও দয়ালুতা এই যে, যে ব্যক্তি তাঁকে মানে না, তাঁর মতবাদ খণ্ডন করে অর্থাৎ নাস্তিক, তার ভিতরও যদি গূঢ়-তত্ত্ব এবং নিজ স্বরূপকে জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহলে তাকেও ভগবান কৃপাপূর্বক জ্ঞানপ্রাপ্ত করিয়ে দেন।

যার দ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত হয়, জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, সঠিক পথ চেনা যায়, নিজ কর্তব্য জানা যায়, নিজ ধ্যেয়কে দেখা যায়, তাকেই গুরু-তত্ত্ব বলা হয়। এই গুরু-তত্ত্ব প্রত্যেকের মধ্যেই বিরাজমান। এই গুরু-তত্ত্ব যে ব্যক্তি, শাস্ত্র ইত্যাদিতে প্রকটিত থাকে, তাকেই নিজ গুরু বলে মানা উচিত।

বাস্তবে ভগবানই সবার গুরু, কারণ জগৎ-সংসারে যে যে স্থানে জ্ঞান-দীপ্তি প্রকাশিত হয়, তা ভগবান হতেই পাওয়া যায়। এই জ্ঞান যে যে স্থানে যে যে ব্যক্তিতে প্রকটিত হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি, শাস্ত্র ইত্যাদিতে প্রকটিত হয় তাকেই গুরু বলা হয়। আসলে ভগবানই মূলে সকলের গুরু। ভগবান গীতায় বলেছেন, 'আমিই সমস্ত দেবতা এবং মহর্ষিদের আদি অর্থাৎ তাঁদের উৎপাদক, সংরক্ষক, শিক্ষক'—**'অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ'** (১০।২)। অর্জুনও ভগবানের বিরাট রূপের স্তুতি করে

বলেছিলেন, 'ভগবান ! আপনিই সকলের গুরু'—'গরীয়সে' (১১।৩৭) ; 'গুরুর্গরীয়ান্' (১১।৪৩)। সুতরাং সাধকের গুরু খোঁজার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর 'কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্' বাক্য অনুযায়ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই গুরু এবং তাঁর বাণী গীতাকে মন্ত্র, উপদেশ মনে করে তাঁর আজ্ঞানুসারে সাধনায় লেগে থাকা উচিত। যদি সাধকের লৌকিক দৃষ্টিতে গুরুর আবশ্যকতা হয়, তাহলে জগদ্গুরু নিজেই তাঁকে গুরু পাইয়ে দেন, কারণ তিনি ভক্তের যোগক্ষেম বহনকারী—'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' (৯।২২)।

(১৭) গীতা এবং বেদ

যস্য নিঃশ্বসিতা বেদা যস্য বৈ মার্গদর্শকাঃ।
স কৃষ্ণঃ স্বস্বরূপাংস্তান্ স্বয়ং খণ্ডয়তে কথম্॥

বেদ নামটি জ্ঞানের বাচক[১]। সেই জ্ঞান দ্বারাই সব ব্যবহারাদি হয় এবং সকলের মঙ্গল হয় অর্থাৎ সাধারণ ব্যবহার থেকে শুরু করে মোক্ষ পর্যন্ত এই জ্ঞান দ্বারাই সবকিছু সিদ্ধ হয়। এই জ্ঞানই পৃথিবীতে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ—এই চার সংহিতা রূপে প্রসিদ্ধ। পুরাণ, স্মৃতি, ইতিহাস ইত্যাদিতে তথা পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপে যা কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তা সমস্তই মূলে বেদ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। সেই জ্ঞানকে কারো পক্ষে খণ্ডন বা অনাদর করা সম্ভবই নয়। যদি কেউ এটি খণ্ডন করে তাহলে বাস্তবে সেই ব্যক্তি নিজেরই হীনতা প্রকাশ করে, নিজেকেই খণ্ডন করে।

ভগবান গীতায় বেদকে অত্যন্ত সম্মান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'যার দ্বারা লৌকিক এবং পারমার্থিক সিদ্ধি হয়, সেই সকল কর্ম-বিধানের জ্ঞান বেদ থেকেই জানা যায়'—'**কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবম্**' (৩।১৫) ; বহুপ্রকার যজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধন প্রণালী বেদের বাণীতেই বিস্তারিতভাবে জানানো আছে—'**এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে**' (৪।৩২)। ভগবান নিজের সম্বন্ধেও বলেছেন যে, 'আমিই ঋক্, সাম এবং যজুঃ'—'**ঋক্ সাম যজুরেব চ**' (৯।১৭) ; 'বেদের মধ্যে সামবেদ আমার স্বরূপ'—'**বেদানাং সামবেদোঽস্মি**' (১০।২২) 'বেদমাতা গায়ত্রী আমারই স্বরূপ'—'**গায়ত্রী ছন্দসামহম্**' (১০।৩৫) ; 'সমস্ত বেদে আমিই একমাত্র জানবার বস্তু অর্থাৎ চার বেদে আমার স্বরূপই প্রতিপাদিত হয়েছে তথা বেদের তত্ত্ব নির্ণয়কারী এবং বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হয়ে বেদার্থ পরিজ্ঞাত আমিই করাই,' '**বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্**' (১৫।১৫) ; 'শাস্ত্রে এবং বেদে আমিই পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ'—'**অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ**' (১৫।১৮)।

গীতায় '**যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্**' (২।৪২)—'লোকদেখানো প্রীতিকর বাক্য', '**বেদবাদরতাঃ**' (২।৪২)—'বেদের বাদ-প্রতিবাদে রত ব্যক্তিগণ' ; '**ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি**' (২।৪৩)—'ভোগৈশ্বর্য লাভের উপায়স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের বর্ণনাসূচক বাক্য', '**ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ**' (২।৪৫)—'বেদ তিনগুণের কার্যরূপ সংসারের প্রতিপাদনকারী', '**জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে**' (৬।৪৪)—'সমতার জিজ্ঞাসুও বেদে কথিত সকাম অনুষ্ঠান অতিক্রম করে যায়', '**বেদেষু----যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্**'। **অত্যেতি তৎসর্বমিদং---**' (৮।২৮)—'বেদাদিতে যে সকল পুণ্যফল কথিত আছে, যোগী সে সমস্ত অতিক্রম করে যান', '**এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা**

---

[১]'বেদ' শব্দটি 'বিদ্ (জ্ঞানে)' ধাতু থেকে জাত।

লভন্তে' (৯।২১)—'এইভাবে তিনটি বেদে কথিত সকাম ধর্মের আশ্রিত ভোগকামনাকারী মানুষ সংসারে গমনা-গমন করে থাকেন' ইত্যাদি পদগুলির দ্বারা বেদের যে নিন্দা বা অসম্মান হয় বাস্তবে সেটি বেদের নয়, বরং তা সকাম ভাবেরই নিন্দা। কারণ সকামভাবের জন্যই মানুষকে বারংবার জন্ম মরণ চক্রে আবর্তিত হতে হয়, বন্ধন দশায় পড়তে হয়। সুতরাং ভগবান সকামভাবেরই নিন্দা করেছেন, বেদের নয়।

গীতায় বেদপাঠ, অধ্যয়ন ইত্যাদি দ্বারা ভগবানের বিশ্বরূপ ও চতুর্ভুজরূপ দর্শনের যে নিষেধ আছে (১১।৪৮, ৫৩), তার তাৎপর্য এই যে, কেবলমাত্র বেদসমূহ পাঠ ও অধ্যয়ন দ্বারাই ভগবানের দর্শন লাভ হয় না, তাঁর দর্শন কেবলমাত্র অনন্য প্রেম দ্বারাই হয়। যদি বেদ পাঠ, অধ্যয়ন ইত্যাদি ভগবানের আদেশ বলে মনে করা যায়, নিষ্কামভাবে শুধুমাত্র তাঁর প্রসন্নতার জন্যই করা যায়, তবে ভগবৎকৃপায় তাঁর দর্শন লাভ সম্ভব হয়। কারণ ভগবান ভাবগ্রাহী, ক্রিয়াগ্রাহী নন।

বেদ শ্রুতিমাতা, মা সমস্ত বালকের কাছেই সমান। তার জন্য বেদমাতা নিজের সন্তানদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুযায়ী সর্বপ্রকার লৌকিক এবং পারমার্থিক সিদ্ধির সাধন উপায় দেখিয়েছেন। নিজ মাতার অসম্মান এবং নিন্দা কোন্ সন্তান করতে পারে ? আর করবেই বা কেন ? ভগবানও গীতায় বেদসমূহকে নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন ; সুতরাং তিনি নিজের স্বরূপের অসম্মান করবেন কীভাবে ? এবং তাঁর দ্বারা তাঁর নিজ স্বরূপের অসম্মান হবেই বা কিরূপে ?

(১৮) গীতায় জাতি বর্ণনা

জন্মনা মন্যতে জাতিঃ কর্মণা মন্যতে কৃতিঃ।
তস্মাৎ স্বকীয়কর্তব্যং পালনীয়ং প্রযত্নতঃ॥

উচ্চ-নীচ যোনিতে যে শরীর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা সমস্তই গুণ এবং কর্ম অনুযায়ী পাওয়া যায় (১৩।২১), (১৪।১৬, ১৮)। গুণ এবং কর্ম অনুযায়ীই মানুষের জন্ম হয় অর্থাৎ পূর্বজন্মে মানুষের যেমন গুণ ছিল এবং যে যেমন কর্ম করেছিল, সেই অনুযায়ী তার জন্ম হয়। ভগবান গীতায় বলেছেন যে, 'প্রাণিসকলের গুণ ও কর্ম অনুযায়ী আমি চারটি বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সৃষ্টি করেছি'—'**চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ**' (৪।১৩)। সুতরাং গীতা জন্ম (উৎপত্তি) থেকেই জাতিপ্রথা স্বীকার করে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে বর্ণ এবং যে জাতির মাতা-পিতা হতে জন্ম লাভ করে, তার দ্বারাই তার জাতি নিরূপিত হয়।

'জাতি' শব্দটি '**জনি প্রাদুর্ভাবে**' এই সূত্রানুসারে জন্ ধাতুর থেকে উৎপন্ন। এই জন্য জাতি জন্ম থেকেই মানা হয়, কর্ম থেকে নয়। কর্মের দ্বারা 'কৃতি' হয়, যা '**কৃ**' ধাতু থেকে উদ্ভূত, তাই জাতির মর্যাদারক্ষা সেই অনুযায়ী কর্তব্য-কর্ম করলে তবেই হয়।

ভগবান (১৮।৪১এ) জন্ম-অনুযায়ীই কর্ম বিভাগ করেছেন। মানুষ যে বর্ণ বা জাতিতে জন্ম নেয় এবং শাস্ত্রে সেই বর্ণের জন্য যে কর্মের বিধান আছে, সেই কর্মই ঐ বর্ণভুক্ত ব্যক্তির '**স্বধর্ম**' এবং যে কর্ম তাদের জন্য নিষিদ্ধ ঐ বর্ণের কাছে তা হচ্ছে 'পরধর্ম'। যেমন যজ্ঞ করা, দান গ্রহণ করা ইত্যাদি শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কর্ম হওয়ায় এটি তাদের 'স্বধর্ম'। আবার এই কর্মগুলি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ হওয়ায় তাদের কাছে 'পরধর্ম'। স্বধর্ম পালনকালে মানুষ যদি মৃত্যুপ্রাপ্তও হয়, তথাপি তার কল্যাণ হয় ; কিন্তু পরধর্ম বা অপরের জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য-কর্ম আচরণ জন্ম-মৃত্যুরূপ ভীতি প্রদান করে (৩।৩৫)। অর্জুন ক্ষত্রিয় ছিলেন, সুতরাং যুদ্ধ করাই তাঁর স্বধর্ম। সেইজন্য ভগবান তাঁকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, 'ক্ষত্রিয়ের জন্য যুদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই কল্যাণকারী কাজ নেই' (২।৩১) ; 'যদি তুমি এই

ধর্মযুদ্ধ না করো, তবে স্বধর্ম ও কীর্তি পরিত্যাগের জন্য তুমি পাপভাগী হবে' (২।৩৩)।

ভগবান গীতায় নিজ নিজ বর্ণ অনুসারে কর্তব্য-কর্ম করার ওপর খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, নিষ্কামভাবে তৎপরতার সঙ্গে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় (৩।১৯ ; ১৮।৪৫), বিধি দ্বারা পরমাত্মার পূজা করে মানুষ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় (১৮।৪৬)। পরমাত্মার পূজা পবিত্র বস্তু দ্বারা হয়, অপবিত্র বস্তুর দ্বারা নয়। নিজ কর্মই হচ্ছে সেই পবিত্র বস্তু, অপরের কর্ম নিজের জন্য (নিষিদ্ধ হওয়ায়) অপবিত্র বস্তু। সুতরাং নিজ কর্মের দ্বারা পরমাত্মার পূজা করলে কল্যাণ হয় এবং অপরের কর্ম করলে তাতে পাতকী হতে হয়। নিজ কর্মকে (স্বকর্ম) ভগবান 'সহজ কর্ম' বলে বর্ণনা করেছেন। সহজ কর্মের অর্থ হচ্ছে—সঙ্গে নিয়ে জন্মানো কর্ম। যেমন কেউ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মালে, ক্ষত্রিয় কর্মও তার সঙ্গে জন্ম নেয়—অতএব ক্ষত্রিয়-কর্ম তার জন্য সহজ কর্ম। ভগবানও চার বর্ণের জন্য সহজ, স্বভাবজ কর্মের বিধান করেছেন (১৮।৪২-৪৪)। এই স্বভাবজ কর্ম করলে মানুষ পাপভাগী হয় না (১৮।৪৭)। যেমন স্বতঃ-প্রাপ্ত ন্যায়যুদ্ধেও মনুষ্য হত্যা হয়, কিন্তু এটি শাস্ত্রবিহিত সহজ কর্ম হওয়ায় ক্ষত্রিয়ে পাপ বর্তায় না।

মানুষ যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, সেই অনুযায়ী শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্ম করলে সেই জাতি রক্ষা পায় আর বিপরীত কর্ম করলে সেই জাতিতে কর্মসংকর বশতঃ বর্ণসংকর ঘটে যায়। ভগবান নিজের সম্বন্ধেও বলেছেন যে, 'যদি আমি নিজবর্ণ অনুযায়ী কর্তব্য পালন না করি, তাহলে আমি বর্ণসংকর সৃষ্টিকারী তথা সমস্ত প্রজার নাশ বা পতনকারী হই' (৩।২৩-২৪)। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ বর্ণ অনুযায়ী কর্তব্যের পালন করে না, সেই ইন্দ্রিয় ভোগ পরায়ণ এবং পাপময় জীবন যাপনকারী মানুষের সংসারে বাঁচাই বৃথা (৩।১৬)।

সকল মানুষেরই নিজ নিজ কর্তব্য-কর্ম দ্বারা নিজ জাতির রক্ষা করা উচিত। এর জন্য পাঁচটি কথা মনে রাখা খুবই প্রয়োজন—

১) **বিবাহ**— কন্যার বিবাহ দেওয়া বা পুত্রবধূ আনা নিজ নিজ জাতির মধ্যে হওয়া ভালো। কারণ অপর জাতির কন্যা নিয়ে এলে রজোবীর্য জনিত বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা থাকায় সন্তান বর্ণসংকর জন্মাবে। এরূপ সন্তানের আপন পূর্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা না থাকলে সে তো পূর্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করবে না, পিণ্ড-জল প্রদান করবে না। কখনো লোক-লজ্জায় যদি সে প্রদান করেও, তাহলে সেই শ্রাদ্ধ-তর্পণ, পিণ্ড-জল তাঁদের প্রাপ্তি হবে না। এর দ্বারা পিতৃপুরুষেরা নিজ নিজ স্থান থেকে পতিত হন (১।৪২)। গীতায় বলা আছে, যে ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছামত কাজ করে, তার কখনো অন্তঃকরণের শুদ্ধিরূপ সিদ্ধি মেলে না, সুখও মেলে না আর তার পরমগতিও লাভ হয় না (১৬।২৩)। অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয় স্থির করতে শাস্ত্রকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত (১৬।২৪)।

২) **ভোজন**—আহারও নিজ নিজ জাতি অনুযায়ী হওয়া উচিত। যেমন ব্রাহ্মণদিগের রসুন, পেঁয়াজ খাওয়া দূষণীয় ; কিন্তু শূদ্রের তাতে দোষ হয় না। আমরা যদি ভিন্ন জাতির লোকের সঙ্গে ভোজন করি, তাহলে আমাদের শুদ্ধি তাদের ওপর কোন প্রভাব ফেলে না, কিন্তু তাদের অশুদ্ধি আমাদের ওপর নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং মানুষের নিজ নিজ জাতি অনুসারেই খাওয়া-দাওয়া করা কর্তব্য।

৩) **বেশভূষা**—পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আজকাল নিজ জাতির পোশাকআশাকও প্রায়শঃ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রায় সকল জাতির বেশভূষার মধ্যেই বিকৃতি এসে গেছে, যার দ্বারা 'কোন ব্যক্তি কি জাতির'—তা বুঝতে পারা যায় না। অতএব মানুষের নিজ জাতি অনুযায়ী বেশভূষা ধারণ করা কর্তব্য।

৪) **ভাষা**— অপর ভাষা বা লিপি শেখায় দোষ নেই, কিন্তু সেই অনুযায়ী নিজেকেও পাল্টে ফেলা অত্যন্ত দোষ। যেমন ইংরাজী শিখে নিজ বেশভূষা, খাওয়া-দাওয়া, চালচলন ইত্যাদিতে নিজেকে ইংরেজ বানিয়ে ফেলা, সেই ভাষাকে নিজের ভাষা করে নেওয়া তো নয়, বরং নিজেকেই হারিয়ে ফেলা। নিজের বেশভূষা, খাওয়া-থাকা ইত্যাদি যথাযথ রেখেই ইংরাজী শেখা ইংরাজী ভাষা ও অক্ষরকে নিজের করে নিতে হবে। সুতরাং অন্য ভাষার জ্ঞান থাকলেও কথাবার্তা নিজ ভাষাতেই হওয়া উচিত।

৫) **ব্যবসায়**—ব্যবসায় (কাজকর্ম)ও নিজ জাতি অনুসারে হওয়া উচিত। গীতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রদের জন্য পৃথক পৃথক কর্মের বিধান করা আছে (১৮।৪২-৪৪)।

(১৯) গীতায় চারটি আশ্রমের বর্ণনা

যথা সর্বেষু শাস্ত্রেষু প্রোক্তাশ্চত্বার আশ্রমাঃ।
গীতয়া ন তথা প্রোক্তাঃ সংকেতেনৈব দর্শিতাঃ ॥

গীতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র— এই চারটি বর্ণের স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা আছে ; যেমন-**'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্'** (৪।১৩) ; **'ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ'** (১৮।৪১) ইত্যাদি ; কিন্তু ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার আশ্রমের বর্ণনা স্পষ্টভাবে করা হয় নি। এই চারটি আশ্রমের বর্ণনা গীতায় সংকেতরূপে গৌণভাবে পাওয়া যেতে পারে ; যেমন—

(১) যে পরমাত্মতত্ত্ব পাবার আশায় ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য পালন করেন—**'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি'** (৮।১১) পদটিতে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সংকেত বলে মানা যায়।

(২) যে ব্যক্তি অপরের প্রাপ্য না দিয়ে নিজে সব একাকী ভোগ করে, সে চোর—**'তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ'** (৩।১২) ; যে ব্যক্তি কেবল নিজের শরীর পোষণের জন্য রন্ধন করে ; সেই পাপী পাপ ভক্ষণ করে—**'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্ম-কারণাৎ'** (৩।১৩) ইত্যাদি পদকে গার্হস্থ্য আশ্রমের সংকেত বলা যেতে পারে।

(৩) কিছু ব্যক্তি আছে যারা তপস্যারূপ যজ্ঞ করে থাকে—**'তপোযজ্ঞাঃ'** পদটিতে বানপ্রস্থ আশ্রমের সংকেত রয়েছে।

(৪) যিনি সর্বপ্রকার ভোগোপকরণ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছেন—**'ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ'** (৪।২১) পদটিতে সন্ন্যাস আশ্রমের সংকেত পাওয়া যায়।

গীতায় বর্ণগুলির বিষয়ে স্পষ্টরূপে এবং আশ্রমগুলির সংকেতে বর্ণনা করার কারণ এই যে, সেই সময় কর্তব্য-কর্মরূপ যুদ্ধের প্রসঙ্গ ছিল, আশ্রমের নয়। তাই ভগবান গীতায় বর্ণগত কর্তব্য-কর্মের বর্ণনাই বেশী করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এতেও ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য কর্ম নিয়ে যত আলোচনা করা হয়েছে, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রদের নিয়ে তত আলোচনা করা হয় নি।

আশ্রম নিয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা না করার অন্য কারণ এই যে, অন্যান্য শাস্ত্রে যেখানে আশ্রমগুলির বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে ক্রমশঃ আশ্রম বদল করার কথাই বলা হয়েছে। আশ্রম বদল করার কথাও মানুষের কল্যাণের জন্যই বলা হয়েছে। কিন্তু গীতার উপদেশ এই যে, নিজ কল্যাণ করার জন্য আশ্রম বদলানোর কোন প্রয়োজন নেই, বরং ব্যক্তি যে পরিস্থিতিতে যে বর্ণে, আশ্রম ইত্যাদিতে থাকে, তাতেই সে নিজ কর্তব্য যদি সঠিকভাবে পালন করে তাহলে নিজ কল্যাণ সাধন করতে পারে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের মত ঘোরতর কর্মে লিপ্ত থাকা মানুষও নিজের কল্যাণ করতে পারে। এর তাৎপর্য এই যে, আশ্রম ভেদে জীবের কল্যাণে কোন ভেদ আসে না। বর্ণের ভেদও কর্তব্য-কর্মের দৃষ্টিতেই করা হয় অর্থাৎ যে কর্তব্য-কর্মই করা হোক না কেন তা বর্ণ ভেদের দৃষ্টিতেই করা হয়ে থাকে। সেইজন্য ভগবান চারটি বর্ণের সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন। বর্ণগুলি নিয়ে আলোচনা করার কালে আশ্রমের আলোচনাও তার মধ্যে এসে পড়ে। এইভাবে দেখতে গেলে পৃথক্‌ভাবে আশ্রমের বর্ণনা করার আর প্রয়োজন হয় না।

(২০) গীতায় সৈনিকদের জন্য শিক্ষা

পালনীয়ং স্বকর্তব্যং ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতৈঃ।
নিত্যত্বাদাত্মনো মৃত্যোর্ভেতব্যং নৈব সৈনিকৈঃ॥

ভারতীয় শিক্ষা এই যে, কোন সময়, কোন পরিস্থিতিতেই যেন মানুষের মধ্যে কাপুরুষতা, ভীরুতা, এবং কর্তব্য-বিমুখতা ইত্যাদি কিঞ্চিন্মাত্র না আসে। বরং সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতেই উৎসাহ বজায় রাখা উচিত। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে, 'সাত্ত্বিক ব্যক্তি'র লক্ষণ বলার সময় ভগবান দুটি কথা বলেছেন— আসক্তি এবং অহংকার—এই দুটির ত্যাগ, ধৈর্য এবং উৎসাহ—এই দুটির ধারণ করা তথা সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি এই দুটিতে নির্বিকার থাকা। এই ছটির মধ্যে মানুষের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান— ধৈর্য এবং উৎসাহ। কর্তব্যরূপে যে কাজকে স্বীকার করা হয়েছে, তাতে লেগে থাকার নাম 'ধৈর্য' এবং সেই লক্ষ্যে কর্মপ্রবণতা, তৎপরতা ইত্যাদির নামই 'উৎসাহ'।

পর্বত যেমন অচল, অটল, সৈনিকদেরও তেমনি নিজ কর্তব্যে অচল, অটল থাকতে হয়। কোনও বিপরীত অবস্থা বা পরিস্থিতি এলেও কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হওয়া। কারণ শরীর তো প্রতিক্ষণই মরছে, মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে এবং স্বয়ং (আত্মা) তো অমর, তাঁর কখনও মৃত্যু হয় না (২।২৩-২৫)। সুতরাং মৃত্যুর জন্য কখনও ভীতি থাকা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ নিজ কর্তব্যপালন কালে যদি মৃত্যুও হয়, তাহলেও তাতে কল্যাণ হয়—**'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'** (৩।৩৫)। কিন্তু নিজ কর্তব্য-কর্ম থেকে চ্যুত হলে ভয় আসে অর্থাৎ ইহলোকে অপমান, তিরস্কার, হানি ইত্যাদির ভয় থাকে এবং পরলোকে দুর্গতিপ্রাপ্তি হয়— **'পরধর্মো ভয়াবহঃ'** (৩।৩৫)। অতএব যে যুদ্ধ কর্তব্যরূপে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত তা করতে বিশেষভাবে উৎসাহী হওয়া উচিত। সৈনিকদের পক্ষে যুদ্ধের মত কল্যাণকারী অন্য কোন ধর্ম নেই। সেই সৈনিকেরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যাদের অনায়াসে ধর্মযুদ্ধে যোগ দেওয়ার আহ্বান আসে (২।৩১-৩২)।

নিজ কর্তব্য পালনে খুবই উৎসাহী হওয়া উচিত। কোন কাজে যদি সফলতা পাওয়া যায়, তাহলে তাতে যেরূপ উৎসাহ থাকে—এইরূপ উৎসাহ, বিফলতা এলেও নিজের কর্তব্য পালনে বজায় রাখা উচিত। নিজ কর্তব্যসাধনের ক্ষেত্রে সিদ্ধি-অসিদ্ধি বা সফলতা-বিফলতার কোনই স্থান নেই। কারণ লৌকিক সফলতাও বিফলতা আর বিফলতাও বিফলতা। নিজ কর্তব্যপালনে যদি সফলতা আসে, তবে সেটিও সফলতা এবং বিফলতা এলে তাও সফলতা (২।৩৭)। ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসীর হুকুম দেওয়ার পর কারাগারে তাঁর শরীরের ওজন বেড়ে গিয়েছিল, কেননা তাঁর মনে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধেই বিচার ছিল, সফলতা বা বিফলতা নিয়ে নয়।

আমাদের ভারতবর্ষের সৈনিকদের যুদ্ধে এতো উৎসাহ ছিল যে, শরীর থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেলেও তাঁরা শত্রুসংহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকতেন। যুদ্ধবীর সৈনিকের দেহ ক্ষতবিক্ষত হতে থাকলেও তাঁর উৎসাহ বাড়ত বৈ কমত না। ক্ষত-জনিত কষ্ট হলেও তাঁর দুঃখ হয় না, বরং নিজ কর্তব্য পালন করতে একরকমের সুখ অনুভব করেন, যা তাঁর উৎসাহকে বাড়িয়ে তোলে। এইরূপ যুদ্ধবীর সৈনিকদের উৎসাহ অন্য সৈনিকদের ওপর প্রভাব জাগায়। ঐসব উৎসাহী সৈনিকদের কথা শুনে কাপুরুষেরাও উৎসাহিত হয়।

(২০) গীতায় ভগবানের শক্তিসমূহ

আদ্যা গুণময়ী দৈবী তথান্যা দিব্যচিন্ময়ী।
যোগমায়েতি চ প্রোক্তা গীতায়াং পঞ্চ শক্তয়ঃ॥

গীতায় ভগবানের পাঁচ প্রকার শক্তির বর্ণনা আছে ; যেমন—

১) **মূল প্রকৃতি**—মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত প্রাণী এই মূল প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ এই মূল প্রকৃতিতে লীন হয় —**'সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্। কল্পক্ষয়ে**------(৯।৭)'। মহাসর্গের সময় ভগবান এই মূল প্রকৃতিকে বশ করে নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত প্রাণিকুলের সৃষ্টি করেন—**'প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য**-----' (৯।৮) ; এবং এই প্রকৃতি ভগবানের অধিষ্ঠানবশতঃ সমস্ত জগৎ-সংসার সৃষ্টি করে (৯।১০)। এই মূল প্রকৃতিকে ভগবান **'মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্'** (১৪।৩) এবং **'তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা'** (১৪।৪) —এই পদগুলির দ্বারা সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি স্থান এবং নিজেকে বীজ প্রদানকারী পিতা বলে জানিয়েছেন।

২) **দিব্য চিন্ময় শক্তি**—ভগবান নিজে যখন অবতার রূপ ধারণ করেন, তখন এই দিব্য চিন্ময় শক্তির আশ্রয় নিয়েই করেন। এই শক্তির দ্বারাই ভগবান ভক্তদের আনন্দদানকারী প্রেমলীলা করেন। এই শক্তি দিব্য ও চিন্ময় গুণসম্পন্ন হয়। সুতরাং ভগবানের অবতারদেহও দিব্য ও চিন্ময় হয়। এই দিব্য-চিন্ময় শক্তিকে ভগবান **'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি'** (৪।৬) পদে উল্লেখ করেছেন।

৩) **যোগমায়া শক্তি**—এই শক্তিদ্বারা মোহিত হয়েই সাধারণ প্রাণিসকল ভগবানকে মানুষ মনে করে তাঁর স্বরূপ চিনতে অপারগ হয়। এই শক্তিতে স্বয়ং ব্রহ্মাও মোহিত হয়ে যান। এই যোগমায়া শক্তিকে ভগবান **'আত্মমায়য়া'** (৪।৬) এবং **'যোগমায়াসমাবৃতঃ'** (৭।২৫) পদে ব্যাখ্যা করেছেন।

৪) **দৈবী প্রকৃতি**—ভগবানের নাম 'দেব'। ভগবানের প্রকৃতি বা স্বভাব হওয়ায় একে 'দৈবী' প্রকৃতি বলা হয়। এতে দয়া, ক্ষমা, অহিংসা ইত্যাদি দৈবগুণ থাকে। সাধক ভক্তগণ এই দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে ভগবানের দিকে অগ্রসর হন—**'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ----ভূতাদিমব্যয়ম্'** (৯।১৩)। একেই 'দৈবী সম্পদ' নামে বলা হয়েছে। (১৬।৩, ৫)। সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ হওয়ায় জীবের মধ্যে এই দৈবী সম্পদ্জাত গুণ স্বতঃস্বাভাবিকভাবে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ জীব ভগবানের প্রতি বিমুখ থাকে, ততক্ষণ এই গুণ তার মধ্যে প্রকটিত হয় না, বিকশিত হয় না, সুপ্তভাবে থাকে। যখন সে ভগবদ্‌মুখী হয় তখন এই সমস্ত গুণ তার মধ্যে স্বতঃ-স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেতে থাকে, বিকশিত হতে থাকে।

৫) **গুণময়ী মায়া**—এই মায়া লৌকিক সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিন গুণসম্পন্ন। এই মায়ার সঙ্গে জীব যত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করে, নিজেকে এর অধিপতি বলে মনে করে, এর থেকে সুখ পেতে চায়—ততই সে নিজে এর দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এর অধীন হয় এবং এতে বদ্ধ হয়ে পড়ে। এই গুণময়ী মায়াকে ভগবান প্রকৃতি (৩।২৭, ২৯ ; ১৩।১৯-২১ ; ২৩, ২৯, ৩৪ ; ১৪।৫), অপরা প্রকৃতি (৭।৪-৫), দৈবী গুণময়ী মায়া, (৭।১৪-১৫) মায়া (১৮।৬১) এবং অব্যক্ত (১৩।৫) নামে উল্লেখ করেছেন। এই গুণময়ী মায়াতে অত্যধিক তাদাত্ম্য, মমতা এবং আসক্তি থাকায় এই মায়াই আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী রূপ ধারণ করে (৯।১২)।

বাস্তবে ভগবানের একক শক্তিই বিদ্যমান, যা ভগবৎস্বরূপা। সেই শক্তির দ্বারাই ভগবান সৃষ্টি রচনা ইত্যাদি বিভিন্ন কার্য এবং বিভিন্ন প্রকার লীলা করে থাকেন। সুতরাং ঐ এক শক্তিরই কার্য বা লীলা অনুসারে উপরিউক্ত পাঁচটি ভেদ হয়।

(২২) গীতায় বিভূতি বর্ণনা

প্রোক্তাঃ কারণরূপাশ্চ সপ্তমে তু বিভূতয়ঃ।
কার্যকারণরূপাশ্চ কৃষ্ণেন নবমে স্বয়ম্॥
দশমে ব্যক্তিভাবাভ্যাং সারমুখ্যাদিভিশ্চ বৈ।
স্বীয়াঃ প্রভাবরূপেণ প্রোক্তাঃ পঞ্চদশে তথা॥

ভগবান সাধকের অপর ভাব (পরমাত্মা ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তা এই ভাব) দূর করার জন্য গীতার সপ্তম, নবম, দশম এবং পঞ্চদশ— এই চারটি অধ্যায়ে নিজের বিভূতি বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান **'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি'**—আমার থেকে শ্রেষ্ঠ এই জগতে দ্বিতীয় কোন কিঞ্চিন্মাত্র কারণ নেই বলেছেন এবং এর পরে অষ্টম শ্লোক থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত কারণরূপে নিজের সতেরটি বিভূতি বর্ণনা করেছেন। কারণরূপে বিভূতি বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, কার্যদ্বারা গুণের ভিন্ন ভাব হতে পারে, কিন্তু কারণ রূপে কেউ ভিন্ন নয়। যেমন আকাশের কাজ শব্দ এবং শব্দ বর্ণাত্মক এবং ধ্বন্যাত্মক যে কোন প্রকারে হতে পারে। কিন্তু কারণরূপে আকাশ একই থাকে। এইরূপ পরমাত্মার কার্য হচ্ছে এই জগৎ সংসার এবং পরমাত্মা স্বয়ং এর কারণ। গুণের বিভিন্নতা অনুযায়ী জগৎ বিচিত্র প্রকারের হয়, কিন্তু কারণরূপে তার মধ্যে এক পরমাত্মাই বিরাজমান। যে ব্যক্তি কার্যে (সংসার) আসক্ত হয় সে বন্ধ হয়ে পড়ে। আবার যে ব্যক্তি কারণরূপে জগতে এক পরমাত্মাকেই দেখতে পায় সে কখনও বদ্ধ হয় না, বরং কার্যে অসঙ্গ হয়ে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**—সমস্ত পরমাত্মারই রূপ— এরূপ অনুভব করে।

নবম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোক থেকে ঊনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান কার্য-কারণরূপে নিজের সাঁইত্রিশটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন। এর তাৎপর্য এই যে, কার্য-কারণ, সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য, সার-অসার ইত্যাদি যা কিছু আছে, সে সকলই পরমাত্মা। পরমাত্মা ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছু নেই।

দশম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে ভগবান প্রাণীদের ভাবরূপে নিজের কুড়ি প্রকার বিভূতি এবং ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যক্তিরূপে নিজের পঁচিশটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন। আবার অর্জুনের 'আমি আপনাকে কিসের মধ্যে চিন্তা করব ?' এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান কুড়ি শ্লোক থেকে আটত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত মুখ্যরূপে তথা অধিপতিরূপে নিজের একাশিটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন। পুনরায় ঊনচল্লিশ শ্লোকে নিজের সাররূপ বিভূতির কথা বলেছেন। এইসবের তাৎপর্য এই যে, জগৎ-সংসারে ভাব, ব্যক্তি, মুখ্য, অধিপতি এবং সাররূপে যা কিছু আছে, তা সমস্ত এক ভগবানই।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান প্রভাবরূপে নিজের তেরটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন। তাৎপর্যস্বরূপ বলা যায় বস্তু বা ব্যক্তিতে যা কিছু প্রভাব, মহত্ত্ব, তেজ ইত্যাদি আছে, সে সকল ভগবানেরই, কোন বস্তু বা ব্যক্তির নয়।

এইভাবে ভগবান এই চারটি অধ্যায়ে সর্বসমেত নিজ একশত চুরানব্বইটি বিভূতির কথা বলেছেন। এইসব বিভূতির তাৎপর্যস্বরূপ বলা যায় যে, বাস্তবে এক ভগবানই সব কিছু হয়ে রয়েছেন। অতঃপর কোন বস্তু বা ব্যক্তি ইত্যাদির মধ্যে অধিক ভাব বা আকর্ষণ বোধ হলে তাতে ভগবানেরই চিন্তন হয়।

বিভূতি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য

মানুষের স্বভাব এই যে, সে কোন বস্তু, ব্যক্তি,পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদির মধ্যে কোন বিশেষত্ব,

মহত্ত্ব, প্রভাব, সৌন্দর্য ইত্যাদি দেখলে তাতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বাস্তব জগতে যে সমস্ত বিশেষ জিনিস দেখা যায়, তা জগতেরই নয়। কারণ যে জগৎ-সংসার এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, সেই ক্ষণস্থায়ী সংসারে বিশেষ জিনিস হবেই বা কীভাবে ? যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, তা আসলে এই জগতের আশ্রয়, আধার এবং প্রকাশক সেই ভগবানেরই। কিন্তু ভগবানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সংসারের উপরিভাগের সৌন্দর্য দেখে মানুষ সেদিকে আকৃষ্ট হয়। কেবল উপরের রূপ দেখে সেই বস্তুতে আকৃষ্ট হওয়া এবং তার মূল কারণকে অনুসন্ধান না করা পশুদের বৃত্তি, মানুষের নয়। মানুষ বিবেক-প্রধান প্রাণী ; সুতরাং তার জগতের তাৎকালিক বিশেষত্বকে গুরুত্ব দিয়ে তাতে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি বিনাবিচারে এতে আকৃষ্ট হয়, তাহলে তার বিচার-বিবেচনার প্রাধান্য কোথায় থাকল ? সেইজন্য মানুষের জগতের মহত্ত্ব থেকে নিজের মন সরিয়ে ভগবানের যে বাস্তবিক মহত্ত্ব তাতে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সমস্ত মানুষের মন নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার নিমিত্ত ভগবান নিজ বিভূতির বর্ণনা করেছেন।

গীতায় ভগবান নিজের যে সমস্ত মুখ্য বিভূতির বর্ণনা করেছেন, তার যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায় সব ভগবানকে নিয়েই। অতএব জগৎসংসারে যে কোন স্থানে সামান্যতম বিশেষত্বও যদি দেখা যায়, সেখানে ভগবানেরই প্রকাশ, সাধকের যেন স্বতঃই এই চিন্তন হয়। জগতের বিশেষত্ব মনে করে যেখানে জগতের কথা চিন্তায় উদিত হয়, সেখানে সেই বিশেষত্বটিকে ভগবানের বলে চিন্তা করলে ঐ চিন্তা ভগবৎচিন্তায় রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ সেইস্থানে আপনা হতে ভগবানের চিন্তা এসে যায়।

সাধকের উচিত, যেসকল বিভূতি বর্ণিত হয়েছে সেগুলি কি কি কারণে মুখ্য, এতে কি কি বিলক্ষণতা আছে, এই বিষয়ে কোন্ কোন্ গ্রন্থে কি কি লেখা আছে, এদিকে নজর না দিয়ে এর মূল কোথায় আলোচনা করা ? কোথা থেকে এটি প্রকটিত হল ? এইরূপে লক্ষ্য বিভূতির দিকে না রেখে এর মূল ভগবানের দিকে প্রবাহিত করা উচিত। মানুষের অন্তঃকরণের ভাবসমূহের প্রবাহ নিজের দিকে ফেরাবার জন্যই ভগবান বিভূতিসকল বর্ণনা করেছেন (১০।৪১) ; কেননা অর্জুন তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন (১০।১৭)। অতএব এই সমস্ত বিভূতি তাঁকে চিন্তা করবার জন্যই। এই বিভূতির মধ্যে বিলক্ষণতা দেখা যাক বা না যাক, একে জানা যাক বা না যাক, তাহলেও এতে ভগবানেরই স্মরণ হওয়া উচিত। এর তাৎপর্য হল যে, ভগবানের উদ্দেশ্য বিভূতি বর্ণনা করা নয়, তা হল তাঁকে চিন্তা করানো। চিন্তা করানোর উদ্দেশ্য এই যে— 'সাধক আমাকে তত্ত্বতঃ জানুক এবং আমাতে তার অবিচলিত ভক্তি হোক'।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

(গীতা ১০।৭)

বিভূতিসকলের দিব্যভাব

অর্জুন দশম অধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে এবং ভগবান উনবিংশ তথা চল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে নিজের বিভূতিকে 'দিব্য' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ ভগবান দিব্যাতিদিব্য। সুতরাং যত বিভূতি আছে, সবই তত্ত্বতঃ দিব্য। কিন্তু সাধকের কাছে সেই বিভূতির দিব্যতা তখনই প্রকাশিত হয়, যখন সে সর্বতোভাবে ভোগবুদ্ধি পরিহার-পূর্বক ঐ বিভূতির দ্বারা শুধুমাত্র ভগবানকেই স্মরণ করে।

(২৩) গীতায় বিশ্বরূপ দর্শন

বিশ্বরূপং প্রভোর্দ্রষ্টুং কৃপাপাত্রৈর্হি শক্যতে।
যজ্ঞাদিসাধনৈঃ কোঽপি দ্রষ্টুং শক্তো ন তৎ ক্বচিৎ॥

ভগবান অর্জুনকে যে নিজ বিশ্বরূপ (বিরাটরূপ) দেখালেন, তা অর্জুনের কোন সাধনার ফল নয়। ভগবান নিজে বলেছেন যে, 'এইপ্রকার আমার বিশ্বরূপ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, উগ্র-তপস্যা, তীর্থ, ব্রত ইত্যাদির দ্বারা দেখা যায় না' (১১।৪৮)। এই বিশ্বরূপ কেবল ভগবানই কৃপাপূর্বক নিজ সামর্থ্যে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দর্শন করাতে পারেন—'ময়া প্রসন্নেন---আত্মযোগাৎ' (১১।৪৭)। চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ তো অনন্যভক্তির দ্বারা দর্শন করা যায় বলে ভগবান জানিয়েছেন (১১।৫৪), কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য কোন সাধনের কথা তিনি বলেন নি, বলেছেন তাঁর কৃপাই একমাত্র সাধন। অর্জুনও নম্রভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন, 'হে ভগবন্ ! যদি আপনি মনে করেন যে, আমার দ্বারা আপনার বিশ্বরূপ দেখা সম্ভব, তাহলে আপনি আপনার সেই রূপ দেখান' (১১।৪)। অর্জুনের এইরূপ আগ্রহ হওয়ায় ভগবান কৃপাপূর্বক অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন ; কারণ তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু।

ভগবান এর আগে কৃপা করে কৌশল্যা, যশোদা, উত্তঙ্ক, ভীষ্ম এদের যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন তা অর্জুনের সম্মুখে প্রদর্শিত রূপের ন্যায় অত ভয়ঙ্কররূপ ছিল না। কারণ এই বিশ্বরূপ দেখে যুদ্ধবীর অর্জুনও ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং ভগবানও একথা স্বীকার করেছিলেন যে, 'অর্জুন, আমি তোমাকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছি, এইরূপ আর কেউ কখনও দেখেনি' (১১।৪৭)। ভগবান অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন তা এই দৃশ্যমান জগৎ নয়। এই বিশ্বসংসার ঐ বিশ্বরূপের আভাসমাত্র, একটি ঝলক। কারণ এই জগৎ নশ্বর ও জড়, দিব্য নয়। অপর পক্ষে বিশ্বরূপ দিব্য, অবিনাশী ও অনন্ত। ভগবান অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাতে থাকলে, কয়েকটি স্তর দেখার পর অর্জুন ভীত হয়ে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন, আপনার এই অদৃষ্টপূর্ব বিশ্বরূপ দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু আপনার অত্যন্ত উগ্র, এই ভয়ংকররূপ দেখে আমার মন ব্যথিত হয়েছে অর্থাৎ আমি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছি। সুতরাং আপনি চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করুন (১১।৪৫-৪৬)। অর্জুন যদি ভীত হয়ে ভগবানকে চতুর্ভুজরূপ দেখাবার প্রার্থনা না জানাতেন, তাহলে না জানি তিনি আরও কি কি দেখাতেন, কী রূপ দেখাতেন এবং আরও কোন্‌রূপে অর্জুনের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতেন !

সঞ্জয়ও বিশ্বরূপের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বলেছিলেন যে, 'হে রাজন্ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই অত্যন্ত অদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করে আমি বার বার রোমাঞ্চিত হচ্ছি এবং অত্যন্ত বিস্মিত হচ্ছি (১৮।৭৭)'।

ভগবানের বিশ্বরূপ জ্ঞানদৃষ্টির বিষয় নয়, বরং দিব্যদৃষ্টির বিষয়। তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষও সাধককে জ্ঞানদৃষ্টি দিয়ে এই জগৎকে 'বাসুদেবঃ সর্বম্' রূপে দেখাতে সক্ষম হন, বোধ করাতে সক্ষম হন, কিন্তু ভগবানের বিশ্বরূপ দেখাতে সক্ষম হন না। অর্থাৎ কোন সাধু-মহাত্মাই সেই বিশ্বরূপ দেখতে বা দেখাতে সক্ষম নন। এই বিশ্বরূপ কেবলমাত্র ভগবান এবং ভগবানের দ্বারা অধিকারপ্রাপ্ত, ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত কারক-পুরুষই দিব্যদৃষ্টি সহায়ে দেখাতে পারেন। ভগবান যে জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা এই জগৎ সংসারকেই বিশ্বরূপ বলে অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন—তা নয়। বরং তিনি অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সাক্ষাৎ চক্ষু দ্বারাই এই রূপ দেখিয়েছিলেন। অর্জুন বিশ্বরূপ দেখাবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালে ভগবান অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখবার আদেশ দিলেন (১১।৫-৭)। কিন্তু অর্জুন কিছুই দেখতে না পাওয়ায় ভগবান বললেন, 'ভাই, তুমি তোমার এই চর্মচক্ষুদ্বারা আমার বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারবে না, এজন্য তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দিচ্ছি তার দ্বারা তুমি আমার এই রূপ দেখে নাও' (১১।৮)। দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করতে লাগলেন। অর্জুন বললেন, 'হে ভগবন্ ! আমি আপনার শরীরে সমস্ত দেবতাদের দেখতে পাচ্ছি'—

'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে----' (১১।১৫)[1]। সঞ্জয়ও বলেছেন যে, অর্জুন 'দেবাদিদেব ভগবানের শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন করেছেন'—**'অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা'** (১১।১৩)। ভগবানও তাঁর শরীরে বিশ্বরূপ দেখবার আদেশ দিয়েছিলেন।

এর তাৎপর্য এই যে এইরূপ ঐশ্বর্যপূর্ণ দিব্য বিশ্বরূপ কোন সাধনবলে বা নিজ সামর্থ্যে মানুষ দেখতে পায় না অথবা কোন তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষও জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা দেখাতে পারেন না। কেবল ভগবৎকৃপা বলেই এরূপ দর্শন হওয়া সম্ভব।

(২৪) গীতায় সৃষ্টি-রচনা

সৃষ্টিশ্চতুর্বিধা প্রোক্তা স্বাদিসংকল্পজা প্রভোঃ।
ব্রহ্মজা চান্নজা তূর্যা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোগজা॥

গীতায় সৃষ্টি রচনার বর্ণনা নিম্নোক্ত চার প্রকারে করা হয়েছে, যেমন—

১) **মহাসর্গ**—ব্রহ্মা এবং সমস্ত প্রাণিজগতের উৎপত্তি মহাসর্গেই হয়। এই মহাসর্গ ভগবানের সংকল্পে সৃষ্ট হয়। ভগবানের সংকল্প কেন হয় ? মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীব নিজ নিজ কর্মের সংস্কারগুলি-সহ কারণ শরীর নিয়ে প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় এবং প্রকৃতি ঐ সমস্ত প্রাণী সহ ভগবানে লীন হয়ে যায়। প্রকৃতিতে লীন হওয়া এই প্রাণীদের কর্ম যখন পরিপক্ব হয়ে ফল দানের উপযুক্ত এবং উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখন ভগবানের মধ্যে **'বহু স্যাং প্রজায়েয়'** (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৬) 'আমি একাকী বহু হয়ে যাব'—এই সংকল্প হয়। এরূপ সংকল্প হলেই ভগবান নিজ প্রকৃতিকে স্বীকার করে ব্রহ্মার[2] এবং সমস্ত জীবের শরীর এবং সকল লোকের সৃষ্টি করেন। এই রূপ রচনার পরিণতি প্রকৃতিতেই হয় অর্থাৎ সকল জীব-শরীর এই প্রকৃতি থেকেই নির্মিত হয়। এইজন্য ভগবান গীতায় দুটি কথা বলেছেন, 'আমি মহাসর্গের প্রারম্ভে প্রাণিসকলের শরীর প্রকৃতিকে স্বীকার করেই রচনা করি (৯।৭-৮) এবং প্রকৃতি যে প্রাণিসকলকে সৃষ্টি করে তা আমার অধীনেই অর্থাৎ আমার সত্তা থেকেই স্ফুরিত হয় (৯।১০)'।

মহাসর্গের বর্ণনা গীতায় অন্যস্থানে এইভাবে আছে—

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'এই অবিনাশী যোগ প্রথমে (মহাসর্গের আদিতে) আমি সূর্যকে বলেছিলাম' এবং তৃতীয় শ্লোকে 'এই সেই পুরাতন (মহাসর্গের আদিতে বর্ণিত) যোগ আমি আজ তোমাকে জানালাম' এই বলে তিনি মহাসর্গের বর্ণনা করলেন।

চতুর্থ অধ্যায়েরই ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবানকর্তৃক গুণ ও কর্ম অনুযায়ী চারি বর্ণের রচনার কথা এসেছে, যেটি মহাসর্গের সময়।

অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে **'বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ'** পদ দ্বারা ভগবানের সৃষ্টি রচনার জন্য সংকল্পকে 'বিসর্গঃ' বলা হয়েছে। যা মহাসর্গের সূচনাকারী।

দশম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে 'চার সনকাদি, সাত মহর্ষি এবং চতুর্দশ মনু আমার মন থেকে উৎপন্ন, জগতের সকল প্রজা এঁদের থেকে উৎপন্ন'—এইপ্রকারে তিনি মহাসর্গের বর্ণনা করেছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোকে প্রকৃতি বীজ ধারণ করার স্থান এবং ভগবান নিজে বীজ প্রদানকারী

[1]অর্জুন অন্যত্রও নিজ চক্ষু দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শনের কথা বলেছেন ; যেমন—'পশ্যামি' (১১।১৬-১৭,১৯) ; 'দৃষ্ট্বা' (১১।২০, ২৩-২৪, ৪৫) ; 'দৃষ্ট্বৈব' (১১।২৫) ; 'সংদৃশ্যন্তে' (১১।২৭) ইত্যাদি।

[2]ভগবান কখনও স্বয়ং ব্রহ্মারূপে প্রকটিত হন আবার কখনও জীব নিজ পুণ্যকর্মের দ্বারা ব্রহ্মা-পদ প্রাপ্ত হন।

পিতা বলে মহাসর্গের বর্ণনা করেছেন।

সপ্তদশ অধ্যায়ের তেইশ সংখ্যক শ্লোকে যে পরমাত্মার ওঁ, তৎ এবং সৎ—এই তিনটি নাম সেই পরমাত্মাই সৃষ্টির আদিতে বেদ-ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞের রচনা করেছেন—এইরূপে মহাসর্গের বর্ণনা করা হয়েছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের একচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে 'স্বভাবজাত গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের কর্মসকল পৃথকভাবে বিভক্ত করা হয়েছে'—এই বলে ভগবান মহাসর্গের বর্ণনা করেছেন।

২) সর্গ—ব্রহ্মার নিদ্রাকালে প্রলয়কাল হয় এবং জাগরণের সময় কল্প শুরু হয়। সর্গের সময় (কল্পের সময়) ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীর থেকে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়। তাৎপর্য এই যে প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর সহ ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীরে লীন হয় এবং সর্গের শুরুতে পুনরায় ঐসকল সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর সহ ব্রহ্মার শরীর হতে উৎপন্ন হয় (৮।১৮-১৯)।

তৃতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে সর্গের বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে যে—'প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে যজ্ঞের (কর্তব্য-কর্ম) সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদি রচনা করেছিলেন।'

(মহাসর্গে ভগবান জীবকে কারণ শরীরের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ করিয়ে দেন—এটিই ভগবানের দ্বারা প্রাণী সকলের রচনা এবং সর্গকালে ব্রহ্মা জীবকে সূক্ষ্ম-শরীরের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ ঘটিয়ে দেন—এটিই হল ব্রহ্মার দ্বারা প্রাণীদের সৃষ্টিকার্য করা।)

৩) সৃষ্টিচক্র—প্রথমে ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি হয়। তারপর ব্রহ্মা হতে স্থূলরূপে স্ত্রী ও পুরুষের শরীর উৎপন্ন হয়। তারপর স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে এই সৃষ্টি চলতে থাকে, তাই এর নাম সৃষ্টিচক্র। এই কথা গীতায় বলা হয়েছে যে অন্ন হতে অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের রজ ও বীর্য থেকে সমস্ত প্রাণী জন্মগ্রহণ করে ; অন্ন বৃষ্টি হতে জন্মায় ; বৃষ্টি কর্তব্য-কর্মরূপ যজ্ঞ থেকে সৃষ্টি হয়। কর্তব্য-কর্মরূপ যজ্ঞের বিধান বেদ এবং বেদানুকূল শাস্ত্র থেকে পাওয়া যায় ; বেদ পরমাত্মা হতে প্রকটিত ; অতএব পরমাত্মাই সর্বগত অর্থাৎ সবের মূলে সেই পরমাত্মাই বিদ্যমান (গীতা ৩।১৪-১৫)। সৃষ্টি ভগবান থেকেই হোক বা ব্রহ্মা থেকে হোক বা অন্ন (রজ-বীর্য) থেকেই হোক অর্থাৎ সৃষ্টি মহাসর্গ, সর্গ বা সৃষ্টিচক্র থেকে যেভাবেই হোক না কেন—সকলেরই মূলে সেই এক পরমাত্মাই বিরাজিত। সুতরাং এই তিন সৃষ্টির তাৎপর্য সবের মূল সেই এক পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা।

৪) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ—জীবের নিজ নিজ শরীরের সঙ্গে যে তাদাত্ম্য বোধ থাকে, তাকে 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ' বলা হয়। একেই 'প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ' 'জড়-চেতনের সংযোগ' এবং 'অপরা-পরা প্রকৃতির সংযোগ' বলা হয়। জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের প্রতি যে 'আসক্তি' থাকে, তাকেই সংযোগ বলা হয়। এই সংযোগের জন্যই জীবের উৎপত্তি হয়, জন্ম-মরণ হয় (১৩।২১)। এর তাৎপর্য এই যে, এই সংযোগেই (আসক্তিই) জীবের মহাসর্গে কারণ-শরীরের সঙ্গে, সর্গে (কল্পের প্রারম্ভে) সূক্ষ্ম-শরীরের সঙ্গে এবং সৃষ্টিচক্রে মাতাপিতার শরীরের (রজ-বীর্যের) সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হয়।

জীবের শরীরের সঙ্গে যে তাদাত্ম্য, রাগ (আসক্তি) থাকে তার বর্ণনা গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক তথা ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে করা হয়েছে।

উপরিউক্ত মহাসর্গ, সর্গ, সৃষ্টিচক্র এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ যাই হোক না কেন এই সবেতেই পরমাত্মার জীবের সঙ্গে এবং জীবের পরমাত্মার সঙ্গে অটুট অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান থাকে। শুধু শরীরের পরবশতার জন্য জীব বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। এই পরবশতার জন্য সে নিজেই দায়ী। যদি এই পরবশতা দূর করে সে পরমাত্মার সম্মুখীন হয়, তাহলে সে যে কোন পরিস্থিতিতেই পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে।

(২৫) গীতায় জীবের গতি-বর্ণনা

জীবানাং গতয়ো বহ্ব্যো গীতয়া তু ত্রিধা মতা।
দ্বিধোর্ধ্বা হি দ্বিধা চাধো মধ্যমৈকেতি পঞ্চধা॥

ভগবান গীতায় মুখ্যভাবে জীবের তিনটি গতির বর্ণনা করেছেন—ঊর্ধ্বগতি, অধোগতি ও মধ্যগতি। যেমন—সত্ত্বগুণের তাৎকালিক বৃত্তি বৃদ্ধির সময়ে মৃত এবং সত্ত্বগুণে স্থিত মানুষ ঊর্ধ্বমার্গে গমন করে (১৪।১৪, ১৮)। তমোগুণের তাৎকালিক বৃত্তি বৃদ্ধির সময়ে মৃত এবং তমোগুণে স্থিত মানুষ অধোগতি প্রাপ্ত হয় (১৪।১৫, ১৮)। রজোগুণের তাৎকালিক বৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সময়ে মৃত এবং রজোগুণে স্থিত মানুষ মধ্যগতি লাভ করে (১৪।১৫, ১৮)। এই তিনের বিস্তারিত বর্ণনা এইপ্রকার—

ঊর্ধ্বগতি

দুই প্রকারের জীব ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয়—

১) **ফিরে না আসা ব্যক্তি**—ক) যে জীব শুক্লমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করে, সে সেখানেই থাকে এবং মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সঙ্গে ভগবানে লীন হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়ে যায় (৮।২৪)।

খ) যে তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত হয়ে যায়, সে এখানেই তত্ত্বে লীন হয়ে যায়, তার প্রাণের উৎক্রমণ হয় না (৫।১৯, ২৪-২৬)।

গ) যে ভগবানের ভক্ত, সে ভগবানের পরমধামে গমন করে। (৮।২১, ১৫।৬)।

ঘ) ভগবান দুষ্টের দমনের জন্য অবতাররূপ গ্রহণ করেন (৪।৮)। এইসব দুর্বৃত্ত যখন ভগবানের হাতে হত হয়, সেখানেই তারা ভগবানে লীন হয়ে যান ; কারণ, তাঁদের সম্মুখে ভগবান থাকেন এবং পাপী ব্যক্তি তাঁকে চিন্তা করতে করতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভগবানের এই নিয়ম যে, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে তাঁকে স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করবে, সে নিঃসন্দেহে তাঁকেই প্রাপ্ত হবে (৮।৫)।

২) **যারা ফিরে আসে**—(ক) যারা স্বর্গাদি সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সকাম কর্ম করে, তারা নিজ পুণ্যফলস্বরূপ কৃষ্ণমার্গ দ্বারা স্বর্গাদিলোকে গমন করে এবং নিজ নিজ পুণ্য অনুসারে সুখভোগ করে। পুণ্যভোগ সমাপ্ত হলে তারা পুনরায় মৃত্যুলোকে জন্মগ্রহণ করে (৮।২৫, ৯।২১)।

খ) যে পরমাত্ম-প্রাপ্তির সাধনায় রত, অথচ যার সাংসারিক বাসনা এখনো পুরোপুরি মেটেনি, সে অন্তিম সময়ে কোন বাসনার কারণে নিজের সাধনা থেকে বিচলিত হওয়ায় স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করে। এইরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি বহুদিন পর্যন্ত স্বর্গাদিলোকে বসবাস করে। যখন সেখানকার ভোগে তার অরুচি জন্মায়, তখন সে আবার জগৎ-সংসারে ফিরে আসে এবং শুদ্ধ শ্রীমান ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে (৬।৪১)।

অধোগতি

দুই প্রকারের জীব অধোগতি প্রাপ্ত হয়—

১) **যারা চুরাশী লক্ষ যোনি প্রাপ্ত হয়**—জীব নিজ পাপ কর্ম অনুযায়ী পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি নীচ জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং সেখানে নিরন্তর সেই জন্ম-জনিত যন্ত্রণা ভোগ করে (১৬।১৯)[1]।

২) **নরকে গমনকারী**—জীব নিজ পাপকর্ম অনুযায়ী রৌরব, কুম্ভীপাক ইত্যাদি ভয়ঙ্কর নরকে গমন করে এবং সেখানে ভয়ঙ্কর নরক যন্ত্রণা ভুগতে থাকে (১৬।১৬)।

---

[1]ভগবান যোগভ্রষ্টের কথায় বলেছেন, এরা বহুদিন স্বর্গে বাস করে—'শাশ্বতীঃ সমাঃ' (৬।৪১) আর পাপীদের জন্য জানিয়েছেন, 'আমি তাদের নিরন্তর নীচ জন্মে অর্থাৎ (আসুরী যোনিতে) নিক্ষেপ করি' অর্থাৎ এরা নীচ জন্মেই নিরন্তর থাকে—'অজস্রম্' (১৬।১৯)। এর তাৎপর্য এই যে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি একই স্থানে বহুদিন অবস্থান করে, কিন্তু পাপকর্মকারিগণের জন্ম-জন্মান্তর ধরে আসুরী জন্ম হতে থাকে।

মধ্যগতি[১]

ছয় প্রকারের জীব মধ্যগতিতে গমন করে—

১) **স্বর্গাদি লোক হতে ফিরে আসা প্রাণী**—যারা সুখভোগের উদ্দেশ্যে স্বর্গাদি লোকে গমন করে, তারা স্বর্গ-প্রাপক পুণ্য ক্ষীণ হলে এই মধ্যলোকে বা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এই সব ব্যক্তির প্রবৃত্তি (আচরণ) প্রায়শঃই শুদ্ধ হয়, তারই জন্য তারা পুনরায় শুভকর্ম করে স্বর্গাদি লোকে গমন করে এবং সেখানে সুখ ভোগ করে পুণ্য ক্ষয় হলে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে জন্ম নেয় ; এইরূপ এরা বারংবার আসা যাওয়া করতে থাকে (৯।২১)। এদের মধ্যে যদি কারো সংসারে বৈরাগ্য হয়, তবে সে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে মুক্ত হয়ে যায় এবং কারো যদি ভগবানে ভক্তি জন্মায়, তবে সেও সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে গমন করে।

২) **যোগভ্রষ্ট**—সাংসারিক বাসনাযুক্ত যোগভ্রষ্ট মানুষ স্বর্গাদি লোকে গিয়ে মর্ত্যলোকে শুদ্ধ শ্রীমানের ঘরে জন্ম নেন এবং সাংসারিক বাসনা থেকে মুক্ত যোগভ্রষ্ট মানুষ স্বর্গাদিতে না গিয়ে সোজা যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। যে যোগভ্রষ্ট মানুষ শ্রীমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ভোগের সূক্ষ্ম বাসনার জন্য এবং শুদ্ধ-সম্পন্ন ঘরে ভোগ-বাহুল্যের জন্য ভোগে আসক্ত হয়ে পড়েন। আসক্ত হলেও তাঁর পূর্বের মনুষ্যজন্মের সাধনা তাঁকে পুনরায় পারমার্থিক পথে আকর্ষিত করে এবং তিনি আবার তৎপরতার সঙ্গে পুনঃ নিজ সাধনে নিয়োজিত হয়ে পরমগতি প্রাপ্ত হন (৬।৪৪-৪৫)। যে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যোগী (তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত) ভক্তের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, সেই স্থানের পারমার্থিক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদির দ্বারা অতি বাল্যকাল থেকেই তিনি সাধনা শুরু করে দেন তথা তাঁর পূর্বজন্মের সাধনার সুফলও স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত হয়ে তিনি পুনরায় সাধনায় তৎপর হয়ে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন (৬।৪৩)।

৩) **পশু-পক্ষী ইত্যাদি প্রাণী এবং ৪) নরক হতে আসা প্রাণী**—

পশু-পক্ষীর যোনিপ্রাপ্ত তথা নরকের প্রাণীরাও কখনও ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় আবার মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হয়। তাদের ভগবান সমস্ত জন্মের শেষ জন্ম এই মনুষ্য-শরীর প্রদান করে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দেন যাতে তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম করতে পারে এবং যেখানে খুশী যেতে পারে। তাৎপর্য এই যে, তারা সকামভাবে শুভকর্ম করে স্বর্গাদিলোকে যেতে পারে (২।৪২-৪৩ ; ৭।২০-২২ ; ৯।২০) অথবা অশুভ (পাপ) কর্ম করে চুরাশী লক্ষ জন্ম তথা নরকে যেতে পারে (১৬।১৬, ১৯-২০) অথবা বিচার বিবেচনা দ্বারা জড়তা থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে মুক্ত হতে পারে (১৩।৩৪) অথবা নিষ্কামভাবে নিজ কর্তব্যপালন করে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হতে পারে (২।৫১ ; ৫।১২) অথবা ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারে (১৮।৫৬)। কেবল তাই নয়, ভগবান স্বয়ং তাদের সংসার-সাগর উদ্ধারকারী হয়ে থাকেন (১২।৭)।[২] এর তাৎপর্য এই যে সেখানে

---

[১]এখানে মধ্যগতিকে শেষে দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, সকল গতির মূল কারণ হল মধ্যগতি। কারণ উর্ধ্বগতি ও অধোগতি প্রাপ্ত মানুষকে মধ্যগতিতে আসতে হয় এবং সে মধ্যগতি থেকে উর্ধ্ব বা অধোগতিতে যাত্রা করে। এখানে প্রথমেই মধ্যগতির বর্ণনা করা হলে (উর্ধ্বগতি ও অধোগতির বর্ণনা না থাকায়) তার স্পষ্ট বোধ হত না।

[২](ক) ভগবান কৃপা করে জীবকে শুভকর্মের ফল ভোগ করিয়ে, শুদ্ধ করে কোলে তুলে নেবার জন্য স্বর্গাদি রচনা করেছেন ; অশুভ-কর্মের ফল ভোগ করিয়ে শুদ্ধ করে নিজ ক্রোড়ে নেবার জন্য চুরাশী লক্ষ জন্ম এবং নরক সৃষ্টি করেছেন ও অনুকূল ও প্রতিকূলতার দ্বারা শুভ-অশুভ কর্মের অবসানে নিজের কোলে তুলে নেওয়ার জন্য মনুষ্যজন্ম সৃষ্টি করেছেন। মনুষ্য-জন্মে ভগবান জীবকে তাঁকে প্রাপ্তির ও জন্ম-মরণ চক্র থেকে মুক্ত হবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। মনুষ্যজন্মে মানুষ জীবদ্দশায় ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারে। তাতেও না হলে মৃত্যু সময়েও যদি স্মরণ করে, তাহলেও তাঁকে পায় (৮।৫)।

(খ) এই মনুষ্যলোকে জীব যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক তা প্রায়শই 'ঋণানুবন্ধ' (নেওয়া-দেওয়া সম্পর্ক) থেকেই হয়। তাৎপর্য এই যে, কারুর কাছ থেকে নেওয়ার এবং কাউকে দেওয়ার জন্য, পরস্পরের এই সম্পর্কের জন্যই জীবের জন্ম। মানুষ কেবল অপরের হিতের জন্য কর্তব্য-কর্ম করে শুভ-অশুভ থেকে অর্থাৎ ঋণানুবন্ধ থেকে মুক্ত হতে পারে (৪।২৩) অথবা সৎ-অসতের বিবেকবোধ দ্বারা নিজ স্বরূপে স্থিত হয়ে সমস্ত পাপ থেকে অর্থাৎ ঋণানুবন্ধ থেকে মুক্ত হতে পারে (৪।৩৬) অথবা ভগবানের শরণাগত হয়ে সমস্ত পাপ থেকে বা ঋণানুবন্ধ থেকে মুক্ত হতে পারে (১৮।৬৬)। একমাত্র মানুষই পারে এই ঋণানুবন্ধ থেকে মুক্ত হতে ; অন্য প্রাণী নয়। কারণ তাদের এই যোগ্যতা বা অধিকার থাকে না ; মানুষ এদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ সে স্বাধীন ও সমর্থ।

সুখ ভোগ করে পুণ্য ক্ষয় হলে পুনরায় তারা সকলেই নিজের উদ্ধার বা পতন ঘটাতে স্বতন্ত্র, তারা কারো অধীন নয়।

৫) **ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষ**—যেসব জীবের ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটেছে বা যাঁদের ভগবানের ধামে প্রবেশ হয়েছে, তাঁরাও ভগবদ্ ইচ্ছায় অন্যান্য জীবের উদ্ধারের জন্য কারক-পুরুষের রূপ পরিগ্রহ করে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের মনুষ্যজন্ম কর্ম-পরবশ নয়। তাঁরা শ্রেষ্ঠ আচরণের দ্বারা মানুষকে সেই কর্মে অনুপ্রেরিত করেন অথবা নিজ অমৃতময় বচন দ্বারা লোককে সঠিক পথ দেখিয়ে দেন (৩।২১)। এই প্রকারে নিজেদের কার্য সম্পূর্ণ করে তাঁরা পুনরায় ভগবানের কাছে ফিরে যান।

৬) **ভগবানের নিত্য পরিকর (পার্ষদ)**—ভগবান যেসব যখন সাধুদের রক্ষা, দুষ্টের বিনাশ এবং ধর্মের স্থাপনা করার জন্য মনুষ্যলোকে আসেন (৪।৮), তখন ভগবদ্ভাবে থাকা ভগবানের নিত্য পরিকর (পার্ষদ)ও ভগবানের সঙ্গে সখা ইত্যাদিরূপে মনুষ্যলোকে আসেন। তাঁরা এখানে ভগবানের সঙ্গেই বাস করেন, খাওয়া-দাওয়া, ক্রীড়া ইত্যাদিতে তাঁকে সুখ-আনন্দ দেন। ভগবান যখন নিজ অবতারলীলা সমাপ্ত করে অন্তর্ধান করেন, তখন তাঁর পার্ষদগণও একে একে শরীর ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গেই ভগবদ্ধামে চলে যান।

(২৬) গীতায় মানুষের শ্রেণী বিভাগ

স্থিতিভাবানুসারেণ বিভিন্নাঃ সন্তি মানবাঃ।
তেষু ভবন্তি তে ধন্যাঃ প্রাপ্তিং কুর্বন্তি যে হরেঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও মনন করলে দেখা যায় যে, মানুষের যেমন স্থিতি, ভাব, মান্যতা, আচরণ ইত্যাদি থাকে, সেই অনুসারে তাদের পৃথক পৃথক শ্রেণী হয় অর্থাৎ মনুষ্যজাতিরূপে এক হলেও স্থিতি, ভাব, সাধন-পদ্ধতি ইত্যাদি অনুযায়ী তাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ হয়ে যায়; যেমন—

ভগবান পূর্বজন্মের গুণ ও কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চার বর্ণের রচনা করেছেন এবং সমস্ত মনুষ্যজাতিকে এই চার বর্ণের অন্তর্গত বলে মানা হয়েছে (৪।১৩) তথা স্বভাব হতে উৎপন্ন গুণানুসারে চারি বর্ণের লোকের জন্য কর্মের বিভাগ করেছেন (১৮।৪১-৪৪)। ঐসব ব্যক্তির মধ্যে যারা নিজ কল্যাণের জন্য ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের আচরণ অনুযায়ী ভগবান নিজ ভক্তির সাত প্রকার অধিকারীর কথা বলেছেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, পাপযোনি এবং দুরাচারী (৯।৩০-৩৩)। এই সাত প্রকার অধিকারীই যে যে ভাবে ভগবানের ভজনা করেন, সেই ভাবগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করে ভগবান ভক্তদের চারটি শ্রেণীর কথা বলেছেন—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমী (৭।১৬)। ধন-সম্পত্তি, পদ-অধিকার, জমি-জায়গা, ইত্যাদি সাংসারিক বৈভবের জন্য যারা ভগবানের ভজনা করে, তারা হল 'অর্থার্থী' ভক্ত। সাংসারিক দুঃখ দূর করার নিমিত্ত যারা আর্তভাবে ভগবানকে ডাকে, তারা হচ্ছে 'আর্ত' ভক্ত। যারা নিজ স্বরূপকে, পরমাত্মাকে জানবার জন্য ভগবানের ভজনা করে তারা 'জিজ্ঞাসু' ভক্ত। যারা কেবল ভগবানে প্রেম করতে চায়, তাঁকে সুখ দিতে চায়, তাঁর সেবা করতে চায়, তারা হচ্ছে জ্ঞানী (প্রেমী) ভক্ত। এই চারপ্রকার ভক্তকে ভগবান উদার বলেছেন; কারণ এরা যা কিছু চায় তা ভগবানের কাছ থেকেই চায়, জগতের অন্য কারো থেকে নয়। জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমী ভক্তদের ভগবান নিজ আত্মা-স্বরূপ বলে জানিয়েছেন। কারণ তাঁদের ভগবানের

কাছে কোন চাহিদা থাকে না (৭।১৮)। এই প্রেমী ভক্তকে ভগবান দুর্লভ বলে বর্ণনা করেছেন—'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ' (৭।১৯) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন—'স মে যুক্ততমো মতঃ' (৬।৪৭)। এরূপ সিদ্ধ-ভক্ত রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার-রহিত, অহংকার ও মমতা-বর্জিত এবং শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ ইত্যাদিতে সমাহিতচিত্ত হয় (১২।১৩-১৯)।

জ্ঞানযোগী সাধক সৎ-অসৎ জ্ঞান (বিবেক) দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রার্থনা করেন (২।১১-৩০ ; ১৩।১৯-৩৪) এবং একেই নিজ পুরুষার্থ বলে মনে করেন।

সিদ্ধ জ্ঞানযোগী সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনগুণের বৃত্তি বৃদ্ধি পেলেও রাগ বা দ্বেষ করেন না। গুণই নিজের নিজের গুণে বর্তিত হচ্ছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্রিয়া গুণের দ্বারাই হয়—এইরূপ মনে করে তিনি নিজ স্বরূপে স্থিত থাকেন। তিনি সর্বক্ষণই সুখে অথবা দুঃখে সমভাবে বিরাজ করেন। তথা তাঁর ওপর নিন্দা-স্তুতি বা মান-অপমানের কোন প্রভাব পড়ে না (১৪।২২-২৫)।

কর্মযোগী সাধক কেবল লোকসংগ্রহের জন্য, কর্তব্য পরম্পরা সুরক্ষিত রাখবার জন্য নিষ্কামভাবে তৎপরতার সঙ্গে নিজ কর্তব্য পালন করেন। অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম না করে অপরের হিতের জন্যই সমস্ত কর্ম করেন (৩।৯)।

সিদ্ধ কর্মযোগী নিজ স্বরূপেই আনন্দিত, তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁর কর্মেও আসক্তি থাকে না, অকর্মেও আসক্তি থাকে না। তাঁর কোন প্রাণীর সঙ্গে স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে না (৩।১৭-১৮) এবং সমস্ত পদার্থ, প্রাণী ইত্যাদির ওপর সমবুদ্ধি থাকে (৬।৮-৯)।

ধ্যানযোগী সাধক ইন্দ্রিয় সংযম করে একান্তে বাস করে সগুণ-সাকার, নিজ স্বরূপ অথবা নির্গুণ-নিরাকারের ধ্যানে নিরত থাকেন (৬।১০-২৮)।

সগুণ-সাকারের ধ্যানে সিদ্ধ যোগী 'সবকিছুই' ভগবান এবং ভগবানই সবেতে এইরূপ অনুভব করেন। কাজেই তিনি কর্ম করলেও সর্বক্ষণ ভগবানেই স্থিত থাকেন (৬।৩০-৩১)। নিজ স্বরূপের ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া ধ্যানযোগী নিজেকে সমস্ত প্রাণীতে এবং সমস্ত প্রাণীকে নিজের মধ্যে দেখেন, অতএব তিনি সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হন (৬।২৯)। নির্গুণ-নিরাকারের ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া ধ্যানযোগী নিজ শরীরের উপমাতে সমস্ত প্রাণী তথা তাদের সুখ-দুঃখকে নিজের বলে বোধ করেন (৬।৩২)। এর তাৎপর্য এই যে, সাধারণ মানুষ যেমন স্বভাবতঃ নিজ শারীরিক কষ্ট দূর করে সুখী থাকার স্বাভাবিক চেষ্টা করে, তেমনি ঐ সমস্ত জ্ঞানী মহাপুরুষদের অপরের দুঃখ দূর করে তাদের সুখী করার স্বাভাবিক চেষ্টা হয়ে থাকে।

জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী, ধ্যানযোগী প্রমুখ সাধকদের অন্তিমকালে যদি কোন কারণবশতঃ নিজ সাধনে মন স্থিত না থাকে, তাঁরা নিজ সাধন পথ থেকে বিচলিত হয়ে পড়েন, তবে তাঁরা যোগভ্রষ্ট হন। এইরূপ যোগভ্রষ্ট দুই প্রকারের হয়—সাংসারিক বাসনামুক্ত এবং সাংসারিক বাসনাযুক্ত। সাধন করার সময় যাঁর সাংসারিক বাসনা দূর হয়, সেই সাধক অন্তিম সময়ে কোন বিশেষ কারণে নিজ সাধন থেকে যদি বিচলিত হয়ে পড়েন, তাহলে তিনি স্বর্গাদি উচ্চলোকে না গিয়ে সরাসরি জ্ঞানবান যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে পুনরায় তৎপরতার সঙ্গে সাধন-ভজন করে সিদ্ধিলাভ করেন (৬।৪২-৪৩)। কিন্তু সাধনাবস্থাতেও যাঁর সাংসারিক ভোগ-বাসনা একেবারে মেটে না, সেই সাধক যদি অন্তিম সময়ে কোন বাসনাদির কারণে নিজ সাধন পথ হতে বিচলিত হন, তবে তাঁর স্বর্গাদি প্রাপ্তি ঘটে। সেখানে বহু বছর থাকার পর পুনরায় তিনি শুদ্ধ শ্রীমৎকুলে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে ভোগবহুলতা থাকায় ভোগ পরবশ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব জন্মের করা সাধন তাঁকে পারমার্থিক পথে আকর্ষিত করে এবং তিনি একাগ্র চিত্তে সাধনায় পরম গতি প্রাপ্ত হন (৬।৪১, ৪৪-৪৫)।

যাঁদের ভগবানের ওপর, পারমার্থিক সাধনের ওপর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নেই কিন্তু শাস্ত্রোক্ত, বেদোক্ত সকাম অনুষ্ঠানের ওপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস আছে, তাঁরা দেবতাদের পূজা করেন এবং মৃত্যুর পর নিজ নিজ শুভকর্ম অনুযায়ী

স্বর্গাদিলোকে গিয়ে সেখানকার সুখাদি ভোগ করে পুণ্য সমাপ্ত হলে পুনরায় মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন (৮।২৫ ; ৯।২০-২১)।

যারা কেবলমাত্র সাংসারিক কাজে লেগে থাকে এবং পশুদের মতো নির্বোধ জীবনযাপন করে সেইসব মানুষদের ভগবান 'পশু' বলে অভিহিত করেছেন (৫।১৫)।

যাদের ভগবানে শ্রদ্ধা নেই, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নেই, ধর্মে শ্রদ্ধা নেই, সকাম অনুষ্ঠানগুলিতে শ্রদ্ধা নেই, বা পরলোকেও শ্রদ্ধা নেই, এইরূপ ব্যক্তিরা কেবল নিজ ভোগসুখ নিয়েই লিপ্ত থাকে, তারা মিথ্যা, কপটাচরণ, কপটতা, চুরি-ডাকাতি, অন্যায়-অত্যাচার, ইত্যাদি দ্বারা জীবন নির্বাহ করে ; ফলে এরা চুরাশী লক্ষযোনি এবং নরকভোগ করে (১৬।৭-২০)। স্বভাবের ভিন্নতার জন্য এইসব মানুষ তিন শ্রেণীর হয়—আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী (৯।১২)। যারা কেবল খাওয়া-দাওয়া, সুখ-আরাম, খেলাধূলা, সংগ্রহ করা, ভোগ-বিলাস ইত্যাদিতে লেগে থাকে, তাদের 'আসুরী' শ্রেণীর বলা হয়। যারা নিজ স্বার্থের জন্য ক্রোধপূর্বক অন্যকে দুঃখ দেয়, খুন ডাকাতি করে, পশু-পক্ষী হত্যা করে খায়, তারা 'রাক্ষসী' শ্রেণীভুক্ত। যারা বিনা কারণে অপরকে দুঃখ দেয়, শায়িত কুকুরকে পাথর বা লাঠির আঘাতে প্রহার করে আনন্দ পায়, নদীতে পাথর ফেলে আনন্দ পায়, পশুদের মত চিৎকার করে, তাদের 'মোহিনী' শ্রেণীভুক্ত বলা যায়। এই তিন শ্রেণীতেই এক একটি বিষয় প্রাধান্য পায় ; যেমন আসুরী শ্রেণীতে স্বার্থের প্রাধান্য থাকে এবং তার সঙ্গে ক্রোধ ও মূঢ়তাও থাকে। রাক্ষসী শ্রেণীতে ক্রোধের প্রাধান্য দেখা যায় কিন্তু তার সঙ্গে স্বার্থ ও মূঢ়তাও থাকে। মোহিনী শ্রেণীতে মূঢ়তার প্রাধান্য থাকে এবং সঙ্গে স্বার্থ, ক্রোধও থাকে। এইরূপ তিনটি শ্রেণীতে তিনপ্রকার বিষয় থাকলেও এক একটি বিষয়ের প্রাধান্য থেকে যায়। যেমন—

ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য লোভে পড়ে সরকারী কর্মচারী দেশের, চাকর মালিকের এবং সমাজের অনেক ক্ষতি করে থাকে—এইগুলি হল 'আসুরীতে রাক্ষসী'। সমাজ-কুটুম্বাদির কত ক্ষতি হচ্ছে, সেদিকে যাদের খেয়াল যায় না—তাদের 'আসুরীতে মোহিনী' বলা হয়।

ভোগ-বিলাস এবং টাকা পয়সা জমানো—একে বলা হয় 'রাক্ষসীতে আসুরী'। ভোগে, সংগ্রহে, রাজকীয় আরামে মানুষ এত তন্ময় হয়ে যায় যে, তার দেশের কি অবস্থা হবে, মৃত্যুর পরই বা গতি কি হবে সেদিকে তার দৃষ্টি থাকে না—এরা হল 'রাক্ষসীতে মোহিনী-বৃত্তি'।

রাজকীয় আরাম, ভোগ সংগ্রহ করার ইচ্ছা পোষণ করা—এগুলিকে 'মোহিনীতে আসুরী' বলা হয়, এবং নির্দয়ভাবে অপরের ক্ষতি করা—একে মোহিনীতে রাক্ষসী বলা হয়।

ভগবান মানুষকে এত অধিকার দিয়েছেন, বিবেক দিয়েছেন যার দ্বারা সে প্রাণী মাত্রেরই সেবা করতে পারে, নিজের ও অপরের কল্যাণ করতে পারে, সকলকে শান্তি দান করতে পারে, সবার পূজনীয় হতে পারে আবার ভগবানকেও নিজের সেবকে পরিণত করতে পারে ; কিন্তু সে কামনা পরবশ জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়, মিথ্যা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, অন্যায় ইত্যাদি করে পশু-পক্ষী ইত্যাদি নীচ জন্ম পায় ও নরক গমন করে—এ অত্যন্ত দুঃখের কথা। সুতরাং মনুষ্যজন্ম পেয়ে পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করে নেওয়া উচিত, ভগবৎপ্রেম ও ভগবদ্ দর্শন করে নেওয়া কর্তব্য, এতেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা।

(২৭) গীতায় শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধা দ্বিধা শ্রীহরিগীতগীতে দৈবী প্রসঙ্গেন মতাঽসুরী চ।
দৈবী সদা সত্ত্বগুণেন যুক্তা রজস্তমোভ্যামপরা নিবোধ্যা॥

ভগবান গীতায় শ্রদ্ধাকে মানুষমাত্রেরই সাক্ষাৎ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন—'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' (১৭।৩) অর্থাৎ যে যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেইরূপই হয়।

ইন্দ্রিয় দ্বারা, অন্তঃকরণ দ্বারা যে বিষয়ের জ্ঞান হয় না, সেই বিষয়ে সাদরভাবযুক্ত যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাকে 'শ্রদ্ধা' বলা হয়। শ্রদ্ধার দুটি ভাগ আছে—দৈবী এবং আসুরী। যে শ্রদ্ধা দ্বারা অর্থাৎ যাতে শ্রদ্ধা করলে মানুষের কল্যাণ হয়, তত্ত্ব প্রাপ্তি হয়, ভগবদ্ দর্শন হয়, তাকে 'দৈবী' শ্রদ্ধা বলা হয় এবং যে শ্রদ্ধায় অর্থাৎ যাতে শ্রদ্ধা করলে বন্ধন হয়, অধোগতি হয়, সেই শ্রদ্ধাকে 'আসুরী' বলে অভিহিত করা হয়। এই দুই বিভাগকে সাত্ত্বিক এবং রাজসিক-তামসিক রূপেও বলা হয়েছে অর্থাৎ দৈবী শ্রদ্ধাকে সাত্ত্বিক এবং আসুরী শ্রদ্ধাকে রাজসিক-তামসিক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান এবং তাঁর নির্দেশে, মহাপুরুষ এবং তাঁদের বচনে, গ্রন্থে এবং শাস্ত্রীয় শুভকর্মে এবং সাত্ত্বিক তপাদি কর্মে শ্রদ্ধা করাকে দৈবী বা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা বলা হয়। দেবতাগণে, সকাম অনুষ্ঠানে, যক্ষ-রাক্ষসে, ভূত-প্রেতাদিতে শ্রদ্ধাকে আসুরী (রাজসিক-তামসিক) শ্রদ্ধা বলা হয়েছে। গীতায় এসবের বর্ণনা এইপ্রকারে করা হয়েছে—

দৈবী শ্রদ্ধা

১) **ভগবান এবং তাঁর মতে শ্রদ্ধা**—'সমস্ত যোগীর মধ্যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাবান হয়ে আমার ভজনা করে, আমার মতে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী' (৬।৪৭)। 'নিত্য নিরন্তর আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হয়ে যে ভক্ত পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করে, আমার মতে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ' (১২।২)। 'আমাতে শ্রদ্ধাবান হয়ে ও মৎপরায়ণ হয়ে যে ভক্ত এই অমৃততুল্য ধর্মের অনুষ্ঠান রুচিপূর্বক করে, সে আমার অতীব প্রিয়' (১২।২০)। 'যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক আমার এই মতের সর্বদা অনুষ্ঠান করে, সে সম্পূর্ণ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়' (৩।৩১)।

২) **মহাপুরুষ এবং তাঁর বচনে শ্রদ্ধা**—মহাপুরুষেরা যে যে আচরণ করেন, অন্যান্য ব্যক্তিগণও সেইরূপ আচরণ করে এবং মহাপুরুষ নিজ বাণীতে যে বিধান দেন, অপরে তার অনুসরণ করে (৩।২১)। যারা কর্মযোগ, সাংখ্যযোগ ধ্যানযোগাদি সাধনের কথা জানে না, কিন্তু মহাপুরুষদিগের বচনানুসারেই চলে তারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করে (১৩।২৫)।

৩) **গ্রন্থে ও শাস্ত্রীয় শুভকর্মে শ্রদ্ধা**—যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক এই গীতাগ্রন্থ পাঠ শোনে, সে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হয়ে পুণ্য-কর্মকারীদের প্রাপ্য উচ্চলোক প্রাপ্ত হয় (১৮।৭১)। কর্তব্য এবং অকর্তব্যের বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ ; সুতরাং শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা মেনেই কর্তব্য-কর্ম করা উচিত (১৬।২৪)। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি জানে না অর্থাৎ কোন কাজ কি বিধিতে করতে হবে তা জানে না, কিন্তু শাস্ত্রীয় শুভকর্মে যার শ্রদ্ধা আছে এবং যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক যজন-পূজন (১৭।১) করে, তাকে সাত্ত্বিক (দৈবী সম্পদ্‌সম্পন্ন) মানুষ বলা হয়—'**যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্**' (১৭।৪)।

৪) **সাত্ত্বিক তপে শ্রদ্ধা**—পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ফলেচ্ছারহিত হয়ে শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা যে তপ করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক তপ বলা হয় (১৭।১৭)।

—এই সবগুলিকে 'দৈবী' শ্রদ্ধার বিভাগ বলা হয়।

আসুরী শ্রদ্ধা

১) **দেবতা এবং সকাম অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা**—'যে ব্যক্তি যে দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভজন-পূজন করতে চায়, আমি

সেই দেবতার প্রতি তার শ্রদ্ধা দৃঢ় করে দিই (৭।২১)। মানুষ শ্রদ্ধাপূর্বক যে কোন দেবতাকেই পূজা করুক না কেন, বাস্তবে তাতে আমারই পূজা করা হয়, কিন্তু তা হয় অবিধিপূর্বক' (৯।২৩)।

২) **যক্ষ-রক্ষ ও ভূত-প্রেতাদিতে শ্রদ্ধা**—রাজসিক ব্যক্তি যক্ষ এবং রক্ষের পূজা করে এবং তামসিক ব্যক্তি ভূত-প্রেতাদির পূজা করে—**'যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ', 'প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ'** (১৭।৪)।

—এই সমস্ত আসুরী শ্রদ্ধার বিভাগ।

শ্রদ্ধার সঙ্গে যতক্ষণ দোষদৃষ্টি থাকে, ততক্ষণ শ্রদ্ধা পূর্ণরূপে ফলবতী হয় না। সুতরাং ভগবান শ্রদ্ধার সঙ্গে **'অনসূয়ন্তঃ'** এবং **'অনসূয়ঃ'** পদও দিয়েছেন—**'শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ'**(৩।৩১) এবং **'শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ'** (১৮।৭১)। এর তাৎপর্য এই যে শ্রদ্ধা যেন দোষদৃষ্টিরহিত হয়।

গীতায় দৈবী শ্রদ্ধার প্রয়োগ সাধকদের জন্যই করা হয়েছে, সিদ্ধদের জন্য নয়। কারণ সাধকদের সিদ্ধি লাভ করতে হবে, অতএব তাদের জন্য দৈবী শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সিদ্ধ তো সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছেনই অর্থাৎ তাঁর পরমাত্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভব হয়েছে, অতএব তাঁর জন্য দৈবী শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা নেই।

গীতা দৈবী শ্রদ্ধাকে খুবই প্রাধান্য দেয় এবং তাঁর ঘোষণা— যে শ্রদ্ধাহীন হয়ে যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদি করে তার সব নিষ্ফল হবে (১৭।২৮)।

নিষ্কামভাবে ভগবানে শ্রদ্ধা করলে মুক্তিলাভ হয়, মানুষের সংসার বন্ধন কেটে যায় আর সকামভাবে দেবতাদিতে শ্রদ্ধা করলে মানুষ বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। নিষ্কামভাবে শ্রদ্ধাপূর্বক দেবতাদির পূজা করায় দোষ হয় না, বন্ধনও হয় না, বরং তাতে কল্যাণই হয়। কিন্তু ভূত-প্রেতাদিতে শ্রদ্ধা করলে অধোগতি প্রাপ্তি হয় (৯।২৫ ; ১৪।১৮)। কারণ ভূত-প্রেতের উপাসনাতে নিষ্কামভাব থাকতেই পারে না। ভূত-প্রেতকে ইষ্ট মেনে পূজা-উপাসনা করলে পতন অনিবার্য। তবে যদি তাদের উদ্ধারের জন্য, তাদের তৃপ্তির জন্য পিণ্ড-জল দেওয়া হয়, গয়াতে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করা হয়, তাহলে তাতে দোষ হয় না ; কারণ, এতে কেবল সেই প্রেতের উদ্ধারের ভাবটিই প্রধান থাকে।

(২৮) গীতায় দেবগণের উপাসনা

যে নরাঃ কামনাযুক্তা যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
দুঃখং হি যান্তি তে সর্বে জন্মমৃত্যুজরাত্মকম্॥

দেবতা দুই প্রকারের—'আজান দেবতা' এবং 'মর্তদেবতা'। 'আজান দেবতা' তাঁদের বলা হয়, যাঁরা কল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেবতারূপে থাকেন এবং 'মর্তদেবতা' তাঁদের বলে, যাঁরা মনুষ্যদেহে পুণ্যকর্ম করে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হন এবং পুণ্যকর্ম অনুযায়ী স্বল্পসময়ের জন্যও স্বর্গে বাস করেন।

মানুষ অপেক্ষা দেবতাদের জন্ম (অর্থাৎ যোনিরূপে) উঁচু বলে মানা হয়, দেবলোককেও উঁচু বলে মানা হয়, তাঁদের ভোগ, শরীর, সুখ-সামগ্রী সমস্তকেই উচ্চরূপে ধারণা করা হয়। দেবলোক, তাঁদের ভোগ, শরীর ইত্যাদি সমস্তই দিব্য, **'দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্'** (৯।২০) ; এবং তাঁর লোক, ভোগ, ইন্দ্রিয়ের শক্তি, আয়ু ইত্যাদি সবই বিশাল হয়ে থাকে—**'স্বর্গলোকং বিশালম্'** (৯।২১) ; কিন্তু তাঁর লোক, ভোগ, শরীর, ইন্দ্রিয়

ইত্যাদিতে যা কিছু দিব্যতা[১] বিলক্ষণতা বা বিশালতা থাকে, তা পুণ্যকর্মের কারণেই হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি সংসারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত হয়ে আছে, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে, তার চেয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি-যুক্ত দেবতাদের উপাসনাকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। কারণ সে বেদ, শাস্ত্র তথা বৈদিক মন্ত্র, যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা রাখে এবং সকামভাবে তৎপরতাপূর্বক যজ্ঞ এবং আনুষ্ঠানিক শুভকর্ম যথাযথভাবে পালন করে। এইজন্য এখানকার ভোগে সে কিছু সংযম পালন করে এবং তার অন্তঃকরণও কিছুটা শুদ্ধ হয়। এইরূপ ব্যক্তি শুভকর্মের প্রভাবে দেবলোকে গমন করে এবং সেখানে দিব্য সুখভোগ করে, সেই পুণ্যের ফল সমাপ্ত হলে পুনরায় মৃত্যুলোকে এসে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ স্বর্গ থেকে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণের স্বভাব স্বাভাবিকভাবে শুদ্ধ হয়, দান করা ইত্যাদির দিকে তাদের স্বাভাবিকভাবে প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু যারা নিষ্কামভাবে নিজ কর্তব্যপালন করে তথা ভগবদ্বুদ্ধিতে দেবতার পূজা করে, তাদের যেরূপ শুদ্ধি হয় ঐরূপ শুদ্ধি সকামভাবে যারা দেবতাদের পূজা বা আরাধনা করে, তাদের হয় না ; কেননা তাদের স্বর্গাদি লোকের এবং তথাকার সুখভোগের প্রবল কামনা থাকে।

যদিও মনুষ্যলোকে কোন কর্মের সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করে দেবতাদের পূজা করলে সেই কর্মের সিদ্ধি খুব শীঘ্র পাওয়া যায় (৪।১২), তবু সেই উপাসনার ফল অসীম, অবিনাশী হয় না (৭।২৩)। কারণ দেবতাগণ তাঁদের উপাসনাকারী ব্যক্তিদের উপর প্রসন্ন হলে সর্বাধিক দেবলোকে তাদের নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তাদের প্রকৃত কল্যাণ করতে পারেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত উপাসনাকারী ব্যক্তিদের পুণ্য অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ তাঁরা দেবলোকে থাকতে পারেন। পুণ্য সমাপ্ত হলেই তাঁদের সেখান থেকে চলে আসতে হয়। টিকিট যে স্থান পর্যন্ত কাটা আছে সেইস্থান পর্যন্ত যেমন যাওয়া যায়, তেমনি পুণ্য যতটা থাকে সেই সময়টুকু পর্যন্তই স্বর্গে থাকতে পারা যায়। পুণ্য শেষ হলেই তাঁদের বাধ্য হয়ে সেখান থেকে মৃত্যুলোকে চলে আসতে হয় (৯।২১)।

প্রকৃতির সঙ্গে, গুণাবলীর সঙ্গে সম্বন্ধগত যে সুখভোগ হয়, উচ্চলোক প্রাপ্তি হয়, তা সমস্তই বিনাশশীল, সীমিত এবং জন্ম-মৃত্যু চক্রে আনয়নকারী। যে প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে চায় না, শুধু নিজের কল্যাণ চায় এবং পরমার্থ পথে চলে, এমন মানুষ যদি কোন কারণ বিশেষে মৃত্যুকালে সাধনপথ থেকে বিচলিত হয়ে স্বর্গাদি লোকে যেতে বাধ্য হয়, তাহলেও সে সেই ভোগে আবদ্ধ হয় না ; কারণ, ভোগবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। স্বর্গাদি ভোগ তার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। সেখানে বহুকাল থাকার পর সে পুনরায় শুদ্ধ শ্রীমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে ও পুনরায় সাধন ভজন শুরু করে (৬।৪১, ৪৪)।

দেবতাকে যারা পূজা করে তাদের পতনই হয়, কারণ তাদের বার বার জন্ম-মরণরূপ দুঃখ ভোগ করতে হয়। কিন্তু যারা কোন প্রকারে নিজ কল্যাণসাধনে লেগে আছে, তাদের কখনো পতন হয় না (৬।৪০) ; কারণ তাদের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ কল্যাণ হওয়ায় ভগবান তাদের শুদ্ধ শ্রীমানের ঘরে সাধন করার উদ্দেশ্যে জন্ম পরিগ্রহ করান।

বাস্তবে দেখতে গেলে স্বর্গাদির সুখ কোন উচ্চ জিনিস নয়। সেই সুখও মর্তের ধনী ব্যক্তিদের সুখেরই শ্রেণীভুক্ত, শুধুমাত্র সুখের তারতম্য আছে। কারণ সেই সুখও সংস্পর্শজনিত ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়ের এবং তা আদি ও অন্তবিশিষ্ট এবং দুঃখের হেতু (৫।২২)। কিন্তু পারমার্থিক সুখ নির্বিকার, অক্ষয় অর্থাৎ তা কখনো নষ্ট হয় না কারণ তা স্বয়ং থেকে উদ্ভূত, প্রত্যেক প্রাণীর স্বধর্ম, সম্পর্কজনিত নয় (৫।২১)।

তাৎপর্য এই যে, দেবগণের উপাসনাকারী ব্যক্তি অতি

---

[১]দেবগণের দিব্যতা ভগবানের দিব্যতার সমান নয়। ভগবানের দিব্যতা অলৌকিক, চিন্ময় ; অপরপক্ষে দেবগণের দিব্যতা লৌকিক, প্রাকৃত এবং বিনাশশীল।

উচ্চলোকে গেলেও কামনার কারণে তাকে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আসতেই হয় এবং তার কল্যাণ হয় না (৯।২১)। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনভাবে ভগবানে মন নিবিষ্ট করে, সে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়,[১] তার কখনো পতন হয় না (৬।৪০)। ভগবান নিজের চারপ্রকার ভক্ত—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী (প্রেমী)—এদের সুকৃতিশালী বলে বর্ণনা করেছেন (৭।১৬), উদার বা মহান বলেছেন (৭।১৮), কেননা তারা ভগবানকেই আশ্রয় করে আছে। ভগবানকে আশ্রয় করে থাকায় তারা ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মানুষের উচিত—কামনা ও সুখেচ্ছার বশীভূত হয়ে মনুষ্যজন্মের অমূল্য সময়কে জন্ম-মৃত্যুচক্রে না লাগিয়ে তারা যেন ভগবানকেই আশ্রয় করে থাকে।

(২৯) গীতায় প্রাণিমাত্রের প্রতি হিতসাধনের ভাব

জগতি যোঽখিলজীবহিতে রতো ব্রজতি স সুখদুঃখবিনাশতাম্।
নিজহিতং চ য ইচ্ছতি কেবলং ঝটিতি নশ্যতি নো অবিবেকতা॥

জীব অনাদিকাল থেকে তার ব্যক্তিগত সুখ ও হিতে তৎপর রয়েছে। 'আমার সুখ হোক, আমার সম্মান হোক, আমার মান বাড়ুক, আমার যশ হোক, আমি যেমন চাই তেমন হোক, আমার কল্যাণ হোক, আমার মুক্তি হোক'—এইপ্রকারে তার সবকিছু নিজ অধিকারে নেওয়ার স্বভাব রয়েছে। এই স্বভাবের জন্য তার মধ্যে কামনা, বাসনা, মমতা, আসক্তি ইত্যাদির বৃদ্ধি এবং দৃঢ়তা আসে ; কিন্তু কল্যাণ—কামনা, মমতা ইত্যাদি রহিত হলে তবেই হয় (গীতা ২-৭১)। সুতরাং জগতের সবকিছু নিজের অধিকারে আনার স্বভাব দূর করার জন্য মানুষের সমস্ত প্রাণীর হিতে অনুরাগ ও প্রীতি হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। অর্থাৎ 'প্রাণিমাত্রই যেন সুখ পায়, কেউ দুঃখ না পায়, সকলের সম্মান ও সৎকার যেন হয়, সকলের মান বাড়ুক, সকলের কল্যাণ হোক, সবাই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হোক'—এইরূপ মনোভাব থাকা খুবই প্রয়োজন। এইরূপ সর্বহিতকারী ভাব হলে সংসারের আসক্তি কমে যায়, অর্থাৎ সংসারকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করার যে মনোভাব তা দূর হয়ে যায়। নিজের যা কিছু ধন-সম্পত্তি, বৈভব, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-শরীর আছে, যা এই সংসার থেকেই পাওয়া এবং সংসারেরই অভিন্ন, তাকে যদি প্রাণীদের হিতে নিয়োজিত করার চিন্তা জাগ্রত হয় এবং প্রাণীদের সেবা করতে, তাদের সম্মান-সৎকার করতে, সুখ ও আনন্দ দিতে, তাদের উপকার করতে তার সব সামগ্রী স্বতঃই সৎভাবে ব্যয় হয় তবে বিনাশশীল বস্তুর কামনা, মমতা, আসক্তি দূর হতে থাকে এবং নিজের পরিচ্ছিন্নতাবোধ মিটতে থাকে। সার্বিকভাবে পরিচ্ছিন্নতা-বোধ দূর হলে পরমাত্ম-প্রাপ্তি ঘটে—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (১২।৪)।

স্বয়ং জীবাত্মা যেমন পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন, সেইরূপ শরীরাদি সামগ্রীও সংসার থেকে অভিন্ন। কিন্তু যতক্ষণ সকলের হিতের চিন্তা দৃঢ় না হয়, ততক্ষণ নিজের বলতে যা কিছু সামগ্রী তা সংসারের বলে মনে হয় না। ফলে নিজের সুখ ও আরামের জন্য কামনা বৃদ্ধি পেয়ে দৃঢ় হতে

[১]ভগবানের এমনই মহিমা যে, যদি কোন ব্যক্তি যে কোন ভাবেই হোক ভগবানে মন নিবিষ্ট করে, তাহলে তার মধ্যে আপনিই নিষ্কামভাব এসে যায় এবং সে উদ্ধার পেয়ে যায়। অতএব সকামভাবের তাৎপর্য কেবল ভগবানে মন-নিবিষ্ট হওয়াতেই নিহিত, সকামভাবে লিপ্ত হওয়ায় নয়।

থাকে। যতক্ষণ কামনা, মমতা ইত্যাদি থাকে, ততক্ষণ জড়ত্বের সঙ্গে তাদাত্ম্য-ভাব থাকে, যা জন্ম-মৃত্যু-চক্রে আবর্তনের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় (১৩।২১)। কিন্তু যদি সমস্ত প্রাণীর হিতে অনুরক্তি হয় তাহলে তাদাত্ম্য-ভাব সহজেই নষ্ট হয়। কারণ প্রাণীমাত্রেরই হিতে অনুরক্তি হলে সাংসারিক বিষয়াদি আর নিজের সুখ-আরামের জন্য নয়, প্রাণীদের মঙ্গলের জন্যই খরচ হতে থাকে।

ভগবান গীতায় দু'বার বলেছেন—'সর্বভূতহিতে রতাঃ' (৫।২৫ ; ১২।৪)। পঞ্চম অধ্যায়ের পঁচিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন, সমস্ত প্রাণীর হিতে যদি সাধকের অনুরাগ হয়, তবে সে নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন—'সমস্ত প্রাণীর হিতে যার অনুরাগ হয়, সেই সাধক আমাকে (সগুণকে) প্রাপ্ত হয়।' এর তাৎপর্য এই যে, অপরের হিতে প্রীতি হলে জড়ত্ব এবং নিজ সুখ-বিলাস ত্যাগ আপনা হতেই সহজভাবে হয়ে যায়। জড়ত্ব ত্যাগ হলে সাধক যদি নির্গুণ ব্রহ্মের প্রাপ্তি চায়, তবে সে নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হতে পারে আর যদি সগুণ প্রাপ্তি চায়, তাহলে সগুণ লাভ করে। অর্থাৎ প্রভুর প্রতি যে স্বাভাবিক প্রেম তা জাগরিত হয়।

'সর্বভূতহিতে রতাঃ'—পদটি দু'বারই জ্ঞানযোগের প্রকরণে দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, জ্ঞানযোগের সাধকদের মধ্যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র উপাসনা প্রধানভাবে থাকে। যে অহং-ভাব অনাদিকাল থেকে শরীরের সম্বন্ধের ফলে চলে আসছে সেই অহংভাব ত্যাগ করার জন্য প্রাণীর হিতে অনুরাগ হওয়া খুবই প্রয়োজন। প্রাণীদের হিতে অনুরাগ হলে অহংভাব খুব সহজেই চলে যায়। অহংভাব দূরীভূত হলে নিজ স্বরূপের অনুভব করা যায়, তখন বন্ধনের কোন কারণ থাকে না।

প্রাণীদের হিত পরিমাপের এমন মানদণ্ড নেই যার দ্বারা দেখা যায় সাধক প্রাণীদের জন্য কতটা কাজ করছে, কত জিনিস দান করছে। কেননা ক্রিয়া ও পদার্থ সীমিত। ক্রিয়ার যেমন আরম্ভ ও শেষ থাকে, তেমনি পদার্থেরও সংযোগ ও বিয়োগ হয়। কিন্তু প্রাণীদের হিতের জন্য যে ভাব, তা অসীম। অসীম ভাবের দ্বারাই অসীম তত্ত্ব (পরমাত্মা) প্রাপ্তি হয়।

সাধক যা কিছু সাধন-ভজন করে তাতে স্বাভাবিক-ভাবে সকলেরই হিত হয়। যদি সাধকের মধ্যে, 'আমার যেন কল্যাণ হয়'—এরূপ ব্যক্তিগত হিতের চিন্তা থাকেও, এর দ্বারা জীবের হিত হয়। ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষের ব্যক্তিগত হিতের চিন্তা থাকে না, সুতরাং তাঁর দ্বারা যা কিছু সাধন-ভজন হয় তাতে স্বতঃই লোকের কল্যাণ করে। মহাপুরুষকে দর্শন করলে, তাঁর শরীর স্পর্শকারী বায়ুতে, তাঁর সঙ্গ ও অমৃতময় বাক্যে অন্য লোকের ওপর প্রভাব পড়ে, যার ফলে তাদের মধ্যে সাধন-ভজন করার রুচি জাগ্রত হয় এবং তারাও ভগবন্মুখী হয়ে ওঠে।

ধূমপানকারীদের দ্বারা যেমন স্বাভাবিকভাবে ধূমপানের প্রচার হয়, তেমনি সাধকদের দ্বারাও স্বাভাবিকভাবে সাধন-ভজনের প্রচার হয়। এইরূপ নির্মল হৃদয়ের সাধকেরা যেখানে বাস করেন, সেই স্থানটি অত্যন্ত পবিত্র হয়ে ওঠে। ভোগী ব্যক্তিদের ভোগস্পৃহা এবং সংগ্রহের লালসা যেমন সাধারণ লোকের ওপর স্বাভাবিকভাবে প্রভাব ফেলে, তেমনি সাধকগণের ত্যাগ, ও সাধন-ভজন সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁদের সাধন-ভজনের প্রভাব কেবল মানুষের ওপরই নয়, পশু-পক্ষী ইত্যাদি ইতর জীবের ওপর, এমনকি ঘরের দেওয়াল প্রভৃতি নানা জড় বস্তুর ওপরও পড়ে।

যে সকল সিদ্ধ মহাপুরুষ কেবল নিজের মধ্যেই মগ্ন থাকেন, লোক-সংস্পর্শে আসেন না, তাঁদের দ্বারাও অদৃশ্যরূপে স্বতঃই চিন্ময় তত্ত্বের, জড়ত্ব ত্যাগের প্রচার হয়। তাঁদের এই অদৃশ্য প্রভাব জড়ত্ব ত্যাগে ও চিন্ময় তত্ত্বে স্থিত হতে সাহায্য করে। বরফ থেকে যেমন স্বাভাবিকভাবে ঠাণ্ডা বিকিরণ হয়, সূর্য থেকে যেমন স্বতঃই জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি এইসব মহাপুরুষ হতে সাধারণ মানুষের স্বতঃই হিত হয়, তারা শান্তি লাভ করে। সুতরাং এই জগৎ-সংসারে যে শান্তি পাওয়া যায়, সুখ পাওয়া যায়, আনন্দ পাওয়া যায়, সেই সমস্তই এইসব

সিদ্ধ মহাপুরুষগণের কৃপা-কণামাত্রে হয়।

অপরের হিতে প্রীত হওয়া এবং নিজ কল্যাণ কামনা করা এই দুটিতে আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য থাকলেও, বাস্তবে একই। কারণ যাঁদের প্রাণীর প্রতি হিত করার চিন্তা থাকে, তাঁরা জড়ত্ব ত্যাগ করে কল্যাণ প্রাপ্ত হন, আর যাঁরা নিজ কল্যাণে উৎসাহী, তাঁদের জড়ত্ব স্বতঃই ত্যাগ হয়, ফলে তাঁদের দ্বারা স্বতঃই প্রাণীদের হিত সাধিত হয়।

লোভী ব্যক্তিদের দ্বারা স্বাভাবিকভাবে লোভের এবং উদার ব্যক্তিদের দ্বারা স্বতঃই উদারতার প্রচার হয়। যার মনে অর্থের, মান-সম্মানের গুরুত্ব থাকে, তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবে ঐসবেরই প্রচার হয়, আর যাঁর হৃদয়ে অর্থাদির কোন গুরুত্ব নেই, তাঁর দ্বারা ত্যাগের প্রচার হয়। যে ব্যক্তি সর্বদা ভগবানের গুণ, লীলা, প্রভাব, মহত্ত্ব ইত্যাদির কথা বলে, অপর ব্যক্তিদের শোনায়, তার দান এই পৃথিবীতে অপরিমেয় (মহাদানী)—'**ভূরিদা জনাঃ**' (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩১।৯)। যে ব্যক্তি অর্থ ও অন্ন জল ইত্যাদি দান করে সে '**ভূরিদা**' (মহাদানী) নয়, বরং তাকে '**অন্নদা**' (অন্নদানী) বলা হয়। কারণ প্রাকৃত বস্তু শুধুমাত্র প্রাণীদের শরীর পর্যন্ত পৌঁছায়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রেমপূর্ণ ভগবদ্‌বচন বলে, সে সকলকে জড়ত্ব থেকে চিন্ময়-তত্ত্বে আকর্ষণ করে।

সমস্ত জগৎ চাইলেও একটি প্রাণীকে সুখী করতে পারে না, তাহলে একজন মানুষ কী প্রকারে সকল প্রাণীকে সুখী করতে পারে ? বস্তুতঃ সমস্ত প্রাণীর হিতের তাৎপর্য এই যে, সকলের হিতে রুচি হোক, প্রীতি হোক ; সবাইকে সুখী করার চিন্তা হোক। সকল প্রাণীর হিতে অনুরাগ জন্মালে নিজের সুখবুদ্ধি, ভোগ এবং সংগ্রহবুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধি স্বাভাবিকভাবে ত্যাগ হয়ে যায় এবং পরমাত্মতত্ত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। তার কারণ নিজের সুখবুদ্ধি হল পরমাত্ম তত্ত্ব-প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায়।

(৩০) গীতায় এক প্রত্যয়ের মহিমা

সাধকানাং ভবত্যেব বুদ্ধিশ্চ নিশ্চয়াত্মিকা।
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং বুদ্ধয়োঽনিশ্চয়াত্মিকাঃ॥

জীবাত্মায় এক অংশে পরমাত্মা অপর অংশে প্রকৃতির অধিষ্ঠান। জীবাত্মা যখন পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হয়, তখন তার মধ্যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আসে আর যখন সে প্রকৃতির অংশ শরীর ও সংসারের দিকে চালিত হয়, তখন তার বুদ্ধি বহু দিকে ধাবিত হয়, তার অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় (২।৪১)। তাৎপর্য এই যে, পারমার্থিক সাধকের এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় যে, 'পরমাত্মাকে পেতে হবে, তাতে যাই হোক না কেন।' কিন্তু যে ব্যক্তি সাংসারিক ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ করতে ও জাগতিক সুখভোগ করতে চায়, তার পরমাত্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না। অপরপক্ষে জাগতিক ভোগ প্রাপ্তির জন্য তার মনে বিচারের শেষ থাকে না। এর কারণ হচ্ছে যে, পরমাত্মা এক এবং তাঁকে পাবার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিও একই হয়। সাংসারিক ভোগ অসংখ্য এবং তা ভোগ করবার (ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি) সাধনও অনেক, তাই সেইসব প্রাপ্তির একনিষ্ঠ বুদ্ধিও হয় না।

পরমাত্মার সগুণ, নির্গুণ ইত্যাদি স্বরূপের ভেদ থাকলেও এইসকল স্বরূপ তত্ত্বতঃ এক এবং নিত্য। সুতরাং পরমাত্মার কোন একটি স্বরূপের প্রাপ্তির নিশ্চয়তাও একই হয়। পরমাত্মপ্রাপ্তির লক্ষ্য যদি এক নিশ্চয় হয়, তাহলে সমস্ত সাধনই সহজ সরল হয়ে যায় এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তৎপরতাও স্বতঃই হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি নিজেকে ঈশ্বরের ভক্ত বলে মেনে নেয়,

তাহলে ঈশ্বরকে ভক্তি করা তার পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে যায় অর্থাৎ ভক্তি সম্বন্ধীয় কথা সে তখন গ্রহণ করে এবং ভক্তি-বিরোধী কথা সে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে। কারণ সে তখন এই কথাই ভাবে যে, 'আমি ভক্ত, কাজেই ভক্তি-বিরুদ্ধ কাজ আমার করা উচিত নয়।' কিন্তু যাদের লক্ষ্য থাকে সংসার-ভোগের, তাদের কখনও এদিকে কখনও ওদিকে, এইরূপ নানারকম বাসনা মনে জন্মাতে থাকে। সেই বাসনার কখনও অন্ত হয় না, কেননা এক বাসনা পূরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাসনা উৎপন্ন হতে থাকে।

এই ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধির এমনই মহিমা যে অতি দুরাচার বা অতি পাপী ব্যক্তিও যদি, 'আমি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হব'—এইরূপ সিদ্ধান্ত করে, তাহলে সে খুব শীঘ্র ধর্মাত্মা হয়ে যায়। শুধু ধর্মাত্মাই নয়, তার নিত্য শান্তি লাভ হয় অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় (৯।৩০-৩১)।

অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত মানুষ যতবার জন্ম নেয় ততবারই সে নানা উদ্যোগ, পরিশ্রম করতে থাকে, কিন্তু তার বাসনার পরিপূর্তি হয় না। আসলে, নতুন নতুন বাসনা জন্মাতে থাকে, যার কখনো শেষ হয় না। যদি কখনও কোনও বাসনার পূর্তি হয়, তাহলে সেটিও ভবিষ্যতে নতুন-নতুন কামনা সৃষ্টির কারণে পরিণত হবে।

এর তাৎপর্য এই যে, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হলে অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি চলে যায়, কিন্তু অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি থাকাতে কখনো ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি হয় না। সুতরাং মানুষের উচিত যে, সে যেন শীঘ্র পরমাত্ম-প্রাপ্তিকেই স্থির লক্ষ্য করে নেয়। কারণ পরমাত্ম-প্রাপ্তির জন্য প্রাপ্ত শরীর পাত হয়ে গেলে আমরা ভগবৎপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিতই রয়ে যাব।

(৩১) গীতায় দ্বিবিধ সত্তার বর্ণনা

দ্বিবিধা দৃশ্যতে সত্তা বিকারিণ্যবিকারিণী।
ভূত্বাঽসতো ভবিত্রী চ সতো নিত্যা সনাতনী॥

সত্তা দুই প্রকারের—বিকারী এবং অবিকারী। উৎপন্ন হবার পর যে সত্তা হয়, তাকে বিকারী সত্তা বলে ; কারণ তাতে নিরন্তর পরিবর্তন হতে থাকে। যে সত্তা স্বতঃসিদ্ধ, তাকে 'অবিকারী সত্তা' বলা হয় ; কারণ তাতে কখনো কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। তাই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোল সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যার কখনো ভাব (সত্তা) হয় না, সে অসৎ, বিকারী সত্তা এবং যার কখনো অ-ভাব হয় না, সে সৎ এবং অবিকারী সত্তা—'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।'

উৎপন্ন হওয়া, উৎপন্ন হওয়ার পর শরীর সম্পন্ন হওয়া, বেড়ে ওঠা, অবস্থান্তর হওয়া বা বদল হওয়া, ক্ষীণ হওয়া এবং নষ্ট হওয়া—এই ছয় প্রকারের বিকার জগতে হয়। যেমন শিশু জন্মায়, জন্মানোর পরে 'শিশু-কলেবর' বেড়ে ওঠে, অবস্থার পরিবর্তন হয়, পরে ক্ষীণ হতে থাকে এবং শেষে মৃত্যু হয়। এই ছয় প্রকার বিকার জগৎ-সংসারেই হয়, আত্মাতে নয়। কারণ আত্মা জন্মায় না, জন্মে শরীর সম্পন্ন হয় না, বাড়ে না বা বদলায় না, ক্ষীণও হয় না বা তার মৃত্যুও হয় না (২।২০)।

গীতায় যে যে স্থানে শরীর এবং জগৎ-সংসারের বর্ণনা আছে তা সবই 'বিকারী সত্তার' এবং যে যে স্থানে পরমাত্মা এবং আত্মার বর্ণনা আছে তা সবই 'অবিকারী সত্তার'।

জ্ঞাতব্য

উৎপন্ন হওয়া বিকারী সত্তা অনুৎপন্ন অবিকারী সত্তার অধীনেই থাকে। কারণ বিকারী সত্তার কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। বিকারী সত্তা যত সত্য বলেই প্রতিভাত হোক না কেন তা আসলে অবিকারী সত্তারই অন্তর্গত। কিন্তু অবিকারী সত্তা বিকারী সত্তার অধীন নয়। কারণ তা স্বতঃসিদ্ধ। যে স্থানে বিকারী সত্তা নেই অর্থাৎ যে স্থানে

দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি এবং ক্রিয়াদি নেই, সে স্থানেও অবিকারী সত্তা যথাবৎ ও পরিপূর্ণরূপে থাকে। এই অবিকারী সত্তা দেশ, কাল, বস্তু ইত্যাদির ভিতর এবং বাহির সর্বত্র পরিপূর্ণ। অবিকারী সত্তাকে যারা জানে, যারা জানে না, যারা মানে, যারা মানে না, তাদের মধ্যেও এই অবিকারী সত্তা সমানভাবে বর্তমান। অবিকারী সত্তাকে কেউ জানুক বা না জানুক, মানুক বা না মানুক, স্বীকার করুক বা না করুক, অনুভবে আসুক বা না আসুক এ সদা বিরাজমান। তা জানবার বা মানবার বা স্বীকার করবার অপেক্ষা রাখে না। অবিকারী সত্তা বিকারী সত্তা ব্যতীতই বিদ্যমান থাকে ; কিন্তু বিকারী সত্তা অবিকারী সত্তা ব্যতীত থাকতেই পারে না। কারণ তার আধার এবং আশ্রয় হল এই অবিকারী সত্তা।

জিজ্ঞাসা—শরীর বিকারী সত্তাসম্পন্ন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির দ্বারাই তো অবিকারী সত্তার জ্ঞান হয়, অনুভব হয় ; তাহলে তো অবিকারী সত্তা বিকারী সত্তার অধীন হল ?

সমাধান—কথা তা নয়। বিকারী সত্তা দ্বারা অবিকারী সত্তার অনুভূতি হয় না, বরং বিকারী সত্তা ত্যাগ করলেই অবিকারী সত্তার অনুভূতি হয়। যতক্ষণ 'বিকারী সত্তার দ্বারা অবিকারী সত্তার অনুভূতি হয়'—এই ভাব থাকবে, ততক্ষণ হৃদয়ে বিকারী সত্তার গুরুত্ব থাকবে। যতক্ষণ বিকারী সত্তার গুরুত্ব থাকবে ততক্ষণ মানুষ অবিকারী সত্তার কথা শিখতে পারে, পড়তে পারে, ব্যাখ্যা করতে পারে, গ্রন্থ রচনা করতে পারে, কিন্তু তাকে অনুভব করতে পারে না। তাৎপর্য এই যে, যতক্ষণ অন্তরে উৎপন্ন সত্তার গুরুত্ব থাকে, ততক্ষণ সর্বত্র পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও অনুৎপন্ন সত্তার অনুভব হতে পারে না।

জিজ্ঞাসা—চরম বা অন্তিম বৃত্তিই তো অনুৎপন্ন সত্তার বোধ হওয়ার কারণ হয়, তাহলে উৎপন্ন সত্তার দ্বারাই অনুৎপন্ন সত্তার বোধ হয়—এই তো প্রমাণিত হয় ?

সমাধান—না। চরম বৃত্তির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলে তবেই অনুৎপন্ন সত্তার, শুদ্ধ-স্বরূপের যথার্থ অনুভব হয়। উৎপন্ন সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাকালীন শুদ্ধ-স্বরূপের বোধ হয় না, বরং বৃত্তিসংশ্লিষ্ট তত্ত্বেরই বোধ হয়। বৃত্তি থাকা পর্যন্ত সমাধি এবং ব্যুত্থান—এই দুই অবস্থা হয় ; কিন্তু বাস্তবিক বোধে এই অবস্থা হয় না। বাস্তবিক বোধ বৃত্তিরহিত হলেই হয়, কেননা বৃত্তি উৎপন্ন ও নষ্ট হয়, কিন্তু স্বরূপের উৎপত্তি বা নাশ কিছুই হয় না। এর তাৎপর্য এই যে, বৃত্তি থেকে বোধ হয় না, বরং বৃত্তি থেকে সম্বন্ধবিচ্ছেদ হলে তবেই বোধ হয়।

যারা ক্রমানুসারে সাধনা করে অর্থাৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ধ্যান, সমাধি, সবীজ, নির্বীজ এইরূপ ক্রম অনুযায়ী সাধনা করে, তাদের পক্ষে বৃত্তি কিছু সময়ের জন্য উপযোগী হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক বোধ বৃত্তিরহিত হলেই হয়। সাধারণভাবে এই স্থূল-শরীর, স্থূল-পদার্থ এবং স্থূল-ক্রিয়াদির দ্বারাও জগৎ-সংসারের সেবা-কাজ চলে, যার দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ, পবিত্র হয়। শুদ্ধ অন্তঃকরণ ভগবানে মন নিবিষ্ট করতে সাহায্য করে। শুদ্ধ অন্তঃকরণ করণ-সাপেক্ষ সাধনে অর্থাৎ ক্রম অনুযায়ী সাধনার সহায়ক হয়, কিন্তু সেই সাধনায় অন্তঃকরণের প্রতি যে গুরুত্ব থাকে, তা তত্ত্ব-প্রাপ্তির বাধক হয়। করণ-নিরপেক্ষ সাধনা দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করা যায়। কারণ স্বতঃসিদ্ধ সত্তা করণ-সাপেক্ষ নয় অর্থাৎ তা কোন করণের (অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-আমিত্ব-আদির) অপেক্ষা করে না। কোন কিছুই চিন্তা না করে, সমাধিরও চিন্তা-ভাবনা না করে, অন্তরে-বাহিরে নীরব থাকলে স্বরূপ-স্থিতি স্বাভাবিক হয়, কারণ তা তো প্রথম থেকেই বিদ্যমান।

সাধক যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিকারী সত্তা উপভোগ করে এবং তার দ্বারা সুখাস্বাদন করে, সমাধিস্থ হয়েও এইরূপ ভাব পোষণ করে, ততক্ষণ তার বিকারী সত্তার গুরুত্ব দূর হয় না ; এবং গুরুত্ব দূর না হলে অবিকারী সত্তার স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি হয় না। মনুষ্য দেহ বিকারী সত্তার গুরুত্ব দূর করারই হেতুস্বরূপ হয়, অবিকারী সত্তা প্রাপ্তির জন্য নয়। অতএব বিকারী সত্তা অবিকারী সত্তার প্রাপ্তির কারণ হতে পারে না এবং অবিকারী সত্তা বিকারী সত্তার কার্য হতে পারে না—**'নাসতঃ সজ্জায়েত'**।

মানুষ কেবলমাত্র অবিকারী সত্তা (পরমাত্মা)-কেই প্রাপ্ত হতে পারে, বিকারী সত্তা (জাগতিক পদার্থের)-প্রাপ্ত হতেই পারে না ; কারণ মানুষ বিকারী সত্তা বা জাগতিক পদার্থ যতই সংগ্রহ করুক, তাকে চিরস্থায়িভাবে

রাখা সম্ভবই নয়। হয় মানুষ জীবিত থাকাকালীন এই পদার্থ নষ্ট হয়ে যায় অথবা পদার্থ থেকে যায় ; মানুষ চলে যায় অর্থাৎ তার মৃত্যু হয়। মানুষ জাগতিক পদার্থ নিজের করে রাখতে পারে না অথবা নিজে তার সঙ্গে থাকতে পারে না ; সুতরাং পদার্থপ্রাপ্তি প্রকৃত অর্থে অপ্রাপ্তিই।

অবিকারী সত্তার বিকারী সত্তা থেকে আজ পর্যন্ত কিছু প্রাপ্তি ঘটে নি, ঘটা সম্ভবও নয়। এর তাৎপর্য এই যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি থেকে স্বয়ং কিছুই পান নি, পাবেন না এবং পাওয়া সম্ভবও নয়। বিকারী সত্তা হচ্ছে অ-ভাবরূপী—'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' (২।১৬)। অতএব বিকারী সত্তা (জগৎ) প্রাপ্ত হয়েছে দেখালেও তা অপ্রাপ্তব্যই থাকে এবং অবিকারী সত্তা (পরমাত্মা) অপ্রাপ্ত দেখালেও তার প্রাপ্তি হয়েই আছে। অবিকারী সত্তাকে প্রাপ্ত হতে মানুষ সক্ষম এবং তাকে প্রাপ্ত হওয়ার সমস্ত প্রকার সামগ্রীও মানুষের অধিকারে রয়েছে।

জিজ্ঞাসা— বিকারী সত্তার কাছ থেকে অবিকারী সত্তা কিছুই লাভ করে না — একথা সত্য, তবুও বিকারী সত্তার কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে, এইরকম মৃগতৃষ্ণা থেকে যায়। এ কীভাবে দূর হবে ?

উত্তর— সাধক নিজ বিবেককে যেমন সম্মান করবে, গুরুত্ব দেবে, তেমনই এই ভ্রম দূর হতে থাকবে। শেষে এই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যাবে এবং বিবেক অবিকারী সত্তার প্রাপ্তি করিয়ে তাতেই একাত্ম হয়ে যাবে।

(৩২) গীতায় দ্বিবিধ বাসনা

ইচ্ছা তু দ্বিবিধা প্রোক্তা জগতঃ পরমাত্মনঃ।
অপূর্তির্জগদিচ্ছায়াঃ পূর্তিশ্চ পরমাত্মনঃ॥

গীতায় সৎ এবং অসৎ—এই দুইয়েরই বর্ণনা আছে। এইরূপ বাসনাও দুই প্রকারের হয়। 'সৎ' প্রাপ্তির বাসনা এবং 'অসৎ' বা সাংসারিক ভোগ প্রাপ্তির বাসনা। সৎ-এর বাসনা হল ভাবরূপ অর্থাৎ তা সদা স্থিতিশীল এবং অসতের বাসনা অ-ভাবরূপ অর্থাৎ যা কখনো পূর্ণ হওয়ার নয় (২।১৬)। অতএব সৎ বাসনার পূরণ হয় এবং অসৎ বাসনার নিবৃত্তি হয়, অভাব হয়।

বাস্তবে দেখতে গেলে জীব সাক্ষাৎ পরমাত্মা (সৎ)-এর অংশ এবং সে প্রকৃতির অংশ (অসৎ)কে আকর্ষণ করে থাকে, তার সঙ্গে তাদাত্ম্য করে নেয় (১৫।৭)। এইজন্য তার মধ্যে দুইপ্রকার বাসনা সৃষ্টি হয়। যদি সে প্রকৃতিগত অংশকে আকর্ষণ না করে, তাহলে অসৎ বাসনার নিবৃত্তি হয় এবং সৎ বাসনা পূর্ণ হয়। কারণ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় পরমাত্ম-প্রাপ্তি তার স্বতঃসিদ্ধভাবে হয়ে রয়েছে, কেবলমাত্র অসৎকে আকর্ষণ করার জন্যই তার অপূর্তি বা অভাব অনুভূত হয়।

কর্মযোগের প্রকরণে এই দুই বাসনাকেই ব্যবসায়াত্মিকা এবং অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নামে বলা হয়েছে (২।৪১)। পরমাত্ম-প্রাপ্তির বাসনাকেই 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' এবং ভোগের বাসনাকে 'অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' বলা হয়। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক হয়, কারণ পরমাত্ম-তত্ত্ব একই। মার্গভেদে, পদ্ধতি ভেদে, রুচি এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ভেদে এই পরমাত্ম-তত্ত্বের বাসনাকে মুমুক্ষা, প্রেম-পিপাসা, ভগবদ্দিদৃক্ষা ইত্যাদি নামে বলা হয়। অপরপক্ষে অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বহু হয়। কারণ সংসারে ভোগ্য-পদার্থ বহু প্রকারের। সাংসারিক ভোগ এবং সংগ্রহের বাসনার কখনো অন্ত হয় না। অতএব তার পূরণ হওয়া কখনই সম্ভব নয়, তার ত্যাগই হতে পারে। এইজন্য ভগবান গীতায় অসৎ বাসনার ত্যাগের ওপর খুব জোর দিয়েছেন (২।৪৭, ৫৫, ৭১ ; ৩।৪৩ ; ৫।১১-১২ ; ৬।২৪ ; ১৬।২১-১১ ইত্যাদি)।

একটি হল আবশ্যকতা, অপরটি হল বাসনা। আবশ্যক হচ্ছে সৎ-এর এবং বাসনা অসৎ-কেন্দ্রিক। মানুষের মধ্যে কেবল সৎ (পরমাত্মার)-এর বাসনা হওয়া উচিত, যা অনিবার্য । মানুষের জন্ম অসৎ-কে ইচ্ছা বা

কামনা করার জন্য হয়নি। কারণ অসৎ নিজস্ব নয় এবং কখনো সঙ্গে থাকে না। কিন্তু সৎ নিজস্ব বস্তু এবং সর্বদা সঙ্গেই থাকে, কখনো পৃথক হতেই পারে না।

জ্ঞাতব্য

সাংসারিক বস্তু ইত্যাদির এক 'আবশ্যকতা' হয় এবং আর এক হয় 'বাসনা'। আবশ্যকতা পূর্ণ হয় কিন্তু ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হয় না, কারণ এর শেষ নেই। যেমন ক্ষুধা পেলে উদরপূর্তির ইচ্ছা হয় আর স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা হয়। উদরপূর্তির ইচ্ছা শরীরের আবশ্যকতা (ক্ষুধা) যা ভোজন করলে মিটানো যায়। কিন্তু স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা ভোজনের দ্বারা মিটানো যায় না। এর তাৎপর্য এই যে শরীরের আবশ্যকতা ক্ষুধার পূর্তিতে পূর্ণ করা যায়, তাকে যুক্তি-বিচারে ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু স্বাদের ইচ্ছার পূর্তি করা যায় না বরং তাকে ত্যাগ করা সম্ভব।

উদর পূর্তির ইচ্ছা (ক্ষুধা) একই হয় আর তার পূরণ করার ব্যবস্থা ভগবানের তরফে প্রারব্ধ অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং তার পূরণের ব্যবস্থা ভগবানকৃত প্রারব্ধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কারণ উদরপূর্তির ইচ্ছা শরীরের স্বাভাবিক প্রয়োজন, কিন্তু স্বাদ-গ্রণের ইচ্ছা আমাদের নিজস্ব, তা স্বাভাবিক নয়, সুতরাং তা পরিত্যাগ করার দায়িত্বও আমাদের।

পারমার্থিক ইচ্ছা হল স্বয়ং-এর আবশ্যকতা (প্রয়োজনীয়তা)। সে ইচ্ছা হতে পারে ভগবদ্দর্শনের বা ভগবৎপ্রেমের বা মুক্তির কিন্তু সে সবই হল প্রয়োজনীয়তা। এর পূরণ ক্রিয়া, পদার্থ, পরিস্থিতি, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির অধীন নয় অর্থাৎ ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদির সহায়তায় ভগবৎপ্রেম, মুক্তি প্রভৃতি লাভ হয় না। কারণ সৎ-এর প্রাপ্তি অসৎ দ্বারা হয় না, বরং অসৎ-এর সম্বন্ধ ত্যাগ করলেই তাঁর প্রাপ্তি হয়।

বাস্তবে অসতের ইচ্ছা থেকেই সতের ইচ্ছা হয়। যদি অসৎ-এর আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা যায় তাহলে সৎ-এর আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই পূর্ণ হয়। কারণ সৎ সর্বস্থানে, সর্বসময় এবং সকল পরিস্থিতি আদিতে সমানভাবে পরিপূর্ণ। তবে অসৎ-এর ইচ্ছা থাকা অবস্থায় সৎ-এর প্রকাশ ঘটে না।

জাগতিক এবং পারমার্থিক—দুই (অসৎ এবং সৎ) ইচ্ছাই বাস্তবে সংসারের ইচ্ছার ওপর টিকে আছে। যদি মানুষ এই নশ্বর জগৎ-সংসারকে গুরুত্ব না দেয়, এর আশ্রয় গ্রহণ না করে, এটির ইচ্ছা না রাখে, নিজেকে সংসারের অধীন বলে মনে না করে, তাহলে পারমার্থিক ইচ্ছা স্বতঃই পূর্ণ হয়। কারণ পারমার্থিক (সৎ-এর) ইচ্ছার প্রয়োজন আছে এবং সেই প্রয়োজন অবশ্যই পূরণ হয়। শারীরিক প্রয়োজনীয়তার পূরণ প্রারব্ধ অনুযায়ী হয় অর্থাৎ তা কখনও পূরণ হয়, কখনও হয় না ; কারণ, এর বিষয় অসৎ (অনিত্য)। কিন্তু অসৎ ইচ্ছা সর্বতোভাবে ত্যাগ করলে সৎ-এর প্রয়োজনীয়তা স্বতঃই পূর্ণ হয়। কারণ সৎ তো প্রথম থেকেই বিদ্যমান। সৎ-এর প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হলে কোন কিছু করার, জানার এবং পাওয়ার বাকী থাকে না। জগৎ সংসারের কাজ যতই করা হোক তা বাকী থেকে যায়, জগৎ সম্বন্ধে যতই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাক, তা অসমাপ্ত থেকে যায় ; সাংসারিক ভোগ্য বস্তুর যতই প্রাপ্তি হোক, তার শেষ হয় না। এর তাৎপর্য এই যে, সাংসারিক কিছু করার, জানার এবং পাওয়ার কখনও পূর্তি হয় না।

(৩৩) গীতায় ত্রিবিধ দৃষ্টি

চক্ষুস্ত্রিধাঽমন্যত কৃষ্ণগীতা দিব্যং তু চক্ষুঃ প্রভুণা চ দত্তম্।
বিবেকিনাং জ্ঞানময়ং হি চক্ষুরজ্ঞানিনাং চর্মময়ং চ চক্ষুঃ॥

গীতায় ভগবান তিন প্রকার চক্ষু অর্থাৎ চোখের দ্বারা দেখার শক্তির বর্ণনা করেছেন—স্বচক্ষু (চর্ম চক্ষু), দিব্যচক্ষু এবং জ্ঞানচক্ষু। প্রাণীর নিজ নিজ চোখে যে দেখার শক্তি, তা তাদের 'স্বচক্ষু'। এই বিষয়ে ভগবান

অর্জুনকে বলেছেন যে, 'তুমি তোমার স্বচক্ষুর দ্বারা আমার দিব্য বিশ্বরূপ দেখতে পাবে না'—'ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা' (১১।৮)। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, এই চর্মচক্ষু দ্বারা কেবল জাগতিক বস্তুসমূহই দেখা যায়, ভগবানের বিরাট রূপ এবং শরীর ও সংসার থেকে নিজের পৃথক্ (ভেদ) ভাবকে দেখা সম্ভব নয়।

যার দ্বারা ভগবানের অলৌকিক, দিব্য, ঐশ্বর্যযুক্ত বিরাটরূপ দেখার শক্তি হয় তথা যার দ্বারা ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা জানবার এবং প্রাণীদের মনে উদ্ভূত ভাব দেখার সামর্থ্য হয়, তাকে দিব্যচক্ষু বলা হয়। গীতায় অর্জুন ভগবানের কোন এক অংশে স্থিত বিশ্বরূপ দেখার বাসনা প্রকাশ করেন, তখন ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ দেখাবার সময় চার বার, 'দেখ ! দেখ ! দেখ ! দেখ !' বলেছেন, কিন্তু অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন হয় নি। তখন ভগবান অর্জুনকে বললেন, 'ভাই ! তুমি চর্মচক্ষুতে আমার এই রূপ দেখতে পাবে না ; তাই আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিচ্ছি, তার দ্বারা তুমি আমার বিরাটরূপ দর্শন করো'—'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্' (১১।৮)। এই বলে ভগবান অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিলেন এবং অর্জুন ভগবানের অলৌকিক, দিব্য বিশ্বরূপ দর্শন করলেন, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ। তাঁর মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, 'আমি কৃপা করে এই তেজোময় দিব্যরূপ দেখিয়েছি, তোমার আগে এইরূপ আর কেউ দেখেনি (১১।৪৭)।' এর তাৎপর্য এই যে, এইপ্রকার বিশ্বরূপ দর্শন কেবল দিব্য চক্ষু দ্বারাই সম্ভব, চর্মচক্ষু বা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা নয়।

একমাত্র স্বয়ং ভগবান অথবা ভগবানের অধিকারলব্ধ ভগবৎস্বরূপ কারক মহাপুরুষই কৃপা করে কোন কৃপাপ্রার্থীকে দিব্যচক্ষু দিতে পারেন। দিব্যচক্ষু দানের ক্ষমতা যে কোন সন্ত বা মহাত্মার নেই। শ্রীবেদব্যাস মহাভারত যুদ্ধের প্রারম্ভে নিজ কৃপাপাত্র সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান করেছিলেন ; ফলে সঞ্জয়েরও বিশ্বরূপ দর্শন হয়েছিল (১৮।৭৭)।

যার দ্বারা নিত্য-অনিত্য, সৎ-অসৎ, জড়-চেতন, যথাযথ বোধ হয় এবং যার দ্বারা নিজ-স্বরূপের অনুভব হয়, তাকে 'জ্ঞানচক্ষু' (বিবেক-দৃষ্টি) বলা হয়। গীতায় ভগবান দুই স্থানে জ্ঞানচক্ষুর বর্ণনা করেছেন—১) যে ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিভেদকে ঠিক বুঝতে পারে তথা কার্য-কারণ সহিত সমস্ত প্রকৃতি থেকে নিজেকে পৃথক্ অনুভব করতে পারে, সে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে (১৩।৩৪) ; এবং ২) জন্ম-মৃত্যু এবং ভোগ-বিলাসের সময়ও এই জীবাত্মা স্বরূপতঃ নির্লিপ্তই থাকে—এই কথা অনুরাগলিপ্ত বিষয় ভোগকারী মূঢ় মনুষ্য অবগত নয়, জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিরাই জানেন (১৫।১০)। এইপ্রকার বোধ জ্ঞানচক্ষু দ্বারাই হয়, চর্মচক্ষুতে নয়।

ভগবান এবং তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই শুধু জ্ঞানচক্ষু দিতে সক্ষম, সাধারণ মানুষ নয়। কারণ সাধারণ মানুষের নিজেরই এরূপ জ্ঞানচক্ষু নেই, তবে সে অপরকে কীভাবে দেবে ? শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সৎ-অসৎ বিবেচনা করতে পারেন, কিন্তু কারো জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করতে সক্ষম নন ; কেননা তাঁর নিজেরই সেই অনুভূতি নেই। এর অর্থ এই নয় যে, কোন মানুষই জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হতে পারবে না, বরং বলা যায় কেবল মানুষই জ্ঞানচক্ষু লাভের অধিকারী। শুধু তাই নয় অত্যন্ত পাপী ব্যক্তিও তা প্রাপ্ত হওয়ার অধিকারী (৪।৩৬)। এই মনুষ্য শরীর কেবল মুক্তি লাভের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং মানুষ নিজ ভক্তি দ্বারা ভগবানের কাছ থেকে জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হতে সক্ষম (১০।১১), অথবা তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মানুষের আনুকূল্যে প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয় (৪।৩৪) অথবা তৎপরতার সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্বক সাধন ভজনে রত থাকলেও পেতে পারে (৪।৩৯)। জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হলে মোহ চিরদিনের মতো দূরীভূত হয় (৪।৩৫)।

(৩৪) গীতায় ত্রিবিধ অনুরক্তি (প্রীতি)

সাধ্যসাধনরূপাভ্যাং প্রসিদ্ধা রতয়স্ত্রিধা।
আদৌ সাধনরূপাস্তা অন্ততো যান্তি সাধ্যতাম্॥

একটির নাম 'আসক্তি', অপরটির নাম 'রতি' বা প্রীতি। এই দুইটি সর্বতোভাবে পৃথক্। আসক্তিতে নিজ সুখের ইচ্ছা থাকে আর রতিতে নিজ সুখ (স্বার্থ) ত্যাগ করে অপরের হিতের ইচ্ছা থাকে। আসক্তি জড়ত্ব থেকে আসে এবং রতি চিন্ময় তত্ত্ব থেকে হয়। আসক্তি থেকে পতন হয়, রতিতে কল্যাণ হয়। আসক্তিতে বিনাশশীল বস্তুর গুরুত্ব থাকে, রতিতে অবিনাশী তত্ত্বের গুরুত্ব থাকে। আসক্তি থেকে অবনতি, রতি থেকে উন্নতি হয়। আসক্তি থেকে অনুরাগের সুখ হয়, রতিতে আগেই সুখ। সাত্ত্বিক সুখও যদি আসক্তিগত হয় তাও বন্ধনের কারণ হয়। অতএব মানুষের আসক্ত হওয়া উচিত নয়, বরং রতি রাখা উচিত। গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিন যোগেই আসক্তি ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। যেমন—কর্মযোগে **'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি'** (২।৪৭), **সংঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে** (৫।১১) ইত্যাদি, জ্ঞানযোগে **'অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ'** (১৩।৯), **'অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র'** (১৮।৪৯) ইত্যাদি এবং ভক্তিযোগে **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা'** (৫।১০) **'সঙ্গবর্জিতঃ'** (১১।৫৫) **'সঙ্গবিবর্জিতঃ'** (১২।১৮) ইত্যাদি।

এই তিন যোগেই প্রথমে সাধনে প্রীতি হয় পরে সেই প্রীতি নিজ লক্ষ্য ধ্যেয়তে পরিণত হয় ; যেমন—

কর্মযোগীর নিজ কর্তব্য-কর্ম করার রতি (প্রীতি) হয়— **স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ** (১৮।৪৫), পরে ঐ রতি নিজের স্বরূপে হয় **'যস্ত্বাত্মরতিঃ'** (৩।১৭)।

জ্ঞানযোগী সকলকে নিজ স্বরূপ বলে মনে করেন। তাই তাঁর প্রথমে সমস্ত প্রাণীর হিতে প্রীতি জন্মে—**'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (৫।২৫ ; ১২।৪) এবং পরে ঐ রতি বা প্রীতি নিজ স্বরূপে হয়—**'যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামঃ'** (৫।২৪)।

ভক্তিযোগীর রতি প্রথমে ভগবানের নামজপ, কীর্তন-কথকতা, গুণগান ইত্যাদিতে হয়—**'রমন্তি'** (১০।৯), পরে সেই রতি ভগবানে হয়—**'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ'** (৭।১৭)।

আকর্ষণ বা টান দুইপ্রকারের হয়— একপ্রকার আকর্ষণ পরমাত্মার দিকে হয় আর একটি সংসারের দিকে হয়। পরমাত্মার দিকে যে আকর্ষণ হয় তাতে স্বয়ং চেতনেরই প্রাধান্য এবং সংসারের দিকে যে আকর্ষণ, তাতে ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের প্রাধান্য থাকে। বাস্তবে উভয়ক্ষেত্রেই স্বয়ং (চেতনের)-এরই আকর্ষণ হয় ; কিন্তু শরীরের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ মেনে নেওয়ায় মানুষ এই দুই আকর্ষণের পার্থক্য করতে পারে না। তবে হ্যাঁ, জড় ও চেতনের ভেদ বোধ হলে দুই আকর্ষণের পার্থক্য বোঝা যায় অর্থাৎ সংসারের আকর্ষণ দূর হয় এবং স্বয়ং যথাবৎ অনুভূত হয়।

যে আকর্ষণ পরমাত্মার দিকে হয়, তাকে রতি, প্রেম, আত্মীয়তা বলে এবং যে আকর্ষণ সংসারের দিকে হয়, তাকে আসক্তি, কাম, মমতা বলে।

সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে **'ময্যাসক্তমনাঃ'** পদে ভগবানে মন আসক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মনের এই আসক্তিকে বাস্তবে রতিই বলা হয়। সংসারে আসক্ত হলে মন সংসারে লিপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু ভগবানে আসক্ত হলে মন ভগবানে লীন হয়ে যায়, অর্থাৎ মনের তখন আর স্বতন্ত্র সত্তা (অস্তিত্ব) থাকে না—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং মধ্যেব প্রবিলীয়তে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।২৭)

(৩৫) গীতায় বিবিধ বিদ্যা

বাসুদেবেন গীতায়াং মনুষ্যাণাং হিতায় হি।
কথিতা বিবিধা বিদ্যা দর্পণে তু প্রধানতঃ॥

১) **শোক-নিবৃত্তির বিদ্যা**—জগতে দুই প্রকারের শোক হয়, মৃতের জন্য এবং যে জীবিত তার জন্য। এই শোক দূর করার জন্য ভগবান সৎ-অসৎ এবং শরীরী ও শারীরিক বিবেকের বর্ণনা করেছেন। যা সৎ, অবিনাশী এবং অপরিবর্তনশীল তার কখনো অ-ভাব হয় না আর যা অসৎ, বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল তার ভাব হয় না অর্থাৎ তার অ-ভাব হয়। তাৎপর্য এই যে, এই শরীরস্থিত জীবাত্মার কখনো অ-ভাব হয় না। এই শরীরে কৌমার্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা আসে, কিন্তু শরীরস্থিত জীবাত্মা যেমন তেমনি থাকে। আবার এক শরীর নষ্ট হলে অপর শরীরের প্রাপ্তিতেও জীবাত্মা একই থাকে, তার কোন পরিবর্তন হয় না। সকল শরীরই জন্ম নেয় এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই শরীরে যিনি স্থিত, তাঁকে কেউ কখনো নাশ করতে পারে না। শরীরাদি অসৎ বস্তুর জন্য শোক হতেই পারে না ; কারণ এ কখনো স্থায়ী নয় এবং শরীরস্থিত সৎ-এর জন্যও শোক হতে পারে না ; কারণ এর কখনও মৃত্যু হয় না (২।১১-৩০)—এভাবে ভগবান শোক নিবৃত্তির উপায় জানিয়েছেন।

যে সাধক ভগবদ্মুখী, যে কেবল তাঁকেই চায়, পরমাত্মার কৃপায় তার মধ্যে দৈবী সম্পত্তি অর্থাৎ সদ্গুণ, সদাচার স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাধক নিজের মধ্যে দৈবী সম্পত্তির ন্যূনতা মনে করে বিমর্ষ ও চিন্তিত হয়। তাই ভগবান বলেছেন যে, সাধকের নিজের মধ্যে দৈবী গুণ কম আছে ভেবে দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়া উচিত নয় (১৬।৫)। এর তাৎপর্য এই যে, সাধক ভগবদাশ্রয়ে থেকে দুর্গুণ-দুরাচার যেন ত্যাগ করে এবং ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু তার শোক বা চিন্তা করা উচিত নয়।

ভগবান ব্যতীত অন্য কারো আশ্রয় গ্রহণ করলেই দুঃখ আসে। কারণ অপর কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তবু মানুষ এগুলি রাখতে চায় ; অতএব অপরের বিয়োগে বা বিয়োগের আশঙ্কায় মানুষ শোকগ্রস্ত হয়। এইজন্য ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি সমস্ত আশ্রয় ত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও ; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব, তুমি শোক-চিন্তা কোরো না (১৮।৬৬)।'

২) **কর্তব্য-কর্ম করার বিদ্যা**—মানুষের কর্তব্য-কর্ম করারই অধিকার রয়েছে, ফলের প্রাপ্তিতে নয় (২।৪৭)। কারণ ফল প্রাপ্তি মানুষের অধীনে নয় বরং ভগবানের বিধানের অধীন। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে মানুষ সর্বদা স্বাধীন, সমর্থ। অতএব ভগবান বলেন যে, সাধক কর্মফল ত্যাগ করলে নৈষ্ঠিক শান্তি প্রাপ্ত হন (৫।১২)। সেইজন্য মানুষের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত ; কারণ, ফলাসক্তিরহিত হয়ে নিজ কর্তব্য পালন করলে পরমাত্মাকে লাভ করা যায় (৩।১৯)।

৩) **ত্যাগের বিদ্যা**—প্রত্যেক কর্মের আরম্ভ এবং শেষ আছে তথা তার সঙ্গে ফলেরও সংযোগ ও বিয়োগ আছে। অতএব যে কর্ম এবং কর্মফল আমাদের সঙ্গে থাকে না এবং আমরাও যার সঙ্গে থাকতে পারি না এইরূপ কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বা তার ফলপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ করে তৎপরতার সঙ্গে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্ম পালন করা উচিত (১৮।৯)।

৪) **পাপভাগী না হওয়ার বিদ্যা**—জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ ইত্যাদিতে সমভাব রেখে নিজ কর্তব্য পালন করলে, তাতে পাপ হয় না (২।৩৮)। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, সমভাব এলে পুরানো পাপ নষ্ট হয়ে যায় এবং নতুন করে কোন পাপ আর হয় না (৪।২৩)। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার আশা ত্যাগ করে শুধু শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করেন, তাঁরও পাপ হয় না (৪।২১), কারণ তাঁর মধ্যে সুখসম্পর্কিত বুদ্ধি বা ভোগবধী বুদ্ধি থাকে না। স্বভাবসম্মত কর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত কর্ম করলে মানুষ পাপভাগী হয় না (১৮।৪৭)। যার মধ্যে, 'আমি কর্ম করি'—এই অহংকার নেই এবং যার মধ্যে, 'আমি যেন কর্মের ফল লাভ করি'—এইরূপ ফলেচ্ছা নেই, সেই ব্যক্তি সমস্ত প্রাণিকুলকে ধ্বংস করলেও, ধ্বংস করেন না

বা তার জন্য পাপভাগীও হন না (১৮।১৭)।

৫) **ভোজন করার বিদ্যা**—ভোজন করার পর উদরের কথা চিন্তায় না আসাই উচিত। উদরের চিন্তা আসে—অধিক ভোজন হলে অথবা অল্প ভোজন হলে। সুতরাং ভোজন যেন বেশী না হয় বা কমও না হয়, বরং পরিমিত যেন হয় (৬।১৬-১৭)। ভোজ্যপদার্থ যেন সাত্ত্বিক হয় (১৭।৮)।

চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশ সংখ্যক শ্লোকটি ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা খাদ্যগ্রহণের সময় উচ্চারণ করেন, যার দ্বারা ভোজন কর্মটিও যজ্ঞে পর্যবসিত হয়।

৬) **বিষয়-সেবনের বিদ্যা**—অনুরাগের সঙ্গে বিষয়ের চিন্তা করা মাত্র মানুষের পতন হয় (২।৬২-৬৩)। কিন্তু বশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা রাগ-দ্বেষরহিত হয়ে যদি বিষয় সেবন করা হয়, তাতে প্রসন্নতা প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ হৃদয় নির্মল ও স্বচ্ছ হয় এবং সমস্ত দুঃখ নাশ হয়। স্বচ্ছ হৃদয়সম্পন্ন মানুষের বুদ্ধি শীঘ্রই পরমাত্মায় স্থিত হয় (২।৬৪-৬৫)।

৭) **ভগবানের প্রতি অর্পণ করার বিদ্যা**—অর্পণ করার বিভাগ দুটি—পদার্থ অর্পণ এবং ক্রিয়া অর্পণ। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি ভগবানের নিকট অর্পণ করে,তার সেই ভক্তিপূর্বক দেওয়া উপহার ভগবান গ্রহণ করেন (৯।২৬)। যদি কারো কাছে ভগবানকে অর্পণ করার মত পত্র-পুষ্পাদিও কিছু না থাকে, তাহলে সে যা কিছু করে, যা কিছু খায়, যে যজ্ঞ করে, যা কিছু দান করে এবং যে জপ-তপাদি করে, সবই ভগবানকে যেন অর্পণ করে দেয়। এরূপ করলে সে সমস্ত শুভাশুভ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় (৯।২৭-২৮)।

৮) **দান করার বিদ্যা**—দান প্রায় সকলেই করে কিন্তু তা বিধিপূর্বক হয় না। ভগবান দান করার কথায় বলেছেন যে, দেশ, কাল, পাত্র বিচার করে 'দান করা কর্তব্য'—এই বাক্য স্মরণে রেখে প্রত্যুপকারের ভাবনা না রেখে দান করা উচিত। এই দানকে সাত্ত্বিক দান বলা হয় এবং এই দান বন্ধন থেকে মুক্তিকারী হয় (১৭।২০)।

৯) **যজ্ঞ করার বিদ্যা**—যে যজ্ঞই করা হোক না কেন, তার ফলের কামনা ত্যাগ করে করা উচিত অর্থাৎ 'যজ্ঞ করা কর্তব্য'—এইভাবে যজ্ঞ করলে, তা সাত্ত্বিক যজ্ঞ হয় এবং তা যজ্ঞকারীকে গুণাতীত করে (১৭।১১)।

১০) **কর্মকে সৎ-এ পরিণত করার বিদ্যা**—যদি সমস্ত কর্ম ভগবানের প্রতি অর্পণ করা যায়, তাহলে তা সৎ কর্মরূপে বিবেচিত হয়, নির্গুণ কর্ম হয় (১৭।২৭)।

১১) **পূজা করার বিদ্যা**—মানুষ নিজ বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী যে শাস্ত্রবিধিসম্মত কর্ম করে, সেই কর্মকে তার পরমাত্মার পূজন সামগ্রীরূপে করা উচিত। অর্থাৎ সেই কর্ম দ্বারা সর্বব্যাপী পরমাত্মার পূজা করা এবং সেই কর্ম পরমাত্মার প্রীত্যর্থে করা এবং সেই কর্মে নিজের কোন স্বার্থ না রাখা উচিত (১৮।৪৬)।

১২) **সমতা লাভ করার বিদ্যা**—রাগ-দ্বেষের বশবর্তী হয়ে কোন কার্য করা উচিত নয় (৩।৩৪)। যে কাজই কর, শাস্ত্রবিধি মেনে করা উচিত। কারণ কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণ (১৬।২৪)। মহাপুরুষদের আচরণ এবং বচন অনুসারেই সকল কর্ম করা উচিত (৩।২১)। কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব থাকা উচিত (২।৩৮, ৪৮)। এইরূপ করলে নিজের মধ্যে সমত্বভাব আসে। এর তাৎপর্য এই যে, কোন কাজ করতে রাগ-দ্বেষ করা উচিত নয় এবং তার ফলে (পরিণামে) আহ্লাদিত বা বিমর্ষ হওয়া উচিত নয়। প্রতিটি মানুষ এরূপ করতে অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করতে সর্বতোভাবে স্বাধীন এবং সক্ষম।

♠ ♠ ♠

(৩৬) গীতা এবং সংসারে থাকার বিদ্যা

পরিস্থিতিসু সর্বাসু স্থিতা মুচ্যন্ত্র বন্ধনাৎ।
এষা বিদ্যা নবা প্রোক্তা গীতায়াং হরিণা স্বয়ম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একটি অতি অসামান্য গ্রন্থ। এটি অধ্যয়ন করলে, এর গভীরে প্রবেশ করলে মনে হয় যে, যাকে তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদ্দর্শন, ভগবৎপ্রেম, কল্যাণ, মুক্তি বা উদ্ধার বলা হয়, গীতা অনুসারে সাংসারিক ছোট বড়

সকল কাজ করেও তা প্রাপ্ত হওয়া যায় (২।৩৮ ; ৩।১৯ ; ৪।২০ ; ১৮।৫৬)। আশ্রম পরিবর্তন তথা ভজন, ধ্যান, জপ-কীর্তন ইত্যাদি কর্ম পরিবর্তনের যে কথা বলা হয়েছে, গীতা অনুসারে তা অপরিহার্য নয়। মানুষ যে বর্ণে, যে আশ্রমে, যে স্থানে থাকে, সে অবস্থাতে থেকেই নিষ্কামভাবে তৎপরতাপূর্বক নিজ কর্তব্য পালন করে পরমাত্মা-প্রাপ্ত হতে পারে (১৮।৪৫)। তার জন্য নতুন করে কোন আশ্রম পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। তাৎপর্য এই যে, গীতায় প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ দ্বারা কল্যাণের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ব্যবহারে পরমার্থ সিদ্ধির কলা বা বিদ্যা বলা হয়েছে। এই বিদ্যাতে দুটি বিষয় প্রধান—নিজ কর্তব্য পালন করা এবং অপরের অধিকার রক্ষা করা (২।৪৭ ; ৩।১০-১২)।

আত্মীয়-কুটুম্বদের আমাদের ওপর যে অধিকার আছে, কোন প্রত্যুপকারের আশা না করে, লোভের ইচ্ছা না রেখে, কোনও পরিস্থিতিতে নতিস্বীকার না করে, তা রক্ষা করা উচিত। যাতে তারা সুখী থাকে, তাদের কল্যাণ হয়, মঙ্গল হয় সেই কাজে নিজ বুদ্ধি, বল, যোগ্যতা শেষ বিন্দু পর্যন্ত অর্পণ করা উচিত। ভগবানের আদেশ মনে করে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তাদের সেবা করা উচিত। যেমন মা-বাবার যা আকাঙ্ক্ষা, যা প্রয়োজন, তা যদি ন্যায়যুক্ত হয় এবং তা পূরণ করার সামর্থ্য থাকে, তবে তা পূর্ণ করা উচিত। কিন্তু তারা আমাদের অনুকূল হবে—এই ইচ্ছা কিছুমাত্র পোষণ করা উচিত নয়। এইভাবে ভাই-ভাজ, স্ত্রী, পুত্র, চাকর, প্রতিবেশী ইত্যাদি সকলেরই মঙ্গল করা উচিত। এমনকি গৃহপালিত গরু, মোষ, মেষ, ছাগল প্রভৃতিরও মঙ্গল চিন্তা করা উচিত। নিজ গৃহের ইঁদুর, মশা, ছারপোকা ইত্যাদি বিরক্ত করলে এদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু তাদের মারবার অধিকার আমাদের নেই। এরূপ সাপ, বিছা, ইত্যাদি বিষযুক্ত জীব ঘরে ঢুকে পড়লে তাদের বন্দি করে অন্য কোন স্থানে ছেড়ে দেওয়ায় কোন দোষ নেই। কিন্তু তাদের মারার কোন অধিকার আমাদের নেই। বাড়ী-ঘর ইত্যাদি বস্তুর সদ্ব্যবহার করে তার শ্রীবৃদ্ধি করা উচিত কিন্তু মনোভাব এমন হবে যেন আমি এখানে অতিথি, একদিন চলে যেতে হবে, কিন্তু আমার পুত্র-পৌত্রাদি থাকবে, তাদের সুবিধার্থে বাড়ী ঘর সুরক্ষিত রাখতে হবে ; যদিও পুত্র-পৌত্রাদিও একদিন চলে যাবে তবুও আমায় তাদের সুখ-আনন্দ দিতে হবে, সেবা করতে হবে, মঙ্গল করতে হবে। এইভাবেই নিজ পল্লী, গ্রাম, প্রান্ত, দেশ ইত্যাদিরও সেবা করা উচিত।

স্বয়ং পরমাত্মার অংশ হওয়ায় নিত্য, কিন্তু সে এই অনিত্য শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' মনে করে তার অধীন হয়ে পড়ে (১৫।৭)। তাৎপর্য হলো, মানুষ সংসারে কিভাবে থাকতে হয় তা জানে না। যদি সে জগৎ-সংসারে থাকার বিদ্যা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তাহলে শরীরাদিতে আমিত্ব ভাব করে লিপ্ত হয়ে পরাধীন হয়ে পড়তে হয় না।

জগতে হাজার হাজার বাড়ী আছে, যদি এ সমস্ত ভেঙে পড়ে যায়, তাহলে আমাদের তেমন দুঃখ হয় না, আমরা এ থেকে মুক্ত থাকি। কিন্তু যে বাড়ীটিকে আমরা নিজের বলে মনে করি, তার জন্য আমরা মায়াবদ্ধ হয়ে পড়ি। তাই বাড়ী ইত্যাদিকে শুধু ব্যবহারের জন্য নিজের বলে মনে করতে হবে। যেমন কেউ যখন অফিসে যায় তখন সেখানকার চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য নিজের বলে মনে করে, কিন্তু মনে মনে জানে যে সেটি তার নয়। তেমনি সাংসারিক বস্তুগুলিও ব্যবহারের জন্য নিজের বলে মানা উচিত, মনে মনে কখনোই নিজের বলে মনে করা উচিত নয়। এইরূপ পিতামাতাকেও সেবা করার জন্যই নিজের বলে মনে করা উচিত। সেবার জন্য নিজের বলে মনে করলে স্বয়ং তাতে লিপ্ত হয় না।

যেমন কোন পথিক রাত্রে যদি কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়, তাহলে সে আন্তরিকভাবে চাইবে যে, 'এই বাড়ীতে যারা থাকে তাদের যেন আমার দ্বারা কোন অসুবিধা না হয়, তাদের অবশিষ্ট ভোজ্য পদার্থ আমি ভোজন করব, রাত্রে যদি চোর-ডাকাত আসে বা অন্য কোন বিপদ আসে, তাহলে সেই বিপদ নিজের উপরে নিয়ে তাদের সহায়তা করব, কারণ আমি আগন্তুক আর এরা সব এই গৃহের মালিক।' আমরাও এইরূপ এই জগতে পথিকরূপে এসেছি। সুতরাং আমাদের জীবননির্বাহের জন্য কাউকে বিন্দু মাত্র কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, বরং কায়-মন-বাক্য, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা, পদ অধিকার ইত্যাদি অপরের সেবায় লাগানো প্রয়োজন। কারণ এই সমস্ত জিনিসই আমরা এখানে অর্থাৎ জগৎ-

সংসার থেকেই পেয়েছি। পাওয়া জিনিস নিজের হয় না, অপরের কাজে লাগানোর জন্যই হয়, সুতরাং তা অপরের জন্যই খরচ করা উচিত। তাৎপর্য এই যে, এই জগতে নিজের স্বার্থের জন্য নয়, সংসারের অপর ব্যক্তিদের জন্যই থাকতে হয়—এটিই হলো সংসারে থাকার আসল বিদ্যা।

(৩৭) গীতায় বিবিধ আদেশ

দুর্যোধনেন কৃষ্ণেন ব্রহ্মণা ফাল্গুনেন চ।
যা যা আজ্ঞাশ্চ সংদত্তাস্তত্তাৎপর্যং চ কথ্যতে॥

গীতায় দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য এবং সেনানায়কদের ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছিলেন, রথীরূপী অর্জুন সারথিরূপী ভগবানকে আদেশ দিয়েছিলেন, ব্রহ্মা কল্পের প্রারম্ভে দেবতা এবং মনুষ্যগণকে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্মরূপ যজ্ঞ পালন করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান জ্ঞানীদের কর্তব্য-কর্মগুলিকে উপেক্ষা না করার আদেশ দিয়েছেন এবং যখন অর্জুন যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন ভগবান অর্জুনকে আশ্বাসপূর্বক অনেক প্রকার আদেশ দিয়েছিলেন।

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্য সমারোহের প্রতি লক্ষ্য করার জন্য বললেন—'পশ্য' (১।৩)। এর তাৎপর্য এই যে, আপনি এই সেনা-সমারোহকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন। এদের সাধারণ মনে করে উপেক্ষা করবেন না, এটি যুদ্ধের ব্যাপার। এই সেনাদলে মস্ত সব শূরবীর আছেন। সুতরাং আপনি সতর্ক থাকুন।

পাণ্ডবদের সেনা সামনেই দণ্ডায়মান ছিল ; সুতরাং দুর্যোধন বলেছিলেন 'দেখুন' (**পশ্য**)। কিন্তু নিজ সৈন্য-সামন্ত দ্রোণাচার্যের পশ্চাৎদিকে দণ্ডায়মান ছিল, তাই দুর্যোধন '**নিবোধ**' (১।৭) ক্রিয়া প্রয়োগ করে বলেন যে, 'আপনি আমাদের সেনাদের সম্বন্ধে অবহিত হোন এবং অবগত হন যে, আমাদের সেনাও বল ইত্যাদিতে কোন প্রকারে কম নয়।' আবার দুর্যোধন নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত সমগ্র সেনানায়কদের আদেশ দিয়েছিলেন পিতামহ ভীষ্মকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার জন্য—'**অভিরক্ষন্তু**' (১।১১) বলে। কারণ ভীষ্মকে রক্ষা করলে আমরা সবাই রক্ষা পাব এবং তিনি সেনাপতি থাকলে আমরা বিজয়ী হব। এইভাবে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে '**পশ্য**' এবং '**নিবোধ**' পদ দ্বারা যে আদেশ দিয়েছিলেন তা সম্মানপূর্বকই দিয়েছিলেন, রাজা হলেও দুর্যোধন নিজে দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে 'আচার্য' বলে অত্যন্ত সম্মান সহকারে আদেশ দেন। এই আদেশেও একপ্রকার প্রার্থনা নিহিত ছিল।

অর্জুন '**রথং স্থাপয়**' (১।২১) পদটিতে ভগবানকে দুই পক্ষের সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করতে বললেন। অর্জুনের মধ্যে যদিও ভগবানের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভাব ছিল, তবুও রথীর কর্তব্য করতে গিয়ে সারথিরূপী ভগবানকে এই আদেশরূপ বাক্য অর্জুন বলেছিলেন। এইপ্রকার '**ব্রূহি**' (২।৭ ; ৫।১), '**শাধি**' (২।৭) ; '**বদ**' (৩।২) ; '**কথয়**' (১০।১৮) ; '**দর্শয়**' (১১।৪, ৪৫) ; '**প্রসীদ**' (১১।২৫ ; ৩১ ; ৪৫) ; এবং '**ভব**' (১১।৪৬) পদেও মনে হয় যে, অর্জুন ভগবানকে আদেশ করছেন, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, বরং এগুলি সবই প্রার্থনা ; কারণ ব্যাকরণে '**লোট্**'-লকার 'প্রার্থনা' অর্থেও ব্যবহার হয়।

ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টির রচয়িতা। সুতরাং তাঁর ইচ্ছা যে সৃষ্টি কার্য সুচারুরূপে সঞ্চালিত হোক, যা কেবল মানুষ এবং দেবতার মধ্যে স্নেহ-ভালবাসা থাকলেই হতে পারে। তাই ব্রহ্মা '**প্রসবিষ্যধ্বম্**', '**ভাবয়ত**' (৩।১০-১১) পদে মানুষকে আদেশ দিয়েছেন যে, 'তোমরা কর্তব্য-কর্মরূপ যজ্ঞ দ্বারা নিজেদের উন্নতি করো এবং এই যজ্ঞ দ্বারা

দেবতাদেরও সংবর্ধিত করো।' আবার '**ভাবয়ন্তু**' (৩।১১) পদদ্বারা দেবতাদের আদেশ দিয়েছেন যে, 'তোমরা নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী মানুষদের উন্নত করো। এইভাবে একে অপরকে সংবর্ধিত করতে থাকলে তোমরা পরম শ্রেয়কে প্রাপ্ত হবে।'

জ্ঞানী মহাপুরুষদের ভগবান আদেশ দেন যে, আমি যেমন কর্তব্য-কর্ম উপেক্ষা করি না (৩।২২-২৪), সেইরূপ তাদেরও কর্ম উপেক্ষা করা উচিত নয় ; বরং কর্মে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিগণ যে তৎপরতায় কাজ করে, সেই তৎপরতার সঙ্গেই তাঁরা যেন আসক্তি-বর্জিত হয়ে লোকসংগ্রহকে উদ্দেশ্য রেখে কর্তব্য-কর্ম পালন করেন'—'**কুর্যাৎ**' (৩।২৫)। তাঁরা যেন কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদের 'জ্ঞানের তুলনায় কর্ম তুচ্ছ, যারা কর্ম করে তারা অযোগ্য ও নিম্নস্তরের, জ্ঞানের অধিকারীরা উচ্চস্তরের' এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মাবার চেষ্টা না করেন, '**ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ**' (৩।২৬)। বরং কর্মে আসক্ত সাধারণ মানুষদেরও আসক্তি বর্জিত ভাবে কর্ম করাতে সচেষ্ট হবেন '**যোজয়েৎ**' (৩।২৬)। জ্ঞানী যদি কর্ম না করেন তাতেও কিছু যায় আসে না কিন্তু তিনি যেন নিজ বচন দ্বারা, ভাব দ্বারা, অজ্ঞান ব্যক্তিগণকে কর্ম থেকে বিচলিত না করেন '**ন বিচালয়েৎ**' (৩।২৯)। এর তাৎপর্য এই যে, কর্মে আসক্ত ব্যক্তিগণ কর্তব্য-কর্ম থেকে যেন বিচলিত না হয়, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সেই দিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

গীতায় ভগবান অর্জুনকে কয়েকটি আদেশ দিয়েছিলেন, যেমন—অর্জুন যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না ; অতএব ভগবান '**উত্তিষ্ঠ**' (২।৩৭ ; ৪।৪২), '**যুদ্ধায় যুজ্যস্ব**' (২।৩৮), '**যুধ্যস্ব**' (৩।৩০ ; ১১।৩৪) এবং '**যুধ্য**' (৮।৭) পদগুলির দ্বারা অর্জুনকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। অর্জুন আজ্ঞাপালনকারী ছিলেন। যেখানে ভগবানের কথা অর্জুনের পছন্দ হয় নি সেখানে তিনি বলেছেন, 'ভগবান ! আপনি কেন আমাকে এই ঘোর কর্মে প্রবৃত্ত করছেন (৩।১)'? এতে প্রমাণিত হয় যে ভগবানের কথায় অর্জুন নিজ কল্যাণ বিধায় যুদ্ধের মত ঘোর কর্মেও প্রবৃত্ত হতে পারেন অর্থাৎ ভগবান আদেশ দিলে তিনি তা অগ্রাহ্য করবেন না, বরং সেইরূপই করবেন।

ভগবান অর্জুনকে কর্মযোগের বিষয়ে এই সমস্ত আদেশ দিয়েছিলেন—'**বিদ্ধি**' (৩।৩৭ ; ৪।১৩ ; ৩২ ; ৬।২), '**মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ**' (২।৪৭), '**যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি**' (২।৪৮), '**যোগায় যুজ্যস্ব**' (২।৫০), '**নিয়তং কুরু কর্ম**' (৩।৮), '**সমাচর**' (৩।৯, ১৯), '**কুরু কর্মৈব**' (৪।১৫) ইত্যাদি। জ্ঞানযোগের বিষয়ে এই সমস্ত আদেশ দিয়েছিলেন—'**বিদ্ধি**' (২।১৭; ৪।৩৪ ; ১৩।২ ; ১৯ ; ২৬) '**শৃণু**' (১৩।৩) প্রভৃতি। ভক্তিযোগের বিষয়ে এই আদেশ দিয়েছিলেন— '**বিদ্ধি**' (৭।৫, ১০, ১২ ; ১০।২৪ ; ২৭), '**শৃণু**' (৭।১ ; ১০।১), '**মামনুস্মর**' (৮।৭), '**পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্**' (৯।৫ ; ১১।৮), '**উপধারয়**' (৭।৬ ; ৯।৬), '**কুরুষ্ব**' (৯।২৭), '**প্রতিজানীহি**' (৯।৩১), '**ভজস্ব মাম্**' (৯।৩৩), '**নিবেশয়**' (১২।৮), '**ইচ্ছ**' (১২।৯), '**মা শুচঃ**' (১৬।৫ ; ১৮।৬৬) ইত্যাদি। সাম্যভাবে স্থিত থাকার জন্য আজ্ঞা দিয়েছিলেন—'**তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন**' (৬।৪৬), '**যোগযুক্তো ভবার্জুন**' (৮।২৭)। এছাড়া অন্য বিষয়েও ভগবান কয়েকটি আদেশ দিয়েছিলেন ; যেমন '**কুরূন্ পশ্য**' (১।২৫), '**ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ**' (২।৩), '**তিতিক্ষস্ব**' (২।১৪), '**যশো লভস্ব**' (১১।৩৩) ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আদেশগুলি লক্ষ্যণীয় যে, যেখানে অর্জুন প্রশ্ন করেছেন, সেখানে ভগবান প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সেই অনুযায়ী আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু ভগবান যে স্থানে নিজে থেকে উপদেশ দিয়েছেন, সেস্থানে অর্জুনকে ভক্তিযোগের আদেশই দিয়েছেন।

ভগবান যেখানে আদেশ দেন, সেখানে তাঁর প্রতি সংলগ্ন হবার কথাও বলেন এবং জগৎ-সংসার থেকে আকর্ষণ দূর করার কথাও বলেন। যেখানে ভগবান শুধু সংসার থেকে মমত্ব দূর করার আদেশ দেন, সেখানেও তাঁর উদ্দেশ্য সাংসারিক আসক্তি ত্যাগ করিয়ে নিজের প্রতি নিয়ে আসা। অন্যভাবে দেখলে বলা যায় যে, ভগবান যেখানে ভক্তির (নিজের প্রতি অনুরাগের) উপদেশ দেন, সেখানে ভক্তি তো আছেই, যেখানে কর্মযোগের (সংসারে আসক্তি দূর করার) আদেশ দেন,

সেখানেও ভগবানের আদেশ হওয়ায় তা ভক্তিই হয়।

ভগবান যেখানে জ্ঞানের উপদেশ দেন, সেখানেও সংসার থেকে আসক্তি দূর করার এবং নিজের প্রতি আকর্ষণের ভাব থাকে। এই ভাবই গীতায় কখনো আদেশরূপে, কখনো বিবেকরূপে আবার কখনও ভাবরূপে দেখতে পাওয়া যায়।

(৩৮) গীতায় বিভিন্ন মান্যতা

কৃষ্ণস্য ফাল্গুনস্যাপি সিদ্ধস্য সঞ্জয়স্য চ।
ভক্তসাধকয়োশ্চৈবাভক্তাসাধকয়োর্মতম্॥

১. ভগবানের মান্যতা

ভগবানের মতে ভক্তির মহত্ত্বই বেশী অর্থাৎ ভগবান ভক্তিকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন এবং তাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তিনি জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, গীতাধ্যয়ন ইত্যাদিতে নিজের সমর্থন জানিয়েছেন, কিন্তু ভক্তির মতো প্রাধান্য দিয়ে নয়।

তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান নিজ ভক্তির কথা বলেছেন এবং সেই একই কথা তিনি একত্রিশ-বত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে অন্বয়-ব্যতিরেকে সমর্থন করে বলেছেন, 'যে মানুষ দোষ-দৃষ্টিরহিত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক আমার এই মতের অনুসরণ করে, সে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু দোষদৃষ্টি এবং অশ্রদ্ধাকারী যে ব্যক্তি আমার এই মত অনুসরণ করে না, তার পতন হয়।'

ধ্যানযোগীর দৃষ্টি বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন, যে ধ্যানযোগী নিজ সাদৃশ্যে সকলকে সমানরূপে দেখে এবং সুখ ও দুঃখকেও সমভাবে দেখে, তাকে যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয় (৬।৩২)।

ধ্যানযোগের বর্ণনা শুনে অর্জুন যখন জানালেন যে, মনের চঞ্চলতা দূর করা বড় কঠিন, ভগবান তখন তাঁকে মনের চঞ্চলতা দূর করার জন্য দুটি উপায় বললেন। অভ্যাস ও বৈরাগ্য—এই দুটি উপায় বলে তিনি নিজের মতও এই বিষয়ে জানালেন, 'যার মন (স্ববশে) সংযত নয়, তার দ্বারা ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ করা কঠিন এবং যার মন সংযত বা 'বশীভূত' সে ধ্যানযোগ দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে—এই আমার মত (৬।৩৬)।'

যোগভ্রষ্টের বিষয়ে অর্জুনের সন্দেহ দূর করে ভগবান বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মদ্গতচিত্তে শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক হৃদয়ে আমার ভজনা করে, সেই ভক্ত জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী ইত্যাদি সমস্ত যোগীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ—এই আমার মত (৬।৪৭)।'

অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী (প্রেমী)—এই চারপ্রকার ভক্তদের সুকৃতি এবং মহানরূপে বর্ণনা করে ভগবান বলছেন যে, জ্ঞানিভক্ত হল আমারই আত্মা স্বরূপ—এই আমার মত। কারণ তার অন্য কোন কামনা নেই, সে কেবল আমাকেই আশ্রয় করে থাকে (৭।১৮)।

দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন প্রশ্ন করেন, ভক্তিযোগী এবং জ্ঞানযোগী এদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? ভগবান তখন উত্তর দেন যে, যে ব্যক্তি আমাতে মন নিবিষ্ট করে পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার উপাসনা করে, সেই ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ—এই আমার মত। (১২।২)

এই জগতে সাংসারিক যত জ্ঞান আছে, তার মধ্যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, দেহ-দেহী, শরীর-শরীরী, অনিত্য-নিত্য, অসৎ-সৎ-এর জ্ঞান (বিবেক) শ্রেষ্ঠ। এরূপ জ্ঞান সমস্ত সাধনার আধার, মূল। কারণ সাধক যে কোন সাধনই করুক তাতে এই বিবেক-বোধ থাকবেই। সেইজন্য ভগবান বলেছেন, 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই আমার মতে যথার্থ জ্ঞান' (১৩।২)।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে ভগবান সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের বিষয়ে অন্য দার্শনিকদের চারটি মত বলেছেন। এই মতগুলির তুলনা করে ভগবান বলেছেন, 'কর্ম এবং তার ফলকামনার আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্য-

কর্ম করা উচিত—এই আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত (১৮।৬)।'

গীতা অধ্যয়ন ও পঠন-পাঠনের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এই গীতগ্রন্থ কেবলমাত্র অধ্যয়ন করবে, পাঠ করবে, তার দ্বারা আমি জ্ঞান যজ্ঞের মাধ্যমে পূজিত হব—এই আমার মত (১৮।৭০)।'

এইরূপে ভক্তির বিষয়ে চারটি, ধ্যানযোগের বিষয়ে দুটি, জ্ঞানযোগের বিষয়ে একটি, কর্মযোগের বিষয়ে একটি এবং গীতাধ্যয়নের বিষয়ে একটি—এই সবকটি মান্যতা বা অভিমতের তাৎপর্য এই যে, ভগবান ভক্তিকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন।

২. অর্জুনের মান্যতা

অর্জুন ধ্যানযোগের অসিদ্ধিতে চিত্তগত চঞ্চলতাকেই কারণ মনে করে বলেছেন, 'মন বড় চঞ্চল, ইন্দ্রিয় বিক্ষোভকারী, শক্তিশালী এবং জেদী। আমি মনে করি এই মনকে নিরোধ করা বায়ুকে আবদ্ধ করার মত কঠিন (৬।৩৪)।'

ভগবানের প্রভাবের কথা শুনে এবং তাতে প্রভাবিত হয়ে অর্জুন ভগবানকে বললেন, 'হে ভগবান ! আপনি আমাকে যা কিছু বলছেন আমি তা সমস্তই সত্য বলে মানি (১০।১৪)।'

ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনকালে অর্জুনের ভগবানের নির্গুণ-নিরাকার, সগুণ-নিরাকার এবং সগুণ-সাকার রূপের বিশেষ বোধ জন্মেছিল। অতএব অর্জুন নিজ মত বলতে গিয়ে বলেছেন, 'আপনিই জ্ঞাতব্য অক্ষরব্রহ্ম, আপনিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, আপনিই এই সনাতন ধর্মের রক্ষক এবং আপনিই সনাতন পুরুষ—এই আমার মত (১১।১৮)।'

বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুনের ভগবানের প্রভাব ও মহিমা সম্বন্ধে এই জ্ঞান হয় যে, ভগবান কত প্রভাবশালী ! তখন ভগবানের প্রতি তাঁর পূর্বের আচরণের কথা স্মরণে এলে তিনি ভগবানকে বললেন, 'আমি আপনাকে আমার সখা মনে করে ধৃষ্টতার সঙ্গে হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখা ! এইরূপ বলেছি, তার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি (১১।৪১)।'

অর্জুনের কথার তাৎপর্য এই যে, তিনি তাঁর ত্রুটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য অনুধাবন করেছিলেন। এই দুটি কথা যদি সাধক বুঝতে পারে তাহলে তার উদ্ধার হয়।

৩. সঞ্জয়ের মান্যতা

সঞ্জয় ভগবানের প্রভাব প্রথম থেকেই অবগত ছিলেন। কিন্তু অর্জুনের ওপর ভগবানের অপার কৃপা দেখে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন। অতঃপর তিনি নিজ সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন, 'যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন, সেখানেই ঐশ্বর্য, বিজয়, বিভূতি ও অখণ্ড নীতি বিরাজ করে— এই আমার মত (১৮।৭৮)।'

সঞ্জয়ের মান্যতার তাৎপর্য এই যে যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্রগণেরই বিজয় হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

৪. সিদ্ধের মান্যতা

ভগবান ধ্যানযোগের ফলের কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন যে, আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্ত হয়ে সিদ্ধ মহাপুরুষ আর কোন প্রাপ্তিকে তার চেয়ে বড় বলে মানেন না (৬।২২)।

যে ব্যক্তি তত্ত্বকে জানেন, তাঁর যথার্থ মতবাদ এই যে, গুণই গুণসকলের মধ্যে কার্যাদি করে অর্থাৎ প্রকৃতিজাত গুণের মধ্যেই সমস্ত ক্রিয়া হয়। এইরূপ মেনে নিয়ে তিনি ক্রিয়া ও পদার্থ দ্বারা আসক্ত হন না (৩।২৮)। সিদ্ধ ব্যক্তির এই মতবাদের তাৎপর্য হল যে তার মধ্যে কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব থাকে না।

৫. সাধক ও অসাধকগণের মান্যতা

সাংখ্যযোগী সাধকের মত এইরূপ যে, ইন্দ্রিয়সকলই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে কার্যাদি করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়াসকল হচ্ছে, আমি কিছুই করি না (৫।৮-৯)। এর তাৎপর্য এই যে—তাঁর মধ্যে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব থাকে না।

সংসারে আবদ্ধ, তত্ত্বকে জানে না এইরূপ অহংকারে মূঢ় চিত্ত মানুষের মতবাদ এই যে, 'আমি কর্তা (৩।২৭)।' নিজেকে কর্তা বলে মানলে ভোক্তা হতেই হয় এবং সেই ভোগের জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। অসাধকের মতের তাৎপর্য এই যে, সে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে এবং কর্মের ফলরূপে সুখভোগ করতে চায়।

৬. ভক্ত এবং অভক্তের মান্যতা

'ভগবান সব কিছুর মূল কারণ এবং ভগবানের থেকে সত্তার স্ফূরণ পেয়েই সংসারের সমস্ত ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়'—এই মনে করে ভক্তগণ শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক ভগবানের ভজনা করেন (১০।৮)। কিন্তু যারা অভক্ত, তারা ভগবানকে সাধারণ মানুষের মত শরীর-ধারণকারী, জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তনকারী বলে মনে করে (৭।২৪) থাকে।

৭. দৈবী এবং আসুরী প্রকৃতিসম্পন্নদের মান্যতা

দৈবীগুণসম্পন্ন মানুষ ভগবানকে সমস্ত প্রাণীর আদি এবং অবিনাশী জেনে অনন্যমনে ইহলোক এবং পরলোকের ভোগের কামনা ত্যাগ করে ভজনা করে (৯।১৩) থাকে।

আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ মনে করে সুখভোগ এবং বিষয়-সংগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নেই (১৬।১১)।

এর তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি সাংসারিক ভোগ ও বিষয়সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, তার মনে সংসারের প্রাধান্য এসে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানে মন নিবিষ্ট করে, তার মধ্যে সংসারের গুরুত্ব দূর হয়ে ভগবানের গুরুত্ব এসে যায়। সংসারের গুরুত্ব পর-ধর্ম, কারণ সংসার নিজের নয় এবং ভগবানের গুরুত্ব স্ব-ধর্ম, কারণ ভগবান একান্ত আপনার।

(দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে তথা অষ্টাদশ অধ্যায়ের ঊনষাট সংখ্যক শ্লোকে উদ্ধৃত **'মন্যসে'** পদটি ভগবান মান্যতা আরোপ করার অর্থে বলেছেন, মান্যতাতে নয়। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে আগত **'মতা'** পদও অর্জুন মান্যতার আরোপ বোঝাতেই বলেছেন, মান্যতা অর্থে নয়। এইরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঁয়ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে **'মংস্যন্তে'** পদ ভগবানের দ্বারা এবং একাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে **'মন্যসে'** পদ অর্জুনের দ্বারা সম্ভাবনার অর্থে বলা হয়েছে, মান্যতার অর্থে নয়।)

(৩৯) গীতায় স্বাভাবিক ও নতুন পরিবর্তনের বর্ণনা

প্রকৃতৌ জায়তে যত্তৎ সহজং পরিবর্তনম্।
মনুষ্যঃ কুরুতে যত্তন্নূতনং পরিবর্তনম্॥

প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যরূপ সংসারে বৃদ্ধি বা ক্ষয় যা কিছু পরিবর্তন হতে থাকে, তাকে বলা হয়—'স্বাভাবিক পরিবর্তন', আর মানুষ যে নতুন কর্ম করে, তা হল—'নতুন পরিবর্তন'।

স্বাভাবিক পরিবর্তন নিরন্তর হতেই থাকে। এই পরিবর্তন মানুষ, দেবতা, ভূত-প্রেত, গন্ধর্ব, যক্ষ ইত্যাদির শরীরে তথা সূর্য, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র, বৃক্ষ, লতা, জন্তু ইত্যাদিতে এবং পৃথিবী, সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদিতেও হতে থাকে। এই স্বাভাবিক পরিবর্তনকে কোথাও প্রকৃতির দ্বারা সম্পন্ন বলা হয়েছে (১৩।২৯) আবার কোথাও গুণের দ্বারা বলা হয়েছে (৩।৩৭)। তাৎপর্য এই যে, ত্রিলোকে স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের শরীরে তথা জড় পদার্থে যা কিছু পরিবর্তন হয়, তা স্বাভাবিক পরিবর্তন।

মানুষের শরীর জন্মায়, শিশু থেকে যুবক হয়, যুবক থেকে বৃদ্ধ হয় এবং পরে মারা যায় (২।১৩)—এই স্বাভাবিক পরিবর্তনের মধ্যে মানুষের নতুন পরিবর্তনও হতে থাকে। যেমন, মানুষ সাত্ত্বিক সঙ্গ, স্বাধ্যায়, জপ, ধ্যান ইত্যাদি করলে তার গতি সাত্ত্বিকতা অভিমুখে যায় ; রাজসিক সঙ্গ, স্বাধ্যায় ইত্যাদিতে তার গতি রাজসিকতার অভিমুখে যায় এবং তামসিক সঙ্গ, স্বাধ্যায় ইত্যাদির দ্বারা তার গতি তামসিকতার অভিমুখে যায়। মৃত্যুর পর সাত্ত্বিক ব্যক্তি ঊর্ধ্বগতিতে, রাজসিক ব্যক্তি মধ্যগতিতে এবং তামসিক ব্যক্তি অধোগতিতে গমন করে (১৪।১৮)।

নতুন পরিবর্তন পশু-পক্ষী ইত্যাদির মধ্যেও দেখা যায়; যেমন—শিক্ষা দিলে বাঁদরও সৈনিকের কাজ করতে পারে, সাইকেল চালাতে পারে ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু যার দ্বারা পারমার্থিক কল্যাণ হতে পারে, সেইরূপ পরিবর্তন তার হয় না। কারণ ইতরপ্রাণী হচ্ছে ভোগযোনি এবং তাদের দ্বারা যা কিছু করা হয়, সবই হলো ফলভোগ। যদি সিংহ কোন পশুকে হত্যা করে খায় তবে তার পাপ হয় না; কারণ তা ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই। তাই পশু-পক্ষীদের নতুন কোন কর্ম সৃষ্ট হয় না। কিন্তু মনুষ্যজীবন কর্মযোনি। সুতরাং সে নতুন কর্ম (নতুন পরিবর্তন) করতে সক্ষম।

মানুষের জন্মসূত্রে নির্দিষ্ট যে সকল কর্ম আছে, সে সমস্তই তার পুরানো কর্ম। সেই কর্ম দ্বারা যে পরিবর্তন হয়, তার থেকেও বিশেষ রকম পরিবর্তন নতুন কর্ম দ্বারা হয়। এরূপ দেখা যায় যে, উত্তম জাতিতে জন্ম হলেও যদি উত্তম সঙ্গ, শিক্ষা না পায়, তবে সে ব্যক্তি দুরাচারী হয়ে ওঠে। সুতরাং জন্মজাত (পুরানো) কর্ম ভাল হলেও নতুন কর্ম ভাল না হলে মানুষের পতন হয়। আবার নীচ জাতিতে জন্ম নিলেও উত্তম সঙ্গ, শিক্ষা ইত্যাদি পেলে মানুষ সদাচারী হয়, সাধু-মহাপুরুষ হয়ে ওঠে, অপরের কাছে আদর্শ হয়ে ওঠে। সুতরাং জন্মজাত কর্ম ভাল না হলেও নতুন কর্ম ভাল হলে মানুষের মধ্যে বিশেষত্ব আসে।

গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ, গুণাতীত এবং ভক্তদের লক্ষণের বর্ণনায় নতুন পরিবর্তনের কথাই বলা হয়েছে। এই নতুন পরিবর্তন সাধনের কোন শেষ-সীমানা নেই অর্থাৎ মানুষ যেমন চাইবে নিজের মধ্যে এই নতুন পরিবর্তন আনতে পারবে। নতুন পরিবর্তনের দ্বারা মানুষ ভগবানেরও আদরণীয় হতে পারে। এই নতুন পরিবর্তনে ভক্তের শরীর চিন্ময় হয়ে যায়—যেমন ভক্তশ্রেষ্ঠ তুকারামজী সশরীরে বৈকুণ্ঠে চলে গিয়েছিলেন ; মহামানব কবীরের শরীর ফুলে পরিণত হয়েছিল, ভক্তিমতী মীরার শরীর ভগবানের শ্রীবিগ্রহতে লীন হয়ে গিয়েছিল। ভক্তিমতী জনাবাঈ এবং ফুলীবাঈ-এর দেহ থেকে নামধ্বনি শোনা যেত। তুকারামের চরণচিহ্নে বিট্‌ঠল নামের ধ্বনি বার হত। দেহরক্ষার পরেও চোখামেলার হাড়ে বিট্‌ঠল নামের ধ্বনি শোনা যেত।

ভগবান গীতায় চার প্রকার ভক্তের কথা বলেছেন—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং প্রেমী (৭।১৬)। এই চারপ্রকার ভক্ত জন্ম দ্বারা নয়, বরং কর্ম দ্বারা নির্ণীত হয়। এদের এই উদ্যোগ প্রারব্ধজনিত নয়, বরং নতুন কর্মের পরিবর্তন। এই নতুন পরিবর্তনের সুযোগ মনুষ্য শরীরেই রয়েছে, অন্য শরীরে নয়। কোন কোন স্থলে (ব্যতিক্রমরূপে) অবশ্য পশু-পক্ষী ইত্যাদির মধ্যেও এই নতুন পরিবর্তন দেখা যায়।

শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও পালন-পোষণ এসব হচ্ছে মায়ের দ্বারা সম্পাদিত নতুন পরিবর্তন বা কর্ম। কিন্তু শিশুর বৃদ্ধিপ্রাপ্তি নতুন কর্ম নয়, কারণ মা শিশুকে বড় করে না, সে স্বাভাবিকভাবেই বড় হতে থাকে। আহার গ্রহণ করা নতুন কর্ম, কিন্তু ভোজ্যপদার্থ হজম হওয়া স্বাভাবিক কর্ম (পরিবর্তন)। ঔষধ সেবন করা নতুন কর্ম, কিন্তু আরোগ্য লাভ স্বাভাবিক কর্ম। এইরূপ শরীরের জন্ম, বৃদ্ধি ইত্যাদি স্বতঃ স্বাভাবিক হয়। কিন্তু মনুষ্যজীবনে শুভাশুভ কর্ম করে স্বর্গ-নরক অথবা চুরাশী লক্ষ জন্ম ভোগ করা, ভগবদ্-ভজনা করা, প্রাণীদের সেবা করা, নিজ কর্তব্য-কর্ম পালন করা, নিজ বিবেককে শ্রদ্ধা জানানো ইত্যাদি হল নতুন কর্ম (পরিবর্তন)। এই নতুন কর্মের কারণেই অত্যন্ত পাপী ও দুরাচারী ব্যক্তিও জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে উদ্ধার করতে পারে (৪।৩৬), ভগবৎপ্রাপ্তিকে দৃঢ় নিশ্চয় করে অনন্য ভক্ত হতে পারে তথা চির শান্তি লাভ করতে পারে (৯।৩০-৩১) এবং কেবলমাত্র লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে কর্তব্য-কর্মের পরম্পরাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং অপরের হিতের জন্য কর্তব্য-কর্মের পালন করে সমস্ত পাপের বিনাশ করতে পারে (৪।২৩)।

(৪০) গীতায় স্বভাবের বর্ণনা

চতুর্বিধঃ স্বভাবশ্চ প্রাকৃতো বর্ণগস্তথা।
উৎপাদিতশ্চ সঙ্গেন শুদ্ধশ্চ জ্ঞানিনাং স্মৃতঃ॥

গীতায় চার প্রকারের স্বভাবের বর্ণনা করা আছে, যা এইরূপ—

১. সমষ্টি প্রকৃতিগত স্বভাব

গাছপালার জন্ম, বড় হওয়া, ফল-ফুল উৎপন্ন হওয়া ইত্যাদি এবং ঠিক এইরূপই মানুষ, পশু-পক্ষী ইত্যাদির জন্ম, শিশু থেকে যুবা এবং যুবা থেকে বৃদ্ধে পরিণত হওয়া তথা শরীরের বল হ্রাস, বৃদ্ধি যা কিছু পরিবর্তন এই জগৎ সংসারে হচ্ছে তা সমস্তই সমষ্টি প্রকৃতির স্বভাব।

সমষ্টি প্রকৃতিগত স্বভাব কারো পক্ষে দোষযুক্ত বা অহিতকর নয়, বরং শুদ্ধ ও পবিত্রকারী হয়ে থাকে। শিশু থেকে যুবা এবং যুবা থেকে বৃদ্ধ হওয়া এবং রোগী থেকে নীরোগ এবং নীরোগ থেকে রোগীতে[১] পরিণত হওয়া কি দোষের ? না, তা নয়, এটি তো পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করিয়ে শুদ্ধ করে দেয়। কিন্তু প্রকৃতির এই স্বভাবে (স্বাভাবিক পরিবর্তনে) মানুষ স্বেচ্ছাচার করতে থাকে অর্থাৎ রাগ-দ্বেষপূর্বক শাস্ত্র আদেশের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী হয়ে কর্ম করতে থাকে, যার দ্বারা সে বদ্ধ হয়ে পড়ে।

এই স্বভাবের বর্ণনা গীতায় কয়েকটি স্থানে আছে ; যেমন—প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় (৩।২৭) ; গুণই গুণসকলের ওপর ক্রিয়া করছে (৩।২৮, ১৪।২৩) ; ইন্দ্রিয়ই ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে (৫।৮-৯) ; প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম করে (১৩।২৯)। এর তাৎপর্য এই যে, সমষ্টি প্রকৃতির দ্বারা সম্পন্ন ক্রিয়াগুলিতে মানুষের স্বেচ্ছাচারী হওয়া বা তার দ্বারা সুখী বা দুঃখী হওয়া উচিত নয়।

২. বর্ণগত স্বভাব

এটি ব্যক্তিগত স্বভাব, কারণ এটি পূর্বকর্ম অনুসারে এবং ইহ জন্মের মাতা-পিতার রজঃবীর্য অনুযায়ী সৃষ্ট হয়। সুতরাং এই স্বভাবও কোন ব্যক্তির জন্য দোষের ও পাপের হয় না। যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চার বর্ণের যে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম হয়, সেই কর্মের বিভিন্নতার কারণেই এই বর্ণগত স্বভাব তৈরী হয়।

ব্রাহ্মণের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি কর্মে স্বাভাবিক এক পবিত্রতা থাকে ; ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ করা, দান করা ইত্যাদি কর্মে স্বাভাবিকভাবেই নির্ভয়তা, শৌর্য, উদারতা থাকে। বৈশ্যদের মধ্যে চাষ করা, গো-পালন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে এবং শূদ্রদের মধ্যে সমস্ত বর্ণের মানুষকে সেবা করার এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। বর্তমান সময়ে এই চার বর্ণের মধ্যে যদি এইরূপ স্বভাব না দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে সঙ্গ-দোষই তার কারণ। এইজন্যই মানুষের ভাল সঙ্গ গ্রহণ এবং খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।

এই বর্ণগত (জাতিগত) স্বভাবের বর্ণনা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে (১৮।৪২-৪৮, ৫৯-৬০)। এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের নিজ বর্ণগত স্বভাব অনুযায়ী নিজ নিজ শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য তৎপরতার সঙ্গে নিষ্কামভাবে পালন করা উচিত এবং কুসঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। এইরূপ করলে মানুষের স্বাভাবিকভাবে কল্যাণ হতে পারে।[২]

---

[১]রোগ দুই প্রকারে হয়—প্রারব্ধজনিত এবং কুপথ্য জনিত। প্রারব্ধের জন্য যে অসুখ হয় তা ওষুধে সারে না। যতক্ষণ প্রারব্ধের বেগ থাকে, ততক্ষণ রোগ থাকে। কুপথ্যজনিত অসুখ পথ্য সেবন ও ঔষধ গ্রহণে সারে। এখানে (সমষ্টি প্রকৃতিগত স্বভাবে) প্রারব্ধ জনিত রোগের কথা বলা হয়েছে।

[২]যে মানুষ নিজ কল্যাণ চায়, তার শাস্ত্রসম্মত ভোগসমূহও ত্যাগ করতে হয় এবং পরম্পরাগত স্বাভাবিক দোষযুক্ত আচরণ ত্যাগ করে শুদ্ধ, পবিত্র আচরণ গ্রহণ করতে হয়।

৩. উৎপাদিত স্বভাব

এই স্বভাব মানুষের নিজের সৃষ্ট এবং তা প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন হয়। মানুষ যেমন শাস্ত্রাদি পাঠ করে, যেমন লোকজনের সঙ্গ করে, যেমন পরিবেশে থাকে, তেমনি তার স্বভাব সৃষ্টি হয়। এর তাৎপর্যরূপে বলা যায় যে, বিধিসম্মত কর্ম, সৎসঙ্গ তথা পবিত্র আচরণ দ্বারা স্বভাব শুধরে যায় এবং নিষিদ্ধ কর্ম, কুসঙ্গ তথা অপবিত্র আচরণ দ্বারা স্বভাব দূষিত হয়ে যায় (১৬।১-১৮)। এই স্বভাব শোধরাবার জন্য গীতায় ভগবান স্থানে স্থানে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়েছেন (৩।৩০, ৩৪ ; ১৬।২১, ২৪ ইত্যাদি)। এর তাৎপর্য হল, নিজের স্বভাবকে শুদ্ধ, পবিত্র করে তুলতে মানুষ স্বতন্ত্র এবং সক্ষম, এতে কেউই পরাধীন বা হীনবল নয়। সুতরাং মানুষকে খুব সাবধানে থেকে নিজ স্বভাবকে শুদ্ধ করে তুলতে হবে। স্বভাব খারাপ হবার কোন সুযোগই দেওয়া উচিত নয়। এতেই মনুষ্যজন্মের সাফল্য নিহিত।

৪. জ্ঞানীর স্বভাব

জ্ঞানীর স্বভাব খুবই শুদ্ধ হয়। সকল জ্ঞানী (তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত) মহাপুরুষদের স্বভাবে শুদ্ধি, নির্মলতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমানভাবেই থাকে। কিন্তু বর্ণ, আশ্রম, সাধনা-পদ্ধতি ইত্যাদির জন্য তাঁদের স্বভাব এবং আচরণ একরকম হয় না, কিছু ভিন্নতা থাকে (৩।৩৩)। তাঁদের এ ভিন্নতা দোষের নয়, কারণ তাঁদের মধ্যে রাগ-দ্বেষ, অহং-অভিমান এই দোষগুলি থাকে না। এর তাৎপর্য এই যে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরেও জ্ঞানী মহাপুরুষগণ নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রম, সাধন-পদ্ধতি অনুযায়ীই আচার-আচরণ এবং কর্তব্য-কর্ম করেন।

উপরিউক্ত স্বভাবগুলির বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, মানুষ নিজের স্বভাব সংশোধন করবে, তাকে নষ্ট হতে দেবে না এবং কারো স্বভাব নিয়ে দোষারোপ করবে না। নিজে সাবধান হয়ে দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করে সৎকর্ম গ্রহণ করবে। এইরূপ করায় সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সৎ-শাস্ত্র, সৎপুরুষের সঙ্গ এবং নিজের উৎসাহ ও ধৈর্য —এগুলি তার সহায়ক হয়।

জ্ঞাতব্য

মনুষ্যলোকে স্বভাবই প্রধান। এই ব্যক্তি সজ্জন, এ বড় ভাল, এ দুষ্ট, এ দ্বেষপরায়ণ, এ খুব খারাপ, এ চোর বা ডাকাত, এ বড় ঠগ, এ বড় প্রতারক—ইত্যাদি যতপ্রকার সংজ্ঞা আছে তা সবই স্বভাবকে নিয়ে বলা হয়। স্বভাব অনুযায়ীই পরলোকে গতি হয়। মানুষ নিজ স্বভাব যেরূপ তৈরী করে, সেই অনুযায়ী ভগবান তাকে পরের জন্ম দেন।

মনুষ্যজন্ম শুধুমাত্র স্বভাবকে শুদ্ধ করার জন্যই লাভ হয়, কাজেই খারাপ স্বভাব ত্যাগ করে ভালো স্বভাব গ্রহণ করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। নিজ স্বভাব বদলাতে প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন। ধনী হওয়া, উচ্চপদ প্রাপ্ত করা ইত্যাদিতে তার সেরূপ স্বাধীনতা নেই—যেরূপ নিজ স্বভাবকে শুদ্ধ করাতে রয়েছে। যদি মানুষ ভালো সঙ্গ করে, ভালো বই পড়ে, স্বভাব সংশোধনের চেষ্টা করে তবে সে নিজ স্বভাবকে খুব শীঘ্রই এবং সহজে শুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু যদি সে কুসঙ্গ করে, খারাপ মানের বই পড়ে, খারাপ চিন্তাধারায় উৎসাহিত হয়, তাহলে সে মন্দ স্বভাবসম্পন্ন হয়।

মনুষ্যজন্ম পেয়েও নিজ স্বভাবকে শুদ্ধ না করার চেষ্টা একটা বড় ক্ষতি ; কারণ এই মনুষ্য-জন্মেই নিজ স্বভাবকে পরিশুদ্ধ করে মানুষ উন্নত হতে পারে, জীবন্মুক্ত হতে পারে ; তত্ত্বজ্ঞ হতে পারে, ভগবদ্‌ভক্ত হতে পারে। অন্য যোনিতে এরূপ সুযোগ পাওয়া কঠিন ; কারণ সেইসব জন্মে এরূপ হয় না, সেই সামগ্রীও থাকে না বা এরূপ সামর্থ্যও থাকে না, যাতে সে নিজ স্বভাব শুদ্ধ করতে পারে, নিজেকে উদ্ধার করতে পারে।

মানুষের যা কিছু সম্মান বা প্রতিষ্ঠা সমস্তই স্বভাবের কারণেই হয়। কোন ব্যক্তি যদি বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদিতে উচ্চ হয়, উচ্চপদে আসীন হয়, কিন্তু তার স্বভাব যদি খারাপ হয় তাহলে, লোকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার সামনে চুপ করে থাকতে পারে, ভয় পেয়ে তার প্রশংসা করতে পারে, তাকে সম্মান দেখাতে পারে কিন্তু অন্তর থেকে তাকে শ্রদ্ধা করবে না। তাদের মনের মধ্যে এই অভিযোগ থাকবে, 'কী করা যায়, এই লোকটি তো বদ্‌স্বভাব, কিন্তু কাজের জন্যই আমাকে এর তোষামোদ করতে হচ্ছে।' মানুষের মনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে সম্মান এবং দুর্যোধনের প্রতি যে ঘৃণা তা তাদের স্বভাবেরই জন্য।

মানুষ স্বার্থ ও অভিমান ত্যাগ করে যদি অপরের সেবা

করে, অপরের মঙ্গল কামনা করে, তাহলে তার স্বভাব খুব শীঘ্র সংশোধিত হতে পারে। স্বভাবের সংশোধন হলে সে নিজের তথা বিশ্বের উদ্ধারকর্তা হতে সক্ষম হয়। বটবৃক্ষ ইত্যাদি যেমন খুব বেড়ে ওঠে, কিন্তু দুর্বা ছোটই থেকে যায়, যদিও আকাশের তরফ থেকে কোন বাধা নেই, তেমনি মানুষ নিজ স্বভাব সংশোধন করে অনেক উন্নত হতে পারে, তারজন্য ভগবানের তরফ থেকে কোন বাধা নেই। এর অর্থ হল যেমন বৃক্ষাদির আকাশের দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার কোন সীমা নেই, তেমনি মানুষেরও উন্নত হবার কোন সীমা নেই।

স্বভাব প্রধানতঃ দুই প্রকারের হয়—সমষ্টি স্বভাব এবং ব্যষ্টি স্বভাব। যাতে কোনপ্রকার উদ্যোগ, পরিশ্রম করতে হয় না এবং যার দ্বারা স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া হয়, তা হচ্ছে 'সমষ্টি (প্রাকৃত) স্বভাব'। যেমন গ্রীষ্মকালে কখনও বেশী গরম পড়ে কখনও কম পড়ে ; কখনও হাওয়া বয়, কখনও বয় না, শীতকালে কখনও খুব ঠাণ্ডা পড়ে, কখনও কম পড়ে। বর্ষাকালে কখনও বেশী বৃষ্টি হয়, কখনও আবার কম আবার কখনও একেবারে বৃষ্টি হয় না, শিশু জন্মায়, বড় হয়ে যুবক হয়, শেষে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, গাছপালা জন্মায়, বেড়ে ওঠে, পড়ে যায়, শুকিয়ে যায়, নতুন বাড়ী পুরানো হয়ে যায়—এই সবই সমষ্টি প্রকৃতির স্বভাব। এই প্রাকৃত স্বভাব পরিবর্তন করা যায় ; যেমন পরমাণু বোমা ইত্যাদির বিস্ফোরণে সমষ্টি প্রকৃতিতে বিকৃতি আসে।

ব্যষ্টি-স্বভাব সকলের একপ্রকার হয় না। কারোর স্বভাব শান্ত, কারো বা ভয়ানক আবার কারো বা মূঢ় (তমোগুণী) স্বভাব হয়। যার স্বভাব শান্ত, সে সৎসঙ্গ, সৎশাস্ত্র, সৎবিচার ইত্যাদির দ্বারা নিজ শান্ত স্বভাবের বিশেষভাবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। যার ভয়ানক স্বভাব, সে যদি ঠিক করে যে, 'আমার নিজের স্বভাব বদলাতে হবে, নম্র করতে হবে', তবে সে সৎসঙ্গ, সদ্বিচার ইত্যাদির দ্বারা নিজ স্বভাবকে শান্ত, সৌম্য করে তুলতে পারে। যার মূঢ় স্বভাব, সেও যদি সৎসঙ্গ করে, সৎশাস্ত্র পড়ে, সু-অভ্যাস করে, তাহলে নিজ স্বভাবকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে। তবে এতে তাকে কিছুটা কষ্ট স্বীকার করতে হবে। কিন্তু যত কঠিনই হোক সেই ব্যক্তি তার স্বভাব বদলাতে, সুন্দর করে গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সক্ষম।

(৪১) গীতায় দৈবী এবং আসুরী সম্পদ্

অভয়াদিগুণৈর্যুক্তা সম্পদ্ দৈবীতি কথ্যতে।
দম্ভদর্পাভিমানাদিরাসুরী সম্পদা মতা॥

দৈবী এবং আসুরী—এই দুটি শব্দের মধ্যে 'দেব' নাম দেবতাদের নয়, তা হলো পরমাত্মার ; এবং 'অসুর' নাম রাক্ষসদের নয়, তা আসলে প্রাণে রমণকারীদের নাম। গীতায় 'দেবদেব' (১০।১৫) ; 'দেবম্' (১১।১১ ; ১৪) ; 'দেবদেবস্য' (১১।১৩) ; 'দেব' (১১।১৫) ইত্যাদি পদে পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই 'দেব' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। 'আসুরং ভাবম্' (৭।১৫) ; 'আসুরঃ' (১৬।৬) ; 'আসুরনিশ্চয়ান্' (১৭।৬) ইত্যাদি পদ প্রাণে আসক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য 'অসুর' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।

'দেব' অর্থাৎ পরমাত্মার যত গুণ আছে সেগুলিকে 'দৈবী গুণ' বলে। এই দৈবীগুণ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার পুঁজি হওয়ায় একে 'দৈবী সম্পদ্' বলা হয়—'দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়' (১৬।৫)। সাধকেরা এই দৈবী সম্পদের আশ্রয় নিয়ে ভগবানের ভজনা করেন (৯।১৩)।

'অসু' প্রাণের নাম। সেই প্রাণে যে রমণ করে, প্রাণের ভরণ-পোষণ-রক্ষণ করতে চায়, তাকে অসুর বলে ;

এবং ঐসব অসুরদের যে স্বভাব, যে গুণ থাকে তাকেই 'আসুরী গুণ' বলে। এই আসুরীগুণ মানুষকে বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্র, চুরাশী লক্ষ যোনি এবং নরকে নিয়ে যাওয়ার কারণ হওয়ায় তাকে আসুরী সম্পদ্ বলে— **'নিবন্ধায়াসুরী মতা'** (১৬।৫)। মূঢ় ব্যক্তিগণই আসুরী সম্পদের আশ্রয় নেয় (৯।১২)।

সংসার থেকে বিমুখ হয়ে এবং দৈবী সম্পদের আশ্রয় নিয়ে পরমাত্মার প্রাপ্তি লাভ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি দুই প্রকারের হয়—

১) সগুণোপাসক (ভক্ত)—সগুণোপাসকদের মধ্যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং ভাবের প্রাধান্য হয় ; অতএব সে **'অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ------নাতিমানিতা'** (১৬।১-৩)—এই ছাব্বিশটি গুণ ধারণ করে। এই সাধক সর্বত্র ভগবানকে দেখে এবং সর্বপ্রথম অভয় হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে অমানিত্ব স্বাভাবিকভাবে এসে যায়।

২) নির্গুণোপাসক (জ্ঞানী)—নির্গুণ উপাসকদের শরীর-শরীরীর বিবেক-বিচারের প্রাধান্য থাকে, সুতরাং সে **'অমানিত্বমদম্ভিত্ব-----তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্'** (১৩। ৭-১১)—এই কুড়ি প্রকার গুণ ধারণ করে। এইরূপ সাধকে প্রথমে অমানিত্ব ভাব আসে এবং তারপর সে সর্বত্র পরমাত্মাকে অনুভব করে অভয় হয়ে যায়।

উপরিউক্ত দুই প্রকারের সাধকদের মধ্যে দৈবী সম্পদ্ সাধন রূপে থাকে। সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে এই দৈবী সম্পদ্ স্বতঃ স্বাভাবিকভাবে থাকে। বাস্তবে সিদ্ধ মহাপুরুষ গুণাতীত ; কিন্তু তিনি সাধন অবস্থার প্রথমদিকে দৈবী সম্পদের সহায়েই সাধনা করেছেন। সুতরাং সিদ্ধ হওয়ার পরও তাঁর দৈবী-স্বভাব বজায় থাকে। ঐ সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে সিদ্ধভক্তদের স্বাভাবিক দৈবী সম্পদের গুণের বর্ণনা দ্বাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক থেকে উনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে এবং সিদ্ধ-জ্ঞানীদের স্বাভাবিক দৈবী সম্পদের গুণের বর্ণনা চতুর্দশ অধ্যায়ের বাইশ থেকে পঁচিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে।

আসুরী সম্পদ ধারণকারীও দুই প্রকারের হয়—

১) সকামভাবে দেবতাদের উপাসনাকারী—সকামভাবে দেবতাদির পূজা-উপাসনা করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমনকারী সমস্ত মানুষই আসুরী সম্পদের অধিকারী। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ভোগ উপভোগ করা, তাই তারা ভোগেতেই আসক্ত ও তন্ময় থাকে (২।৪২-৪৪ ; ৭।২০-২৩ ; ৯।২০-২১)। এরূপ মানুষেরা যে ফল লাভ করে তা বিনাশশীল, অন্তহীন নয়—**'অন্তবত্তু ফলং তেষাম্'** (৭।২৩) এবং তারা পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়—**'গতাগতং কামকামা লভন্তে'** (৯।২১)।

তাৎপর্য এই যে, যাদের উদ্দেশ্য সুখ, আরাম, ভোগ-বিলাস ও বিনাশশীল পদার্থ, তারা সকলেই আসুরী সম্পদ্যুক্ত এবং যাদের উদ্দেশ্য ভগবানের প্রসন্নতা, লোকসংগ্রহ এবং জগতের কল্যাণে কর্ম করা, তারা সকলে দৈবী সম্পদ্ সম্পন্ন হয়।

২) কাম-ক্রোধাদির আশ্রয় নিয়ে দুর্গুণ-দুরাচারে প্রবৃত্ত ব্যক্তি—যেসব মানুষ কাম, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে তারা মিথ্যা, কপটতা, ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, হিংসা ইত্যাদির দ্বারা অপরকে দুঃখ দেয়। এইসব ব্যক্তি পাপের তারতম্য অনুযায়ী পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা আদি আসুরী জন্ম লাভ করে (১৬।১৯) এবং কুম্ভীপাক, রৌরব ইত্যাদি নরকে গমন করে (১৬।১৬)।

এর তাৎপর্য এই যে, ভগবৎপরায়ণ হলে দৈবী সম্পদ্ প্রকট হয়, যা মানুষকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে। পিণ্ডপোষণপরায়ণ, ভোগপরায়ণ হলে এবং নতুন নতুন বস্তু আশা করা ও প্রাপ্ত বস্তু ধরে রাখা—এই ভাব হলে আসুরী সম্পত্তি আসে, যা মানুষের বন্ধন ও পতনের কারণ। সুতরাং সাধকের উচিত যে, সে যেন দৈবী সম্পদ্‌কে গুরুত্ব দেয় এবং আসুরী ভাবকে সদা পরিত্যাগ করে। তাহলে তার উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত সিদ্ধ হবেই।

(৪২) গীতার যোগ

যোগশব্দস্য গীতায়ামর্থস্তু ত্রিবিধো মতঃ।
সামর্থ্যে চৈব সম্বন্ধে সমাধৌ হরিণা স্বয়ম্॥

যুক্ত করাই হল 'যোগ'। যখন দুই স্বজাতীয় তত্ত্বের মিল হয়ে যায়, তখন তার নাম হয় 'যোগ'। আয়ুর্বেদে দুটি ওষুধ পরস্পর মিলে যাওয়াকে 'যোগ' বলা হয়। ব্যাকরণে শব্দের সন্ধিকে যোগ (প্রয়োগ) বলা হয়। পাতঞ্জল যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই 'যোগ' বলা হয়েছে। এইভাবে 'যোগ' শব্দের অনেক অর্থ হয়। কিন্তু গীতায় 'যোগ'-এর তাৎপর্য খুবই অসাধারণ।

গীতায় যোগ শব্দের অনেক বিচিত্র অর্থ আছে। তাকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

১) **'যুজির্ যোগে'**—অর্থাৎ যুজ্ ধাতু থেকে সৃষ্ট 'যোগ' শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে—সমরূপ পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ ; যেমন—**'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (২।৪৮) ইত্যাদি। এই অর্থই গীতায় মুখ্যভাবে এসেছে।

২) **'যুজ্ সমাধৌ'**—অর্থাৎ যুজ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন 'যোগ' শব্দ, যার অর্থ চিত্তের স্থিরতা অর্থাৎ সমাধিতে স্থিতি ; যেমন **'যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া'** (৬।২০) ইত্যাদি।

৩) **'যুজ্ সংযমনে'**—অর্থাৎ যুজ্ ধাতু থেকে সৃষ্ট 'যোগ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে সামর্থ্য, প্রভাব ; যেমন **'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'** (৯।৫)।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তির নিরোধকে 'যোগ' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে—**'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'** (১।১২) এবং সেই যোগের পরিণাম বলা হয়েছে দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতিলাভ করা। **'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র'** (১।৩-৪)। এইপ্রকার পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগের যে পরিণাম বলা হয়েছে, তাকেই গীতাতে 'যোগ' নামে বলা হয়েছে (২।৪৮ ; ৬।২৩)। সঠিকভাবে বলা যায় যে, গীতায় চিত্তবৃত্তি থেকে সর্বথা সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ পূর্বক স্বাভাবিকভাবে সম-স্বরূপে স্থিতিলাভ করাকেই 'যোগ' বলা হয়েছে। সেই সমতায় স্থিতি (নিত্যযোগ) হলে আর কখনও তার থেকে বিয়োগ হয় না, কখনো বৃত্তিরূপতা হয় না, কখনো ব্যুত্থান হয় না। বৃত্তিসকল নিরোধ হলেই 'নির্বিকল্প অবস্থা' হয়, কিন্তু সমতাতে স্থিতি হলে 'নির্বিকল্প বোধ' হয়। 'নির্বিকল্প বোধ' অবস্থার অতীত এবং সম্পূর্ণ অবস্থার প্রকাশক তথা সমস্ত যোগের ফল।

জীবের পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ (যোগ) রয়েছে, কোন অবস্থায় বা পরিস্থিতিতেই যার বিয়োগ হয় না। কারণ, পরমাত্মারই অংশসম্ভূত হওয়ায় জীবের পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ যেমন তেমনি থাকে। শরীর-সংসারের সঙ্গে সংযোগ হওয়ায় অর্থাৎ সম্বন্ধ মেনে নেওয়ায় সেই সম্বন্ধের (নিত্যযোগের) অনুভব হয় না। শরীর-সংসারের সঙ্গে এই মেনে নেওয়া সংযোগের বিয়োগ (সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ, বিমুখতা) হওয়া মাত্রই ঐ নিত্যযোগের অনুভব হয়—**'তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্'** (৬।২৩) অর্থাৎ দুঃখের সঙ্গে সংযুক্তির বিয়োগ হওয়ার নামই 'যোগ'[১]। এর তাৎপর্য বলা হল যে, ভুলবশতঃ শরীর-সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সংযোগের বিয়োগ হয়ে যাওয়া এবং সমরূপ পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধের স্থির নিশ্চয় হয়ে যাওয়া, তাঁর অনুভব হয়ে যাওয়ার নামই 'যোগ'। এই যোগ সবসময় আছে, সর্বদেশে আছে, সমস্ত বস্তুতে আছে, সম্পূর্ণ শরীরে আছে, সমস্ত ঘটনাবলীতে আছে, সকল ক্রিয়াতে আছে। আরও বলা যায় যে, এই নিত্যযোগের বিয়োগ বলে কিছু নেই, কখনও ছিল না, কখনও হবে না, হওয়া সম্ভব নয়। গীতার এই হচ্ছে মুখ্য যোগ। এই যোগপ্রাপ্তির জন্যই গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, প্রাণায়াম, হঠযোগ ইত্যাদি সাধনের বর্ণনা

---

[১]গীতায় 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' (২।৫০) এরূপ বাক্যও আছে, কিন্তু এই বাক্য যোগের পরিভাষা নয়, বরং এর দ্বারা যোগের মহিমা বলা হয়েছে যে, কর্মে যোগই কুশলতা। যোগ ভিন্ন কর্মের আর কোন মহত্ত্ব নেই।

করা হয়েছে। কিন্তু এইসব সাধনকে যোগ তখনই বলা সম্ভব, যখন অসৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধের অনুভূতি হবে।

এই নিত্যযোগ অনুভূত না হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে অসৎ সঙ্গ অর্থাৎ অসতের প্রতি আসক্তি। কারণ অসৎ-এর প্রতি আসক্তি থাকার জন্যই রাগ-দ্বেষ, অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, ভালো-মন্দ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হয়। অসৎ থেকে অসঙ্গ হলেই, অসৎ-এর সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হলেই যোগপ্রাপ্তি হয়।

যোগপ্রাপ্তির জন্য ভগবান মুখ্যতঃ দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা বলেছেন—(১) কর্মযোগ এবং (২) সাংখ্যযোগ (৩।৩)। অসৎ থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করা হল 'কর্মযোগ' এবং সৎ-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে বলে 'সাংখ্যযোগ'। কিন্তু এই দুই প্রকার নিষ্ঠাই সাধনের একান্ত নিজস্ব। ভক্তিযোগে সাধকের নিজের নিষ্ঠা নেই, বরং ভগবন্নিষ্ঠা আছে।[1] ভক্ত ভগবানের শরণাগত হলে তার ওপর সাংসারিক সিদ্ধি-অসিদ্ধির কোন প্রভাব পড়ে না। ফলে স্বাভাবিক ভাবে ভক্তের মধ্যে সমত্ব এসে যায়।

তিন যোগের দ্বারা কর্ম (পাপ) নাশ

কর্মজ্ঞানভক্তিযোগাঃ[2] সর্বেঽপি কর্মনাশকাঃ।
তস্মাৎ কেনাপি যুক্তঃ সাম্যিন্নর্মা মনুজো ভবেৎ॥

গীতায় ভগবান কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—তিন যোগের দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে কর্ম (পাপ) নাশ হওয়ার কথা বলছেন ; যেমন—

১) কর্মযোগ—যে সাধক কেবল যজ্ঞ (কর্তব্য-কর্ম)-এর পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার জন্য, লোকসংগ্রহের জন্য, সৃষ্টি-চক্রের পরম্পরা প্রবাহিত রাখার উদ্দেশ্যে কর্তব্য-কর্ম পালন করেন, অর্থাৎ অপরের জন্যই কেবল কর্ম করেন, নিজের জন্য নয়, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান (৩।১৩)।

২) জ্ঞানযোগ—দেখা, শোনা এবং বোঝাতে যে সমস্ত দৃশ্য আসে তা সমস্তই অদৃশ্যতায় পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের যত বিষয় আছে, সে সমস্তই প্রথমে ছিল না এবং পরেও থাকবে না এবং বর্তমান সময়েও প্রতিক্ষণে অভাবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিষয় তথা অভাবকে জানে যে তত্ত্ব সেটি সর্বদা যেমন ছিল তেমনি থাকে। ওই তত্ত্বের কখনো অভাব হয় নি, হয় না, হবে না এবং হতেও পারে না। সেই তত্ত্ব দ্বারাই আমি-আমার, তুমি-তোমার, এটি-তার, ওটি-তাদের প্রকাশিত হয়। এই তত্ত্ব (প্রকাশ) এসবে যেমন তেমনি পরিপূর্ণভাবে থাকে। জ্বলন্ত অগ্নি যেমন কাঠকে ভস্মে পরিণত করে, তেমনি জ্ঞানরূপী অগ্নি সব কর্ম ও পাপকে ভস্ম করে দেয় (৪।৩৭)। এর অর্থ হল যে সেই জ্ঞানরূপী অগ্নিতে আমি-আমার, তুমি-তোমার, এটি-তার, ওটি-তাদের ইত্যাদি সমস্তই লীন হয়ে যায়।

৩) ভক্তিযোগ—যে সংসার-বিমুখ হয়ে শুধু ভগবানের শরণাগত হয়, ভগবান তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেন। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি সমস্ত ধর্মের আশ্রয় ছেড়ে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব, তুমি চিন্তা করো না (১৮।৬৬)।

তিন যোগের আশ্রয়ে নির্বাণ-পদ প্রাপ্তি

কর্মজ্ঞানভক্তিযোগৈর্নির্বাণব্রহ্ম গম্যতে।
উক্তমেতল্লক্ষ্যসাম্যং সাধকানাং তু গীতয়া॥

সমস্ত সাধকেরই প্রাপণীয় তত্ত্ব এক। কেবলমাত্র সাধকের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, স্বভাব, রুচি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন

---

[1]গীতায় যেখানে কর্মযোগ ও সাংখ্যযোগ—এই দুটিকেই নিষ্ঠা বলে মানা হয়েছে, সেখানে ভক্তিযোগকে আলাদা করে না মেনে উপরিউক্ত দুই নিষ্ঠার অন্তর্গত মানা হয়েছে। তাই সেখানে সাংখ্যযোগের দুটি ভাগ হয়ে যাচ্ছে—বিচারপ্রধান সাংখ্যযোগ (১৩।১৯-৩৪) এবং ভক্তিমিশ্রিত সাংখ্যযোগ (১৩।১-১৮)। এইরূপে কর্মযোগেরও তিনটি ভাগ হয়ে যায়। যেমন, কর্মপ্রধান কর্মযোগ (১৮।৪-১২), ভক্তিমিশ্রিত কর্মযোগ (১৮।৪১-৪৮) এবং ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ (১৮।৫৬-৬৬)। কিন্তু যেখানে ভক্তিযোগকে দুই নিষ্ঠার অন্তর্গত না মেনে পৃথক মানা হয়, সেখানে সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—দুটি নিষ্ঠা সাধকদের নিজস্ব এবং ভক্তিযোগ হচ্ছে ভগবন্নিষ্ঠা। সেক্ষেত্রে তিনটি যোগকেই পৃথক বলে মনে করা হয়, তাতে কোনো সংমিশ্রণ থাকে না।

[2]এখানে (এই শ্লোকে) 'ন-বিপুলার' প্রয়োগ হয়েছে। এইরূপে প্রত্যেক লিখনের শুরুতে দেওয়া অন্য শ্লোকে কোথাও কোথাও 'র-বিপুলা'র প্রয়োগ হয়েছে। এইরূপ প্রয়োগকে 'পিঙ্গলচ্ছন্দঃ' সূত্রম্ গ্রন্থের অনুসারে 'পথ্যাবক্ত্র' নামক ছন্দের অন্তর্গত বলে মানা হয়।

হওয়ায় তাঁদের উপাসনা (সাধন) পদ্ধতিতে বিভিন্নতা থাকে। মানুষের মধ্যে যেমন ভাষা, বেশ, বিভিন্ন সম্প্রদায় ইত্যাদিতে অনেক প্রকারের ভেদ আছে, কিন্তু সুখ-দুঃখের অনুভব সবারই সমান হয় অর্থাৎ অনুকূল পরিস্থিতিতে সুখী এবং প্রতিকূল অবস্থায় দুঃখী হওয়াতে সকলেই সমান, তেমনি সংসারে বিমুখ হয়ে পরমাত্মার শরণাগত হওয়ার সাধনা পৃথক্, কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তিতে সকলেই এক হয়ে যায় অর্থাৎ পরমাত্মপ্রাপ্তি, সুখ-শান্তি সকলের একইরকম প্রাপ্তি ঘটে।

ভগবান গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ —এই তিনটি যোগ দ্বারা নির্বাণ-পদ প্রাপ্তির কথা বলেছেন ; যেমন—

(১) **কর্মযোগ**—যে ব্যক্তি কামনা, স্পৃহা (আসক্তি), মমতা ও অহং ভাববর্জিত হয়, তার শান্তিপ্রাপ্তি ঘটে। একে ব্রাহ্মী স্থিতি বলে। এই ব্রাহ্মী স্থিতিতে যদি কেউ অন্তিমকালে (মৃত্যুকালেও) স্থিত হয়, তাহলেও তার নির্বাণ-ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় (২।৭১-৭২)।

(২) **জ্ঞানযোগ**—যে ব্যক্তির জাগতিক বাহ্য-পদার্থ অর্থাৎ সুখভোগের (সম্বন্ধজনিত) আসক্তি মিটে গেছে, যাঁর কেবল পরমাত্ম-তত্ত্বতেই সুখ-বুদ্ধি, যে ব্যক্তি পরমাত্ম-তত্ত্বতেই রমণ করেন, এইরূপ ব্রহ্মভূত সাধকগণ নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যাঁর সমস্ত পাপ নাশ হয়েছে, যাঁর দ্বিধা দ্বন্দ্ব মিটে গেছে, যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীদের হিতে রত, তিনি নির্বাণ-ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি কাম-ক্রোধরহিত হয়েছেন, যাঁর মন নিজ বশে আছে, যে ব্যক্তি তত্ত্ব জেনেছেন—এইরূপ সাধকেরা জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পর নির্বাণ-ব্রহ্ম লাভ করেন (৫।২৪-২৬)।

(৩) **ভক্তিযোগ**—শান্ত অন্তঃকরণসম্পন্ন, ভয়হীন এবং ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিত সাধক মন সংযম করে চিত্ত আমাতে স্থির রেখে মৎ-পরায়ণ হলে, আমাতে স্থিত যে পরমনির্বাণ (শান্তি) তা প্রাপ্ত করে (৬।১৪-১৫)।

তিন যোগের একতা

বস্তুতস্তু ত্রয়ো যোগা অভিন্নাস্তে পরস্পরম্।
সাধকানাং রুচের্ভেদাৎ ত্রিবিধা যোগসংজ্ঞিতাঃ॥

গীতায় তিনটি যোগেই তিন যোগের উল্লেখ হয়েছে ; যেমন—

(১) **কর্মযোগ**—এতে **'যুক্ত আসীত মৎপরঃ'** (২।৬১), **'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা'** (৩।৩০), **'ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি'** (৫।১০)—এই ভক্তিযোগের কথাগুলি এসেছে। **'সর্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা'** (৫।৭)—এটি জ্ঞানযোগের কথা, কারণ জ্ঞানযোগে পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্নতার কথা মুখ্যরূপে থাকে।

(২) **জ্ঞানযোগ**—এতে **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (৫। ২৫ ; ১২।৪)—এই কর্মযোগের কথা এসেছে ; কারণ সকল প্রাণীর হিতে রতিই কর্মযোগের প্রধান কথা। **'ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী'** (১৩।১০), **'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে'** (১৪।২৬)—এগুলি ভক্তিযোগের কথা ; কারণ ভক্তিযোগে ভগবানের অনন্যতাই মুখ্য।

(৩) **ভক্তিযোগ**—এতে **'সর্বকর্মফলত্যাগম্'** (১২।১১), এবং **'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'** (১৮।৪৬)—এগুলি কর্মযোগের কথা, কেননা কর্মযোগে কর্মফল ত্যাগ এবং নিজ কর্মের দ্বারা জনগণের সেবা (পূজা) করাই প্রধান হয়ে থাকে। **'অধ্যাত্মনিত্যাঃ'** (১৫।৫)—এটি জ্ঞানযোগের কথা ; কারণ জ্ঞানযোগে চিন্ময় তত্ত্বে স্থিত থাকাই মুখ্য উদ্দেশ্য। **'তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ'** (৭।২৯)—এটিও জ্ঞানযোগের কথা ; কারণ জ্ঞানযোগের মুখ্যভাব জানা।

এইভাবে তিনটি যোগেরই তিনটি যোগে আসার তাৎপর্য এই যে, কোন ব্যক্তি এই তিনটি যোগকে সর্বতোভাবে যেন পরস্পর থেকে আলাদা না মনে করেন ; কারণ যোগ তিনটি প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন নয়, বরং একই। এতে শুধু প্রণালীর বিভিন্নতা থাকে।

একভাবে দেখতে গেলে কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ কাছাকাছি হয় ; কারণ কর্মযোগী তার সবকিছু (পদার্থ এবং ক্রিয়া) সংসারকে দিতে চায় এবং ভক্তিযোগী সবকিছু ভগবানকে দিতে চায় (৯।২৬-২৭)।

আবার একদৃষ্টিতে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ

কাছাকাছি হয় ; কেননা কর্মযোগী পদার্থ এবং ক্রিয়ার আসক্তি ত্যাগ করে সংসার থেকে পৃথক্ হয় (৬।৪) ; আর জ্ঞানযোগী পদার্থ এবং ক্রিয়াকে প্রকৃতিমাত্র মনে করে এবং নিজেকে অসঙ্গ অনুভব করে সংসার থেকে পৃথক্ হয়। এর তাৎপর্য এই যে, কর্মযোগী 'ক্রিয়া' দ্বারা সংসার থেকে পৃথক্ হন এবং জ্ঞানযোগী 'বিচার' দ্বারা সংসার থেকে পৃথক্ হন।

আর এক দৃষ্টিতে ভক্তিযোগ আর জ্ঞানযোগ কাছাকাছি হয়, ভক্তিযোগী সমস্তই ভগবান হতে সৃষ্ট বলে মনে করেন (৭।১২ ; ১০।৫ ; ৬, ৮, ৩৯) এবং সবকিছুই ভগবানের বলে মানেন (৬।৩০ ; ৭।৭ ; ৮।২২) আর জ্ঞানযোগী সবকিছু প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করেন (১৪।১৯ ; ১৮।৪০) এবং সবকিছু প্রকৃতিতেই বর্তমান বলে মানেন (১৩।৩০)।

তিন যোগেই কর্মে হেতু হওয়ার নিষেধ

হেতোঃ কথনতাৎপর্যং সম্বন্ধঃ স্যান্ন কুত্রচিৎ।
তস্মান্নিমিত্তমাত্রং বৈ ভবেয়ুঃ সাধকাঃ সদা॥

গীতায় ভগবান কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ —এই তিন যোগে হেতুগুলির বর্ণনা করেছেন। যেমন—

(১) **কর্মযোগ**—যখন মানুষ কর্মফলের সঙ্গে, কর্ম সম্পাদনের করণগুলির সঙ্গে অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি কর্ম করার বস্তুর সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ যোগ করে, তখন সে কর্মের হেতুতে পরিণত হয়। যদিও পৃথিবীতে অনেক প্রকার কর্ম হয়ে থাকে, যেসব কর্মের আমরা হেতু হই না, সেসব কর্মের ফলও আমরা পাই না ; কারণ সে সকল কর্মের সঙ্গে আমরা কোন সম্পর্ক স্থাপন করিনি। কর্মের ফল সেই ভোগ করে, যে কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতায়। সুতরাং কর্মযোগের প্রকরণে ভগবান অর্জুনকে মানুষের প্রতিনিধিরূপে বলেছেন যে, 'তুমি কর্মফলের হেতু হয়ো না'—**'মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ'** (২।৪৭) অর্থাৎ 'নিজ কর্তব্য অবশ্যই তৎপরতার সঙ্গে পালন করো, কিন্তু কর্ম, কর্মফল, করণ[১] ইত্যাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক পাতিয়ো না'। এর তাৎপর্য এই যেন কর্মযোগী সাধক কর্ম, কর্মফল, শরীর ইত্যাদি করণগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মানেন না, তাই তিনি কর্মের হেতু হন না।

(২) **জ্ঞানযোগ**—প্রকৃতির রাজ্যে, এই জগতে, শরীরে যা কিছু ক্রিয়াদি হয়, সাংখ্যযোগী তা সবই প্রকৃতিতে, গুণসমূহে এবং ইন্দ্রিয়সমূহেই হয় বলে মনে করেন, নিজের দ্বারা নয়। ভগবান বলেছেন যে, 'প্রকৃতির দ্বারাই সমস্ত কর্ম সংগঠিত হয়—এরূপ যিনি অনুভব করেন, তিনি নিজের মধ্যে অকর্তৃত্ব অনুভব করেন (১৩।২৯)। গুণই গুণের মধ্যে প্রবর্তিত অর্থাৎ ক্রিয়াগুলি গুণের মাধ্যমে সংগঠিত হয়—এরূপ মেনে নিয়ে তত্ত্ববিৎ পুরুষ তাতে আসক্ত হন না (৩।২৮)। দেখা, শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা হচ্ছে, স্বরূপতঃ আমি কিছুই করি না—এইরকম তিনি মনে করেন' (৫।৮-৯)। অতএব সাংখ্যযোগের প্রকরণে ভগবান কার্য এবং করণের দ্বারা ঘটিত ক্রিয়াগুলি উৎপন্ন করায় প্রকৃতিকে হেতু হিসাবে বলেছেন —**'কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে'** (১৩।২০)। সমস্ত কর্ম সম্পাদনে শরীর, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং সংস্কার—এই পাঁচটি হেতু বলা হয়েছে (১৮।১৪)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বিংশতিতম শ্লোকের উত্তরার্ধে যে সুখ-দুঃখের ভোগবিষয়ে পুরুষকেই হেতু বলা হয়েছে, সেখানেও বাস্তবে সুখী বা দুঃখী হওয়াতে পুরুষই হেতু, ভোক্তা হওয়ায় নয়, কারণ ভোগও ক্রিয়াজনিত হয়। সুতরাং ক্রিয়ার জন্য যে ভোগ, প্রকৃতিই তার হেতু। যে ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃতিতে স্থিত মানে, সে-ই সুখী বা দুঃখী হয় (১৩।২১)। কিন্তু যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত, তাঁরা সুখী বা দুঃখী হন না। এর তাৎপর্য এই যে, সাংখ্যযোগী সমস্ত ক্রিয়াগুলি প্রকৃতির বলেই মনে করেন ; সুতরাং তিনি কর্ম করেনও না, করানও না (৫।১৩) অর্থাৎ তিনি কোনও কর্ম বা কর্মফল ইত্যাদির হেতু হন না।

(৩) **ভক্তিযোগ**—যখন ভক্ত নিজেকে ভগবানের

[১]যার দ্বারা কর্ম করা হয়, যেমন মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, অন্তঃকরণ প্রভৃতিকে 'করণ' বলা হয়।

প্রতি সর্বতোভাবে সমর্পণ করেন, নিজেকে ভগবানে বিলিয়ে দেন, তখন করা এবং করানো সবই ভগবানের দ্বারাই হয়ে থাকে, ভক্ত সেখানে নিমিত্তমাত্র। সুতরাং ভক্তিযোগের প্রকরণে ভগবান নিজ প্রিয় ভক্ত অর্জুনকে বলেছেন—'এই ব্যক্তিগণ পূর্বেই আমা দ্বারা হত হয়ে রয়েছে। এদের হত্যার ব্যাপারে তুমি নিমিত্তমাত্র হও'—'নিমিত্তমাত্রং ভব' (১১।৩৩)।

—এইরূপ তিন যোগে তিন হেতু দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, তিনটি যোগেই সাধক কর্ম করায় নিজেকে হেতুরূপে রাখেন না, বরং নিমিত্তমাত্র হয়ে থাকেন। লোকেরা হয়ত এঁদের হেতুরূপেই দেখে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁরা হেতু হন না।

(৪৩) সকলেই গীতোক্ত যোগের অধিকারী

সর্বে মানবদেহত্বাৎ প্রভুপ্রাপ্ত্যধিকারিণঃ।
তস্মাৎ কেনাপি মার্গেণ হরিং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

অন্যান্য শাস্ত্রে জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি মার্গের পৃথক্ পৃথক্ অধিকারীর কথা বলা হয়েছে; যেমন—যে ব্যক্তি সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন, সে জ্ঞানের অধিকারী; যে ব্যক্তি মূঢ় এবং ক্ষিপ্ত বৃত্তিসম্পন্ন নয়, কিন্তু বিক্ষিপ্ত বৃত্তিসম্পন্ন, সে ব্যক্তি পাতঞ্জলযোগের অধিকারী ইত্যাদি। কিন্তু ভগবানের এই এক বিশেষ উদারতা এবং দয়ালুতা যে, তিনি গীতায় মানুষমাত্রেই ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের অধিকারী বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ ভগবৎতত্ত্বলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রেই গীতোক্ত যোগের অধিকারী।

ভক্তিযোগের অধিকারী

সপ্তাধিকারিণো ভক্তের্ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্ত্রিয়ঃ।
বৈশ্যাঃ শূদ্রা দুরাচারা যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ॥

ভগবান ভক্তির অধিকারীদের বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথমে দুরাচারীর কথাই বলেছেন, 'যদি অত্যন্ত পাপী (দুরাচারী) ব্যক্তিও অনন্যভাব নিয়ে আমার ভজনা করে, তবে তাকে সাধু বলে জানবে, কারণ সে আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করেছে। সেই ব্যক্তি অতি সত্বর ধর্মাত্মারূপে পরিগণিত হয় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে।' (৯।৩০-৩১)।

দ্বিতীয়, পাপযোনিভূত ব্যক্তিদের নাম করেছেন, যাদের পূর্বকৃত পাপের জন্য চণ্ডাল ইত্যাদি যোনিতে জন্ম হয়েছে (৯।৩২)।

তৃতীয় হচ্ছে চার বর্ণের স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রদের কথা, যারা হলেন মধ্যম শ্রেণীভুক্ত (৯।৩২)।

চতুর্থত, পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষি ক্ষত্রিয়, যাদের জন্ম এবং আচরণাদিকে উত্তম বলে মানা হয় (৯।৩৩)।

এইপ্রকার দুরাচারী, পাপযোনি, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—এভাবে সমগ্র প্রাণিকুলই এই সাত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাণিমাত্রই ভক্তির অধিকারী। কারণ ভগবানের অংশসম্ভূত হওয়াতে প্রাণিমাত্রেরই ভগবানের সঙ্গে অখণ্ড, অটুট ও নিত্য সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু তারা এই ভুল করে যে, যা তাদের নিজেদের নয় সেগুলিকে নিজস্ব বলে মনে করে এবং যা তাদের একান্ত নিজস্ব, তাকে তারা নিজের বলে স্বীকার করে না।

ভক্তির অধিকারী সাতপ্রকার হলেও, ভাব অনুযায়ী তাদের চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী (৭।১৬)। যে ব্যক্তি ধনপ্রাপ্তির আশায় ভগবানের ভজনা করে এবং ভগবানের কাছেই কেবল চায়, অন্যের সাহায্য নেয় না, সে (সাংসারিক পদার্থ কামনা করার জন্য) 'অর্থার্থী ভক্ত' নামে পরিচিত হয়। যার অর্থার্থী ভক্তের ন্যায় সাংসারিক কামনা নেই, কিন্তু কোন দুঃখ হলে তা সহ্য করতে পারে না, ভগবানকে ডাকে অর্থাৎ নিজ দুঃখ দূর করার জন্য ভগবান ছাড়া আর কাউকে ডাকে না, সে (দুঃখ দূর করবার কামনা থাকার কারণে) 'আর্ত ভক্ত' বলে পরিচিত হয়। যার মধ্যে সাংসারিক বস্তুর কামনা নেই বা দুঃখ দূর করারও কামনা

নেই, যে শুধু ভগবৎতত্ত্ব জানার উদ্দেশ্যে ভগবানের ভজনা করে, এবং তা শুধু ভগবানের কাছ থেকেই জানতে চায়, তাকে (তত্ত্ব জানার কামনা হওয়ার জন্য) 'জিজ্ঞাসু ভক্ত' বলে। যে ব্যক্তি ভগবানের কাছে কিছুই চায় না, শুধু ভগবানকেই চায় এবং নিত্য নিরন্তর তাঁতেই মগ্ন থাকে, তাকে (নিজের কোন কামনা না থাকার জন্য) 'জ্ঞানী ভক্ত' অর্থাৎ 'প্রেমিক ভক্ত' বলা হয়। এমন ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হয় এবং এরূপ ভক্তদেরও ভগবান অত্যন্ত প্রিয় হন (৭।১৭)। এরূপ ভক্তদের ভগবান নিজ আত্মস্বরূপ বলে জানিয়েছেন (৭।১৮)। এই ভক্তদেরই ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোকে 'সর্ববিৎ' বলেছেন। অর্থাৎ যেসব মানুষের উদ্দেশ্য শুধু ভগবৎপ্রাপ্তি তাদের লৌকিক কামনা থাকুক বা পারলৌকিক কামনা থাকুক কিংবা কোনও কামনা না থাকুক—এরা সবাই ভক্তির অধিকারী। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
(২।৩।১০)

'যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকাম বা নিষ্কাম বা মোক্ষলাভে আকাঙ্ক্ষী, তার কেবল তীব্র ভক্তিযুক্ত হয়ে পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সাধন-ভজন করা উচিত।'

জ্ঞানযোগের অধিকারী

যে নরা জ্ঞাতুমিচ্ছন্তি স্বরূপং সংশয়াত্মকাঃ।
সর্বে তে জ্ঞানযোগস্য ভবেয়ুরধিকারিণঃ॥

যেমন সকলেই ভক্তির অধিকারী, তেমনি সকলেই জ্ঞানেরও অধিকারী। ভগবান গীতায় বলেছেন যে, শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সেবা করে, তাঁর অনুগত হয়ে জিজ্ঞাসাপূর্বক প্রশ্ন করে মানুষ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে আর কখনো মোহগ্রস্ত হয় না তথা যে জ্ঞান দ্বারা সাধক প্রথমে সমস্ত প্রাণীকে নিজের মধ্যে এবং পরে পরমাত্মার মধ্যে দেখে, সেই জ্ঞান (তীব্র জিজ্ঞাসা হলে) অতি পাপীরও হতে পারে (৪।৩৪-৩৬)।

ভগবান বলেছেন যে, জগতের সকল পাপীর চেয়েও অধিক পাপী যদি জ্ঞান লাভ করতে চায়, তবে সেও জ্ঞান লাভ করে জ্ঞানরূপী নৌকার দ্বারা সমস্ত পাপ-সমুদ্র পার হয়ে যায়। জ্বলন্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করে দেয়, সেইরূপ জ্ঞানরূপী অগ্নিও সমস্ত পাপকে সর্বতোভাবে ভস্ম করে দেয় (৪।৩৬-৩৭)।

যদি অত্যন্ত পাপীও জ্ঞানলাভ করতে পারে, তবে যে শ্রদ্ধাবান, সাধনায় তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয়, তার যে জ্ঞানলাভ হবে, তাতে আর বলবার কি আছে (৪।৩৯)।

কেউ ধ্যানযোগ দ্বারা, কেউ বা সাংখ্যযোগের দ্বারা, আবার কেউ বা কর্মযোগের দ্বারা নিজের মধ্যেই সেই পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করে (১৩।২৪)। কিন্তু যারা এই সাধনগুলি জানে না, সেই সব ব্যক্তি শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের কাছে শুনে, তাঁদের উপদেশ পালন করে জ্ঞানলাভ করেন (১৩।২৫)।

এর তাৎপর্য এই যে, মানুষ যদি শ্রদ্ধাবান সাধক হয় বা অত্যন্ত পাপী অথবা অত্যন্ত মূঢ় যাই হোক না কেন সে যদি জ্ঞানলাভ করতে আগ্রহী হয়, তাহলেই তার জ্ঞান হতে পারে।

কর্মযোগের অধিকারী

যে নির্মমাস্ত্র নিষ্কামা ইচ্ছন্তি ভবিতুং নরাঃ।
সর্বে তে কর্মযোগস্য ভবেয়ুরধিকারিণঃ॥

ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগের যেমন সকলেই অধিকারী, তেমনি কর্মযোগেরও সকলেই অধিকারী। যে ব্যক্তি সাংসারিক কামনা থেকে মুক্ত হতে চায় অর্থাৎ নিজের উদ্ধার চায়, সে যে কোন বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়ের হোক বা যে কোন স্থানেই বাস করুক, সে যদি নিষ্কামভাবে নিজ কর্তব্য তৎপরতার সঙ্গে পালন করে, তবে তার পরমাত্মপ্রাপ্তি ঘটে (১৮।৪৫)। যে ফলাসক্তি ত্যাগ করে মমত্বরহিত হয়ে শরীর-ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য কর্ম করে, সে-ই কর্মযোগী (৫।১১)। এরূপ কর্মযোগীর সমস্ত (ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ) কর্ম লীন হয়ে যায় (৪।২৩)।

অর্থাৎ ফলাসক্তি ত্যাগ করে অপরের হিতের জন্য যারা নিজ কর্তব্য-কর্ম করে, তারা সকলেই কর্মযোগের অধিকারী।

(৪৪) গীতায় তিন যোগের সমত্ব

কর্মযোগে জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে তথৈব চ।
অস্তি সাধনসিদ্ধৌ চ গীতায়াং তু সমানতা॥

গীতায় ভগবান কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—তিন যোগেই একপ্রকারের কথা বলেছেন যেমন—

কর্মযোগে—'**কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।**' (৪।১৮) 'যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখে।'

জ্ঞানযোগে—'**সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।**' (৬।২৯)। 'যে আত্মাকে সমস্ত প্রাণীতে এবং সমস্ত প্রাণীদের আত্মার মধ্যে দেখে।'

ভক্তিযোগে—'**যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।**' (৬।৩০)। 'যে সর্বত্র আমাকে দেখে এবং আমার মধ্যে সবকিছু দেখে।'

এইরূপ তিনটি যোগেই একই ধরনের কথা বলার অর্থ এই যে, সাধক যে যোগেরই অধিকারী হোক না কেন, সেই যোগের তত্ত্ব সে যেন অসন্দিগ্ধরূপে বুঝতে পারে। কর্মযোগে 'অকর্ম' ; জ্ঞানযোগে 'আত্মা' এবং ভক্তি-যোগে 'ভগবানই' মুখ্য। অর্থাৎ অকর্ম, আত্মা এবং ভগবান—তিনই তত্ত্বতঃ এক।

কর্মযোগে কর্মের অভাব এবং 'অকর্মে'র ভাব আছে। যেমন, প্রত্যেক কর্মের আরম্ভ এবং শেষ থাকে ; কিন্তু কর্মের আরম্ভ হওয়ার পূর্বেও অকর্ম ছিল এবং কর্ম সমাপ্ত হওয়ার পরও অকর্ম থাকবে। সিদ্ধান্ত এই যে, যে বস্তু আদিতেও থাকে আবার অন্ততেও থাকে, তা মধ্যেও থাকে। সুতরাং কর্ম করার সময়ও অকর্ম একইভাবে থাকে।

জ্ঞানযোগে 'সর্বভূতে'-র অভাব এবং 'আত্মা'-র ভাব আছে। সব শরীরেরই জন্ম ও মৃত্যু আছে ; কিন্তু শরীর জন্মাবার পূর্বেও আত্মা ছিল, শরীর নাশের পরেও আত্মা থাকবে। সুতরাং শরীরের বর্তমান অবস্থাতেও আত্মা যেমনকার তেমনি থাকে।

ভক্তিযোগে 'সর্বে'-র অভাব এবং 'ভগবানে'-র ভাব আছে। সংসার সৃষ্টি হয় ও ধ্বংস হয় ; কিন্তু সংসার সৃষ্টির আগেও ভগবান ছিলেন এবং ধ্বংসের পরেও তিনি থাকবেন। অতএব সংসার থাকাকালীনও তিনি যেমনকার তেমনই আছেন।

অকর্ম (নির্লিপ্ততা), আত্মা, এবং ভগবান এই তিন স্বতঃসিদ্ধ। যে বস্তু স্বতঃসিদ্ধ তা সর্ব সময়ের জন্য, সকল প্রাণীর জন্য এবং সর্বস্থানের জন্য হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত কর্ম, সর্বভূত এবং সর্ব (বস্তু, ব্যক্তি, যোগ্যতা, পরিস্থিতি, অবস্থা ইত্যাদি)—এই তিনটি স্বতঃসিদ্ধ নয়, সুতরাং এগুলি সর্বকালের জন্য, সকলের জন্য এবং সর্বস্থানে নয়।

যে বস্তু কখনো থাকে আবার কখনো থাকে না, কেউ পায় আবার কেউ পায় না, কোথাও আছে আবার কোথাও নেই, সেই বস্তুর প্রাপ্তি ক্রিয়া এবং পদার্থ দ্বারা হয়। এইজন্য কর্ম, সর্বভূত এবং সর্বের প্রাপ্তি ক্রিয়া এবং পদার্থের আশ্রিত অর্থাৎ এইসব প্রাপ্তি অভ্যাসসাধ্য। কিন্তু অকর্ম, আত্মা এবং ভগবানের প্রাপ্তি আয়াসসাধ্য নয়, বরং নিষ্কামভাব, বিবেক এবং বিশ্বাসের দ্বারা সাধ্য। যদি এঁর প্রাপ্তি অভ্যাস দ্বারা সাধ্য হোত, তাহলে এঁকে সর্বদা, সকলের জন্য, সর্বস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যেত না।

'কর্ম', 'সর্বভূত' এবং 'সর্ব' কখনো থাকে, কখনো থাকে না ; কোথাও থাকে কোথাও বা থাকে না। এজন্য স্বয়ং যিনি, তাঁর এসবে কোনও প্রয়োজন নেই। এসবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা অকর্ম, আত্মা এবং ভগবানে বিমুখ হওয়া বোঝায়। অকর্ম, আত্মা এবং ভগবান—এই তিনকে অনুভব করার জন্য উৎপত্তি ও বিনাশশীল শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, যোগ্যতা, পরিস্থিতি ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষ এটি বুঝতে পারে না ; কারণ সে এই বাস্তবিকতাকে স্বয়ং অনুভব না করে ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ দ্বারা অনুভব করার চেষ্টা করে, কারণ এইরূপ করাই তার স্বভাব হয়ে আছে।

অকর্ম, আত্মা এবং ভগবান—এই তিনটি তত্ত্বতঃ এক এবং আমাদের সঙ্গে এর নিত্য সম্বন্ধ। অপরপক্ষে

কর্ম, সর্বভূত এবং সর্ব এই তিনের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ। কর্ম থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ অনুভূত হলে 'অকর্ম' অবশেষ থাকে। অকর্মে আত্মা এবং ভগবান দুই-ই থাকে। 'সর্বভূত' থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ অনুভূত হলে 'আত্মা' শেষে থেকে যায়। আত্মাতে অকর্ম এবং ভগবান দুই-ই থাকে। 'সর্ব' থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের অনুভব হলে 'ভগবান' শেষে থাকেন। ভগবানে অকর্ম এবং আত্মা দুই-ই বিদ্যমান।

কর্মে অকর্ম অনুভবকারী 'কৃতকৃত্য' হয়ে যায়—'**স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ**' (৪।১৮)। সর্বভূতে যিনি আত্মাকে অনুভব করেন, তিনি 'জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য' হয়ে যান—'**ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ**' (৬।২৯)। সর্বভূতে ভগবানকে অনুভবকারী 'প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য' হয়ে যায়—'**তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি**' (৬।৩০)।

কৃত-কৃত্যতা, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্যতা এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্যতা—এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটির প্রাপ্তি ঘটলে অন্য দুটি স্বাভাবিকভাবে এসে যায় অর্থাৎ কৃত-কৃত্য হলে কর্মযোগী জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্যও হয়ে যান, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য হলে জ্ঞানযোগীও কৃত-কৃত্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্যও হয়ে যান তথা প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হলে ভক্তিযোগী কৃত-কৃত্য এবং জ্ঞাত-জ্ঞাতব্যও হন।

কৃত-কৃত্যতা (কিছু করার শেষ না থাকা), জ্ঞাত-জ্ঞাতব্যতা (কিছু জানার শেষ না থাকা) এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্যতা (কিছু পাওয়ার শেষ না থাকা)—এই তিনটির দ্বারা মানুষ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তার মনুষ্যজন্ম সর্বতোভাবে সার্থক হয়।

মানুষ যতক্ষণ নিজের জন্যই কেবলমাত্র কাজ করে, ততক্ষণ সে কৃত-কৃত্য হয় না। অপরপক্ষে সে যখন নিজের জন্য কিছু না করে অপরের জন্যই কেবলমাত্র কর্ম করে, তখন সে কৃত-কৃত্য হয়। সাধক যখন নিজ স্বরূপ যথার্থরূপে জানতে পারে এবং অনুভব করতে পারে, তখন সে জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য হয়ে যায়। শুধু ভগবানকেই যে নিজের বলে মনে করে, অপরকে নিজের বলে মানে না; সেই সাধক প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়। অর্থাৎ করবার মতো শুধু অপরের সেবা, জানার মতো কেবল নিজ স্বরূপ এবং পাওয়ার মতো একমাত্র ভগবানই আছেন।

(৪৫) গীতায় তিন যোগের (মহত্ত্ব) গুরুত্ব

ত্রয়ো হি যোগাঃ সুগমা বরিষ্ঠাঃ সিদ্ধিপ্রদাঃ পাপনিবারকাশ্চ।
তুষ্টিপ্রশান্তিপ্রদসাম্যদাশ্চ জ্ঞানাস্থদাতার উদীরিতাশ্চ॥

ভগবান গীতায় তিন যোগের স্বতন্ত্র সাধনপ্রণালী জানিয়েছেন এবং প্রতিটির জন্য নয় প্রকারের গুরুত্ব প্রকট করেছেন—

কর্মযোগ

১) শ্রেষ্ঠ—কর্মযোগ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—'**তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে**' (৫।২)। কারণ কর্মযোগে সমস্ত কর্ম, কর্তব্য-পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ অপরের জন্য করা হয়ে থাকে। অতএব এর দ্বারা নিজ সুখ-আরাম, গুণ-মহিমা, বিদ্যা-বুদ্ধির অভিমান, ভোগ এবং সংগ্রহ করার আকাঙ্ক্ষা অতি সহজেই পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানযোগে বিবেক ও বিচারপূর্বক সুখ-আরাম পরিত্যাগ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন মনে হয়।

কর্মযোগ ধ্যানযোগ হতেও শ্রেষ্ঠ—'**ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগঃ**' (১২।১২)। কারণ কর্মযোগে সমস্ত কর্মের ফল অর্থাৎ কর্মফলেচ্ছা ত্যাগ হয় ; কিন্তু ধ্যানযোগে কর্মফল ত্যাগের কোনো ব্যাপার নেই।

কর্ম ত্যাগ করার থেকে আসক্তিরহিত হয়ে যিনি কর্ম করেন তিনি শ্রেষ্ঠ—'**কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে**' (৩।৭)। কারণ আসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করলে তার দ্বারা যোগারূঢ় (সমতা) হওয়া সম্ভব

(৬।৩) কিন্তু শুধুমাত্র কর্মত্যাগ করলেই সিদ্ধি হয় না (৩।৪)।

২) **সুগম**—কর্মযোগী বন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত হয়ে যান—**'সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে'** (৫।৩)। কারণ তাঁর রাগ-দ্বেষ থাকে না বরং সমভাব থাকে। মানুষকে সাধারণতঃ কর্ম করতেই হয়, কিন্তু রাগ-দ্বেষ, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সুখী বা দুঃখী হওয়ার ফলে সে বন্ধন থেকে মুক্ত হয় না।

৩) **শীঘ্র সিদ্ধি**—সমত্বসম্পন্ন কর্মযোগী খুব শীঘ্রই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়—**'যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি'** (৫।৬)। কারণ তাঁর কর্ম এবং কর্মফলে আসক্তি হয় না এবং সংসারের আশ্রয়ও থাকে না (৪।২০)।

৪) **পাপের নাশ**—যে কেবল যজ্ঞের জন্য অর্থাৎ কর্তব্য-পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যেই কর্ম করে, তার সমস্ত কর্ম এবং পাপ লীন হয়ে যায়—**'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'** (৪।২৩)। কারণ যজ্ঞার্থ কর্ম করলে কর্মের ফলাসক্তি, কামনা ইত্যাদি থাকে না।

কর্ম কি এবং অকর্মই বা কি—তা ঠিক মতো জেনে কর্ম করলে কর্মযোগীর সম্পূর্ণ কর্ম ভস্মসাৎ হয়—**'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্'** (৪।১৯)। কারণ তাঁর সমস্ত কর্ম কামনা ও সংকল্পরহিত হয়, সেইজন্য সেই কর্মে বন্ধনের শক্তি থাকে না।

৫) **সন্তুষ্টি**—কর্মযোগী আপনাতে আপনি তুষ্ট থাকেন—**'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ'** (২।৫৫), **'আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ'** (৩।১৭)। কারণ তাঁর সমস্ত কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ হয়, সুতরাং তাঁর সন্তুষ্টি পরাধীন নয় অর্থাৎ অন্য কোন কিছুর আশ্রিত নয়।

৬) **শান্তি-প্রাপ্তি**—কর্মযোগী শান্তি প্রাপ্ত হন **'স শান্তিমধিগচ্ছতি'** (২।৭১) **'শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্'** (৫।১২)। কারণ তাঁর কামনা, মমতা ইত্যাদি থাকে না অর্থাৎ সংসারের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ থাকে না।

৭) **সমত্ব প্রাপ্তি**—কর্মযোগী সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি সম্পন্ন থাকেন—**'সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ'** (৪।২২)। কারণ তাঁর কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধি, পূর্তি-অপূর্তিতে হর্ষ-শোক বা রাগ-দ্বেষ হয় না।

৮) **জ্ঞান-প্রাপ্তি**—কর্মযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজ স্বরূপের জ্ঞান (বোধ) আপনা হতেই লাভ করেন—**'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি'** (৪।৩৮)। কারণ তাঁর সংসারের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। জড়ত্ব (সংসারের আকর্ষণ) না থাকায় স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রকাশিত থাকে।

৯) **প্রসন্নতা (স্বচ্ছতা) প্রাপ্তি**—কর্মযোগী অন্তঃকরণে প্রশান্তি লাভ করেন—**'প্রসাদমধিগচ্ছতি'** (২।৬৪)। কারণ রাগ-দ্বেষ পূর্বক বিষয় ভোগ করলে অন্তঃ-করণে অশান্তি, অস্থিরতা জন্মে, অপরপক্ষে কর্মযোগী সাধক রাগ-দ্বেষ-রহিত হয়ে বিষয় ভোগ করেন, তাই তাঁদের অন্তঃকরণ স্বচ্ছ ও নির্মল হয়।

জ্ঞানযোগ

১) **শ্রেষ্ঠ**—দ্রব্যময় (আহুতি দ্বারা কৃত) যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ **'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ'** (৪।৩৩)। কেননা দ্রব্যময় যজ্ঞে দ্রব্যসমূহ এবং ক্রিয়াসমূহের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞে কেবল বিবেক-বিচারই প্রাধান্য পায়। বিবেক-বিচারে মানুষের যত স্বাতন্ত্র্য থাকে, তত স্বাতন্ত্র্য দ্রব্যসমূহে ও ক্রিয়াসমূহের ক্রিয়াতে পাওয়া যায় না।

২) **সুগম**—জ্ঞানযোগী সাধক নির্গুণ-নিরাকারের ধ্যান করতঃ সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হয়ে সহজেই পরমাত্মাকে লাভ করেন—**'সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে'** (৬।২৮), কারণ তাঁর দেহাভিমান থাকে না।

৩) **শীঘ্র সিদ্ধি**—শ্রদ্ধাবান্ সাংখ্যযোগী জ্ঞানলাভ করে শীঘ্রই পরমগতি প্রাপ্ত হন—**'জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি'** (৪।৩৯)। কারণ তিনি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করেছেন।

৪) **পাপের বিনষ্টি**—অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও জ্ঞানরূপী নৌকার সাহায্যে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন—**'সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি'** (৪।৩৬)। জ্ঞানরূপী অগ্নি পাপরাশিকে ভস্মসাৎ করে **'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে'** (৪।৩৭)। কারণ স্বরূপের বোধ হলে শরীর-সংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হয়।

৫) **সন্তুষ্টি**—নিজ স্বরূপ-ধ্যানকারী সাংখ্যযোগী আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হন—**'পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি'** (৬।২০)। কারণ তাঁর জড়ত্ব অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না।

৬) শান্তি-প্রাপ্তি—জ্ঞানযোগী পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয় —**'জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি'** (৪।৩৯)। কারণ তিনি তত্ত্ব জেনে যান ফলে তাঁর আর কোন কিছু জানার বাকী থাকে না।

৭) সমত্ব-প্রাপ্তি—যিনি সমস্ত প্রাণীতে নিজেকে এবং নিজেকে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে দেখেন, তিনি সমদর্শী হয়ে যান অর্থাৎ তাঁর সমত্বপ্রাপ্তি ঘটে—**'সর্বত্র সমদর্শনঃ'** (৬।২৯)। তাঁর সুখ-দুঃখেও সমস্থিতি ঘটে—**'সমদুঃখসুখঃ'** (১৪।২৪)। কেননা তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে অভিন্নতা হয়।

৮) জ্ঞান-প্রাপ্তি—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ পৃথক্ পৃথক্—এইরূপ বিবেক হলে সাংখ্যযোগীর স্বরূপবোধ অর্থাৎ পরমতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়—**'যান্তি তে পরম্'** (১৩।৩৪)। কারণ তাঁর প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

৯) প্রসন্নতা (স্বচ্ছতা) প্রাপ্তি—সাংখ্যযোগী অন্তঃ-করণের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়—**'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা'** (১৮।৫৪), কারণ তিনি অহংকার, কামনা ইত্যাদি থেকে মুক্ত।

ভক্তিযোগ

১) শ্রেষ্ঠ—ভগবানে তদ্গত অন্তঃকরণসম্পন্ন শ্রদ্ধাবান ভক্ত সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—**'স মে যুক্ততমো মতঃ'** (৬।৪৭)। কারণ ভগবানের ওপরেই তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে এবং তাঁর আশ্রয়ও ভগবানই হয়ে থাকেন। সাংখ্যযোগী এবং ভক্তিযোগীর মধ্যে ভক্তিযোগীই শ্রেষ্ঠ—**'তে মে যুক্ততমা মতাঃ'** (১২।২); কারণ তিনি নিত্য-নিরন্তর ভগবানেই লেগে থাকেন।

২) সুগম—ভক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা যে পত্র-পুষ্প-ফল-জলাদি ভগবানকে অর্পণ করেন, ভগবান তা গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয় যদি ভক্তের কাছে পত্র-পুষ্প ইত্যাদিও দেওয়ার মত না থাকে, তবে তিনি যা কিছু করেন তা সমস্ত যদি ভগবানে অর্পণ করেন, তাহলে তিনি সকল বন্ধন-মুক্ত হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হন—**'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং -------মামুপৈষ্যসি'** (৯।২৬-২৮)। কারণ ভক্তের ভগবানে অর্পণ করার ভাব থাকে এবং ভগবানও ভাবগ্রাহী।

৩) শীঘ্র সিদ্ধি লাভ—ভগবানে সমর্পিতচিত্ত ভক্তকে ভগবান অতি শীঘ্রই উদ্ধার করে থাকেন—**'তেষামহং সমুদ্ধর্তা----নচিরাৎপার্থ ময্যাবেশিত-চেতসাম্'** (১২।৭) কারণ তিনি কেবল ভগবৎপরায়ণ হন ; সুতরাং তাঁকে উদ্ধার করার দায়িত্ব ভগবান গ্রহণ করেন।

৪) পাপের বিনষ্টি—ভগবান তাঁর শরণাগত ভক্তকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন—**'অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি'** (১৮।৬৬)। কারণ শরণাগত ভক্তের সমস্ত দায়িত্ব স্বয়ং ভগবানের।

৫) সন্তুষ্টি—ভগবানে অর্পিতচিত্ত ভক্ত সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন—**'তুষ্যন্তি'** (১০।৯)। কারণ ভগবানে যেমন যেমন মন অর্পিত হয়, তেমন তেমনই তিনি সন্তোষ লাভ করেন—'আমার মন ভগবৎচিন্তনে ব্যাপৃত'। সিদ্ধাবস্থায় ভক্তদের এই সন্তোষ স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে—**'সন্তুষ্টঃ সততং যোগী'** (১২।১৪)। কারণ তাঁর ভগবৎপ্রাপ্তি হয়েছে।

৬) শান্তি-প্রাপ্তি—ভক্ত পরম শান্তি লাভ করেন—**'শান্তিং নির্বাণপরমাম্'** (৬।১৫), **'শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি'** (৯।৩১)। কারণ তাঁর আশ্রয় হচ্ছে কেবল ভগবান।

৭) সমত্ব-প্রাপ্তি—ভগবান তাঁর ভক্তকে সেই সমত্ব প্রদান করেন, যার দ্বারা ভক্ত ভগবানকে লাভ করেন—**'দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে'** (১০।১০)। কারণ তিনি শুধু ভগবানেই লেগে থাকেন, ভগবান ছাড়া তিনি আর কিছুই চান না।

৮) জ্ঞান-প্রাপ্তি—ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তের অজ্ঞান দূর করেন—**'তেষামেবানুকম্পার্থ-------জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা'** (১০।১১)। কারণ যেহেতু ভগবানেই তাঁর চিত্ত সমর্পিত এবং ভগবান ছাড়া তাঁর আর কিছু চাওয়ার নেই। তাই ভগবান নিজেই তার অজ্ঞান দূর করে ভগবৎ-তত্ত্বের জ্ঞান করিয়ে দেন।

৯) প্রসন্নতা (স্বচ্ছতা) প্রাপ্তি—ভক্তের অন্তঃকরণ প্রসন্ন এবং স্বচ্ছ হয়—**'প্রশান্তাত্মা'** (৬।১৪)। কারণ তিনি সর্বদা ভগবানের ধ্যানেই রত থাকেন।

(৪৬) গীতায় যোগ এবং ভোগ

প্রভুণা সহ সম্বন্ধো জীবানাং যোগ উচ্যতে।
প্রকৃত্যা কৃতসম্বন্ধঃ প্রাণিনাং ভোগ উচ্যতে॥

জীবের পরমাত্মার সঙ্গে যে স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধ, তাকে 'যোগ' বলে এবং বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাকৃত বস্তুগুলির সঙ্গে যে সম্বন্ধ মানা হয়, তাকে 'ভোগ' বলে। সংসারের আসক্তি ত্যাগ করা হলো 'যোগ' এবং আসক্তি ধরে রাখা হলো 'ভোগ'। 'যোগ' নিত্য এবং 'ভোগ' অনিত্য।

খাদ্যবস্তু গ্রহণ শুধু জীবননির্বাহের জন্য করা উচিত। ভোজ্য-পদার্থে যদি অনুরাগ না হয়, আকর্ষণ না থাকে, তাহলে ভোজনও 'যোগ' বলে বিবেচিত হয়। অপরপক্ষে শরীর যেন পরিপুষ্ট হয়, বলশালী হয়—এই দৃষ্টিতে এবং স্বাদ পাবার বা রস গ্রহণ করার জন্য যে ভোজন করা হয়, তাকে 'ভোগ' বলা হয়। অর্থাৎ রাগরহিত হয়ে, নির্লিপ্ততাপূর্বক ভোজন করলে পূর্বের অনুরাগ নষ্ট হয় এবং স্বাদবুদ্ধি, সুখবুদ্ধি না হওয়ায় নতুন করে আর অনুরাগ সৃষ্টি হয় না, ফলে তা 'যোগ' হয়। অনুরাগপূর্বক ভোজন করলে পুরাতন অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং স্বাদ-বুদ্ধি, সুখ-বুদ্ধি হলে নতুন অনুরাগ সৃষ্টি হয়, যাকে 'ভোগ' বলে।

সাংসারিক বস্তু, পদার্থ আদির অনুরাগ ত্যাগ করলে যে সুখ পাওয়া যায়, তার দ্বারা 'যোগ' হয় (১২।১২), এবং ভোগের দ্বারা যে তাৎক্ষণিক বা সাময়িক সুখ হয়, তাতে বন্ধন সৃষ্টি করে (১৮।৩৮)।

প্রবাদ আছে যে, একগুণ দান, সহস্রগুণ পুণ্য। ফলাকাঙ্ক্ষা করে এক টাকা দান করলে তাতে হাজার গুণ পুণ্য হয় অর্থাৎ হাজার টাকার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সুতরাং এইরূপ দান সম্বন্ধ-জনিত ভোগ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সকামভাবে করা দানের দ্বারা বর্তমানে বস্তু ইত্যাদির তাৎক্ষণিক সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ মনে হলেও পরিণামে বস্তু আদির সম্বন্ধ তৈরী হয় (২।৪২-৪৪)। দান করা কর্তব্য এই ভাব নিয়ে, প্রত্যুপকারের আশা না করে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে যদি দান করা যায়, তবেই বস্তু ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ ঘটে (১৭।২০)। একেই ত্যাগ বলে। ত্যাগে অনন্ত পুণ্য হয়, ত্যাগে মহান পবিত্রতা আসে এবং ত্যাগের দ্বারা তৎক্ষণাৎ যোগ সিদ্ধ হয় (৬।২৩)। যোগ দ্বারা সাংসারিক বিয়োগ হয় (৬।২৩) এবং ভোগ দ্বারা সাংসারিক যোগ হয় (৫।২২)।

অপরকে নিষ্কামভাবে সুখ দেওয়ার জন্য, হিত কর্ম করার জন্যই তাদের সঙ্গে যে সম্পর্ক করা হয় তাতে 'যোগ' হয়, কারণ এতে নিজের অনুরাগ, সুখ, আরাম, প্রভৃতি ত্যাগ করা হয়। অপরপক্ষে, কোন বস্তু বা ব্যক্তি থেকে সুখ পাওয়ার জন্য সম্পর্ক করলে, তাতে 'ভোগ' হয়। বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে অনুরাগপূর্বক সম্বন্ধ স্থাপন করলে পরমাত্মার নিত্য-সম্বন্ধের অনুভব হয় না।

বস্তু বা ব্যক্তি থেকে সম্পর্করহিত হলে একপ্রকার সুখ অনুভূত হয়। সাধক সেই সুখভোগে যদি লালায়িত না হয় তবে 'যোগ' হয়। কিন্তু যদি সেই সুখ সে ভোগ করে এবং তাতে খুশী হয়, তবে তাতে 'যোগ' না হয়ে 'ভোগ' হয়।

সাধক যদি ভোগবুদ্ধি সর্বতোভাবে ত্যাগ করে, তাহলে তার সব সাধনাতেই 'যোগ' (পরমাত্মার নিত্য অনুভব) হয়ে যায়। যেমন—কর্মযোগে শুধু সৃষ্টিচক্রের সীমা সুরক্ষিত রাখার জন্য, কেবল কর্তব্য-পরম্পরা রক্ষার জন্য নিষ্কামভাবে কর্তব্য-কর্ম করলে কর্মের প্রবাহ কেবল সংসারের দিকে যায় এবং কর্মগত সম্পর্করহিত হওয়ায়, ভোগাসক্তিরহিত হওয়ায় পরমাত্মার সঙ্গে স্বয়ং (স্বরূপে)-এর যোগ হয়ে যায় (৪।২৩)।

জ্ঞানযোগে সৎ-অসৎ-এর বিবেক-বিচার দ্বারা বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া ইত্যাদি পরিবর্তনশীল পদার্থ থেকে সাধক সম্বন্ধ-রহিত হয়, এর ফলে সে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থাৎ সাধক পরমাত্মার সঙ্গে নিজের স্বতঃসিদ্ধ অভিন্নতা অনুভব করে (১৩।২৩, ৩৪)।

ভক্তিযোগে সমস্ত ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদিকে ভগবানের বলে মেনে ভগবানকেই অর্পণ করা হয়, যার ফলে সকল ক্রিয়া পদার্থ ইত্যাদিতে সম্বন্ধ-রহিত হয়ে সাধক ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা

লাভ করে (৯।২৭-২৮)।

ধ্যানযোগে নিরন্তর পরমাত্মায় মন অভিনিবেশ করলে মন যখন সংসার থেকে বিরত হয়ে যায় তখন পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয় এবং নিজ স্বরূপ অনুভূত হয় (৬।২০, ২৮)।

অষ্টাঙ্গযোগে ক্রমশঃ যম, নিয়মাদি আট অঙ্গ নিষ্কামভাবে পালন করলে, তার দ্বারা সংসারের সম্বন্ধ রহিত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়ে যায় (৫।২৭-২৮)। কিন্তু তাতে সাধকের বিশেষ সাবধান থাকতে হয় যেন সে কোন সিদ্ধিতে আবদ্ধ না হয়ে যায়। যদি সে সিদ্ধিতে আবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে তাতে ভোগ হয়, যোগ হয় না।

তাৎপর্য এই যে, যে কোন পথেই সাধক বিচরণ করুক না কেন সাংসারিক ব্যবহারে অথবা সাধন অবস্থায়, সর্বদাই সাধককে সাবধান থাকতে হয়। কোন অবস্থাতেই বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, পদার্থ, যোগ্যতা, স্থিরতা ইত্যাদির থেকে সুখ গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ তার থেকে সুখ গ্রহণ করলে, সেটি ভোগরূপে পরিণত হয়, যোগ হয় না (১৪।৬)।

সাত্ত্বিক সুখ সান্নিধ্য (আসক্তির) দ্বারা, রাজসিক সুখ কর্মের আসক্তিতে এবং তামসিক সুখ নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদে আবদ্ধ করে (১৪।৬-৮)। সুতরাং সাধককে সাবধানে থাকতে হয় যেন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সুখে সে আবদ্ধ না হয়, সেগুলির সঙ্গে তার সম্বন্ধ না হয়, তাহলেই তার পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হওয়া সম্ভব।

(৪৭) গীতায় বন্ধ এবং মোক্ষের স্বরূপ

গুণসঙ্গো হি জীবানাং বন্ধনং কথ্যতে মহৎ।
গুণসঙ্গপরিত্যাগো জীবানাং মোক্ষ উচ্যতে॥

রন্ধনের জন্য পরিষ্কার বাসন উনুনে চাপালে তাতে বাইরে ধোঁয়া এবং ভিতরে খাদ্যপদার্থ আটকে যায়, এইভাবে সেই বাসনে বিজাতীয় দ্রব্যের (ধোঁয়া, অন্নের) সঙ্গে সম্পর্ক হয়। পরিষ্কার কাপড়ে ময়লা লেগে যায়, আয়নাতে ময়লা পড়ে, বাড়ী-ঘর অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। এইভাবে কাপড়, আয়না ও বাড়ী-ঘরের সঙ্গে বিজাতীয় দ্রব্যের সম্পর্ক হয়। কিন্তু বাসন-পত্র মাটি এবং জল দিয়ে ধুলে তা পরিষ্কার হয়ে যায় অর্থাৎ তাতে আটকে থাকা খাদ্যপদার্থ ও ধোঁয়া ধুয়ে ফেললে তা পুনরায় আগের মতো হয়ে যায়। কাপড়কে সাবান ও জল দিয়ে ধুলে তার ময়লা বেরিয়ে যায় এবং সেটি পরিচ্ছন্ন হয়ে নিজ স্বরূপ ফিরে পায়। আয়নাকে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছলে তার ময়লা চলে গিয়ে সেটি পরিষ্কার হয়ে যায়। বাড়ী-ঘর ঝাড়ু দিয়ে সাফ করলে ময়লা চলে যায় এবং সেটিও পরিষ্কার হয়ে যায়। তেমনি জীবাত্মা (স্বয়ং) প্রকৃতি এবং তার কার্য শরীর ইত্যাদির সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ পাতিয়ে নেয়, তার বশ হয়ে যায় এবং তাতে তার অশুদ্ধি আসে, একেই বলে বন্ধন। কিন্তু যখন সে প্রকৃতি এবং তার কার্যগুলির সঙ্গে পাতানো সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, তখন সে নির্মল হয় এবং তার নিজ স্বরূপবোধ জেগে যায়, একেই বলা হয় মোক্ষ।

বাসনে ধোঁয়া, ময়লা বা অন্ন না লাগলে যেমন বাসন পরিষ্কার থাকে, ময়লা না ধরলে যেমন কাপড় পরিচ্ছন্ন থাকে, আয়নাতে ময়লা না পড়লে যেমন আয়না স্বচ্ছ থাকে, বাড়ী-ঘরে নোংরা না জমলে যেমন পরিচ্ছন্ন থাকে, তেমনি জীবাত্মা যদি প্রকৃতির স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরকে না ধরে, তার সঙ্গে আত্মীয়তা না করে, তাকে নিজের না মনে করে, তবে সে মুক্তই থাকে। বাসন, কাপড়, আয়নার সঙ্গে জীবের এক বিশেষ তফাৎ এই যে, বাসন ইত্যাদি নিজে ময়লাকে ধরে না, বরং ময়লা আপনিই আসে এবং এতে লেগে যায়, অপরপক্ষে জীবাত্মা নিজে প্রকৃতির কার্য-শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে আপন বলে

মানে, যার ফলে সে বদ্ধ হয়ে যায়। সৎ-অসৎ, শুভ-অশুভ যোনিতে জন্মগ্রহণ গুণসমূহের সংসর্গেই হয় (১৩।২১)। সকল প্রাণী ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ থেকেই উৎপন্ন হয় (১৩।২৬), কিন্তু এই সম্পর্ক ক্ষেত্র দ্বারা হয় না, ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) নিজেই করে থাকে। ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাই বন্ধন এবং সম্পর্ক না করাই হল মোক্ষ।

ভগবান বলেছেন যে, আমার অপরা প্রকৃতি, পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি আট ভাগে বিভক্ত এবং এ থেকে ভিন্ন জীবরূপে হল আমার পরা প্রকৃতি। এই পরা-প্রকৃতি (জীবাত্মা)ই অহংকার-মমতা, কামনা, বাসনা ইত্যাদির দ্বারা এই জগতকে ধারণ করে আছে (৭।৪-৫)। জীবলোকে জীবভূত এই আত্মা আমারই সনাতন অংশ, কিন্তু তারা ভ্রমবশতঃ প্রকৃতিতে স্থিত মন-ইন্দ্রিয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়ে তাকে নিজের বলে মনে করে (১৫।৭)। এর তাৎপর্য হল, জীবাত্মা স্বরূপতঃ স্বতঃ অসঙ্গ, কিন্তু সে প্রকৃতির গুণ-কার্য ইন্দ্রিয়, শরীর প্রভৃতিকে স্বীকার করে নিয়ে তার সঙ্গে একাত্মতা করে, ফলে সে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, সম্পদকে যত বেশী আপন মনে করে, ততই সে বদ্ধ হতে থাকে, এদের বশীভূত হয়ে যায়। অপরদিকে যতই সে এদের সম্পর্ক ত্যাগ করতে থাকে, ততই সে মুক্ত হতে থাকে।

জীবাত্মা স্বয়ং প্রকৃতির সম্পর্ক ছাড়া কোন সাংসারিক কার্যাদি করতে অক্ষম। প্রকৃতির সম্পর্ক ছাড়া যখন সে কিছু করতেই পারে না তখন (প্রকৃতির সম্বন্ধ ছাড়া) এ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারে না। কিছু না করতে পারার কারণে তার ওপর কিছু করার কোন দায়িত্ব ন্যস্ত হয় না এবং কর্তৃত্বও আসে না। সেইজন্যই গীতায় বিভিন্ন জায়গায় একে অকর্তা বলা হয়েছে (১৩।২৯, ৩২-৩৩ প্রভৃতি)।

প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া যে সম্পর্ক, তা দূর করার তিনটি উপায় আছে—

১) কর্মযোগ—কর্মযোগের দ্বারা বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় এই যে, মানুষ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীর দিয়ে যা কিছু করে, তা যেন কেবল লোকসংগ্রহের জন্য, কর্তব্য-পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে, মানুষকে কু-পথ থেকে সৎপথে ধরে রাখার জন্য এবং প্রাণীমাত্রেরই হিত করার জন্য করে, নিজের জন্য নয়, (৩।৯, ২০)। এরূপ করলে তার অসঙ্গতা এবংনিজ স্বরূপবোধ জাগ্রত হয়।

২) জ্ঞানযোগ—জ্ঞানযোগ দ্বারা মুক্তি পাবার উপায় হলো এই যে, মানুষ সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্যকে বিবেক দ্বারা অসৎ(শরীর ইত্যাদি) থেকে নিজেকে পৃথক বলে যেন অনুভব করে। এইরূপ করলে সে মোক্ষ লাভ করে এবং বন্ধনমুক্ত হতে সক্ষম হয় (১৩।২৩, ৩৪)।

৩) ভক্তিযোগ—ভক্তিযোগ দ্বারা বন্ধন থেকে মুক্ত হবার উপায় এই যে, মানুষ নিজেকে এবং সংসারকেও যেন ভগবানের মনে করে, তাঁর প্রসন্নতার জন্যই যেন সমস্ত কার্য নিষ্পন্ন করে, সমস্ত কর্ম ভগবানেই অর্পণ করে। এইরূপ করার ফলে সে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় (৯।২৬-২৮)।

বাস্তবে বন্ধন নেই। যদি বন্ধন বলে কিছু থাকত, তবে তার কখনো অনস্তিত্ব হোত না—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (২।১৬), এবং জীব কখনো বন্ধন থেকে মুক্ত হোত না। প্রকৃতপক্ষে এই বন্ধন নিজেরই সৃষ্টি, বন্ধনকে ধরে রাখা হয়েছে। সুতরাং সে ইচ্ছা করলেই, বন্ধন মুক্ত হতে পারে। বন্ধন ত্যাগে সে স্বাধীন, সবল, সমর্থ, যোগ্য এবং অধিকারী। তাই গীতা বলে যে, অতি পাপী ব্যক্তিও জ্ঞান লাভ করতে পারে (৪।৩৬) এবং অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভাবে ভগবানের সাধন ভজন করতে পারে (৯।৩০)। সুতরাং যে কোন দেশ বা বেশভূষা, যে কোনও বর্ণের বা সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তি স্ত্রী বা পুরুষ যেই হোক না কেন তারাও সংসার-বন্ধনরহিত হয়ে মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারে।

সব সাধকই নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুযায়ী দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ, দ্বৈতাদ্বৈত ইত্যাদি কোন এক সম্প্রদায়ের মত অনুসারে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হয় এবং সেই ধারণানুসারেই তাঁর পরমাত্মতত্ত্ব, নিজ স্বরূপের অনুভব হয়। কিন্তু তাদের সকলেরই এই পরিবর্তনশীল জগৎ-সংসার থেকে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয়। সম্বন্ধ-রহিত হলে তাদের কাছে সংসারের কোন পৃথক সত্তা থাকে না ; কারণ বাস্তবে সংসারের পৃথক সত্তা নেই-ই।

ভগবান পরা (চেতন) ও অপরা (জড়) এই দুই-ই

নিজের প্রকৃতি বলে জানিয়েছেন। অপরা-প্রকৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল, তা কখনও একভাবে থাকে না এবং পরা-প্রকৃতি পরমাত্মার থেকে অভিন্ন, কাজেই তা ভিন্ন হয়ে লীলা করুক বা অভিন্ন অবস্থাতে থাকুক, পরমাত্মা ভিন্ন তার কোন আলাদা (স্বতন্ত্র) সত্তা হয় না। লীলার জন্যই তাকে দ্বৈতরূপে দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অদ্বৈতই থাকে, তার পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য যোগ থাকে। অর্থাৎ প্রেমরস আস্বাদনের জন্য পরা-প্রকৃতি পরমাত্মার থেকে পৃথক হয়ে লীলা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কখনই পৃথক নয়। এই বিষয়ে আচার্যদের মধ্যেও মতভেদ আছে। কোন কোন আচার্য অদ্বৈত মানেন, কোন আচার্য মানেন দ্বৈত, কেউ বা দ্বৈতাদ্বৈত, আবার কেউ বিশিষ্টাদ্বৈত ইত্যাদি। সেই আচার্যগণের মতানুসারে, মান্যতানুসারে, সম্প্রদায় অনুসারে সাধকদের সাধনভজন চলতে থাকে। অর্থাৎ কোন সাধক দ্বৈত মানেন এবং সেইভাবে চলেন, কোন সাধক অদ্বৈত পথে চলেন, কিন্তু বাস্তবিক অনুভব হলে প্রথমে যেরূপ মান্যতা ছিল সেরূপ আর থাকে না। সাধকদের প্রাথমিক যে ধারণা থাকে তার চেয়ে বিলক্ষণ তত্ত্ব প্রাপ্ত হন। যেমন—কেউ বদ্রীনারায়ণ যাওয়া স্থির করেছেন, তখন তিনি বদ্রীনারায়ণের বিষয়ে (শোনা কথা অনুযায়ী) অনেক প্রকার কল্পনা করতে থাকেন যে, সেখানে এইরূপ মন্দির হবে, মন্দিরের কাছেই অলকানন্দা নদী বইছে, বরফের পাহাড় কাছাকাছি, ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যখন সেখানে যান তখন দেখেন যা কল্পনা করেছিলেন তেমনটি নয়, উপরন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী। আমরা কোন মহাত্মার বিষয়ে শুনে তাঁর মহিমা গুণ জেনে এবং তাঁর শরীর এইরূপ, মাথায় সাদা চুল ইত্যাদি নানাবিধ কথা শুনে একরূপ ধারণা করে রাখলেও যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁর সঙ্গে আমাদের ধারণা মেলে না, উপরন্তু তাঁকে আরও বিশেষ মনে হয়। এইরূপ সাধক প্রথমে নিজ সম্প্রদায় অনুযায়ী, নিজ ধারণা অনুযায়ী সাধনা করেন ; কিন্তু প্রকৃত অনুভব ওই ধারণার থেকে ভিন্নই হয়। যদি আমরা প্রকৃত অনুভবকে নিজের পূর্বধারণা থেকে ভিন্ন বলে না স্বীকার করি, সাধকাবস্থায় যা ভেবেছিলাম ঠিক সেইরূপই মনে করি, তবে সাধক এবং সিদ্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য হতে পারে না। সাধক এবং সিদ্ধের ভিন্নতার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে সাধকের ধারণার মতো নয়। কারণ তত্ত্ব বর্ণনাতীত, তার বর্ণনা করা যায় না ; তার অনুভব হয় মাত্র। অতএব ঐ তত্ত্বের বর্ণনা, বিবেচনা করার সময় যেমন মান্যতা থাকে অনুভব হওয়ার পরে আর সেরূপ মান্যতা থাকে না। যেমন, কোন সাধক বিবেক-(প্রকৃতি-পুরুষের ভিন্নতা) এর প্রাধান্য বজায় রেখে সাধনা করেন ; কিন্তু যখন তাঁর বাস্তবিক তত্ত্ব অনুভূত হয়, তখন তাঁর কাছে প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না এবং বিবেকও প্রকৃত তত্ত্বে পরিণত হয়, তার নাম আর তখন 'বিবেক' থাকে না, 'বোধ' হয়ে যায়। এই বোধকেই প্রকৃতপক্ষে অনুভব বলা হয়। অর্থাৎ সাধনাবস্থায় সাধকের যে ধারণা থাকে, প্রকৃত তত্ত্বের অনুভব হলে তা আর থাকে না। কারণ সাধকের বিচার করার যে সমস্ত উপকরণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ ইত্যাদি থাকে তা সমস্তই অপরা-প্রকৃতির অংশ। তাই এ সমস্ত একত্র হয়েও প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব তা চিনতে পারে না।

যে সাধক দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ইত্যাদি কোন ভাবের প্রাধান্য রেখে ভজন করেন, তাঁর যখন (তত্ত্ব) অনুভব হয়ে যায়, তখন তাঁর আর এই সমস্ত ভিন্ন বোধের ভাব (আলাদা আলাদা করে) থাকে না। তাঁর ভগবানের সঙ্গে নিত্য যোগ হয়ে যায়। যেমন শ্রীরাম যখন বনবাসে চলে গেলেন তখন তাঁর মা কৌশল্যা সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগ্নি, সত্য করে বল, রাম বনে চলে গেছে, না এখানেই আছে ? যদি বনে চলে গিয়ে থাকে তাহলে সে আমার দৃষ্টিগোচরে আছে কেমন করে, আর বনে যদি গমন না করে থাকে, তবে আমার হৃদয় এত ব্যাকুল কেন ? এতে বোঝা যাচ্ছে মাতা কৌশল্যার শ্রীরামের সঙ্গে নিত্য যোগ রয়েছে। নিত্যযোগ কখনও স্মৃতিরূপে হয় এবং কখনও স্বরূপে হয়। 'বিয়োগ (বিচ্ছেদ) হবে' এইরূপ ভাব থাকলে 'যোগে বিয়োগ' হয় ; এবং বিয়োগেও সর্বদা প্রেমাস্পদকে সামনে দেখতে পাওয়া যায়—এই হলো 'বিয়োগে-যোগ'। এইরূপ যোগে-বিয়োগ এবং বিয়োগে-যোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। যোগ এবং বিয়োগের ধারায় প্রেম প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোন কোন আচার্য যোগকে, আবার কোন কোন আচার্য বিয়োগকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

যিনি অদ্বৈতমত মানেন, তাঁর যে আনন্দপ্রাপ্তি হয়, তা অখণ্ড (শান্ত) হয়। আবার যাঁরা দ্বৈতবাদী, প্রেমকে মানেন, তাঁদের যে আনন্দপ্রাপ্তি হয় তা অনন্ত (প্রতিক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) হয়। সেই প্রেমের আনন্দতেই যোগে বিয়োগ এবং বিয়োগে যোগ—এই প্রবাহ চলে, যার কখনো অন্ত হয় না।

প্রশ্ন— মুক্তি পাঁচ প্রকারের কি কি ?

উত্তর—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য (একত্ব)—এই পাঁচ প্রকারের। ভগবদ্ধামে বাস করাকে **'সালোক্য'** বলে। ভগবদ্ধামে এক বিশেষ আনন্দ থাকে, সেখানে সুখ বা দুঃখের মিলিত সুখ নেই বরং সুখ-দুঃখের অতীত যে আনন্দ, তাই আছে। সালোক্যের পরে যে মুক্তি তাকে বলে **'সার্ষ্টি'**। এই মুক্তির দ্বারা ভক্তের ভগবদ্ধামে ভগবানের সমান ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ভগবানের যেমন ঐশ্বর্য, তেমনি ঐশ্বর্য ভক্ত লাভ করে। জগৎ-সংসার উৎপন্ন করা বা সংহার করা ব্যতীত আর সমস্ত ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য— এই সমস্তই ভগবানের সঙ্গে সমভাবে ভক্ত প্রাপ্ত হয়। সার্ষ্টির পরে যে মুক্তি তাকে বলে-**'সামীপ্য'**। এই মুক্তির দ্বারা ভক্ত ভগবদ্ধামে থেকে ভগবানের সমীপে (নিকটে, সন্নিধানে) বাস করে এবং ভগবানের সঙ্গে মা-বাবা, সখা, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি সম্পর্ক করে থাকে। সামীপ্যর পরেও মুক্তি আছে **'স্বারূপ্য'**। এই মুক্তির সহায়ে ভক্তের অবস্থা ভগবানের সমান হয়ে যায়। ভগবানের বক্ষঃস্থলস্থিত শ্রীবৎস (লক্ষ্মীদেবীর আবাস), ভৃগুলতা (শ্রীভৃগুর চরণ-চিহ্ন) এবং কৌস্তুভমণি—এই তিনটি বাদে শেষগুলি অর্থাৎ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি সমস্ত চিহ্নই ভক্তেরও হয়ে যায়। সারূপ্যেরও পরের মুক্তি হল-**'সাযুজ্য'**। এর অর্থ হচ্ছে একত্ব। এই মুক্তিতে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়, অর্থাৎ সে আর তার পৃথক্ অস্তিত্ব আছে বলেই মনে করে না।

উপরিউক্ত পাঁচ প্রকার মুক্তি, সগুণ-সাকার যারা মানে তাদের হয়। এই পাঁচ মুক্তির মধ্যে 'সাযুজ্য' (একত্ব) মুক্তিকে নির্গুণ-নিরাকারবাদিগণ ও অদ্বৈত-সিদ্ধান্তপথে বিচরণকারিগণও মানতে পারেন।

প্রেমী ভক্ত ভগবানের সেবা ছেড়ে এই পাঁচ প্রকার মুক্তি ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত হলেও গ্রহণ করতে চায় না—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।১৩)

কারণ সে কেবল ভগবানকে সুখ দিতে চায়। সংসারে জন্ম-মরণ হোক, সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি না হোক, এসবের সে পরোয়া করে না। বন্ধনে দুঃখ এবং মুক্তিতে সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু ভগবানের সেবা যারা করে তারা নিজ সুখ-দুঃখের পরোয়া করে না, বরং ভগবানের প্রসন্নতাপ্রাপ্তিই তাদের উদ্দেশ্য থাকে।

বদ্ধ অবস্থায় আমরা ব্রহ্ম, জীব ইত্যাদিকে বিশেষ রীতিতে দেখি এবং প্রকৃতিকেও কার্যকারণরূপে বিশেষভাবে দেখি। সাধনা করতে করতে সাধকের ব্রহ্ম, জীব ইত্যাদির বিষয়ে বিশেষরকম অনুভব হয়। সিদ্ধাবস্থায় আরও বেশী অনুভব হয়। অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে যে মোক্ষ হয়, তাতে জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হওয়াই প্রাধান্য পায় এবং ভক্তি দ্বারা যে মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে, তাতে চিন্ময় তত্ত্বের সঙ্গে ঐক্যই প্রাধান্য পায়।

(৪৮) গীতার সমত্ব

সিদ্ধসাধকয়োঃ প্রোক্তা গীতায়াং সমতা দ্বিধা।
মানসী সাধকানাং চ সিদ্ধানাং সহজা স্মৃতা॥

গীতায় কোন প্রভাবশালী লক্ষণ যদি থাকে তা হল সমত্ব। সেই সমত্ব বা সাম্যভাব কোন সাধনা দ্বারা লাভ হয়ে গেলেই গণ্ডী পার হওয়া যায়। সাধকে সমত্ব এলে গীতা অন্য লক্ষণ নিয়ে বিচার করে না ; কারণ সমত্ব

সাক্ষাৎ পরমাত্মারস্বরূপ—**'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'** (৫।১৯), **'সমোঽহং সর্বভূতেষু'** (৯।২৯) এবং সমত্বই সাধনার পূর্ণতা। সুতরাং সমত্ব এলে অন্যান্য লক্ষণ আপনিই এসে পড়ে। যদি কোন মানুষের মধ্যে সমত্ব না থাকে, অপর লক্ষণ বহুল পরিমাণে থাকে তবে সে অপূর্ণ, তার পূর্ণতা নেই। সমত্ব ব্যতীত অন্য সব লক্ষণ—বিদ্যা, যোগ্যতা, সম্মান, সুস্থতা, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির কোন মূল্য নেই, তা সবই অসমত্বের বিষয়। সমত্ব মানুষমাত্রেই স্বাভাবিকভাবে থাকে। অসমত্ব মানুষের নিজের সৃষ্ট। সুতরাং অসমত্ব কৃত্রিম, প্রাকৃত, তা স্থায়ী নয় ; কারণ তা অসৎ (শরীর ইত্যাদির)-এর সংস্পর্শে জাত।

প্রত্যেক কাজেরই আরম্ভ থাকে এবং শেষ থাকে। কর্মফলেরও সংযোগ এবং বিয়োগ হয়ে থাকে, কিন্তু স্বরূপ (স্বয়ং) যেমন তেমনি থাকে। এটি সকলের অনুভবগম্য। সংযোগ বা বিয়োগ ব্যক্তি, ক্রিয়া বা পদার্থের হয় কিন্তু স্বরূপ-এর কোন সংযোগ বা বিচ্ছেদ হয় না, যেমন তেমনি থাকে। সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ হওয়া অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ যার সংযোগ হয় তার বিচ্ছেদ হবেই। কিন্তু যার বিচ্ছেদ হয়েছে তার যে সংযোগ হবেই—এ নিয়ম নেই। সুতরাং সংযোগ অনিত্য আর বিচ্ছেদ নিত্য। সেইজন্য মানুষ যদি বিচ্ছেদের দিকে সদা দৃষ্টি রাখে তবে তার মধ্যে কখনো অসমত্ব আসতে পারে না। কারণ অসমত্ব হল আগন্তুক, কিন্তু সমত্ব তার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ। এই সমতার নাম 'যোগ' (২।৪৮)।

পরমাত্মা হচ্ছেন সম। তিনি অ-সম হতেই পারেন না। অপরপক্ষে প্রকৃতি অ-সম, সুতরাং পরমাত্মার দিকে যার দৃষ্টি থাকে, সে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। অর্থাৎ সর্বত্র সমরূপ, পরমাত্মরূপ দেখাই সমদৃষ্টি এবং প্রকৃতি বা তার কার্য (শরীর, সংসার) ইত্যাদি দেখা অসমদৃষ্টি। প্রকৃতি এবং তার কার্যে সমদৃষ্টি কখনও হতেই পারে না। প্রকৃতির দিকে যাদের দৃষ্টি, তারা কখনও সমদর্শী হতে পারে না এবং পরমাত্মার দিকে যারা দৃষ্টি রাখে, তারা কখনও অসমদর্শী হয় না। তাই গীতায় পরমাত্মার দিকে দৃষ্টি যারা রাখে তাদের **'সমদর্শিনঃ'** (৫।১৮) **'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ'** (১২।৪) ইত্যাদি পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

পরমাত্মার সঙ্গে স্বয়ং-এর নিত্য যোগ আছে এবং মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে স্বয়ং-এর নিত্য বিয়োগ (বিচ্ছেদ) (৬।২৩)। পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য যোগ থাকলেও, যতক্ষণ স্বয়ং সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সেই নিত্য যোগের অনুভূতি হয় না। কিন্তু যখন নিত্যযোগের অনুভূতি হয়ে যায় অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ হয়ে যায়, তখন সেই যোগ অর্থাৎ সমত্বের বোধ তার মন, বুদ্ধি ও অন্তঃকরণেও নেমে আসে (৫।১৯)। তখন সে সুখ-দুঃখ ইত্যাদিতে সম হয়ে যায় (১৪।২৪-২৫) এবং তার সমত্বসম্পন্ন দৃষ্টি পুণ্যাত্মা-পাপাত্মা ইত্যাদি ব্যক্তির প্রতিও এসে যায় (৬।৯)। সেই সমতা তার ব্যবহারেও এসে যায় এবং তার ব্যবহারে কোন আসক্তি বা দ্বেষ থাকে না (৫।১৮)। পরে নানা পদার্থের প্রতিও তার সমভাব আসে অর্থাৎ কোনো পদার্থে তার প্রিয়-অপ্রিয় ভাব থাকে না (৬।৮)। অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বের অনুভবের ফলে যোগে তার সর্বত্র সমভাব হয়ে যায়। বর্ণ, আশ্রম, পরিস্থিতি, সাধন ইত্যাদিতে তার ব্যবহার যথাযোগ্য হয়, কিন্তু হৃদয়ে অনুরাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক এসব আর থাকে না।[১]

সমতা দুই প্রকারের—সাধনরূপা এবং সাধ্যরূপা। সাধনরূপা সমতা অন্তঃকরণের হয় এবং সাধ্যরূপা সমতা পরমাত্মতত্ত্বের হয়। একে যথাক্রমে সাধকের সমতা ও সিদ্ধের সমতাও বলা যায়।

১) সাধকের সমতা (সমভাব)—কর্মযোগী সাধক সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম থেকে কর্ম করেন (২।৪৮)। জ্ঞানযোগী সাধকের সৎ ও অসৎ-এর বিবেচনাই মুখ্যরূপে থাকে। সৎ-এর বিয়োগ নেই এবং অসৎ কখনো নিত্য বা চিরস্থায়ী হয় না। সুতরাং জ্ঞানযোগী সত্য-স্বরূপে সর্বদা সমভাবে বিরাজ করে (২।১৫)। ভক্তিযোগী সাধক ভগবন্নিষ্ঠ হয়। সে ভগবানের ইচ্ছা-অনিচ্ছাতে সর্বদাই প্রসন্ন থাকে। সেইজন্য সাংসারিক পদার্থ, বস্তু বা পরিস্থিতিজনিত সংযুক্তি বা বিযুক্তিতে তার উপর কোন প্রভাব পড়ে না। তার কেবল ভগবানের সঙ্গেই সম্পর্ক থাকে। এরূপ ভক্তকে ভগবান স্বয়ং

---

[১]বিস্তারিতভাবে জানতে হলে গীতার 'সাধক-সঞ্জীবনী' নামক টীকার পঞ্চম অধ্যায়ের আঠারো সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সমত্ববোধ প্রদান করেন (১০।১০)।

যদি কর্মযোগীর সমত্ববোধ না আসে, তাহলে বুঝতে হবে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে তার গুরুত্বগত ভেদবুদ্ধি রয়েছে। যদি জ্ঞানযোগীর সমত্ববোধ না আসে, তাহলে বুঝতে হবে পদার্থের প্রতি তার গুরুত্বগত ভেদবুদ্ধি আছে। যদি ভক্তিযোগীর সমত্ববুদ্ধি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে ভগবানের কৃপার দিকে তার দৃষ্টি নেই। এর অর্থ এই বোঝায় যে, অনিত্য বস্তুর প্রতি আগ্রহ অন্তঃকরণে থাকলে স্বাভাবিকভাবে সমত্ব অনুভূত হয় না। সেই আগ্রহ চলে গেলেই সমত্ব এসে যায়।

এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, সম-ভাবের সঙ্গে মানুষের নিত্যযোগ আছে। কেবলমাত্র অসৎকে গুরুত্ব দেওয়াতেই অ-সমতা জন্মায়। সুতরাং মানুষের অসৎকে (অনিত্যকে) গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

২) সিদ্ধের সমতা (সাম্য)—সিদ্ধ কর্মযোগী (৬।৮-৯), সিদ্ধ জ্ঞানযোগী (১৪।২৪) এবং সিদ্ধ ভক্তিযোগী (১২।১৮-১৯) এই তিনেই সমত্ববুদ্ধি স্বাভাবিকভাবে থাকে।

এর তাৎপর্যরূপে বলা যায় যে, সাধক যে কোন পথেই চলুক না কেন, যতক্ষণ অনুকূল-প্রতিকূল, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির কিছুমাত্র প্রভাব তার ওপর পড়ে এবং সে তাতে বিচলিত হয়, ততক্ষণ সাধকের সাধনরূপ সমতা থাকে ; কিন্তু যখন তার অনুকূল-প্রতিকূল জ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও সে তাতে প্রভাবিত হয় না, তখন সাধ্যরূপ সমতা তাতে অটলরূপে বিরাজ করে। সেই সাধ্যরূপ সমতা প্রাপ্ত হলে অন্তঃকরণে স্বতঃই সমত্ববুদ্ধি জাগ্রত হয় এবং অন্তঃকরণের সমতা দ্বারা বোঝা যায় যে, যোগীর সাধ্যরূপ সমতা লাভ হয়েছে (৫।১৯)।

(৪৯) গীতায় ক্রিয়া, কর্ম এবং ভাব

কর্তৃত্বভাবেন সকামভাবাৎ সর্বাঃ ক্রিয়া বন্ধনকারিকাশ্চ।
কর্তৃত্বহীনা অপি কামহীনাঃ সর্বাঃ ক্রিয়া নিষ্ফলতাং প্রয়ান্তি॥

জড়ের মধ্যে (প্রকৃতিতে) কেবল পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া আছে, কর্ম নেই এবং চেতন নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ তাতে ক্রিয়াও নেই, কর্মও নেই। কিন্তু যখন চেতন ক্রিয়াশীল প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক যুক্ত করে প্রকৃতির ক্রিয়া নিজের মধ্যে আরোপিত করে নেয় অর্থাৎ 'আমি করি'—এইরূপ অহংকার ভাব করে (৩।২৭), তখন প্রকৃতির ক্রিয়া তার কর্মরূপে প্রতিভাত হয়, যা শুভ-অশুভ ফল দান করে। ক্রিয়া কখনো বন্ধনের কারণ হয় না, কেবল অহং-কর্তৃত্ব-পূর্ণ ক্রিয়াই বন্ধনের কারণ হয়। সেইজন্যই গীতায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তির মধ্যে অহং-কর্তৃত্ব ভাব ও ফলেচ্ছা নেই, সে যদি সমস্ত প্রাণীকে নিধনও করে তাহলেও কাউকে নিধন করাও হয় না বা তার দ্বারা সে আবদ্ধও হয় না (১৮।১৭)। কারণ তার দ্বারা শুধু ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হয়। যেমন, গঙ্গাজলে অনেকের পালন-পোষণ হয় ; ব্রাহ্মণ, গাভী ইত্যাদি সকলেই সেই জল পান করে, কিন্তু গঙ্গার তাতে কোন পুণ্য হয় না। আবার গঙ্গার প্রবাহে অনেক জীব ভেসে যায়, মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাতেও গঙ্গার কোন পাপ হয় না। কারণ গঙ্গার কখনও অহং-কর্তৃত্ব ভাব থাকে না ও গঙ্গা মনে করে না যে, আমিই সকলকে পালন-পোষণ করছি। সুতরাং তার দ্বারা ক্রিয়ামাত্রই হয়, কর্ম বন্ধন হয় না। সূর্য উদিত হলে বেদ পাঠ হয়, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু তার দ্বারা সূর্যের কোন পুণ্য হয় না। আবার সূর্য উদিত হলে শিকারী পশু শিকার করে, তাতেও সূর্য পাপভাগী হয় না। কারণ 'আমার দ্বারা আলো প্রকাশিত হয়' এই অহং-কর্তৃত্ব ভাব সূর্যে না থাকায় তার দ্বারা কেবল ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম হয় না। এইরূপই জগতে কত চুরি হয়, ডাকাতি হয়, হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়, কিন্তু তাতে আমাদের অনুমোদন না থাকায়,

সেগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক না থাকায় সেইসব কার্যগুলি আমাদের নিকট ক্রিয়ামাত্র, তাতে আমাদের কোনপ্রকার বন্ধন হয় না। এইরূপ আমাদের শরীর, মন, ইন্দ্রিয় দ্বারা যে ক্রিয়াসকল ঘটে, তাতে যদি আমাদের কর্তৃত্ব-ভাব এবং ফলাসক্তি না থাকে, তাহলে তা আমাদের কর্মবন্ধনের কারণ হয় না, তার দ্বারা কোন ফলপ্রাপ্তিও হয় না এবং জন্ম-মৃত্যু আবর্তনের কারণ ঘটে না। কিন্তু যদি সেই ক্রিয়ায় আমাদের কর্তৃত্ব-ভাব ও ফলাসক্তি আসে তবে সেই ক্রিয়া কর্মে রূপান্তরিত হয় এবং বন্ধনকারক হয়ে যায় (৫।১২)।

মানুষ বাল্যাবস্থা থেকে যুবকে পরিণত হলে তার কোন পাপ বা পুণ্য হয় না, তাতে ক্রিয়ামাত্র ঘটে। শরীরে প্রাণ, অপান ইত্যাদি বায়ুর দ্বারা যে ক্রিয়াগুলি হয়, তার দ্বারা কোন পাপ বা পুণ্য অর্জিত হয় না। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত কাজ স্বাভাবিকভাবে হয় তাতেও পাপ বা পুণ্য হয় না। কিন্তু যখন আমরা সেই ক্রিয়াগুলিতে নিজের কর্তৃত্ব-ভাব আরোপ করি তখন তা কর্ম হয়ে ওঠে। যেমন শ্বাস গ্রহণ একটি ক্রিয়া, কিন্তু কেউ যখন প্রাণায়াম করে সেটি তখন কর্ম হয়ে ওঠে এবং তা ফল প্রদানকারী হয় (৪।৩০)।

বাস্তবে সকল ক্রিয়াই প্রকৃতির দ্বারা হয় বা প্রকৃতিতে অনুষ্ঠিত হয় (১৩।২৯) ; সমস্ত ক্রিয়া প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা হয় (৩।২৭-২৮) ; তথা সমস্ত ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংঘটিত হয় (৫।৯)। এর তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতি, প্রকৃতির কার্য গুণ এবং গুণের কার্য ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা ক্রিয়ামাত্রই অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম নয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে কর্মের সিদ্ধিতে অধিষ্ঠান, কর্তা ইত্যাদি পাঁচটি কারণ বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে কর্তা তাকেই বলা হয়েছে যার অন্তঃকরণ অহংকারে মোহিত। এইরূপ কর্তার দ্বারাই কর্মসংগ্রহ হয় অর্থাৎ তার কর্ম বন্ধন-কারক হয়। কিন্তু মানুষ যেখানে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে না অর্থাৎ নিজের মধ্যে অকর্তৃত্ব অনুভব করে, সেখানে ক্রিয়ামাত্র অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম হয় না (১৩।২৯)।

কর্তার ভাব অনুযায়ী ক্রিয়া সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক কর্মরূপে প্রতিভাত হয় অর্থাৎ কর্তা সাত্ত্বিক হলে কর্মও সাত্ত্বিক হয় ; কর্তা রাজসিক হলে কর্মও রাজসিক হয় এবং কর্তা তামসিক হলে কর্মও তামসিক হয় (১৮।২৩-২৫)। কিন্তু মানুষ যখন ত্রিগুণের অতীত হয়ে যায় তখন তার দ্বারা শুধু ক্রিয়া হয়, কর্ম নয়।

আমরা যা কিছু দেখি-শুনি, তা যদি নির্লিপ্ততা সহকারে করি তাহলে সেই দেখা বা শোনা আমাদের কাছে ক্রিয়ারূপে থাকে, বন্ধনকারক হয় না। কিন্তু সেই দেখা শোনাই যদি আসক্তি সহকারে করি তবে তা বন্ধনরূপ কর্ম হয়ে যায়। এই কথা সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার বিষয়েই বোঝা উচিত।

কর্মযোগী সাধক শুধু লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করেন, নিজের জন্য কিছু করেন না ; সুতরাং এই কর্ম ক্রিয়ামাত্র হয়, যা তাঁকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে (৩।২০)।

জ্ঞানযোগী সাধক নিজেকে অকর্তা অনুভব করেন, সুতরাং তাঁর দ্বারা ক্রিয়া মাত্রই হয় (১৩।২৯)।

ভক্তিযোগী সাধক কেবলমাত্র ভগবানের প্রসন্নতার নিমিত্ত কর্ম করেন (১১।৫৫ ; ১২।১০)। সুতরাং সেই ক্রিয়াগুলি ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধিত হওয়ায় কর্মরূপে প্রকাশিত হয় না। কেবল তাই নয়, তাঁর ক্রিয়াতে দিব্যতা এসে যায় এবং সেই ক্রিয়া দ্বারা জগতের হিত সাধিত হয়।

ধ্যানযোগী, লয়যোগী, হঠযোগী ইত্যাদি কোনপ্রকার সাধকই যদি প্রকৃতির ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হন, তবে তাঁদের দ্বারা কেবল ক্রিয়াই হয়, কর্ম হয় না।

এর তাৎপর্য এই যে, কর্মযোগীর নিষ্কামভাব হলে, জ্ঞানযোগীর প্রকৃতি এবং তার কার্যের ক্রিয়াদিতে পৃথক্‌ভাব হলে এবং ভক্তিযোগীর ভগবানের প্রসন্নতার ভাব হলে তাদের দ্বারা ক্রিয়ামাত্র হয়, কর্মবন্ধন ঘটে না। জ্ঞানী মহাপুরুষ যা কিছু করেন, তা তাঁর নিজ শুদ্ধ রাগ-দ্বেষহীন স্বভাব অনুযায়ীই করে থাকেন, সুতরাং তা তাঁর কর্মবন্ধন ঘটায় না, কেবল ক্রিয়ামাত্র হয় (৩।৩৩)।

(৫০) গীতায় কর্মের ব্যাপকতা

কায়েন মনসা বাচা যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।
শুভাশুভং চ তৎসর্বং কর্ম বৈ গীতয়া মতম্॥

পরমাত্মা এবং পরমাত্মার শক্তি প্রকৃতি—এই দুটি বিদ্যমান। এর মধ্যে পরমাত্মা সবসময় এক রূপ, এক রস অবস্থায় থাকেন, তাঁর কখনও পরিবর্তন হয় না, কিন্তু প্রকৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল, তা কখনও পরিবর্তন রহিত থাকে না[১]। এই প্রকৃতিতে যা কিছু পরিবর্তন হয় তা সমস্তই 'ক্রিয়া' এবং ক্রিয়ারই পুঞ্জীভূত রূপ হলো পদার্থ। প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে ঘটিত ক্রিয়ার সঙ্গে যখন অহং-কর্তৃত্ব বোধ এসে যায় তখন তার সংজ্ঞা হয় 'কর্ম'। এই কর্ম কায়িক হোক বা বাচিক অথবা মানসিক—তা ইষ্ট-অনিষ্ট ও মিশ্রিত ফলদানকারী রূপে প্রতিভাত হয় (১৮।১২)। ওইসকল কর্ম করার যে ভাব তা কর্তার মধ্যেই থাকে। এই 'কর্ম' এবং 'ভাব' শুভ ও অশুভ দুই প্রকারের। 'শুভ' কর্ম এবং 'ভাব' মুক্তিদানকারী এবং 'অশুভ' কর্ম ও 'ভাব' পতনকারী। এই কর্ম এবং ভাবকে ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে 'কর্ম' এবং 'গুণ' নামে অভিহিত করেছেন এবং এর দ্বারাই চার বর্ণের রচনার কথা জানিয়েছেন। অর্থাৎ শুভ এবং অশুভ ক্রিয়াকে 'কর্ম' বলা হয়, 'গুণ' বলা হয় শুভ-অশুভ ভাবকে। এই ক্রিয়া এবং ভাবগুলিকে নিয়ে চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে।

ভগবান চার বর্ণের যে লক্ষণ (চিহ্ন) বলেছেন, সে সবগুলিকে 'স্বভাবজ কর্ম' নামে তিনি অভিহিত করেছেন। এতে ব্রাহ্মণের শম, দম, তপ, শুদ্ধি ইত্যাদি নয়টি গুণ ও ক্ষত্রিয়ের শৌর্য, তেজ, ধৃতি ইত্যাদি সাতটি গুণকে কর্ম বলা হয়েছে এবং বৈশ্যের কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য এই তিন কর্ম এবং শূদ্রের পরিচর্যাত্মক কর্মগুলিকেও 'কর্ম' নামেই অভিহিত করা হয়েছে। বৈশ্য ও শূদ্রের কর্মগুলিকে কর্ম বলাই ঠিক, কারণ এগুলি কর্মই, কিন্তু ভগবান ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের গুণগুলিকেও কর্ম নামে অভিহিত করেছেন। গুণগুলিকে কর্ম নামে অভিহিত করার তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক করে মানুষ যা কিছু করে, তা সবই কর্ম অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করলে ভাব, ক্রিয়া ইত্যাদি সবই কর্ম নামে পরিচিত হয় যা জন্ম-মৃত্যু চক্র এবং নানাপ্রকার অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রদান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতি থেকে সম্বন্ধ ত্যাগ করে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, তার শরীর দ্বারা কর্ম হলেও সেইকর্মকে 'অকর্ম' বলা হয়। নিজ স্বরূপে স্থিত থাকা 'অকর্ম' এবং অকর্মে স্থিত থেকে শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা যে কর্ম হয়, সে সমস্ত কর্মই 'অকর্ম'। ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের আঠারো সংখ্যক শ্লোকে এর বর্ণনা করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম অনুভব করেন, তিনি যোগী, তিনি বুদ্ধিমান এবং তাঁর আর কোন কর্ম বাকী থাকে না।

এই বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে মানুষ যা কিছু করে, তা সবই বন্ধনরূপ কর্ম। সে স্থূল-শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে স্থূল-ক্রিয়া করে এবং সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ধ্যান, চিন্তা ইত্যাদি করে আর কারণ-শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে সমাধিগত হয়। গীতা অনুযায়ী এ সমস্তই 'কর্ম', কারণ এইসবের সঙ্গেই প্রকৃতির সম্বন্ধ আছে। ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে বলেছেন যে, মানুষ তার শরীর, মন এবং বাক্য দ্বারা যা কিছু করে তা সবই 'কর্ম'। চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশ

[১]যদিও প্রকৃতিকে সর্গ এবং মহাসর্গের অবস্থায় সক্রিয় তথা প্রলয় এবং মহাপ্রলয়ের অবস্থাতে নিষ্ক্রিয় বলা হয়, বাস্তবে এই নিষ্ক্রিয় অবস্থা সক্রিয় অবস্থারই সাপেক্ষে সূচিত হয়। বাস্তবে প্রকৃতি কখনোই নিষ্ক্রিয় থাকে না, এতে সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তন হতেই থাকে, সেইজন্যই প্রলয় ও মহাপ্রলয়ের পরে সর্গ এবং মহাসর্গ হয়। যখন প্রলয় এবং মহাপ্রলয় হয় তখন প্রলয় ও মহাপ্রলয়ের মধ্য পর্যন্ত প্রকৃতি প্রলয় ও মহাপ্রলয়ের দিকে যেতে থাকে এবং অর্ধেক প্রলয় ও মহাপ্রলয়ের পর প্রকৃতি সর্গ ও মহাসর্গের দিকে অগ্রসর হয়।

থেকে ত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত যে সমস্ত যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, সে সমস্তকে ভগবান কর্মোদ্ভূত বলে জানিয়েছেন—'**কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান্**' (৪।৩২)।

কর্ম থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ফলাসক্তি ত্যাগ করে যদি শুধু যজ্ঞ অর্থাৎ কর্তব্য-পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার জন্যই কর্ম করা যায়, তবে তা 'কর্মযোগ' হয় (৩।৯ ; ১৮।৯)। বিবেক দ্বারা কর্ম থেকে সম্পর্ক ছেদ করলে, তা জ্ঞানযোগ হয় (১৩।২৩, ৩৪) এবং কর্ম যদি ভগবানে অর্পণ করা হয় তাহলে তা 'ভক্তিযোগ' নামে অভিহিত হয় (৯।২৭ ; ১২।৬)।

(৫১) গীতায় 'যজ্ঞ' শব্দের ব্যাপকতা

গীতায়া যজ্ঞশব্দস্তু কর্তব্যকর্মবাচকঃ।
পালনীয়স্ততো যজ্ঞো নিষ্কামৈর্মানবৈঃ সদা॥

গীতার শ্লোক ধরে যদি বিচার করা যায় তাহলে দেখা যায় যে, নিষ্কামভাবে করা শাস্ত্রবিহিত সমস্ত শুভকর্মই '**যজ্ঞ**' নামে অভিহিত। যজ্ঞের বিশেষ বর্ণনা চতুর্থ অধ্যায়ে আছে। সেখানে ভগবান বলেছেন যে, শুধু যজ্ঞের জন্য মানুষ যে কর্ম করে, তাতে তার সমস্ত কর্মের বন্ধনকারকত্ব নষ্ট হয়ে যায়—'**যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে**' (৪।২৩)। এই কথাই ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকে অন্যভাবে বলেছেন যে, যজ্ঞের অতিরিক্ত যে সমস্ত কর্ম করা হয়, তা মনুষ্যের বন্ধনের কারণ '**যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ**'। চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশ থেকে ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের বর্ণনা করেছেন—১) ব্রহ্মযজ্ঞ, ২) ভগবৎ-অর্পণরূপ যজ্ঞ, ৩) অভিন্নতারূপ যজ্ঞ, ৪) সংযমরূপ যজ্ঞ, ৫) বিষয়হবনরূপ যজ্ঞ, ৬) সমাধিরূপ যজ্ঞ, ৭) দ্রব্যযজ্ঞ, ৮) তপোযজ্ঞ, ৯) যোগযজ্ঞ, ১০) স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ, ১১) প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ এবং ১২) স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ। আবার একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যজ্ঞ থেকে প্রাপ্ত পরিণামরূপ অমৃত যে ব্যক্তি অনুভব করে, সে সনাতন পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, '**যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্**' (৪।৩১)। এই কথাই ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে '**যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ**' শ্লোকাংশে বলেছেন যে, 'যজ্ঞাবশেষ যারা গ্রহণ করে তারা শ্রেষ্ঠ মানুষ, এবং তারা সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।' এইভাবে তৃতীয় অধ্যায়ের নবম এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্থ অধ্যায়ের তেইশ এবং একত্রিশ সংখ্যক—এই চারটি শ্লোকে যজ্ঞের ফল বলা আছে—সমস্ত পাপের নাশ, সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ এবং পরমাত্মতত্ত্বপ্রাপ্তি। সুতরাং পরমাত্ম তত্ত্বপ্রাপ্তির যত উপায় আছে তা সমস্তই গীতার যজ্ঞ শব্দের অন্তর্গত।

গীতার 'যজ্ঞ' শব্দ এতো ব্যাপক যে যজ্ঞ, দান, তপ, তীর্থ, ব্রত, হোম ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মই এর অন্তর্গত হয়। চতুর্থ অধ্যায়ের বত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে বেদের বাণীতে বহুপ্রকার যজ্ঞের বিস্তারিত বর্ণনা আছে —এই বলে ভগবান দহরাদির উপাসনাকেও 'যজ্ঞ' শব্দে সমাবিষ্ট করেছেন, এর বর্ণনা গীতায় নেই কিন্তু উপনিষদে আছে। ভগবান আরও বলেছেন যে—এই সমস্ত যজ্ঞ-গুলিকে তুমি কর্মোদ্ভূত বলে জান এবং এইপ্রকার জানলে মুক্তিলাভ করবে '**এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে**' (৪।৩২)।

চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য' '**জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্**'। নিজ কর্মের দিব্যতার বর্ণনা ভগবান ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শ্লোকে করেছেন। এতে ভগবান বলেছেন যে—আমি সৃষ্টি-রচনাকারী ইত্যাদির কর্তা হলেও, আমাকে তুমি অকর্তা বলে জানবে, কারণ কর্মফলে আমার কোন স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমাকে বাঁধতে পারে না। এইরূপে যারা আমাকে তত্ত্বসহ জানে তারাও কর্ম দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়

ফলাসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করে, সেও কর্ম দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। এইভাবে ভগবান নিজের কর্মের দিব্যতা সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে, কর্মের দ্বারা বন্ধন হয়, সেই কর্মই মুক্তিদায়ী হয়ে ওঠে—এই হচ্ছে কর্মের দিব্যতা। পনেরো সংখ্যক শ্লোকে ভগবান আবার **'এবং জ্ঞাত্বা---'** পদে বলেছেন যে, এইভাবে জ্ঞাত হয়ে মুমুক্ষু ব্যক্তিরাও কর্ম করেছেন, অতএব তোমারও (অর্জুনেরও) সেভাবে কর্ম করা উচিত—**'কুরু কর্মৈব'**। ষোড়শতম শ্লোকে কর্ম থেকে নির্লিপ্ত থাকার তত্ত্বকে বিস্তারিতরূপে জানাবার জন্য ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং **'যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ'** পদ দ্বারা তাকে জানার ফল মুক্ত হওয়া বলে জানিয়েছেন। এই কথাই তিনি এই প্রসঙ্গের উপসংহারে **'এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে'** (৪।৩২) পদে বলেছেন। অতএব কর্তৃত্বাভিমান এবং আসক্তিরহিত হয়ে করা সমস্ত শুভ-কর্মই 'যজ্ঞে' পর্যবসিত হয়।

গীতায় অনেক স্থানে যজ্ঞ, দান এবং তপ—এই তিন শুভকর্মের বর্ণনা আছে (১৭।২৪-২৫, ২৭ ; ১৮।৩, ৫), কোথাও বা যজ্ঞ, দান, তপ এবং বেদাধ্যয়ন—এই চারটি শুভকর্মের বর্ণনা আছে (৮।২৮, ১১।৫৩) এবং কোথাও যজ্ঞ, দান, তপ, বেদাধ্যয়ন এবং ক্রিয়া—এই পাঁচটি শুভকর্মের বর্ণনা করা হয়েছে (১১।৪৮)। বাস্তবে কোনও একটি যজ্ঞের উল্লেখেই সমস্ত শুভকর্মের কথা বলা হয়ে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন, **'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা'**। এখানে 'প্রজা' বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি সকলকেই বোঝানো হয়েছে এবং তার সঙ্গে **'সহযজ্ঞাঃ'** বিশেষণ দেওয়ায় প্রশ্ন জাগে এই যে, যজ্ঞে তো সকলের অধিকার নেই তাহলে ভগবান সমস্ত প্রজার জন্য এই বিশেষণ কেন প্রয়োগ করেছেন ? তার সমাধান হিসাবে বলা যায় এই যে, উনি সেই যজ্ঞের কথা এখানে বলেননি যাতে সকলের অধিকার নেই। 'যজ্ঞ' শব্দটি এখানে 'কর্তব্য-কর্ম বাচক'। নিজ বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, জাতি, স্বভাব, দেশ, কাল ইত্যাদি অনুযায়ী প্রাপ্ত সমস্ত কর্তব্য-কর্মই 'যজ্ঞে'র অন্তর্গত। অপরের হিতের চিন্তা নিয়ে করা সমস্ত কর্মকেই 'যজ্ঞ' বলা হয়। **'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'** (১৮।৪৬) পদে নিজ কর্তব্য-কর্ম দ্বারা পরমাত্মাকে পূজা করার যে কথা বলেছেন, তাও যজ্ঞেরই অন্তর্গত।

সেঁকো, ধুতরা ইত্যাদি যত বিষ আছে, বৈদ্যেরা যখন সেগুলিকে শোধন করে ঔষধে পরিণত করেন তখন সেই বিষ অমৃতরূপ ধারণ করে এবং কঠিন কঠিন অসুখ তার দ্বারা নিরাময় হয়। এইরূপ কামনা, মমতা, আসক্তি, পক্ষপাত, ভেদভাব, স্বার্থ, অহংকার ইত্যাদি সবই বিষবৎ। কর্মের এই বিষময় অংশ দূর করলে কর্ম অমৃতময় হয়ে জন্ম-মরণ-রূপ মহান রোগ দূর করতে সক্ষম হয়। এই অমৃতময় কর্মকেই 'যজ্ঞ' বলা হয়।

সবার মূল পরমাত্মা। পরমাত্মা থেকেই বেদ প্রকটিত হন। বেদ কর্তব্য পালনের বিধি নির্দেশ করে। মানুষ সেই বিধি অনুযায়ী কর্তব্য পালন করে। কর্তব্য পালনের দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং যজ্ঞ করলে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্ন থেকে প্রাণীর জন্ম এবং সেই প্রাণীদের মধ্যে মানুষ কর্তব্য পালন করে যজ্ঞ করে (৩।১৪-১৫)। এইভাবেই সৃষ্টিচক্র গতিশীল থাকে। পরমাত্মা সর্বব্যাপী হওয়া সত্ত্বেও কর্তব্য-কর্মরূপ যজ্ঞে সদা বিদ্যমান থাকেন **'তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্'** (৩।১৫)। অর্থাৎ নিষ্কামভাবে যেখানে কর্তব্য পালন করা হয়, সেখানেই পরমাত্মা অবস্থান করেন। অতএব পরমাত্মপ্রাপ্তিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ কর্তব্য-কর্ম পালনের দ্বারা অতি সহজেই তাঁকে প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে না, নিজ কর্তব্য পালন করে না, ভগবান বলেন সে ব্যক্তি চোর—**'স্তেন এব সঃ'** (৩।১২) ; 'সে পাপ ভক্ষণ করে' **'ভুঞ্জতে তে ত্বঘম্'** (৩।১৩) ; 'যে ইন্দ্রিয়রমণাসক্ত পাপজীবন যাপনকারী মানুষ, তার বেঁচে থাকাই বৃথা'—**'অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি'** (৩।১৬)।

যজ্ঞ অর্থাৎ কর্তব্য পালন করার দায়িত্ব একমাত্র মানুষের উপরে ন্যস্ত। সুতরাং মানুষের উচিত নিষ্কামভাবে বা ভগবৎপূজার ভাব রেখে নিজ কর্তব্য তৎপরতার সঙ্গে পালন করা। নিজ কর্তব্য-কর্ম তৎপরতার সঙ্গে পালনকারী মানুষ পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়—**'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ'** (১৮।৪৫)।

(৫২) গীতায় লোকসংগ্রহ

সাধকাৎ প্রভুসিদ্ধাভ্যাং জায়তে লোকসংগ্রহঃ।
যেনোন্মার্গং পরিত্যজ্য ভবন্তি ধার্মিকা জনাঃ॥

'লোক' শব্দটি স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল—এই তিন লোকের বাচক। এই ত্রিলোকের মর্যাদাকে স্থায়ী রাখবার জন্য যে কর্ম করা, তাকেই বলে 'লোকসংগ্রহ'। লোকসংগ্রহ মানুষেরই অধীন ; কারণ মনুষ্য-শরীরের দ্বারা কৃতকর্মই ফলরূপে স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল—তিন লোক সৃষ্ট হয় (১৪।১৮)।

লোকেরা যাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে, আদর্শ বলে মনে করে এবং যার আচরণ ও বাক্যে লোকে উন্মার্গ থেকে সন্মার্গে চলে তার দ্বারাই লোকসংগ্রহ হয়। লোকসংগ্রহ সাধক, সিদ্ধ এবং ভগবান এই তিনের দ্বারা হয়ে থাকে। যেমন—

১) সাধকের দ্বারা লোকসংগ্রহ—ভগবান অর্জুনকে সাধকদের প্রতিনিধিরূপে উপস্থাপিত করে বলেছেন, 'পূর্বে রাজা জনকের মত মহাপুরুষগণ কর্মের দ্বারাই পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন ; সুতরাং লোক-সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে তুমি তাঁদের মতই অনাসক্তভাবে কর্ম করার যোগ্য' (৩।২০)।

২) সিদ্ধের দ্বারা লোকসংগ্রহ—সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যেরূপ আচরণ করেন, অন্যান্য ব্যক্তিগণও সেইরূপ আচরণ করে এবং মহাপুরুষগণ তাঁদের বাণী দ্বারা যে উপদেশ দেন, অন্য ব্যক্তিরা তারই অনুসরণ করে (৩।২১)। কর্মে আসক্ত সাধারণ মানুষেরা যে প্রকার সাবধানতা ও তৎপরতাপূর্বক কর্ম করে, সিদ্ধ মহাপুরুষেরাও লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতে যেন অনাসক্ত-ভাবে সেইরূপ কর্ম করে (৩।২৫)।

৩) ভগবানের দ্বারা লোকসংগ্রহ—ভগবান নিজের বিষয়ে বলেছেন, 'ত্রিলোকে আমার কোন কর্ম করা বাকী নেই এবং কিছু পাওয়ারও বাকী নেই, তবুও আমি কর্তব্য-কর্ম করে থাকি। আমি যদি আলস্যবশতঃ কর্তব্য-কর্ম না করি, তবে সাধারণ লোক আমারই অনুসরণ করবে অর্থাৎ তারাও নিজ কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগ করবে, অতে তাদের পতন হবে। সুতরাং আমি যদি কর্তব্য-কর্ম না করি, তবে আমি সংকরত্ব উৎপন্নকারী এবং প্রজানাশকারী বলে বিবেচিত হব' (৩।২২-২৪)।

তাৎপর্য এই যে, বাস্তবে লোকসংগ্রহ ভগবান এবং সিদ্ধগণ দ্বারাই হয় ; কারণ তাঁদের নিজস্ব কোন স্বার্থ থাকে না। সাধকগণ যদিও মর্যাদার সঙ্গেই থাকেন এবং তাঁদের দ্বারাও লোকসংগ্রহ হয়, **কিন্তু যথাযথ লোকসংগ্রহ** হয় না ; কারণ, সাধকদের নিজ কল্যাণের প্রয়োজনও থাকে।

জ্ঞাতব্য

ভগবান এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের ভাব সর্বদা নিষ্কাম হওয়ায় তাঁদের দ্বারা শুদ্ধ, আদর্শ লোকসংগ্রহ হয়। কিন্তু সাধকদের ভাব সর্বথা (সর্বতোভাবে) নিষ্কাম হয় না, প্রত্যুত তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে নিষ্কাম হওয়ার দিকে, সুতরাং তাঁদের দ্বারা লোকসংগ্রহ হয় গৌণভাবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সকামভাব থাকে ; সুতরাং তাদের দ্বারা তেমন উল্লেখযোগ্য লোকসংগ্রহ হয় না। তারা যে শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকর্ম করে, তার দ্বারাই সামান্য ভাবে কিছু লোকসংগ্রহের কাজ হয়।

লোকসংগ্রহ দুইভাবে হয়—

১) আচরণ দ্বারা—মানুষ যে বর্ণ ও আশ্রমে স্থিত থাকে, সেই অনুসারে শাস্ত্র যার জন্য যেরূপ কর্মের বিধান করেছে, সেইরূপ কর্ম নিষ্কামভাবে কেবলমাত্র সংসারের হিতসাধনের জন্য করা।

২) বাক্য দ্বারা—নিজের অতিরিক্ত অপর বর্ণ এবং আশ্রমে স্থিত যত ব্যক্তি আছে, তাদের উন্মার্গ থেকে সন্মার্গ (সৎ-মার্গ)-তে সরিয়ে আনা।

এই দুইভাবে লোকসংগ্রহের মধ্যে নিজ আচরণাদির দ্বারা অন্যান্য ব্যক্তিদের ওপর যে প্রভাব পড়ে, তা শুধুমাত্র বাক্যদ্বারা হয় না। যে ব্যক্তির আচরণাদি তার বর্ণ ও আশ্রমের মর্যাদা অনুযায়ী হয়, তার বাক্যের প্রভাবই অপরের ওপর পড়ে। এই কথা জানাবার জন্য ভগবান

তৃতীয় অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক শ্লোকের পূর্বার্ধে 'যৎ'-'যৎ', 'তৎ'-'তৎ' এবং 'এব'-এই পাঁচ শব্দ ব্যবহার করেছেন ; এবং উত্তরার্ধে 'যৎ' তথা 'তৎ'-এই দুই শব্দ ব্যবহার করেছেন[1]। এর তাৎপর্য এই যে, নিজ আচরণের প্রভাবই অপরের ওপরে বিশেষ ভাবে পড়ে এবং শুধুমাত্র বাক্যের প্রভাব অপরের ওপরে কম পড়ে। সুতরাং আচরণই মুখ্য। হাঁা, যদি কেউ অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি হন, তবে তিনি শুধু বাক্যদ্বারাই প্রভাবিত হতে পারেন।

মানুষের নিজ আচরণ লোকমর্যাদা অনুযায়ীই করা উচিত। এতে কোন লোক দেখানো ব্যাপার যেন না থাকে। তার সেই আচরণ কেউ দেখুক বা না দেখুক, কেউ মানুক বা না মানুক তা গ্রাহ্য না করে লোকসমক্ষে বা একান্তে সুচারুরূপে নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত। এইসব কর্তব্য করার সময় যেন কিঞ্চিন্মাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাব না থাকে, পক্ষান্তরে বিশ্বের প্রাণিমাত্রের হিত ভাবনা যেন থাকে। অর্থাৎ সমস্তকর্মই জগৎ-সংসারের হিতের ভাবনা রেখে করা উচিত।

নিজ কল্যাণের কথা ভেবে কর্ম করাও স্বার্থভাব। অতএব লোকসংগ্রহকারী ব্যক্তির এই চিন্তা ত্যাগ করা উচিত এবং দিবারাত্র জগৎ-সংসারের কল্যাণের ভাব মনে রাখা কর্তব্য। যদিও নিজ কল্যাণের চিন্তা করা সকামভাব নয়, তবুও ব্যক্তিগত কল্যাণের ভাব লোকসংগ্রহ যথাযথভাবে হতে দেয় না। যে ব্যক্তি নিজ কল্যাণের চিন্তা না করে শুধু অপরের কল্যাণের ভাব মনে রেখে নিজ কর্তব্য পালন করে, তার দ্বারা স্বতঃই মানুষের কল্যাণ হয়। যেমন বরফের কাছে গেলে ঠাণ্ডা লাগে, আগুনের কাছে গেলে গরম লাগে, তেমনি ঐসব ব্যক্তির কাছে গেলে বা তাদের কথা চিন্তা করলেও কল্যাণ হয়। এইসব ব্যক্তি যদি গৃহস্থাশ্রমে থাকেন, তাহলে তাঁর গৃহ থেকে যারা অন্ন-জল নিয়ে ব্যবহার করে তাদেরও ভালো হয় এবং এরূপ ব্যক্তি যদি সন্ন্যাসী হন, তাহলে তিনি যে গৃহ থেকে অন্ন-জলাদি গ্রহণ করেন, সেই (অন্ন-জল দানকারী) ব্যক্তিরও কল্যাণ হয়ে থাকে। তিনি জীবিত থাকাকালে তাঁর আচরণ, বাক্য, ভাব প্রাণীদের উপর যে প্রভাব ফেলে, তাঁর মৃত্যুর পরও তা তেমনিই প্রভাব ফেলে। যে স্থানে মহাপুরুষ বসবাস করেন, অজানিত ভাবে কোন ব্যক্তি যদি তথায় যায় তবে সে-ও সেইস্থানে শান্তি অনুভব করে। এই মহাপুরুষদের উপদেশ অলক্ষ্যে স্থায়িরূপে বিরাজ করে এবং কোন অধিকারী ব্যক্তির সেই তত্ত্বলাভের জন্য জিজ্ঞাসা বা উৎকণ্ঠা জাগলে মার্গদর্শন পেতে থাকে। সেই ব্যক্তি জানতে পারে না যে, তার এই ভাব কোথা থেকে এল, তবে সে এই ভাবের প্রাপ্তিকে ভগবান বা মহাপুরুষদের কৃপা মনে করে।

মহাপুরুষের দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়াদি হয় তা সমস্তই আদর্শ রূপে হয়। কোথাও কোথাও তাঁর ক্রিয়া অনুকরণীয় রূপেও দৃষ্ট হয়। যেমন আস্তিক ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্মে এবং সেই কর্মফলে দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রেখে সকামভাবে তৎপরতার সঙ্গে কর্ম সম্পন্ন করেন, জ্ঞানী মহাপুরুষও তেমনি তৎপরতার সঙ্গে কর্ম করেন (৩।২৫)।

কর্মযোগী সাধকের কর্ম করার যে স্বভাব থাকে সেই স্বভাব সিদ্ধাবস্থায়ও থাকে। সুতরাং কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষের স্বাভাবিক ভাবে কর্ম করার প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু জ্ঞানযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের এই প্রবৃত্তি দেখা যায় না ; কারণ, জ্ঞানযোগী প্রথম থেকেই নিজেকে নির্লিপ্ত অনুভব করেন। তাই সিদ্ধাবস্থায় তাঁর কর্মে এবং বস্তুজগৎ সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবে উপরতি থাকে যা জ্ঞান-পথের সাধকের জন্য আদর্শ এবং এই মহাপুরুষের বস্তুজগৎ সম্বন্ধে যে উদাসীনতা থাকে তা জগতের পক্ষে হিতকারী হয়।

প্রশ্ন—সিদ্ধ মহাপুরুষদের অহংভাব থাকে না, তাহলে তাঁদের দ্বারা লোকসংগ্রহ, ক্রিয়াদি কীভাবে হয় ?

উত্তর—সেই মহাপুরুষদের শরীর দ্বারা ক্রিয়া হওয়ার দুটি কারণ আছে—এক, তাঁর অদৃষ্ট এবং দ্বিতীয়, প্রাণীদের ভাব। যে ভাগ্যের ফলে তিনি শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই ভাগ্যের জন্যই তাঁর এইসমস্ত ক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং তিনি যেসব প্রাণীর সম্মুখীন হন

---

[1] যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

(গীতা ৩।২১)

তাদের ভাব অনুযায়ী ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়। যদি তাঁর নিকট প্রেম ভাবাপন্ন, শ্রদ্ধাযুক্ত মানুষ আসে তাহলে তার সঙ্গে সেই মহাপুরুষের ব্যবহারও প্রেমযুক্ত হয়। যদি উদাসীন অথবা শত্রুভাবাপন্ন মানুষ আসে, তাহলে সেই মহাপুরুষের ব্যবহারও উদাসীনের মতো হয় (শত্রুভাব মহাপুরুষদের মধ্যে থাকে না)।

জগতে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি যে যোগ-সাধনের যখন যখন প্রয়োজন হয়, সেই সেই সময় সন্ত-মহাপুরুষ দ্বারা সেই যোগ সাধনের প্রচার হয়ে থাকে। যেমন, যে সময় জগতে জ্ঞানযোগের প্রয়োজনীয়তা ছিল, সেই সময় শ্রীশঙ্করাচার্যের দ্বারা জ্ঞানযোগের বিশেষভাবে প্রচার হয়েছিল। যে সময় জগতে ভক্তিযোগের প্রয়োজনীয়তা ছিল, সেই সময় শ্রীরামানুজাচার্য দ্বারা বিশেষভাবে ভক্তিযোগেরই প্রচার হয়েছে। যেমন ভগবানের দ্বারা হওয়া সমস্ত ক্রিয়াই প্রাণীদের হিতের জন্য হয়, এইরূপ মহাপুরুষদের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত কর্মও স্বতঃই প্রাণীদের হিতের জন্য হয়। তাঁদের আচরণ এবং বাক্য (উপদেশ)-দুই-ই প্রাণীদের হিতের জন্য, কিন্তু তাঁদের মধ্যে হিত করবার কোন অহং-অভিমান থাকে না। যেমন সূর্য দ্বারা জগৎ-সংসারের সকলেই আলো এবং কর্ম করার প্রেরণা পায়, তেমনি ঐসব মহাপুরুষদের আচরণাদি এবং বাক্য দ্বারা জগতের সকলের জ্ঞান এবং কর্তব্য-কর্ম করার প্রেরণা মেলে, তিনি জীবিত থাকুন আর নাই থাকুন। ভগবান যখন শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে জন্ম নিলেন, তখন তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে মানবার মতো মানুষ খুব কম ছিল। কিন্তু এখন তাঁকে ভগবান বলে মানবার মতো মানুষের সংখ্যা অনেক। কলিযুগ হওয়ায় মানুষের আচরণাদিতে শিথিলতা এলেও তাঁকে ভগবান বলে মানবার ভাবটি বৃদ্ধি পেয়েছে। তেমনি মহাপুরুষদের দেহ ত্যাগের পর তাঁদের সিদ্ধান্ত এবং বাণীগুলির বিশেষভাবে প্রচার ও সমাদর হয়।

যতক্ষণ মানুষের অহংভাব থাকে, তার ক্রিয়াদি ততক্ষণ জগতের জন্য হিতকারী হয় না। অহংভাব ঘুচলে তবেই তার ক্রিয়াদি জগতের পক্ষে কল্যাণকারী এবং আদর্শ হয়ে ওঠে। সকামভাবে কর্ম করলেও মানুষের কর্ম অপরের জন্য আদর্শ হয় বটে, কিন্তু তা কল্যাণকারী হয় না। সকাম কর্মকারী মানুষ ততটাই শুদ্ধি পায়, যার দ্বারা সে নানাপ্রকার ভোগ উপভোগ করতে পারে। সে এমন শুদ্ধি পেতে পারে না যার দ্বারা কল্যাণ হয়।

যে গ্রামে বা প্রান্তরে সন্ত-মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন বা বসবাস করেছেন, তা আজও পবিত্র। এখনও সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে আস্তিকতা, শুদ্ধ-বিচার, শুদ্ধ-আচরণ ইত্যাদি দেখা যায় এবং যে গ্রামে কোন সাধু সন্ত জন্মগ্রহণ করেন নি বা সেখানে কেউ যান নি, সেই স্থানের মানুষেরা ভূত-প্রেতের মতই হয়।

(৫৩) গীতোক্ত 'প্রবৃত্তি' এবং 'আরম্ভ'

বর্ণাশ্রমাভ্যাং নিয়তং হি কর্ম কার্যং প্রবৃত্তিঃ কথিতা বুধৈশ্চ।
কর্মাণি ভোগায় নবানি চৈব কার্যাণি চারম্ভ উদীরিতো বৈ॥

ভগবান রজোগুণের বৃদ্ধির লক্ষণ বলতে গিয়ে 'প্রবৃত্তি' এবং 'আরম্ভ' এই দুটি শব্দ একসঙ্গে প্রয়োগ করেছেন—'লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা' (১৪।১২)। যদিও স্থূলদৃষ্টিতে প্রবৃত্তি এবং কর্মের আরম্ভ—এই দুটি সমানই দেখায়, কিন্তু এই দুটিতে বেশ বড় তফাৎ আছে। নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রম, দেশ, পোশাক-পরিচ্ছদ অনুসারে প্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কর্তব্য উপস্থিত হয়, তাকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করাই 'প্রবৃত্তি'। আর ভোগ তথা সম্পদ বাড়াবার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কর্ম আরম্ভ করাকে বলে 'আরম্ভ'। প্রবৃত্তিকে নিষ্কামভাবে, নির্লিপ্ততাপূর্বক পালন করা উচিত, তাকে ত্যাগ করা উচিত নয় ; কারণ নিষ্কামভাবে প্রবৃত্তি পালনই যোগারূঢ়

হওয়ার কারণ (৬।৩)। কিন্তু সকল আরম্ভকেই পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ তা ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের আসক্তি বৃদ্ধি করিয়ে পতন ঘটায়।

গীতা পরিস্থিতি পরিবর্তনের কথা বলে না ; পরিমার্জন করার কথাই বলে, যাতে মানুষ কোনও পরিস্থিতিতে আবদ্ধ না হয় এবং যে পরিস্থিতিতেই সে থাকুক তার দ্বারা যেন তার কল্যাণ হয়। নিজের কল্যাণ করার জন্য যেন নতুন কর্ম আরম্ভ করতে না হয় এবং বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কাল ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রয়োজন না পড়ে। কারণ পরমাত্মা সমস্ত বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কাল, পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদিতে পূর্ণভাবে ব্যাপ্ত আছেন।

প্রবৃত্তি (নিজ কর্তব্য পালন) তো সমস্ত বর্ণ-আশ্রমে হয় এবং হওয়া উচিতই ; কারণ, নিজ নিজ কর্তব্য পালন না করলে সৃষ্টিচক্রের মর্যাদা থাকে না এবং নিজ কর্তব্য ত্যাগ করলে উদ্ধার লাভ হয় না। সুতরাং মানুষ যে কোন বর্ণ, আশ্রম, ইত্যাদিতে থাকুক না কেন, তার নিষ্কামভাবে নিজ কর্তব্য অবশ্যই পালন করা উচিত।

গুণাতীত মানুষের দ্বারাও প্রবৃত্তি বা নিজ কর্তব্য পালন হয়ে থাকে (১৪।২২), কিন্তু তার দ্বারা ভোগ অথবা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে কর্ম আরম্ভ হয় না। কোনও কোনও স্থানে গুণাতীত মানুষের দ্বারা নতুন নতুন কর্মের আরম্ভ লক্ষ্য করা যায় ; কিন্তু সেই কর্মে তাঁর কিছুমাত্র আসক্তি বা দ্বেষ থাকে না। ভোগ ও সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কর্মের আরম্ভকারী মানুষ 'আমাকে পরমাত্মপ্রাপ্তি করতেই হবে'—এরূপ স্থির নিশ্চয় কখনও করতে পারে না (২।৪৪)।

অর্থাৎ নিজ বর্ণ, আশ্রম অনুযায়ী নিষ্কামভাবে করা প্রবৃত্তি বন্ধনের কারণ হয় না, তা মুক্তিরই হেতু হয়ে থাকে। তেমনি নিজ স্বার্থ, অভিমান, কামনা, আসক্তি ত্যাগ করে শুধু সর্বপ্রাণীর জন্য করা নতুন নতুন কর্মের আরম্ভও বন্ধনের কারণ হয় না। কিন্তু এই আরম্ভের সময় সাধককে বিশেষভাবে সাবধান থাকতে হবে যেন তার হৃদয়ে বস্তুসমূহ এবং ক্রিয়াগুলি কোন গুরুত্বপূর্ণ ছাপ না ফেলে। যদি এই সমস্ত ক্রিয়া ও বস্তু তার হৃদয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছাপ ফেলে, তবে সেইসব কর্মে সাধকের নির্লিপ্ততা থাকতে পারে না অর্থাৎ সেই সাধক যদি নিজের কাছে টাকা-পয়সা নাও রাখে, দ্রব্যাদির সংগ্রহে মনোযোগ নাও দেয়, তবুও তার হৃদয়ে ধন-সম্পত্তি, বস্তু এবং ক্রিয়াসকল গুরুতর ছাপ ফেলবে তথা কাজ করা বা না করা অবস্থায় তার সেই কর্মের চিন্তা হতেই থাকবে।

ভগবান কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী এবং ভক্তিযোগী—তিনপ্রকার সাধককেই প্রবৃত্তি (কর্ম) থেকে নির্লিপ্ত থাকার কথা বলেছেন। কর্মযোগী সাধকের ফলাসক্তি না থাকায় তিনি কর্ম করলেও তার ফলে লিপ্ত হন না—**'কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে'** (৫।৭)। জ্ঞানযোগী সাধক 'সমস্ত কর্ম প্রকৃতির দ্বারাই সম্পন্ন হয়'—এইরূপ দেখেন এবং নিজেকে অকর্তা ভাবেন (১৩।২৯)। এইজন্য তিনি কর্ম করলেও তাতে লিপ্ত হন না। ভক্তিযোগী সাধক তাঁর সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করেন, অতএব তিনি কর্ম করলেও তাতে লিপ্ত হন না।

ভগবান কর্মযোগে কর্মের প্রারম্ভকালে কামনা এবং সংকল্প ত্যাগ করার কথা বললেও কর্মের আরম্ভ ত্যাগ করতে বলেন নি। কারণ কর্মযোগে নিষ্কামভাবে কর্ম করা আবশ্যক। কর্ম পালন না করলে কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ হতে পারে না (৬।৩)। কিন্তু জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগে ভগবান কর্মের আরম্ভ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করার কথা বলেছেন ; যেমন— যে সকল কর্মের আরম্ভ ত্যাগ করে তাকে গুণাতীত বলে (১৪।২৫) এবং যে সকল কর্মারম্ভ ত্যাগ করেছে, সেই ভক্তই আমার প্রিয় (১২।১৬)। কারণ জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগীর সাংসারিক কর্মে উপরতি বা বিরতি-ভাব থাকে।

(৫৪) গীতায় ত্যাগের স্বরূপ

বাহ্যব্যক্তিপদার্থানাং ন ত্যাগস্ত্যাগ উচ্যতে।
কামাদীনাং পরিত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

ত্যাগের বিষয়ে মানুষের প্রায়শঃ এরূপ ধারণা থাকে যে, যে ব্যক্তি ঘর-সংসার, স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতা ইত্যাদি ত্যাগ করে সাধু বা সন্ন্যাসী হয়, সেই যথার্থ ত্যাগী। কিন্তু বাস্তবে তাকে ত্যাগ বলে না। কারণ, যতক্ষণ অন্তঃকরণে সাংসারিক বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ আদিতে অনুরাগ বা আসক্তি থাকে, ভালবাসা থাকে, মনে এগুলির প্রতি গুরুত্ব থাকে, ততক্ষণ বাহ্যতঃ ঘর-সংসার ইত্যাদি ত্যাগ করলেও তা সত্যকার ত্যাগ নয়। যদি ওই ভাবে ঘর-সংসার ছাড়লেই ত্যাগ করা হয়, তবে যেসব ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের কল্যাণ হওয়া উচিত। কারণ, তারা নিজ ঘর-সংসার বিশেষ করে নিজের শরীর পর্যন্ত ত্যাগ করে যায়। কিন্তু তাতে তাদের কল্যাণ হয় না ; কারণ, তারা তো সংসারের আসক্তি মমতা ইত্যাদি ত্যাগ করে নি, এগুলি থাকা অবস্থাতেই তাদের মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে।

যে জিনিস নিজের নয়, তাও ত্যাগ করা যায় না আর যা নিজ স্বরূপ (স্বভাব), তাও ত্যাগ করা যায় না। যেমন—আগুন তার দাহিকা শক্তি এবং প্রকাশিকা শক্তি বর্জন করতে পারে না। কারণ দাহিকা শক্তি এবং প্রকাশিকা শক্তি দুই-ই অগ্নির স্বরূপ। তাহলে ত্যাগ কিসের হবে? যা নিজের নয় অথচ নিজের বলে মনে করা হয়, তাকে ত্যাগ করা এই মিথ্যা মান্যতার ত্যাগ হয়। যার সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল না, এখন নেই, পরেও হবে না এবং কখনও হতে পারেও না অর্থাৎ পরিত্যাগ না করলেও যার প্রতিক্ষণ আমাদের থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করা বাস্তবিকই ত্যাগ। এর তাৎপর্য এই যে, বস্তু আদির বাহ্যিক পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নয় আসলে ওইসব বস্তু ইত্যাদিতে যে মানসিক সম্বন্ধ করা হয়, যে আসক্তি, মমতা ইত্যাদি করা হয় তা ত্যাগ করা। এই ত্যাগই সত্যকারের ত্যাগ, এরূপ ত্যাগের ফলে তৎক্ষণাৎ শান্তি লাভ হয়, **ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্** (১২।১২)।

ত্যাগের বিষয়ে প্রধান কথা হল এই যে, সংসারে থাকতে হবে সংসারের জন্যই, নিজের জন্য নয়। সাত্ত্বিক ত্যাগের স্বরূপ জানাতে গিয়ে ভগবান বলছেন যে, শুধু কর্তব্য-কর্মই করা উচিত কিন্তু তাতে যেন আসক্তি, মমতা বা ফল লাভের ইচ্ছা না থাকে। আসক্তি ইত্যাদি না থাকলে শরীর-সংসার থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয় (১৮।৯)। কর্তব্য পালন করলে ক্লেশ হয়, পরিশ্রম হয়, আরাম পাওয়া যায় না—এইরূপ চিন্তা করে অর্থাৎ শারীরিক কষ্টের ভয়ে কর্তব্য পরিত্যাগ করলে তাকে রাজসিক ত্যাগ বলে। রাজসিক ত্যাগে শান্তি পাওয়া যায় না (১৮।৮)। মোহবশতঃ চিন্তা ভাবনা না করেই কর্তব্য, ক্রিয়া, পদার্থ ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলে (১৮।৭)। তামস ত্যাগ মানুষকে প্রমাদ ও আলস্যে অভিভূত করে, যাতে তার অধোগতি হয়।

তিনিই সাধক, যিনি ত্যাগী অর্থাৎ যিনি শুধু সংসারকে দিয়ে থাকেন, নেন না কিছু। কোন কিছু গ্রহণ করাও তাঁর দেওয়া-তুল্য এবং কিছু প্রদান করাও দেওয়া-তুল্য, অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্র-জল ইত্যাদি যা কিছু তিনি গ্রহণ করেন তা জগতের কল্যাণের জন্যই এবং অন্ন-জলাদি যদি নেন, তাও কল্যাণের জন্যই নেন। তিনি যদি কিছু না করে শান্ত হয়ে বসেও থাকেন, তাহলেও তিনি জগৎকে দিতেই থাকেন ; কারণ, তাঁর শুধু বেঁচে থাকা বা শুধু তাঁকে দর্শনের দ্বারাই জগতের স্বতঃই হিত হয়। তাঁর শরীর ত্যাগের পরও তাঁর ভাব দ্বারা, তাঁর আচরণাদির পঠন-স্মরণ-মনন ইত্যাদির দ্বারা এবং তাঁর বাসস্থানের অণু-পরমাণু দ্বারাও পৃথিবীর মঙ্গল হয়। এর তাৎপর্য এই যে, তিনি **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (৫।২৫ ; ১২।৪) হন, তাঁর জীবন হয় ত্যাগময়, তাই তিনি নেন না কিছুই, সবকিছু দিয়ে যান।

গীতায় সাংখ্যযোগকে 'সন্ন্যাস' এবং কর্মযোগকে 'ত্যাগ' নামেও অভিহিত করা হয়েছে (১৮।১)। যার গচ্ছিত বস্তু, তাকে সেই বস্তু ফিরিয়ে দেওয়ার নামই

'সন্ন্যাস'। শরীর এবং সংসার প্রকৃতির সম্পদ। প্রকৃতির গচ্ছিত বস্তু বা সম্পদ প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দেওয়াই অর্থাৎ নিজ সম্বন্ধ না রাখাই 'সন্ন্যাস'। যা নিজস্ব নয়, তার থেকে সম্পর্ক ছেদ করার নামই 'ত্যাগ'। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদিতে মমত্ব না রাখা, নিজ সম্বন্ধ না রাখার নামই 'ত্যাগ' ; কারণ এসবই জগতের, নিজের নয়। মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে মমতা-আসক্তি না রেখে শুধু জগৎ-সংসারের জন্য কাজ করা উচিত, নিজের জন্য নয়। নিজের জন্য, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যদি মানুষ কাজ করে, তবে সে তার দ্বারা বদ্ধ হয়—**'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ'** (৩।৯)। শুধুমাত্র যজ্ঞ করার জন্য, অপরের হিতের জন্য এবং জগৎ-সংসারের জন্য কর্ম করলে মানুষের সম্পূর্ণ কর্ম বিলীন হয়ে যায়—**'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'** (৪।২৩)।

কর্মের আরম্ভ না করলেও সিদ্ধিলাভ হয় না এবং উপর থেকে কর্ম ত্যাগ করলেও সিদ্ধিলাভ হয় না (৩।৪)। কর্মের আরম্ভ না করলে সিদ্ধি হয় না ; কারণ কর্মানুষ্ঠান ছাড়া কর্মযোগীর সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় না। যে ব্যক্তি যোগারূঢ় হতে চায়, নিজের মধ্যে সমত্ব আনতে চায়, তার নিষ্কামভাবে কর্ম করাই সিদ্ধি লাভের মূল (৬।৩)। অর্থাৎ কর্ম না করে মানুষ যোগারূঢ় হতে পারে না, কর্ম করলে তবেই কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধি এবং ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সম-ভাবের পরীক্ষা হয়।

কর্মকে কেবল স্বরূপতঃ ত্যাগ করাতেও সিদ্ধিলাভ হয় না ; কারণ যতক্ষণ কর্তৃত্বাভিমান (করবার ভাব) বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ সাংখ্যযোগীর সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় না। কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করলেই সিদ্ধিলাভ হয় ; কারণ বাস্তবে 'করা' প্রকৃতিতে হয়, নিজের নয় (১৩।৩১)। এর তাৎপর্য এই যে, সাংখ্যযোগী যদি কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন তাহলে তারপর কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করলেও তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। কিন্তু কর্মযোগে কর্তব্য-কর্ম করলে তবেই সিদ্ধিলাভ হয়।

যে কর্ম দ্বারা সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক যোগ হয়, তাকে 'অকুশল' কর্ম বলে। কর্মযোগী অকুশল কর্ম ত্যাগ করে বটে, কিন্তু দ্বেষ-ভাব থেকে নয়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ত্যাজ্য বস্তু তত বন্ধনকারক নয়, যত বন্ধনকারক হল দ্বেষযুক্ত মনোভাব। একইভাবে কর্মযোগী কুশল কর্ম করে, কিন্তু আসক্তিপূর্বক নয়। এতেও দেখা যায় যে, কুশলকর্ম দ্বারা যে লাভ হয় তার থেকে অনেক বেশী ক্ষতি হয় আসক্তি পূর্বক কর্ম করলে। এইভাবে কর্ম করলেই তা বাস্তবিক ত্যাগ হয় (১৮।১০)।

যে ব্যক্তি কর্মফলের অপেক্ষা না রেখে, কর্মফলের আসক্তি বা কামনা না রেখে, কর্মফলের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ না রেখে কর্তব্য-কর্ম করে যায়, বাস্তবে সেই ত্যাগী। কেবল অগ্নি (যজ্ঞাদি) ও কর্ম ত্যাগকারী হলেই ত্যাগী হওয়া যায় না (৬।১)। নিজ সংকল্প ত্যাগ না করে, মনের বাসনা ত্যাগ না করে মানুষ কোনওভাবেই যোগী হতে পারে না (৬।২)। যে ব্যক্তি কর্ম এবং কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করেছে, সে কর্মে প্রবৃত্ত হলেও বাস্তবে সে কিছুই করে না (৪।২০)। যে কর্ম করেও নির্লিপ্ত থাকে (কামনা, মমতা, আসক্তি রহিত হয়), নির্লিপ্ত থেকেই কর্ম করে, সেই যোগী বুদ্ধিমান এবং সর্বকর্মকারী (কৃতকৃত্য) (৪।১৮)। এর তাৎপর্য এই যে, কর্মযোগী কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করে না, সে কেবল কর্ম এবং কর্মফলের কামনা, মমতা, আসক্তি ত্যাগ করে। ভক্তিযোগীও কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করে না, সে কর্ম এবং কর্মফল ভগবানে অর্পণ করে অর্থাৎ তার (কর্মের) কামনা, মমতা, আসক্তি ত্যাগ করে (৩।৩০ ; ১২।৬, ১৮।৫৭)।

ভক্তের কিছু নেবার ইচ্ছা কখনো হয় না, তার মুক্তির ইচ্ছাও হয় না ; কারণ তার কোন বন্ধনই হয় না। যেখানে জড় অনিত্য বস্তুকে স্বীকার করা হয়, সেখানেই বন্ধন ঘটে। ভক্ত কখনো অনিত্য বস্তুকে স্বীকার করে না। সে ভগবানের নিকট কিছু নেয় না, ভগবানকে সে শুধু দিয়েই যায়। তার মধ্যে 'আমি ভগবানের নিকট কিছু চাই না, মুক্তিও চাই না',—এইরূপ অভিমানও থাকে না। ভগবান যেমন কারো নিকট হতে কিছু নেন না, শুধু দিয়েই থাকেন, তবু তাঁর কোন কিছু কমে না, তেমনি এই ত্যাগী ভক্তদেরও কিছু কমে যায় না। ভক্ত নিজের জন্য ভগবানকেও চায় না, সে স্বয়ং ভগবানে সমর্পিত হতে চায়, নিজের পৃথক অস্তিত্ব পর্যন্ত রাখতে চায় না।

অদ্বৈত সিদ্ধান্ত অনুসারে সাধক ব্রহ্মরূপ হয়ে যায়। কিন্তু ভক্ত ব্রহ্মরূপের থেকেও বিশিষ্ট হয় ; ফলে

ভগবানও ভক্তের ভক্ত হয়ে যান। কিন্তু ভক্ত চায় না যে ভগবান তার ভক্ত হন। এরূপ ভক্ত ছাড়া ভগবানেরও ভালো লাগে না। ভগবানেরও এরূপ ভক্তের প্রয়োজন হয়, চাহিদা থাকে। শ্রীহনুমান যেমন ভগবানের কাছ থেকে কিছুই চান নি ; থাকবার স্থানও চাননি ; খাদ্যও চাননি, বস্ত্রও না, না সহায়তা বা মান মর্যাদা, কিছুই চাননি তিনি, কিন্তু তিনি ভগবানের কার্য করবার জন্য সবসময় ব্যগ্র থাকতেন—**'রাম কাজ করিবে কো আতুর'**। তারই জন্য ভগবান শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, অযোধ্যাবাসী প্রত্যেকেই হনুমানের কাছে ঋণী হয়ে গিয়েছিলেন। হনুমান তাঁর ত্যাগের জন্য এতো উচ্চ স্থানে আসীন যে যেখানে শ্রীরামের মন্দির সেখানেই হনুমানের মন্দির তৈরী করা হয়। কিন্তু যেখানে শ্রীরামের মন্দির হয়নি, সেখানেও পৃথকভাবে হনুমানের মন্দির তৈরী করা হয়। অর্থাৎ হনুমানের মন্দির ব্যতীত শ্রীরামের মন্দির হয় না, কিন্তু শ্রীরাম ব্যতীতও শ্রীহনুমানের মন্দির হয়।

ত্যাগী ভক্তদের ভগবান মা-বাবা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয় করে নেন। ভক্তের ভালবাসা পাওয়ার জন্য ভগবানও ব্যাকুল হয়ে থাকেন। বৃন্দাবনের গোপীদের সঙ্গে তাঁর এইরূপ প্রেমই ছিল। তাঁরা নিজেদের জন্য কিছুই চান নি, শুধু ভগবানকে সুখ দিতে চাইতেন। তাঁদের পৃথক্ কোন সত্তা ছিল না ; তাঁরা ভগবানেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত সত্তার আহুতি দিয়েছিলেন।

ব্রহ্ম একরস (বা সমরস)। তিনি কাউকে রস দেনও না, কারুর থেকে রস গ্রহণও করেন না। কিন্তু ভক্ত ভগবানকে রস দেয় এবং দিতেই থাকে, তার দেওয়ার শেষ নেই। যেমন সমুদ্রে মিশলেও গঙ্গার প্রবাহ সমুদ্রতে বহমানই থাকে, যদিও তাতে তাঁকে প্রবাহিত বোঝা যায় না, এইরূপ ভক্তের দেওয়ার প্রবাহ চলতেই থাকে।

(৫৫) গীতায় নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার গুরুত্ব

রাগদ্বেষাদয়ো দ্বন্দ্বাঃ শত্রবঃ সন্তি দেহিনাম্।
তন্মুক্তাঃ সাধকাঃ শীঘ্রং ভবেয়ুঃ সমমাশ্রিতাঃ॥

সাংসারিক কর্মে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে এবং পারমার্থিক সাধনে সংসার থেকে বিমুখ হয়ে ভগবন্মুখী হতে হয়। সুতরাং সাংসারিক কর্ম করা উচিত, না পারমার্থিক সাধনা করা উচিত—মনে এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই দ্বন্দ্ব নিবারণের উপায় এই যে, সাংসারিক কাজ সংসারের জন্য না করে শুধু ভগবানের জন্য করা উচিত। শুধু ভগবৎপ্রীতির জন্য করলে সমস্ত কর্ম, ক্রিয়া সাধনরূপে পর্যবসিত হয়। গীতায় নবম অধ্যায়ের সাতাশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান **'যৎ করোষি'** (তুমি যা কিছু কর) **'যদশ্নাসি'** (যা কিছু ভোজন কর), **'যজ্জুহোষি'** (যা কিছু হোমযজ্ঞাদি কর), **'দদাসি যৎ'** (যা কিছু দান কর) এবং **'যৎ তপস্যসি'** (যা কিছু তপস্যা কর)—এই পাঁচটি ক্রিয়ার কথা বলেছেন। এর মধ্যে **'করোষি'** এবং **'অশ্নাসি'** এই দুটি সংসার সম্বন্ধীয় ক্রিয়া, **'জুহোষি'** **'দদাসি'** এবং **'তপস্যসি'**—এই তিনটি ক্রিয়া শাস্ত্রীয় ; কিন্তু এই পাঁচটি ক্রিয়ারই সম্বন্ধ **'মদর্পণম্'**-(ভগবদর্পণ)-এর সঙ্গে যুক্ত। কারণ পাঁচটি ক্রিয়ার সঙ্গেই **'যৎ'** শব্দটি যুক্ত আছে এবং অর্পণ ক্রিয়ার সঙ্গে **'তৎ'** শব্দটি যুক্ত আছে—**'তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্'**। অতএব এই পাঁচটি ক্রিয়া শুধু ভগবানের প্রীত্যর্থেই করা উচিত। এতে কিছুমাত্র আপনভাব রাখা উচিত নয়।

অর্পণ দুই প্রকারের—১) কর্ম করে ভগবানে অর্পণ করা, ২) শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি সবই ভগবানের—এইরূপ মনে করা। এই দুটির মধ্যে দ্বিতীয় অর্পণই শ্রেষ্ঠ ; কেননা এর দ্বারা সমস্ত কিছুই ভগবানে সমর্পিত হয়। এইভাবে অর্পণকারী ভক্তের লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় সমস্ত কর্মই পারমার্থিক হয়ে যায়, ভগবৎ-প্রীত্যর্থ হয়ে ওঠে। তখন অর্পণকারীর মধ্যে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকে না।

অনুকূল পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট থাকা এবং প্রতিকূল

পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট হওয়াও দ্বন্দ্ব। এরূপ দ্বন্দ্বের ফলে আচার-ব্যবহার বিরূপ হয়ে যায়, দুঃখ অনুভব হয় এবং বন্ধন দৃঢ় হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি এলেও সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয় না, সমভাবে থাকে, ব্যবহার ঠিক রাখে, সে দুঃখ পায় না এবং তার কর্মবন্ধন কেটে যায় (২।৩৮)। যেমন, যে মা নিজ সন্তানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, পক্ষপাত বা ভেদবুদ্ধি রাখে, সে মা হয়েও সন্তানদের সুখী রাখতে পারে না, যার জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ, অশান্তি, মনোমালিন্য হয়ে থাকে। দ্বন্দ্ব বা পক্ষপাত না থাকলে ঝগড়া, অশান্তি দূর হয় এবং সকলের সঙ্গে শান্তিসম্পর্ক বজায় থাকে।

দ্বন্দ্ব, বৈষম্য, পক্ষপাত—এইগুলি জন্ম-মৃত্যু এবং দুঃখের কারণ। এগুলি না থাকলে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়। সেইজন্য ভগবান দ্বন্দ্বভাবেও সম থাকাকেই 'যোগ' বলে অভিহিত করেছেন (২।৪৮)।

'আমরা যুদ্ধ করব কি করব না, জয় আমাদের হবে, না ওদের হবে' (২।৬)—এও দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব রাগ-দ্বেষপূর্ণ নয়, এটি ভবিষ্যতের চিন্তাযুক্ত দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে অভিভূত হয়ে অর্জুন ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে নিজের কি কর্তব্য তা জানতে চাইলেন (২।৭)। ভগবান এর উত্তরে জানালেন, 'যদি তুমি এই যুদ্ধে হত হও তাহলে স্বর্গপ্রাপ্ত হবে, জয়লাভ করলে পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করবে' (২।৩৭)। 'অতএব জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে তুল্য জ্ঞান করে যুদ্ধ কর, তাহলে তুমি পাপভাগী হবে না' (২।৩৮)। 'কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়' (২।৪৭)। 'সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ব রেখে তুমি কর্ম কর' (২।৪৮), 'কারণ সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত মানুষ এই জীবনেই পাপ-পুণ্য হতে রহিত হয়ে যান (২।৫০)।'

'এই ব্যক্তি আমার শ্রোতা, অন্য ব্যক্তিটি নয় ; এই ব্যক্তি আমার অনুগামী, অপরজন নয় ; এ আমার শিষ্য, অপর জন নয় ; অতএব যে ব্যক্তিগণ আমার অনুগামী শিষ্য ও শ্রোতা তাদেরই আমি আমার সাধন-প্রণালী জানাব, অন্যদের নয়'—এইপ্রকার বক্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিষমতা, পক্ষপাত থাকায় রাগ-দ্বেষ হয়। যতক্ষণ রাগ-দ্বেষ থাকে ততক্ষণ কল্যাণ হয় না ; কল্যাণের পথে রাগ ও দ্বেষ—এই দুটি বড় শত্রু (বিঘ্নকারক) (৩।৩৪)।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিন যোগ পথেই সাধকের নির্দ্বন্দ্ব হওয়া অত্যন্ত জরুরী। সেইজন্যই ভগবান গীতায় স্থানে স্থানে নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার জন্য বিশেষ জোর দিয়েছেন। যেমন—'নির্দ্বন্দ্ব হলে সাধক কর্ম করেও কর্মফলে আবদ্ধ হন না' (৪।২২), 'দ্বন্দ্ব দ্বারা মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয়' (৭।২৭) 'কিন্তু নির্দ্বন্দ্ব হলে মানুষ অনায়াসে সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে' (৫।৩)। 'দ্বন্দ্বনির্মুক্ত মানুষই দৃঢ়ব্রত হয়ে ভগবানের ভজনা করতে সক্ষম হয়' (৭।২৮)। এর তাৎপর্য এই যে, সাধকের সাধনা নির্দ্বন্দ্ব হলেই দৃঢ়তা লাভ করে। সেইজন্য ভগবান অর্জুনকে নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন (২।৪৫)।

(৫৬) গীতায় অহংকার ও মমত্ব ত্যাগ

অহংতামমতাত্যাগঃ কথিতো হরিণা স্বয়ম্।
কর্মযোগে জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে সমানতঃ॥

গীতায় ভগবান কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিন পথেই অহংকার ও মমত্ব ত্যাগ করার কথা বলেছেন ; যেমন- কর্মযোগে **'নির্মমো নিরহংকারঃ'** (২।৭১) পদগুলির দ্বারা, জ্ঞানযোগে **'অহংকারং ------বিমুচ্য নির্মমঃ'** (১৮।৫৩) পদসমূহের দ্বারা এবং ভক্তিযোগে **'নির্মমো নিরহংকারঃ'** (১২।১৩) ইত্যাদি

পদের দ্বারা সাধককে অহংকার ও মমত্ব রহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য এই তিন যোগপথে অহংকার ও মমত্ব ত্যাগ করার পন্থায় পার্থক্য আছে। যেমন—

কর্মযোগে প্রথমে কামনা ত্যাগ হয় ; কারণ, কর্মযোগী প্রথম থেকেই নিষ্কামভাবে কর্ম করতে শুরু করেন। তাঁর কামনা যখন সর্বতোভাবে ত্যাগ হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই স্পৃহা, মমতা এবং অহংকর্তৃত্ব বোধ দূর হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাত্তর সংখ্যক শ্লোকে ভগবান কর্মযোগীদের প্রথমে কামনা ত্যাগের কথা বলেছেন, পরে আসক্তি, মমতা ও অহংকাররহিত হওয়ার কথা বলেছেন।

জ্ঞানযোগে প্রথমে অহংকার দূর হয়। বন্ধনের মূল এই অহংকার-বোধ ত্যাগ হলে মমতা, আসক্তি এবং কামনা স্বাভাবিকভাবেই বর্জিত হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, জ্ঞানযোগীর প্রথমে অহং ত্যাগ হয়, পরে লিপ্ততা বা ফলেচ্ছা ত্যাগ হয়।

ভক্তিযোগে ভগবানের শরণাগত হওয়ায় 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার'—এইভাবে অহং বদল হয়ে যায় এবং ভগবানের কৃপায় ভক্তিযোগী অহংকার, মমতা ও আসক্তি-কামনা রহিত হয়ে যায়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টি সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, তুমি সর্বধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে শুধুমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ (অহংকার, মমত্ব ইত্যাদি দোষগুলি) থেকে মুক্ত করব।

এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষই অহংকার ও মমত্বরহিত হতে পারে। কারণ, অহংকার বা মমত্ব তার স্বরূপ নয়। অহংকার ও মমত্ব যদি মানুষের স্বরূপ হতো, তবে তা কখনও ত্যাগ করা সম্ভব হতো না এবং ভগবানও এর থেকে রহিত হবার কথা বলতেন না।

জীবাত্মা স্বয়ং যখন শরীরের সঙ্গে 'আমি এই শরীর' বলে অভিন্নতার সম্বন্ধ পাতায়, তখনই 'অহংকার' জন্ম নেয় এবং যখন শরীরের সঙ্গে 'এই দেহ আমার' এরূপ পৃথক্ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন 'মমতার' উৎপত্তি হয়। অহংকার ও মমতা এই দুই-ই উপাধি, স্বরূপ নয়—এই কথা বিবেকপূর্বক দৃঢ়তার সঙ্গে মনে রাখলে সাধক অনায়াসে এই দুটি থেকে রহিত হতে পারে।

সাধকের শরীরাদির সঙ্গে অহংকার ও মমতারূপে আরোপিত সম্পর্কটুকুই ত্যাগ করতে হবে। কারণ এটি তার স্বরূপ নয়। স্বরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, এই পুরুষ স্বয়ং অনাদি ও নির্গুণ হওয়ায় পরমাত্ম-স্বরূপই এবং এই শরীরে থেকেও তিনি কিছুই করেন না এবং কর্মফলেও লিপ্ত হন না, (১৩।৩১)। কিন্তু সে নিজে 'আমি করি এবং আমি চাই'— এইরূপ মনে করে নেয়। এই দুই উপাধি আরোপ করতে ভগবান নিষেধ করে বলেছেন—'যার অহংকর্তৃত্ব ভাব নেই এবং যার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সে যদি সমস্ত প্রাণীকে বধও করে, তাহলে তার দ্বারা হত্যা করা হয় না এবং তার দ্বারা সে লিপ্তও হয় না (১৮।১৭)। কারণ তার স্বরূপে প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্বাভিমান এবং কর্মলিপ্ততা নেই-ই।

শ্রীরামচরিতমানসে (তুলসীকৃত রামায়ণে) যেখানে শ্রীলক্ষ্মণ মায়ার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার উত্তরে ভগবান বলেছেন—

মৈ অরু মোর তোর তৈঁ মায়া।
জেঁহি বস কীন্হে জীব নিকায়া॥ (৩।১৫।১)

এর তাৎপর্য এই যে, অহংকার (আমি-ভাব) এবং মমতা (আমার-ভাব)—এগুলি হচ্ছে মায়ার স্বরূপ, নিজ স্বরূপ নয়। কিন্তু জীব এই মায়ার বশীভূত হয়েছে, বদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই বদ্ধদশা থেকে মুক্ত হতে হবে। সাধুদের বাণীও আছে—

মৈঁ মেরেকী জেবরী, গল বঁধ্যো সংসার।
দাস কবীরা কোঁ বঁধে, জাকে রাম আধার॥

শরীরাদিতে অহং-মমতা বোধ করলে স্ব-স্বরূপ পরাধীন হয়ে যায় এবং এতে অপরিচ্ছিন্নতা ও মলিনতা এসে পড়ে। অহংকার-মমতা ত্যাগ হলে স্বাভাবিক ভাব স্বরূপের বোধ হয়। অহংকার-মমতা ত্যাগ করার পূর্বেই সাধককে এক প্রত্যয় আনতে হবে যে, এগুলি তার নিজ স্বরূপ নয়। ত্যাগ তারই হতে পারে, যা তার নিজ স্বরূপ নয়। নিজ স্বরূপ কখনো ত্যাগ করা যায় না।

বাস্তবিক ব্যবহারেও দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি মনে যত বেশী অহংকার-মমতা রাখে, ততই সে সংসারে অসম্মান পায় ; এবং যে যত অহংবোধ ও মমত্ব ত্যাগ করে, ততই সে সংসারে সম্মাননীয় হয়ে ওঠে, মর্যাদা পেতে থাকে। সাধক নিজেও অনুভব করতে পারে যে, যতই সে সাধনপথে অগ্রসর হতে থাকে ততই তার

অহংকার ও মমত্ববোধ বর্জিত হতে থাকে। অহংবোধ ও মমত্ববোধ সর্বতোভাবে দূরীভূত হলে সাধক জীবন্মুক্ত হয়ে যায়।

অহংকার ও মমতায় আবদ্ধ মানুষ বিশেষভাবে অপবিত্র হয় এবং এগুলি দূর হলে সে অত্যন্ত পবিত্র হয়। যেমন, অহং-মমতাবদ্ধ কোন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হলে লোকে তার বস্ত্রাদি স্পর্শ করতে চায় না, কিন্তু যে ব্যক্তির অহং ও মমতাবোধ দূরীভূত হয়েছে সেইরূপ সাধু-মহাপুরুষ দেহত্যাগ করলে লোকে তার বস্ত্রাদি সম্মানের সঙ্গে রেখে দিতে চায় ; কারণ, অহংকার ও মমতা শূন্য থাকায় তাঁর ব্যবহৃত বস্তুগুলি অত্যন্ত পবিত্র হয়। শুধু পবিত্রই নয় অপরকে পবিত্র করার ক্ষমতাও তার থাকে। দ্বিতীয়তঃ যেখানে অহং ও মমতাসম্পন্ন সাধারণ ব্যক্তির দাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই স্থানে ভজন-ধ্যান করলে বিক্ষেপ হয় ; ভয় ভাব জাগে, ভজন তেমনভাবে জমে না। কিন্তু যেস্থানে অহংকার-মমত্ববোধ রহিত সাধু-মহাপুরুষকে দাহ করা হয়, সেইস্থানে বসে ভজন-ধ্যান করলে মন স্থির হয়, ভজন-ধ্যানে সাহায্য পাওয়া যায়, শান্তি মেলে এবং পবিত্র ভাব আসে।

অহংকার-মমতারহিত সাধু-মহাপুরুষদের স্মরণ করলে গৃহ পবিত্র হয়—**'যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৯।৩৩)। কিন্তু অহংকার ও মমত্ববোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের স্মরণ করলে মালিন্য আসে এবং অহংকার ও মমতা ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

যাঁর মধ্যে অহংবোধ ও মমত্ববোধ নেই, ভগবান তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে প্রকটিত হন। তাঁর স্পর্শযুক্ত বায়ু, তাঁর বাণী এবং তাঁর সংস্পর্শে এলে জীবমাত্রই পবিত্র হয়। কিন্তু এই পবিত্রতা যদি স্বীকার না করা যায় অর্থাৎ তাঁর ওপর অবিশ্বাস করা হয়, তবে সেই পবিত্রতা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

নিজস্ব যে সত্তা, তা নিরপেক্ষ, এর কোন পরিবর্তন নেই। পরিবর্তন হয় অহংবোধেই, যেমন—'আমি বিদ্বান', 'আমি মূর্খ', 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি ক্ষত্রিয়', 'আমি শূদ্র', 'আমি দেবতা', 'আমি রাক্ষস' ইত্যাদি রূপে 'আমি' ভাবেরই পরিবর্তন হয়, অস্তিত্বের (সত্তার) কোন পরিবর্তন হয় না। 'আমি' ভাব বদল হয় মাত্র কিন্তু অস্তিত্ব একভাবেই থাকে। কোন বর্ণ, আশ্রম, যোগ্যতা ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করলে 'আমি' হয়। সুতরাং 'আমি' সাপেক্ষ (অর্থাৎ নিরপেক্ষ নয়) এবং সত্তা স্বতঃই অস্তিত্ববান, সুতরাং সত্তা নিরপেক্ষ।

'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী', 'আমি নির্ধন', 'আমি রোগী', 'আমি নীরোগ'—এসবই পুরাতন কর্মের প্রভাবে হয়, অর্থাৎ এই সমস্ত বাহ্যিক পরিস্থিতি পূর্ব-কর্মের (প্রারব্ধের) ফলে হয়, কিন্তু স্ব-অস্তিত্ববোধ কোন কারণের ওপর নির্ভর করে না। স্ব-অস্তিত্ব কোন কর্মের ফল নয়। কোনও বর্ণ, আশ্রম, যোগ্যতা আদির উপরেও নির্ভর করে না। 'আমি' ত্যাগ করলে 'আছি' থাকে না, 'আছে'ই থাকে ; কারণ 'আমি'র জন্য 'আছি' থাকে।

সুখ বা দুঃখ স্ব-স্বরূপে থাকে না, তা 'আমি' ভাবেতেই থাকে। 'আমি'র সঙ্গে যোগ হলে, অহং-এ স্থিত হলে, প্রকৃতিতে স্থিত হলেই সে নিজে 'আমি সুখী', অথবা 'আমি দুঃখী' এরূপ মনে করে। কিন্তু যখন সে 'আমি'কে ত্যাগ করে দেয় এবং 'স্ব'তে স্থিত হয়, তখন সে আর সুখী বা দুঃখী হয় না, সুখ-দুঃখে তার সমবোধ হয়—**'সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ'** (১৪।২৪)।

যার অন্ত আছে তারই পরিবর্তন হয় কিন্তু যার অন্ত হয় না সেই বস্তুর কোন পরিবর্তন নেই। যেমন সুষুপ্তির সময় 'আমি' ভাব থাকে না, কিন্তু নিজ সত্তার ভাব থাকে যে, 'আমি খুব আরামে ঘুমিয়েছি।' এর তাৎপর্য এই যে, সকল অবস্থাতেই, সকল পরিস্থিতিতেই নিজ সত্তার অখণ্ড অনুভব থাকে, কিন্তু 'আমি' ভাবের অখণ্ড অনুভব হয় না।

যদি কেউ বলে যে জ্ঞান (মুক্তি) হলে শুধু আসুরী সম্পদযুক্ত অহং (১৬।১৩-১৫) দূরীভূত হয়, অহং সর্বতোভাবে দূর হয় না, সূক্ষ্মরূপে অহং থেকে যায়, তো তাদের কথা ঠিক নয়। কারণ অহং-এর উৎপত্তি হয় অবিদ্যা[১] থেকে এবং জ্ঞান হলে অবিদ্যার নাশ হয়।

---

[১]অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ। অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং------ (পাতঞ্জলযোগদর্শন ২।৩-৪)।

অবিদ্যাই যখন থাকে না, তখন অবিদ্যা থেকে উদ্ভূত অহম্ কিভাবে থাকতে পারে ? যে জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা নাশ না হয়, তা কিরূপ জ্ঞান ? সে তো কেবল বাচিক শাস্ত্রজ্ঞান, বাস্তবিক জ্ঞান (বোধ) নয়। দ্বিতীয়তঃ অহং যদি সর্বতোভাবে নাশ না হয়, তবে বীজ থেকে যেমন বিরাট মহীরূপ জন্মায়, তেমনি সূক্ষ্ম অহংও প্রাকৃত পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদির সঙ্গ পেয়ে বিরাট হয়ে ওঠে, আসুরী সম্পদসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

অহং ভোগেচ্ছা এবং মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা এই উভয় ইচ্ছার ওপর টিঁকে থাকে। ভোগেচ্ছা মিটলে মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা পূরণ হয়ে যায় অর্থাৎ চিন্ময়তার প্রাপ্তি ঘটে, যাতে অহং থাকে না, হয় না এবং হবেও না।

(৫৭) গীতায় কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের নিষিদ্ধতা

প্রকৃতৌ প্রকৃতেঃ কার্যে ভবন্তি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
শরীরবাঙ্‌মনোভিস্তাঃ প্রকটস্ত্যখিলাঃ সদা ॥
আত্মনি নৈব কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং নৈব কর্হিচিৎ।
প্রকৃতেরেব সম্বন্ধাম্মন্যতে স্বে তু পুরুষঃ॥

এক হলেন পরমাত্মা এবং অপরটি হলো তাঁর শক্তি, প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিতেই পরিবর্তন হয় এবং সেই প্রকৃতির যিনি আধার, প্রকাশক, আশ্রয়, তাঁর কখনো কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। প্রকৃতির এই পরিবর্তনকে গীতা কয়েক প্রকারে বর্ণনা করেছে ; যেমন—সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতির দ্বারা সম্পন্ন হয় (১৩।২৯)। গুণই গুণের দ্বারা প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতির গুণের দ্বারা হয় (৩।২৭-২৮ ; ১৪।২৩)। ইন্দ্রিয়ই ইন্দ্রিয়গত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ সমস্ত ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হয় (৫।৯)। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন হওয়ার কথাও গীতায় কয়েক প্রকারে বলা হয়েছে—কোথাও শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা বলা আছে (৫।১১), কোনও স্থানে শরীর, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং দৈব (সংস্কারকে)কে ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হওয়ার হেতু বলা হয়েছে (১৮।১৪)। কোন স্থানে শরীর, বাণী এবং মনকে ক্রিয়াগুলি প্রকট করার কারণ বলা হয়েছে এবং কোথাও স্বভাবই তার হেতু বলা হয়েছে (৫।১৪)। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি, গুণ এবং ইন্দ্রিয়—এই তিনটিই তত্ত্বতঃ এক ; কারণ, প্রকৃতি হচ্ছে মূল, প্রকৃতির কার্য হল গুণ এবং গুণের কার্য ইন্দ্রিয় সকল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কর্তৃত্ব অর্থাৎ শুধুমাত্র করা প্রকৃতিতে হয়, পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা (পুরুষ)তে নয় ; কারণ, কার্য এবং করণ দ্বারা সম্পন্ন ক্রিয়াগুলি উৎপন্ন করায় প্রকৃতিকে হেতু বলে জানানো হয়েছে—**কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে** (১৩।২০)।

ভোক্তৃত্বতে পুরুষকেই কারণ বলা হয়েছে—**'পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে'** (১৩।২০)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিস্থ পুরুষই হেতু হয়—**'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে'** (১৩।২১) অর্থাৎ প্রকৃতিতে স্থিত হওয়ার জন্যই পুরুষ ভোক্তৃত্বের হেতু হয়। যদি পুরুষ (স্বয়ং) প্রকৃতিতে স্থিত না হয়ে নিজ স্বরূপেই স্থিত থাকে তবে সে ভোক্তা হয় না। সেইজন্য ভগবান বলেছেন, 'এই পুরুষ স্বয়ং অনাদি এবং নির্গুণ হওয়ায় অবিনাশী পরমাত্মস্বরূপ, অতএব দেহে বসবাস করেও তিনি কিছুই করেন না বা কর্মফলে লিপ্ত হন না' (১৩।৩১)। এখানে 'করেন না'-এর অর্থ যে এতে তাঁর কর্তৃত্ব ভাব নেই এবং তিনি 'লিপ্ত হন না'-এর অর্থ এতে ভোক্তৃত্ব ভাব নেই।

সেই পুরুষ স্বয়ং যখন কর্মেন্দ্রিয় (শরীরাদি)র সঙ্গে মিশে থাকেন, তখন তিনি কর্তারূপে প্রতিভাত হন আর যখন জ্ঞানেন্দ্রিয় (মন, বাক্যাদি)-এর সঙ্গে মিশে থাকেন, তখন তিনি ভোক্তারূপে পরিচিত হন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যখন তিনি কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মেলেন তখন তিনি ভোক্তা নন বা যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মেশেন তখন তিনি কর্তা নন। আসলে কর্মেন্দ্রিয়ের প্রাধান্যে নিজেকে

কর্তা এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রাধান্যে তিনি নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করেন। বোধ (তত্ত্বজ্ঞান) না হওয়া পর্যন্ত এই কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের বোধের প্রভাব থেকে যায়।

ভোক্তা, ভোগ্যবস্তু এবং ভোগরূপী ক্রিয়া—এই তিনটিতে কারণ-রূপ প্রকৃতিগত ঐক্য হয়ে থাকে। ভোক্তার মধ্যে প্রকৃতির যে অংশ বিদ্যমান, তাই ভোগ্য বস্তু এবং ভোগরূপী ক্রিয়ার সঙ্গে এক হয়ে থাকে। সেই প্রকৃতির অংশের সঙ্গে একাত্ম হলে, তার সঙ্গে মিলে-মিশে গেলে এই পুরুষ (চেতন) ভোক্তারূপে প্রতিভাত হন। ভোক্তা হলেও ভোগের যে আকর্ষণ তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়, তা আসলে প্রকৃতির অংশেই হয় ; কিন্তু শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ার জন্য সেই পুরুষ প্রকৃতি-অংশের আকর্ষণকে নিজের আকর্ষণ বলে মনে করে নেন। তিনি যদি বিবেক-বোধ দ্বারা অনুভব করেন যে, এই আকর্ষণ জড় প্রকৃতির অংশেই হচ্ছে, স্বরূপের নয়, তাহলে তিনি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। সেইজন্য ভগবান বলেছেন যে, বিচারশীল মানুষ যখন গুণ ভিন্ন অন্য কাউকে কর্তা দেখেন না এবং নিজেকে গুণগুলির অতীত বলে অনুভব করেন, তখন তিনি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন (১৪।১৯)। কেন প্রাপ্ত হন ? কারণ, তিনি স্বয়ং স্বাভাবিকভাবে গুণগুলিতে নির্লিপ্ত (১৩।৩১)। অর্থাৎ পুরুষ যে জড়-অংশের সঙ্গে একাত্মবোধে নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করেন, সেই জড়-অংশে ভোগরূপী ক্রিয়াও থাকে। সুতরাং ভোক্তাও জড়-অংশ রূপেই প্রতিভাত হয়। ভোগরূপী ক্রিয়াও জড়-অংশেতেই হয়, ভোগের সামর্থ্যও জড়-অংশে স্থিত ও ভোগ্য পদার্থও জড় প্রকৃতির কার্য। সেইজন্য ভোক্তা, ভোগরূপী ক্রিয়া, ভোগের সামর্থ্য এবং ভোগ্য পদার্থ সমস্তই প্রকৃতির (১৩।৩০)। ভোগ করার সময় পুরুষের মধ্যে কোন বিকারও হয় না (১৩।৩১) ; কিন্তু তাদাত্ম্যের জন্য পুরুষ নিজের মধ্যে অহংভাব আরোপ করে অর্থাৎ 'আমি সুখী বা আমি দুঃখী'—এইরূপ মনে করে। সেইজনাই নিজেকে জড়-অংশীভূত মনে করায় ভোক্তার ভোগে আকর্ষণ হয়, নাহলে স্বরূপ-চেতনের ভোগাদিতে আকর্ষণ হতেই পারে না।

ভগবান গুণগুলিকে কর্তা বলেছেন, সেই কর্তার মধ্যে ভোক্তৃত্বও লিপ্ত থাকে, কারণ ভোগ ক্রিয়াগত-ই হয় (৫।৮-৯)। ক্রিয়া ছাড়া ভোগ সম্ভব হয় না, এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, স্বরূপে কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব-দুই এর কোনটাই নেই।

কর্তৃত্ব বোধের সঙ্গেই ভোক্তৃত্ব আসে অর্থাৎ যে কর্তা সেই ভোক্তা রূপে প্রতিভাত হয়। কারণ স্বয়ং কোনো প্রয়োজনে, ফলের ইচ্ছায় কর্ম করতে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ ভোক্তৃত্ব ভাব রাখার জন্য একে কর্তা বলা হয় । সুতরাং কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব দুটি আলাদা বস্তু নয়, দুটি আসলে একই[১]। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে গেলে কর্তৃত্বের মধ্যে স্থূলতা ও ভোক্তৃত্বের মধ্যে সূক্ষ্মতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দুটি একই ; কারণ দুটিই প্রকৃতির সম্বন্ধ থেকে হয়। অতএব কর্তৃত্ব দূর হলে ভোক্তৃত্ব থাকে না এবং ভোক্তৃত্ব না থাকলে কর্তৃত্বও চলে যায়।

জিজ্ঞাসা—গীতায় আছে যে সাধক 'আমি কিছুই করি না'—এরূপ যেন মনে করেন (৫।৮) ; যাতে 'আমি কর্তা' এই ভাব নেই (১৮।১৭) ইত্যাদি। যদি স্বরূপের কর্তৃত্ব না থাকে তাহলে 'আমি কিছু করি না' ; 'যার অহং ভাব নেই'—এরূপ বলার (স্বরূপে কর্তৃত্বের নিষেধ করার) প্রয়োজনই থাকে না। কারণ কোন জিনিস প্রাপ্তির প্রশ্ন থাকলে তবেই তা নিষেধ করা যেতে পারে। **'প্রাপ্তৌ, সত্যাং নিষেধঃ'**। যেখানে প্রাপ্তিই নেই, সেখানে নিষেধ করার ব্যাপারই আসে না। তাই উপরিউক্ত বাক্য দ্বারা কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ করায় প্রমাণিত হয় যে, স্বরূপে কর্তৃত্ব থাকে। অতএব কর্তৃত্ব শুধু প্রকৃতিতে আছে স্বরূপে (চেতনে) নেই এরূপ বলার তাৎপর্য কি ?

সমাধান—প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতিতে হয়, কিন্তু 'আমি কর্ম করি'—এই কর্তৃত্বের ভাব স্বরূপে থাকে অর্থাৎ স্বরূপ নিজের মধ্যে কর্তৃত্বকে মেনে নেয় ; কারণ মানা বা না মানা চেতনে (স্বরূপ)-ই হয়, জড় প্রকৃতির (শরীরে) মধ্যে নয়। স্বয়ং নিজের মধ্যে কর্তৃত্বের ভাব আরোপিত করে, সেজনাই সে ভোক্তা হওয়ার হেতু হয়।

---

[১]নিজের মধ্যে কর্তা ভাব না রেখেও ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু নিজেকে সুখী বা দুঃখী বলে মনে না করলে ভোক্তৃত্ব প্রমাণিত হয় না।

স্বরূপে যদি কর্তৃত্বের ভাব না থাকে, তাহলে 'পুরুষ ভোক্তৃত্বের হেতু হয়' (১৩।২০)—এ বলা যায় না। যতক্ষণ স্বরূপের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের ভাব স্বরূপেই থাকে। সুতরাং কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের ভাব প্রকৃতির সংস্পর্শে আসাতেই স্বয়ং-এর মধ্যে হয় (৩।২৭)। যদি প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়, তাহলেই এই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের ভাবনা চলে যায় এবং স্বরূপ শরীরে স্থিত হয়েও কিছুই করে না বা কোন কর্মফলে লিপ্ত হয় না (১৩।৩১)।

ভগবান গীতায় এই জীবাত্মাকে পরা (চেতন) প্রকৃতি এবং জগৎ-সংসারকে অপরা (জড়) প্রকৃতি বলেছেন। এই পরা ও অপরা সংযোগেই সমস্ত প্রাণীজগৎ উৎপন্ন হয়। এইসব প্রাণী মনুষ্যলোকের, স্বর্গলোকের, নরকের বা চৌরাশী লক্ষ যোনির বা ভূত-পিশাচ আদি যাই হোক তা সমস্তই পরা-অপরা সম্বন্ধ থেকে উদ্ভূত (৭।৬)। এই কথাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে, স্থাবর-জঙ্গম যত প্রাণী উৎপন্ন হয় তা সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই হয়। সংযোগ করার, সম্বন্ধ মানার যোগ্যতা সামর্থ্য চেতনের দ্বারাই হয়, জড় প্রকৃতিতে নয়। সম্বন্ধকে স্বীকার করায় অথবা না করায়, মানায় বা না মানায় স্বরূপ (স্বয়ং) সর্বতোভাবে স্বাধীন। যখন সেই স্বরূপ অবিবেকপূর্বক প্রকৃতি ও তার কার্যরূপ শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন তার মধ্যে অভাব অনুভূত হয়। বিবাহের পরে কখনও যখন কারও স্ত্রীর বস্ত্র, অলংকারাদির অভাব হয়, তখন তা সেই ব্যক্তির নিজস্ব অভাব বলে মনে হয় ; তেমনি স্বরূপ (স্বয়ং) শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে শরীরের যে কোন অভাবই তার নিজের বলে মনে করে। সেই অভাব পূরণ করার জন্য সে নিজ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কামনা-বাসনাপূর্বক যে চেষ্টা করে, তাতে তার কর্তৃত্ব ভাব হয়, অর্থাৎ তার মধ্যে 'আমি কর্ম করি'—এইভাব এসে যায়। কিন্তু তার মধ্যে কর্তৃত্ব-ভাব এলেও ক্রিয়া, পদার্থ, বস্তু ইত্যাদি রূপে প্রকৃতিই পরিণতি লাভ করে। এর অর্থ হলো ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতির দ্বারা তথা প্রকৃতিতে অনুষ্ঠিত হয় (১৩।৩০)। স্বরূপে কখনো কোন ক্রিয়া হয়ই না, কারণ সে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত এবং আসক্তিবিহীন। তার অনাসক্তি কখনও দূর হয় না, যেমন তেমনই থাকে (১৩।৩১)।

পুরুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ মেনে নেয় তখন সে নিজের মধ্যে অভাব অনুভব করে এবং তা পূর্তির চেষ্টা করে ; সেই চেষ্টা অর্থাৎ কর্মের পূর্তি-অপূর্তি, সিদ্ধি-অসিদ্ধি এবং ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ঘটে। যখন কর্মের পূর্তি, সিদ্ধি এবং ফলের প্রাপ্তি লাভ হয়, তখন তার সুখ অনুভূত হয় এবং দেহধারণকারী নিজেকে সুখী বলে মনে করে। কিন্তু যখন কর্মের অপূর্তি, অসিদ্ধি এবং ফলের অপ্রাপ্তি ঘটে, তখন সে দুঃখ পায় এবং নিজেকে দুঃখী বলে মনে করে। এইভাবে সুখ-দুঃখের অনুভব করাতে, নিজেকে সুখী বা দুঃখী বলে মনে করলে এই পুরুষ সুখ-দুঃখের ভোক্তারূপে প্রতিভাত হয় (১৩।২১)। ভোক্তা হলে অর্থাৎ নিজেকে ভোক্তা বলে মেনে নিলেও ভোগরূপী ক্রিয়া প্রকৃতিতেই হয়, স্বরূপে নয়।

কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বতে ক্রিয়ার যে অংশ তা প্রকৃতির অংশ ; কারণ 'করা' ও 'ভোগ' করা রূপ ক্রিয়া প্রকৃতিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতি ও শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্যতার জন্য পুরুষ নিজের মধ্যে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-ভাব স্বীকার করে এবং সেইজন্যই সে নিজের মধ্যে প্রাকৃত পদার্থের আকর্ষণ অনুভব করে। যখন বিবেক-বোধ জাগরিত হয়ে পুরুষ এই প্রকৃতির সঙ্গে তার পৃথকত্ব অনুভব করে, তখন তার আর কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-ভাব থাকে না। তখন সে আর সুখী বা দুঃখী হয় না ; কারণ শুদ্ধস্বরূপে সুখ বা দুঃখ বলে কিছু থাকেই না। স্বরূপের সুখ বলে কিছু থাকলে সে কখনো দুঃখী হোত না এবং দুঃখ থাকলে কখনো সুখী হোত না। সুখ এবং দুঃখ আসে ও যায়, কিন্তু স্বয়ং যেমন তেমনি থাকে। সুখ এবং দুঃখের অবস্থার পরিবর্তন হয়, কিন্তু স্বয়ং (স্বরূপ) অপরিবর্তনীয় থাকে। কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব ভাবও বদলায় কিন্তু স্বরূপের কখনো পরিবর্তন হয় না। স্বরূপ সমানভাবে দুই-এর প্রকাশক।

বাস্তবিক সত্য ও সর্বানুভূত ব্যাপার এই যে, যে ব্যক্তি লেখাপড়া করে, তারই পড়ার অভাব অনুভূত হতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তি নিরক্ষর তার লেখাপড়াগত অভাববোধ অনুভবেই আসে না। যে ধন, মান, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সংস্পর্শে এসেছে, সে-ই পারে এসবের অভাব অনুভব করতে। কিন্তু যে ব্যক্তি ধন-মান ইত্যাদি স্বীকার করে না, তার এইসবে কিছু যায় আসে না। এইরূপ এই স্বরূপ যখন দেহ, পরিবার, ধন, মান, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সঙ্গে

নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে তখন তার অভাবের অনুভূতি আসে। সে যেভাবে শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়, তদনুসারে তার অভাবের অনুভূতি বাড়তে থাকে। সেই অভাবপূর্তির জন্য সে তখন কর্ম করে, একেই কর্তৃত্ব বলে এবং ঐ কর্মের পূর্তি বা অপূর্তিতে সুখী বা দুঃখী হওয়াকেই বলা হয় ভোক্তৃত্ব। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব স্বরূপেও নেই এবং প্রকৃতিতেও নেই। চেতন প্রকৃতির (শরীরের) সম্বন্ধ মেনে নেয় এবং এই সূত্রেই কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব বিরাজ করে (৫।১৪)।

শরীরের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মানার কারণ কি ? এর মূল কারণ হচ্ছে অজ্ঞান। জ্ঞানের অভাবে অজ্ঞান নয়, অসম্পূর্ণ জ্ঞানকেই অজ্ঞান বলা হয়। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, নিজের জানা বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়াই অজ্ঞান। যেমন, মানুষ এ বিষয়ে অবহিত যে, 'আমি শরীর নই এবং এ শরীরও আমার নয়', তা সত্ত্বেও সে শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' বলে মনে করে, একেই অজ্ঞান বলে। যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তার নাশ হবেই—এটাই নিয়ম ; সুতরাং শরীর যখন উৎপন্ন হয়েছে তার নাশ হবেই (মরবেই), এ কথা সকলেই জানে, তবুও 'আমার শরীর ঠিক থাক, যেন নষ্ট না হয়'—এই ইচ্ছা পোষণ করার নামই অজ্ঞান।

এই অজ্ঞান কবে থেকে এলো ? যখন থেকে পুরুষ নিজ বিবেকের অনাদর করতে আরম্ভ করলো, বিবেকের অবহেলা করতে আরম্ভ করল, তখন থেকে তার এই অজ্ঞানতা। এর তাৎপর্য এই যে প্রকৃতিতেই সব ক্রিয়া ঘটে থাকে, তবুও পুরুষ তাকে নিজের বলে মনে করে, এইভাবেই অজ্ঞানতার শুরু।

কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নিজের মধ্যে নেই, এটি মেনে নেওয়া হয়েছে, সেইজন্যই এটি নাশ হয়। কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব যদি স্বরূপের হতো, তবে তার কখনো নাশ হোত না—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (২।১৬), নষ্ট সেই জিনিসই হয়, যার প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নেই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক শ্লোকে পুরুষকে 'প্রকৃতিস্থ' এবং একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে পুরুষকে 'শরীরস্থ' বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, যিনি শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিয়েছেন বা তাদাত্ম্য বোধ করেছেন, তিনি সমস্ত প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য সংসার-জগতের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। যেমন, মানুষ যখন কোন একটি মহিলাকে বিবাহ করে, তখন মহিলার পরিবারের সকল মানুষের সঙ্গেই সেই ব্যক্তিটির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তেমনি স্বরূপ পুরুষ কোন একটি দেহের সঙ্গে সম্পর্ক করলে তার প্রকৃতি এবং সমস্ত জগতের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হলে সে সকল গুণ ও সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয় (১৩।২০) অর্থাৎ সুখী ও দুঃখী হয়।

প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের সুখ বা দুঃখ নেই। সে সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে, আনন্দস্বরূপ। কিন্তু যখন সে এই প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে এক বলে মনে করে, তখন সে অনুকূল পরিস্থিতিতে 'আমি সুখী' এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে 'আমি দুঃখী' এরূপ অনুভব করে[১]। যখন এই স্বরূপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করে নিজ স্বরূপে স্থিত হয়, তখন সে সুখ-দুঃখে সমত্ব লাভ করে। তখন পরিচ্ছিন্ন অহং, যাকে **'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** পদের দ্বারা (৩।২৭) বলা হয়েছে, তা দূর হয় এবং তার বুদ্ধি সাম্যাবস্থায় স্থিত হয়ে যায়, মন নির্বিকল্প হয়, ইন্দ্রিয় নির্বিষয় হয় অর্থাৎ তার মধ্যে রাগ-দ্বেষ থাকে না এবং স্থূল-শরীরের প্রতি 'আমি' এবং 'আমার' ভাব দূরীভূত হয়। এইরূপ মহাপুরুষগণ সংসার জয় করেন অর্থাৎ সাংসারিক সংযোগ-বিয়োগের ঊর্ধ্বে চলে যান। কারণ, তিনি নিজ স্বরূপে স্থিতি লাভ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বরূপে স্থিত হলেন তা নয়, আসলে তিনি তো সর্বদাই স্বরূপে স্থিত। যখন তিনি দেহাদির মধ্যে নিজ স্থিতি মেনে রেখেছিলেন তখনও তিনি শরীরে স্থিত ছিলেন না, সেইসময়ও তিনি কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব রহিতরূপে বিরাজিত ছিলেন—**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (১৩।৩১) অর্থাৎ স্বরূপের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বলে কিছু

[১]প্রকৃতির স্বরূপ হল—ক্রিয়া এবং পদার্থ অর্থাৎ প্রকৃতিই ক্রিয়া এবং পদার্থরূপে প্রকটিত হয়। ক্রিয়া এবং পদার্থের সংযোগে যে সুখ হয়, তাকে 'ভোগ' বলে, যোগ নয়। কিন্তু পরমাত্মার সম্পর্ক থেকে যে সুখ হয় তাকে 'যোগ' বলে, ভোগ নয়। অতএব এই সুখে ভোক্তা থাকে না।

নেই। যদি প্রকৃতপক্ষে তিনি কর্তা বা ভোক্তা হতেন, তাহলে ভগবান কি করে বলেন, **'ন করোতি ন লিপ্যতে'** ? যদি তাঁর তিনগুণের সঙ্গে একত্ব ঘটত, তাহলে ভগবান **'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব'** (২।৪৫) কথাটির দ্বারা কিভাবে ত্রিগুণরহিত হওয়ার আদেশ দেন ? নিষেধ তারই হতে পারে যা প্রকৃতপক্ষে হয় না।

জ্ঞানযোগী সাধক 'প্রকৃতিজাত গুণই গুণের মধ্যে প্রবর্তিত হচ্ছে'—এইরূপ মনে করে নিজেকে ঐ ক্রিয়াসমূহের কর্তা বলে মনে করেন না (৫।৮-৯ ; ১৩।২৯), সুতরাং তাঁর কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব দূর হয়।

কর্মযোগী সাধক শুধু যজ্ঞ-পরম্পরা বা কর্তব্য-কর্ম পরম্পরা সুরক্ষিত রাখবার জন্যই কর্ম করে থাকেন। কেবল অপরের কল্যাণের নিমিত্ত কর্তব্য-কর্ম অনুষ্ঠিত করায় তাঁর কর্তৃত্ব কর্তব্য-কর্মের সঙ্গে সঙ্গে অপরের সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন শুধু সেবাই থেকে যায়, সেবক থাকে না। সুতরাং তাঁর কর্তৃত্ব থাকে না। এইভাবেই কর্মযোগী ফলেচ্ছা কামনা ও আসক্তি-রহিত হয়ে তৎপরতাপূর্বক নিজ কর্তব্য পালন করেন (২।৫১)। ফলেচ্ছা না থাকায় তাঁর ভোক্তৃত্বও থাকে না। অর্থাৎ অন্যের কল্যাণের জন্য কর্ম করলে কর্তৃত্ব এবং ফলেচ্ছা না থাকায় তাঁর ভোক্তৃত্ব দূরীভূত হয় (৪।২০)।

ভক্তিযোগী সাধক শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিসহ নিজেকেও ভগবানে অর্পণ করেন (১৮।৬৬)। তাঁর দ্বারা যা কিছু ক্রিয়া হয়, সবই ভগবানের করানো ; সুতরাং তাঁর কর্তৃত্ব থাকে না। তিনি বস্তু-ব্যক্তি ইত্যাদি সংসারের পদার্থমাত্রকেই ভগবানের বলে মনে করেন (৫।২৯) ; সুতরাং তাঁর ভোক্তৃত্বও থাকে না।

(৫৮) গীতায় গুণসমূহের বর্ণনা

গুণবর্ণনতাৎপর্যং গ্রহণত্যাগয়োর্মতম্।
সত্ত্বং গ্রাহ্যং রজস্ত্যাজ্যং ত্যজনীয়ং তমঃ সদা॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান সৎ-এর মহিমা জানাবার জন্য এবং অসৎ থেকে পৃথক থাকার জন্য সৎ-অসৎ-এর বর্ণনা করেছেন। এইরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশ সংখ্যক থেকে তিপ্পান্ন সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ভগবান নিষ্কামভাবের মহিমা জানিয়েছেন এবং কামনা পরিত্যাগ করার নিমিত্ত একনিশ্চয়াত্মিকা বা নিষ্কাম ও অনিশ্চয়াত্মিকা বা সকাম মানুষের বর্ণনা করেছেন। বেদে বর্ণিত ভোগ এবং ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য যারা উৎসাহী, তারা অব্যবসায়ী বা অনিশ্চয়যুক্ত। বেদের যে খণ্ডে ভোগ ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা আছে তাকে **'ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ'** (২।৪৫) বলা হয়েছে। সেই ভোগ এবং ঐশ্বর্য থেকে সরিয়ে অর্জুনকে নিষ্কাম করার উদ্দেশ্যে ভগবান বলেছেন যে, 'হে অর্জুন, তুমি তিনগুণের কার্যরূপ সংসার থেকে অর্থাৎ ভোগ ও ঐশ্বর্য থেকে দূরে থাক'—**'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন'** (২।৪৫)।

প্রকৃতির গুণে বশীভূত প্রাণীদের দ্বারা প্রকৃতি-কেন্দ্রিক গুণ কার্য করিয়ে নেয় ফলে তাদের ক্রিয়া করতেই হয়, অর্থাৎ তারা কর্ম না করে থাকতেই পারে না—**'কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ'** (৩।৫)।

প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারাই ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠিত হয়—**'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ'** (৩।২৭) অর্থাৎ স্বরূপের (স্বয়ং-এর) এইসব ক্রিয়ার সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক নেই। কিন্তু অহংকারে মোহিত অন্তঃকরণ-যুক্ত মানুষ নিজেকে কর্তা বলে মনে করে ; সুতরাং সে বদ্ধ হয়ে যায়। গুণ ও কর্মের বিভাগগুলি[১]

[১]গুণের কার্য হওয়ায় শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সব 'গুণ-বিভাগ' এবং শরীরাদিতে যে ক্রিয়াসকল হয় তা 'কর্ম-বিভাগ' রূপে অভিহিত হয়।

যাঁরা জানেন, তাঁরা 'গুণই গুণগুলিতে প্রবর্তিত হয়'— **'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'** (৩।২৮) অর্থাৎ সমস্ত পরিবর্তনগুলি গুণেই হতে থাকে, ক্রিয়া এবং কর্তৃত্ব কেবল গুণেই হয়, নিজের মধ্যে নয়—এরূপ জেনে তাতে আসক্ত হন না। সুতরাং তাঁরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যান। কিন্তু যে সমস্ত মানুষ এই গুণগুলিতে মোহিত হন, তাঁরা আসক্ত হওয়ায় বদ্ধ হন—**'প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু'** (৩।২৯)।

তৃতীয় অধ্যায়ের পঁয়ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকের **'বিগুণঃ'** শব্দ সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিন গুণ রহিত হওয়ার অর্থ বহন করে না, তা আসলে সদ্‌গুণ-সদাচারের অভাবের বাচক।

চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে সৃষ্টি-রচনার সময়ের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলছেন যে, পূর্বে প্রাণীদের গুণ, স্বভাব যেরূপ ছিল এবং তাদের যেমন কর্ম ছিল, সেই অনুযায়ী আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণের বিভাগ করেছি—**'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'** (৪।১৩)। 'কিন্তু আমি এই রচনারূপ কর্মে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকি। মানুষেরও সেইরূপ সমস্ত কাজ করার সময় নির্লিপ্ত থাকা উচিত।'

সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সংসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যত ভাব আছে, তা সমস্তই আমা-হতে উদ্ভূত, কিন্তু এগুলি আমাতে বা আমি তাদের মধ্যে নই অর্থাৎ সমস্ত কিছুই আমি। কারণ আমি ছাড়া গুণগুলির স্বতন্ত্র সত্তা হয়ই না। সুতরাং সাধকের দৃষ্টি আমার দিকেই থাকা উচিত, গুণগুলির দিকে নয়। যাদের দৃষ্টি গুণগুলির দিকে থাকে, তারা সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাবে বিমুগ্ধ হয় এবং তাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং তারা গুণাতীত আমাকে জানতে পারে না (৭।১৩)। আমার এই গুণময়ী মায়া অতিক্রম করা বড়ই দুস্তর—**'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া'**(৭।১৪)। কিন্তু যে কেবল আমার শরণাগত, আমার আশ্রিত, সে মায়াকে অতিক্রম করে যায়—**'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'** (৭।১৪)। অর্থাৎ যে মানুষ এই গুণগুলি হতে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে কেবল আমার শরণাগত হয়, সে এই গুণগুলিকে অতিক্রম করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চোদ্দ সংখ্যক শ্লোকে **'সর্বেন্দ্রিয় গুণা- ভাসম্'** পদ দ্বারা 'সর্বেন্দ্রিয়গুণ' শব্দ ইন্দ্রিয়গুলির পাঁচটি বিষয় (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ)-এর বাচক। এই ইন্দ্রিয়গুলি এবং তার বিষয়গুলিকে জ্ঞেয়তত্ত্ব পরমাত্মাই প্রকাশিত করেন। এই জ্ঞেয়তত্ত্ব সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনটি গুণরহিতও বটে, আবার তিনটিগুণের ভোক্তাও অর্থাৎ এই তত্ত্ব নির্গুণ এবং সগুণও— **'নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ'**।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোকে প্রকৃতি (ক্ষেত্র) এবং পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ)-এর বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, প্রকৃতি এবং পুরুষ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে অর্থাৎ প্রকৃতির থেকে পুরুষ (চেতন) পৃথক্। সেই প্রকৃতিতেই বিকার, গুণ এবং কার্য ও কারণের দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয়। সুতরাং এই তিনের কোনটির সঙ্গেই (চেতন) পুরুষের সম্বন্ধ নেই। কিন্তু পুরুষ যখন প্রকৃতিতে স্থিত হয়, প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য করে, তখন সে (প্রকৃতিস্থ পুরুষ) প্রকৃতির গুণগুলির ভোক্তা হয়ে ওঠে। এই গুণগুলির ভোক্তা হওয়ায়, গুণগুলির সঙ্গ করায় তার উচ্চ-নীচ যোনিতে গমনের কারণ হয়ে যায় (১৩।১৯-২১)। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে এবং গুণসহ প্রকৃতিকে পৃথক্‌ভাবে জানে অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে নিজের কোন সম্পর্ক নেই—এই বাস্তবিকতা অনুভব করে নেয়, সে মুক্ত হয়ে যায় (১৩।২৩)। এর তাৎপর্য এই যে, জীবের প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ নেই এবং প্রকৃতিজাত গুণের সঙ্গেও তার সম্বন্ধ নেই।

গুণ হল প্রকৃতিজাত, জীব (স্বয়ং) গুণরহিত—এই কথা জানাবার জন্য ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে জীবকে 'নির্গুণ' বলেছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে গুণগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেইজন্য চতুর্দশ অধ্যায়ে এগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ভগবান বলেছেন যে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত (১৪।৫)। এর মধ্যে সত্ত্বগুণের স্বরূপ নির্মল, প্রকাশক এবং নির্দোষ, রজোগুণের স্বরূপ রাগাত্মক এবং তমোগুণের স্বরূপ মোহাত্মক (ভ্রান্তিজনক)। সত্ত্বগুণ সুখ তথা জ্ঞানের দ্বারা, রজোগুণ কর্মের আসক্তিতে এবং তমোগুণ নিদ্রা,

আলস্য তথা প্রমাদ দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে (১৪।৬-৮)। সত্ত্বগুণ সুখে ও রজোগুণ কর্মে লিপ্ত করে জীবকে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ জ্ঞান আবৃত করে প্রমাদ উৎপন্ন করে মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে। এই তিন গুণের একটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে অন্য দুটি দুর্বল হয়। রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে রজোগুণ প্রবল হয় আবার সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করে তমোগুণ প্রবল হয় (১৪।৯-১০)।

ইন্দ্রিয়াদিতে প্রকাশ উদ্ভাসিত হলে এবং বুদ্ধিতে বিবেক বোধ জাগ্রত হলে বুঝতে হবে এ সত্ত্বগুণের লক্ষণ। অন্তঃকরণে লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি, নতুন কর্ম শুরু, শান্তির অভাব এবং স্পৃহা উৎপন্ন হওয়া—এ সবই রজোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ। অন্তঃকরণে অপ্রকাশ বা অন্ধকার, অনুদ্যম (আলস্য), প্রমাদ (বিস্মৃতি) এবং মোহ উৎপন্ন—এ সবই তমোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ (১৪।১১-১৩)।

মৃত্যুর সময় সত্ত্বগুণের তৎকালীন বৃত্তি বৃদ্ধি পেলে জীব স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করে, রজোগুণের মৃত্যুকালীন বৃত্তির বৃদ্ধিতে জীব পৃথিবীতে মানুষ রূপে জন্ম নেয় এবং তমোগুণের তৎকালীন বৃত্তির বৃদ্ধিতে জীব পশু, পক্ষী ইত্যাদি মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে (১৪।১৪-১৫)।

শ্রেষ্ঠ কর্মের ফল সাত্ত্বিক তথা নির্মল হয়, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল হয় অজ্ঞান (মূঢ়তা) (১৪।১৬)। সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান, রজোগুণ থেকে লোভ এবং তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয় (১৪।১৭)। সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তি ঊর্ধ্বলোকে, রজোগুণে স্থিত ব্যক্তি মনুষ্যলোকে (মধ্যলোকে) এবং তমোগুণে স্থিত ব্যক্তি অধোগামী (পশুযোনি)তে যায় (১৪।১৮)।

বিচারশীল ব্যক্তি যখন এই তিনটি গুণ ভিন্ন অন্য কাউকে কর্তা বলে মনে করে না অর্থাৎ সমস্ত ক্রিয়া এবং পরিবর্তন গুণগুলি দ্বারাই হয়—এইরূপ বোধ দৃঢ়রূপে হয়, তখন তার অকর্তৃত্ব, অসঙ্গ এবং নির্লিপ্ততার অনুভব হয়ে ভগবৎভাব প্রাপ্তি ঘটে (১৪।১৯)। দেহের উৎপাদক এই তিনগুণকে অতিক্রম করে, জন্মমৃত্যুরহিত মানুষ সেই অমরত্বের অনুভব করে যা স্বয়ং-এর (স্বরূপের) স্বতঃসিদ্ধ (১৪।২০)।

গুণাতীত পুরুষে অর্থাৎ অমরত্ব অনুভবকারী মানুষের সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক বৃত্তির হ্রাস-বৃদ্ধিতে কোন অনুরাগ বা দ্বেষ হয় না। শুধু তাই নয়, সে উদাসীনরূপে বিরাজ করে, গুণগুলির দ্বারা সে বিচলিত হয় না তথা 'গুণই গুণের দ্বারা প্রবর্তিত হয়'—এই অনুভব হওয়ায় সে নিজের মধ্যে কখনো কিছুমাত্র পরিবর্তন অনুভব করে না (১৪।২২-২৩)। এটি জ্ঞানযোগের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে। ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে যখন সাধকের ধ্যেয়, লক্ষ্য কেবল ভগবানই থাকেন, তখন সে স্বতঃই গুণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত হয়ে যায় (১৪।২৬)।

জল পেলে যেমন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বেড়ে ওঠে, সেইরূপ সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনগুণের সংস্পর্শে সংসারবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চলোকে বিস্তৃত হয় (১৫।২)। এর তাৎপর্য এই যে, গুণগুলির সংস্পর্শেই জীবসকল অধোলোক, মধ্যলোক এবং ঊর্ধ্বলোকে জন্মগ্রহণ করে, গুণের সংগ্রহেই সে ভোক্তারূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু স্বয়ং নির্লিপ্তই থাকে—এই তত্ত্ব বিবেকবান ব্যক্তিই জানেন, অবিবেকিগণ নয় (১৫।১০)।

মানুষের স্বভাব থেকে উৎপন্ন শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয়—সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী (১৭।২)। যার যেরূপ শ্রদ্ধা, তার সেইরূপই নিষ্ঠা হয় এবং সেই নিষ্ঠা অনুযায়ী তার প্রবৃত্তি হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তি দেবগণের পূজা করে, রাজসিক ব্যক্তি যক্ষ-রাক্ষস ইত্যাদির পূজা করে, এবং তামসিক ব্যক্তি ভূত-প্রেতাদির পূজা করে (১৭।৩-৪)। যারা পূজাদি করে না, তাদের খাদ্যের রুচির দ্বারা (তাদের) জানা যায়। সাত্ত্বিক ব্যক্তির সরস স্নিগ্ধ আহারদি প্রিয়, রাজস ব্যক্তি অতি কটু অম্লাদি খাদ্যদ্রব্য পছন্দ করে এবং তামস ব্যক্তি অর্ধপক্ব, নীরস, অপবিত্র ভোজ্য পদার্থ পছন্দ করে (১৭।৮-১০)

ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ব্যক্তির দ্বারা বিধিপূর্বক সাত্ত্বিক যজ্ঞ, ফললাভের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বিধিপূর্বক রাজস যজ্ঞ, এবং বিবেকহীন ব্যক্তির দ্বারা বিধি, মন্ত্র, অন্ন, দক্ষিণা এবং শ্রদ্ধাহীন তামস যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়

(১৭।১১-১৩)। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তি সাত্ত্বিক তপ করে, মান এবং সৎকারকামনাকারী ব্যক্তি দম্ভপূর্বক রাজস তপ করে এবং মূঢ় ব্যক্তি নিজ শরীরকে কষ্ট দিয়ে ও অপরকে দুঃখ দেবার উদ্দেশ্যে তামস তপ করে (১৭।১৭-১৯)। দেশ, কাল ও উপযুক্ত পাত্র পেলে প্রত্যুপকারের আশা না রেখে যে দান করা হয় তাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়, প্রত্যুপকারের আশায় এবং ফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে যে দান, তাকে বলা হয় রাজসিক দান এবং দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা না করে অবজ্ঞাসহকারে প্রদত্ত দানকে তামস দান বলা হয় (১৭।২০-২২)।

মোহপূর্বক নির্দিষ্ট কর্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলে, শারীরিক কষ্টের ভয়ে নির্দিষ্ট কর্ম ত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলে, আসক্তি এবং ফলকামনা ত্যাগ করে নির্দিষ্ট কর্ম করে যাওয়াকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে (১৮।৭-৯)।

সকল বিভক্ত (পৃথক্ পৃথক্) প্রাণীর মধ্যে অবিভক্ত এক অবিনাশী, চিন্ময় ভাবকে অবলোকন করাই হলো সাত্ত্বিক জ্ঞান। সমস্ত প্রাণীতে পরমাত্মাকে বিভক্ত রূপে পৃথক্ পৃথক্ দেখার নাম রাজস জ্ঞান এবং শুধু পাঞ্চভৌতিক শরীরকেই নিজ স্বরূপ বলে মনে করাই হলো তামস জ্ঞান (১৮।২০-২২)। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি কর্তৃত্বাভিমান ও রাগ-দ্বেষ বর্জিত হয়ে যে কর্ম করেন, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে। ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তি অহংভাব যুক্ত হয়েও পরিশ্রম সহকারে যে কর্ম করেন, তাকে বলে রাজস কর্ম এবং কার্যের পরিণাম, হানি, হিংসা তথা নিজ সামর্থ্য বিচার না করে মোহবশতঃ যে কর্ম করা হয়, তাকে তামস কর্ম বলা হয় (১৮।২৩-২৫)। রাগ-দ্বেষশূন্য, কর্তৃত্বাভিমান-বর্জিত, ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্বিকারচিত্ত ব্যক্তিকে বলা হয় সাত্ত্বিক কর্তা। রাগী (আসক্ত) ফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, অপবিত্র এবং হর্ষ-শোকান্বিত ব্যক্তিকে বলা হয় রাজস কর্তা। অসাবধান, অভদ্র, একগুঁয়ে, জেদী, অকৃতজ্ঞ, অলস, অবসন্নচিত্ত এবং দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তিকে বলা হয় তামস কর্তা (১৮।২৬-২৮)।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, কর্তব্য-অকর্তব্য, ভয়-অভয় এবং বন্ধন-মোক্ষ এই সমস্ত বিষয় যে বুদ্ধি দ্বারা ঠিকমতো জানা যায়, তাকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলে। ধর্ম-অধর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য ঠিকমতো ধরতে অসমর্থ যে বুদ্ধি তাকে বলে রাজসী বুদ্ধি। অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সমস্ত বিষয়কেই বিপরীত বলে ধরে নেয় যে বুদ্ধি, তাকে বলা হয় তামসী বুদ্ধি (১৮।৩০-৩২)। সমত্বপূর্বক মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি ধারণ করে যে ধৃতি, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিকী ধৃতি ; ফলাকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তিপূর্বক ধর্ম, কাম (ভোগ) এবং অর্থকে (সম্পদকে) ধারণ করে যে ধৃতি, তাকে বলে রাজসী ধৃতি। যে ধৃতি দ্বারা নিদ্রা, ভয়, শোক ইত্যাদি ধারণ করা হয়, তাকে বলা হয় তামসী ধৃতি (১৮।৩৩-৩৫)।

পরমাত্ম-সম্পর্কিত বুদ্ধি দ্বারা উৎপন্ন যে সুখ তা সাংসারিক আসক্তির জন্য প্রথমে বিষের ন্যায় এবং পরিণামে অমৃততুল্য মনে হয়—তা হল সাত্ত্বিক সুখ। প্রথমে অমৃতের ন্যায় এবং পরিণামে বিষতুল্য বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগে উদ্ভূত সুখকে রাজস সুখ বলা হয়। আরম্ভে এবং পরিণামে দুইয়েতেই মোহিতকারী, কেবলমাত্র নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে যা উৎপন্ন, তা হল তামস সুখ (১৮।৩৭-৩৯)।

প্রকৃতিজাত গুণগুলি হতেই সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে, সেইজন্য ত্রিলোকে গুণরহিত কোন বস্তু বা প্রাণী নেই। স্বভাবজাত গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র —এই চারবর্ণের কর্মবিভাগ করা হয়েছে (১৮।৪০-৪১)।[১]

অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাতচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকের **'বিগুণঃ'** শব্দটিও তিন গুণরহিতের বাচক নয়, আসলে এই শব্দটি সদ্গুণ-সদাচারের অভাবের বাচক।[২]

এইপ্রকার গীতায় ভাব, বৃত্তি, শ্রদ্ধা, পূজা, আহার, যজ্ঞ, তপ, দান, ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি

---

[১]কোন একটি বস্তুর উপর ঘা মারলে সেটি দু টুকরো হয়ে যায়, দুটি ঘা মারলে তা তিন টুকরো হয় ও তিন ঘা মারলে সেটি চার টুকরো হয়। এইভাবেই তিনগুণে চারটি বর্ণের বিভাগ হয়।

[২]গীতায় যে অধ্যায়ের যে শ্লোকগুলিতে গুণগুলির বর্ণনা আছে, তারই সঙ্কেত এখানে করা হয়েছে।

এবং সুখ—এই পনেরো প্রকারে গুণগুলির বর্ণনা করা হয়েছে।

উপরিউক্ত তিন প্রকার গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণের তাৎপর্য হল এই যে, তা প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদকারী, রজোগুণের তাৎপর্য প্রাকৃত পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ দৃঢ় করায় এবং তমোগুণের তাৎপর্য মূঢ়তার বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে।

গীতায় সত্ত্বগুণের স্বরূপ হচ্ছে প্রকাশক ও অনাময় (১৪।৬)। 'প্রকাশ' মানে হচ্ছে অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা, নির্মলতা অর্থাৎ অন্তঃকরণে সৎ-অসৎ এবং কর্তব্য-অকর্তব্যের বিবেক জাগ্রত হওয়াই 'প্রকাশ'। 'অনাময়' হল রোগরহিত অর্থাৎ বিকাররহিত হওয়া। জড়ত্ব ত্যাগ হলে মানুষ বিকাররহিত হয়। গীতায় সত্ত্বগুণকে যেমন 'অনাময়' বলা হয়েছে, তেমনি নির্গুণ তত্ত্বকেও 'অনাময়' বলা হয়েছে (২।৫১)। দুটিকেই অনাময় বলার তাৎপর্য এই যে, পরমাত্মপ্রাপ্তির হেতু হওয়ায় সত্ত্বগুণ নির্গুণ তত্ত্বের খুবই সন্নিকট। রজোগুণের স্বরূপ রাগাত্মক (১৪।৭)। বিনাশশীল পদার্থে আকর্ষণ ও আসক্তি হওয়াকে 'রাগ' বলে, এর দ্বারা কামনা উৎপন্ন হয়। এই কামনাই সমস্ত পাপের মূল (৩।৩৭)। তমোগুণের স্বরূপ মোহাত্মক হয়ে থাকে, যাতে মূঢ়তাই মুখ্যরূপে থাকে (১৪।৮)। গীতায় রাজস কর্মকে হিংসাত্মক বলা হয়েছে (১৮।২৭) এবং তামস কর্মাদিতেও হিংসার কথা বলা হয়েছে (১৮।২৫)। দুই ক্ষেত্রেই হিংসা কথাটি বলার অর্থ এই যে, রজোগুণ এবং তমোগুণ—দুটি একে অপরের খুবই কাছাকাছি থাকে[১]।

অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়েছে যে সত্ত্বগুণে পুণ্য হয়—'সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ', যার সুখরূপ ফল জন্ম-জন্মান্তর ও লোক-লোকান্তরে ভোগ করা যায়। কিন্তু গীতার সত্ত্বগুণ বর্ণনার তাৎপর্য সুখে নয়, বরং এটি অবিনাশী সুখ প্রাপ্তিতে, যা মুক্তিতে সহায়ক হয়। কিন্তু রজোগুণ যদি এই সত্ত্বগুণের মধ্যে এসে যায়, তাহলে এই সত্ত্বগুণ সাধককে সেই স্থিতিতে ধরে রাখে। এর তাৎপর্য এই যে, সত্ত্বগুণের উপভোগ করলে, এর দ্বারা উদ্ভূত সুখ এবং জ্ঞানে আসক্ত হলে এটি মানুষকে এগোতে দেয় না (১৪।৬)।

গীতায় যে যে স্থানে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই তিন গুণের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে একদৃষ্টিতে দেখতে গেলে সাত্ত্বিক এবং রাজসিক (সমান) এক। অন্য দৃষ্টিতে রাজসিক ও তামসিক এক তথা অপর দৃষ্টিতে সাত্ত্বিক ও তামসিক এক। যেমন-শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী কর্ম করাতে সাত্ত্বিক এবং রাজসিক সমান ; কিন্তু এতে পার্থক্য এই যে সাত্ত্বিকের মধ্যে নিষ্কামভাব থাকে এবং রাজসিকের মধ্যে সকামভাব দেখা যায়। জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে রাজসিক ও তামসিক একই প্রকারের ; কিন্তু এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, রাজসিকতায় সাবধানী বা সতর্কতা থাকে এবং তামসিকতায় মূঢ়তা দেখা যায়। ক্রিয়া-রহিত হওয়াতে সাত্ত্বিক বা তামসিক এক, কিন্তু তাতে পার্থক্য এই যে, সাত্ত্বিকে বিবেক জাগ্রত থাকে আর তামসিকতায় থাকে মূঢ়তা।

প্রকৃতপক্ষে দেখতে গেলে প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হওয়ায় সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক তিনটি গুণেই অন্তর্নিহিত সম্পর্ক দেখা যায় (১৪।৫)। এই গুণগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক না থাকলে প্রকৃতির অতীত পরমাত্মতত্ত্ব অথবা স্বরূপের অনুভব হয়—যা এই তিন গুণরহিত এবং স্বরূপতঃ সে কিছু করেও না বা লিপ্তও হয় না (১৩।৩১)।

[১]তমোগুণ, রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণ—তিনটিতে পরস্পর (১, ১০ এবং ১০০র মত) দশগুণ তফাৎ আছে। তবুও তমোগুণ (১) থেকে রজোগুণ (১০) নিকটে এবং সত্ত্বগুণ (১০০) এই দুইয়ের থেকে দূরে থাকে।

(৫৯) গীতায় পরমাত্মা এবং জীবাত্মার স্বরূপ

জীবাত্মা পরমাত্মা চ তত্ত্বতোঽভিন্ন এব চ।
লক্ষণেষু দ্বয়োঃ সাম্যং কৃষ্ণেন কথিতং স্বয়ম্॥

উপাসনার দৃষ্টিতে পরমাত্মার তিনটি স্বরূপ মানা হয়েছে—সগুণ-নিরাকার, নির্গুণ-নিরাকার এবং সগুণ-সাকার। সৌন্দর্য, মাধুর্য, ঐশ্বর্য ইত্যাদি দিব্য গুণযুক্ত এবং প্রকৃতি তথা তার কার্য সংসারে পরিপূর্ণভাবে ব্যাপক পরমাত্মাকে **'সগুণ-নিরাকার'** বলা হয়। সাধক যখন পরমাত্মাকে দিব্য গুণরহিত বলে মনে করে অর্থাৎ যখন তার দৃষ্টি শুধু নির্গুণ পরমাত্মার দিকে থাকে, তখন পরমাত্মার সেই স্বরূপ **'নির্গুণ-নিরাকার'** বলে পরিচিত হয়। সগুণ-নিরাকার পরমাত্মা যখন নিজ দিব্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজ যোগমায়ার দ্বারা জগতে প্রকট হন, তখন তাঁকে **'সগুণ-সাকার'** বলা হয়। এই তিন স্বরূপের বর্ণনা গীতায় এই প্রকারে আছে—

(১) **সগুণ-নিরাকার**—অভ্যাসযোগ দ্বারা যুক্ত একাগ্র মনে সেই পরম পুরুষের ধ্যান করতে করতে শরীর ত্যাগ করলে মানুষ তাঁকেই প্রাপ্ত হয় (৮।৮)। যিনি সর্বজ্ঞ, পুরাণ-পুরুষ, সর্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যস্বরূপ, অজ্ঞান থেকে দূর এবং সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপ, তাঁকে স্মরণ করতে করতে একাগ্র মন এবং যোগবলের দ্বারা ভ্রূমধ্যে প্রাণকে স্থাপন করে শরীর-ত্যাগকারী মানুষ সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন (৮।৯-১০)। যাঁর অন্তর্গত সমস্ত প্রাণী এবং যিনি সমস্ত ভূতে পরিব্যাপ্ত, সেই পরমপুরুষকে অনন্য ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায় (৮।২২), যাঁর দ্বারা সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি এবং যিনি এই চরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই পরমাত্মাকে নিজ কর্ম দ্বারা পূজা করে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে থাকে (১৮।৪৬); ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(২) **নির্গুণ-নিরাকার**—যাঁকে বেদজ্ঞগণ অক্ষর বলেন, বীতরাগ সন্ন্যাসিগণ যাঁতে প্রবেশ করেন এবং যাঁকে প্রাপ্তির আশায় ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য পালন করেন, আমি (কৃষ্ণ) তাঁদের সম্বন্ধে বলছি (৮।১১)। যাঁরা অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল এবং ধ্রুব তত্ত্বের উপাসনা করেন (১২।৩), ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(৩) **সগুণ-সাকার**—'অনন্যচিত্ত যে ভক্ত নিত্য-নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, তাঁর পক্ষে আমি **'সহজলভ্য'** (৮।১৪)। 'মহাত্মা ব্যক্তিগণ আমাকে লাভ করে পুনরায় এই দুঃখপূর্ণ অশাশ্বত পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না' (৮।১৫)। 'দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত মহাত্মগণ আমাকে সমস্ত প্রাণীর আদি এবং অবিনাশী জেনে অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন' (৯।১৩)। 'যে ভক্ত ভক্তি সহকারে পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি আমাকে অর্পণ করেন, প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত তাঁর সেই উপহার আমি ভক্ষণ করি' (৯।২৬)। 'কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমাকে জানা সম্ভব, দর্শন করা সম্ভব এবং প্রাপ্ত করা সম্ভব' (১১।৫৪); ইত্যাদি।

সগুণ-নিরাকার, নির্গুণ-নিরাকার এবং সগুণ-সাকারের ঐক্য—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চোদ্দ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান এই তিন রূপের সমন্বয় করেছেন; যেমন 'সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্' অর্থাৎ এই তত্ত্ব সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির প্রকাশক হওয়ায়, সগুণ-নিরাকার। **'সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্, নির্গুণম্'** অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয় এবং সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনগুণ রহিত হওয়ায়, নির্গুণ-নিরাকার। **'সর্বভৃৎ, গুণভোক্তৃ'** অর্থাৎ সমগ্র চরাচরের ভরণ-পোষণকারী তথা গুণের ভোক্তা হওয়ায়, সগুণ-সাকার। এছাড়া অন্যত্রও তিনরূপের সামঞ্জস্য করা হয়েছে। যেমন—তাকেই অব্যক্ত অক্ষর বলা হয় এবং তাকেই পরম গতি বলা হয়, যাকে লাভ করলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না, তাই আমার পরম ধাম (৮।২১)। 'ব্রহ্ম, অবিনাশী অমৃত, শাশ্বত ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয়—এসকলই আমি' (১৪।২৭)।

অর্জুনও বিরাটরূপ ভগবানের স্তুতি করতে গিয়ে একাদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে তিনরূপের ঐক্য সাধন করেছেন; যেমন—**'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্'** অর্থাৎ আপনিই জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর (অক্ষর ব্রহ্ম)

হওয়ায় নির্গুণ নিরাকার ; 'ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্', আপনিই বিশ্বের পরম আশ্রয় হওয়ায় সগুণ নিরাকার ; 'ত্বং শাশ্বতধর্মগোপ্তা', অর্থাৎ আপনিই সনাতনধর্মের রক্ষাকর্তা হওয়ায় সগুণ-সাকার।

জীবাত্মার স্বরূপ—গীতায় জীবাত্মার স্বরূপের বিষয়ে ভগবান বলেছেন যে 'জীব আমারই সনাতন অংশ, কিন্তু আমার অংশসম্ভূত হয়েও এই জীবলোকে সে জীবরূপে স্থিত রয়েছে এবং প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করে থাকে (১৫।৭)। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' মনে করে জীব সুখ ও দুঃখের ভোক্তা হয়। প্রকৃতির গুণ এবং বিষয়ের সংস্পর্শেই এই জীবের উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হয় (১৩।২১)। এই জীবাত্মা আমার 'পরা প্রকৃতি', কিন্তু সে 'অপরা প্রকৃতি' অর্থাৎ জগৎ চরাচরের সংস্পর্শে এসে অহংকার ও মমত্ববশতঃ এই জগতে বিধৃত হয়ে আছে (৭।৫)। অপরা প্রকৃতির সঙ্গে পরা প্রকৃতির এই সংস্পর্শেই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয় (৭।৬; ১৩।২৬)।

এই জীবাত্মার বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো সংখ্যক শ্লোক থেকে ত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত দেহী, শরীরী, নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় ইত্যাদি শব্দে করা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে একে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' এবং উনিশ সংখ্যক শ্লোকে 'পুরুষ' নামে বলা হয়েছে। একেই পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষোল সংখ্যক শ্লোকে 'অক্ষর' বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে প্রকৃতপক্ষে জীব পরমাত্মার অংশ হওয়ায় পরমাত্মস্বরূপই। আসক্তির জন্য প্রকৃতির কার্য শরীর ও সংসারের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় সে জীবরূপে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে শরীরে স্থিত হয়েও জীবাত্মা কিছুই করেন না এবং কর্মফলেও লিপ্ত হন না। (১৩।৩১)।

সগুণ-নিরাকারের সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্য—জীবাত্মার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যিনি এই জগৎ সংসার পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাকে অবিনাশী বলে জানবে (২।১৭) ; এবং সগুণ-নিরাকার পরমাত্মার সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রাণী যাঁর অন্তর্গত এবং যাঁর দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায় (৮।২২)। 'আমি অব্যক্তরূপে এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছি' (৯।৪)। যে পরমাত্মা এই সমস্ত জগৎ চরাচর পরিব্যাপ্ত করে আছেন, নিজ কর্ম দ্বারা তাঁর পূজা করা উচিত। (১৮।৪৬)।

জীবাত্মাকেও 'ঈশ্বর' বলা হয়েছে (১৫।৮) এবং সগুণ-নিরাকার পরমাত্মাকেও 'ঈশ্বর' বলা হয়েছে (১৮।৬১)।

নির্গুণ-নিরাকারের সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্য—জীবাত্মাকেও সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত বলা হয়েছে (২।১৭) এবং নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মাকেও সমস্ত চরাচর প্রাণীজগতে পরিব্যাপ্ত বলা হয়েছে (১৩।১৫)।

জীবাত্মাকে নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থাণু, নিশ্চল, অব্যক্ত এবং অচিন্ত্য (২।২৪-২৫), অপ্রমেয় (২।১৮) তথা কূটস্থ (১৫।১৬) বলা হয়েছে এবং নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মাকে অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, নিশ্চল এবং ধ্রুব বলা হয়েছে (১২।৩)।

জীবাত্মাকেও 'পরমাত্মা' বলা হয়েছে (১৩।২২) আবার নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মাকেও 'পরমাত্মা' বলা হয়েছে (৬।৭)।

জীবাত্মাকে 'নির্গুণ' বলা হয়েছে (১৩।৩১) এবং নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মাকেও 'নির্গুণ' বলা হয়েছে (১৩।১৪)।

সগুণ-সাকারের সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্য—জীবাত্মাকেও 'মহেশ্বর' বলা হয়েছে (১৩।২২) এবং সগুণ-সাকার পরমাত্মাকেও 'মহেশ্বর' বলা হয়েছে (৫।২৯ ; ৯।১১ ; ১০।৩)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে, 'তুমি সমস্ত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে আমাকেই জানবে'—এই কথায় জীবাত্মার সঙ্গে নিজের (সগুণ-সাকারের) একত্ব জানিয়েছেন।

সমস্ত স্বরূপের সঙ্গে জীবাত্মার একত্ব জানাবার তাৎপর্য এই যে জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব স্বতঃ স্বাভাবিক ; কিন্তু শরীরের সঙ্গে একত্ব মানলে তখন আর পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব অনুভূত হয় না। সুতরাং সাধকের উচিত শরীরের সঙ্গে নিজের একত্ব স্বীকার না করা, বরং পরমাত্মার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে নিজের ঐক্য মেনে একনিষ্ঠভাবে সাধনায় রত হলে তার সেই একত্বের অনুভূতি হয়।

পরমাত্মার সগুণ-নিরাকার, নির্গুণ-নিরাকার এবং সগুণ-সাকার—এই তিনরূপের সঙ্গে জীবাত্মার তত্ত্বগতভাবে ঐক্য থাকলেও ভিন্নতা মেনে নেওয়া হয়েছে। মেনে নেওয়া এই ভিন্নতা দূর হলে তাত্ত্বিক ঐক্য স্বতঃই অনুভূত হয়। সম্প্রদায়গত ভেদে কোনও আচার্য জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে অভেদ বলে মনে করেন এবং আবার কেউ ভিন্ন বলে মনে করেন। ভিন্ন বলে যাঁরা মানেন, তাঁরাও তাত্ত্বিক ভিন্নতা মানেন না। জীব অনেক—এই দৃষ্টিতে জীবাত্মা এবং পরমাত্মায় স্বজাতীয় ঐক্যের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই ঐক্য তাত্ত্বিক ঐক্য। কারণ জাতি তাকেই বলা হয়, যা এক হয়েও সব কিছুতে পৃথক্‌ভাবে থাকে। চেতন-তত্ত্ব একই আর তাতে কোন ভেদ (অনৈক্য) নেই, তাহলে তাতে জাতি কিভাবে হয় ? সুতরাং জীবাত্মা এবং পরমাত্মায় তাত্ত্বিক ঐক্য আছে অর্থাৎ দুই-ই তত্ত্বতঃ এক।

জীবাত্মা অল্পজ্ঞ এবং পরমাত্মা সর্বজ্ঞ। জীবাত্মার অল্পজ্ঞতার কারণ হলো অবিদ্যা এবং পরমাত্মার সর্বজ্ঞতার কারণ হলো তাঁর শক্তি প্রকৃতি। যদি জীবাত্মার অবিদ্যা দূর হয়ে যায়, তবে তার অজ্ঞতা থাকে না আর যদি পরমাত্মা নিজ শক্তিকে উপেক্ষা করেন, নিজ শক্তির দিকে দৃষ্টিপাত না করেন ; তাহলে পরমাত্মার সর্বজ্ঞতা থাকে না।

গীতা শব্দময় গ্রন্থ ; অতএব এই লেখাতে গীতার শব্দগুলি নিয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মার তাত্ত্বিক ঐক্য কোন গ্রন্থাদির ওপর নির্ভরশীল নয়, তা স্বতঃসিদ্ধ। যদি সাধক কোন গ্রন্থকে গুরুত্ব দেয়, তাহলে তা সেই গ্রন্থে বর্ণিত তত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ার জন্যই, তাতে নিজেকে লীন করার জন্যই। সাধকের মধ্যে যখন সাংসারিক বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির গুরুত্ব থাকে না, তখন তার মেনে নেওয়া তত্ত্বগত ভিন্নতা দূর হয় অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে নিজ তত্ত্বগত ঐক্য অনুভূত হয়। এই একত্ব অনুভূত হলে ব্যক্তিত্বের অহং থাকে না ; কারণ, প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বে ব্যক্তিত্বের অহং নেই। মানুষের দৃষ্টিতে যে যোগী, জ্ঞানী, অথবা প্রেমী যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে আর যোগী, জ্ঞানী বা প্রেমী থাকে না, সে তখন যোগ-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও প্রেম-স্বরূপ হয়ে যায়। তত্ত্বতঃ এক হলে অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের অহং দূর হলে যোগ এবং যোগী, জ্ঞান এবং জ্ঞানী, প্রেম এবং প্রেমী—এই দুইপ্রকার ভেদ থাকে না। যতক্ষণ এই ভেদ বা ব্যক্তিত্বের অহং থাকে, ততক্ষণ তত্ত্বের সঙ্গে ঐক্য হয় নি বলে মানতে হবে।

(৬০) গীতায় ঈশ্বর এবং জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য (স্বাধীনতা)

কর্তুং তথান্যথাকর্তুং স্বতন্ত্রো হীশ্বরঃ সদা।
প্রকৃতের্বশতাভাগে জীবাত্মা স্ববশঃ সদা॥

'স্ব' হচ্ছে স্বয়ং, 'পর' হচ্ছে অপর ; 'তন্ত্র'-র অর্থ হলো অধীন। সুতরাং যা স্বয়ং এর অধীন তাই স্বাধীন বা স্বতন্ত্র এবং যা অপরের অধীন তাকেই পরাধীন বা পরতন্ত্র বলে। স্বতন্ত্র এবং পরতন্ত্রের ভাবকেই স্বতন্ত্রতা এবং পরতন্ত্রতা বলা হয়।

যদিও ঈশ্বরে কর্তৃত্ব থাকে না এবং ঈশ্বরের অংশ এই জীবাত্মাতেও তত্ত্বগতভাবে কর্তৃত্ব নেই, তবু ঈশ্বরের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের জন্য কর্তৃত্ব আছে এবং জীবাত্মায় শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কের জন্য কর্তৃত্ব আছে। কিন্তু এই দুই কর্তৃত্বের মধ্যে অনেক পার্থক্য। ঈশ্বর প্রকৃতির অধীশ্বর হয়েও প্রকৃতিকে নিজের বশে এনে স্বাধীনভাবে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়াদি কার্য সম্পন্ন করেন (৪।৬ ; ৯।৮) কিন্তু জীবাত্মা সুখের আকাঙ্ক্ষায় শরীরাদির বশীভূত হয়ে পরাধীনভাবে কর্ম করে (১৫।৭-৯)। ভগবান যেমন প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করা বা না করায় স্বতন্ত্র এবং অঙ্গীকার করলেও তিনি পরাধীন হয়ে যান না, তেমনি জীবাত্মাও শরীর ইত্যাদিকে 'আমি-আমার' মানা বা না মানায়

স্বতন্ত্র, কিন্তু 'আমি-আমার' মানা বা না মানার এই স্বাধীনতা ভুলে গিয়ে জীবাত্মা তাদের অধীন হয়ে যায় এবং পরিণামে তাকে জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

জীবাত্মার এই পরাধীনতা স্বাভাবিক নয়, তা নিজেরই সৃষ্ট, নিজেরই দ্বারা স্বীকৃত। এর তাৎপর্য এই যে, যখন এই জীবাত্মা নিজ আসক্তির জন্য প্রকৃতির কার্য শরীরাদির অধীনতাকে স্বীকার করে নেয়, তখন সে পরাধীন হয়ে যায় ; কিন্তু যখন সে প্রকৃতির অধীনতাকে অস্বীকার করে, তখন সে স্বাধীন হয় অর্থাৎ নিজ স্বতঃসিদ্ধ স্বাধীনতা, নিজ স্বরূপ সে অনুভব করতে পারে। এই অনুভব করায় সে স্বাধীন।

যখন জীবাত্মা নিজ স্বতঃসিদ্ধ স্বাধীনতা অনুভব করেও সন্তুষ্ট হয় না, তখন তার ভগবৎপ্রেম জন্মায়। ভগবানে প্রীতি জন্মালে ভগবানও তার বশীভূত হন। এর তাৎপর্য এই যে যখন জীবাত্মা প্রকৃতির কার্য পরিত্যাগ করে ভগবানের শরণাগত হয়, তখন চিরস্বাধীন ভগবানও তার অধীন হন। শুধু তাই নয়, ভক্তের অধীনে ভগবান আনন্দ অনুভব করেন। জীবাত্মাকে ভগবান এতোখানি স্বাধীনতা দিয়েছেন !

(৬১) গীতায় সৎ, চিৎ এবং আনন্দ

দ্বাবেব সচ্চিদানন্দৌ প্রোক্তৌ জগজ্জনার্দনৌ।
দ্বয়োরন্তরমেতত্তু সদাঽস্থিরং সদা স্থিরঃ॥

গীতায় সৎ, চিৎ এবং আনন্দ—এই তিনের বর্ণনা আছে। কিন্তু বেদান্ত গ্রন্থগুলিতে যে ক্রমে এই তিনটি বর্ণিত হয়েছে, সেই ক্রম গীতায় অনুসরণ করা হয় নি ; কারণ গীতা সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ, প্রক্রিয়া-গ্রন্থ নয়।

'সৎ' শব্দ সত্তার বাচক, 'চিৎ' হচ্ছে জ্ঞানের বাচক এবং 'আনন্দ' হলো সর্বোপরি সুখের বাচক।

সৎ

সত্তা দুই প্রকারের—স্বতঃসিদ্ধ অবিকারী সত্তা এবং উৎপন্ন হওয়া বিকারী সত্তা। পরমাত্মা এবং জীবের সত্তা অবিকারী আর সংসার এবং শরীরের সত্তা বিকারী। অবিকারী সত্তার কখনও অ-ভাব হয় না—'**নাভাবো বিদ্যতে সতঃ**' (২।১৬) এবং বিকারী সত্তার কখনো ভাব হয় না—'**নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ**' (২।১৬)।

উৎপন্ন হওয়া, 'আছে' রূপে দেখা, বেড়ে ওঠা, পরিবর্তিত হওয়া, ক্ষীণকলেবর হওয়া এবং নাশ হওয়া—এই ছটি বিকার অবিকারী সত্তায় হয় না অর্থাৎ এই সত্তা ছয় প্রকার বিকারবর্জিত। এই ছটি বিকার বিকারী সত্তায় হয় ; যেমন—জগৎ-সংসার এবং শরীর উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হওয়ার পর 'আছে' রূপে দেখা যায়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে যায়, ক্ষীণ হয় এবং নাশ হয়।

গীতায় উপরিউক্ত দুই সত্তার বর্ণনাই একসঙ্গে করা হয়েছে ; যেমন—গতিশীল প্রাণীর মধ্যে যিনি গতি-রহিত, অসম প্রাণীদিগের মধ্যে যিনি সমরূপে বিদ্যমান এবং বিনাশশীল প্রাণীর মধ্যে যিনি বিনাশরহিত (১৩।২৭), বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে যিনি অপরিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান (১৩।১৬), সমস্ত প্রাণী যাঁর অন্তর্গত এবং যিনি সমস্ত প্রাণীতে ওতপ্রোত হয়ে আছেন (৮।২২) ইত্যাদি।

চিৎ

জ্ঞান দুই প্রকারের—করণ-নিরপেক্ষ এবং করণ-সাপেক্ষ। পরমাত্মা এবং নিজ স্বরূপের জ্ঞান বা বোধকে বলা হয় করণ-নিরপেক্ষ। কারণ, এই জ্ঞান স্বরূপ থেকেই হয়, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদির দ্বারা নয়। সংসার ও শরীরের জ্ঞান করণ-সাপেক্ষ ; কারণ, এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি দ্বারা হয়। করণ-নিরপেক্ষ জ্ঞান সবকিছুর প্রকাশক। এই জ্ঞানের দ্বারাই সবকিছু প্রকাশিত হয়। এর দ্বারা মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সবই প্রকাশিত হয়, কিন্তু করণ-সাপেক্ষ জ্ঞান প্রকাশ্য।

গীতায় উপরিউক্ত দুই জ্ঞানের বর্ণনাও প্রায় একসঙ্গেই করা হয়েছে। যেমন এই পরমাত্মা সকল জ্যোতিরও জ্যোতি অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানের জ্ঞান (১৩।১৭)। তিনি সর্ব ইন্দ্রিয়বিবর্জিত হয়েও সকল বিষয়ের প্রকাশক ; (১৩।১৪)। সেই পরমপদরূপ পরমাত্মাকে সূর্য (চক্ষু), চন্দ্র (মন) এবং অগ্নি (বাক্য) প্রকাশিত করতে পারে না (১৫।৬) ; কিন্তু তাঁর দ্বারাই এই সূর্যাদি সমস্ত (নেত্র) উদ্ভাসিত হয় (১৫।১২), ইত্যাদি।

আনন্দ

সুখও দুই প্রকারের—পারমার্থিক এবং লৌকিক। পারমার্থিক সুখ পরমাত্মস্বরূপ। এই সুখ ত্রিগুণের অতীত এবং সাংসারিক সুখ-দুঃখ-বর্জিত। এই সুখকেই গীতায় অক্ষয় সুখ, আত্যন্তিক সুখ এবং অত্যন্ত সুখ নামে বলা হয়েছে (৫।২১ ; ৬।২১, ২৮)। কিন্তু লৌকিক সুখ ক্ষণভঙ্গুর এবং ত্রিগুণসম্পন্ন। রাজসিক ও তামসিক সুখ তো লৌকিক সুখই, সাত্ত্বিক সুখও যেহেতু উৎপন্ন হয়, তাই এটিও লৌকিক সুখ। গীতায় লৌকিক সুখের বর্ণনার সঙ্গে প্রায় দুঃখের কথাও বলা হয়েছে ; যেমন **'শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ'**, **'সমদুঃখসুখম্'** (২।১৪-১৫), **'সুখেষু বিগতস্পৃহঃ'** (২।৫৬), **'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু'** (৬।৭), **'সমদুঃখসুখঃ'**, **'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু'** (১২।১৩, ১৮) ; **'সমদুঃখসুখঃ'** (১৪।২৪), **'সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ'** (১৫।৫) ; ইত্যাদি।

তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, পরমাত্মতত্ত্বও সচ্চিদানন্দ (সৎ, চিৎ, আনন্দ) এবং সংসারও সচ্চিদানন্দ, কিন্তু এই দুই সচ্চিদানন্দ বোধে পার্থক্য আছে। পরমাত্মতত্ত্বের সচ্চিদানন্দময়তা সকলের অনুভব হয় না। মানুষ যখন সাধনা করে, সৎসঙ্গ করে, পরমাত্মার পথে চলে, তখন পরমাত্মার সচ্চিদানন্দময়তা তার অনুভবে আসতে থাকে। পারমার্থিক পথে সে যেমন এগোতে থাকে, তেমনভাবেই তার মধ্যে বিশেষ লক্ষণ আসতে থাকে। কিন্তু জগতে যে সচ্চিদানন্দময়তা আছে তা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। জগতের যে সত্তা ('আছি' ভাব) আছে ; জ্ঞান আছে ; সুখ আছে— সে সবই উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়। তা আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না। অর্থাৎ যে সময় সেটা আছে বলে মনে হয়, সেই সময়ও তা প্রতি মুহূর্তে বিনাশের পথে যাচ্ছে, অ-ভাবে যাচ্ছে। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যেন সে উৎপত্তি ও বিনাশশীল সাংসারিক সৎ-চিৎ-আনন্দতে বদ্ধ না হয়।

পরমাত্মাকে 'সৎ' বলার তাৎপর্য এই যে পরমাত্মা অসৎ থেকে খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; এখানে অসৎ বলে কিছু নেই-ই। যেমন উৎপন্ন হওয়া বস্তুকে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দিষ্ট করে লক্ষ্য করানো যায়, ঠিক সেইভাবে এই পরমাত্মাকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখানো যায় না।

সেই পরমাত্মাকে 'চিৎ' বলা হয়, কিন্তু এই 'চিৎ' জাগতিক প্রকাশ-অপ্রকাশ, জ্ঞান-অজ্ঞান, চেতন-জড় এইসবের মত নয়। কারণ সাংসারিক প্রকাশ বা অপ্রকাশ কোন কিছুর সাপেক্ষে ঘটে, যেমন চক্ষু যেখানে কাজ করে, সেখানে প্রকাশ, কিন্তু চক্ষু যেখানে কাজ করে না সেখানে অন্ধকার। সাংসারিক জ্ঞান-অজ্ঞানও কোন কিছুর সাপেক্ষে ঘটে অর্থাৎ বুদ্ধি যেখানে কার্য করে, সেখানে জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় আর বুদ্ধি যেখানে কাজ করে না সেখানে অজ্ঞানতা। সাংসারিক চেতনা জড়ের সাপেক্ষে বিদ্যমান। কিন্তু পরমাত্মা এইরূপ অপ্রকাশ, অজ্ঞান এবং জড়ের সাপেক্ষে 'চিৎ' নন ; সেখানে অপ্রকাশ, অজ্ঞান এবং জড়ত্বের কোন চিহ্ন নেই। এর তাৎপর্য এই যে পরমাত্মায় প্রকাশহীনতা, অজ্ঞানতা বা জড়তা বলে কিছু থাকে না।

জগতে হয় সুখ ঘটে অথবা দুঃখ, কিংবা শান্তি হয় অথবা অশান্তি। এ সমস্তই দ্বন্দ্ব। পারমার্থিক সুখে (আনন্দে) দুঃখ বা অশান্তি বলে কিছু নেই। সেই সুখ সাংসারিক সুখ-শান্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে পারমার্থিক সৎ, চিৎ এবং আনন্দ—এই তিনটিই দ্বন্দ্বাতীত।

(৬২) গীতায় অষ্টাঙ্গযোগের বর্ণনা

সর্বযোগময়ী গীতা সর্বসাধনসিদ্ধিদা।
তস্মাদষ্টাঙ্গযোগস্য বর্ণনং ন যথাক্রমম্॥

' পাতঞ্জল যোগদর্শনে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি—এই অষ্ট অঙ্গের বর্ণনা অষ্টাঙ্গযোগের প্রতিপাদ্য বিষয়—'যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি' (যোগদর্শন ২।২৯)। গীতায় ভগবান অষ্টাঙ্গ যোগের ক্রম-অনুসারে বর্ণনা করেন নি, কিন্তু ভগবানের বাণীর বিশেষত্ব এমনই যে অন্য যোগ-সাধনের বর্ণনার সঙ্গে অষ্টাঙ্গযোগের বর্ণনাও তাঁর বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমন—

(১) যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি 'যম'-এর অন্তর্ভুক্ত 'অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ' (যোগদর্শন ২।৩০)। গীতায় 'অহিংসা' (১০।৫, ১৩।৭; ১৬।২; ১৭।১৪) পদে অহিংসার; 'সত্যম্' (১৬।২; ১৭।১৫) পদদ্বারা সত্যের, 'স্তেন এব সঃ' (৩।১২) পদে বিধিমুখে 'অস্তেয়'র; 'ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ' (৬।১৪); 'ব্রহ্মচর্যং চরন্তি' (৮।১১); 'ব্রহ্মচর্যম্' (১৭।১৪) পদদ্বারা ব্রহ্মচর্যের এবং 'ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ' (৪।২১), 'অপরিগ্রহঃ' (৬।১০) 'অহংকারং.........পরিগ্রহম্'। বিমুচ্য...... (১৮।৫৩) পদদ্বারা 'অপরিগ্রহে'র বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান—এই পাঁচটিকে 'নিয়ম' বলা হয়—'শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ' (পাতঞ্জল ২।৩২)। গীতায় 'শৌচম্' (১৩।৭, ১৬।৩; ১৭।১৪, ১৮।৪২) পদদ্বারা 'শৌচ' এবং যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (৪।২২); 'আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ' (৩।১৭), 'তুষ্যন্তি' (১০।৯), 'সন্তুষ্টঃ' (১২।১৪), 'সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ' (১২।১৯) পদদ্বারা 'সন্তোষের', 'যত্তপস্যসি' (৯।২৭), 'তপঃ' (১৬।১; ১৭।১৪-১৬) পদদ্বারা 'তপে'র; 'স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ' (৪।২৮), 'স্বাধ্যায়াভ্যসনম্' (১৭।১৫), 'অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ' (১৮।৭০) পদদ্বারা 'স্বাধ্যায়' এর; 'মামাশ্রিত্য যতন্তি' (৭।২৯), 'তমেব শরণং গচ্ছ' (১৮।৬২), 'মামেকং শরণং ব্রজ' (১৮।৬৬), পদগুলির দ্বারা 'ঈশ্বর-প্রণিধানের' বর্ণনা করা হয়েছে।

(৩) আসন—স্থিরভাবে স্বচ্ছন্দে বসার নাম—'আসন'—'স্থিরসুখমাসনম্' (পাতঞ্জল ২।৪৬)। গীতায় 'সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ'। 'সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্' (৬।১৩)—এই শ্লোকটিতে 'আসন'-এর বর্ণনা করা হয়েছে।

(৪) প্রাণায়াম—শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে নিরুদ্ধ করার নাম 'প্রাণায়াম'—'তস্মিন্সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ' (পাতঞ্জল ২।৪৯)। গীতায় 'প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ' (৪।২৯), 'প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা' (৫।২৭), 'ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্' (৮।১০), 'মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণম্' (৮।১২) পদের দ্বারা 'প্রাণায়ামের' বর্ণনা করা হয়েছে।

(৫) প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ বিষয় হতে সরিয়ে আনাকে 'প্রত্যাহার' বলে—'স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ' (পাতঞ্জল ২।৫৪)। গীতায় 'ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ' (২।৫৮, ৬৮), 'তানি সর্বাণি সংযম্য' (২।৬১), 'শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি' (৪।২৬) পদগুলির দ্বারা 'প্রত্যাহার'-এর বর্ণনা করা হয়েছে।

(৬) ধারণা—পরমাত্মায় মনঃ সংযোগ করাকে বলা হয় 'ধারণা'—'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা' (পাতঞ্জল ৩।১)। গীতায় 'মনঃ সংযম্য' (৬।১৪), 'যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ' (৬।২৬), 'মচ্চিত্তাঃ' (১০।৯), 'ময্যেব মন আধৎস্ব' (১২।৮), 'মচ্চিত্তঃ সততং ভব'

(১৮।৫৭), 'মচ্চিত্তঃ' (১৮।৫৮) পদগুলিতে 'ধারণা'র বর্ণনা করা হয়েছে।

(৭) ধ্যান—যে বিষয়ে চিত্তকে লগ্ন করা হয় সেই বিষয়ে সাধকের একাগ্র হওয়াকেই 'ধ্যান' বলা হয়—'**তত্র প্রত্যৈকতানতাধ্যানম্**' (পাতঞ্জল ৩।২)। গীতায় '**তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা**' (৬।১২), '**চেতসা নান্যগামিনা**' (৮।৮), '**মাং ধ্যায়ন্তঃ**' (১২।৬), '**ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি**' (১৩।২৪), '**ধ্যানযোগপরো নিত্যম্**' (১৮।৫২), ইত্যাদি পদদ্বারা 'ধ্যানে'র বর্ণনা করা হয়েছে।

(৮) সমাধি—ধ্যান করতে করতে চিত্ত যখন ধ্যেয় বস্তুতে তদাকার হয়ে যায়, তখন চিত্তবৃত্তির জ্ঞান থাকে না ; ধ্যানের সেই অবস্থার নাম 'সমাধি'—'**তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ**' (পাতঞ্জল ৩।৩)। গীতায় '**আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে**' (৪।২৭) পদগুলিতে 'সমাধি' বর্ণিত হয়েছে।

উপরিউক্ত 'অষ্টাঙ্গযোগ'-এর বর্ণনায় গীতার সার কথা এই যে মানুষ সংসার থেকে সরে গিয়ে নিজেকে যেন পরমাত্মায় লগ্ন করে।

(৬৩) গীতায় দ্বিবিধা ভক্তি

ভক্তির্দ্বিধাঽমন্যত কৃষ্ণগীতা ভক্তস্য ভাবেন চ যোগ্যতায়াঃ।
কৃষ্ণে রতিস্তস্য জপাদিকর্ম সংসারকর্ম প্রভুভক্তিভাবঃ॥

ভগবান গীতায় নিজ ভক্তির কয়েকটি প্রকার বর্ণনা করলেও পরিশেষে প্রধানতঃ দুই প্রকারের কথা বলেছেন —

ভক্তির প্রথম প্রকার—যাতে ক্রিয়া এবং ভাব দুই-ই ভগবদ্‌বিষয়ক হয়। যেমন—জপ-ধ্যান, পূজা-পাঠ, স্বাধ্যায়-সৎসঙ্গ, ভগবৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থের পঠন-পাঠন, শ্রবণ-মনন ইত্যাদি সকল ক্রিয়াই ভগবৎসম্বন্ধীয় এবং এর দ্বারা ভগবদ্ভাব বৃদ্ধি পায় (১০।৮-৯)।

ভক্তির অপর প্রকার হচ্ছে এই, সাংসারিক ক্রিয়ার মধ্যেও ভগবদ্‌ভাব থাকে ; যেমন—নিজ নিজ বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কর্তব্যের পালন ইত্যাদি 'জীবিকা-সম্বন্ধীয়' ক্রিয়া এবং খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, শয়ন-জাগরণ ইত্যাদি 'শরীর-সম্বন্ধীয়' ক্রিয়া। কিন্তু এগুলি করার সময় ভগবদ্‌ভাব এবং ভগবৎপ্রসন্নতার, ভগবৎপূজনের ভাবই থাকে (৯।২৭, ১৮।৪৬, ৩।৩০ ইত্যাদি)।

এর তাৎপর্য এই যে ভক্তির উপর্যুক্ত দুই প্রকারের ক্রিয়াতে পার্থক্য আছে অর্থাৎ প্রথমটি ভগবৎসম্বন্ধীয় এবং দ্বিতীয়টি সংসার-সম্বন্ধীয়। কিন্তু উভয় ক্রিয়াই ভগবদর্থে বা ভগবানের প্রসন্নতার জন্য করার ফলে উভয়ের ভাব একই থাকে। ক্রিয়াসমূহ ভগবৎ-সম্বন্ধীয় হোক বা সংসার-সম্বন্ধীয় হোক এতে সাংসারিক আকর্ষণ না হয়ে শুধু ভগবানেই যদি আকর্ষণ হয়, তাহলে দুই প্রকারের ভক্তিই ভগবানের প্রতি হয়ে যায়। যেমন ক্ষুধা সকলেরই একই প্রকারের হয় এবং ভোজনের পর ক্ষুধার নিবৃত্তি হলে তৃপ্তিও একই রকমের হয় কিন্তু সকলের ভোজনের রুচি পৃথক্ পৃথক্ হয়। এইরূপ দু'প্রকারের ভক্তের প্রথমে ভগবৎপ্রাপ্তিই উদ্দেশ্য থাকলে পরিশেষে দুজনের প্রাপ্তিই অভিন্ন হয়। তবে সাধনায় পার্থক্য থাকে।

(৬৪) গীতায় নবধা ভক্তি

কথিতা নবধা ভক্তিঃ শ্রবণাদিস্বরূপিণী।
যয়া কয়াঽপি সংযুক্তো হরিং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে সাধন-ভক্তির নয় প্রকার পথের কথা বলা হয়েছে, যা 'নবধা ভক্তি' নামে প্রসিদ্ধ[১]। গীতায় ভগবান ক্রমঅনুসারে নবধা ভক্তির বর্ণনা না করলেও ভগবানের বাণী এতো সবিশেষ যে তাতে অন্য সাধনের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নবধা ভক্তির বর্ণনাও এসেছে ; যেমন—

(১) শ্রবণ—'যেসব ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের বাণী শ্রবণ ও তদনুসারে উপাসনা করে, এরূপ শ্রবণ-পরায়ণ ব্যক্তি মৃত্যুকে অতিক্রম করে' (১৩।২৫)।

(২) কীর্তন—যেসব ভক্ত প্রীতিপূর্বক আমার নাম, রূপ, লীলা ইত্যাদি কীর্তন করে (৯।১৪) ; হে হৃষীকেশ ! তোমার নাম, রূপ ইত্যাদি কীর্তনে সমস্ত জগৎ হৃষ্ট হয় এবং তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়' (১১।৩৬)।

(৩) স্মরণ—যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হয়ে নিত্য-নিরন্তর আমায় স্মরণ করে (৮।১৪) ; মহাত্মা ব্যক্তিগণ অনন্যচিত্তে আমাকে স্মরণ করে আমার উপাসনা করেন (৯।১৩) ; তুমি সর্বদা আমাতে মদ্‌গতচিত্ত হও (১৮।৫৭) ; মদ্‌গতচিত্ত হলে তুমি আমার কৃপায় সমস্ত বাধা অতিক্রম করবে (১৮।৫৮)।

(৪) পাদবন্দনা—'ভক্ত প্রীতিপূর্বক আমাকে নমস্কার করে আমার উপাসনা করে' (৯।১৪)।

(৫) অর্চনা—যাঁহা হতে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়েছে এবং যিনি সর্বব্যাপী, সেই পরমাত্মাকে নিজ কর্মের দ্বারা অর্চনা (পূজা) করে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে (১৮।৪৬) ; 'তুমি আমার পূজনকারী হও, তাহলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে।' (৯।৩৪ ; ১৮।৬৫)।

(৬) বন্দনা—'তুমি আমাকে নমস্কার কর, তাহলে আমাকেই তুমি লাভ করবে (৯।৩৪ ; ১৮।৬৫) ; হে প্রভু ! তোমাকে সহস্রবার নমস্কার করি, নমস্কার করি (১১।৩৯) ; হে সর্বাত্মন্ ! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, পশ্চাতে নমস্কার এবং সকল দিকেই নমস্কার (১১।৪০)। হে প্রভু ! আমি দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে তোমাকে প্রসন্ন করতে ইচ্ছা করি' (১১।৪৪)।

(৭) দাস্য—'তুমি আমার ভক্ত হও, তাহলে তুমি আমাকেই পাবে' (৯।৩৪ ; ১৮।৬৫) ; হে কৃষ্ণ ! আমি আপনার শিষ্য (দাস) (২।৭) ; 'হে পার্থ ! তুমি আমার ভক্ত' (৪।৩)।

(৮) সখা—'তুমি আমার প্রিয় সখা' (৪।৩) ; হে কৃষ্ণ ! সখা যেমন সখাকৃত অপমান সহ্য করে অর্থাৎ ক্ষমা করে দেয়, তেমনি তুমিও আমাকৃত অপমান সহ্য করতে সক্ষম' (১১।৪৪)।

(৯) আত্মনিবেদন— সেই আদিপুরুষ পরমাত্মার শরণ নেওয়া উচিত (১৫।৪) ; তুমি সর্বতোভাবেই সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার শরণ গ্রহণ কর (১৮।৬২), তুমি সকল ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ নাও (১৮।৬৬)।

এইপ্রকারে উপরিউক্ত স্থানে ভগবান সাধন-ভক্তির বর্ণনা করেছেন ; এবং **'সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ'** (৮।১৫), **'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌'** (১৮।৫৪), **'ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা'** (১৮।৬৮)—এই পদ গুলির দ্বারা ভগবান সাধ্য (পরা) ভক্তির বর্ণনা করেছেন[২]।

---

[১]'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্'॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।২৩)

[২]সাধন-ভক্তি দ্বারা সাধ্য-ভক্তি প্রাপ্ত হয়। 'ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা' (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৩১)।

(৬৫) গীতায় ভক্তিযোগের প্রাধান্য

সর্বাধ্যায়েষু গীতায়াং স্বভক্তিগৌরবান্বিতা।
তস্মাদ্ধি ভগবন্নিষ্ঠা সর্বযোগেষু সত্তমা॥

বিচার করলে দেখা যায় যে, গীতায় ভগবান ভক্তির কথাই বিশেষভাবে বলেছেন। যেখানে অর্জুন ভক্তির বিষয়ে কোন প্রশ্ন করেননি অথবা যেখানে কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগের প্রসঙ্গ রয়েছে সেখানেও ভগবান নিজে থেকেই ভক্তির কথা বলেছেন, যেমন—

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের বর্ণনায় যেখানে স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে সেখানে ভগবান **'মৎপরঃ'** (২।৬১) পদদ্বারা তৎপরায়ণ হওয়ার কথা বলেছেন। ভগবান ভক্তিকে তাঁরই নিষ্ঠা বলে মনে করেন, সাধকের নিষ্ঠা নয়। এইজন্য তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে দ্বিবিধ নিষ্ঠা—সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের বর্ণনা করেছেন আর ভক্তির কথা সযত্নে অন্তরালে রেখেছেন। কর্মযোগের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবানই সেই ভক্তির কথা **'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্য'** (৩।৩০) পদদ্বারা উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে যোগের পরম্পরা জানাতে গিয়ে 'আমিই সৃষ্টির আদিতে যোগের উপদেশ দিয়েছিলাম'—এই কথায় পরম রহস্যের ইঙ্গিত করেছেন। তাই সেখানে **'ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্'** (৪।৩) পদেও ভক্তির প্রকাশ দেখা যায়। চতুর্থ শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের পর ভগবান পঞ্চম থেকে চতুর্দশ শ্লোক পর্যন্ত অবতারের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ভক্তির কথাই বলেছেন। আবার পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিবিধা নিষ্ঠার কথা বলে প্রথম দশটি শ্লোকে (**ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি**) এবং পরে উনত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে (**ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং** ......) নিজে থেকে ভগবৎ নিষ্ঠার বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের বর্ণনা করতে গিয়ে **'মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ'** (৬।১৪), **'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র** ....' (৬।৩০) ; **'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ'** (৬।৩১) এবং **'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্'** (৬।৪৭)—এই শ্লোকগুলিতে ভক্তির কথা বলেছেন। সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত মুখ্যভাবে ভগবৎনিষ্ঠারই বর্ণনা আছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের বর্ণনা করতে গিয়ে **'ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী'** (১৩।১০) এবং **'মদ্ভক্তঃ'** (১৩।১৮) পদগুলির দ্বারা ভক্তির কথাই বলা হয়েছে। আবার চতুর্দশ অধ্যায়ে **'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে'** (১৪।২৬) এবং **'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'**.... (১৪ । ২৭)—শ্লোকগুলিতে ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায় তো ভক্তির কথাতেই পরিপূর্ণ। ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদ্‌রূপে ভক্তিযোগী সাধকদের লক্ষণগুলির বর্ণনা রয়েছে। সপ্তদশ অধ্যায়ের তেইশ থেকে সাতাশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত 'ওঁ তৎ সৎ'—এই নামগুলির রূপে ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে **'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'** (১৮।৪৬) **'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'** (১৮।৫৪) এবং **'ভক্ত্যা মামভিজানাতি'** (১৮।৫৫) পদগুলিতে ভক্তিরই কথা বলেছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছাপ্পান্ন সংখ্যক শ্লোক থেকে ছেষট্টি সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ভগবৎনিষ্ঠার কথাই মুখ্যভাবে বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞানযোগী এবং কর্মযোগীর মধ্যে নিজ কল্যাণের ইচ্ছা থাকে এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা সাধন-ভজনে ব্রতী হন। ভক্তিযোগীও সাধনার প্রারম্ভে নিজ কল্যাণই কামনা করেন, কিন্তু যখন ভগবানে তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন আর তাঁর দৃষ্টি নিজ কল্যাণের দিকে থাকে না, তখন তাঁর দৃষ্টি ভগবানের প্রতি নিবদ্ধ হয়। তখন তাঁর কল্যাণ করার দায়িত্ব ভগবানের উপর ন্যস্ত হয় (১০।৮-১১ ; ১২।৬-৭ ; ১৮।৬৬)।

গীতার ভক্তিযোগে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের প্রসঙ্গও এসেছে, যেমন—'যে ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিযোগ দ্বারা আমার সেবা করে, সে গুণসমূহের অতীত হয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় (১৪।২৬)'। অর্থাৎ মানুষ যেমন জ্ঞানযোগের দ্বারা গুণাতীত হয়, তেমনি ভক্তিযোগ দ্বারাও গুণাতীত হয়ে যায়। সেইসব ভক্তদের উপরে কৃপা করবার জন্য তাদের স্বরূপস্থিত-আমি তাদের

অজ্ঞান অন্ধকারকে জ্ঞানরূপ প্রদীপ দ্বারা সর্বতোভাবে নাশ করি (১০।১১) অর্থাৎ ভক্তিযোগ দ্বারাও তত্ত্ববোধ (স্বরূপজ্ঞান) হয়। ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যেখানে সাধনসমূহের বর্ণনা করেছেন, সেখানে তিনি তাঁর অব্যভিচারিণী ভক্তিকেও তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় বলে জানিয়েছেন (১৩।১০)।

সমস্ত কর্ম যে পরমাত্মাকে অর্পণ করে, সে জলেস্থিত কমলপত্রের ন্যায় পাপ দ্বারা লিপ্ত হয় না (৫।১০) ; কারণ পদ্মপত্র জলে স্থিত হয়েও নির্লিপ্ত থাকে, নির্লিপ্ত অবস্থাতেই জলে থাকে। কর্মযোগের কথায় ভগবান কর্মযোগীদের জন্যও বলেছেন যে, তিনি কর্ম করেও নির্লিপ্ত থাকেন এবং নির্লিপ্ত হয়েই কর্ম করেন (৪।১৮)। এইরূপেই 'সর্বকর্মফলত্যাগম্' (১২।১১), 'সঙ্গবর্জিতঃ' (১১।৫৫) এবং 'স্বকর্মণা' (১৮।৪৬) পদেও কর্মযোগের কথা ভক্তিযোগে বলা হয়েছে।

গীতায় জ্ঞানযোগ দ্বারা পরাভক্তি (প্রেম) প্রাপ্তির (১৮।৫৪) এবং কর্মযোগ দ্বারা জ্ঞানের প্রাপ্তির (৪।৩৮) কথা বলা হয়েছে ; কিন্তু ভক্তি দ্বারা ভগবদ্দর্শন, ভগবৎতত্ত্বের জ্ঞান এবং ভগবৎতত্ত্বে প্রবেশ—এই তিনটিই হয়ে যায় (১১।৫৪)। এই বিশেষত্ব ভক্তিযোগেই আছে, অন্য যোগে নেই।

(৬৬) শরণাগতিতেই গীতার আরম্ভ ও অবসান

আদাবন্তে চ গীতায়াং প্রোক্তা বৈ শরণাগতিঃ।
আদৌ শাধি প্রপন্নং মামন্তে মাং শরণং ব্রজ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন একসঙ্গেই থাকতেন। একসঙ্গে থাকলেও অর্জুন যতক্ষণ ভগবানের শরণাগত হয়ে নিজ কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা না করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবান তাঁকে উপদেশ দেন নি। মানুষ কখন শরণাগত হয় ? যখন সে প্রকৃতপক্ষে নিজ কল্যাণ চায়, কিন্তু কল্যাণের কোনও পথ খুঁজে পায় না এবং তার নিজের শক্তি, বুদ্ধি, যোগ্যতা ইত্যাদিতে কাজ হয় না, তখন সে গুরু, গ্রন্থাদি অথবা ভগবানের শরণাগত হয়। অর্জুনেরও এই দশা হয়েছিল। ক্ষাত্রধর্মের দৃষ্টিতে তাঁর যুদ্ধ করা উচিত মনে হয়েছিল, কিন্তু কুলনাশের কথা ভেবে যুদ্ধ করা অনুচিত মনে হয়েছিল। এইজন্য যুদ্ধ করা উচিত কিনা—তা স্থির করতে পারছিলেন না। যদি ভগবানের সম্মতিক্রমে যুদ্ধ করাও হয় তাহলে যুদ্ধে জয় হবে, না পরাজয় হবে তাও জানতেন না আবার যুদ্ধে কুটুম্ব বধ করে তিনি বেঁচে থাকতেও চাইছিলেন না (২।৬)। এইরূপ পরিস্থিতিতে অর্জুন ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন (২।৭)।

ভগবানের শরণাগত হওয়ার পরেও অর্জুনের মনে এই চিন্তা জাগল যে, 'যুদ্ধ দ্বারা খুব বেশী হলে পৃথিবীর ধনধান্যপূর্ণ রাজ্যই লাভ হতে পারে। তার চেয়েও বেশী কিছু হলে দেবতাদের আধিপত্য পাওয়া যেতে পারে ; কিন্তু এর দ্বারা আমার ইন্দ্রিয়শিথিলকারী শোক দূরীভূত হবে না' (২।৮)। দ্বিতীয়তঃ 'আমি ভগবানের শরণাগত হওয়াতে তিনি অনতিবিলম্বে এই আদেশ দিতে পারেন যে, তুমি যুদ্ধ কর। কিন্তু যুদ্ধে আমি কোন লাভই দেখতে পাচ্ছি না।' সুতরাং অর্জুন ভগবানের উত্তরের অপেক্ষা না করেই পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, 'আমি যুদ্ধ করব না'—'ন যোৎস্যে' (২।৯)।

মানুষ যাঁর শরণাগত হয়, তাঁর কথা যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলেও সেই ব্যক্তির ওপর তার অটল বিশ্বাস থাকা উচিত যে এঁর কথা শুনলে তার ভালোই হবে। অর্জুনেরও ভগবানের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 'যদিও আমি যুদ্ধ করাতে কোনরূপ লাভ দেখছি না, তবুও ভগবান যেরূপ আদেশই প্রদান করুন, তা ঠিকই হবে।' এইজন্য গীতায় অর্জুন ভগবানের কথায় নানাপ্রকার প্রশ্ন করলেও ভগবান হতে বিমুখ হন নি।

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে এবং নিজের দিক থেকেও ভগবান অনেক অন্তরঙ্গ কথা বলেছেন এবং নিজের

শরণাগতির কথাও বলেছেন, কিন্তু এই কথা অর্জুনের পুরোপুরি মনঃপূত হয় নি। শেষে ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি সবার হৃদয়ে বিরাজমান সর্বব্যাপী ঈশ্বরের শরণাগত হও ; তাঁর কৃপায় তোমার সংসারের আসক্তি সর্বতো-ভাবে দূর হবে এবং অবিনাশী পদ লাভ হবে (১৮।৬২)। আমি তোমাকে এই অতি গোপনীয় কথাটি বললাম, এরপর তোমার যা ইচ্ছা হয়, কর'—**'যথেচ্ছসি তথা কুরু'** (১৮।৬৩)।

অর্জুনের এক উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই যে তিনি কোনও অবস্থাতেই ভগবান থেকে বিমুখ হননি। তারই জন্য ভগবান যখন বললেন যে 'যেমন তোমার ইচ্ছা, তেমন কর', তখন অর্জুন উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন, ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তখন ভগবান তাঁকে গুহ্যতম উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন যে, 'তুমি সমস্ত ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হও আমি তোমাকে সর্বপাপ হতে পরিত্রাণ করব, তুমি এর জন্য শোক বা চিন্তা কোরো না'[১]। ভগবানের এই কথা শুনে অর্জুন সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হলেন, নিজের বুদ্ধির ওপর আর তাঁর নির্ভরতা রাখলেন না। অর্জুন জানালেন যে, হে অচ্যুত! আপনার কৃপাতেই আমার মোহ সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়েছে। এখন থেকে আমি শুধু আপনার নির্দেশই পালন করব—**'করিষ্যে বচনং তব'** (১৮।৭৩)। এরূপ বলে অর্জুন ক্ষান্ত হলেন এবং ভগবানও আর কিছু বললেন না অর্থাৎ অর্জুন সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ায় অর্জুনকে তাঁর কিছু বলার রইল না।

(৬৭) গীতায় আশ্রয়ের বর্ণনা

যাবজ্জীবো ন গৃহ্ণীয়াদ্ধরেশ্চ চরণাশ্রয়ম্।
তাবন্ন চ তরেৎ কশ্চিন্মৃত্যুসংসারসাগরাৎ॥

জীবমাত্রেরই স্বভাব হচ্ছে যে সে কারো না কারো আশ্রয় গ্রহণ করতে চায় এবং আশ্রিত থাকে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি সমস্তই কারো না কারো আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, কারণ জীবমাত্রই সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ। তারই জন্য জীব যতক্ষণ নিজ অংশী পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ না করে, ততক্ষণ সে অপরের আশ্রয় নিতে থাকে, পরাধীন হতে থাকে এবং দুঃখও পেতে থাকে।

মানুষের বিবেকবোধ আছে অথচ নিজ বিবেককে গুরুত্ব না দিয়ে সে স্বয়ং সাক্ষাৎ অবিনাশী পরমাত্মার চেতন অংশ হওয়া সত্ত্বেও বিনাশশীল জড়বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ শরীর, বল, বুদ্ধি, যোগ্যতা, আত্মীয়-পরিজন, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির আশ্রিত হয়—এটি মনুষ্য-জীবনের একটি মারাত্মক ভ্রান্তি।

গীতায় অর্জুন ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেই নিজ কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন (২।৭)। যতক্ষণ পর্যন্ত অর্জুন ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি, ততক্ষণ গীতার উপদেশ আরম্ভ হয় নি। উপদেশের শেষেও ভগবান তাঁর আশ্রয় নেওয়ার কথাই বলেছেন (১৮।৬৬)। এইপ্রকারে গীতার উপদেশের আরম্ভ এবং অবসানে ভগবৎ আশ্রয়েরই কথা বলা হয়েছে।

ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধীনতায় মানুষ তার ইচ্ছামতো যে কারোরই আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং কেউ কেউ নিজ কামনাপূর্তির উদ্দেশ্যে দেবতাদের আশ্রয় গ্রহণ করে (৭।২০), কিন্তু পরিণামে তারা বিনাশশীল ফলই লাভ করে থাকে (৭।২৩)। কিছু মানুষ ভোগাদি কামনায় বেদোক্ত সকাম অনুষ্ঠানের আশ্রয় নেয় এবং পরিণামে

[১]সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
—এটি শরণাগতির মুখ্য শ্লোক। (গীতা ১৮।৬৬)

তারা পুনঃ পুনঃ মর্ত্যলোকে আগমন করে (৯।২১)।

কিছু মানুষ আবার ভগবানেরও আশ্রয় নেয় না এবং ভগবানকে ভগবান বলে মানে না, সুতরাং এইসব মানুষদের মধ্যে কেউ আসুরীভাবের আশ্রয় নেয় (৭।১৫) ; কিছু ব্যক্তি আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী প্রকৃতির আশ্রয় নেয় (৯।১২) ; কেউ কেউ অপূরণীয় কামনায় বশীভূত থাকে (১৬।১০) ; কেউ আমৃত্যু অপার চিন্তার আশ্রয় নেয় (১৬।১১) ; কেউ অহংকার, দুরাগ্রহ, গর্ব, কামনা এবং ক্রোধের আশ্রয় নেয় (১৬।১৮)। এই আশ্রয় নেওয়ার ফলস্বরূপ তাদের বারংবার চুরাশী লক্ষ যোনি এবং নরকে পরিভ্রমণ করতে হয় (১৬।১৯-২১)। এও তার এক ভ্রান্তি।

ভগবদ্‌বিমুখীন মানুষ ভগবানের এবং তাঁর দয়া, ক্ষমা, সমতা ইত্যাদি গুণগুলির (দৈবী সম্পদের) আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরিণামে ভগবানকে লাভ করে। সুতরাং গীতায় **'মামুপাশ্রিতাঃ'** (৪।১০) ; **'মদাশ্রয়ঃ'** (৭।১) ; **'মামেব যে প্রপদ্যন্তে'** (৭।১৪) ; **'মামাশ্রিত্য যতন্তি যে'** (৭।২৯) ; **'মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য'** (৯।৩২) ; **'মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ'** (১৮।৫৬) **'তমেব শরণং গচ্ছ'** (১৮।৬২) ; **'মামেকং শরণং ব্রজ'** (১৮।৬৬) ইত্যাদি পদগুলিতে ভগবানের আশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে ; এবং 'দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ' (৯।১৩) এবং 'বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য' (১৮।৫৭) পদগুলিতে দৈবী সম্পদের আশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে।[1]

এর তাৎপর্য এই যে গীতায় যেসকল সাধন প্রণালীর কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সহজ সাধন হলো ভগবানের শরণাগত হওয়া। যে ভগবানের শরণাগত হয়ে সাধনা করে তার সাধনার সিদ্ধি খুবই শীঘ্র এবং সহজে হয়। এই কথা ভগবান গীতায় স্পষ্টভাবেই বলেছেন, যে আমার শরণাগত হয়ে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, আমি সেই ভক্তকে মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর থেকে অচিরাৎ উদ্ধার করে থাকি (১২।৬-৭)। যারা আমার আশ্রয় নিয়ে মুক্তিলাভের জন্য যত্ন করে তারা ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম এবং সম্পূর্ণ কর্ম তথা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ সহ আমাকে জানতে পারে অর্থাৎ আমার সমগ্ররূপ অবগত হয় (৭।২৯-৩০)। ভগবান তাঁর আশ্রয় গ্রহণকারী ভক্তদের সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন (৬।৪৭)। সুতরাং সাধকদের উচিত তাঁরা যে সাধনাই করুন ভগবানের আশ্রয় নিয়েই তা করা।

জীব স্বয়ং পরমাত্মার অংশ এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর প্রকৃতির অংশ। ক্রিয়া এবং পদার্থের যে আশ্রয় তা স্থূল শরীরের আশ্রয় (স্থূল শরীর ছাড়াও অর্থ, গৃহ, পুত্র, পৌত্র, আত্মীয়, জমি-জায়গা ইত্যাদির যে আশ্রয় তা তো বিশেষভাবেই জড়ত্বের আশ্রয়)। বিদ্যা, বুদ্ধি, সদ্‌গুণ, যোগ্যতা প্রভৃতির যে আশ্রয় তথা চিন্তা, ধ্যান, মননের যে আশ্রয় তা সবই সূক্ষ্ম-শরীরের আশ্রয়। যাতে ব্যুত্থান (উত্তরণ) হয়, সেই সমাধির আশ্রয় নেওয়া হলো কারণ-শরীরের আশ্রয়। আর সমাধি দ্বারা যে সকল সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, নিজের মধ্যে যা মহত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয় সে সবই সমাধিকেন্দ্রিক কার্যের আশ্রয়—এ সবই হলো বিনাশশীল বস্তুর আশ্রয়।

জপ-ধ্যান, কথা-কীর্তন ইত্যাদির আশ্রয় হলো সাধনের আশ্রয়। 'আমি ভগবানেরই'—এইপ্রকার ভগবানের সঙ্গে একমাত্র সম্পর্কিত হওয়া হলো সাধ্যের (ভগবানের) আশ্রয়। সাধনের আশ্রয় নিলে সাধন-ভজন করতে হয়, কিন্তু সাধ্যের আশ্রয় নিলে সাধন স্বতঃস্ফূর্ত হয়, করতে হয় না। বিনাশশীলের আশ্রয় দূরীভূত হলেই ভগবৎপ্রাপ্তির অনুভূতি স্বতঃই হয়ে যায়। কারণ ভগবান নিত্যপ্রাপ্ত, কেবল ক্ষণভঙ্গুর আশ্রয় গ্রহণই হলো ঈশ্বর-প্রাপ্তির একমাত্র অন্তরায়।

[1] দৈবী সম্পদের (ভগবানের গুণগুলির) আশ্রয় নেওয়া ভগবানেরই আশ্রয় নেওয়া বলে বিবেচিত হয়।

(৬৮) গীতায় ভগবানের আশ্বাস

সর্বেভ্যঃ সাধকেভ্যশ্চাশ্বাসনং দত্তবান্ হরিঃ।
জনঃ কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং নৈব গচ্ছতি॥

ভগবৎপ্রাপ্তির পথে কোন বাধা বিঘ্নই নেই। এটি সম্পূর্ণরূপে বাধা-বিঘ্নশূন্য—'**এষ নিষ্কণ্টকঃ পন্থাঃ**'। এই পথে মানুষ যদি চোখ মুদেও ছোটে তাহলেও সে হোঁচট খায় না বা পড়েও যায় না।

সাধক যদি তার একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পরমাত্মার প্রাপ্তি বলে স্থির করতে পারে তাহলে কাজ অনেক এগিয়ে থাকে। ভগবান স্বয়ং সাধকদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, যারা নিজ কল্যাণের জন্য কর্ম করে তাদের দুর্গতি হয় না—'**ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি**' (৬।৪০)। যে কেবল পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই সকল কর্ম করে তার সমস্ত কর্মই 'সৎ' বলে অভিহিত হয় (১৭।২৭) এবং সৎ কর্মের কখনো বিনাশ হয় না। স্বল্প-পরিমাণেও সমত্ব-ভাব যদি জীবনে আসে, তাহলে তা জন্ম-মরণ রূপ মহাভয় থেকে ত্রাণ করে—'**স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ**' (২।৪০)। বেদাদি গ্রন্থে, যজ্ঞে, তপে এবং দান কর্মে যে পুণ্যফল কথিত আছে যোগীপুরুষ তা সমস্ত অতিক্রম করেন (৮।২৮)। কেবল যোগী নয়, যোগের (সমত্বের) জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বেদোক্ত সকাম অনুষ্ঠান অতিক্রম করতে সক্ষম হন—'**জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে**' (৬।৪৪)।

তথাকথিত নিজের বস্তুসহ নিজেকেও যাঁরা ভগবানে সমর্পণ করেন, এইরূপ ভক্তগণকে ভগবান অচিরাৎ উদ্ধার করেন (১২।৭)। এরূপ ভক্তদের যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করার দায়িত্ব) ভগবান নিজে বহন করেন—'**তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্**' (৯।২২)।

অর্জুনের মাধ্যমে ভগবান তাঁর অনন্য ভক্তদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, 'তোমরা সাধনা এবং সিদ্ধি—এই দুই বিষয়ে চিন্তা কোরো না।' সাধক যদি তার দৈবী-সম্পদের গুণের স্বল্পতার জন্য সাধনের কথা ভেবে হতাশ হয়, তবে ভগবান তাদের এই বলে আশ্বাস দেন যে, 'তোমার মধ্যে দৈবী সম্পদের গুণ রয়েছে, সুতরাং তুমি চিন্তা কোরো না'—'**মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব**' (১৬।৫)। সাধক যদি নিজ পাপের কথা ভেবে তত্ত্ব-প্রাপ্তিতে হতাশ হয়, সেক্ষেত্রে ভগবানের আশ্বাসবাক্য হলো, 'আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব, তুমি চিন্তা কোরো না'—'**অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ**' (১৮।৬৬)[১]।

সাধকদের সাধন এবং সিদ্ধি কোন বিষয়ে হতাশ হওয়া উচিত নয়, তবে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতার খুবই প্রয়োজন। কারণ চিন্তা ভগবান থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং ব্যাকুলতা ভগবানের সন্নিকট করে। চিন্তায় নৈরাশ্য আসে, ব্যাকুলতাতে ভগবানকে পাওয়ার আশা দৃঢ় হয়। অতএব সাধকের কখনো চিন্তা করা উচিত নয় বরং নিজ সাধনে তৎপরতার সঙ্গে লেগে থাকা উচিত।

[১]ভগবানের আশ্বাসবাক্য অন্যান্য শ্লোকেও আছে যেমন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাহাত্তর সংখ্যক শ্লোক, চতুর্থ অধ্যায়ের ছত্রিশ সংখ্যক শ্লোক, পঞ্চম অধ্যায়ের উনত্রিশ সংখ্যক শ্লোক, ষষ্ঠ অধ্যায়ের একত্রিশ সংখ্যক শ্লোক, সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোক, অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম এবং চতুর্দশ শ্লোক, নবম অধ্যায়ের ত্রিশ-একত্রিশ সংখ্যক শ্লোক, দশম অধ্যায়ের নবম, দশম ও একাদশ সংখ্যক শ্লোক, একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্ন সংখ্যক শ্লোক, দ্বাদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঁচিশ ও চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোক, চতুর্দশ অধ্যায়ের ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোক, পঞ্চদশ অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের আটান্ন সংখ্যক শ্লোক।

(৬৯) গীতায় নয় প্রকারের সগুণ উপাসনা

স্বকীয়োপাসনা প্রোক্তা নবধা ফাল্গুনং প্রতি।
তাসাং যয়া কয়া যুক্তো হরিং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

গীতায় নয় প্রকারের সগুণ-উপাসনার কথা বলা হয়েছে, যথা—

(১) সবকিছুর আদিতে ভগবান বিদ্যমান—'যে ব্যক্তি আমাকে অজাত, অনাদি এবং সর্বকালের মহেশ্বর রূপে মান্য করেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান' (১০।৩)। 'আমি সমস্ত জগতের প্রভব (নিমিত্ত কারণ) এবং প্রলয় (উপাদান কারণ) অর্থাৎ সকলের আদি কারণ' (৭।৬) ; 'দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত মহাত্মা ব্যক্তিগণ আমাকে সমস্ত প্রাণিজগতের আদি ও অবিনাশী জেনে অনন্যভাবে ভজনা করেন' (৯।১৩) ইত্যাদি।

(২) ভগবান সবার মধ্যে বিরাজমান—'যাঁরা সবার মধ্যে আমাকে দেখেন, তাঁদের কাছে আমি কখনো অদৃশ্য হই না' (৬।৩০) ; 'যাঁরা সকল প্রাণীর মধ্যে আমাকে দেখেন' (৬।৩১) ; 'আমি অব্যক্তরূপে এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছি' (৯।৪) ; 'প্রাণীদের অন্তঃকরণে আত্মারূপে আমিই আছি' (১০।২০) ; 'সেই পরমাত্মাই সর্বভূতের হৃদয়ে স্থিত' (১৩।১৭) ; 'আমিই অন্তর্যামীরূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত' (১৫।১৫) 'ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত' (১৮।৬১) ইত্যাদি।

(৩) সবকিছু ভগবানেই অধিষ্ঠিত—'যিনি সবকিছু আমাতে অধিষ্ঠিত দেখেন, তিনি আমার কাছে কখনও অদৃশ্য হন না' (৬।৩০)। 'সমস্ত জগৎসংসার সূত্রে সূত্র দ্বারা তৈরি গুটির (মণির) ন্যায় আমাতেই ওতপ্রোত হয়ে আছে' (৭।৭) ; 'সমস্ত প্রাণী যাঁর অন্তর্গত' (৮।২২) ; 'সকল প্রাণী আমাতেই অবস্থিত (৯।৬) ; 'হে অর্জুন ! তুমি আমার এই শরীরের এক অংশে চরাচর সমগ্র জগৎ এখনই দর্শন কর' (১১।৭) ; অর্জুন দেবাদিদেব ভগবানের দেহে একই স্থানে স্থিত বহু-বিভাগে বিভক্ত সমস্ত জগৎকে দর্শন করলেন (১১।১৩) ; 'হে দেব ! আমি আপনার শরীরে সমস্ত দেবতাগণ, প্রাণীগণ, কমলাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মা, শঙ্কর, ঋষিগণ এবং দিব্য সর্পগণকে দেখতে পাচ্ছি' (১১।১৫) ইত্যাদি।

(৪) ভগবানই সবকিছুর অধীশ্বর—'আমি জন্মরহিত, অবিনাশী এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে যোগমায়ার দ্বারা প্রকটিত হই' (৪।৬) ; 'যে ব্যক্তি আমাকে সকল যজ্ঞ এবং তপের ভোক্তা এবং সর্বলোকের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর (প্রভু) ও সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ বলে মানেন, তিনি (পরম) শান্তি লাভ করেন' (৫।২৯) ; 'আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সমগ্র চরাচর জগতকে সৃষ্টি করেন' (৯।১০) ; 'মূঢ় ব্যক্তিগণ সমস্ত প্রাণীর মহেশ্বররূপ আমাকে মনুষ্য-দেহধারী সাধারণ ব্যক্তি বলে অবজ্ঞা করে' (৯।১১) ; মহাযোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিজ পরম ঐশ্বরিক বিরাট রূপ দেখালেন (১১।৯) ইত্যাদি।

(৫) সমস্ত কিছু ভগবান হতেই উৎপন্ন—'সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আমা-হতেই উৎপন্ন হয়' (৭।১২) ; 'বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ ইত্যাদি কুড়ি প্রকার ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়' (১০।৪-৫) ; 'আমা হতেই জগৎ-সংসার প্রবৃত্ত হয়' (১০।৮) ; 'স্মৃতি, জ্ঞান এবং সংশয়াদি দূরীকরণ আমা-দ্বারাই হয়' (১৫।১৫) ; পরমাত্মা থেকেই সকল প্রাণীর উৎপত্তি হয় (১৮।৪৬) ইত্যাদি।

(৬) ভগবান সবকিছুর বিধানকর্তা—'যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে অন্যান্য দেবতাদের উপাসনা করেন, সেই উপাসনার ফলের বিধান আমিই করে থাকি' (৭।২২) ; 'ভক্তদের যোগক্ষেম আমিই বহন করে থাকি' (৯।

২২) ; 'আমার আশ্রয়গ্রহণকারী ভক্ত আমার কৃপায় অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়' (১৮।৫৬) ; 'ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে শরীররূপী যন্ত্রে আরূঢ় হয়ে সমস্ত প্রাণীকে সঞ্চালিত করেন' (১৮।৬১) ইত্যাদি।

(৭) ভগবানই সকলের আরাধ্য—তিন বেদে বর্ণিত সকাম কর্ম অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রদেবতার রূপে আমারই পূজা করে (৯।২০)। 'যেসব ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করে তারা প্রকৃতপক্ষে আমারই উপাসনা করে, কিন্তু তা হয় বিধিবর্জিত অর্থাৎ তারা সেই দেবতারূপে আমাকে মানে না' (৯।২৩) ; 'যাঁরা নির্গুণ-নিরাকারের উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন' (১২।৩-৪) ইত্যাদি।

(৮) ভগবানই সবকিছুর প্রকাশক—'সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিতে যে তেজ তা আমারই অর্থাৎ এইসকল আমার দ্বারাই প্রকাশিত হয়' (১৫।১২)।

(৯) ভগবানই সব হয়ে আছেন—সর্বই বাসুদেব (৭।১৯) ; 'আমিই এই সমস্ত জগতের গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃদ্, প্রভব, প্রলয়, স্থান, আধার এবং অবিনাশী বীজও আমিই' (৯।১৮) সৎ, অসৎ আমারই প্রকাশ (৯।১৯) ; হে জগন্নিবাস ! আপনিই সৎ ও অসৎ এবং যা সদসতের অতীত তাও আপনিই (১১।৩৭) ইত্যাদি[১]।

উপরিউক্ত সমস্ত উপাসনার তাৎপর্য এই যে সব-কিছুর বীজ, আধার, প্রকাশক, প্রভু, শাসক—সব এক ভগবানই ; কিন্তু সাধকগণের প্রকৃতি (স্বভাব), যোগ্যতা এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের বিভিন্নতার কারণে তাদের উপাসনাও বিভিন্ন প্রকারের হয়। তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নেই ; কারণ পরিণামে সমস্ত উপাসনার ফল একই হয়।

ক্ষুধা যেমন সকলেরই একপ্রকার এবং ভোজনে তৃপ্তিও একইপ্রকারের হয়, কিন্তু রুচির ভিন্নতার জন্য খাদ্যপদার্থ বিভিন্ন প্রকারের হয় ; যেমন মানুষের বেশ-ভূষা, থাকা-খাওয়া, ভাষা ইত্যাদি পৃথক হলেও হাসি এবং কান্না সকলের একপ্রকারেরই হয় ; কারণ, সুখ ও দুঃখের অনুভব সকলের একই রকমের হয় ; সেইরূপ ভগবৎপ্রাপ্তির ক্ষুধা (ইচ্ছা) এবং ভগবানকে না পাওয়ার দুঃখ সকল সাধকের একই প্রকারের হয় এবং সাধনায় পূর্ণতা হলে ভগবৎপ্রাপ্তির আনন্দও সকলের একই প্রকারের হয়। কিন্তু সাধকের প্রকৃতি, যোগ্যতা ও বিশ্বাসের বিভিন্নতার জন্য উপাসনা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

উপাসনার প্রারম্ভে সাধকের ভাব এবং যোগ্যতা প্রবল থাকে আর সিদ্ধিলাভ হলে (শেষে) তত্ত্বের প্রাধান্য হয়। ভাব এবং যোগ্যতা ব্যক্তিগত, কিন্তু তত্ত্ব ব্যক্তিগত নয়, তা হল সর্বগত।

[১]এখানে উপাসনার যে নয়টি বর্ণনা পৃথক্ ভাবে করা হয়েছে, এগুলির কোনওটির বর্ণনা গীতায় কোথাও কোথাও একটি শ্লোকেও করা হয়েছে।

(৭০) গীতার গোপনীয় বিষয়

পুরোঽর্জুনস্য কৃষ্ণেন স্বাত্মা হি প্রকটীকৃতঃ।
বিষয়ো গোপনীয়োঽয়ং গীতায়া মন্যতে বুধৈঃ॥

ভগবান তাঁর আত্মীয় এবং ভক্ত অর্জুনের কাছে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এই হলো গীতার গোপনীয় বিষয়। ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তিনি নিজেকে গোপন করে রাখেন, সবার সামনে নিজ ভগবৎস্বরূপ প্রকাশ করেন না (৭।২৫)। কিন্তু নিজ অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্তদের কাছে তিনি গোপন থাকতে পারেন না, নিজেকে অনাবৃত করে দেন।

গীতায় ভগবান নিজ প্রিয় ভক্ত অর্জুনের কাছে তাঁর ভগবত্তা, মহত্ত্ব এবং প্রভুত্বের বিষয়ে অনেক প্রকারে বলেছেন ; যেমন—

'এই যোগ (কর্মযোগ) আমি প্রথমে সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। এইরূপে পুরুষানুক্রমে এই যোগ সমস্ত রাজর্ষিগণ অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু এই কর্মযোগের মর্ম জানা লোকের অভাব হওয়ায় কালক্রমে এই যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। সেই পুরাতন যোগের কথা আমি তোমাকে বললাম। এ অত্যন্ত গুহ্য তত্ত্ব। অর্থাৎ যা আমি সূর্যকে বলেছিলাম, তা আজ তোমায় বলছি—এটি অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়' (৪।১-৩)।

'আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতিক্রান্ত হয়েছে ; সেসব আমি অবগত আছি, তুমি জানো না (৪।৫)', 'আমি জন্মরহিত, অব্যয়, আত্মা এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও প্রকৃতিকে বশীভূত করে প্রকট হই' (৪।৬)। 'আমি ধর্মের সংস্থাপন, ভক্তদের রক্ষা ও দুষ্টের বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতাররূপ গ্রহণ করি' (৪।৭-৮)। 'মহাসর্গের শুরুতে আমি চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেছি, এই সৃষ্টি রচনা করেও আমি অকর্তা রূপে বিরাজমান' (৪।১৩)। 'আমাকে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সর্বভূতের সুহৃদ জেনে মানুষ পরম শান্তি লাভ করে' (৫।২৯)। 'যেসব ব্যক্তি আমাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতে আমাকে অবস্থিত দেখেন, আমি তাঁদের কাছে অদৃশ্য হই না এবং তাঁরাও আমার কাছে অদৃশ্য হন না' (৬।৩০)।

'এই জগতে আমি ভিন্ন অপর কোন মূল কারণ নেই। সমস্ত জগৎ-সংসার আমাতে ওতপ্রোত', 'আমিই জলে রস, চন্দ্র ও সূর্যে প্রভা ইত্যাদি কারণ-রূপে বিদ্যমান' ; 'সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয় ; কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নই, সেগুলিও আমাতে অবস্থিত নয় অর্থাৎ সবকিছু আমি-ই' (৭।৭-১২)। 'আমি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছি এবং সকল প্রাণী আমাতে অবস্থিত ; কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই এবং তারাও আমাতে নেই— তুমি আমার এই ঐশ্বরিক যোগ (সামর্থ্য) অবলোকন কর' (৯।৪-৫)। 'মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাণী আমার প্রকৃতিতে লীন হয় এবং মহাসর্গের প্রারম্ভে পুনরায় আমি তাদের সৃষ্টি করি' (৯।৭)।

'আমিই এই জগতের মাতা, পিতা, ধাতা, পিতামহ ইত্যাদি' (৯।১৭)। 'সৎ- অসৎ, জড়-চেতন ইত্যাদি যা কিছু আছে, তা সব আমিই' (৯।১৯) 'একনিষ্ঠ ভক্তগণের যোগক্ষেম আমিই বহন করে থাকি' (৯।২২)। 'আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং সমস্ত জগতের প্রভু, কিন্তু যারা আমাকে তত্ত্বগত জানে না সংসারে তাদের পতন হয়' (৯।২৪)। 'সর্বভূতেই আমি সমানভাবে আছি কোন প্রাণীই আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নয়, কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের মধ্যে এবং তাঁরা আমার মধ্যে বিশেষভাবে রয়েছেন' (৯।২৯)।

'দেবতা বা মহর্ষি কেহই আমার উৎপত্তির কারণ জানেন না, কেননা আমি সর্বপ্রকারেই দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি' (১০।২)। 'প্রাণীগণের বুদ্ধি, জ্ঞান আদি সমস্ত ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়' (১০।৪-৫) 'আমিই জগতের মূল কারণ এবং আমা হতেই সকল প্রাণী সত্তা ও স্ফূর্তি পায়' (১০।৮)। 'আমিই ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনষ্ট করি' (১০।১১)।

'সর্বভূতের বীজ আমিই, আমা ব্যতীত কোন প্রাণীর সৃষ্টি হতে পারে না' (১০।৩৯)। 'আমি নিজের একাংশে

সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করে অবস্থিত আছি' (১০।৪২)। 'তুমি আমার এই বিরাট রূপ তোমার এই চর্মচক্ষু দ্বারা দর্শনে সক্ষম হবে না ; সুতরাং আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করছি ; এর দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ (প্রভাব) অবলোকন কর' (১১।৮)। 'আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল এবং এখানে এইসকল যোদ্ধার প্রাণসংহার করতে এসেছি। তুমি যুদ্ধ না করলেও এরা কেউই জীবিত থাকবে না ; কারণ, এদের আমি পূর্বেই বধ করে রেখেছি। অতএব নিমিত্তমাত্র হয়ে তুমি যুদ্ধ কর, তোমার জয় হবে' (১১।৩২-৩৪)।

'মৎপরায়ণ যে ভক্তগণ সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে অনন্যভাবে আমার সাধন-ভজন করে, তাদের আমি (অচিরাৎ) সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করি' (১২।৬-৭)। 'একনিষ্ঠ ভক্তি সহযোগে যিনি আমায় ভজনা করেন, তিনি গুণসমূহকে অতিক্রম করেন' (১৪।২৬)। 'আমিই ব্রহ্ম, অবিনাশী, অমৃত, শাশ্বতধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয়' (১৪।২৭)। 'চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নিতে আমারই তেজ রয়েছে। আমি নিজ শক্তির দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করি। আমি বৈশ্বানররূপে প্রাণিগণের খাদ্য পরিপাক করি। আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি। বেদসমূহের জ্ঞাতব্য আমিই' (১৫।১২-১৫)। 'আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর থেকে উত্তম ; সেই হেতু বেদ এবং শাস্ত্রে আমিই পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ' (১৫।১৮)। 'যিনি অনন্যভাবে আমার ভজনা করেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন' (১৫।১৯)। 'আমি এ অতি গুহ্য শাস্ত্র জানালাম, যা জেনে মানুষ জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয়' (১৫।২০)।

'মানুষ সর্বদা সর্বকর্মে লগ্ন থেকেও আমার কৃপায় অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়' (১৮।৫৬)। 'তুমি মৎপরায়ণ হয়ে সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ কর, তাহলে আমার অনুগ্রহে সমস্ত সঙ্কট অতিক্রম করবে' (১৮।৫৭-৫৮)। 'তুমি সকল ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে কেবলমাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি চিন্তা কোরো না' (১৮।৬৬)।

এইভাবে ভগবান তাঁর গোপন কথা এবং নিজেকে ভক্তদের কাছে উন্মোচিত করার যত কথা প্রকাশ করেছেন সে সবই গোপনীয় বিষয়।

(৭১) গীতায় সাধকদের দ্বিবিধ দৃষ্টি

গীতায়াং দ্বিবিধা দৃষ্টির্দৃশ্যতে জ্ঞানিভক্তয়োঃ।
জ্ঞানী গুণময়ং সর্বং ভক্তঃ প্রভুময়ং জগৎ॥

(১)

পরমাত্মা এবং সংসারের বর্ণনা গীতায় বিবিধ প্রকারে করা হয়েছে। সেই বিবিধ প্রকার সাধকদের দৃষ্টিতেই করা হয়েছে। যেসকল সাধকের দৃষ্টিতে ভগবানই সব, তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই, তাদের 'ভক্তিযোগী' বলা হয়। যাদের দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবী গুণময়, প্রকৃতির গুণগুলি ছাড়া আর কিছুই নেই, তাদের বলা হয় 'জ্ঞানযোগী'। এইপ্রকার সাধকদের দ্বিবিধ দৃষ্টি হয়—ভক্তিদৃষ্টি এবং জ্ঞানদৃষ্টি। ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রাধান্য এবং জ্ঞানযোগে বিচার ও বিবেকের প্রাধান্য থাকে।

ভক্তিযোগে ভক্ত মনে করেন যে, ভগবানই সবকিছু—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯)। ভগবানও বলেছেন যে, চরাচরে কোন প্রাণীই আমা-ছাড়া নেই (১০।৩৯) অর্থাৎ চর-অচর সবকিছু আমিই। সূত্রে গ্রথিত মালার ন্যায় এই সম্পূর্ণ জগৎ-সংসার আমাতে ওতপ্রোত হয়ে আছে' (৭।৭)। 'সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাবও আমা-হতে উৎপন্ন, কিন্তু আমি সে সবে এবং সেসব আমাতে স্থিত নয়, অর্থাৎ সবকিছুই আমি' (৭।১২)। 'সৎ-অসৎ অর্থাৎ জড় বা চেতন যা কিছু আছে, তা সমস্তই আমি' (৯।১৯)। 'বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ ইত্যাদি ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়, (১০।৪-৫)। আমি সকলের উৎপত্তির হেতু অর্থাৎ মূল

কারণ এবং আমা হতেই সব সক্রিয় হয়' (১০।৮)। দশম অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বললেন যে, 'তুমি যে যে স্থানে, যে যে বস্তুতে বা পদার্থে মহত্ত্ব, বিশেষত্ব এবং অলৌকিকতা ইত্যাদি যা কিছু দেখবে, তা সবই আমার বলে জানবে (১০।৪১)। এর অর্থ এই যে, সেই মহত্ত্ব, গুরুত্ব, বিশেষত্ব প্রভৃতি রূপে আমিই আছি—এই মনে করে তোমার দৃষ্টি যেন শুধু আমার দিকেই থাকে'।

জ্ঞানযোগে সাধক এরূপ মনে করেন যে, প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারাই সমস্ত কর্ম সংঘটিত হয় (৩।২৭)। গুণই গুণের মধ্যে প্রবৃত্ত আছে (৩।২৮, ১৪।২৩)। এই দৃষ্টিতেই ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ অনুযায়ী জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি এবং সুখের তিনটি বিভাগ করে বর্ণনা করেছেন এবং তিনপ্রকার গুণের উপসংহারে বলেছেন যে, ত্রিলোকে এই তিনগুণ ভিন্ন কিছুই নেই ; আমরা যা কিছু দেখি সমস্তই ত্রিগুণাত্মক (১৮।৪০)।

(২)

ভগবান গীতায় একস্থানে বলেছেন যে, 'সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আমা-হতেই উৎপন্ন,' (৭।১২) এবং অন্য আর এক স্থানে বলেছেন যে, 'সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন' (১৩।১৯ ; ১৪।৫)। প্রথম কথাটি ভক্তিমার্গের এবং দ্বিতীয়টি জ্ঞানমার্গের। ভক্তিমার্গে ভগবান ভিন্ন গুণ এবং ভাবের অন্য কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। অর্থাৎ গুণ, পদার্থ, ক্রিয়া ইত্যাদি সবই ভগবানের স্বরূপ। সেইজন্যই ভগবান বলেছেন যে গুণগুলি তাঁর থেকেই উদ্ভূত। জ্ঞানমার্গে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। নির্গুণব্রহ্ম গুণসমূহের অতীত, নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় এবং নিরাকার। সুতরাং এতে বিন্দুমাত্র প্রকৃতি বা প্রকৃতিগত গুণ নেই। ভগবানও সেইজন্য বলেছেন যে গুণগুলি প্রকৃতিজাত। অর্থাৎ গুণগুলিকে ভগবান হতে উদ্ভূত বলা হোক অথবা প্রকৃতি হতে উদ্ভূত বলা হোক, আমার সঙ্গে গুণের কোন সম্বন্ধ নেই।

(৭২) গীতায় সাধ্য এবং সাধনের সুলভতা

সাধ্যসাধনয়োঃ প্রোক্তং সৌলভ্যং হরিণা স্বয়ম্।
মোহিতং হি বিনা তস্মাদনুৎসাহী ভবেত্তু কঃ॥

গীতায় সাধকের দৃষ্টিতে সাধ্যের দুটি বিভাগ মনে করা যেতে পারে—

(১) সগুণ—সগুণ উপাসনায় অনন্যভাবই প্রধান হয়। অনন্যভাবসম্পন্ন ভক্তদের কাছে ভগবান সহজেই ধরা দেন। এই অনন্যভাব কি ? অন্যের না হওয়া। অন্য কি ? ভগবান ব্যতীত ধন, সম্পত্তি, বৈভব, ঘটনা, পরিস্থিতি, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদি যা কিছু, তা সমস্তই 'অন্য'। সেই সব থেকে বিমুখ হয়ে অর্থাৎ এদের আশ্রয়, গুরুত্ব, আসক্তি, প্রিয়তা ত্যাগ করে কেবল ভগবানের শরণাগত এবং তাঁর প্রতিই গুরুত্ব ও প্রিয়তা বোধের নাম 'অনন্যভাব'। 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার, আমি জগৎ-সংসারের নই এবং জগৎ-সংসার আমার নয়'—এইরূপ নিজের বলে যা কিছু বস্তু, শরীরাদি সহ নিজেকেও ভগবানে অর্পণ করার নাম হলো 'অনন্যভাব'। অনন্যভাবের দ্বারা ভগবান সুলভ হন (৮।১৪), তিনি ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন (৯।২২), ভক্তকে অচিরাৎ মৃত্যু-সংসারসাগর থেকে উদ্ধার করেন (১২।৭)। এইরূপ অনন্যভাব দ্বারাই ভক্ত ভগবানের দর্শন লাভ করে, স্বরূপতঃ জানতে পারে এবং একাত্ম হতে পারে (১১।৫৪)। এইজন্যই ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি মন ও বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট কর, তাহলে তুমি আমাতেই স্থিতি লাভ করবে' (১২।৮)। তুমি আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ কর, তবে তুমি নিশ্চিতরূপে নিঃসন্দেহে আমায় লাভ করবে (৮।৭)।

(২) **নির্গুণ**—নির্গুণের উপাসনায় বিবেক-বিচার মুখ্য হয়। এই সাধন পথে বিবেকসহায়ে জড়ত্ব ত্যাগ করা হয়। নির্গুণ উপাসকেরও সহজেই পরমাত্মপ্রাপ্তি ঘটে। (৪।৩৯, ৬।২৮ ইত্যাদি)।

সাধনেরও তিনটি বিভাগ করা হয়—

(১) **কর্মযোগ**—কর্তব্যরূপে যে পরিস্থিতি সামনে আসবে, তৎপরতার সঙ্গে সেই কর্তব্য পালন করা এবং সেই কর্মের ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করা এমন কি কঠিন কাজ ? তারই নাম কর্তব্য যা করা উচিত এবং যা সহজভাবে করতে পারা যায়। এইরূপে প্রাপ্ত কর্তব্য-পালনের কথা ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন।

(২) **জ্ঞানযোগ**—এই দেহে প্রতিক্ষণ পরিবর্তন হচ্ছে, এটি মৃত্যুর পথে অগ্রসর হচ্ছে, কেননা এ হচ্ছে অসৎ। কিন্তু অসৎকে যিনি জানেন অর্থাৎ শরীর-জগৎ-সংসার ইত্যাদির পরিবর্তন, উৎপন্ন এবং বিনাশকে যিনি জানেন, তিনিই সৎ—এটা জানা কি এমন শক্ত ? এই কথা প্রায় সমস্ত আস্তিক ব্যক্তিই জানেন যে, শরীর তো বিনাশশীল, কিন্তু যিনি এই শরীরের মধ্যে আছেন, তিনি চিরস্থায়ী। এই কথা ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো থেকে ত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বলেছেন।

(৩) **ভক্তিযোগ**—যার কাছে ভগবানকে অর্পণ করার মতো ভালো ভালো জিনিস নেই, সে কেবল পত্র, পুষ্প, জল ইত্যাদিই যদি প্রেমপূর্বক ভগবানকে সমর্পণ করে, তাহলে ভগবান 'এটি পাতা বা ফুল, এগুলি আমি কিভাবে খাব ?' এরূপ কোনপ্রকার বিচার না করে সেগুলিকে গ্রহণ করেন (৯।২৬)। আবার কারো কাছে যদি পত্র-পুষ্প-ফল ইত্যাদিও না থাকে, তবে সে যা কিছু ক্রিয়া করে অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, যজ্ঞ-তপ ইত্যাদি করে, তা সব যেন ভগবানে সমর্পণ করে (৯।২৭)। এরূপ করলে সে সমস্ত শুভ-অশুভ কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হয় (৯।২৮)। এর চেয়ে সহজ সাধন আর কি হতে পারে ?

(৭৩) গীতায় সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন

বরং কর্মত্যাগাজ্জগতি সততং কর্মকরণং
স্বধর্মো হি শ্রেয়ান্ সগুণপরধর্মাচ্চ বিগুণঃ।
বরং ক্ষেত্রজ্ঞানং দ্রবিণময়যজ্ঞাদ্ধি শতশ-
স্তপস্বিজ্ঞানিভ্যঃ সমনিরতযোগী বরতমঃ॥
জ্ঞানধ্যানাদিতঃ কর্মফলত্যাগো বিশিষ্যতে। সর্বেভ্যঃ সাধনেভ্যশ্চ প্রভুভক্তির্গরীয়সী॥

গীতায় পরমাত্মপ্রাপ্তির অনেক প্রকার সাধন প্রণালীর কথা বলা হয়েছে এবং সেগুলি যে শ্রেষ্ঠ তাও বলা হয়েছে। যে সাধন প্রণালীতে সাধকের প্রিয়-ভাব, বিশ্বাস ও যোগ্যতা থাকে, সেই সাধন প্রণালীই সেই সাধকের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। কারণ, সেই সাধনার দ্বারাই তার ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে। গীতায় যে যে স্থানে সাধনপ্রণালীকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, সেই শ্রেষ্ঠত্ব সেখানকার প্রসঙ্গ বা অধিকারকে নিয়েই বলা হয়েছে। বহুপ্রকার শ্রেষ্ঠ সাধনা থাকা সত্ত্বেও ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনারূপে ভক্তিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

গীতা অনুসারে কর্ম না করার চেয়ে নিজের কর্তব্য পালন করা শ্রেষ্ঠ (৩।৮)। কারণ মানুষের যতক্ষণ প্রকৃতির (শরীরের) সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ সে কর্ম না করে থাকতে পারে না। সে কায়-মন-বাক্যে কিছু না কিছু করতেই থাকে। সে যদি কর্তব্য-কর্মের পালন না করে তবে অকর্তব্য করবে, বিপরীত কর্ম করবে, যার ফলে বন্ধন প্রাপ্ত হবে। অতএব কর্ম না করা অপেক্ষা নিজ কর্তব্য কর্মের পালন করাই শ্রেষ্ঠ।

শাস্ত্র বর্ণাশ্রম অনুসারে যে মানুষের জন্য যে কর্মের বিধান দিয়েছেন সেই ব্যক্তির পক্ষে সেটিই স্বধর্ম এবং যে মানুষের জন্য যে কর্মে নিষেধ আছে, তার পক্ষে সেটি

পরধর্ম। অধিক গুণসম্পন্ন পরধর্ম অপেক্ষা অল্প গুণসম্পন্ন নিজ ধর্ম (স্বধর্ম) শ্রেয়। নিজ ধর্ম-পালনে মানুষের পাপ হয় না এবং ধর্ম পালনকালে যদি মৃত্যু হয়, তবুও তাতে তার কল্যাণ হয় (১৮।৪৭ ; ৩।৩৫)।

দ্রব্যময় অর্থাৎ বস্তুর বাহুল্যযুক্ত যজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ (৪।৩৩) ; কারণ, দ্রব্যযজ্ঞে পদার্থ, ব্যক্তি, স্থান, কাল, পরিস্থিতি, অবস্থা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা থাকে এবং সে সবের দ্বারাই দ্রব্যযজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। অতএব দ্রব্যযজ্ঞে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞে পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদির কোন আবশ্যকতা হয় না, সেইজন্য জ্ঞানযজ্ঞে পরের উপর নির্ভরতা নেই। তাই জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।

তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্মীর চেয়ে সমভাবসম্পন্ন মানুষ শ্রেষ্ঠ (৬।৪৬)। কারণ তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্মীর মধ্যে সকামভাব থাকে। তপস্বী তপস্যা করে অণিমাদি সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করে, জ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে মান-মর্যাদা, আরাম-আয়েস আকাঙ্ক্ষা করে এবং কর্মী কর্ম দ্বারা ধন, সঞ্চয়, ভোগ, স্বর্গ ইত্যাদি কামনা করে। কিন্তু সমভাবসম্পন্ন ব্যক্তি কোন কিছু কামনা করেন না, সুতরাং তিনি এই তিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

অভ্যাসের থেকে জ্ঞান, জ্ঞানের চেয়ে ধ্যান এবং ধ্যানের থেকে সর্ব কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ (১২।১২)। কেননা অভ্যাস, জ্ঞান এবং ধ্যানে সমতা নেই। সমতা ছাড়া এই তিনটি অসম্পূর্ণ হয়। সর্বকর্মফল ত্যাগ করলে সমতা লাভ হয়, সুতরাং এটি শ্রেষ্ঠ।

সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ (৩।৭)। (৫।২) ; কারণ, সাংখ্যযোগে নতুন করে বিচার করতে হয় এবং প্রবল বৈরাগ্য হলে, কোথাও আসক্তি না থাকলে তবেই কল্যাণ হয়। বৈরাগ্য বিনা যে জ্ঞান (বিবেক-বিচার) হয়, তা কেবল তোতাপাখীর মত শেখানো বুলির ন্যায়ই হয়ে থাকে। কিন্তু কর্মযোগের সাধনায় মানুষ যে কর্ম করে আসছে তা কেবল সংশোধন করে নিতে হয় অর্থাৎ মানুষের কর্ম করার স্বভাব তো থাকেই, তাকে শুধু কামনা ও আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। যেমন—পত্নী পতির, পুত্র পিতা-মাতার, শিষ্য গুরুর, পরিচারক মালিকের এবং নীচ বর্ণের ব্যক্তি উচ্চবর্ণ মানুষদের সেবা করে থাকে। এই সেবাকার্য করার সময় নিজ সুখ-আরাম, স্বার্থভাব, কামনা-আসক্তি ত্যাগ করতে হয়। এই ত্যাগ খুবই সহজ। সুতরাং কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ।

উপরিউক্ত সাধনাগুলি তথা গীতায় উল্লিখিত ধ্যানযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ ইত্যাদি সমস্ত সাধনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো ভক্তিযোগ (৬।৪৭)। কারণ অন্যান্য সাধনায় সাধকের নিজের সাধন-শক্তির আশ্রয় থাকে, তাই তাতে পতন হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ভক্তিযোগী সাধকদের শুধু ভগবানের আশ্রয়ই থাকে, তারা ভগবদ্‌নিষ্ঠ হয় ; সেইজন্য তাদের পতন হওয়ার সম্ভাবনা থাকেই না। ভক্তদের স্বয়ং ভগবান উদ্ধার করেন (১২।৭)। তাদের অজ্ঞান অন্ধকার স্বয়ং ভগবান বিনাশ করেন (১০।১১)। তাদের যোগক্ষেমও স্বয়ং ভগবানই বহন করেন (৯।২২)। এইরূপ ভক্তদের কাছে ভগবান সহজলভ্য (৮।১৪)। ভক্ত তার অনন্য ভক্তি দ্বারা ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতে পারে, তত্ত্ব দ্বারা তাঁকে জানতে পারে এবং ভগবানে প্রবেশ করতে পারে (১১।৫৪)। অর্থাৎ অন্য সাধকদের কিছু অপূর্ণতা থাকতে পারে এবং মৃত্যুকালে অন্য চিন্তা, মূর্চ্ছা ইত্যাদি কোন কারণে তারা সাধনায় বিচলিত হয়ে যোগভ্রষ্টও হতে পারে এবং তাতে তাদের পুনর্জন্ম হতে পারে। কিন্তু ভক্তের কিছু অপূর্ণতা থাকলে তা দূর করবার দায়িত্ব ভগবানের, ভগবান সেই অপূর্ণতা দূর করে দেন। মৃত্যুকালে ভক্তের কোন কারণবশতঃ ভগবৎ স্মৃতি হারিয়ে গেলে স্বয়ং ভগবানই তাকে স্মরণ করেন। সুতরাং ভক্ত যোগভ্রষ্ট হয় না এবং তার পুনর্জন্ম হয় না। সেইজন্যই ভগবান ভক্তিযোগকে সমস্ত সাধন প্রণালীর মধ্যে এবং ভক্তিযোগীকে সমস্ত সাধকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন (৬।৪৭ ; ১২।২)।

(৭৪) গীতায় প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিগত সাধনা

ন প্রবৃত্তির্নিবৃত্তিশ্চ বাধিকা সাধিকা মতা।
দ্বয়োর্মধ্যে তু জীবানাং রাগো বৈ বাধকো মতঃ॥

লৌকিক দৃষ্টিতে কোন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হওয়াকে 'প্রবৃত্তি' এবং ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হওয়াকে 'নিবৃত্তি' বলা হয়। এইভাবেই লৌকিক দৃষ্টিতে গৃহস্থাশ্রমকে প্রবৃত্তিগত এবং সন্ন্যাসাশ্রমকে নিবৃত্তিগত স্থান বলা হয়। কিন্তু গীতার দৃষ্টিতে যদি অন্তরে বিষয়ের প্রতি আসক্তি, অনুরাগ ও কামনা থাকে, তাহলে বাইরের নিবৃত্তিও প্রবৃত্তিরূপে চিহ্নিত হয় এবং অন্তরে রাগ, কামনা, আসক্তি যদি না থাকে, তবে বাইরের প্রবৃত্তিও নিবৃত্তিরূপে চিহ্নিত হয়। যে ব্যক্তি বাইরের ক্রিয়াকর্মে নিবৃত্ত হয়েছে, কিন্তু অন্তরে অনুরাগপূর্বক বিষয় চিন্তা করে, তার সেই নিবৃত্তিকে গীতায় মিথ্যাচার বলা হয়েছে (৩।৬)।

গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনটি সাধনপথের অনুসরণ প্রবৃত্তি সহকারে গৃহস্থাশ্রমে থেকে সমস্ত কর্ম করেও করা যায় এবং নিবৃত্তি সহকারে সাংসারিক কাজকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়েও করা যায়। যেমন—

কর্মযোগ

(১) প্রবৃত্তিগত কর্মযোগ—যাতে কর্মফলের ইচ্ছা, কামনা, আসক্তি থাকে না এবং যাকে নিজ কর্তব্য তৎপরতার সঙ্গে পালন করা হয়, তাকেই প্রবৃত্তিগত কর্মযোগ বলা হয়। এর তাৎপর্য এই যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম পালন করে, সাংসারিক কর্মে প্রবৃত্ত হয়েও নির্লিপ্ত থাকা হলো প্রবৃত্তিগত কর্মযোগ। যেমন, 'কর্ম করায় তোমার অধিকার, ফলে নয়' (২।৪৭) ; 'যোগে অর্থাৎ সমতায় স্থিত হয়ে তুমি কর্ম কর' (২।৪৮) ; 'কর্ম আরম্ভ না করলে নিষ্কর্মতা লাভ হয় না এবং কর্ম ত্যাগ করলেও হয় না' (৩।৪) ; 'তোমার শাস্ত্র-বিহিত কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয় ; কর্ম না করা থেকে কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ' (৩।৮) ; ব্রহ্মাও সৃষ্টি-রচনা কালে প্রজাদের কর্তব্য পালন করার আদেশ দিয়েছেন (৩।১০-১২) ; ভগবানও লোক-সংগ্রহের জন্য কর্ম করেন (৩।২২-২৪) ইত্যাদি।

(২) নিবৃত্তিগত কর্মযোগ—যাতে কর্মে বিরতি থাকে এবং পদার্থের ত্যাগ হয়, তাকে নিবৃত্তিগত কর্মযোগ বলে। কর্ম থেকে বিরত হওয়া এবং পদার্থ ত্যাগ—এতেও জগতের কল্যাণের মনোভাবই থাকে অর্থাৎ নিবৃত্তিরূপ কর্মও সংসারের হিতের জন্যই করা হয়, এতে নিজের কোনো স্বার্থ থাকে না। যেমন, শরীর এবং অন্তঃকরণ বশকারী, সকল প্রকার সংগ্রহ পরিত্যাগকারী এবং সাংসারিক আশারহিত কর্মযোগী শুধু শরীর-সম্পর্কীয় কর্ম করলেও তার দ্বারা আবদ্ধ হয় না (৪।২১)।

জ্ঞানযোগ

(১) প্রবৃত্তিগত জ্ঞানযোগ—গুণই গুণের মধ্যে প্রবর্তিত হচ্ছে ; গুণ ব্যতীত আর কেউ কর্তা নেই ; সমস্ত ক্রিয়াই গুণগুলিতে, ইন্দ্রিয় দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে—এরূপ বুঝে কর্তৃত্বাভিমান না রেখে ক্রিয়া করলে তা প্রবৃত্তিগত জ্ঞানযোগ হয়। যেমন গুণ বিভাগ ও কর্মবিভাগ সম্পর্কে অবহিত জ্ঞানযোগী 'সমস্ত ক্রিয়াগুলি গুণ দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে'—এরূপ মেনে নিয়ে কর্ম করলেও তাতে আসক্ত হয় না (৩।২৮)। যে (প্রকৃতিস্থ) পুরুষ এবং গুণসহ প্রকৃতিকে সম্যক্‌ভাবে জানে, সে সর্বপ্রকারের আচার-ব্যবহার করেও বন্ধনে আবদ্ধ হয় না (১৩।২৩)। যার মধ্যে অহংকর্তৃত্ব ভাব ও ফলের কামনা নেই, সে সকল প্রাণী হত করলেও অর্থাৎ ঘোরতম কর্ম করলেও তার দ্বারা আবদ্ধ হয় না (১৮।১৭) ইত্যাদি।

(২) নিবৃত্তিগত জ্ঞানযোগ—সাংসারিক প্রবৃত্তি থেকে, কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে নির্জনে শুধু নিজ স্বরূপের, পরমাত্মার ধ্যানে রত থাকাকে নিবৃত্তিগত জ্ঞানযোগ বলা হয়। যেমন সাত্ত্বিকী বুদ্ধিসম্পন্ন, বৈরাগ্য আশ্রিত, নির্জনে থাকার স্বভাববিশিষ্ট এবং পরিমিত ভোজনকারী

জ্ঞানযোগী (সাধক) ধৈর্যসহ আত্মসংযমপূর্বক শরীর, মন ও বাক্য সংযত করে শব্দাদি বিষয়সমূহ ত্যাগ করে, রাগ-দ্বেষ বর্জিত হয়ে সর্বদা পরমাত্মার ধ্যানে নিরত থাকে। এরূপ সাধক অহঙ্কার, জেদ, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং ভোগ্য-সংগ্রহ পরিত্যাগ করে মমত্বশূন্য এবং শান্তচিত্ত হয়ে ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হয় (১৮।৫১-৫৩)।

ভক্তিযোগ

(১) প্রবৃত্তিগত ভক্তিযোগ—সাংসারিক কাজকর্মও যখন ভগবানের প্রসন্নতা লাভের জন্য করা হয়, ভগবানের শরণাগত হয়ে, ভগবৎপূজার দৃষ্টিতে করা হয় তখন তাকে প্রবৃত্তিগত ভক্তিযোগ বলা হয়। যেমন, 'তুমি যা কিছু কর্ম কর, তৎ সমুদায় আমাকেই অর্পণ কর' (৯।২৭) ; 'আমার নিমিত্ত কর্ম করলে তুমি সিদ্ধি প্রাপ্ত হবে' (১২।১০) ; 'মানুষ নিজ নিজ কর্ম দ্বারা সেই পরমাত্মার পূজা করে সিদ্ধিলাভ করে' (১৮।৪৬) ; 'আমার ভক্ত আমার আশ্রিত হয়ে সর্বকর্ম করতে থাকলেও আমার কৃপায় অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়' (১৮।৫৬) ইত্যাদি।

(২) নিবৃত্তিগত ভক্তিযোগ—সাংসারিক কর্ম হতে বিরত হয়ে কেবল ভগবৎসম্বন্ধীয় জপ-ধ্যান, কথা-কীর্তন ইত্যাদি কর্মে লগ্ন হয়ে থাকাকে বলা হয় নিবৃত্তিগত ভক্তিযোগ। যেমন, 'যারা নিরন্তর আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট রাখে, সেইরূপ দৃঢ়ব্রতী ভক্তগণ ভক্তিপূর্বক সর্বদা আমার নাম কীর্তন করে, আমাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে সাধনা করে, আমায় প্রণামপূর্বক আমার উপাসনা করে' (৯।১৪) ; 'তুমি আমার ভক্ত হও, আমাতে মন নিবিষ্ট কর, আমার পূজা কর এবং আমাকেই নমস্কার কর'(৯।৩৪) ; 'আমাতে অর্পিত চিত্ত, আমাতে অর্পিত প্রাণ ভক্ত নিজেদের মধ্যে আমার গুণ ও প্রভাবের কীর্তনকারী হয় ও আমার কথায় নিত্য সন্তুষ্ট থাকে' (১০।৯) ইত্যাদি।

এর তাৎপর্য এই যে, সাধন-ভজনের দুটি পথ আছে, একটি দ্বারা আচার-ব্যবহার ঠিকমতো রেখে পরমাত্মার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া আর অপরটি সাংসারিক আচার-ব্যবহার ত্যাগ করে পরমাত্মার লক্ষ্যে চলা। আচার-ব্যবহার পালন করে সাধনভজন করাকে প্রবৃত্তিগত সাধনা বলা হয় এবং ব্যবহারাদি ত্যাগ করে সাধনা করাকে নিবৃত্তিগত সাধনা বলা হয়। যেমন মনু, জনক ইত্যাদি রাজা প্রবৃত্তিমার্গের অনুগামী ছিলেন এবং সনকাদি, শুকদেব প্রভৃতিগণ ছিলেন নিবৃত্তিমার্গের অনুগামী। প্রকৃতপক্ষে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ —এই তিনটি সাধন-পথেই নিবৃত্তি অর্থাৎ প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তি এবং নিবৃত্তিতেও নিবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। কারণ এই তিন সাধনাতেই সংসারের সম্বন্ধ (আসক্তি) ত্যাগ হয় এবং পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(৭৫) গীতায় সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ

সমতাদিষু চিহ্নেষু সিদ্ধানাং তু সমানতা।
তদীয়ব্যবহারে তু ক্রিয়াভাববিভিন্নতা॥

কামনা (ফলেচ্ছা)-র ত্যাগের দ্বারা 'কর্মযোগে'র সাধনা আরম্ভ হয় (২।৪৮) এবং সর্বতোভাবে কামনাশূন্য হলে কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ হয় (২।৫৫)। সুতরাং কর্মযোগে কামনার ত্যাগই মুখ্য কথা।

সৎ-অসৎ, প্রকৃতি-পুরুষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যাদির ভেদ-বিচারের দ্বারা 'জ্ঞানযোগে'র সাধনা আরম্ভ হয় (১৩।১৯) এবং সর্বতোভাবে অসতের সঙ্গে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হলে এতে সিদ্ধিলাভ হয়। অতএব জ্ঞানযোগে সৎ

ও অসতের (বিচারবোধ) বিবেকই মুখ্যরূপে কাজ করে।

'ভক্তিযোগ' ভগবৎপরায়ণতায় আরম্ভ হয় (১২।৬) এবং ভগবৎপরায়ণতাতেই সম্পূর্ণ হয় (১২।১৪)। সুতরাং ভক্তিযোগে ভগবৎপরায়ণতাই মুখ্য সাধনা।

উপরিউক্ত তিনটি যোগের সাধনার প্রারম্ভকালের যে স্থিতি, সেই স্থিতির পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে সেই মার্গের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। সেইজন্য গীতায় যেখানে কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের বর্ণনা আছে (২।৫৫-৭২), সেখানে কর্মযোগী সাধকদের বর্ণনাও করা হয়েছে (২।৫৯, ৬৪-৬৫ ইত্যাদি)। যেখানে জ্ঞানযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের বর্ণনা আছে (১৪।২২-২৫), সেখানে তার পূর্বে জ্ঞানযোগী সাধকদের বর্ণনা রয়েছে (১৪।১৯-২০)। এইরূপেই যেখানে ভক্তিযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের বর্ণনা আছে (১২।১৩-১৯), সেখানে প্রথমে ভক্তিযোগী সাধকদের বর্ণনা করা হয়েছে (১২।৬-১০)।

সাধনকালে কর্মযোগীর কর্মে অধিক প্রবৃত্তি থাকে ; সেইজন্য সিদ্ধাবস্থায়ও তার কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে। অতএব কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের লক্ষণে কর্মে উপরতির বর্ণনা নেই (৬।৭-৯)। জ্ঞানযোগী অসৎ পরিত্যাগ করে নিজ স্বরূপে স্থিতিলাভ করে, কাজেই সংসারের প্রতি তার স্বতঃই বিরাগ থাকে (১৪।২৩)। ভক্তিযোগীর ভগবানে মতি থাকায় সেও সংসারের প্রতি আসক্ত থাকে না (১২।১৬)।

তিন যোগেই সিদ্ধ মহাপুরুষগণ অহংভাব ও মমত্ব বর্জিত হয় (কর্মযোগী ২।৭১), (জ্ঞানযোগী ১৮।৫৩), (ভক্তিযোগী ১২।১৩)। তিন সিদ্ধযোগীই রাগ-দ্বেষ বর্জিত হয় (কর্মযোগী ২।৫৭ ; জ্ঞানযোগী ১৪।২২ ; ভক্তিযোগী ১২।১৭)। তিন যোগীর মধ্যেই সমত্ব-ভাব বিরাজ করে (কর্মযোগী ৬।৭-৯ ; জ্ঞানযোগী ১৪।২৪-২৫ ; ভক্তিযোগী ১২।১৮)।

ভক্তিযোগে 'সবকিছুই বাসুদেব' (৭।১৯)—এই অনুভূতি জাগ্রত হওয়ায় প্রাণিমাত্রের প্রতি মিত্রতা ও করুণার ভাব বিশেষভাবে প্রকটিত হয় (১২।১৩), কিন্তু কর্মযোগে ও জ্ঞানযোগে এরূপ হয় না।

সাধক যে কোন পথেই সাধনা করুন না কেন পূর্ণতা লাভ করলে তারা একই তত্ত্ব লাভ করে। তবুও কর্মযোগীর পক্ষে জ্ঞানযোগের কথা বিশেষভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয় এবং ভক্তিযোগের কথা সাধারণভাবে বোধগম্য হয়। জ্ঞানযোগীর কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান থাকে না কিন্তু ভক্তিযোগী কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত থাকে।

কর্মযোগে কামনা ত্যাগের কিছু ন্যূনতা থাকলে এবং জ্ঞানযোগে নিজের মধ্যে কোন বিশেষত্ব অনুভব করলে তাদের মধ্যে অহং-অভিমান থাকতে পারে। কারণ, কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগীর যে নিষ্ঠা, তা হল তাদের নিজেদের। সুতরাং অহং-অভিমান দূর করার দায়িত্ব তাদের উপরেই থাকে। কিন্তু ভক্তিযোগীর অহং-অভিমান থাকতে পারে না। কারণ, সে প্রথম থেকেই ভগবন্নিষ্ঠ হয়। তবে ভগবৎপরায়ণতায় ন্যূনতা থাকলে ভক্তিযোগীর মধ্যেও অহং-অভিমান থাকতে পারে, কিন্তু তা দূর করার দায়িত্ব স্বয়ং ভগবানের, ভক্তের নয়, কেননা ভক্তিযোগী ভগবন্নিষ্ঠ হয়।

এর তাৎপর্য এই যে, তিনটি যোগমার্গেই নিজস্ব কিছু বিশেষত্ব থাকায় তিনটি সাধন-পথই হলো পৃথক্। তবুও তত্ত্বলাভ, সমত্ব, নির্বিকার-ভাব—প্রভৃতিতে তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না ; তবে তাদের লৌকিক ব্যবহারে ভিন্নতা থাকে।

(৭৬) গীতায় ভগবান এবং মহাপুরুষের সাধর্ম্য

অন্বভূয়ত যৈস্তত্ত্বং তে মুক্তা এব বন্ধনাৎ।
তস্মাৎ প্রোক্তং তু সাধর্ম্যং নিজস্য চ মহাত্মনাম্॥

গীতায় ভগবান এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের লক্ষণগুলির মধ্যে যে সাধর্ম্য আছে তার বর্ণনা করা হয়েছে ; যেমন—

(১) ভগবান বলেছেন যে, 'ত্রিলোকে আমার করণীয় কিছুই নেই'—'**ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন**' (৩।২২)। সেইরূপ মহাপুরুষদের জন্যও কোন কর্তব্য থাকে না—'**তস্য কার্যং ন বিদ্যতে**' (৩।১৭)।

(২) ভগবান বলেছেন, 'পাওয়ার মত কোন বস্তুই আমার অপ্রাপ্ত নেই'—'**নানবাপ্তমবাপ্তব্যম্**' (৩।২২)। সেইরূপ মহাপুরুষদেরও কোন প্রাণীর সঙ্গে কিছুমাত্র স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না অর্থাৎ কারো কাছে কিছু পাওয়ার কামনা থাকে না।—'**ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ**' (৩।১৮)।

(৩) কোনরূপ কর্তব্য এবং প্রাপ্তব্য না থাকলেও ভগবান লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন। ভগবান বলেছেন যে, 'আমি যদি সাবধান হয়ে কর্ম না করি, তাহলে এই লোক সব উচ্ছন্নে যাবে এবং আমি বর্ণসংকরাদি উৎপন্নকারী তথা প্রজাবিনাশের কারণ হব' (৩।২৩-২৪)। এইভাবে মহাপুরুষদেরও নিজ কর্তব্য বা কিছু পাওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও ভগবান তাঁদের তৎপরতাপূর্বক লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করার আদেশ দিয়েছেন—'**কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্**' (৩।২৫)। সুতরাং তাঁরাও আসক্তিবর্জিত হয়ে লোকহিতার্থে কর্ম করেন।

(৪) ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত কিছু করতে থাকলেও আমাকে অকর্তা বলে জানবে অর্থাৎ আমি কর্তৃত্বাভিমানরহিত—'**তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্**' (৪।১৩) এইপ্রকার মহাপুরুষদের সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যে তাঁরা নানাভাবে কর্ম করলেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না অর্থাৎ তাঁরা কর্তৃত্বাভিমানরহিত হন—'**কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ**' (৪।২০)।

(৫) ভগবান বলেছেন যে, 'আমি সমস্ত কর্ম করলেও কর্ম আমায় লিপ্ত করে না'—'**ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি**' (৪।১৪) এবং কর্মের ফলের প্রতিও আমার স্পৃহা নেই—'**ন মে কর্মফলে স্পৃহা**' (৪।১৪)। এইরূপ মহাপুরুষকেও কর্ম লিপ্ত করে না—'**ন নিবধ্যতে**' (১৮।১৭) এবং কর্মফলেও তাঁদের স্পৃহা থাকে না—'**বিগতস্পৃহঃ**' (২।৫৬) ; '**পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ**' (২।৭১)।

(৬) ভগবান স্বভাবতই সর্বলোকের সুহৃদ—'**সুহৃদং সর্বভূতানাম্**' (৫।২৯)। এইরূপে মহাপুরুষগণও স্বভাবতই প্রাণিমাত্রেরই হিতে প্রীতি রাখেন—'**সর্বভূতহিতে রতাঃ**' (৫।২৫ ; ১২।৪)।

(৭) ভগবান নিজেকে ত্রিগুণের অতীত বলে বর্ণনা করেছেন—'**মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্**' (৭।১৩)। মহাপুরুষগণকেও এইপ্রকার ত্রিগুণের অতীত বলা হয়েছে—'**গুণাতীতঃ স উচ্যতে**' (১৪।২৫)।

(৮) ভগবান কর্মে অনাসক্ত এবং উদাসীনবৎ অবস্থিত থাকেন, সেইজন্য কর্ম তাঁকে আবদ্ধ করতে পারে না—'**উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু**' (৯।৯)। এইরূপ মহাপুরুষগণও কর্মে আসক্ত হন না, ফলে তাঁরাও কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না—'**উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে**' (১৪।২৩)।

(৯) ভগবান বলেছেন 'সৎ এবং অসৎ সবই আমি'—'**সদসচ্চাহম্**' (৯।১৯), এবং মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে সবকিছুই বাসুদেব—'**বাসুদেবঃ সর্বম্**' (৭।১৯)।

(১০) ভগবান বলেছেন, 'আমিই বেদের একমাত্র জ্ঞাতা' '**বেদবিদেব চাহম্**' (১৫।১৫)। মহাপুরুষদেরও এইপ্রকার বেদবিদ্ বলা হয়—'**স বেদবিৎ**' (১৫।১)।

—ভগবান এবং মহাপুরুষগণের এরূপ সাধর্ম্য থাকলেও মহাপুরুষগণ ভগবানের ন্যায় ঐশ্বর্যসম্পন্ন হতে পারেন না। পূর্ণ ঐশ্বর্য একমাত্র ভগবানেই সম্ভব—'**ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য**' (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৪)। জগৎ চরাচরের উৎপত্তি, পালন ও সংহার একমাত্র ভগবানের দ্বারাই সম্ভব, মহাপুরুষের দ্বারা নয়—'**জগদ্ব্যাপারবর্জম্**' (ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৭)।

ভগবান এবং মহাপুরুষদের লক্ষণের সাধর্ম্য বলার উদ্দেশ্য এই যে, অনাদিকাল হতে স্বর্গ-নরক এবং চুরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণকারী সাধারণ প্রাণী যদি মানব-জন্মের সদুপযোগ করে, তাহলে পরমাত্মার যে লক্ষণসমূহ আছে সেই লক্ষণগুলি জীবন্মুক্ত হলে তার মধ্যেও বর্তায়। যে উৎকর্ষতা ব্রহ্মলোকে গেলেও হয় না, তা জীব মনুষ্যশরীরে থেকেই লাভ করতে পারে।

(৭৭) গীতার তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণগীতগীতায়াস্তাৎপর্যং দৃশ্যতে বুধৈঃ।
বিবেকভাবয়োর্মধ্যে তাবপি দ্বিবিধৌ স্মৃতৌ॥

গীতার তাৎপর্য সমগ্র জীবের কল্যাণ করা, এইজন্য গীতায় বিবেক এবং ভাবমুখী সাধন-পথের বর্ণনা করা হয়েছে।

গীতায় উল্লিখিত বিবেকবোধ দু প্রকারের—

(১) সৎ এবং অসৎ-এর বিবেক—যা স্থিতিশীল, অপরিবর্তনীয়, যার বিনাশ নেই, সেই শরীরী এবং পরমাত্মাকে 'সৎ' বলা হয়। যা সর্বদা থাকে না, পরিবর্তনশীল এবং বিনাশশীল সেই শরীর এবং জগৎ চরাচরকে 'অসৎ' বলা হয়। (২।১১-৩০, ১৩।১৯-২৩, ২৯-৩৪ ; ১৪।৫-২০) ইত্যাদি।

(২) কর্তব্য এবং অকর্তব্যের বিবেক—কর্তব্য কী এবং অকর্তব্য কী, প্রবৃত্তি কাকে বলে এবং নিবৃত্তি কাকে বলে, ধর্ম কী এবং অধর্মই বা কী ? স্বধর্ম কাকে বলে এবং পরধর্মই বা কাকে বলে—একে কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান (বিবেক) বলা হয় (২।৩১-৫৩ ; ৩।৮-১৬ ; ৩৫; ৪।১৫ ; ১৮।৪১-৪৮ ইত্যাদি)।

ভাবও দু' প্রকারের বলা হয়েছে—

(১) নিষ্কামভাব (ত্যাগভাব)—এইভাবে কর্ম এবং কর্মফলের আসক্তি, কামনাবর্জিত হয়। গীতায় **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা'** (২।৪৮) ; **'প্রজহাতি যদা কামান্'** (২।৫৫) ; **'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্'** (২।৭১) ; **'ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গম্'** (৪।২০) **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা'** (৫।১১) ; **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি'** (১৮।৬) ; **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব'** (১৮।৯) ; **'যস্তু কর্মফলত্যাগী'** (১৮।১১) ইত্যাদি পদগুলিতে নিষ্কামভাবের বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) অনন্যভাব (প্রেমভাব)—সংসার হলো পর। সেই সংসারের আশ্রয়, গুরুত্ব ত্যাগ করে এ থেকে বিমুখ হওয়াকেই অনন্যভাব বলা হয়। গীতায় **'অনন্যচেতাঃ সততম্'** (৮।১৪) ; **'ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া'** (৮।২২), **'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্'** (৯।২২) ; **'অনন্যেনৈব যোগেন'** (১২।৬) ইত্যাদি পদসমূহে অনন্যভাবের বর্ণনা করা আছে।

বিবেক এবং ভাব—সমস্ত সাধনাতেই এই দুটির প্রাধান্য থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ এই দুটি না হলে মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয় এবং জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হয়। তাৎপর্য এই যে, বিবেককে যদি গুরুত্ব না দেওয়া হয়, তবে মানুষের মধ্যে জড়ত্ব (মূঢ়তা) আসে এবং সে অকর্তব্য-কর্মে ব্যাপৃত হয় এবং 'ভাব' (নিষ্কামভাব বা অনন্যভাব) না হলে মানুষের সংসারের প্রতি আসক্তি ও কামনা জন্মে এবং সে ভগবান থেকে বিমুখ হয়ে যায়।

বিবেক-বোধেও নিষ্কামভাব থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন (৫।২৩, ২৬)। কারণ, নিষ্কামভাব না থাকলে মানুষ কামনায় বশীভূত হয়, ফলে সংসারের আসক্তি দূর হয় না। তেমনি বিবেক-বোধে অনন্যভাব অর্থাৎ প্রেমভাব থাকা অত্যন্ত আবশ্যক, সেই প্রেম-ভাব স্বরূপের প্রতি হোক (৫।২৪) বা কর্তব্য-কর্মের প্রতি (১৮।৪৫) হোক।

নিষ্কামভাবেও (বিবেকবোধ) জ্ঞান থাকা অত্যন্ত আবশ্যক (৪।১৯ ; ৪১ ; ৬।৮ ইত্যাদি) ; কারণ মানুষের বিবেক-বোধ যদি না থাকে, তবে সে নিষ্কাম হবে কিভাবে ? অনন্যভাবেও বিবেক-বোধ (জ্ঞান) অত্যন্ত প্রয়োজন (৫।২৯ ; ৯।১৩ ; ১০।৭ ইত্যাদি) ; কারণ বিবেক-বোধের (জ্ঞানের) অভাবে অন্য পদার্থের ত্যাগ কিরূপে সম্ভব ?

এইরূপে গীতায় মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিবেক ও ভাবগত সাধনগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে ক্রিয়াগত সাধনার বর্ণনা করা হয়েছে, সেস্থানে ঐগুলিকে তত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিবেক (জ্ঞান) এবং ভাবগত সাধনার উপর। যেখানে ক্রিয়াগত সাধনাগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেখানেও প্রকৃতপক্ষে নিষ্কামভাবেরই প্রাধান্য রয়েছে (২।৪৭ ; ৩।৮, ১৭-১৮ ; ৪।১৫) ইত্যাদি।

(৭৮) গীতায় কথোপকথন

সংজয়স্যাম্বিকেয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্যার্জুনস্য চ।
দ্বিধৈব মুখ্যসংবাদো গীতয়া মন্যতে স্বয়ম্॥

গীতায় কথোপকথন দুই প্রকারের—ধৃতরাষ্ট্র এবং সঞ্জয়ের ও শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের।

গীতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন, তারপরে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের কোন কথা নেই। সঞ্জয় মাঝে মাঝে কয়েকবার কথা বলেছেন।

প্রথম অধ্যায়ে **'হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ'** (১।২১), **'উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি'** (১।২৫) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনের উল্লেখ আছে, কিন্তু এগুলি সঞ্জয়ের বাক্যের অন্তর্গত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক থেকে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের পরস্পর কথাবার্তা আরম্ভ হয়েছে।

উপরিউক্ত দুইপ্রকার কথোপকথন ছাড়াও দুর্যোধন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার কথাও গীতাতে আছে; যেমন—প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত (মোট ন'টি শ্লোকে) দুর্যোধনের কথা আছে; এবং তৃতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকের উত্তরার্ধ থেকে দ্বাদশ শ্লোকের পূর্বার্ধ পর্যন্ত ব্রহ্মার বাণী আছে। তার মধ্যে দুর্যোধনের বাক্য সঞ্জয়ের বাক্যের অন্তর্গত এবং ব্রহ্মার বাণী ভগবানের বাণীর অন্তর্গত। সেইজন্য ঐস্থানে 'দুর্যোধন উবাচ' এবং 'প্রজাপতিরুবাচ' বলা হয় নি।

দ্বিতীয়তঃ সমগ্র মহাভারতই বৈশম্পায়ন এবং জনমেজয় দ্বারা উক্ত। তাদের কথোপকথনে ধৃতরাষ্ট্র এবং সঞ্জয়ের বার্তালাপ আছে[১] যার মধ্যে সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথন সম্বন্ধে বলেছিলেন দুর্যোধন প্রভৃতির নয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে যে উপসংহার দেওয়া হয়েছে, তাতেও **'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে'** পদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং গীতায় দুটিই কথোপকথন আছে।

---

[১]মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়ন ঋষি এবং শ্রোতা রাজা জনমেজয়। মহাভারতে মোট আঠারোটি পর্ব আছে, তার মধ্যে ভীষ্মপর্বের শুরুতে রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করছেন যে কৌরব এবং পাণ্ডবেরা কীভাবে যুদ্ধ করলেন ? উত্তরে বৈশম্পায়ন দুই পক্ষের সেনাদের হর্ষোল্লাসাদির কথা জানালেন। তারপর বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের বিষয়ে অনেক কিছু জানালেন ও সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দিলেন যাতে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধাদির বর্ণনা করতে পারেন। বেদব্যাসের প্রস্থানের পর ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'যে ভূসম্পত্তির জন্য আমার ও পাণ্ডুপুত্রগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়েছে, এখন তার বিস্তারিত বর্ণনা কর।' সঞ্জয় তখন ভারতবর্ষের ভূমি, দ্বীপ, নদী ও পর্বতাদির বর্ণনা করলেন। পরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্বের শুরুতে (যেটি ভীষ্মপর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে) বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে বললেন যে, একদিনের ঘটনা, সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে পিতামহ ভীষ্মের যুদ্ধভূমিতে শরশয্যায় পতনের সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রকে শোনালেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের মধ্যে দুই পক্ষের সেনাদের সম্বন্ধে অনেক কথা হলো। শেষে ভীষ্মপর্বের পঁচিশ সংখ্যক অধ্যায়ের প্রারম্ভে (গীতার যেটি প্রথম অধ্যায়) ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের ক্রমানুসারে বিস্তারিত বর্ণনা শোনার জন্য সঞ্জয়কে প্রশ্ন করলেন।

(৭৯) গীতায় অর্জুনের স্তুতি, প্রার্থনা এবং প্রশ্ন

যত্র যত্র চ গীতায়াং প্রোক্তং কৃষ্ণসখেন বৈ।
প্রার্থনা কুত্রচিত্তত্র ক্বচিৎ প্রশ্নঃ ক্বচিৎ স্তুতিঃ॥

স্তুতি দ্বারা ভগবানের মহিমা, গুণ, প্রভাব ইত্যাদি কীর্তন (গান) করা হয়। প্রার্থনাতে ভগবানের গুণ ইত্যাদি তত্ত্বতঃ জানবার অথবা ভগবানের কাছ থেকে কিছু পাবার ইচ্ছা থাকে। নিজের অন্তরে কোন চিন্তা, সন্দেহ বা জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হলে তা দূরীভূত করতে প্রশ্ন করা হয়।

স্তুতিতে ভগবানের প্রতি আস্তিকভাবের প্রাধান্য থাকে। প্রার্থনাতে আস্তিক ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজ আকাঙ্ক্ষাও থাকে। প্রশ্নতে শুধু জিজ্ঞাসা পূরণের বাসনা থাকে।

স্তুতিতে পূজ্যভাব মুখ্য, প্রার্থনাতে পূজ্যভাবের সঙ্গে বিশ্বাস এবং নিজের ইচ্ছাও থাকে। প্রশ্নতে শুধু জিজ্ঞাসা বিষয়ের সমাধানের দিকে লক্ষ্য থাকে।

স্তুতিতে ভগবানের গুণগানেরই প্রাধান্য থাকে। প্রার্থনাতে গুণগানের প্রাধান্য থাকলেও তাতে কিছু পাওয়ার ইচ্ছাও থাকে। প্রশ্নে গুণগান করা হয়, কিন্তু তাতে জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া অর্থাৎ প্রশ্নের সমাধান হলো প্রধান। এইভাবে প্রশ্নের মধ্যে যে অংশটিতে ভগবানের বৈশিষ্ট্য থাকে, তা স্তুতি এবং যে অংশে সমাধানের জন্য আগ্রহ থাকে সেই অংশটি হলো প্রার্থনা।[1]

গীতায় অর্জুন যেখানে যেখানে কথা বলেছেন সেখানে সেখানে কোথায় স্তুতি, কোথায় প্রার্থনা এবং কোথায় প্রশ্ন আছে। নীচে তার সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে—

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের পূর্বার্ধে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে 'আমার কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়'—এই বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্ন আছে এবং উত্তরার্ধে, 'আমার অবশ্যই যেন উদ্ধার লাভ হয়'—এর জন্য অর্জুন ভগবানের শরণাগত হয়ে প্রার্থনা করেছেন। আবার চুয়ান্ন সংখ্যক শ্লোকে 'স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কী ? তারা কিভাবে কথা বলেন ? কিরূপে অবস্থান করেন এবং কিভাবে চলেন ?'—এইরূপ চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোকে 'কর্ম হতে যখন বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তাহলে আপনি আমাকে কেন ঘোর কর্মে নিয়োজিত করছেন ? যাতে আমার মঙ্গল হয়, সেই কথা আমাকে বলুন'—এইরূপ প্রার্থনাপূর্বক প্রশ্ন করেছেন। ছত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে 'পাপ করতে না চাইলেও মানুষকে পাপাচরণে কে বাধ্য করে ?'—এইরূপ জিজ্ঞাসাপূর্ণ প্রশ্ন আছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে, 'আপনি সূর্যকে কীভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন ?' অর্জুন ভগবানকে এইরূপে অবতার বিষয়ে জিজ্ঞাসামূলক প্রশ্ন করেছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সন্ন্যাস এবং যোগ বিষয়ে অর্জুন প্রার্থনাযুক্ত প্রশ্ন করেছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের তেত্রিশ এবং চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন মনের নিগ্রহ বিষয়ে (নিজের ধারণা অনুসারে) প্রশ্ন করেছিলেন। আবার সাঁইত্রিশ এবং আটত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে যোগভ্রষ্টের গতির বিষয়ে অর্জুনের সন্দেহপূর্ণ জিজ্ঞাসা ছিল। আবার উনচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে সন্দেহ দূর করার জন্য অর্জুন (ভগবানের মহত্ত্ব বুঝে) ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন।

অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম-দ্বিতীয় শ্লোকে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম

---

[1]ভক্তের যখন ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ (সখা) ভাব হয়, তখন ভগবানের গুণ পরিলক্ষিত হলেও স্তুতি, প্রার্থনা বা প্রশ্ন থাকে না। কারণ যখন ভক্তের 'আমি ভগবানের' এবং 'ভগবান আমার'—এই ভাব তীব্র হয় তখন ভক্ত ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয় অর্থাৎ তাঁর মনে হয় যে, ভগবানে এমন কী বিশেষত্ব আছে আর আমার মধ্যেই বা কিসের ঘাটতি ! ভগবানের সঙ্গে ভক্তের যে ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা, একত্ব, প্রেম থাকে তাতে ভগবান বিশেষ আনন্দ পান (ভগবানের এই আনন্দে ভক্তও আনন্দ পায় ; ভক্তের নিজের কোন আলাদা আনন্দ নেই)। এই প্রেমের নামই মাধুর্য। এতে স্তুতি, প্রার্থনা বা প্রশ্ন—এই তিনটিই থাকে না।

ইত্যাদি বিষয়ে অর্জুনের জিজ্ঞাসাসূচক প্রশ্ন আছে।

দশম অধ্যায়ের দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন ভগবানের প্রভাবের স্তুতি করেছিলেন। পরে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন প্রার্থনাসূচক প্রশ্ন করেছেন (ষোড়শ ও অষ্টাদশে প্রার্থনা আছে এবং সপ্তদশ শ্লোকে প্রশ্ন করা হয়েছে)।

একাদশ অধ্যায়ের প্রথম থেকে চতুর্থ শ্লোক পর্যন্ত বিশ্বরূপ দর্শনের উদ্দেশ্যে অর্জুন বিনম্রভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন। পঞ্চদশ থেকে ত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের অলৌকিক ঐশ্বর্যের স্তুতি আছে এবং একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে প্রার্থনাসূচক প্রশ্ন আছে। ছত্রিশ থেকে চল্লিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত নমস্কারপূর্বক স্তুতি করেছেন এবং একচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন তাঁর অনিচ্ছাকৃত অমর্যাদাসূচক পূর্ব-ব্যবহারের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। পঁয়তাল্লিশ ও ছেচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবানের নিকট চতুর্ভুজরূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'সগুণ ও নির্গুণ উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?' এই বিষয়ে অর্জুনের জিজ্ঞাসাসূচক প্রশ্ন আছে।

চতুর্দশ অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক শ্লোকটিতে গুণাতীত বিষয়ে অর্জুন প্রশ্ন করেছেন।

সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে নিষ্ঠা বিষয়ে অর্জুনের জিজ্ঞাসা উদ্ধৃত আছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সন্ন্যাস এবং যোগ বিষয়ে অর্জুনের জিজ্ঞাসাযুক্ত প্রশ্ন রয়েছে।[১]

(৮০) গীতায় অর্জুনের যুক্তি উত্থাপন এবং তার সমাধান

যাবন্তো যুক্তয়ঃ সন্তি শোকমগ্নার্জুনস্য চ।
তাসাং প্রত্যুত্তরং দত্তং কৃষ্ণেন কৃপয়া স্বয়ম্॥

প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন যুদ্ধ না করার পক্ষে যেসকল যুক্তি দেখিয়েছেন, শোক ও মোহাবিষ্ট অবস্থায় কথিত হওয়ায় সেগুলি যথার্থ নয়। গীতায় ভগবানের বর্ণনাশৈলী এতোই অপূর্ব যে তাতে অর্জুনের প্রশ্নের স্বাভাবিকভাবেই সমাধান হয়ে যায়। শুধু অর্জুন কেন, ভগবানের যুক্তিপূর্ণ বিবেচনার সম্মুখে কারও অযৌক্তিক কথা টিকতে পারে না।

অর্জুন বলেছেন, 'আমি দুর্লক্ষণ দেখছি' (১।৩১), ভগবান উত্তরে বললেন, 'কর্মযোগী কোন লক্ষণের পরোয়া করেন না, পক্ষান্তরে তিনি শুভ-অশুভ পরিস্থিতিতে রাগ-দ্বেষ (আসক্তি-বিদ্বেষ) করেন না' (২।৫৭); 'আমার ভক্ত শুভ-অশুভ লক্ষণ বা পরিস্থিতি ত্যাগ করেন' (১২।১৭); 'তুমি মদ্‌গতচিত্ত হলে আমার অনুগ্রহে সমস্ত সঙ্কট অতিক্রম করবে' (১৮।৫৮)।

অর্জুন বলেছেন যে—'আমি যুদ্ধে স্বজন বধ করে পরিণামে আমার কোন মঙ্গল দেখছি না' (১।৩১), ভগবান উত্তর দিলেন, 'ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ—কল্যাণের আর কোন দ্বিতীয় সাধন নেই (২।৩১)। কারণ নিজধর্ম পালনকালে যদি মৃত্যুও হয়, তাও কল্যাণকর' (৩।৩৫)।

অর্জুন বলেছেন—'আমি জয়লাভ করতে চাই না, রাজ্য চাই না, সুখও চাই না' (১।৩২), ভগবান বললেন—'তুমি কোনপ্রকার কামনা না রেখে জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে তুল্যজ্ঞান করে

[১]অর্জুনের প্রশ্ন ছাড়াও গীতায় ধৃতরাষ্ট্র এবং ভগবানের প্রশ্নও আছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করলেন যে, 'হে সঞ্জয় ! ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত আমার এবং পাণ্ডুপুত্রগণ কি করলেন ?' এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের বাহাত্তর সংখ্যক শ্লোকে ভগবান (সম্পূর্ণ গীতা উপদেশের শেষে) অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন, 'হে ধনঞ্জয় ! তুমি কী একাগ্রচিত্তে গীতা শ্রবণ করেছ ? তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি দূর হয়েছে ?'

যুদ্ধ কর' (২।৩৮)।

অর্জুন বলেছেন—'যাদের জন্য রাজ্য, সুখভোগ ইত্যাদি কাম্য, তারাই আমার সম্মুখে যুদ্ধে মৃত্যুবরণে প্রস্তুত' (১।৩৩)। ভগবানের উত্তর হলো, 'তুমি সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে শোক ও মমত্বশূন্য (সন্তাপরহিত) হয়ে যুদ্ধ কর' (৩।৩০)। যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা এবং স্পৃহা ত্যাগ করেন এবং অহঙ্কার ও মমতাশূন্য হন, তিনি শান্তি লাভ করেন (২।৭১)।

অর্জুনের প্রশ্ন হলো, 'যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের এই আত্মীয়দের বধ করে আমার কী আনন্দ হবে ?' (১।৩৬)। ভগবান বলেছেন, 'আনন্দ যুদ্ধ করা অথবা না করাতে হয় না, তা হয় রাগ-দ্বেষ বর্জিত হয়ে, ইন্দ্রিয়সমূহকে নিজ বশে রেখে যথোচিত কর্ম করলে' (২।৬৪)।

অর্জুন বলেছেন, 'এই আত্মীয়-কুটুম্বদের যুদ্ধে বধ করলে আমি পাপের ভাগী হব' (১।৩৬), ভগবান জানাচ্ছেন, 'স্বতঃপ্রাপ্ত ধর্মযুদ্ধ না করলেই তুমি পাপের ভাগী হবে' (২।৩৩)।

অর্জুন বলেছেন, 'যুদ্ধে স্বজন বধ করে আমি কীভাবে সুখী হব ?' (১।৩৭), ভগবান জানিয়েছেন, 'যে ক্ষত্রিয়গণ এইরূপ ধর্মযুদ্ধ স্বতঃ প্রাপ্ত হন, তারাই সুখী' (২।৩২)।

অর্জুন বলেছেন, 'আমরা কুলভ্রষ্টকারী দোষগুলিকে জানি, সেইজন্য আমাদের এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়' (১।৩৯)। ভগবান বলেছেন, 'এসব তোমার ক্লৈব্য, কাপুরুষতা এবং মনের দুর্বলতা, তুমি এসব স্বীকার না করে নিজ কর্তব্য পালন করার জন্য প্রস্তুত হও' (২।৩)।

অর্জুন বলেছেন, 'যুদ্ধ করলে পরিণামে ধর্ম নষ্ট হয়' (১।৪০), ভগবান জানিয়েছেন, ধর্মযুদ্ধ না করলেই ধর্ম নষ্ট হয় (২।৩৩)।

অর্জুন বলেছেন, 'যুদ্ধ করলে পরিণামে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়, যার দ্বারা পিতৃপুরুষগণ নরকগামী হয় এবং কুলধর্ম তথা জাতিধর্ম ভ্রষ্ট হয়' (১।৪১-৪৩)। ভগবান বলেছেন, 'যদি আমি সাবধানতাপূর্বক নিজ কর্তব্য পালন না করি, তাহলে আমি বর্ণসংকর উৎপন্নকারী বলে বিবেচিত হব অর্থাৎ যুদ্ধরূপ কর্তব্য পালন না করলেই বর্ণসংকরতা উৎপন্ন হবে' (৩।২৪)।[১]

অর্জুন বলেছেন, 'যুদ্ধের পরিণামে নরক প্রাপ্তি হবে' (১।৪৪), ভগবান বলেছেন, 'কর্তব্য-কর্মরূপ যুদ্ধ করলে পরিণামে নরক প্রাপ্তি হয় না, স্বর্গ লাভ হয়' (২।৩২, ৩৭)।

অর্জুন বলেছেন, 'আমরা লোভের জন্য মহাপাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি' (১।৪৫), উত্তরে ভগবান বলেছেন 'এই কামনারূপ লোভ পরিত্যাগ করা উচিত ; কারণ, তা মানুষের শত্রু এবং পাপে প্রবৃত্ত করানোর হেতু' (৩।৩৭)।

অর্জুন বলেছেন, 'ভীষ্ম এবং দ্রোণকে বাণ দ্বারা কীভাবে বধ করবো ?' (২।৪)। ভগবান বলেছেন, 'কালরূপে এদের সকলকেই আমি বধ করেছি, তুমি কেবল কর্তব্য পালন করতে নিমিত্তমাত্র হও' (১১।৩৩)।

অর্জুন বলেছেন, 'আমি গুরুজনদের বধ না করে অর্থাৎ যুদ্ধ না করে ভিক্ষায় গ্রহণ শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি' (২।৫)। ভগবান বলেছেন, 'পরধর্ম ভয়াবহ এবং নিজধর্ম পালনকালে যদি মৃত্যুও হয়, তাহলেও নিজধর্ম কল্যাণকারী হয় (৩।৩৫)।'

অর্জুন বলেছেন, 'আমরা ঠিক জানি না, যুদ্ধ করা উচিত কি অনুচিত' (২।৬)। ভগবান বলেছেন, 'তুমি নির্দিষ্ট কর্ম কর ; কারণ, কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ' (৩।৮) ; 'যুদ্ধে তুমি অবশ্যই শত্রুদের জয় করবে' (১১।৩৪)।

[১] অর্জুনের যুক্তি অনুসারেও যদি বিচার করা যায়, তাহলেও প্রকৃতপক্ষে কর্তব্য পালন না করলেই বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়। যুদ্ধে কুল নষ্ট হওয়ার ফলে স্ত্রীলোকগণের দুশ্চরিত্র হওয়া তাদের কর্তব্যহীনতার কারণ এবং তাতেই বর্ণসংকরতা ঘটে। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে যদি এই ভাব থাকে যে, 'আমাদের স্বামীরা যুদ্ধরূপ কর্তব্য পালন করে প্রাণত্যাগ করেছেন, তবুও তাঁরা কর্তব্য ত্যাগ করেন নি, তবে আমরা কেন নিজ কর্তব্য পরিত্যাগ করব ?' তাহলে তাঁরা কর্তব্যচ্যুত হবেন না। কর্তব্যচ্যুত না হলে তাঁদের সতীত্ব সুরক্ষিত থাকবে এবং বর্ণসংকরতা ঘটবে না।

(৮১) গীতায় ভগবানের বিষয় নিরূপণের বৈশিষ্ট্য

পৃচ্ছতি ত্বর্জুনো যাবৎ প্রযচ্ছতি তদুত্তরম্।
অপৃষ্টোঽপি স্বমন্তব্যং কৃপয়া ভাষতে স্বয়ম্॥

গীতায় ভগবানের এই বর্ণনাশৈলী লক্ষ্য করা যায় যে, অর্জুন যা জিজ্ঞাসা করেন তিনি তার জবাব তো দেনই তাছাড়াও নিজে থেকে আরও অনেক কিছু জানিয়ে দেন ; যেমন—

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চুয়ান্ন সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের বিষয়ে চারটি প্রশ্ন করেছিলেন, ভগবান তার উত্তরে স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সাধকদের কথাও নিজে থেকে জানিয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন যে, যদি কর্মাপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাহলে আপনি কেন আমাকে ঘোর-কর্মে নিয়োজিত করছেন ? ভগবান উত্তরে জানিয়েছেন, 'কর্ম-ত্যাগ দ্বারা কোনও প্রকারের সিদ্ধিলাভ হয় না।' এই বলে সিদ্ধিলাভের জন্য কর্তব্য কর্ম পালনের আবশ্যকতার কথা জানালেন। এর পরে ব্রহ্মার দৃষ্টিতে, সৃষ্টিচক্রের দৃষ্টিতে, সিদ্ধদের দৃষ্টিতে, সাধকদের দৃষ্টিতে, নিজ দৃষ্টিতে এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে লোকসংগ্রহের জন্য কর্তব্যকর্ম করার প্রয়োজনীয়তার কথা নিজে থেকে জানিয়েছেন। তৃতীয় অধ্যায়েরই ছত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্বক পাপ করায় কে ?' উত্তরে ভগবান কাম-(কামনা)-কে পাপাচরণে প্রবৃত্তকারী বলেছেন এবং তাকে জয় করার, তার অবস্থান এবং তা বিনাশ করার উপায় নিজে থেকেই জানিয়ে দিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতে 'আমিই সূর্যকে এই উপদেশ দিয়েছিলাম'—কথাটি ভগবান নিজে থেকেই জানিয়েছেন। তাতে অর্জুন প্রশ্ন করায় উত্তরে ভগবান নিজ অবতারত্ব এবং কর্মের কথা বলে কর্মের তত্ত্বকে জানবার কথা এবং যজ্ঞ সম্বন্ধে অনেক কিছু নিজেই জানিয়েছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল সাংখ্য ও যোগের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ। ভগবান উত্তরে কর্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব জানালেন এবং জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ সম্বন্ধীয় অনেক গভীর কথা জানালেন। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ে পুনরায় কর্মযোগ সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন এবং অর্জুনের কোন প্রশ্ন না থাকলেও তার পরে বিস্তারিতভাবে ধ্যানযোগের বর্ণনাও করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের তেত্রিশ-চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন মনের চাঞ্চল্যের বিষয়ে প্রশ্ন করলে ভগবান পঁয়ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকের পূর্বার্ধে উত্তর সম্পূর্ণ করলেন এবং স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে ছত্রিশ সংখ্যক শ্লোকের বিষয়টি উপস্থাপিত করলেন। অর্জুন আবার জিজ্ঞাসা করেছেন যে, যে ব্যক্তির মৃত্যুকালে সাধনা বিচ্যুত হয় তার কি গতি হয় ? উত্তরে ভগবান জানিয়েছেন যে, কল্যাণ-কর্মকারী পুরুষের ইহজন্মে বা মৃত্যুর পরেও পতন হয় না। তারপর বিয়াল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে বৈরাগ্যবান যোগভ্রষ্ট পুরুষের কথা নিজেই জানিয়েছেন। ভক্তির বিষয়ে অর্জুন প্রশ্ন না করলেও তিনি নিজেই ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষের দিকে তার বর্ণনা করেছেন। আবার সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভক্তগণের বিশেষত্ব জানিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে বিবৃত কথা প্রসঙ্গে অষ্টম অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুন সাতটি প্রশ্ন করেন। তার মধ্যে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর ভগবান সংক্ষেপে দিয়ে মৃত্যুর পরবর্তী গতির বিষয়ে অর্জুনের যে প্রশ্ন ছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। শেষে শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুইটি পথের বিবরণ নিজ হতেই জানিয়েছেন। আবার নবম অধ্যায়ের বিষয়টি ভগবান নিজেই শুরু করেছেন। এতে তিনি ভক্তি এবং তার সপ্ত অধিকারীর কথাও নিজেই জানিয়েছেন। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আবার দশম অধ্যায়ের বিষয়টি নিজে থেকে শুরু করেন এবং বলেন যে তাঁর যোগ ও বিভূতি জানার পরিণাম হলো ভগবানে দৃঢ় ভক্তি হওয়া। ভক্তদের উপর কৃপা করার বিশেষ কথাগুলিও তিনি নিজে থেকেই আবার জানিয়ে দেন। এই কথা শুনে অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে ভগবানের স্তুতি করেন এবং তাঁকে যোগ ও বিভূতি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রার্থনা করেন। ভগবান তাঁর

বিভূতিগুলি বর্ণনা করে অবশেষে—'তোমার এতকিছু জানবার প্রয়োজন কি ? আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ সংসার ধারণ করে আছি'—এই কথাটি বললেন। এর ফলে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা হলে ভগবান নিজে থেকেই তাঁকে দিব্যচক্ষু দিয়ে বিশ্বরূপ দর্শন করালেন ও একাদশ অধ্যায়ের শেষে অনন্য ভক্তির মহিমা জানালেন—যে বিষয়ে অর্জুনের কোন জিজ্ঞাসাই ছিল না।

দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন প্রশ্ন করলেন যে, ব্যক্ত (সগুণ-সাকার) এবং অব্যক্ত (নির্গুণ-নিরাকার)—এই দুই উপাসনাকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? উত্তরে ভগবান জানালেন যে ব্যক্তের উপাসনাকারী ভক্ত শ্রেষ্ঠ। পরে ভক্তির প্রকার এবং সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ নিজ থেকে জানালেন। অব্যক্তের উপাসনায় বিবেকবোধের প্রাধান্য থাকে। সেইজন্য ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি-পুরুষ ইত্যাদির বিচারসহ বিবেকের বর্ণনা করেছেন, তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি চতুর্দশ অধ্যায়ে পুনরায় ঐ বিবেকেরই প্রকারান্তরে বিশ্লেষণপূর্বক বর্ণনা করেছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন গুণাতীতের সম্বন্ধে তিনটি প্রশ্ন করেছেন। তার উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান গুণাতীত হওয়ার উপায় রূপে নিজ অব্যভিচারিণী ভক্তির উল্লেখ করেছেন এবং নিজেই তাঁর বিশেষ প্রভাবের কথা বলেছেন। এরপর পঞ্চদশ অধ্যায়েও পুনরায় তিনি নিজেই অব্যভিচারিণী (একনিষ্ঠ) ভক্তির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, অর্জুন জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও। এইভাবেই ষোড়শ অধ্যায়েও ভগবান প্রশ্ন ব্যতীতই ভক্তির অধিকারী ও অনধিকারী সম্বন্ধে জানিয়ে দিয়েছেন।

সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল নিষ্ঠা (স্থিতি) সম্পর্কে। তার উত্তরে ভগবান তিন প্রকার শ্রদ্ধার কথা জানিয়ে নিজেই আহার-যজ্ঞ-তপ-দান সম্বন্ধে আলোচনা করলেন এবং 'ওঁ তৎ সৎ' নামের ব্যাখ্যাও করলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব বিষয়ে। তার উত্তরে ভগবান প্রথমে ত্যাগ এবং পরে সন্ন্যাসের বর্ণনা করলেন অতিশয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শৈলীতে, পরিশেষে শরণাগতি এবং উপদেশের মহিমার কথা নিজে থেকেই বিশেষরূপে জানালেন।

এইপ্রকার অর্জুন যেমন যেমন শুনতে আগ্রহী হলেন, তেমনি ভগবানও নিজে থেকেই সব বলতে লাগলেন। (এখানে শুধু পথ-নির্দেশ করা আছে। বিস্তারিতভাবে জানতে হলে সব অধ্যায়গুলি মননপূর্বক পড়া দরকার)।

(৮২) গীতায় ভগবানের বিষয়-প্রতিপাদন শৈলী

বিবেচনস্য যা শৈলী গীতায়াং বিদ্যতে প্রভোঃ।
দৃশ্যতে নহি চান্যত্র শাস্ত্রেষু নিগমেষু চ॥

(ক)

গীতায় ভগবানের এই শৈলী লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রণালীর মাধ্যমে পরমাত্মার উপাসনাকারী সাধকদের লক্ষণ অনুসারেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত সিদ্ধ মহাপুরুষদের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। কারণ যে সাধন যেখান থেকে শুরু হয় সিদ্ধ হলে তাতেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে। যেমন—

(১) দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান কর্মযোগী সাধকদের জন্য চারটি কথা (চার পংক্তিতে) বলেছেন—

(১) **কর্মণ্যেবাধিকারস্তে**—(তোমার কর্মেই অধিকার)।

(২) **মা ফলেষু কদাচন**—(কর্মফলে তোমার কোন অধিকার নেই)।

(৩) **মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ**—[তুমি কর্মফলের কারণ (হেতু) হয়ো না]।

(৪) **মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি**—[কর্মত্যাগে যেন তোমার

আসক্তি (প্রবৃত্তি) না হয়]।

তৃতীয় অধ্যায়ের আঠারোতম শ্লোকে ঠিক উপরিউক্ত সাধনায় সিদ্ধির কথা (কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের লক্ষণ) বলা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পংক্তিতে সাধকদের জন্য যা বলা হয়েছে তা তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকের উত্তরার্ধে সিদ্ধ মহাপুরুষদের সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যে তাঁর কোন প্রাণী বা পদার্থের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না—**'ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ'**। এখানে প্রথম এবং চতুর্থ পংক্তিতে সাধকদের জন্য যে কথা বলা হয়েছে তা তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকের পূর্বার্ধে সিদ্ধ মহাপুরুষদের জন্যও বলা হয়েছে যে, তাঁর কর্ম করা বা না করা—কোন কিছুতেই স্বার্থ থাকে না—**'নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন'**।

(২) চতুর্দশ অধ্যায়ের উনিশ এবং বিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান জ্ঞানযোগের সাধকদের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—এঁরা তিনটি গুণকে ভিন্ন অন্য কাউকে কর্তা দেখেন না। 'সমস্ত ক্রিয়া গুণের দ্বারাই সংঘটিত হয়, আমার তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই'—এইরূপ নিজেকে গুণ হতে সর্বতোভাবে রহিত মনে করে এঁরা ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। দেহোৎপত্তির কারণভূত এই তিনটি গুণ অতিক্রম করে জন্ম, মৃত্যু এবং বৃদ্ধাবস্থারূপ দুঃখ হতে বিমুক্ত হয়ে তাঁরা অমরত্ব অনুভব করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়েরই বাইশ-তেইশ শ্লোকে ভগবান এই তিনটি গুণের প্রসঙ্গে সিদ্ধ মহাপুরুষদের বর্ণনা করেছেন যে তিন গুণের প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ এলেও তাঁরা তাতে দ্বেষ করেন না এবং ঐ প্রবৃত্তি দূরীভূত হলেও তার আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁরা গুণ এবং বৃত্তিসমূহে উদাসীনের মত স্থিত হন, গুণসমূহের দ্বারা বিচলিত হন না এবং 'গুণই গুণে আবর্তিত হচ্ছে'—এইরূপ অনুভব করে স্বরূপে স্থিত থাকেন।

(৩) সাধকদের বিষয়ে ভগবান বলেছেন যে, 'যে ব্যক্তি আমাকে সর্বত্র দেখে এবং সব কিছু আমাতেই অবস্থিত দেখে সেই ভক্তের কাছে আমি কখনো অদৃশ্য হই না এবং সেও আমার কাছ থেকে অদৃশ্য হয় না' (৬।৩০)। সিদ্ধ ভক্তদের জন্য ভগবান বলেছেন যে তাঁদের দৃষ্টিতে 'সব কিছুই বাসুদেব'—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯), ভগবান ছাড়া অন্য কোন তত্ত্বই নেই।[১]

(৪) ভগবান ভক্ত সাধকদের লক্ষণে বলেছেন যে, তাঁরা **'সঙ্গবর্জিতঃ'** অর্থাৎ আসক্তিরহিত এবং **'নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু'** অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী হতে তাঁদের বৈরভাব তিরোহিত হয় (১১।৫৫)। সিদ্ধ ভক্তদের ক্ষেত্রেও তিনি এই লক্ষণের কথা জানিয়েছেন **'সঙ্গবিবর্জিতঃ'** (১২।১৮) এবং **'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্'** (১২।১৩)। নিজের মধ্যে যাতে বৈরভাব না আসে সেই বিষয়ে সাধক সাবধান থাকেন, কিন্তু সিদ্ধ ভক্তদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এই দোষ থাকে না।

(খ)

গীতা কারো মত খণ্ডন করেন না ; কিন্তু নিজমত প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে অপর মতের স্বাভাবিকভাবে খণ্ডন হয়ে যায়। যেমন—অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোকে ভগবান 'সন্ন্যাস' এবং 'ত্যাগে'র বিষয়ে দার্শনিকদের চারটি মত বলেছেন। এর মধ্যে সন্ন্যাসের বিষয়ে দুটি মত বলেছেন—(১) কাম্য কর্ম ত্যাগের নাম সন্ন্যাস এবং (২) সমস্ত কর্মই দোষযুক্ত হওয়ায় ত্যাজ্য। ত্যাগের সম্পর্কেও দুটি মত বলেছেন—সমস্ত কর্মফল ত্যাগ করাকে ত্যাগ বলে এবং যজ্ঞ-দান-তপ ইত্যাদি কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। কিন্তু ভগবানের দ্বারা নিজ মত উপস্থাপিত হওয়ায় দার্শনিকদের চারটি মত স্বভাবতঃই খণ্ডন হয়ে যায়। এই চারপ্রকার মত কী ভাবে স্বতঃই খণ্ডিত হলো অর্থাৎ এই মতগুলির থেকে ভগবানের মত কিরূপে শ্রেষ্ঠ, তার বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে—

---

[১]সাধারণ লোকেরা উচ্চাবস্থাসম্পন্ন সাধক এবং সিদ্ধের লক্ষণের পার্থক্য বুঝতে পারে না ; কারণ উভয়ের লক্ষণে অনেক সাদৃশ্য থাকে। উভয়ের মধ্যে শুধুমাত্র এই পার্থক্য থাকে যে সাধকের মধ্যে সব কিছুতে ভগবৎস্বরূপ দেখার ভাব থাকে এবং সিদ্ধের মধ্যে সব কিছুই ভগবৎস্বরূপ—এই ভাব স্বাভাবিকভাবে হয়।

(১) সন্ন্যাসের প্রথম মতে বলা হয়েছে শুধু কাম্য কর্ম ত্যাগের কথা ; কিন্তু এই কাম্যকর্ম ব্যতিরেকে নিত্য-নৈমিত্তিক প্রভৃতি অবশ্য করণীয় কর্তব্য-কর্মও থাকে। এই মতে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগের কথা বলা হয়নি এবং স্বরূপে স্থিতির কথাও বলা হয় নি। সুতরাং এই মত সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু ভগবান তাঁর মতে অহং-কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগের কথা বলেছেন এবং স্বরূপে স্থিতির কথাও বলেছেন ; যেমন—অষ্টাদশ অধ্যায়ের সতের সংখ্যক শ্লোকে 'যার মধ্যে অহংকর্তৃত্বভাব নেই এবং যার বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না'—এ কথায় কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগের কথা বলেছেন এবং 'যদি সে সমস্ত প্রাণীকেও বধ করে তবুও সে হনন করে না বা আবদ্ধ হয় না'—এতে তিনি স্বরূপে স্থিতির কথা বলেছেন। অর্থাৎ যেমন সর্বব্যাপী পরমাত্মা কিছু করেনও না এবং কিছুতে লিপ্তও হন না, তেমনি যাঁর মধ্যে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব নেই সেই যোগিপুরুষও কিছু করেনও না এবং লিপ্তও হন না।

(২) সন্ন্যাসের দ্বিতীয় মতে সমস্ত কর্মগুলি দোষের ন্যায় পরিত্যাজ্য বলা হয়েছে ; কিন্তু সকল কর্ম কেউ ত্যাগ করতেই পারে না (৩।৫ ; ১৮।১১)। তাই ভগবান নির্দিষ্ট কর্মের বাহ্যিক ত্যাগকে রাজসিক-তামসিক ত্যাগ বলে জানিয়েছেন (১৮।৭-৮)।

(৩) ত্যাগের প্রথম মতে শুধু কর্মফল ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কর্মফল ত্যাগ করলেও কর্মের আসক্তি থেকে যেতে পারে। ভগবান সেইজন্য কর্মাসক্তি ও ফলাসক্তি দুটিকেই ত্যাগের কথা বলেছেন (১৮।৬)।

(৪) ত্যাগের দ্বিতীয় মতে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ না করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভগবান নিজ মতে জানিয়েছেন যে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়—কেবল তাই নয়, এগুলি যদি না করা হয়, তাহলে অবশ্যই তা করা উচিত। এর অতিরিক্ত তীর্থ, ব্রত ইত্যাদিও কর্মফলের ইচ্ছা ও আসক্তি বর্জিত হয়ে করা উচিত (১৮।৫-৬)।

(গ)

কোনও বিষয়ের বর্ণনাতে ভগবান প্রথমে তার লাভ, পরে ক্ষতি এবং শেষে পুনরায় লাভের বর্ণনা দিয়ে সেই বিষয়ের উপসংহার করেছেন। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ের একত্রিশ-বত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্মের ভালোর দিকটি বর্ণনা করে বলেছেন যে ক্ষত্রিয়দের নিকট স্বধর্মের চেয়ে বড় অন্য কোন কল্যাণকারী কর্ম নেই। স্বতঃ প্রাপ্ত যুদ্ধ স্বর্গের অবারিত দরজার মতো, যে ক্ষত্রিয় এইরূপ অনায়াসে প্রাপ্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সেই প্রকৃতপক্ষে সুখী। এরপর মধ্যের চারটি (২।৩৩-৩৬) শ্লোকে যুদ্ধ না করলে কি ক্ষতি হতে পারে তার বর্ণনা করে বলেছেন যে, 'তুমি যদি স্বধর্ম পালন না কর তবে তুমি ধর্ম-ত্যাগের জন্য পাপের ভাগী হবে এবং তোমার অপকীর্তির কথা সকলে বলবে। জগতে সকলেই চিরকাল তোমার অপযশ করবে। সম্মাননীয় ব্যক্তির অপকীর্তি মৃত্যুর চেয়ে বেশী দুঃখদায়ক হয়ে থাকে। মহারথীরা মনে করবে তুমি ভীত হয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছ। যারা তোমাকে সম্মান করে, তাদের দৃষ্টিতে তুমি হেয় হয়ে যাবে। শত্রুরা তোমার সম্বন্ধে অনেক অকথ্য কথা বলবে। তোমার পক্ষে এর থেকে বেশী দুঃখের আর কি হতে পারে ?' আবার শেষের দুটি শ্লোকে (২।৩৭-৩৮) তিনি পুনরায় লাভের বর্ণনা করে বলেছেন যে, 'যদি তুমি মৃত্যুমুখেও পতিত হও, তবে স্বর্গ লাভ করবে আর যদি জয়ী হও, তাহলে পৃথিবীর সুখ ভোগ করবে। তুমি জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখ তুল্যজ্ঞান করে যদি যুদ্ধ কর, তাহলে পাপের ভাগী হবে না ; অতএব তুমি যুদ্ধ কর।'

(ঘ)

ভগবান যে বিষয় নিয়ে প্রথমে বিস্তারিত আলোচনা করেন, পরে সেটিকেই আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করেন ; যেমন—

(১) তৃতীয় অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি সর্বদা আসক্তিবর্জিত হয়ে কর্তব্যকর্ম কর ; কারণ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করে।' এই কথাই পুনরায় বিংশ সংখ্যক শ্লোকের পূর্বার্ধে সংক্ষেপে বলেছেন যে, 'জনকাদি মহাত্মাগণও কর্মযোগ দ্বারা পরম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।'

(২) অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান

'অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ' পদের দ্বারা যে বিষয় বিস্তারিতভাবে বলেছেন, বলা বিষয়ই পুনর্বার **'নিত্যযুক্তস্য'** পদে সংক্ষেপে বলেছেন।

(৩) নবম অধ্যায়ে ষোল সংখ্যক শ্লোক থেকে উনিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ভগবান কার্য-কারণরূপে বিস্তারিত-ভাবে নিজ বিভূতির বর্ণনা করেছেন এবং পরিশেষে **'সদসচ্চাহম্'** পদদ্বারা সেটিকে সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন।

(৪) নবম অধ্যায়ের চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান **'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু'** পদ দ্বারা যে বিষয় বিস্তারিতভাবে বলেছেন সেই কথা আবার সংক্ষেপে **'মৎপরায়ণঃ'** পদে বলেছেন।

(৫) দশম অধ্যায়ের অষ্টম-নবম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'আমিই সমস্ত জগৎ উৎপত্তির প্রধান কারণ এবং আমা হতেই সমস্ত জগৎ-সংসার প্রবর্তিত হয়—বুদ্ধিমান ভক্ত আমাকে এইরূপ মেনে শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক আমার ভজনা করেন। আমাতে চিত্ত অর্পণকারী, আমাতে প্রাণ অর্পণকারী ভক্ত নিজেদের মধ্যে আমার গুণ, প্রভাব ইত্যাদি আলোচনা করে সতত সন্তুষ্ট থাকেন এবং আমাতেই প্রীতি রাখেন।' এই বিষয়টিই তিনি দশম শ্লোকের পূর্বার্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন—'যাঁরা সতত আমাতে চিত্ত অর্পণ করে প্রীতিপূর্বক আমার সাধন-ভজন করেন, সেই ভক্তদের আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি।'

(৬) দশম অধ্যায়ের বিশ শ্লোক থেকে আটত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বিস্তারিতভাবে নিজ বিভূতির বর্ণনা করেছেন এবং উনচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে সেটি পুনরায় সংক্ষেপে বলেছেন।

(৭) দ্বাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'যে ভক্ত মৎপরায়ণ হয়ে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে অনন্যভক্তি দ্বারা আমার ধ্যানে নিরত হয়ে আমার উপাসনা করেন,' এই বিষয়টিই আবার সপ্তম শ্লোকে **'ময্যাবেশিতচেতসাম্'** (আমাতে আসক্ত চিত্ত) পদে সংক্ষেপে বলেছেন।

(ঙ)

ভগবান যে বিষয়টি প্রথমে সংক্ষেপে বলেন পরে সেটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন ; যেমন—

(১) তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান সংক্ষেপে নির্দিষ্ট কর্মের কথা বলেছেন এবং সেই বিষয়েই অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ থেকে আটচল্লিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

(২) চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান সংক্ষেপে চতুর্বর্ণের কথা জানিয়েছেন এবং সেটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন অষ্টাদশ অধ্যায়ের একচল্লিশ শ্লোক থেকে চুয়াল্লিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত।

(৩) সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান **'ন ত্বহং তেষু তে ময়ি'** পদটিতে সংক্ষেপে যে কথা বলেছেন সেটিই নবম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

(চ)

ভগবান কোনও বিষয় নিয়ে প্রথমে যেভাবে আলোচনা করেন পরে সেই বিষয়টি অন্য প্রকারে উপস্থাপিত করেন ; যেমন—

(১) দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত ভগবান যে কর্মযোগের বর্ণনা করেছেন, অষ্টাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত সেটি প্রকারান্তরে বর্ণনা করেছেন।

(২) পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ থেকে ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উনিশ থেকে চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ভগবান যে সাংখ্যযোগের বর্ণনা করেছেন, সেটিই অষ্টাদশ অধ্যায়ে তেরো থেকে আঠারো সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছেন।

(৩) সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবান যে ভক্তিযোগের বর্ণনা করেছেন সেটিকেই তিনি অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছাপ্পান্ন থেকে ছেষট্টি সংখ্যক শ্লোকে ভিন্নরূপে বলেছেন।

(৪) ভগবান বলেছেন যে প্রকৃতি এবং তার গুণ দ্বারাই সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয় (৩।২৭ ; ৫।৯ ;১৩।২৯ ইত্যাদি)। এই বিষয়টি ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ের তেরো থেকে অষ্টাদশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত অন্য প্রকারে বর্ণনা করেছেন।

(৫) চতুর্দশ অধ্যায়ের পঞ্চম থেকে আঠারো সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ভগবান গুণগুলির বিষয়ে যে আলোচনা

করেছেন সেটি পুনরায় অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিশ থেকে চল্লিশ শ্লোক পর্যন্ত অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন।

(ছ)

অর্জুন ক্রিয়াবাচক প্রশ্ন করলে ভগবান তার ভাববাচক উত্তর দিয়েছেন ; যেমন—

(১) দ্বিতীয় অধ্যায়ের চুয়ান্ন সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন ক্রিয়াবাচক প্রশ্ন করেন যে, যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করেছেন তিনি কিরূপে কথা বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন এবং কিরূপে চলেন ? ভগবান ভাববাচক উত্তরে জানিয়েছেন—

তিনি কেমন করে বলেন ? অর্থাৎ আস্তে আস্তে বলেন না জোরের সঙ্গে কথা বলেন ? তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে তাঁর কথা সেরকম নয় ; তিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না এবং সুখেও আসক্ত হন না তথা তিনি রাগ, ভয় ও ক্রোধবর্জিত হন। শুভ-অশুভ পরিস্থিতিতে তিনি রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ করেন না (২।৫৬-৫৭)।

তিনি কিরূপে অবস্থান করেন ? অর্থাৎ সিদ্ধাসনে বসেন, না পদ্মাসন ইত্যাদিতে বসেন ? তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে, 'তাঁর বসা সেইরূপ নয় ; তিনি কচ্ছপের ন্যায় তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন, সংহরণ করেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত করে তিনি আমার পরায়ণ থাকেন (২।৫৮, ৬১)।

তিনি কিরূপে চলেন ? অর্থাৎ ধীরে চলেন, না জোরের সঙ্গে চলেন ? তার উত্তরে ভগবান বলছেন তাঁর চলা সেরূপ নয় ; কিন্তু তিনি রাগ-দ্বেষ বর্জিত এবং কামনা, মমতা এবং অহং অভিমান শূন্য হয়ে আচরণ করেন (২।৬৪-৭১)।

(২) তৃতীয় অধ্যায়ের ছত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন 'ভগবান ! মানুষ না চাইতেও কেন পাপ করে বসে ?' উত্তরে ভগবান জানালেন যে 'মানুষের অন্তরে কামনা থাকলেই পাপের ক্রিয়া হয়' (৩।৩৭)। যদি অন্তরে কামনা না থাকে তবে পাপের ক্রিয়া হতেই পারে না এবং কোন ক্রিয়া বাহ্যতঃ পাপযুক্ত মনে হলেও তাকে পাপ স্পর্শ করে না (১৮।১৭)।

(৩) চতুর্দশ অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেন যে গুণাতীতের লক্ষণ কি ? অর্থাৎ তাঁর আকৃতি, গায়ের রং-রূপ কেমন হয় ? উত্তরে ভগবান জানালেন যে, গুণের বৃত্তিসমূহ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হলেও তাতে তিনি রাগ-দ্বেষ করেন না, অর্থাৎ নির্লিপ্ত থাকেন ও উদাসীনের মতো থাকেন এবং গুণগুলির দ্বারা বিচলিত না হয়ে নিজ স্বরূপে স্থিত থাকেন (১৪।২২-২৩)।

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল যে, গুণাতীতের আচরণ কেমন হয় অর্থাৎ তিনি সবার প্রতি একই ব্যবহার করেন, নাকি তাঁর ব্যবহারে তারতম্য থাকে ? ছুৎমার্গ থাকে, নাকি সমানভাবে মেলামেশা করেন ? ভগবান বলেছেন যে, তাঁর ভিতরে সমভাব থাকে অর্থাৎ বাহ্য ব্যবহারে শাস্ত্র ও লোকমর্যাদা অনুযায়ী নানা আচরণাদি করলেও তাঁর অন্তরে সমত্ব অটলভাবে বিরাজমান থাকে (১৪।২৪-২৫)।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন গুণাতীত হওয়ার উপায় কি ? অর্থাৎ জপ না ধ্যান, কি করা উচিত ? কারো কাছে যাওয়া উচিত না তীর্থে যাওয়া উচিত ? ভগবান জানালেন, 'যে ব্যক্তি অব্যভিচারী (একনিষ্ঠ) ভক্তিযোগ সহকারে আমার শরণাগত হন, তিনি এই গুণ-গুলি অতিক্রম করে যান অর্থাৎ গুণাতীত হন' (১৪।২৬)।

এইরূপে ভগবান অর্জুনের ক্রিয়াবাচক প্রশ্নের ভাববাচক উত্তর দিয়েছেন।

এর তাৎপর্য হিসাবে বলা যায় যে ভগবান বাহ্য আচরণাদি, বেশ-ভূষা, আচার-বিচার, আশ্রম-পরিবর্তন ইত্যাদির উপর তত গুরুত্ব দেন না, যত দিয়ে থাকেন ভাবের উপর। কারণ ভাবের পরিবর্তনে কর্মের স্বতঃই পরিবর্তন হতে থাকে। বিশেষত্ব ভাবেই থাকে, কর্মে নয় ; কারণ ভণ্ডামী করে মানুষ ভালো ভালো কর্মের প্রদর্শন করতে পারে।

(৮৩) গীতায় ভগবানের বর্ণনা করার শৈলী

চিত্রা বর্ণনশৈলী তু নটনাথস্য বিদ্যতে।
ভক্তৌ জ্ঞানং চ সন্ন্যাসে ভক্তিশ্চ কথিতা স্বয়ম্॥

ভগবান যেখানে জ্ঞানের বর্ণনা করেন, সেখানে ফলরূপে ভক্তির বর্ণনা করেন ; যেমন—অষ্টাদশ অধ্যায়ের উনপঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের প্রকরণে ফলরূপে ভগবান নিজ পরাভক্তি লাভের কথা বলেছেন—'**মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্**'। এইরূপেই ভগবান যেখানে ভক্তির বর্ণনা করেছেন সেখানে ফলেতে জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন ; যেমন—দশম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভক্তির প্রকরণ আছে, কিন্তু তার ফলরূপে ভগবান জ্ঞান প্রাপ্তির কথা বলেছেন—'**অজ্ঞানজং তমঃ.....জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা**'।

জ্ঞান প্রাপ্তির সাধনসমূহের কথা যেখানে বলা হয়েছে ভগবান সেখানে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তিকে জ্ঞানের সাধনরূপে জানিয়েছেন (১৩।১০) ; যেখানে গুণাতীত হওয়ার বর্ণনা করেছেন, সেখানেও গুণাতীত হওয়ার উপায় হিসাবে ভক্তির কথা বলেছেন (১৪।২৬) আর যেখানে ভক্তির প্রকরণ, ভগবান সেখানে তত্ত্বতঃ জানবার কথা অর্থাৎ জ্ঞানের কথা বলেছেন (১০।১০)।

এর তাৎপর্য হচ্ছে, জ্ঞানে ভক্তি এবং ভক্তিতে জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। সুতরাং জ্ঞানপথের সাধকদের ভক্তি ও ভক্তিপথের সাধকদের অনাদর অবহেলা করা উচিত নয় এবং ভক্তিপথের সাধকদেরও জ্ঞান ও জ্ঞানপথের সাধকদের অনাদর বা অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ যদি একে অন্যের নিন্দা, অবজ্ঞা করেন, তবে তাঁদের সাধনায় সিদ্ধি হবে না, তাতে বাধা পড়বে অর্থাৎ একটি মার্গের সাধক অপর মার্গের সাধকের বা তাঁর সাধনপথের অবজ্ঞা, নিন্দা বা অপমান করলে সেটি তার নিজের সাধনার সিদ্ধিতে বাধা সৃষ্টির কারণ হবে। অতএব সকল সাধকের উচিত যে সাধক মাত্রের প্রতিই সদ্ভাব বজায় রাখা। পরমাত্মার অংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে প্রাণিমাত্রের প্রতিই সাধকদের সদ্ভাব থাকা উচিত। তবুও বিশেষভাবে যাঁরা জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি কোনও সাধনের দ্বারা ভগবানকে পাওয়ার জন্য সচেষ্ট রয়েছেন, তাঁদের তো বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করা উচিত। এরূপ করলে সাধকের সাধনা অতি শীঘ্রই সাফল্য লাভ করবে। ভগবানও গীতায় কারও মতের খণ্ডন বা নিন্দা না করে নিজ মতটিই প্রকাশ করেছেন (১৮।২-৬ ইত্যাদি)।

(৮৪) গীতোক্ত অন্বয়-ব্যতিরেক বাক্যের তাৎপর্য

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বিষয়স্তু দৃঢায়তে।
স্পষ্টরূপেণ সা শৈলী গীতায়াং দৃশ্যতে প্রভোঃ॥

ইতিবাচক কথাকে 'অন্বয়' এবং নেতিবাচক কথাকে 'ব্যতিরেক' বলা হয়। অন্বয় এবং ব্যতিরেকের বর্ণনা করলে বিষয়টির স্পষ্ট বোধ হয়। সেজন্য গীতায় বিষয়গুলি স্পষ্ট করার জন্য ভগবান অনেক জায়গায় অন্বয় এবং ব্যতিরেক রীতিতে সেই বিষয়টির বর্ণনা করেছেন, যেমন—

(১) দ্বিতীয় অধ্যায়ের চব্বিশ-পঁচিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, শরীরীকে (আত্মাকে) নিত্য, সর্বগত ইত্যাদি বলে জানলে শোক হতে পারে না এবং ছাব্বিশ-সাতাশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে, 'তুমি যদি শরীরীকে নিত্য জন্ম-মৃত্যু গ্রহণকারী বলে মনেও কর, তাহলেও তোমার শোক করা উচিত নয় ; কারণ, যে জন্মায় তার মৃত্যু সুনিশ্চিত এবং মৃতের জন্মও সুনিশ্চিত।'

—এর অর্থ এই যে কোন দৃষ্টিতেই মানুষের শোক

করা উচিত নয়।

(২) দ্বিতীয় অধ্যায়ের একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'নিজ ধর্মের কথা বিবেচনা করলে তোমার ভীত হওয়া উচিত নয় ; কারণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন কল্যাণকারী সাধন নেই'; আবার তেত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে, 'যদি তুমি এই ধর্মময় যুদ্ধ না কর, তবে তুমি পাপভাগী হবে'।

—এর তাৎপর্য এই যে, যে কোন দৃষ্টিতেই বিচার করা হোক না কেন কোনও অবস্থা, পরিস্থিতি বা ঘোরতর সংকটেও নিজ কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং নিজ কল্যাণ সাধনের জন্য নিষ্কামভাবে নিজ কর্তব্যকর্ম তৎপরতার সঙ্গে পালন করা উচিত।

(৩) দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাষট্টি-তেষট্টি সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, কেবলমাত্র আসক্তিপূর্বক বিষয় চিন্তা করলেই পতন হয় আর চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে আসক্তিরহিত হয়ে বিষয়সেবন করলে স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারা যায় অর্থাৎ পরমাত্মাপ্রাপ্তি ঘটে।

—এর তাৎপর্য এই যে, সাধকের রাগ-দ্বেষ বর্জিত হওয়া উচিত। কারণ এই দুটিই হলো সাধকের শত্রু (৩।৩৪)।

(৪) দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাষট্টি-তেষট্টি সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যে ব্যক্তি বিষয়ের চিন্তা করে, তার পতন হয় এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের চল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে, কল্যাণকর্মকারী ব্যক্তির কখনও পতন হয় না।

—এর তাৎপর্য এই যে, যে সংসারে আসক্ত, তার পতন হয় ; এবং যে, যে কোনও প্রকারে ভগবদ্মুখী হয়, পারমার্থিক পথে চলতে আরম্ভ করে, তার পতন হয় না।

(৫) দ্বিতীয় অধ্যায়ের চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় বশ হয়েছে তাঁর বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় ; এবং ছেষট্টি-সাতষট্টি সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে, যার মন এবং ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় নি, তার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত নয়, অসংযমী হওয়ায় তার মন বুদ্ধিকে হরণ করে নেয়।

—এর তাৎপর্য এই যে কর্মযোগীর মন ও ইন্দ্রিয়কে বশে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

(৬) তৃতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যজ্ঞার্থ কর্মের অতিরিক্ত যে কর্ম তা মানুষকে আবদ্ধ করে—**'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ'** এবং চতুর্থ অধ্যায়ের তেইশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে, যজ্ঞের জন্য অর্থাৎ অন্যের হিতার্থে যে কর্ম করে, তার সকল কর্ম (ফলসহ) বিনষ্ট হয়—**'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।'**

—এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের শুধু অপরের হিতার্থেই সমস্ত কর্ম করা উচিত, নিজের স্বার্থের জন্য নয়।

(৭) তৃতীয় অধ্যায়ের তেরো সংখ্যক শ্লোকের প্রথমাংশে ভগবান বলেছেন যে, যে ব্যক্তি যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন, তিনি সকল পাপ হতে মুক্ত হন এবং শ্লোকের শেষাংশে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের জন্য রন্ধন করেন অর্থাৎ নিজের জন্যই সবকিছু করেন, সে পাপী এবং পাপই সে অর্জন করে।

—এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের নিষ্কামভাবে নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত। কারণ নিষ্কামভাবে কর্তব্য-কর্ম করলে মানুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় (৩।১৯) এবং সকামভাবে কর্তব্যকর্ম করলে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় (৫।১২)।

(৮) তৃতীয় অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন অপরে তার অনুকরণ করে ; এবং পঁচিশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে, অজ্ঞ ব্যক্তিরা আসক্তিযুক্ত হয়ে কর্মবিধায়ক শাস্ত্র, কর্ম এবং কর্মফলের উপর আস্থা রেখে যেমন তৎপরতার সঙ্গে কার্য করে, জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও আসক্তিরহিত হয়ে সেইরূপ তৎপরতাপূর্বক কর্তব্য-পালন করা উচিত। এইরূপ একুশ সংখ্যক শ্লোকে শ্রেষ্ঠ (জ্ঞানী) মানুষকে সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য আদর্শরূপে উপস্থাপিত করেছেন এবং পঁচিশ সংখ্যক শ্লোকে অজ্ঞান মানুষদের জ্ঞানী মানুষের জন্য আদর্শরূপে বলেছেন[১]।

—এর তাৎপর্য এই যে জ্ঞানী যোগিপুরুষ 'আদর্শ' হন কিংবা অনুগামী, তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবে লোকসংগ্রহ কার্য হয়।

---

[১]বিদ্বান মানুষদের কাছে অজ্ঞান মানুষদের কর্ম করার পদ্ধতিটুকুই শুধু আদর্শ, তাদের ভাব নয়। সেইজন্য বিদ্বান মানুষের জন্য 'অসক্তঃ' (আসক্তিবর্জিত) পদটি এসেছে।

(৯) তৃতীয় অধ্যায়ের বাইশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'ত্রিলোকে আমার করণীয় কোন কর্তব্য নেই, তবুও আমি কর্তব্য-কর্ম করি' ; এবং তেইশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে, 'আমি যদি নিরলস হয়ে কর্তব্য কর্ম না করি, তাহলে লোকে আমার অনুকরণ করে কর্তব্যকর্ম বিমুখ হয়ে অলস হয়ে পড়বে'।

—এর তাৎপর্য এই যে, জ্ঞানী মহাপুরুষদের কোন কর্তব্য না থাকলেও তাঁদের লোকসংগ্রহার্থে এবং লোকমর্যাদা ধরে রাখার জন্য কর্তব্যকর্ম করা উচিত ; কারণ, ভগবান নিজেও নিরলস হয়ে লোকসংগ্রহার্থে তৎপরতাপূর্বক কর্তব্যকর্ম পালন করেন।

(১০) তৃতীয় অধ্যায়ের সাতাশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন সমস্ত ক্রিয়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা সম্পন্ন হয় ; কিন্তু মূর্খব্যক্তি নিজেকে সেইসকল ক্রিয়ার কর্তা বলে মনে করে এবং আঠাশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে, তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ নিজেকে ঐ ক্রিয়ার কর্তা বলে মনে করেন না। সুতরাং মূর্খ ব্যক্তিগণ ক্রিয়ায় আসক্ত হয়ে বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয় আর তত্ত্ববিদ্‌গণ ক্রিয়ায় আসক্ত না হওয়ায় মুক্ত থাকেন।

—এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, জ্ঞানযোগী সাধক যেন নিজেকে কোন ক্রিয়ার কর্তা বলে মনে না করেন ; প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতিতে হয়ে থাকে। আত্মা সর্বদাই অকর্তা। আত্মাতে কর্তৃত্বভাব কখনো হয় নি, হয় না এবং হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সংসারে মোহগ্রস্ত, সে আত্মাকে কর্তা বলে মেনে নেয় আর যে সম্যক্ রূপে জানে, সে আত্মাকে কর্তা মনে করে না।

(১১) তৃতীয় অধ্যায়ের আঠাশ সংখ্যক শ্লোকে 'গুণই গুণের মধ্যে আবর্তিত হয়', এই বলে গুণগুলিকেই কর্তা বলে উল্লেখ করেছেন ; এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোকে গুণভিন্ন অন্য কেউ কর্তা নয়—এরূপ বলেছেন।

—এর তাৎপর্য এই যে, গুণ-ই কর্তা, স্বয়ং আত্মা নয় অর্থাৎ সমস্ত ক্রিয়া গুণের দ্বারা গুণগুলির মধ্যেই সম্পন্ন হয়, স্বয়ং অর্থাৎ আত্মার দ্বারা নয় এবং আত্মাতেও নয়।

(১২) তৃতীয় অধ্যায়ের একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিবর্জিত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক আমার মতের অনুসরণ করে, সে সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়' এবং বত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন, 'যে দোষদৃষ্টিপূর্বক আমার মতের অনুসরণ করে না, তার পতন হয়।'

—এর অর্থ হ'ল মনুষ্যমাত্রেরই উচিত নিজ উদ্ধারের জন্য দোষদৃষ্টি বর্জিত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক নিষ্কামভাবে ভগবানের কথা (মত) অনুসারে চলা।

(১৩) চতুর্থ অধ্যায়ের উনচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে উল্লেখিত হয়েছে যে, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন এবং চল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি সংশয়াকুল হয় অর্থাৎ তার জ্ঞান হয় না।

—এর তাৎপর্য এই যে, যা ইন্দ্রিয়াদি বা অন্তঃকরণ-গম্য নয় সেই পরমাত্মার উপর শ্রদ্ধা রাখা উচিত ; কারণ, তাঁকে প্রাপ্তির মুখ্য সাধনাই হল শ্রদ্ধা।

(১৪) পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যে সাংখ্য এবং কর্মযোগের ফলকে পৃথক্ পৃথক্ বলে মনে করে সে ছেলেমানুষ অর্থাৎ অবুঝ এবং পঞ্চম শ্লোকে বলেছেন যে, সাংখ্য ও কর্মযোগের ফলকে যিনি একরূপে দেখেন তিনি যথার্থদর্শী অর্থাৎ তিনি পণ্ডিত।

—এর তাৎপর্য হল যে, সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ—এই দুটির পদ্ধতি পৃথক্ পৃথক্ হলেও ফলপ্রাপ্তিতে দুটিই এক, অর্থাৎ সাংখ্যযোগ দ্বারা যে তত্ত্বলাভ হয়, সেই তত্ত্বেরই কর্মযোগেও প্রাপ্তি ঘটে।

(১৫) পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান বলেছেন যে, কর্মযোগী কর্মফল ত্যাগ পূর্বক কর্ম সম্পাদন করে শাশ্বত শান্তি লাভ করে এবং উত্তরার্ধে বলেছেন যে, অ-যোগী (ভোগী) নিজ-স্বার্থের জন্য কর্ম করে এবং বন্ধন প্রাপ্ত হয় ; জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হয়।

—অর্থাৎ মানুষকে সর্বদা যোগী অর্থাৎ কর্মফলত্যাগী হতে হবে। তার কর্মফলভোগী হওয়া উচিত নয়।

(১৬) পঞ্চম অধ্যায়ের উনত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'যে আমাকে সর্ব-কর্মের ভোক্তা এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে মানে, সে পরম শান্তি

লাভ করে' এবং নবম অধ্যায়ের চব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে, 'যে আমাকে সর্ব-কর্মের ভোক্তা ও সর্বলোকের মহেশ্বর বলে মানে না, তার পতন হয়।'

—এর তাৎপর্য এই যে, সমস্ত শুভকর্মের ভোক্তা এবং সমস্ত সংসারের প্রভু হলেন একমাত্র ভগবান। অতএব মানুষ যেন নিজেকে কোন কর্মের ভোক্তা এবং কোন বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির প্রভু বলে না মনে করে, সবকিছুকেই ভগবানেরই বলে যেন মনে করে।

(১৭) ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সংকল্প ত্যাগ না করলে কেউই যোগী হতে পারে না; এবং চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন যে, সর্বসংকল্প ত্যাগকারী মানুষ যোগারূঢ় (যোগী) হয়ে যান।

—এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের নিজের কোন সংকল্প রাখা উচিত নয়, বরং তা ভগবানের সংকল্পের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হয় অর্থাৎ ভগবানের বিধানে পরম সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

(১৮) ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষোল সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন, যার আহার, শয়ন এবং জাগরণ নিয়মিত নয় তার যোগে সিদ্ধিলাভ হয় না; এবং সতের সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে, যার আহার-বিহার, শয়ন-জাগরণ পরিমিত, তার দ্বারাই যোগে সিদ্ধিলাভ হয়।

—এর তাৎপর্য এই যে, সাধকের নিজ জীবন নিয়মিত করে তৈরী করতে হয়; কারণ, যে ইচ্ছামত আচরণাদি করে, তার সুখ এবং সিদ্ধি কিছুই লাভ হয় না।

(১৯) ষষ্ঠ অধ্যায়ের ছত্রিশ সংখ্যক শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান বলেছেন যে, যার মন সংযত নয়, তার দ্বারা যোগ দুষ্প্রাপ্য এবং উত্তরার্ধে বলেছেন যে, যার মন নিজ বশীভূত, তার দ্বারা যোগ সহজলভ্য হয়।

—অর্থাৎ মানুষের নিজ ইন্দ্রিয়াদি ও মনকে অবশ্যই বশ করতে হয়, ঐগুলির বশীভূত হওয়া মানুষের উচিত নয়।

(২০) নবম অধ্যায়ের চব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'যে আমাকে তত্ত্বতঃ জানে না, তার পতন হয়' এবং একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন, 'আমার ভক্তের কখনো পতন হয় না'।

—এর তাৎপর্য এই যে, সকামভাবসম্পন্ন মানুষ যত বড় শুভকর্মই করুক না কেন সে যদি ভগবানে বিমুখ থাকে, তবে তার পতন ঘটে; কিন্তু অতিদুরাচার ব্যক্তিও যদি ভগবদ্মুখী (শরণাগত) হয়, তাহলে তার পতন হয় না।

(২১) একাদশ অধ্যায়ের তিপ্পান্ন সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'বেদাধ্যয়ন, দান বা তপের দ্বারা আমার দর্শন পাওয়া যায় না' এবং চুয়ান্ন সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে, 'অনন্যভক্তি দ্বারাই আমার দর্শন লাভ সম্ভব'।

—এর তাৎপর্য এই যে, বেদাধ্যয়ন, দান ইত্যাদি শুভকর্মে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে এবং অনন্যভক্তিতে থাকে ভাবের প্রাধান্য। ক্রিয়া সসীম আর ভাব অসীম হয়। ক্রিয়ার আরম্ভ এবং শেষ আছে, কিন্তু ভাব আদি-অন্তহীন, অনন্ত। জীব নিত্য, ভগবানও নিত্য; অতএব নিত্যের প্রতি যে ভাব হয়, তা নিত্যই হয়। সেইজন্যই মানুষ ক্রিয়া দ্বারা ভগবানের দর্শন পায় না, বরং ভাব (অনন্যভক্তি) দ্বারাই ভগবানের দর্শন লাভ করতে পারে, তাঁকে প্রাপ্ত হতে পারে। যদি যজ্ঞ, দান ইত্যাদিতেও ভাবের প্রাধান্য হয়, তবে সেই ক্রিয়াগুলিও ভক্তিতে পরিণত হবে। ভগবান ভাবগ্রাহী, ক্রিয়াগ্রাহী নন— 'ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ'; অতএব ভগবানের দর্শন ভাব দ্বারাই পাওয়া সম্ভব, ক্রিয়া দ্বারা নয়।

(২২) অষ্টাদশ অধ্যায়ের আটান্ন সংখ্যক শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান বলেছেন যে, 'যদি (আমার আদেশানুযায়ী) তুমি আমাতে চিত্ত রাখ, তবে আমার কৃপায় তুমি সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করবে' এবং উত্তরার্ধে বলেছেন, 'যদি তুমি অহংকারবশতঃ আমার কথা (আদেশ) না শোন, তবে পতন হবে'।

—এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ভগবানের আশ্রিত হলে উদ্ধার প্রাপ্তি হয় এবং তাঁর থেকে বিমুখ হলে পতন হয়। অতএব সাধকের উচিত সে যেন ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে, অহংকারে মত্ত না হয়।

♠ ♠ ♠

(৮৫) গীতায় কথিত পরস্পর-বিরোধী পদের তাৎপর্য

বস্তুতো ন বিরোধোঽস্তি স্বাল্পবুদ্ধ্যৈব দৃশ্যতে।
তস্মাৎ পদানাং তাৎপর্যং কথ্যতে চ বিরোধিনাম্॥

এই তত্ত্ব শুধুমাত্র শ্রবণ করলেই জানা যায় না (২।২৯) এবং যাঁরা তাঁকে পাবার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে হয়ত কোনও একজন ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানেন (৭।৩)—তা কি করে হয় ?

এই কথা দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এখানে (২।২৯) জ্ঞানযোগের প্রসঙ্গ ; অতএব শোনামাত্রই কেউ নিজ স্বরূপকে জানতে পারে না ; বরং নিজে থেকেই নিজেকে জানা সম্ভব। ওখানে (৭।৩) ভক্তিযোগের প্রসঙ্গ ; সেখানে ভগবানের কৃপায় সাধক ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে।

(২) আমি অজ (অজন্মা) হয়েও জন্মগ্রহণ করি, প্রাণীসকলের ঈশ্বর (প্রভু) হয়েও দাস হই এবং অব্যয়াত্মা হয়েও অন্তর্ধান করি (৪।৬), তবে যে অজ তার আবার জন্ম কী ? প্রভু কী করে দাস হন ? এবং অব্যয় আত্মা কীভাবে অন্তর্ধান করেন ?

এ সমস্তই ভগবানের লীলা। জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর অজত্ব নষ্ট হয় না, বরং যথাবৎ থেকে যায়, ভগবান ভক্তের দাস হলেও তাঁর ঈশ্বরত্ব নষ্ট হয় না। ভগবান যার দাস হন তার ওপরেও তাঁর কর্তৃত্ব যেমন তেমনি থাকে। এইরূপই অব্যয়াত্মা হলেও অন্তর্ধানের লীলা করেন ; ভক্তের প্রেমের উদ্দীপন করতে তিনি অন্তর্ধান করে যান। তাৎপর্য এই যে, এ সমস্তই লীলাপুরুষোত্তমের লীলা। অতএব এতে কোন বিরুদ্ধভাব বা আশ্চর্য হওয়ার ব্যাপার নেই।

(৩) 'আমি চার বর্ণের সৃষ্টি করলেও তুমি আমাকে অকর্তা বলেই জেনো' (৪।১৩), অহলে ভগবান কর্তা হয়েও অকর্তা হন কি করে ?

ভগবান শুধু জগতের ব্যবস্থা করতে এবং নিজ ভক্তদের সেবা করতে এই জগৎসংসার সৃষ্টি করেছেন। এতে ভগবানের নিজস্ব কোন প্রয়োজন বা স্বার্থ নেই। সমস্ত প্রাণীর কর্মবন্ধন কেটে যাক্, সকলে যেন মুক্তিপ্রাপ্ত হয় সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই ভগবান এই জগতের ব্যবস্থা করে থাকেন। ভক্তের ভগবানের সঙ্গে এবং ভগবানের ভক্তের সঙ্গে প্রেমের আদান-প্রদান হয়, উভয়েরই প্রেমের রসাস্বাদন হয়—সেই দৃষ্টিতেই ভগবান এই সৃষ্টি তৈরী করেছেন। সুতরাং জগৎ সৃষ্টি করলেও ভগবান বাস্তবিক পক্ষে অকর্তা থাকেন।

(৪) কর্মে যথাযথভাবে প্রবৃত্ত হলেও অর্থাৎ কর্মে তৎপর হলেও তিনি (কর্মযোগদ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষ) কিছুই করেন না (৪।২০)—তা কি করে হয় ?

যে নিজের মধ্যে কোন অভাব অনুভব করে, যার ভেতরে ফলের ইচ্ছা থাকে এবং যে জড়ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে কার্য করে, সে কর্ম করলেও কর্ম করে এবং কর্ম না করলেও কর্ম করে ; কারণ, তার সম্পর্ক জড়ত্বের সঙ্গে। কিন্তু যে নিজের মধ্যে কিছুমাত্র অভাব অনুভব করে না, যার মধ্যে ফলের ইচ্ছা নেই এবং যে জড়ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেনি, সে কর্ম করলেও কর্ম করে না এবং কর্ম না করলেও কর্ম করে না ; কারণ, তার জড়ত্বের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

(৫) জ্ঞান লাভ হলে অচিরাৎ পরমশান্তিরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় (৪।৩৯), এবং জ্ঞানবান পুরুষ ভগবানের শরণাগত হয় (৭।১৯), জ্ঞান লাভ হলে যখন পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়, তখন আবার শরণাগত হয় কেমন করে ?

জিজ্ঞাসু দুই প্রকারের—(১) যে সংসারের দুঃখে আঘাত পেয়ে তত্ত্ব জানতে অগ্রহী হয়, তত্ত্বজ্ঞান হলে তার দুঃখ দূর হয় এবং পরমশান্তি লাভ হয় এবং (২) যে ভগবৎতত্ত্ব জানার সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎপ্রেম লাভ করতেও ইচ্ছুক থাকে, তার 'সবকিছুই বাসুদেব' এই অনুভূতি লাভের পরও সে ভগবানের শরণাগত থাকে, ভগবৎপ্রেমী হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে দুজনের একই তত্ত্ব অনুভূত হয়, শুধু সাধনপথের ভিন্নতা থাকে।

(৬) দেখা, শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি করলেও এরূপ মনে করা যে, 'আমি কিছুই করি না'

(৫।৮-৯)—তা কেমন করে হয় ?

সাংখ্যযোগীদের এরূপ অনুভব হয় যে প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ই ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে অর্থাৎ সকল ক্রিয়াই ইন্দ্রিয় দ্বারা হচ্ছে। ক্রিয়া প্রকৃতির দ্বারাই হয় ; কারণ ক্রিয়া এবং পদার্থমাত্রই প্রকৃতির। স্বরূপে ক্রিয়াও নেই, পদার্থও নেই। অতএব 'আমি স্বয়ং প্রকৃতির অতীত চিন্ময় তত্ত্ব ; আমার স্বরূপের সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক ছিল না, নেই, হবেও না এবং হওয়া সম্ভবও নয়, তাই আমি কিছুই করি না' এইপ্রকার নিজ স্বরূপের দৃষ্টিতে বলা বাক্য যথাযথ হয়েছে।

(৭) ভগবান কারো পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না (৫।১৫) 'তুমি যা কিছু কর, তা সব আমাকে অর্পণ করে দাও' অর্থাৎ ভগবান সবকিছু গ্রহণ করেন (৯।২৭)—এটি হয় কীভাবে ?

দুটি ভিন্ন প্রসঙ্গে এরূপ বলা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের পনের সংখ্যক শ্লোকে সাধারণ লোকের সম্বন্ধে বলা হয়েছে এবং নবম অধ্যায়ের সাতাশ সংখ্যক শ্লোকে ভক্তদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সাধারণ লোকেরা নিজেই কর্তা ও ভোক্তা হয়ে থাকে অর্থাৎ নিজ কৃতকর্মের ফল নিজেই ভোগ করে, সেইজন্য ভগবান তাদের পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। কিন্তু যারা সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, সেই ভক্তগণ ভগবানকেই সবকিছুর ভোক্তা ও প্রভু বলে মনে করে। সুতরাং তারা ভাবপূর্বক ভগবানে যা কিছু অর্পণ করে, ভগবান তা গ্রহণ করেন। এই ভক্তদের ভাবের কারণেই ভগবান ক্ষুধা, পিপাসা অনুভব করেন (৯।২৬), কারণ তিনি ভাবেরই ভোক্তা।

(৮) কর্মে আসক্ত না হলে মানুষ যোগারূঢ় হয় (৬।৪) ; নিজ নিজ কর্মে তৎপর মানুষ সিদ্ধিলাভ করে (১৮।৪৫)— কেমন করে হয় ?

যোগারূঢ় হওয়া এবং সিদ্ধিলাভ করা—দুটি একই ব্যাপার। কিন্তু কর্মে আসক্তি এবং কর্মে অভিরতি (তৎপরতা) এই দুটি পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার। ফলাকাঙ্ক্ষাপূর্বক অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম করলে কর্মে আসক্তি হয় এবং ভগবানের জন্য কর্ম করলে কর্মে অভিরতি (তৎপরতা) হয়। আসক্তি দ্বারা কর্ম তথা পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয় এবং তৎপরতায় কর্ম তথা পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয় এবং ভগবৎ প্রেম জন্মে, ভগবৎ সম্বন্ধ জেগে ওঠে। অতএব কর্মে তৎপরতা থাকা উচিত, আসক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

(৯) 'অনেকের মধ্যে কোনও একজন তত্ত্বতঃ আমাকে জানতে পারে' (৭।৩), 'আমাকে কেউই জানে না' (৭।২৬)—তা কেমন ?

সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে সাধকদের কথা বলা হয়েছে। যে সংসারে বিরাগী হয়ে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, সে ভগবৎকৃপায় তাঁকে জানতে পারে। সপ্তম অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে সাধারণ লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে আবর্তিত হচ্ছে। ভগবান তাদের জানলেও তারা নিজেদের মূঢ়তার জন্য ভগবানকে জানতে পারে না। এর তাৎপর্য এই যে উপরিউক্ত দুটি শ্লোকে দুই ধরণের কথা, সাধক ও অসাধকদের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে অর্থাৎ তৃতীয় সংখ্যক শ্লোকে সাধকদের এবং ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে অসাধকদের কথা বলা হয়েছে।

(১০) 'যত্ন (ভজনা) করেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে কোনও একজন আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে' (৭।৩) 'ভক্ত আমাকে সমস্ত প্রাণীর আদি জেনে আমার ভজনা করে' (৯।১৩), —না জানলে ভজনা কীভাবে করে এবং ভজন-পূজন না করে জানতে পারে কীভাবে ?

সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানবার বিষয় আছে। তাঁকে জানা ভক্তের শক্তির দ্বারা সম্ভব নয়, বরং ভগবৎকৃপাতেই ভক্ত তাঁকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে। নবম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবানকে শ্রদ্ধাভক্তিপূর্বক মানার বিষয়ে বলা হয়েছে অর্থাৎ এখানে শ্রদ্ধাভক্তিপূর্বক মানাই হল জানা। সুতরাং ভগবান সকল প্রাণীর আদি—সেইমত মেনেই তাঁরা ভজনা করে থাকেন।

(১১) 'সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব (পদার্থ, ক্রিয়া ইত্যাদি) আমাতে নেই এবং আমিও সেইসবে নেই' (৭।১২) ; 'সকল প্রাণী সেই পরমাত্মায় স্থিত এবং পরমাত্মা সেই প্রাণী সকলে স্থিত' (৮।২২)—এটি কীভাবে সম্ভব ?

যে সাধকদের দৃষ্টিতে ভগবান ভিন্ন জগৎ-সংসারের আর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, তাঁদের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে যে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব ভগবানে নেই এবং ভগবানও এসবে নেই, কিন্তু সমস্তই ভগবদ্ময় (৭।১২)। কিন্তু যে সাধকদের দৃষ্টিতে জগৎ-সংসারের পৃথক সত্তা থাকে, তাদের জন্য বলা হয়েছে যে সমস্ত প্রাণী পরমাত্মাতে এবং পরমাত্মা সমস্ত প্রাণীতে স্থিত (৮।২২)।

(১২) 'তিন গুণের দ্বারা সব প্রাণীই মোহাচ্ছন্ন হয়' (৭।১৩) ; 'তমোগুণ সর্বপ্রাণীকে মোহাচ্ছন্ন করে' (১৪।৮)— কেমন করে হয় ?

সত্ত্বগুণের স্বরূপ নির্মল, রজোগুণের স্বরূপ রাগাত্মক এবং তমোগুণের স্বরূপ মোহাত্মক বলা হয়। এর তাৎপর্য এই যে, যেখানে তিনগুণের পৃথকত্ব দেখানো হয়েছে, সেখানে তমোগুণের স্বরূপ মোহজনক বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিনগুণই মোহ উৎপন্নকারী। সত্ত্বগুণ জ্ঞান এবং সুখের আসক্তিতে, রজোগুণ কর্মের আসক্তি দ্বারা, তমোগুণ স্বরূপতঃ (কার্যতঃ) মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে (১৪।৬-৮)। সুতরাং যে অতি উচ্চ ব্রহ্মলোকেরও সুখ কামনা করে, সেও গুণের দ্বারা মোহিত হয়।

(১৩) 'যার জ্ঞান মায়া দ্বারা আবৃত হয়েছে, যে আসুরী ভাবকে আশ্রয় করেছে—এরূপ দুরাচারী (পাপী) ভগবানের শরণ গ্রহণ করে না' (৭।১৫) ; আবার অত্যন্ত পাপী ব্যক্তিও ভগবানের শরণাগত হয় (৯।৩০)—তা কি করে সম্ভব ?

যারা বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, ভগবান এবং তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধগামী, যারা দুর্গুণ-দুরাচারী, এরূপ মানুষ স্বাভাবিকভাবে ভগবদ্মুখী হয় না বা তাঁর শরণ নেয় না। কিন্তু তারাও কোন কারণবশতঃ অর্থাৎ কোন মহাপুরুষের কৃপায়, কোন স্থান বা তীর্থের প্রভাবে, পূর্বজন্মকৃত কোন পুণ্যের ফলে অথবা কোন বিপত্তিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ভগবানের শরণাগত হতে পারে। এর তাৎপর্য এই যে, সাধারণতঃ পাপী ব্যক্তি ভগবানের শরণাগত না হলেও (৭।১৫) কোন বিশেষ কারণে তারাও ভগবানের শরণাগত হতে পারে (৯।৩০)।

(১৪) পরমাত্মা অচিন্ত্যস্বরূপ—'অচিন্ত্যম্', তাঁকে যে চিন্তা (স্মরণ) করে—'অনুস্মরেৎ' (৮।৯)। অতএব যিনি অচিন্ত্যস্বরূপ তাঁর আবার চিন্তন কীরূপে ? আর যাঁর চিন্তন (চিন্তা) করা যায়, তিনি অচিন্ত্য হন কীভাবে ?

পরমাত্মা যদিও চিন্তার বিষয় নয়, তবুও তিলমাত্র স্থানেও তিনি নেই—তাও নয়। পরমাত্মা ভাবরূপে সর্বত্র পরিপূর্ণ। সুতরাং 'এই পরমাত্মতত্ত্ব অচিন্ত্য'—এইরূপ দৃঢ় ধারণা রাখাই হল পরমাত্মাকে চিন্তা করা। তাৎপর্য এই যে যদিও পরমাত্মা চিন্তার বিষয় নয়, তবুও চিন্তাকারী ব্যক্তি এই তত্ত্বকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে পারে।

(১৫) এই সমস্ত জগৎ সংসার আমাতে অব্যক্তরূপে ব্যাপ্ত এবং সমস্ত প্রাণী আমাতে স্থিত ; কিন্তু আমি তাতে স্থিত নই এবং এইসব প্রাণীও আমাতে স্থিত নয়, (৯।৪-৫)—তা কি করে সম্ভব ?

যেখানে প্রাণীদের পৃথক্ সত্তা মানা হয়, সেখানে সব প্রাণীতে ভগবান আছেন এবং সব প্রাণীও ভগবানে আছে। কিন্তু যেখানে প্রাণীদের, জগৎ-সংসারের পৃথক্ সত্তা মানা হয় না সেখানে ভগবান প্রাণিগণে স্থিত নয় এবং প্রাণিগণও ভগবানে স্থিত নয়, কিন্তু সমস্তই ভগবান।

(১৬) 'আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছি' (৯।৪) ; 'ভক্ত ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদি যা কিছু অর্পণ করে তা সব আমি গ্রহণ করি' (৯।২৬) ; যিনি অব্যক্ত, তাঁর আবার খাওয়া-দাওয়া কি ? আর যিনি খাওয়া-দাওয়া করেন, তিনি অব্যক্ত হন কীভাবে ?

'পৃথিবী' স্থূলরূপে ব্যক্ত এবং গন্ধরূপে অব্যক্ত। 'জল' নদী, শিশির, বরফ ইত্যাদি রূপে ব্যক্ত এবং পরমাণুরূপে (আকাশে স্থিত অবস্থায়) অব্যক্ত। 'তেজ' সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিরূপে ব্যক্ত এবং দেশলাই কাঠ ইত্যাদিতে অব্যক্ত। এইপ্রকার যখন পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি ভৌতিক পদার্থও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত—দুই হতে পারে, তাহলে ভগবান যে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি ? এর তাৎপর্য এই যে, ভগবান অব্যক্তরূপে সর্বত্র ব্যাপক রূপেও আছেন এবং ভক্তের ভাব অনুসারে ব্যক্ত রূপেও আছেন ; কারণ ভগবানের বিধান হল—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব

ভজাম্যহম্' (৪।১১)।

(১৭) 'ভগবান সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত' (৯।৪) ; 'ভগবান সকল প্রাণীর হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে অবস্থিত' (১৫।১৫) ; তাহলে যিনি সর্বব্যাপক তিনি একটি হৃদয়ে কীভাবে স্থিত হতে পারেন ?

'ভগবান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সমস্ত কিছুতে ওতপ্রোত হয়ে আছেন, কিন্তু সমস্ত স্থানে এবং সমস্ত বস্তুতে ভগবানকে অনুভব করার জন্য হৃদয়ের মতো এতো স্বচ্ছ আর কিছু নেই। হৃদয়ে স্বচ্ছতা এলে তাতে ভগবানকে অনুভব করা যায় এবং হৃদয়ে একবার অনুভূত হলে 'ভগবান সর্বত্র বিরাজমান'—এই অনুভূতি হয়। অর্থাৎ যেমন বিদ্যুৎসংযুক্ত তারে সর্বত্র বিদ্যুৎ থাকলেও বাল্ব ছাড়া তার প্রকাশ হয় না, তেমনি ভগবান ব্যাপ্তিস্বরূপ হলেও হৃদয় ছাড়া তাঁকে অনুভব করা যায় না। এইজন্যই বলা হয়েছে যে ; 'আমি সবার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করি'।

(১৮) 'সৎ এবং অসৎও আমিই (৯।১৯), সেই পরমাত্মাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না' (১৩।১২)—এটি কিরূপে হয় ?

কার্য-কারণরূপে ভগবান যেখানে নিজের বিভূতিগুলি বর্ণনা করেছেন, সেখানে বলেছেন 'সৎ বা অসৎ যা কিছু আছে তা সবই আমি, আমি ছাড়া আর কিছুই নেই'। কিন্তু যেখানে জ্ঞেয় তত্ত্বের বর্ণনা করেছেন সেখানে বলেছেন যে, 'সেই তত্ত্বকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না ; কারণ, সেই তত্ত্বকে কোন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।' এর তাৎপর্য হল সগুণ-দৃষ্টিতে সমস্তই ভগবান ; নির্গুণের দৃষ্টিতে তাঁকে সৎও বলা যায় না বা অসৎও বলা যায় না ; এবং তত্ত্বের দৃষ্টিতে সৎ এবং অসৎও তিনি ও সৎ-অসৎ-এর অতীতও তিনিই—'সদসৎ তৎ পরং যৎ' (১১।৩৭)।

(১৯) 'আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট (পতন) হয় না' (৯।৩১) 'তুমি আমার ভক্ত' (৪।৩) ; এবং 'যদি তুমি আমার কথা না শোন, তবে তোমার পতন হবে' (১৮।৫৮)—তা কি করে সম্ভব ?

যদিও এটি সম্ভব নয় যে ভক্ত ভগবানের কথা শুনবে না, তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করবে, তবুও যদি সে ভগবানের কথা না শোনে তাহলে সে আর ভগবানের ভক্ত থাকে না অর্থাৎ অভক্ত হয়। তখন তার বিনাশ কে রোধ করবে ? অর্থাৎ যতক্ষণ সে ভগবানের ভক্ত, ততক্ষণ তার পতন হতেই পারে না ; কিন্তু ভক্ত-ভাব যখনই সে ত্যাগ করে, তখনই তার পতন হয়।

(২০) 'জন্ম-মৃত্যু-জরা এবং ব্যাধিরূপ দুঃখের কথা বার বার ভাবা উচিত (১৩।৮) আবার কর্তব্য-কর্ম পালনে যারা দুঃখের অনুভব করে এবং যারা শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম-ত্যাগকারী রাজসিক মানুষ তারা ত্যাগের ফল লাভ করেন না (১৮।৮)—তা কি করে হয় ?

এ দুটি প্রসঙ্গই ভিন্ন। ভোগের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু-জরা এবং ব্যাধিরূপ দুঃখ দর্শন বৈরাগ্যের হেতু হয় অর্থাৎ ভোগ করতে থাকলে তার পরিণামে বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয়, শরীর রোগাক্রান্ত হয়। ইহকালে ভয় ও চিন্তা থাকে, পরকালে দুর্দশা হয়—এইভাবে ভোগের মধ্যে দুঃখ দর্শন করলে ভোগে বৈরাগ্য আসে। অতএব ভোগে দুঃখের ভাবনা অবশ্যই রাখা উচিত, কিন্তু কর্তব্য-কর্মে দুঃখের অনুভব করা পতনের কারণ ; সুতরাং কর্তব্য-কর্মে কখনোই দুঃখভাব রাখা উচিত নয়, বরং কর্তব্য-কর্ম উৎসাহপূর্বক তৎপরতার সঙ্গে করা উচিত। এর তাৎপর্য হল ভোগে আসক্তি রাখা উচিত নয় এবং কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

(২১) 'পরমাত্মা "জ্ঞেয়" অর্থাৎ জ্ঞাতব্য (১৩।১২) ; 'পরমাত্মা "অবিজ্ঞেয়" অর্থাৎ জানার বিষয় নয়' (১৩।১৫)—কি করে হয় ?

জানা দু প্রকারের—করণ-নিরপেক্ষ এবং করণ-সাপেক্ষ। যা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি করণ (যন্ত্র) দ্বারা জানতে পারা যায় না, তা করণ-নিরপেক্ষ এবং যা করণাদির দ্বারা জানা যায় তাকে করণ-সাপেক্ষ বলা হয়। পরমাত্মতত্ত্বের যে জ্ঞান তা করণ-নিরপেক্ষ অর্থাৎ তা স্বয়ং অনুভব করা সম্ভব, সেই জন্য তা 'জ্ঞেয়' এবং তা করণাদির দ্বারা গোচরে আসে না, তাই তা 'অবিজ্ঞেয়'।

(২২) 'এই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং তার বিষয়কে প্রকাশ করেন তথা তিনি সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-রহিত হন' (১৩।১৪)—কি করে সম্ভব ?

যেমন এক একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা এক একটি বিষয়ের জ্ঞান হয় কিন্তু পাঁচ ইন্দ্রিয়ের, তার বিষয়সমূহের এবং ঐগুলির এক একটি বিষয়ের কি ভালো বা মন্দ আছে ইত্যাদির জ্ঞান মনের দ্বারা হয় অর্থাৎ মনই পাঁচ ইন্দ্রিয় ও তার বিষয়সমূহকে প্রকাশিত করে। মনের এরূপ জ্ঞান হলেও মনে পাঁচটি ইন্দ্রিয় থাকে না। এরূপই এই পরমাত্মা সবকিছু এবং জগৎসংসার মাত্রকেই প্রকাশিত করলেও তা ইন্দ্রিয়রহিত অর্থাৎ সেই পরমাত্মায় ইন্দ্রিয়সমূহ স্থিত নয়।

(২৩) 'পরমাত্মা আসক্তিবর্জিত' এবং 'তিনি সকলের ভরণ-পোষণকারী' (১৩।১৪)—তা কি করে হয় ?

বাবা-মা যেমন সন্তানের পালন-পোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তবে তা করেন আসক্তিযুক্ত হয়ে। তেমনি ভগবান সকলের ভরণ-পোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন, কিন্তু তা করেন আসক্তিবর্জিত হয়ে। তাৎপর্য এই যে পরমাত্মার কারোর ওপর আসক্তি নেই, সবার উপরেই তাঁর নির্লিপ্ত ভাব থাকে।

(২৪) 'পরমাত্মা সর্বগুণবিবর্জিত' এবং 'সর্বগুণ-ভোক্তা' (১৩।১৪)—তা কি প্রকারে হয় ?

পরমাত্মা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিন গুণকে কার্য সম্পাদনে স্বীকার করেন অর্থাৎ এই তিন গুণ দ্বারাই সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেন, সেইজন্য তাঁকে গুণগুলির ভোক্তা বলা হয়েছে। কিন্তু পরমাত্মার কোন গুণের সঙ্গে কোনরূপ লিপ্ততা নেই, তাই তাঁকে সর্বগুণবিবর্জিত বলা হয়েছে।

(২৫) 'এই পরমাত্মা অত্যন্ত দূরে অবস্থিত আবার অত্যন্ত নিকটে অধিষ্ঠিত' (১৩।১৫)—কেমন করে ?

বিনাশশীল বস্তুর সঞ্চয় এবং সুখভোগ আকাঙ্ক্ষাকারী এবং পরমাত্মা থেকে বিমুখ ব্যক্তিদের থেকে তিনি অত্যন্ত দূরে অবস্থিত, কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্‌মুখী, সবকিছুতে পরমাত্মাকে দর্শন করে, যার জ্ঞানে একমাত্র পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কারো বা নিজেরও পৃথক সত্তা নেই, তার কাছে ভগবান অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত।

(২৬) 'পরমাত্মা স্বরূপতঃ অবিচ্ছিন্ন হলেও সমস্ত প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হন' (১৩।১৬)—তা কিভাবে সম্ভব ?

সোনার তৈরী গহনার যেমন নাম, আকৃতি, ওজন, মূল্য পৃথক্ হলেও ধাতুরূপে সবেতে এক সোনাই বিদ্যমান, তেমনি পরমাত্মতত্ত্ব বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি বহুরূপে বিদ্যমান হলেও তত্ত্বতঃ সবই এক। যেমন মনোরাজ্যে স্থাবর-জঙ্গম, জড়-চেতন ইত্যাদি যা কিছু দৃশ্যমান বস্তু, তা সব এক মন থেকেই সৃষ্ট, সেইরূপই এক পরমাত্মতত্ত্ব সৃষ্টির বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু অনেক রূপে দেখালেও তিনি তত্ত্বতঃ এক।

(২৭) 'প্রকৃতিতে স্থিত পুরুষই ভোক্তা হন' (১৩।২১) ; 'শরীরে স্থিত হলেও পুরুষ ভোক্তা হন না' (১৩।৩১)—তা কি করে সম্ভব ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যে প্রকৃতিতে স্থিত[১] অর্থাৎ যে প্রকৃতি (শরীর) প্রভৃতির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, সে-ই প্রকৃতিজাত গুণের ভোক্তা হয়ে থাকে এবং একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে, যে শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে নিজ স্বরূপে স্থিত হয়েছে, সে শরীরে স্থিত হয়েও ভোক্তা হয় না। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, একুশ সংখ্যক শ্লোকে প্রকৃতি-(শরীরে)র সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পুরুষের কথা বলা হয়েছে এবং একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদকারী পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে।

(২৮) 'প্রকৃতিতে স্থিত (প্রকৃতিস্থ) পুরুষই প্রকৃতিগত গুণগুলির ভোক্তা হয়' (১৩।২১), ধৈর্যবান পুরুষ সুখ এবং দুঃখে সমান অর্থাৎ স্বরূপে স্থিত (স্বস্থঃ) থাকেন (১৪।২৪), তাহলে যিনি প্রকৃতিতে স্থিত তিনি স্বরূপে স্থিত হন কিভাবে ? আবার যিনি স্বরূপে স্থিত, তিনি প্রকৃতিতে স্থিত কিভাবে ?

---

[১]এখানে ব্যষ্টি শরীরে স্থিত থাকাকেই 'প্রকৃতিতে স্থিত' বলা হয়েছে ; কারণ প্রকৃতি অর্থাৎ সমষ্টি শরীরে স্থিত হয়ে কেউ ভোক্তা হতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে পুরুষ প্রকৃতিতে স্থিত হয়ই না বরং স্বতঃ নিজ স্বরূপেই স্থিত থাকে। কিন্তু যখন সে নিজ স্থিতি প্রকৃতিতে অর্থাৎ একটি শরীরে মেনে নেয় অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে অহঙ্কার ও মমত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়, তখন সে কর্তা ও ভোক্তারূপে প্রতীয়মান হয় এবং তার জন্য সুখী ও দুঃখী হয়। তখন শুভ-অশুভ কর্মফল তার ওপর ক্রিয়াশীল হয় এবং সে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু সে যখন নিজ স্থিতি প্রকৃতিতে মনে না করে, তখন তার স্থিতি স্বরূপেই হয় এবং সে কর্তা বা ভোক্তা হয় না, সুখী বা দুঃখী হয় না, শুভ-অশুভ কর্মফল তার ওপর ক্রিয়াশীল হয় না এবং সে জন্ম-মরণ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

(২৯) 'সংসার বৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বদিকে হয়'—**'ঊর্ধ্বমূলম্'** (১৫।১) এবং 'সংসার বৃক্ষের মূল নিম্ন ভাগে বিস্তৃত'—**'অধশ্চ মূলানি'** (১৫।২), তবে একই সংসার-বৃক্ষের ঊর্ধ্বমূল ও অধোমূল কিভাবে হয় ?

ঊর্ধ্বমূল পরমাত্মার বাচক যা হচ্ছে সংসার-বৃক্ষের আধার এবং অধোমূল হচ্ছে তাদাত্ম্য, মমতা ও কামনার বাচক, যার থেকে ঊর্ধ্ব, মধ্য এবং অধোগতিরূপ শাখাবৃন্দ প্রসারিত হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে মানুষের এই তাদাত্ম্য, মমতা ও কামনারূপ মূল ছেদন করে ঊর্ধ্বমূল পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করতে হয়।

(৩০) 'তিনি সম্পূর্ণ প্রাণিকুলকে হত্যা করলেও কাউকে হত্যা করেন না এবং আবদ্ধ হন না' (১৮।১৭) অর্থাৎ ক্রিয়া করলেও তিনি কোন ক্রিয়া করেন না এবং তার ফলভাগী হন না—এটি কি করে সম্ভব ?

অহংকর্তৃত্ব ভাব অর্থাৎ 'আমি করি'—এই ভাব জন্মালেই মানুষ সেই কর্মের কর্তা হয় এবং ফলাকাঙ্ক্ষা থাকায় ফলভাগী হয়ে থাকে। কিন্তু যার মধ্যে অহংকর্তৃত্ব ভাব নেই এবং ফলাকাঙ্ক্ষাও নেই, সে সমস্ত কিছু করলেও কিছুই করে না এবং কর্মের ফলভাগীও হয় না (১৩।৩১)।

(৩১) 'সাত্ত্বিক সুখ আরম্ভে বিষতুল্য এবং পরিণামে অমৃততুল্য' (১৮।৩৭) ; 'রাজস সুখ আরম্ভে অমৃততুল্য ও পরিণামে বিষতুল্য' (১৮।৩৮)—এরূপ কিজন্য হয় ?

প্রকৃতপক্ষে সাত্ত্বিক সুখ অগ্রে বিষতুল্য নয়। মানুষ যখন সাত্ত্বিক সুখের দিকে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার ভোগ, সুখ-আরাম, মান-মর্যাদা ইত্যাদি রাজস সুখ এবং নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ, খেলাধূলা ইত্যাদি তামস সুখ বিষবৎ পরিত্যাজ্য মনে হয়। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখে নিমজ্জিত হলে পরমাত্মা-বিষয়ক বুদ্ধি দ্বারা উৎপন্ন যে সুখ তা অমৃতের ন্যায় হয়। তারই জন্য বলা হয়েছে যে সাত্ত্বিক সুখ আরম্ভে বিষতুল্য ও পরিণামে অমৃততুল্য হয়।

সুখভোগ ও বিষয়ভোগে প্রথম প্রথম সুখ অনুভূত হয়, মজা পাওয়া যায় ; তারই জন্য রাজস সুখ প্রথমে অমৃততুল্য মনে হয়। কিন্তু সুখভোগ ও বিষয়ভোগের পরিণামে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি হ্রাস পায়, বল-বুদ্ধি কমে যায়, শরীর রোগাক্রান্ত হয়, ক্লান্তি আসে, সেইজন্যই রাজসসুখ পরিণামে বিষতুল্য প্রতিভাত হয়।

এর তাৎপর্য এই যে, বুদ্ধিমান মানুষ পরিণামের দিকেই দৃষ্টি রাখে এবং অজ্ঞান (মূর্খ) ব্যক্তি পরিণামের দিকে নজর দেয় না। সুতরাং সাধকদের কর্তব্য পরিণামের দিকে দৃষ্টি রাখা।

(৩২) 'সকল কর্ম পরিত্যাগ করে, আত্মসংযম করে, নির্জন স্থানে অবস্থান করে ধ্যানে নিরত হলে যে তত্ত্ব (পদ) লাভ হয় (১৮।৫১-৫৪), সেই তত্ত্ব সর্বদা যন্ত্রের মত কর্ম করতে থাকলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়'—(১৮।৫৬)—কিভাবে ?

প্রথম কথাটি (১৮।৫১-৫৪-এ) সাংখ্যযোগের এবং তাতে অভ্যাসের প্রাধান্য থাকে ; অতএব তৎপরতাপূর্বক সাধনা করলে সাংখ্যযোগীর তত্ত্ব লাভ হয়। দ্বিতীয় কথাটি (১৮।৫৬এ) ভক্তিযোগ সম্বন্ধে বলা, এতে ভগবানের শরণাগতিই প্রধান ; সুতরাং ভগবানের আশ্রয়গ্রহণকারী ভক্ত ভগবৎকৃপায় শাশ্বত অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়।

(৮৬) গীতায় কথিত সম-পদসমূহের তাৎপর্য

সমানাঃ শ্লোকপাদা হি গীতায়াং সন্তি যত্র চ।
তাৎপর্যং কথ্যতে তেষাং পূর্বাপরপ্রসঙ্গতঃ॥

'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে' (১।২১, ২৪ ; ২।১০)—প্রথমবার অর্জুন ভগবানকে নিজ রথ উভয় সেনার মধ্যভাগে স্থাপন করার জন্য বলেছিলেন (১।২১), দ্বিতীয়বার ভগবান দুই সেনাদলের মধ্যে রথ স্থাপন করেছেন (১।২৪), তৃতীয়বার উভয় সৈন্যদের মধ্যে অর্জুনকে উপদেশ দিলেন (২।১০)। এইরূপ তিনটি ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি ছিল। 'রথ স্থাপন কর'—কথাটি বলার সময় অর্জুনের ভাব অন্যপ্রকার ছিল অর্থাৎ তিনি নিজেকে রথী এবং ভগবানকে সারথি বলে মনে করতেন ; দু'পক্ষের সেনাদলের মধ্যে রথ স্থাপন করে ভগবান বলেছেন যে, 'এই কুরুবংশীয়দের দেখ', তখন অর্জুনের মধ্যে ভাবের পরিবর্তন হল অর্থাৎ তাঁর মধ্যে পরিজনদের প্রতি মোহ জাগ্রত হল ; এবং ভগবান যখন উপদেশ দিলেন, তখন অর্জুনের মধ্যে একটি বিশেষ ভাব জাগ্রত হল অর্থাৎ নিজেকে শিষ্য মনে করে তিনি উপদেশ শুনতে লাগলেন।

(২) **'কুলক্ষয়কৃতং দোষম্'** (১।৩৮, ৩৯)—এই পদটি কুলক্ষয়জনিত দোষের প্রতি লক্ষ্য করার এবং না করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে ব্যক্তি লোভের পরবশ হয় এবং লোভে যার কর্তব্য-অকর্তব্য বুদ্ধি ভ্রংশ হয় সে নিজের আচার-ব্যবহারের দোষ-ত্রুটিগুলি জানতে পারে না। কিন্তু যে লোভের বশবর্তী নয় এবং যার মধ্যে কর্তব্য-অকর্তব্য, ধর্ম-অধর্মের বিবেক-বোধ আছে, সে নিজের আচার-ব্যবহারের দোষ-ত্রুটিগুলি বুঝতে পারে। দুর্যোধনাদির হৃদয়ে রাজ্যের প্রতি লোভ থাকায় কুলনাশের দোষ-ত্রুটিগুলি নজরে পড়েনি ; কিন্তু পাণ্ডবগণ রাজ্যলোভে অন্ধ না হওয়ায় তাঁরা কুলনাশঘটিত দোষগুলি স্পষ্টভাবে অনুমান করতে পেরেছিলেন। এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের কখনো লোভের বশীভূত হওয়া উচিত নয়।

(৩) **'যেন সর্বমিদং ততম্'** (২।১৭ ; ৮।২২ ; ১৮।৪৬)—প্রথমবারে শরীরী (জীবাত্মা)-র সর্বব্যাপকতা জানিয়েছেন (২।১৭) এবং অপর দুটি ক্ষেত্রে পরমাত্মার সর্বব্যাপকতার কথা বলেছেন (৮।২২ ; ১৮।৪৬)। এর তাৎপর্য এই যে সাধকের নিজ স্বরূপকেও সর্বত্র ব্যাপক বলে মনে করা উচিত এবং পরমাত্মাকেও সকল দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে ব্যাপক বলে মানা উচিত। তাহলে তাঁর সাধনা শীঘ্রই ফলীভূত হয়।

(৪) **'ন ত্বং শোচিতুমর্হসি'** (২।২৭, ৩০)—দুই পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে নিজ আত্মীয়-স্বজনকে দেখে অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হলেন ; সেইজন্য ভগবান তাঁকে বারংবার সচেতন (সজাগ) করেছেন। লৌকিক দৃষ্টিতে দেখলেও, যার জন্ম হয় তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং যার মৃত্যু হয় তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী—এই নিয়মের অন্যথা না হওয়ার ফলেও শোক হতে পারে না (২।২৭)। চেতন তত্ত্বের দৃষ্টিতে আত্মার কখনও বিনাশ হয় না, সুতরাং তার জন্য শোক করাই উচিত নয় (২।৩০)। অর্থাৎ শরীর এবং শরীরী—কারো জন্যই শোক করা উচিত নয়।

(৫) **'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ'** (২।৪১,৪৪)—যার অন্তরে সংসারের গুরুত্ব থাকে না, তার ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি হয় (২।৪১) এবং যার অন্তরে সংসার এবং ভোগের প্রতি গুরুত্ববুদ্ধি (আসক্তি) থাকে তার ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি হয় না (২।৪৪)। এর তাৎপর্য হল নিষ্কাম ব্যক্তির বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয় কিন্তু সকাম ব্যক্তি অস্থির বুদ্ধিযুক্ত হয়।

(৬) **'তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'** (২।৫৭, ৬১)—এই পদটি দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতান্ন সংখ্যক শ্লোকে সিদ্ধ কর্মযোগীর জন্য এবং একষট্টি সংখ্যক শ্লোকে কর্মযোগী সাধকের জন্য প্রযোজ্য হয়েছে। সাধকের বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) প্রতিষ্ঠিত (স্থির) হয়ে যায়। প্রজ্ঞা স্থির হলে সেই সাধককে সিদ্ধরূপে মান্য করা উচিত। গীতায় সিদ্ধকে মহাত্মারূপেও উল্লেখ করা হয়েছে (৭।১৯) এবং সাধককেও মহাত্মা বলা হয়েছে (৯।১৩)।

(৭) **'ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'** (২।৫৮, ৬৮)—দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটান্ন সংখ্যক

শ্লোকে নির্জনে বসবাস করে বৃত্তিগুলি সংযম করার বর্ণনা আছে ; সেইজন্য সেখানে **'সংহরতে'** ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়েছে এবং আটষট্টি সংখ্যক শ্লোকে ব্যবহারে অর্থাৎ সাংসারিক কার্য করাকালে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনার কথা বলা হয়েছে ; তারই জন্য এখানে **'নিগৃহীতানি'** পদটি উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ নির্জনে অবস্থানকালে বা সাংসারিক ব্যবহারে সাধকের নিজ ইন্দ্রিয়ের ওপর আধিপত্য থাকা উচিত। নির্জনে থাকাকালীন মানসিক সঙ্কল্প-বিকল্পও হওয়া উচিত নয় এবং (সাংসারিক) ব্যবহারে ইন্দ্রিয়রাজীর বশীভূত হওয়া উচিত নয়, ভোগাসক্তি থাকা উচিত নয় ; তাহলেই সাধকের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি স্থির, দৃঢ় হয়[1]।

(৮) **'যুক্ত আসীত মৎপরঃ'** (২।৬১ ; ৬।১৪)—এই পদগুলি দ্বারা প্রথমবার কর্মযোগে ভগবৎপরায়ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে (২।৬১) এবং দ্বিতীয়বার ধ্যানযোগে ভগবৎপরায়ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে (৬।১৪)। কর্মযোগেও ভগবৎপরায়ণ হওয়ার প্রয়োজন আছে ; কারণ ভগবৎপরায়ণ হলে কর্মযোগে শীঘ্রই বিশেষভাবে সিদ্ধিলাভ হয়। সেইরূপে ধ্যানযোগেও ভগবৎপরায়ণ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে ; কারণ ধ্যানযোগে ভগবৎপরায়ণতা না থাকলে সকামভাবের জন্য সিদ্ধি প্রকট হলেও মুক্তিলাভ সম্ভব নয়।

(৯) **'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ'** (২।৭১ ; ১২।১৩)—এই পদটি একবার কর্মযোগীর জন্য উদ্ধৃত হয়েছে (২।৭১), দ্বিতীয়বার ভক্তিযোগীর জন্য বলা হয়েছে (১২।১৩)। কর্মযোগী শুধু নিজের কর্তব্য মনে করে কামনা ও আসক্তি বর্জিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করে, অতঃপর সে অহং ও মমত্বশূন্য হয়ে যায়। ভক্তিযোগী সর্বতোভাবে ভগবানে সমর্পিত হয়ে যায়, সুতরাং তার আর অহং-মমত্ব ভাব থাকে না। অর্থাৎ কামনা-আসক্তিরহিত হওয়ায় যে স্থিতি লাভ হয়, ভগবানে সমর্পিত চিত্ত হলেও সেই স্থিতি লাভ হয়। অর্থাৎ দু-পথেই অহং ও মমত্ব দূর হয়।

(১০) **'মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ'** (৩।২৩ ; ৪।১১)—'আমি কর্ম না করলে সকল ব্যক্তিই আমার পথ অনুসরণ করবে অর্থাৎ তারাও কর্ম ত্যাগ করবে, ফলে নিজ কর্তব্য হতে চ্যুত হবে' (৩।২৩)—এইরূপে ভগবান কর্মযোগের কথা আলোচনা করলেন ; এবং 'যে যেমনভাবে আমার শরণ নেয়, আমি তার সঙ্গে সেইভাবেই প্রেমপূর্বক ব্যবহার করি ; আমার এই প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের প্রভাবে অন্যান্য মানুষও অপরের সঙ্গে এইরূপ যথাযোগ্য প্রেম ও প্রীতিপূর্ণ আচরণ করবে'—এইরূপে তিনি ভক্তিযোগের কথা বললেন। অর্থাৎ ভগবান কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ—দুইয়েতেই আদর্শস্বরূপ।

(১১) **'যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ'** (৪।১৬ ; ৯।১)—চতুর্থ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে এই পদটির দ্বারা কর্মযোগের বিষয়ে বলেছেন যে, 'কর্মের তত্ত্ব জানলে তুমি অশুভ সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হবে ; এবং নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে এই পদের দ্বারা ভক্তিযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, তাঁহা হতেই সমস্ত জগৎ-সংসার উৎপন্ন হয়েছে, তাঁতেই অবস্থিত এবং তাঁতেই লীন হয় তথা সমস্ত কিছুই ভগবৎ-স্বরূপ, ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই—'এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে জানলে অর্থাৎ অনুভব করলে তুমি অশুভ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।' অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে নিষ্কামভাব প্রাধান্য পেয়েছে এবং নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সর্বত্র ভগবানকে অবলোকন করার ব্যাপারটি প্রাধান্য পেয়েছে। কর্মের তত্ত্ব জেনে নিষ্কামভাবে কর্ম করলে জড়ত্ব দূর হয় এবং চিন্ময়তা আসে (৪।১৬), তথা চিন্ময় ভগবানকে জানলে চিন্ময়তা আসে এবং জড়ত্ব দূর হয়।

(১৩) **'(কর্ম) কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্'** (৪।২১ ; ১৮।৪৭)—শুধু শরীরনির্বাহ করার জন্য কর্ম করলেও

---

[1]চতুর্থ অধ্যায়ের ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে নির্জনে ইন্দ্রিয় সংযম করাকেই 'শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি' পদ দ্বারা 'সংযমরূপ যজ্ঞ'-এর কথা বলা হয়েছে এবং ব্যবহারাদিতে সংযমেই 'শব্দাদীন্বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি' পদ দ্বারা 'বিষয়হবনরূপ যজ্ঞ' নামে বলা হয়েছে অর্থাৎ ব্যবহারাদিতে বিষয় সেবন করলেও বিষয়াদিতে ভোগ বুদ্ধি (আসক্তি-দ্বেষ) যেন না হয়।

পাপ হয় না (৪।২১) এবং নিজ কর্তব্য (স্বধর্ম) পালন করলেও পাপ হয় না (১৮।৪৭)। এর তাৎপর্য এই যে, সাধকের মধ্যে যে বিশেষত্ব প্রকাশ পায় তা একনিষ্ঠ বুদ্ধির ফলেই হয়। ভোগ ও সংগ্রহের আসক্তি একনিষ্ঠ বুদ্ধি হওয়ার পথে বাধাস্বরূপ। সেইজন্য ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক শ্লোকে শরীর-নির্বাহ অর্থাৎ বিষয়াদিতে ভোগবুদ্ধি না করার কথা বলেছেন। সঞ্চয়ের লোভে মানুষের কর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞান থাকে না ; সেইজন্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাতচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে অকর্তব্য ত্যাগ করে সাবধানতাপূর্বক কর্তব্য-কর্ম পালনের জন্য বলা হয়েছে।

(১৪) **'(কর্মাণি) নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়'** (৪।৪১ ; ৯।৯) —চতুর্থ অধ্যায়ের একচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে এই পদটি কর্মযোগীর জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ কর্ম করলেও কর্মযোগীর কর্ম এবং কর্মফলের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে না ; সুতরাং তাকে কর্ম বন্ধনে ফেলতে পারে না। নবম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে এই পদটি ভগবানের জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভগবান সৃষ্টি আদি রচনা করেন, কিন্তু তিনি এই সকল কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না ; কারণ ভগবানে কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি হয়ই না (৪।১৩-১৪)।

(১৫) **'যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'** (৫।৫ ; ১৩।২৭)— প্রথমবার পদটি সাধনার বিষয়ে উক্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার এটি সাধ্য (পরমাত্মা)-র বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—এই দুই সাধন-পথেই ঈশ্বর-লাভ হয়, এর মধ্যে কোনটিই ছোট বা বড় নয়, দুই-ই সমান—যে এরূপ দেখে, সেই ঠিক দেখে (৫।৫), যে পরমাত্মাকে সর্বত্র সমানরূপে ব্যাপৃত দেখে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে ঠিক দেখে (১৩।২৭)। এর তাৎপর্য এই যে সাধনগুলির মধ্যে পার্থক্য মানা উচিত নয়। সাধন ও সাধ্যকে ছোট-বড় মনে করা উচিত নয় অর্থাৎ সাধনে যেন ছোট-বড় ভাব না আসে এবং সাধ্যতেও ছোট-বড় ভাব না হয়। দুটিকেই পূর্ণ বলে মানা উচিত।

(১৬) **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (৫।২৫ ; ১২।৪)— এই পদটি দু'বারই সাংখ্যযোগের বর্ণনায় উক্ত হয়েছে ; পঞ্চম অধ্যায়ের পঁচিশ সংখ্যক শ্লোকে এই পদ দ্বারা নির্বাণ-ব্রহ্ম অর্থাৎ নির্গুণ-নিরাকারের প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এই পদটির দ্বারা 'মাম্' অর্থাৎ সগুণ-সাকারের প্রাপ্তি বলা হয়েছে। অর্থাৎ সাংখ্যযোগী নির্গুণ প্রাপ্তি করতে ইচ্ছুক হোক বা সগুণ প্রাপ্তি করতে ইচ্ছুক হোক তার কিন্তু সমস্ত প্রাণীর হিতে প্রবৃত্ত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ অপরের প্রতি মঙ্গলের চিন্তা থাকলে জড় পদার্থের (বিষয়ের) আসক্তি ত্যাগ সহজে হয়ে যায়। সাংখ্যযোগী (জ্ঞানমার্গী) প্রায়শঃই সংসার থেকে অসংলগ্ন থাকেন, তাই তাঁর শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয় না ; কিন্তু প্রাণিমাত্রের প্রতি হিতের মনোভাব থাকলে তার শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়।

(১৭) **'যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী'** (৬।১৫, ২৮)—এই পদটি ষষ্ঠ অধ্যায়ের পনেরো সংখ্যক শ্লোকে সগুণ-সাকারের ধ্যানের বিষয়ে এবং আটাশ সংখ্যক শ্লোকে নির্গুণ-নিরাকারের ধ্যানের বিষয়ে উক্ত। পনেরো সংখ্যক শ্লোকে নির্বাণরূপ পরমা শান্তির কথা বলা হয়েছে এবং আটাশ সংখ্যক শ্লোকে নিরতিশয় সুখ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ধ্যান সগুণেরই করা যাক বা নির্গুণের—দুইয়েতে একই তত্ত্বের প্রাপ্তি ঘটে।

(১৮) **'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু'** (৬।৭, ১২।১৮)— এই পদটি ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে সিদ্ধ কর্মযোগীর লক্ষণগুলিতে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের আঠারো সংখ্যক শ্লোকে ভক্তদের লক্ষণাদিতে উক্ত। এর তাৎপর্য হ'ল শীত-উষ্ণ (অনুকূলতা-প্রতিকূলতা) এবং সুখ-দুঃখে কর্মযোগীও প্রশান্ত (নির্বিকার) থাকেন এবং ভক্তিযোগীও সম (নির্বিকার) থাকেন।

(১৯) **'তথা মানাপমানয়োঃ'** (৬।৭ ; ১২।১৮)— এই পদটি ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে সিদ্ধ কর্মযোগীর লক্ষণগুলিতে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের আঠারো সংখ্যক শ্লোকে সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে। এই দু'প্রকার সিদ্ধদের মান ও অপমানে সমভাবে থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু সাধকদের এবিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হয়[1]। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে,

[1]সিদ্ধ জ্ঞানযোগীদের জন্যও 'মানাপমানয়োস্তুল্যঃ' (১৪।২৫) পদটি ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ তাঁরাও মান এবং অপমানে স্বাভাবিক সমভাবে থাকেন।

সাংসারিক আসক্তি দ্বারা তো পতন হয়ই, উপরন্তু মান-অপমান বড় বড় সাধকদেরও বিচলিত করে দেয়। সুতরাং সাধকদের মান ও অপমানের বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধানে থাকা উচিত যেন তাঁরা শরীর ইত্যাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন না করেন ; কারণ, শরীরাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই মান-অপমানের প্রভাব পড়ে।

(২০) **'সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ'** (৬।৮ ; ১৪।২৪)—এই পদটি ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে সিদ্ধ কর্মযোগীদের জন্য বলা হয়েছে এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের চব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে সিদ্ধ সাংখ্যযোগীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কর্মযোগী এবং সাংখ্যযোগী—উভয়ের একই স্থিতি লাভ হয় (৫।৫)।

(২১) **'সর্বথা বর্তমানোঽপি'** (৬।৩১ ; ১৩।২৩)—এই পদটি ষষ্ঠ অধ্যায়ের একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভক্তিযোগীর সম্পর্কে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের তেইশ সংখ্যক শ্লোকে সাংখ্যযোগীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ভগবানের সঙ্গে আপনভাব হলে ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সান্নিধ্যে থাকে (৬।৩১)। প্রকৃতি এবং পুরুষের পৃথকত্ব ঠিক ঠিক অনুভব হলে সাংখ্যযোগীর পুনরায় জন্ম হয় না (১৩।২৩)। অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন অথবা প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ—দুইয়ের একই পরিণাম হয়।

(২২) **'ততো যাতি পরাং গতিম্'** (৬।৪৫ ; ১৩।২৮ ; ১৬।২২)—সাধনায় যে তৎপর হয়েছে, নিজ লক্ষ্যে যে অবিচলিত, তার উদ্ধার প্রাপ্তিতে কখনো সন্দেহ করা উচিত নয়। কোন কারণবশতঃ তাকে যদি পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় তাহলে যোগভ্রষ্টজনিত সেই জন্মে উদ্ধার হবেই (৬।৪৫)। বিনাশশীল দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা ইত্যাদিতে সমরূপে স্থিত এক পরমাত্মাকেই যে দেখে সে পরমগতি লাভ করে (১৩।২৮)। কাম, ক্রোধ এবং লোভ—তিনটির মধ্যে কামই (কামনা) পতনকারী রূপে গণ্য হয় ; কারণ, কাম (কামনা) দ্বারাই লোভ উৎপন্ন হয়। কামনা-মুক্ত ব্যক্তি পরমগতি প্রাপ্ত হয় (১৬-২২)। এইভাবে ভগবান কামনা ত্যাগ করা ও সর্বত্র পরমাত্মাকে দর্শন করা—এই দুই সাধন প্রণালীর কথা বলেছেন তথা সাধননিষ্ঠ ব্যক্তির পরমগতি লাভের কথা বলেছেন।

(২৩) **'(অস্মি) তেজস্তেজস্বিনামহম্'** (৭।১০ ; ১০।৩৬)—এই পদ দ্বারা সপ্তম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে কারণরূপে দীপ্তির বর্ণনা করা হয়েছে যা ভগবান থেকে উৎপন্ন এবং দশম অধ্যায়ের ছত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে কার্যরূপে দীপ্তির বর্ণনা করা হয়েছে যা সংসারে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ মূল (ভগবান)-এর দিকে দৃষ্টি ফেরাবার জন্য কারণরূপ দীপ্তির বর্ণনা করা হয়েছে এবং জগৎসংসারে যে দীপ্তি (প্রভাব) দেখা যায়, তাতে ভগবদ্-বুদ্ধি করানোর জন্য কার্যরূপে (বিভূতিরূপে) দীপ্তির বর্ণনা করা হয়েছে।

(২৪) **'পরং ভাবমজানন্তো মম'** (৭।২৪ ; ৯।১১)—সপ্তম অধ্যায়ের চব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যারা কামনাপূরণের উদ্দেশ্যে দেবতাদের উপাসনা করে এবং ভগবানের পরম অবিনাশী ভাব না জেনে তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তারা বুদ্ধিহীন। নবম অধ্যায়ের এগারো সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে, আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী প্রকৃতির মানুষেরা ভগবানকে অবিনাশী এবং সমস্ত প্রাণীদের মহান ঈশ্বর রূপে না জেনে তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবহেলা করে। এর তাৎপর্য এই যে সপ্তম অধ্যায়ের চব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত ব্যক্তিরা ভগবানকে সাধারণ মানুষ ভেবে উপেক্ষা করে এবং নবম অধ্যায়ের এগারো সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত ব্যক্তিরা ভগবানকে সাধারণ মানুষ মনে করে তাঁকে অশ্রদ্ধা করে। পূর্বে উল্লিখিত স্থানে উপেক্ষা ছিল প্রধান ব্যাপার এবং এখানে অশ্রদ্ধাই হচ্ছে মুখ্য ব্যাপার।

পরম ভাব দুই প্রকারের হয়—প্রথমতঃ, তিনি অবিনাশী ও উত্তম এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি সবার ঈশ্বর (প্রভু) এবং শাসক। এটি জানাবার জন্যই ভগবান দুই স্থানে (৭।২৪ এবং ৯।১১ পদেতে) **'পরং ভাব'** কথাটি প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ এই পদ দ্বারা প্রথমে নিজেকে অবিনাশী (জন্ম-মরণরহিত) বলে জানিয়েছেন (৭।২৪), দ্বিতীয়বার নিজেকে সকলের স্বামী (প্রভু) ও শাসক বলে জানিয়েছেন (৯।১১)—এই দু'টি ভাবের

সমন্বয় হলে তবেই পরমভাব পূর্ণ হয়। এই পরম ভাব যারা জানে না, তারা বুদ্ধিহীন, মূঢ়।

(২৫) **'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু'** (৮।৭, ২৭)— অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে ; কারণ, যুদ্ধ বা কর্তব্যকর্ম তো সব সময় করা সম্ভব হয় না কিন্তু ভগবৎস্মরণ সর্বক্ষণই সম্ভব। সাতাশ সংখ্যক শ্লোকে অনুকূল-প্রতিকূল দেশ-কাল-বস্তু-ব্যক্তি-ঘটনা-পরিস্থিতি ইত্যাদিতে সম ভাব থাকার কথা বলা হয়েছে, যার তাৎপর্য হল অনুকূলতা-প্রতিকূলতায় রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি হওয়া উচিত নয়, সব অবস্থায় সমভাবে থাকা উচিত। সমতা পরমাত্মার স্বরূপ ; অতএব সমরূপ পরমাত্মার আরাধনাও সমতা— **'সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য'** (বিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।৯০)। অর্থাৎ সর্বদা ভগবৎস্মরণ করা হোক বা যোগ অর্থাৎ সমভাবাপন্ন হয়ে সমরূপ পরমাত্মাকে অর্চনা করা হোক, সব একই ব্যাপার।

(২৬) **'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ'** (৮।৭ ; ১২।১৪)— এই পদটি অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে সাধক ভক্তদের জন্য এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে সিদ্ধ ভক্তদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সাধক ভক্ত নিজ মন ও বুদ্ধি ভগবানে অর্পণ করেন, কিন্তু সিদ্ধ ভক্তদের মন ও বুদ্ধি স্বতঃ স্বাভাবিকভাবে ভগবানে অর্পিত থাকে—এই পার্থক্য জানাবার জন্য এই পংক্তিটি দুবার উক্ত হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মানুষের কাছে দুটি শক্তিশালী মাধ্যম আছে—মন ও বুদ্ধি । এই দুইটি মাধ্যম যতক্ষণ জড়-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে রাখে ততক্ষণ স্বয়ং এই মন বুদ্ধির সঙ্গে এক হয়ে জড়ত্বে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন এদুটি ভগবদ্মুখী হয় অর্থাৎ এদের মমত্ব ত্যাগ হয়, তখন স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়।

(২৭) **'ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'** (৮।২১ ; ১৫।৬)—অষ্টম অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক শ্লোকে পরমাত্ম-বিষয়ক বর্ণনার ঐক্য সাধন করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, যাঁকে প্রাপ্ত হলে জীব পুনরায় প্রত্যাবৃত হয় না তাকে পরমধাম বলা হয় ; এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে নিজ মহিমার বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, যে সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করে পরমাত্মার শরণাগত হয় তার পরমগতি লাভ হয়, সেখান থেকে ফিরে আসতে হয় না। অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হোক অথবা পরমাত্মার পরমধামে গমন করুক অর্থাৎ জীবিতকালে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হোক অথবা মৃত্যুর পর পরমাত্মার পরমধামে গমন করুক—দুই একই, এতে কোন পার্থক্য নেই ; কারণ, এই দুইয়েতেই প্রকৃতি এবং তার কার্যের সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ হয়।

(২৮) **'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'** (৯।৫ ; ১১।৮)— 'পশ্য' ক্রিয়াটির দুটি অর্থ, জানা এবং দেখা। নবম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে বুদ্ধি দ্বারা জানবার কথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সবকিছুই ভগবৎস্বরূপ ; এবং একাদশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে বিরাটরূপ দেখার কথা উক্ত হয়েছে। গুরু, মহাপুরুষ ও ভগবান যদি জানিয়ে দেন তবে মানুষ বুদ্ধি দ্বারা জানতে পারে, কিন্তু ভগবানের দিব্য বিরাটরূপ তখনই দেখা সম্ভব যখন ভগবান কৃপা করে নেত্রে দিব্য ভাব প্রদান করেন। এর তাৎপর্য এই যে, নবম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে 'জ্ঞানচক্ষু'র বর্ণনা আছে এবং একাদশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে 'দিব্যচক্ষু'র বর্ণনা আছে।

(২৯) **'নিত্যযুক্তা উপাসতে'** (৯।১৪ ; ১২।২)— নবম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে দৈবী সম্পদের আশ্রয় গ্রহণকারীর সর্বদা ভগবানে একনিষ্ঠ থাকার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবানের জন্য ক্রিয়াশীল তথা ভগবৎপরায়ণকারীর নিত্য-নিরন্তর ভগবানে যুক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, ভগবদুপাসনা দুই প্রকারের হয়—একটিতে সকল কর্ম ভগবৎ-সম্বন্ধীয় হয় এবং অপরটিতে জাগতিক ও ভগবৎ-সম্বন্ধীয়—উভয় প্রকারেরই কর্ম হয়। দুই প্রকার উপাসনাতে ক্রিয়ার পার্থক্য থাকলেও ভাবের কোন ভিন্নতা থাকে না অর্থাৎ ভক্তির সাধনে ক্রিয়াভেদ হতে পারে, কিন্তু ভাবের কোন পার্থক্য হয় না। ভগবৎ-ভাব থাকার জন্য উভয় সাধকই সর্বদা ভগবানে যুক্ত হয়ে থাকেন। দ্বিতীয় ভাব হচ্ছে এই যে, ভগবানের সঙ্গে নিজ বাস্তবিক সম্বন্ধ, তা সে দৈবী সম্পদের আশ্রয়ে জানা হোক বা গীতার একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্ন সংখ্যক শ্লোক

অনুসারে পঞ্চবিধ সাধনের দ্বারা জানা হোক, অতঃপর সাধক সর্বদা ভগবানেই যুক্ত থাকে।

(৩০) **'যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ'** (৯।২৩ ; ১৭।১)—নবম অধ্যায়ের তেইশ সংখ্যক শ্লোকে কামনাযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সদসদ্রূপ ভগবানের অবিধিপূর্বক পূজা করার কথা বলা হয়েছে। সকাম মানুষ নিজ ইষ্টকে ভগবান হতে পৃথক্ বলে মনে করে, তাঁকে ভগবৎ-স্বরূপ বলে মানে না। সেইজন্য তাদের পূজা-অর্চনাদি অবিধিপূর্বক হয়। সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজনকারীদের নিষ্ঠার বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল যে তাঁরা কিরূপ নিষ্ঠা (শ্রদ্ধা)-সম্পন্ন হন ? এর উত্তরে ভগবান সমস্ত প্রাণীদের স্বভাব হতে উৎপন্ন তিন প্রকারের শ্রদ্ধার কথা বলেছেন। এর তাৎপর্য এই যে, নবম অধ্যায়ের তেইশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে, দেবতাদের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি না থাকায় শ্রদ্ধাপূর্বক উপাসনাদি বিধিপূর্বক হয় না আর তাই সে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে ; এবং সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অজ্ঞতাপূর্বক শাস্ত্রবিধি ত্যাগ হলেও লোকেদের মধ্যে যে তিনপ্রকার শ্রদ্ধা থাকে তার কথা বলা হয়েছে। এদের মধ্যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়।

(৩১) **'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু'** (৯।৩৪, ১৮।৬৫)—নবম অধ্যায়ের চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে প্রথমে রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যবিদ্যা এবং ভক্তির অধিকারিগণের বর্ণনা করে তারপরে **'মন্মনা ভব.....'** ইত্যাদি নির্দেশ দিয়েছেন এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঁয়ষট্টি সংখ্যক শ্লোকে প্রথমে গুহ্য, গুহ্যতর এবং সর্বগুহ্যতম কথা জানিয়ে তারপরে 'মন্মনা ভব....' ইত্যাদির নির্দেশ দিয়েছেন। এর তাৎপর্য হিসাবে বলা যায় যে, নবম অধ্যায়ে ভগবান নিজে থেকেই উপদেশ আরম্ভ করেছেন। ভগবানের দিক থেকে কৃপাস্রোত বইছে, কিন্তু অর্জুনের মনে নিজের সাধন ও পুরুষার্থের কিছু অহংকার আছে, সেইজন্য ভগবান বলেছেন—**'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ...... মৎপরায়ণঃ'** (৯।৩৪) 'তুমি আমার ভক্ত হও, মৎপরায়ণ হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। এইভাবে আমার সঙ্গে নিজের মন সমাহিত করে আমার পরায়ণ হলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে।' সুতরাং এখানে ভগবৎ-প্রাপ্তিতে ভগবৎ-পরায়ণতাকেই হেতু বলা হয়েছে এবং অন্য স্থানে (১৮।৬৫ তে) ভগবৎপ্রাপ্তিতে কেবল ভগবৎকৃপাকে হেতু বলা হয়েছে। কারণ, ভগবান প্রথমে (১৮।৫৭ তে) **'মচ্চিত্তঃ সততং ভব'** বলেছেন, কিন্তু তা অর্জুন স্বীকার করেন নি, তাই ভগবান **'অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি'** (১৮।৫৮) বলে অর্জুনকে তিরস্কার করলেন যে, 'তুমি অহংকারের আশ্রয় নিয়ে আমার উপদেশ শুনছ না।' ভগবান যখন পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, 'তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর' (১৮।৬৩), তখন অর্জুন ঘাবড়ে গেলেন। অতএব অর্জুনের মধ্যে পৌরুষের যে অহংকার ছিল, ভগবৎকৃপায় তা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেইজন্যই ভগবান বলেছেন—**'মন্মনা ভব মদ্ভক্ত.....প্রিয়োঽসি মে'** (১৮।৬৫) 'তুমি আমার ভক্ত হও, আমাতে মন রাখ, আমার পূজনকারী হও এবং আমাকে নমস্কার কর। এরূপ করলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে—আমি সত্য-প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলছি ; কারণ, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়'। এর তাৎপর্য হল এই যে, প্রথমে (৯।৩৪এ) অর্জুনের মধ্যে নিজের সামর্থ্যের অহংকার ছিল, যা পরে (১৮।৬৫ তে) দূরীভূত হয়েছে।

(৩২) **'শৃণু মে পরমং বচঃ'** (১০।১; ১৮।৬৪)—এই পদটি দুবারই ভক্তির বিষয়ে কথিত। দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান পরম বাক্য বলে নিজ মহত্ত্ব, প্রভাব, সামর্থ্য, ঐশ্বর্য শোনবার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের চৌষট্টি সংখ্যক শ্লোকে পরম বাক্য বলে তাঁর শরণাগত হওয়ার আদেশ দিলেন। তাৎপর্য এই যে, ভগবান প্রথমে (১০।১এ) নিজে থেকেই উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা অর্জুনের মনোমত হয় নি। কিন্তু পরে (১৮।৬৪ তে) অর্জুন বিশেষভাবে ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন অর্থাৎ কথাটি অর্জুনের মনোমত হয়েছিল।

(৩৩) **'দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ'** (১০।১৬, ১৯)—দশম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে অর্জুন ভগবানের নিকট তাঁর দিব্য বিভূতিগুলি সম্পূর্ণভাবে জানাবার জন্য

অনুরোধ করেছেন এবং উনিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান অর্জুনের অনুরোধ মেনে নিয়ে বলেছেন যে, 'তুমি আমার যে বিভূতিগুলির কথা জানতে চাও, সেগুলি আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করব।' এর তাৎপর্য এই যে, বিভূতি এবং যোগ সম্বন্ধে জেনে ভগবানে অবিচলিত ভক্তিযোগের কথা শুনে অর্জুন বললেন যে, 'আপনি আপনার দিব্য বিভূতিসকল আমায় বলুন' (১০।১৬) ; কারণ, ভগবানের বিভূতির যে অন্ত নেই—এটি অর্জুনের জানা ছিল না। কিন্তু ভগবান জানতেন ; সেইজন্য ভগবান নিজ দিব্য বিভূতিগুলি সংক্ষেপে জানাবার কথা বলেছেন। বিভূতিগুলিকে দিব্য বলার অর্থ এই যে, সাধকদের ভগবানের দ্বারা কথিত বিভূতিগুলি দিব্য অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপ বলেই মনে করা উচিত। কারণ বিভূতিগুলিকে ভগবৎস্বরূপ বলে মনে করাই দিব্যতা এবং সাংসারিক রূপে দেখা অদিব্যতা বা লৌকিকতা।

(৩৪) 'ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্' (১১।১৮ ; ৩৮)—একাদশ অধ্যায়ের আঠারো সংখ্যক শ্লোকে এই পদ দ্বারা দেবরূপী বিরাটমূর্তি ভগবানের স্তুতি করা হয়েছে এবং আটত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে অত্যুগ্ররূপী বিরাট ভগবানের স্তব করা হয়েছে। অর্থাৎ যেমন স্বর্ণনির্মিত গহনার আকৃতি, মাপ, ওজন, ব্যবহার ও নাম পৃথক্ পৃথক্ হলেও স্বর্ণকারের দৃষ্টি শুধু সোনার ওপরেই থাকে, তেমনি ভগবান সৌম্যরূপ, উগ্ররূপ, অত্যুগ্ররূপ, সংসাররূপ ইত্যাদি যে কোন রূপেই থাকুন, ভক্তের দৃষ্টি একমাত্র ভগবানের ওপরেই নিবদ্ধ থাকা উচিত।

(৩৫) 'প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস' (১১।২৫, ৪৫)—একাদশ অধ্যায়ের পঁচিশ সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন ভগবানের অত্যুগ্র (অতি ভয়ঙ্কর) বিরাটরূপ দেখে ভীত হলেন ও ভগবানকে প্রসন্ন হতে অনুরোধ করলেন এবং পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে ভীত ও হর্ষিত অর্জুন ভগবানের নিকট বিষ্ণুরূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা করলেন।

(৩৬) 'সর্বকর্মফলত্যাগম্' (১২।১১ ; ১৮।২)—দ্বাদশ অধ্যায়ের এগারো সংখ্যক শ্লোকে ভগবান ভক্তিযোগের একটি সাধনরূপে সমস্ত কর্মের ফলকে ত্যাগ করার কথা জানিয়েছেন এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে সমস্ত কর্মের ফলত্যাগের কথা জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল সম্পূর্ণ কর্মের ফল ত্যাগ। অর্থাৎ দ্বাদশ অধ্যায়ের এগারো সংখ্যক শ্লোকে এই পদটিতে সমস্ত কর্ম এবং তার ফল—দুটিতেই আসক্তি ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে ; কারণ, এটি ভগবানের মত (১৮।৬)। কিন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে এই পদটিতে কেবল সমস্ত কর্মের ফল-ইচ্ছা ত্যাগ করার কথা বলা আছে ; কারণ, এটি অপর বিদ্বানদের মত।

(৩৭) 'যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ' (১২।১৪, ১৬)—এই পদটি দুই স্থানেই সিদ্ধ ভক্তদের সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের চৌদ্দ সংখ্যক শ্লোকে ভগবানের প্রতি নির্ভরতার এবং ষোল সংখ্যক শ্লোকে সংসার হতে বৈরাগ্যের কথা বিশেষভাবে কথিত হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ভক্তদের এই দুটিই থাকা চাই।

(৩৮) 'সর্বারম্ভপরিত্যাগী' (১২।১৬ ; ১৪।২৫)—এই পদটি দ্বাদশ অধ্যায়ের ষোল সংখ্যক শ্লোকে সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণগুলিতে বর্ণিত আছে এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের পঁচিশ সংখ্যক শ্লোকে গুণাতীতের লক্ষণ-গুলিতে বর্ণিত হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, সিদ্ধাবস্থায় ভগবদ্ভক্ত এবং গুণাতীতের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না ; কেননা ভগবানে অনুরাগ হলে স্বতঃই সংসারের আসক্তি ত্যাগ হয় এবং সংসারের আসক্তি ত্যাগ হলে স্বতঃই স্বরূপে স্থিতি হয়।

(৩৯) 'ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি' (১২।১৭ ; ১৮।৫৪)—এই পদটি দ্বাদশ অধ্যায়ের সতেরো সংখ্যক শ্লোকে সিদ্ধ ভক্তদের জন্য বর্ণিত, যার অর্থ হল, যে ব্যক্তি ভগবদ্‌নিষ্ঠ হন, তাঁর আর হর্ষ-শোক হয় না। অষ্টাদশ অধ্যায়ের চুয়ান্ন সংখ্যক শ্লোকে এই পদটি ব্রহ্মভূত অবস্থাপ্রাপ্ত সাংখ্যযোগীদের জন্য বর্ণিত, সেখানে অর্থ হল ; যেসব সাংখ্যযোগী নিজ পথে ঠিক ঠিক আরূঢ় হন, যাঁদের বিবেক জাগ্রত হয়ে যায়, তাঁদের মধ্যে হর্ষ-শোক হয় না। অর্থাৎ ভক্ত এবং সাংখ্যযোগী—দুজনের ভিতরেই সাংসারিক গুরুত্ব না থাকায় হর্ষ-শোক, রাগ-

দ্বেষ হয় না।

(৪০) **'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে'** (১৪।২৬ ; ১৮।৫৩) চতুর্দশ অধ্যায়ের ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন—'সর্বতোভাবে আমার শরণ নিলে শরণাগত ভক্ত আমার কৃপায় স্বতঃই ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এর জন্য তাকে আর কিছুই করতে হয় না' এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের তিপ্পান্ন সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে, অহংকার ও মমত্ববুদ্ধি সর্বতোভাবে রহিত হলে সাংখ্যযোগী ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হতে হলে তাঁকে সাধন করতে হয়। এর তাৎপর্য এই যে, বিশ্বাস ও বিবেক- বোধের দ্বারা একই তত্ত্ব লাভ হয়।

(৪১) **'সর্বভাবেন ভারত'** (১৫।১৯ ; ১৮।৬২)— এই পদটি পঞ্চদশ অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোকে সগুণ-সাকার ভগবানের শরণাগতির বিষয়ে বলা হয়েছে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের বাষট্টি সংখ্যক শ্লোকে সগুণ-নিরাকার (অন্তর্যামী) ভগবানের শরণাগতির সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তাৎপর্য এই যে রুচিভেদে সাধ্যতে পার্থক্য থাকলেও শরণাগতির ভাবে কোন পার্থক্য নেই। শরণাগতি, তা সে সগুণ-সাকারেরই হোক বা সগুণ-নিরাকারের হোক—উভয়েতেই বিন্দুমাত্র সংসারের আসক্তি থাকা উচিত নয়।

(৪২) **'প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ'** (১৬।৭ ; ১৮।৩০) —ষোড়শ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে যারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে জানে না, সেই আসুরশক্তি ভাবাপন্নদের বর্ণনা আছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে যারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ঠিক মতো জানে, সেই সাত্ত্বিকী বুদ্ধিসম্পন্নদের বর্ণনা আছে। এর তাৎপর্য এই যে, প্রথমে (১৬।৭ এ) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি না জানার কথা বলা হয়েছে এবং পরে (১৮।৩০ এ) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জানার কথা বর্ণিত হয়েছে।

(৪৩) **'অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধম্'** (১৬।১৮ ; ১৮।৫৩)—ষোড়শ অধ্যায়ের আঠারো সংখ্যক শ্লোকে অহংকার ইত্যাদির আশ্রয় নেওয়ার কথা বলা হয়েছে ; কারণ, আসুরস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা অহংকারাদির আশ্রয় নেয়, অহং আদির পরায়ণ হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের তিপান্ন সংখ্যক শ্লোকে অহংকারাদি বর্জন করার কথা বলা হয়েছে ; কারণ, সাধকদের অহংকারাদি বিশেষভাবে ত্যাগ করা উচিত অর্থাৎ অহংকারাদির আশ্রয় নিলে পতন হয় এবং ত্যাগ করলে উচ্চাবস্থা প্রাপ্তি হয় ; সুতরাং সকলেরই অহংকারাদি ত্যাগ করা উচিত।

(৪৪) **'তৎ তামসমুদাহৃতম্'** (১৭।১৯ ; ২২ ; ১৮।২২ ; ৩৯)—সপ্তদশ অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক এবং বাইশ সংখ্যক শ্লোকে এই পদটি শ্রদ্ধা-পরিচায়ক প্রকরণে তথা তপ এবং দানের বিষয়ে উক্ত ; সেখানে অর্থ হল অন্যকে দুঃখ দানের উদ্দেশ্যে কৃত তপকে তামস তপ বলে এবং অশ্রদ্ধাপূর্বক কুপাত্রকে প্রদত্ত দানকে তামস দান বলে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের বাইশ সংখ্যক এবং উনচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে এই পদটি বিবেক-বোধের প্রকরণে তথা সুখ ও জ্ঞানের বিষয়ে উক্ত এই অর্থে যে, শরীরকে 'আমি' এরূপ মনে করা এবং তাতে আসক্ত হওয়াকে তামস জ্ঞান বলে[১] এবং নিদ্রা, আলস্য তথা প্রমাদ থেকে উৎপন্ন সুখকে তামস সুখ বলে। এর তাৎপর্য এই যে হানিকারক হওয়ায় সাধকদের পক্ষে তামস তপ, দান, জ্ঞান এবং সুখ সর্বতোপ্রকারে ত্যাজ্য।

(৪৫) **'যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যম্'** (১৮।৩, ৫) —অষ্টাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে অন্যান্য দার্শনিকদের মত ব্যক্ত করা হয়েছে এবং পঞ্চম শ্লোকে ভগবানের মত বলা হয়েছে। তৃতীয় শ্লোকে যজ্ঞ, দান এবং তপঃরূপ কর্ম ত্যাগ না করার কথা বলা হয়েছে এবং পঞ্চম শ্লোকে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম বিশেষভাবে করার কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান তপস্যারূপ কর্ম সাধনাবস্থায় নিজ কল্যাণের জন্য এবং সিদ্ধাবস্থায় লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে অবশ্যই করা উচিত।

[১] তামস জ্ঞানকে প্রকৃতপক্ষে 'জ্ঞান' বলাই যায় না। এইজন্য ভগবান এখানে (১৮।২২ এ) 'জ্ঞান' শব্দ ব্যবহার করেন নি।

(৮৭) গীতায় ব্যবহৃত সমানার্থক পদের তাৎপর্য

সমানার্থানি চোক্তানি পদানি যত্র যত্র বৈ।
তাৎপর্যং তত্র তত্রাপি তেষাং প্রোক্তং প্রসঙ্গতঃ॥

পদগুলির (শব্দগুলির) অর্থ করা হয় প্রসঙ্গ অনুসারে। যেখানে একই অর্থের দুটি পদ ব্যবহৃত হয় সেখানে দুটি পদের পৃথক পৃথক অর্থ হয় এবং যেখানে একটি পদ উদ্ধৃত হয় সেখানে তারই অন্তর্গত দুটি অর্থ আসে। গীতায় কয়েকটি স্থানে সমানার্থক পদ (একই অর্থের দুটি পদ) ব্যবহৃত হয়েছে, যার পৃথক্ পৃথক্ অর্থ এবং তাৎপর্য এইরূপ—

(১) **'নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ'** অর্থাৎ 'শস্ত্র' এবং 'প্রহরণ' (১।৯)—যেটি হাতে নিয়ে অর্থাৎ নিক্ষেপ না করে প্রহার করা যায় সেটিকে 'শস্ত্র' বলা হয় ; যেমন তরোয়াল, বল্লম, ছুরী, ছোরা, বাঘনখ ইত্যাদি। যেটি হাত থেকে ছুঁড়ে প্রহার করা হয় সেটিকে 'প্রহরণ' (অস্ত্র) বলা হয় ; যেমন বাণ, চক্র, গুলি ইত্যাদি। শস্ত্রও কখনো কখনো প্রহরণ হয়ে দাঁড়ায় ; যেমন তরোয়াল, বল্লম ইত্যাদি ছুঁড়েও প্রহার করা যায়। এর তাৎপর্য এই যে, শস্ত্র এবং প্রহরণ—এই দুটি শব্দ ব্যবহার করে দুর্যোধন নিজ সেনার গুরুত্ব জানাচ্ছিলেন।

(২) **'নিত্যস্য'** এবং **'অনাশিনঃ'** (২।১৮)—যা সর্বদা নির্বিকারভাবে থাকে তাকে 'নিত্য' বলে ; আর যার কখনো বিনাশ হয় না, মৃত্যু হয় না, তাকে 'অনাশী' বলে। এর তাৎপর্য এই যে, এই শরীরীর কোন ভাবে কোন বিকার উৎপন্ন করা যায় না বা এর কোন প্রকারে অ-ভাব হয় না।

(৩) **'নিত্যঃ'** এবং **'শাশ্বতঃ'** (২।২০)—যা সদা বর্তমান, যাতে কখনো ছেদ বা বিরাম হয় না, যা কখনো অন্তর্ধান করে না, তাকে 'নিত্য' বলে ; এবং যা প্রকাশকালে এবং অন্তর্ধানকালে একইপ্রকার থাকে তা 'শাশ্বত'। অর্থাৎ এই শরীরীর জন্ম বা বর্ধিত হওয়া ইত্যাদি কোন বিকার নেই।

(৪) **'নিত্যঃ'** এবং **'সনাতনঃ'** (২।২৪)—যা সদা স্থিতিশীল, যার আদি (উৎপত্তি) নেই, তাকে 'নিত্য' বলা হয় ; এবং যা সর্বদা থাকলেও কখনও প্রকট হয়, কখনও অন্তর্ধান করে, তাকে 'সনাতন' বলা হয়। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এই শরীরীতে দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির কোন বিকার আসে না।

(৫) **'স্থাণুঃ'** এবং **'অচলঃ'** (২।২৪)—দেহী (আত্মা) **'স্থাণুঃ'** অর্থাৎ চলাচলের ক্রিয়াবর্জিত এবং **'অচলঃ'** অর্থাৎ স্থির স্বভাবসম্পন্ন (আসা-যাওয়া ক্রিয়াবর্জিত)। এর তাৎপর্য এই যে, নিজ স্বরূপে চলাচলরূপী ক্রিয়া হয় না। ক্রিয়াসকল প্রকৃতিতে হয়। প্রকৃতির অতীত তত্ত্বে কোন ক্রিয়া নেই।

(৬) **'বিজানতঃ'** এবং **'ব্রাহ্মণস্য'** (২।৪৬)—যে শ্রোত্রিয় অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তার জন্য 'বিজানতঃ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে ; এবং যে তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ তত্ত্বের অনুভবকারী তার জন্য 'ব্রাহ্মণস্য' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ (তত্ত্বজ্ঞ)—দুই হওয়াই আবশ্যক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখতে গেলে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়াই অত্যন্ত আবশ্যক, শ্রোত্রিয় হওয়া ততো আবশ্যক নয়। কারণ বোধ হলে মুক্তি হয়েই যায়। কিন্তু শুধু শাস্ত্রজ্ঞান থাকলেই মুক্তি হয় না। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রোত্রিয় না হলেও উত্তম জিজ্ঞাসুর বোধ করাতে সক্ষম। তবে একথা ঠিক যে, যদি উত্তম জিজ্ঞাসু না হয় এবং সেই জিজ্ঞাসু ব্যক্তির শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া জানার আগ্রহ থাকে তাহলে তাকে বোঝাতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু 'বোধ' করাতে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু যে শ্রোত্রিয়, সে শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া অনুযায়ী জিজ্ঞাসুকে ঠিক মতো বোঝাতে হয়তো সক্ষম হয়, কিন্তু তাকে 'বোধ' করাতে পারে না।

(৭) **'নিশ্চলা'** এবং **'অচলা'** (২।৫৩)—সংসার থেকে আসক্তিরহিত হতে গেলে বুদ্ধি 'নিশ্চলা' অর্থাৎ এক প্রত্যয়সম্পন্ন হওয়া চাই এবং পরমাত্মায় লগ্ন হতে হলে বুদ্ধি 'অচলা' অর্থাৎ নিশ্চল, স্থির হওয়া চাই। তাৎপর্য হল, সংসারে আসক্তি না থাকলে কোন সাংসারিক সংযোগ বা বিয়োগ বুদ্ধি বিচলিত হয় না ;

এবং পরমাত্মতত্ত্বে বুদ্ধি অচল হলে বুদ্ধিতে সংশয়, সন্দেহ ইত্যাদি লেশমাত্র আসতে পারে না। সুষুপ্তিতে অর্থাৎ গভীর নিদ্রাকালে বুদ্ধি অচলা হলেও তাতে সংশয় নিবৃত্ত হয় না ; ঘুম ভাঙ্গলে সংশয় যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়।

(৮) **'বিহায় কামান্'** এবং **'নিঃস্পৃহঃ'** (২।৭১)— আমার অমুক পদার্থ হস্তগত হোক—এই কামনা না থাকাকে **'বিহায় কামান্'** পদ দ্বারা এবং জীবন-নির্বাহ করার প্রয়োজনও না থাকাকে **'নিঃস্পৃহঃ'** পদ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, বৈরাগ্য জাগলে এবং কামনা না থাকলেও ; 'শরীর যেন বেঁচে থাকে'— এরূপ স্পৃহা থাকতে পারে। কিন্তু বোধ (উপলব্ধি) হয়ে গেলে স্পৃহাও থাকে না। সে তখন সর্বতোভাবে নিঃস্পৃহ হয়ে যায়।

(৯) **'আত্মতৃপ্তঃ'** এবং **'আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ'** (৩।১৭)—যতক্ষণ মানুষের সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে ততক্ষণ সে খাওয়া-দাওয়া (অন্ন-জল) থেকে 'তৃপ্তি' এবং সম্পত্তি ইত্যাদি প্রাপ্তিতে 'সন্তুষ্টি' মেনে নেয়। কিন্তু কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষগণের সঙ্গে সংসারের সম্পর্ক না থাকায় তাদের 'তৃপ্তি' এবং 'সন্তুষ্টি'—দুই-ই এক তত্ত্ব (আত্মা)-তে হয় অর্থাৎ ঐ মহাপুরুষগণের দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির কোন অপেক্ষা বা প্রয়োজন থাকে না ; কারণ, তাঁরা জড়ত্ব (বিষয়াদি) থেকে মুক্তি পেয়ে চিন্ময়তত্ত্বে স্থিত হয়েছেন।

(১০) **'সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্'** এবং **'অচেতসঃ'** (৩।৩২)—যে ব্যক্তি ভগবানের মতবাদ অনুসরণ করে না সে সমস্ত প্রকার সাংসারিক জ্ঞানে (বিদ্যা, কলা ইত্যাদিতে) মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে—এই কথাটি **'সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্'** পদ দ্বারা বলা হয়েছে। এইসব ব্যক্তিদের সৎ-অসৎ, ধর্ম-অধর্ম, সার-অসার ইত্যাদি পারমার্থিক কথারও জ্ঞান (বিবেক) হয় না—এই কথা **'অচেতসঃ'** শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে সাংসারিক উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং প্রকৃত তত্ত্ব থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়।

(১১) **'ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গম্'** এবং **'নিরাশ্রয়ঃ'** (৪।২০)—কর্মফল ত্যাগ করা অথবা কর্মের আশ্রয় গ্রহণ না করা একই কথা ; কারণ পরে (৬।১এ) এই কথা বলা হয়েছে যে, কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে কর্তব্য-কর্ম করা উচিত—**'অনাশ্রিতঃ কর্মফলম্'**। অতএব **'ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গম্'** পদটির তাৎপর্য হল কর্ম এবং কর্মফলের আসক্তি বর্জন করা এবং **'নিরাশ্রয়ঃ'** পদটির তাৎপর্য হল প্রাপ্ত দেশ, কাল ইত্যাদির আশ্রয় ত্যাগ করা। অর্থাৎ সাধকদের ব্যষ্টি কর্ম-সামগ্রীর আসক্তি বর্জন করতে হয় এবং সমষ্টি দেশ, কাল ইত্যাদির আশ্রয়ও বর্জন করতে হয়।

(১২) **'সর্বম্'** এবং **'অখিলম্'** (৪।৩৩)—প্রকৃতি দুই রূপে প্রকটিত হয়—ক্রিয়ারূপে এবং পদার্থরূপে। সুতরাং **'সর্বম্'** পদের অর্থ হচ্ছে—ক্রিয়াসকল ; এবং **'অখিলম্'** পদের অর্থ হচ্ছে—পদার্থসকল। এর তাৎপর্য এই যে, পরমাত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা অন্তরে জাগ্রত হলে ক্রিয়া ও পদার্থগুলিতে মন আকৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ ভোগের ইচ্ছা এবং সংগ্রহের ইচ্ছা দূরীভূত হয়।

(১৩) **'তত্ত্বদর্শিনঃ'** এবং **'জ্ঞানিনঃ'** (৪।৩৪)— যে পরমাত্মতত্ত্বকে অনুভব করেছে তাকে **'তত্ত্বদর্শিনঃ'** পদের দ্বারা এবং বেদসকল ও শাস্ত্রসমূহ যে ভালোরূপে জানে তাকে **'জ্ঞানিনঃ'** পদ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞানমার্গী সাধকদের পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য শ্রোত্রিয় (জ্ঞানী) এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ (তত্ত্বদর্শী) গুরুর আশ্রয় নেওয়া উচিত—এই কথাটির জন্য উপরিউক্ত দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু দুইয়ের মধ্যেও যাঁর শরণাগত হবে তাঁর ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

(১৪) **'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু'** অর্থাৎ **'শীত-উষ্ণ'** এবং 'সুখ-দুঃখ' (৬।৭ ; ১২।১৮)—এখানে শীত-উষ্ণ পদটির দ্বারা প্রারব্ধ (ভাগ্য) অনুযায়ী প্রাপ্ত অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে এবং সুখ-দুঃখ পদ দ্বারা বর্তমানে সম্পাদিত ক্রিয়মাণ কর্মের তাৎকালিক সিদ্ধি-অসিদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি যে কোন পথেরই সাধক হোক না কেন তার প্রারব্ধ কর্মের ফল এবং বর্তমানে সম্পাদিত তাৎকালিক ফলে সর্বদা প্রসন্ন এবং সমভাবাপন্ন থাকতে হয়।

(১৫) **'সুহৃদ্'** এবং **'মিত্র'** (৬।৯)—মমত্বরহিত হয়ে যে সম্পূর্ণ বিনা কারণে সকলের হিত আকাঙ্ক্ষা করে এবং হিতসাধন করে তাকে **'সুহৃদ্'** বলে ; এবং

উপকারের বদলে যে উপকার করে, তাকে **'মিত্র'** বলা হয়। বলার তাৎপর্য এই যে, সুহৃদ্ ও মিত্রের প্রাপ্তি হলেও সাধকের অন্তঃকরণে ভেদবুদ্ধি আসা উচিত নয়। অর্থাৎ 'এ সুহৃদ্ এবং ও মিত্র'—এরূপ জ্ঞান হলেও সমত্ব বজায় রাখতে হয়, কোনপ্রকার বিকার আসা উচিত নয়। ঐরূপ জ্ঞান হওয়া দোষের নয়, কিন্তু বিকার হওয়া দোষের।

(১৬) **'অরি'** এবং **'দ্বেষ্য'** (৬।৯)—যে বিনা কারণে অহিত কর্ম করে সে 'অরি' এবং যে নিজ স্বার্থের জন্য অহিত (অপকার) করে তাকে **'দ্বেষ্য'** বলে। এর তাৎপর্য এই যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন কারণে আমাদের অনিষ্ট করে বা অকারণে আমাদের অনিষ্ট করে, তাকে দোষী মনে করা উচিত নয়। কারণ আমাদের যা কিছু অনিষ্ট হয় তা সবই আমাদেরই কর্মের ফল। সে বেচারী কেবল নিমিত্তমাত্র হয়ে থাকে, সুতরাং তার প্রতি দয়া হওয়া উচিত।

(১৭) **'সর্বান্'** এবং **'অশেষতঃ'** (৬।২৪)—এখানে সমস্ত কামনাগুলির জন্য **'সর্বান্'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং যা হতে কামনাগুলি উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত সংকল্পগুলির জন্য **'অশেষতঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ধ্যানযোগীর কোন ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে কোনও প্রকারের সংকল্প বা কামনা উৎপন্ন হওয়া উচিত নয়।

(১৮) **'শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ'** এবং **'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'** (৬।২৫)—সংসারের চিন্তা না করে তা থেকে আসক্তি বর্জিত হওয়া—এই কথাটি **'শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ'** পদটি দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে ; এবং কোন কিছুই চিন্তা না করা, সংসার বা পরমাত্মার চিন্তাও নয়—এই কথাটি বলা হয়েছে **'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'** বাক্যে। অর্থাৎ ধ্যানযোগের সাধকের চিন্তা করা বা না করা দুটি থেকেই বিরত হওয়া উচিত। তিনি তো সর্বতোভাবে সংসার থেকে আসক্তিবর্জিত হবেন এবং পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব করে—এ নিয়ে চিন্তা (চিন্তন) থেকেও বিরত থাকবেন। কারণ পরমাত্মতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করলে পরমাত্মতত্ত্ব এবং নিজ স্বরূপের পার্থক্য বোধ থাকে, আর কিছুই চিন্তা না করলে স্বতঃই অভিন্নতা প্রাপ্তি হয়। তটস্থ হলে প্রকৃতপক্ষে যে তত্ত্ব লাভ হয়, তা কোন কিছুতে আগ্রহ থাকলে হয় না ; কারণ, আগ্রহ থাকলে (ব্যবধান বোধের কারণে) সাধকের অসমভাব দূর হয় না। মহিমা যা কিছু আছে, তা সমত্বেরই।

(১৯) **'অস্থিরম্'** এবং **'চঞ্চলম্'** (৬।২৬)—মন ধ্যেয় (সাধ্য) তে স্থির হয় না, স্থির থাকে না, সেই জন্য তাকে **'অস্থিরম্'** বলা হয়েছে। মন নানাপ্রকার সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা করতে থাকে, তাই একে **'চঞ্চলম্'** বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে সমাধিস্থ অবস্থা অর্জনে কয়েকটি বিঘ্ন দেখা দেয়, যার মধ্যে প্রধান বলে বিবেচ্য চারটি হল বিক্ষেপ (চঞ্চলতা), লয় (নিদ্রা-আলস্য আদি অস্থিরতা), কষায় (অন্তঃকরণের অশুদ্ধি) এবং রসাস্বাদন (ধ্যানাবস্থায় যে সুখ পাওয়া যায় তাতে আটকে থাকা)। এই চারটি দোষ থাকলে সমাধিতে সিদ্ধিলাভ হয় না। কিন্তু গীতায় এর মধ্যে দুটি দোষেরই বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ চারটি দোষের মধ্যে লয় (অস্থিরতা) এবং বিক্ষেপ (চঞ্চলতা) এই দুটি প্রধান। সুতরাং যে সাধকগণ সমাধিস্থ হতে ইচ্ছুক, তাঁদের এই দুই দোষ থেকে সর্বদা সাবধান থাকা উচিত।

(২০) **'বলবৎ'** এবং **'দৃঢ়ম্'** (৬।৩৪)—কামনা, মমতা এবং আসক্তির জন্য পদার্থ এবং ব্যক্তিদের প্রতি গভীর আকর্ষণ হয়ে থাকে। ফলে মন কিছুতেই এদের সঙ্গ ছাড়তে চায় না, জেদ রাখে ; তাই মনকে 'দৃঢ়ম্' (জেদী) বলা হয়েছে। মনের এই টান অত্যন্ত শক্তিশালী হয় ; সেইজন্য মনকে 'বলবৎ' বলা হয়েছে। অর্থাৎ মনকে বশে রাখা খুবই কঠিন, কিন্তু এই কঠিন ভাবটি ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধক মনকে নিজের বলে মনে করে অর্থাৎ মনের প্রতি মমত্ব রাখে। এই মমত্ববোধ ধরে রাখলে মন শুদ্ধ হয় না। সাধক যদি বিচারপূর্বক মমত্ব বর্জন করে, তাহলে তার মনকে বশে রাখা সহজ হয়।

(২১) **'পরম্'** এবং **'অনুত্তমম্'** (৭।২৪)—ভগবান অজ এবং অবিনাশী হলেও তথা সমস্ত প্রাণীর মহেশ্বর হলেও নিজ প্রকৃতি বশীভূত করে যোগমায়ার দ্বারা প্রকটিত হন (৪।৬)—এটি ভগবানের **'পরম্'** ভাব, এবং ভগবানের থেকে উত্তম, শ্রেষ্ঠ অপর কেউ নেই (১৫।১৭-১৮)—এটি ভগবানের **'অনুত্তমম্'** ভাব। অর্থাৎ ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ, উত্তমের থেকেও উত্তম। ভগবানের সমান শ্রেষ্ঠ কেউ ছিল না, নেই, হবে না এবং

হওয়া সম্ভবও নয়।

(২২) **'অত্র'** এবং **'অস্মিন্'** (৮।২)—এখানে **'অত্র'** পদ প্রকরণের বাচক এবং **'অস্মিন্'** পদ মনুষ্যশরীরের বাচক। এর তাৎপর্য এই যে, স্থাবর-জঙ্গম—সমস্ত প্রাণীতে স্থিত হলেও পরমাত্মার অনুভব একমাত্র মনুষ্য শরীরেই হওয়া সম্ভব, অপর কোন শরীরে নয়।

(২৩) **'সততম্'** এবং **'নিত্যশঃ'** (৮।১৪)—**'সততম্'** পদের অর্থ এখানে নিরন্তর স্মরণ করা—অর্থাৎ যখন সকালে ঘুম ভাঙ্গে তখন থেকে রাত্রে ঘুম আসা পর্যন্ত স্মরণ করতে থাকা ; এবং **'নিত্যশঃ'** পদের অর্থ হ'ল—সর্বদা স্মরণ করা অর্থাৎ যখন থেকে এইদিকে মন হয়েছে, চিন্তা হয়েছে তখন থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত স্মরণ করতে থাকা। এর অর্থ হচ্ছে যে নিত্য-নিরন্তর সাধকের সাধনা হওয়া উচিত, এর ফলে সহজে ঈশ্বরলাভ হয়।

(২৪) **'ক্রতুঃ'** এবং **'যজ্ঞঃ'** (৯।১৬)—যাতে বৈদিক মন্ত্র এবং বিধি ইত্যাদি প্রধানরূপে থাকে তাকে **'ক্রতু'** বলা হয় ; আর যাতে পৌরাণিক, স্মার্ত মন্ত্রাদি এবং বিধির প্রাধান্য থাকে তাকে বলা হয় **'যজ্ঞ'**। এর অর্থ হচ্ছে যে, বৈদিক ও পৌরাণিক—দুই প্রকারের যজ্ঞাদি নিষ্কামভাবে এবং উৎসাহ ও তৎপরতার সঙ্গে বিধিপালনপূর্বক করা উচিত।

(২৫) **'নিবাসঃ'**, **'স্থানম্'** এবং **'নিধানম্'** (৯।১৮) —ভগবানের চিৎ-অংশ জীব স্বরূপতঃ সর্বদা ভগবানেই বিরাজ করে, সুতরাং ভগবান সকল জীবের **'নিবাস'**। প্রলয়কালে প্রকৃতিসহ সমস্ত জগৎ ভগবানেই স্থিত হয়, অতএব ভগবান এই জগতের **'স্থান'**। জগৎ সর্গ অবস্থায়ই থাকুক বা মহা-প্রলয়ে থাকুক, সকল অবস্থাতেই প্রকৃতি, জীব, জগৎ এবং যা কিছু দেখা-শোনা এবং বোঝার অন্তর্গত, সবই ভগবানে বিরাজ করে, তারই জন্য ভগবান সকলের **'নিধান'**। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ভগবান ব্যতীত জীবাত্মা এবং প্রকৃতির (জগতের) অন্য কোন আধার, আশ্রয় বা অধিষ্ঠান নেই-ই। সমস্ত কিছুর আধার একমাত্র ভগবানই—এরূপ মেনে নিলে ভগবানের দিকে স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তখন সাধনাও স্বতঃই ঠিক মতো অগ্রসর হয়।

(২৬) **'বুদ্ধিঃ'**, **'জ্ঞানম্'** এবং **'অসম্মোহঃ'** (১০।৪)—বাম্বে যেমন বিদ্যুৎ প্রকটিত হয় তেমনি বিবেক যাতে প্রকটিত হয়, তাকে **'বুদ্ধি'** বলে। সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্যবোধক বিবেকের নাম **'জ্ঞান'**। অজ্ঞান হতে যে মূঢ়তা আসে তার অভাবকে বলা হয় **'অসম্মোহ'**। এর তাৎপর্য এই যে, এগুলি সবই প্রকটিত হয় ভগবান থেকেই। সুতরাং সাধক গুণগুলিকে তার নিজের মনে করে যেন অহংকার না করে।

(২৭) **'বিভূতিমৎ'**, **'শ্রীমৎ'** এবং **'উর্জিতম্'** (১০।৪১)—ঐশ্বর্যযুক্ত বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিকে **'বিভূতিমৎ'** বলে ; শোভাযুক্ত বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিকে **'শ্রীমৎ'** বলে। বলযুক্ত বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিকে **'উর্জিত'** বলে। এর তাৎপর্য এই যে, এগুলি সমস্তই ভগবানের গুণ, কারো ব্যক্তিগত গুণ নয়। এটিকে ব্যক্তিগত বলে মনে করলে অহংকার উৎপন্ন হয়। সুতরাং এগুলিকে কখনও ব্যক্তিগত বলে মনে করা উচিত নয়।

(২৮) **'করালানি'** এবং **'ভয়ানকানি'** (১১।২৭)—অর্জুন সেই বিরাটরূপ ভগবানের মুখমণ্ডল ভয়ানক ও বিশাল দন্তযুক্ত হওয়ায় খুব বড় এবং বিস্তৃতরূপে দেখতে পাচ্ছিলেন—এই কথাটি **'করালানি'** পদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে ; আর তা দেখে ভয়ভীত হয়েছিলেন—এই কথাটি **'ভয়ানকানি'** পদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, ভগবানের বিরাটরূপ করাল বা ভয়ানক ছিল না, অর্জুনের নিজ মূঢ় ভাবের জন্যই তা করাল ও ভয়ানক দেখাচ্ছিল, এইজন্যই ভগবান বলেছেন **'মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবঃ'** (১১।৪৯)।

(২৯) **'অচলম্'** এবং **'ধ্রুবম্'** (১২।৩)—যে চলনক্রিয়ারহিত, কোথাও যাতায়াত করে না, তাকে **'অচল'** বলা হয়, আর যা অটল এবং নিশ্চিতভাবে বিরাজমান, যাঁর সত্তা খণ্ডিত হয় না, তাঁকে **'ধ্রুব'** বলা হয়। অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বকে কেউ বিচলিত করতে পারে না এবং তিনিও স্বরূপ হতে কখনো বিচ্যুত হন না, নিত্য অটলরূপে একইভাবে বিরাজ করেন।

(৩০) **'অসক্তিঃ'** এবং **'অনভিষ্বঙ্গঃ'** (১৩।৯)—চিত্তে অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির প্রতি মমতাযুক্ত প্রিয়-ভাব হওয়াকে বলে সক্তি, এর অভাবকে বলা হয়

'অসক্তিঃ' এবং বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির ভালো-মন্দে, থাকা-না-থাকায় স্বয়ং-এর উপর তার প্রভাব পড়াকে বলা হয় অভিষঙ্গ, এর বিপরীত কোনও প্রভাব না পড়াকে বলা হয় **'অনভিষ্বঙ্গঃ'**। এর তাৎপর্য এই যে, সাধকের কোন ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদিতে আসক্ত হওয়া উচিত নয় এবং কোন পদার্থ বা ব্যক্তির সঙ্গে নিজ অভিন্নতা, ঘনিষ্ঠতা, ঐক্যও হওয়া উচিত নয়। কারণ জড়ত্বের সঙ্গে নিজের (স্বয়ং-এর) ঐক্য কখনো ছিল না, হয়নি, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়।

(৩১) 'অনন্যযোগেন' এবং **'ভক্তিরব্যভিচারিণী'** (১৩।১০)—এটি জ্ঞানযোগের প্রকরণ ; অতএব 'অনন্যযোগ'কে সাধনের বিষয়ে এবং 'অব্যভিচারিণী ভক্তি'কে সাধ্যের বর্ণনা বলে গ্রহণ করা উচিত। এর তাৎপর্য এই যে, সাধনার সাফল্যের জন্য এক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কারো সহায়তার কিছুমাত্র প্রয়োজন যেন না থাকে এবং পরমাত্মা ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য ধ্যেয় বা উদ্দেশ্য যেন না থাকে—এইরূপ অনন্যতার দ্বারা সাধনকার্যে সিদ্ধি শীঘ্র খুবই অনায়াসে লাভ হয়। এরূপ অনন্যতা না হলে সাধনায় শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয় না এবং সিদ্ধিলাভ কঠিনও হয়ে ওঠে।

(৩২) 'বিবিক্তদেশসেবিত্বম্' এবং **'অরতির্জনসংসদি'** (১৩।১০)—নির্জনে বাস করে সাধনে ব্রতী হওয়ার রুচিকে **'বিবিক্তদেশসেবিত্বম্'** বলা হয় এবং সাধারণ মনুষ্য সমাজে প্রীতি না হওয়াকে **'অরতির্জনসংসদি'** বলে। অর্থাৎ সাধকদের সংসারে সর্বদা আসক্তিহীন হওয়া উচিত।

(৩৩) 'উত্তমম্' এবং **'পরম্'** (১৪।১)—এখানে **'উত্তমম্'** পদের অর্থ হচ্ছে এই যে, এই জ্ঞান প্রকৃতি এবং তার কার্য জগৎ-সংসার ও শরীর থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদকারী হওয়াতে শ্রেষ্ঠ ; এবং **'পরম্'** পদের অর্থ এই যে, এই জ্ঞান পরমাত্মার প্রাপ্তিকারী হওয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ। এর তাৎপর্য এই যে সাধক যখন সর্বতোভাবে সুখ-দুঃখের প্রভাব থেকে মুক্ত হন এবং যথার্থভাবে তত্ত্ব অনুভব করেন, তখনই তিনি পূর্ণতা লাভ করেন।

(৩৪) 'প্রকাশঃ' এবং **'জ্ঞানম্'** (১৪।১১)—ইন্দ্রিয়গুলিতে এবং অন্তঃকরণে স্বচ্ছতা ও নির্মলতা এলে তাকে **'প্রকাশ'** বলে, যার দ্বারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাঁচটি বিষয়ের নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনের দ্বারা যে কোন বিষয় ঠিক ঠিক মনন হয় এবং বুদ্ধি দ্বারা পরিষ্কারভাবে নির্ণয় করা যায়। সর্বইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণে স্বচ্ছতা এবং নির্মলতা এলে 'এই বিষয়টি শাস্ত্র এবং লৌকিক মর্যাদার অনুকূল না প্রতিকূল, ঐ বিষয়গুলির পরিণাম আমাদের জন্য বা জগতের জন্য হিতকারী না অহিতকারী, উচিত না অনুচিত', ইত্যাদি ব্যাপারে সম্যক্ বিবেক উৎপন্ন হওয়াকেই **'জ্ঞান'** বলে। এর তাৎপর্য এই যে, জ্ঞানযোগী সাধকদের প্রকাশ এবং বিবেক হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু সাধক যদি তার দ্বারা প্রাপ্ত সুখে অনুরক্ত হয়ে পড়ে তবে তার অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

(৩৫) 'প্রবৃত্তিঃ' এবং **'আরম্ভঃ'** (১৪।১২)—নিজ বর্ণ, আশ্রম, দেশ, পরিধান ইত্যাদি প্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্তব্যকর্ম উপস্থিত হয়, সেটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার নামই **'প্রবৃত্তিঃ'** এবং ভোগ বা সংগ্রহেচ্ছায় নতুন নতুন কর্ম শুরু করাকে **'আরম্ভঃ'** বলে। এর তাৎপর্য এই যে, প্রবৃত্তি দোষাবহ নয় ; কারণ প্রবৃত্তি গুণাতীত মহাপুরুষ দ্বারাও হয় ; কিন্তু ভোগেচ্ছা ও সংগ্রহেচ্ছায় নতুন কোন কর্মারম্ভ তাঁর দ্বারা হয় না। অতএব সাধক যেন প্রবৃত্তিতে নির্লিপ্ত থাকেন এবং নতুন নতুন কর্মারম্ভে না জড়িয়ে পড়েন।

(৩৬) 'মোহঃ' এবং **'অজ্ঞানম্'** (১৪।১৭)—বিপরীত বা উল্টো বোঝার নাম **'মোহ'** এবং অর্ধজ্ঞানকে জ্ঞান বলে মনে করাকে **'অজ্ঞান'** বলে। এর তাৎপর্য এই যে, অকর্তব্য, অনিত্য, অগ্রাহ্য ইত্যাদি ঠিকমতো না বোঝাই হচ্ছে 'মোহ' এবং ইন্দ্রিয়, বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে জ্ঞান বলে মনে করা অর্থাৎ এ পর্যন্ত যা বোঝা হয়েছে, তাকেই পূর্ণ জ্ঞান বলে মনে করাকে 'অজ্ঞান' বলা হয়।

(৩৭) 'সমদুঃখসুখঃ' এবং **'তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ'** (১৪।২৪)—প্রারব্ধ (ভাগ্য) অনুযায়ী প্রাপ্ত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সম থাকাই **'সমদুঃখসুখঃ'** ; এবং ক্রিয়মাণ কর্মের তাৎকালিক ফল প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সম থাকাকে বলে **'তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ'**। অর্থাৎ সাধকদের প্রত্যেক পরিস্থিতিতে নির্বিকার থাকা উচিত। কোন পরিস্থিতিতে রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ করা উচিত নয়।

(৩৮) **'নির্মানমোহাঃ'** এবং **'অমূঢ়াঃ'** (১৫।৫)— মোহ দুই প্রকারের—(১) পরমাত্মার দিকে মন না দিয়ে সংসারে বদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং (২) পরমাত্মাকে ঠিক মতো না জানা। এখানে **'নির্মানমোহাঃ'** পদ দ্বারা সংসারের মোহ দূরীভূত হওয়ার কথা বলা হয়েছে ; এবং **'অমূঢ়াঃ'** পদ দ্বারা পরমাত্মাকে ঠিক মতো জেনে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সংসারের মোহ দূর হলে, সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হলে সাধকের দুঃখের অবসান হয় এবং পরমাত্মার সম্বন্ধে যথার্থ বোধ হলে সাধকের পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়।

(৩৯) **'অকৃতাত্মানঃ'** এবং **'অচেতসঃ'** (১৫।১১)—যে নিজ অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করেনি, সে **'অকৃতাত্মানঃ'** ; এবং যে সৎ-অসৎ জ্ঞান (বিবেক)কে গুরুত্ব দেয়নি, তাকে **'অচেতসঃ'** বলে। এর তাৎপর্য এই যে, যার মধ্যে সাংসারিক আসক্তি থাকে এবং যার পরমাত্মতত্ত্বের বোধ হয় নি, এরূপ ব্যক্তি চেষ্টা করলেও পরমাত্মতত্ত্ব জানতে পারে না।

(৪০) **'অক্রোধঃ'** এবং **'ক্ষমা'** (১৬।২-৩)— 'অক্রোধ'-এ নিজের প্রতি দৃষ্টি থাকে, যেন আমার ক্রোধ না হয়, চঞ্চলতা না আসে ; এবং **'ক্ষমা'**তে যে অপরাধ করেছে, তার ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে যেন তার কখনো কোনপ্রকার শাস্তি না হয়। এর তাৎপর্য এই যে, কাজে নিজের দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে অন্তঃকরণে চাঞ্চল্য এবং বিক্ষেপ হয় এবং যদি অকারণে কেউ আমাদের অপকার করে, মিথ্যা লাঞ্ছনা করে, তাহলে 'তার শাস্তি হোক'—এইরূপ ভাব উৎপন্ন হয় ; কিন্তু দৈবীসম্পদ্-সম্পন্ন সাধকদের এই দুটিই হওয়া উচিত নয়। এর অর্থ এই যে, নিজের বা অপরের কোন কর্মের দ্বারা নিজের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য আসা উচিত নয়।

(৪১) **'দর্পঃ'** এবং **'অভিমানঃ'** (১৬।৪)— মমতাযুক্ত জিনিসগুলি অর্থাৎ ধন, পুত্র, পরিবার ইত্যাদি বাহ্যিক বিষয় নিয়ে 'দর্প' হয়ে থাকে এবং অহং-ভাব থেকে বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা 'অভিমান' হয়ে থাকে। এর তাৎপর্যস্বরূপ বলা যায় যে, সাধকদের মমতা ও অহং-ভাবযুক্ত জিনিসগুলিকে নিয়ে দর্প এবং অভিমান করা উচিত নয়। এই দুই ক্ষেত্রে সাবধান থাকা উচিত।

(৪২) **'দুঃখম্'** এবং **'শোকঃ'** (১৭।৯)— রাজসিক মানুষদের প্রিয় খুব ঝাল-মসলাযুক্ত, অতিশয় গরম খাদ্য ভোজনের পরিণামে মুখ, পেট ইত্যাদির জ্বালা হওয়াকে **'দুঃখ'** বলা হয়েছে ; এবং চিত্তে অশান্তি, চিন্তা ইত্যাদি হওয়াকে এখানে **'শোক'** বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, রাজসিক ভোজন শারীরিক এবং মানসিক উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকে, অতএব তা ত্যাজ্য।

(৪৩) **'অনুদ্বেগকরম্'** এবং **'প্রিয়ম্'** (১৭।১৫)— যে বাক্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতে কখনো কারও উদ্বেগ বিক্ষেপ এবং চাঞ্চল্য উৎপন্ন করে না, তাকে **'অনুদ্বেগকর'** বলা হয়। যে বাক্য ক্রূরতা, রুক্ষতা, তীক্ষ্ণতা, লাঞ্ছনা, নিন্দা, মিথ্যা-অপবাদ এবং অপমানকর না হয় এবং যা প্রেমপূর্ণ, মিষ্ট এবং সহজ-সরল, তাকে 'প্রিয়' বলে। অর্থাৎ মানুষের এমন বাক্য বলা উচিত যা বর্তমানে প্রিয় ও ভবিষ্যতে হিতকারক হয়।

(৪৪) **'সৎকারমানপূজার্থম্'** অর্থাৎ 'সৎকার', 'মান' এবং 'পূজা' (১৭।১৮)—বাহ্য-ক্রিয়া দ্বারা সেবা করাকে বলে **'সৎকার'**, অন্তরের ভাব দ্বারা শ্রদ্ধা করাকে বলে **'মান'**, এবং মালা পরানো, ফুল সাজানো, আরতি করা, একে বলে **'পূজা'**। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে যখন মনে রাগ, আসক্তি, কামনা ইত্যাদি জাগে, তখনই সৎকার, মান এবং পূজা পাবার বাসনা জাগে। অতএব সাধকদের সাবধানে থাকতে হবে যেন তাদের চিত্তে এ সকল সাংসারিক বস্তুর রেখাপাত না হয়।

(৪৫) **'চলম্'** এবং **'অধ্রুবম্'** (১৭।১৮)—যে তপস্যা সৎকার, মান এবং পূজা পাওয়ার আশায় করা হয়, তার ফল **'চল'** অর্থাৎ বিনাশশীল হয় ; এবং যে তপস্যা শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয় তার ফল **'অধ্রুব'** অর্থাৎ অনিশ্চিত (ফল পাওয়া না পাওয়া, দণ্ড সিদ্ধ হওয়া বা না হওয়া) হয়। এর তাৎপর্য এই যে, কামনা থাকলেই কর্মের ফল চল এবং অধ্রুব হয়। অতএব সাধকের উচিত ফলকামনাকে ত্যাগ করা।

(৪৬) **'অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ'** এবং **'দুর্মতিঃ'** (১৮।১৬) —এখানে **'অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ'** পদটি হেতুরূপে ব্যবহৃত

হয়েছে এবং 'দুর্মতিঃ' পদটি কর্তার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কর্তার দুর্মতির হেতু হচ্ছে 'অকৃতবুদ্ধি'। এর তাৎপর্য এই যে, বুদ্ধিকে শুদ্ধ না করলে অর্থাৎ তাতে বিবেক জাগ্রত না করলেই দুর্মতি হয়। যদি সে বিবেককে জাগ্রত করে, তাকে গুরুত্ব দেয় তাহলে তার দুর্মতি হয় না।

(৪৭) 'ধর্মম্', 'অধর্মম্' এবং 'কার্যম্', 'অকার্যম্' (১৮।৩১)—শাস্ত্র যা নির্দেশ দিয়েছে এবং যার দ্বারা পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্তি হয়, তাকে 'ধর্ম' বলে ; এবং যার নির্দেশ নেই বরং নিষেধ আছে এবং যার দ্বারা পরলোকে দুর্গতি প্রাপ্তি ঘটে তাকে 'অধর্ম' বলা হয়। বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কাল, লোকমর্যাদা, পরিস্থিতি অনুযায়ী শাস্ত্র যার জন্য যে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছে, তার জন্য সেই কর্মটিই 'কার্য' (কর্তব্য)-রূপে প্রতিভাত হয়, এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্তব্য পালন না করা এবং না করার যোগ্য কাজগুলি করাকে বলে 'অকার্য' (অকর্তব্য)। এর তাৎপর্য এই যে রজোগুণ দ্বারা বুদ্ধি আচ্ছন্ন হলে ধর্ম-অধর্ম এবং কার্য-অকার্য সম্পর্কে স্পষ্ট বিবেক-বোধ হয় না। অতএব সাধকদের উচিত অবিবেচনাকে (অবিবেককে) গুরুত্ব না দেওয়া। ধর্ম এবং অধর্ম কী ? কার্য এবং অকার্যও বা কী ?—এই কথাগুলি গভীরভাবে বুঝতে হবে। গভীরভাবে বুঝলে অবিবেচনার ভাব (অবিবেক) নষ্ট হয়।

(৪৮) 'শোকম্' এবং 'বিষাদম্' (১৮।৩৫)—কারো মৃত্যুর সম্ভাবনায় অথবা কারো মৃত্যুর পর মনে যে চিন্তা হয়, চাঞ্চল্য হয়, তাকে 'শোক' বলে ; এবং কোন কথায় মনে যে দুঃখ উপস্থিত হয় তাকে 'বিষাদ' বলে। এর তাৎপর্য এই যে, সাধকদের শোক ও বিষাদ—এই দুটি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। তামসী বুদ্ধি ত্যাগ করা সহজ ; কিন্তু তামসী ধৃতি ত্যাগ করা কঠিন। কেননা এটি স্বভাবের মধ্যে থাকে। এটিকে ধারণ করতে হয় না বরং এটি সহজাত বলা হয়। তাই এখানে (১৮।৩৫এ) 'ন বিমুঞ্চতি' পদটি বলা হয়েছে। বিশেষ যত্নপূর্বক সাধকের এর থেকে মুক্তি পেতে হয়।

(৪৯) 'পরাং শান্তিম্' এবং 'শাশ্বতং স্থানম্' (১৮।৬২)—সংসার থেকে সম্পূর্ণভাবে মন তুলে নেওয়াকে 'পরাং শান্তিম্' পদ দ্বারা এবং পরম ধামকে 'শাশ্বতং স্থানম্' পদ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, পরমাত্মার শরণাগত হলে ভগবৎ-কৃপায় সংসার থেকে মুক্তি লাভ ঘটে ও পরমাত্মার প্রাপ্তি ঘটে।

♠ ♠ ♠

(৮৮) গীতায় উল্লিখিত পুনরুক্ত সমানার্থক বাক্যগুলির তাৎপর্য

পুনরুক্তানি বাক্যানি সমানার্থানি কুত্রচিৎ।
অত্র তেষাং চ তাৎপর্যং কথ্যতে ভাবপূর্বকম্॥

(১) 'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা' (২।৪৮) ; 'সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ' (৪।২২) ; এবং 'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো-র্নির্বিকারঃ' (১৮।২৬)—এই তিনটি বাক্য সমার্থক, তবুও এতে কিছু পার্থক্য আছে। প্রথম দুটি বাক্য কর্মযোগী সাধকদের জন্য এবং শেষ বাক্যটি সাংখ্যযোগী সাধকদের জন্য। কর্মযোগী সাধক 'আমাকে কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধি এবং পূর্তি-অপূর্তিতে সম থাকতে হবে'—এই ভাব নিয়ে কর্তব্যকর্ম পালন করে (২।৪৮)। এইভাবে কর্ম করার ফলে তারা সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হয়ে যায় (৪।২২)। সাংখ্যযোগী সাধকগণ সমস্ত বিকারই প্রকৃতির অর্থাৎ তার নিজের নয় বলে মনে করে, সুতরাং তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই নির্বিকার থাকে।

এর তাৎপর্য এই যে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমই বলা হোক বা নির্বিকার বলা হোক, একই ব্যাপার। সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম এবং নির্বিকার হলে উভয়েরই তত্ত্ব লাভ হয় (৫।৫)।

(২) **'বীতরাগভয়ক্রোধঃ'** (২।৫৬) ; **'বীতরাগভয়ক্রোধাঃ'** (৪।১০) ; এবং **'বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ'** (৫।২৮) এই তিনটি বাক্য ক্রমশঃ কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও ধ্যানযোগের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি যে কোন পথে সাধনা করুক না কেন পরিণামে সাধক সাংসারিক আসক্তি, ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়। কারণ সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলেই আসক্তি ইত্যাদি বৃত্তিগুলি উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলি স্বরূপতঃ সাধকের মধ্যে নেই। সুতরাং সংসারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ামাত্র এগুলিও বিলীন হয়ে যায় এবং স্বতঃসিদ্ধ নির্বিকারত্বের অনুভব হয়। এইজন্য সাধক যে পথই অনুসরণ করুক না কেন তার মধ্যে ক্রমশঃ নির্বিকার ভাবের বৃদ্ধি হওয়া উচিত।

(৩) **'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা'** (৩।৩০) ; **'ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি'** (৫।১০) ; **'যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য'** (১২।৬) ; **'চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য'** (১৮।৫৭) ; এবং **'সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে'** (৫।১৩) —প্রথমের চারটি বাক্য ভক্তিযোগের এবং শেষ বাক্যটি জ্ঞানযোগের প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, ভক্তিযোগে সকল কর্মই ভগবানে অর্পণ করা হয় এবং জ্ঞানযোগে সমস্ত কর্ম শরীর-(প্রকৃতি) কে অর্পণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন যোগেই কর্মগুলিকে নিজের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করার কথা বলা হয়নি। কেননা কর্মগুলি নিজের সঙ্গে যুক্ত হলে সেটি ভোগ হয়, যোগ হয় না। সাধকদের যোগ হওয়া উচিত, ভোগ নয়।

(৪) **'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ'** (৩।২৭) ; **'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'** (৩।২৮) ; **'ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে'** (৫।৯) ; **'প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ'** (১৩।২৯) ; **'নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারম্'** (১৪।১৯) ; **'গুণা বর্তন্ত ইত্যেব'** (১৪।২৩) —এই সকল বাক্যের তাৎপর্য এই যে, যদি বলা হয় যে প্রকৃতির দ্বারা সমস্ত কর্ম সাধিত হয়, অথবা যদি বলা যায় যে প্রকৃতির কার্য ও গুণগুলির দ্বারা সর্ব কর্ম সাধিত হয়, অথবা যদি বলা হয় যে গুণের কার্য ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সকল কর্ম সাধিত হয়, তাহলে তিনটি কথার একই অর্থ হয়। কর্ম প্রকৃতিই করে, পুরুষ (চেতন) নয়। ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতির দ্বারা সাধিত হয়, পুরুষ সর্বতোভাবে অক্রিয়। অতএব সাধকের নিজ অক্রিয় স্বরূপের বোধ হওয়াই কাম্য।

(৫) **'স মে যুক্ততমো মতঃ'** (৬।৪৭) এবং **'তে মে যুক্ততমা মতাঃ'** (১২।২)—এই দুটিতে একবচন ও বহুবচনেরই পার্থক্য, শব্দের পার্থক্য নেই। প্রথমে (৬।৪৭এ) অর্জুন প্রশ্ন না করলেও ভগবান জানালেন যে সমস্ত যোগীদের মধ্যে ভক্তিযোগী যুক্ততম (শ্রেষ্ঠ) এবং দ্বিতীয়বার (১২।২) অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন যে, জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগী—এই দুয়ের মধ্যে ভক্তিযোগী যুক্ততম। এর তাৎপর্য এই যে, নিজের জিজ্ঞাসা না থাকলে যে কথা শোনা হয়, তা মনে ধরে না। কিন্তু নিজ জিজ্ঞাসা থাকলে তার উত্তরে যে কথা শোনা হয়, সেই কথা দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। যেমন প্রথমবার যখন ভগবান ভক্তিযোগীকে সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছিলেন তখন অর্জুন সে কথাটি ঠিকমত ধরতে পারেন নি। সেইজন্য তিনি এই বিষয়ে প্রশ্ন করলেন (১২।১)। অর্জুনের প্রশ্নে ভগবান ঐ কথা পুনরায় বললেন এবং অর্জুন সেটি বুঝতে পারলেন। সেইজন্য অর্জুন পুনরায় এই বিষয়ে আর প্রশ্ন করেন নি।

(৬) **'যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'** (৮।২১) এবং **'যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'** (১৫।৬)—যদিও **'যং প্রাপ্য'** এবং **'যদ্গত্বা'** এই দু'টি পদের অর্থ একই ; কারণ 'প্রাপ্য' (আপ্লৃ ব্যাপ্তৌ)-এর অর্থও প্রাপ্ত হওয়া এবং 'গত্বা' (গম্লৃ গতৌ)-এর অর্থও

প্রাপ্ত হওয়া বোঝায় ; তবুও প্রথম বাক্যটিতে সগুণ-নিরাকার পরমাত্মার স্বরূপের বর্ণনা আছে—সমস্ত প্রাণিজগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হলেও যাঁর বিনাশ নেই ; তাঁকে সর্বত্র ব্যাপকভাবে দেখা যায়, অপরোক্ষভাবে দেখা যায়। সুতরাং তাঁকে প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে বৈকুণ্ঠলোক, গোলোক, সাকেতলোক ইত্যাদি ধামের প্রাধান্য রেখে বর্ণনা করা হয়েছে, যা সূর্য আদিও প্রকাশিত করতে পারে না। সেই ধাম দূরে ও পরোক্ষভাবে দেখা যায়। অতএব সেখানে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার স্বরূপ এবং পরমাত্মার ধাম—তত্ত্বতঃ দুটি একই।

(৭) **'উদাসীনবদাসীনম্'** (৯।৯) এবং **'উদাসীন-বদাসীনঃ'** (১৪।২৩)—ভগবান প্রাণীদের স্বভাব অনুসারে সৃষ্টি করেন ; কিন্তু তিনি সেই সৃষ্টি-রূপ কর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না, বরং উদাসীনের মত বিরাজ করেন (৯।৯)। গুণাতীত মহাপুরুষগণও এইরূপ উদাসীনের মতই থাকেন ; কারণ তাঁরা গুণগুলির দ্বারা কখনো কিছুমাত্র বিচলিত হন না (১৪।২৩)।

(৮) **'অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ'** (১০।২০) এবং **'সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন'** (১০।৩২)—দশম অধ্যায়ে তাঁর চিন্তন (স্মরণ) করাবার জন্য নিজ বিভূতিগুলি বর্ণনা করছিলেন। অতএব প্রথম বাক্যের তাৎপর্য হল যদি সাধকের দৃষ্টি প্রাণীদের দিকে যায় তবে তারা যেন এই চিন্তা করে যে সমস্ত প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্ত সবই ভগবান। অন্য বাক্যটির তাৎপর্য হল, যদি সাধকের দৃষ্টি সর্গে-(সৃষ্টি)র দিকে যায় তাহলে সেখানেও এই চিন্তা করা উচিত যে, এই অনন্ত সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্ত সবের মধ্যে ভগবানই আছেন।

(৯) **'অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্'** (১৩।১৬) ; **'অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্'** (১৮।২০)—প্রথম বাক্যে জ্ঞেয় তত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃত বোধের এবং দ্বিতীয় বাক্যে সাত্ত্বিক জ্ঞানের বর্ণনা আছে। সাধকের পক্ষে সাত্ত্বিক জ্ঞান গ্রহণীয় এবং রাজস-তামস জ্ঞান ত্যাজ্য। প্রকৃত বোধ সাত্ত্বিক জ্ঞানের থেকেও উচ্চে অর্থাৎ এটি সাত্ত্বিক জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য। এই প্রকৃত বোধই সাত্ত্বিক জ্ঞান (বিবেক) রূপে প্রকটিত হয়।

সিদ্ধ মহাপুরুষ এবং উচ্চ সাধকদের লক্ষণের মধ্যে যেমন পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে, সেইরূপই প্রকৃত বোধ এবং সাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যেও পার্থক্য করা কঠিন হয়। তবুও বলা যায় যে, প্রকৃত বোধ কারণ-নিরপেক্ষ, গুণাতীত হয় এবং সাত্ত্বিক জ্ঞান কারণ-সাপেক্ষ হয়।

(১০) **'সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্'** (১৩।২৭) এবং **'সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে'** (১৮।২০)—প্রথম বাক্যে জ্ঞানযোগীর দৃষ্টির বর্ণনা আছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে সাত্ত্বিক জ্ঞানের বর্ণনা আছে। সর্বত্র পরমাত্মাকে দর্শন করলে সাধকের পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় এবং সাত্ত্বিক জ্ঞানে স্থিত হলে সাধক গুণাতীত হয়ে যায়। এর তাৎপর্য এই যে পরিণামে দুই সাধন দ্বারাই পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হয়[১]।

[১] এইরূপ 'বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্' এবং 'বলং ভীমাভিরক্ষিতম্' (১।১০) ; 'প্রভবন্ত্যহরাগমে' এবং 'প্রভবত্যহরাগমে' (৮।১৮-১৯) ইত্যাদি পুনরুক্ত সমানার্থক বাক্যও গীতায় রয়েছে, কিন্তু এতে বিশেষ বিচার্য বিষয় না থাকায় এগুলি এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

(৮৯) গীতায় উল্লিখিত বিপরীত ক্রমের তাৎপর্য

পূর্বং যথাক্রমং প্রোক্তং পশ্চান্ন স্যাত্তথাক্রমম্।
বিপরীতক্রমস্যাপি তাৎপর্যং কথ্যতেঽধুনা॥

(১) প্রথম অধ্যায়ে ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে '**পিতৃনথ পিতামহান্**'। '**আচার্যান্**...........' বলে সর্বপ্রথম পিতা এবং পিতামহ এবং তৃতীয় পদে আচার্যের নাম বলা হয়েছে। আবার চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে '**আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ** ....' বলে প্রথমে আচার্য এবং পরে পিতা প্রভৃতির নামের উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিপরীত ক্রমের কি তাৎপর্য ?

একটি মোহ এবং মমতাযুক্ত সম্পর্ক এবং অপরটি হচ্ছে ধর্মের সম্পর্ক। যেখানে মোহ-মমতার সম্পর্ক, সেখানে পিতা ও কুটুম্বদের নাম প্রথমে স্মরণে আসে, পরে আচার্য স্মরণে আসেন ; আর যেখানে ধর্মের সম্বন্ধ সেখানে আচার্যাদি প্রথমে স্মরণে আসেন, পরে পিতা ও কুটুম্বাদিকে স্মরণ করা হয়। যখন অর্জুনের মধ্যে কৌটুম্বিক (কুটুম্ব-জনিত) মোহ-মমতার প্রাধান্য ছিল, তখন তাঁর দৃষ্টি সর্বপ্রথম পিতার প্রতি গেল, আবার যখন ধর্মের মুখ্যতা ছিল, তখন স্বভাবতঃ তাঁর দৃষ্টি আচার্যের প্রতি পড়েছিল।

(২) দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে অর্জুন সর্বপ্রথম পিতামহ ভীষ্মের এবং পরে আচার্য দ্রোণের নাম বলেন—'**কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ**'। কিন্তু একাদশ অধ্যায়ের চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান সর্বপ্রথম দ্রোণের এবং পরে ভীষ্মের নাম উল্লেখ করেন—'**দ্রোণং চ ভীষ্মং চ**'। এই বিপরীত ক্রম কেন ?

ভীষ্মের সঙ্গে অর্জুনের কৌটুম্বিক সম্পর্ক ছিল। ভীষ্ম আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ এবং লোকপ্রিয় পুরুষ ছিলেন। মহাভারতে ভীষ্মকে ভগবান শাস্ত্রের জ্ঞানসূর্য নামে অভিহিত করেছেন। ভীষ্ম এইরূপ অত্যন্ত মাননীয় ও পূজ্য ব্যক্তি হওয়ায় অর্জুন সর্বপ্রথমে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। আচার্য দ্রোণ ছিলেন অর্জুনের বিদ্যাগুরু। অর্জুনের মনে গুরুহত্যাজনিত পাপের ভয় ছিল। সেইজন্য ভগবান সবার আগে আচার্য দ্রোণের নাম করে অর্জুনকে বলতে চাইছিলেন যে, 'যিনি তোমাকে শস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গম করেছেন, ক্ষাত্রধর্মের নীতিতে যদি তাঁকে তুমি বধও কর, তাহলেও তোমার পাপ হবে না। কারণ আমাকর্তৃক হত দ্রোণাদিকে মারলে তোমার নিজ কর্তব্য পালন করাই হবে।'

(৩) কর্মযোগ ও ভক্তিযোগে '**নির্মমো নিরহংকারঃ**' (২।৭১ ; ১২।১৩) কথাটি বলে প্রথমে মমত্ব এবং পরে অহংকার ত্যাগের কথা বলা হয়েছে ; এবং জ্ঞানযোগে '**অহংকারং......বিমুচ্য নির্মমঃ**' (১৮।৫৩) বলে প্রথমে অহংকার ও পরে মমত্ব ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এই বিপরীত ক্রম কেন ?

কর্মযোগে পদার্থ এবং কর্মফলের আসক্তিত্যাগই মুখ্য। এই কামনা ত্যাগ হয় সংসারে নির্মম (মমত্বরহিত) হলে। মমত্ব ত্যাগ হলে অহংকার স্বাভাবিকভাবেই ত্যাগ হয় ; কারণ অহংকারের সঙ্গেও মমত্ব থাকে। ভক্তিযোগে ভক্ত পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদি সমস্ত ভগবানে অর্পণ করে দেয়, সেগুলি ভগবানের বলেই মনে করে ; অতএব তার কোন পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদির উপরে মমতা থাকে না। মমত্ববোধ না থাকায় অহংবোধও থাকে না। সেইজন্য কর্মযোগ ও ভক্তিযোগে প্রথমে মমত্ববোধ এবং পরে অহংবোধ ত্যাগের কথা বলা হয়েছে।

জ্ঞানযোগে সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্যবোধক বিবেকের প্রাধান্য থাকে। 'আমি আছি'—এতে 'আমি' ভাব (অহংকার) প্রকৃতির কার্য (১৩।৩৫) এবং 'আছি' ভাব পরমাত্মার অংশ (১৫।৭)। 'আমি' ভাব নিজ স্বরূপে আরোপিত করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নেই। এইভাবে বিবেকের দ্বারা নিজ স্বরূপে স্থিত হলে অহংবোধ ত্যাগ হয়ে যায়। অহংবোধ ত্যাগ হলে মমত্ববোধ স্বতঃই ত্যাগ হয়। সুতরাং জ্ঞানযোগে প্রথমে অহংবোধ ও পরে মমত্ববোধ ত্যাগের কথা বলা হয়েছে।

(৪) তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে এবং পঞ্চম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে ভগবান প্রথমে কর্ম অর্পণ করে পরে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন ; এবং নবম

অধ্যায়ের সাতাশ সংখ্যক শ্লোকে প্রথমে কর্ম করে পরে কর্ম অর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিপরীত ক্রম কেন ?

ভক্তিযোগে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার দুটি উপায় আছে—(১) ভক্ত কর্মগুলি ভগবানকে অর্পণ করতে করতে নিজেও ভগবানের নিকট অর্পিত হয়ে যান, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হন। ভগবানে অর্পিত হলে তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই ভগবৎপ্রসন্নতার জন্য কর্মগুলি সম্পাদিত হয়। (২) ভক্ত প্রথমে স্বয়ং ভগবানে অর্পিত হয়ে যান। ভগবানে অর্পিত হলে তাঁর দ্বারা যে কোন কর্মই হোক তা স্বাভাবিকভাবে ভগবানে অর্পিত হয়ে থাকে।

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কর্মে যাঁর অত্যন্ত অনুরাগ থাকে, তিনি কর্ম করতে করতেই ভগবানে অর্পিত হন এবং যাঁর ভগবৎপরায়ণ থাকার বেশী আগ্রহ থাকে, তিনি প্রথম থেকেই ভগবানে অর্পিত হয়ে যান।

(৫) দশম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে **'এতাং বিভূতিং যোগং চ'** ইত্যাদি পদের দ্বারা প্রথমে বিভূতি ও পরে যোগের কথা বলেছেন। কিন্তু দশম অধ্যায়েরই আঠারো সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন **'বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ'** পদসমূহে যোগকে প্রথমে এবং বিভূতিকে পরে বলেছেন। এই বিপরীত ক্রম কেন ?

মানুষ প্রথমে ভগবানে বিভূতিগুলি, বিশেষত্বগুলিই দেখে, তারপর সে ভগবানে আকৃষ্ট হয় ; ভগবানের যোগ (সামর্থ্য) তাকে মেনে নিতে হয়। তাই ভগবান সর্বপ্রথম বিভূতিগুলি বললেন। কিন্তু অর্জুন প্রথমে ভগবানের যোগ (সামর্থ্য, প্রভাব) শুনেই প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি **'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম.......'** (১০।১২) ইত্যাদি পদগুলির দ্বারা ভগবানের স্তুতিও করেছিলেন। সেইজন্য তিনি সর্বাগ্রে যোগের কথাই জিজ্ঞাসা করেছেন।

(৬) ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান প্রথমে প্রকৃতি এবং পরে পুরুষের নাম বলেছেন—**'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব'** ; এবং তেইশ সংখ্যক শ্লোকে প্রথমে পুরুষ ও পরে প্রকৃতির নাম বলেছেন—**'য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ'**। এই বিপরীত ক্রম কেন ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোক থেকে একুশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত বন্ধনের বিষয়ে এবং তেইশ সংখ্যক শ্লোকে বোধের বিষয়ে বলা হয়েছে। বন্ধনে প্রকৃতিই প্রধান হওয়ায় উনিশতম শ্লোকে প্রথমে প্রকৃতি এবং পরে পুরুষের কথা বলা হয়েছে। বোধে পুরুষ মুখ্য হওয়ায় তেইশ সংখ্যক শ্লোকে প্রথমে পুরুষ এবং পরে প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জাগলে প্রথমে প্রকৃতির— বন্ধনের কারণ সম্বন্ধে অবহিত হয়, ফলে প্রকৃতি (বন্ধন) নিবৃত্ত হয় ; অতএব প্রকৃতি সম্বন্ধেই প্রথমে বলা হয়েছে। জন্ম-মৃত্যুরহিত হওয়ায়, বোধ হওয়ায় পুরুষের জ্ঞানই প্রধান ; কারণ পুরুষের জন্ম-মরণ হয় না, তার মধ্যে জন্ম-মরণ নেই, সেইজন্য পুরুষকে প্রথমে বলা হয়েছে।

(৭) ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান **'ন করোতি ন লিপ্যতে'** অর্থাৎ করি না এবং লিপ্ত হই না—এই বলে প্রথমে কর্তৃত্বের ও পরে ভোক্তৃত্বের নিষেধ করেছেন। কিন্তু এই দুটি বোঝানোর জন্য বত্রিশ সংখ্যক ও তেত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে প্রথমে ভোক্তৃত্ব এবং পরে কর্তৃত্বের উদাহরণ দিয়েছেন। এরূপ বিপরীত ক্রম কেন ?

কর্তৃত্বের পরই ভোক্তৃত্ব আসে অর্থাৎ কর্ম করার পরই সেই কর্মের ফল ভোগ হয়—এই দৃষ্টিতেই ভগবান একত্রিশতম শ্লোকে প্রথমে কর্তৃত্ব এবং পরে ভোক্তৃত্বের নিষেধ করেছেন। কিন্তু মানুষ যখন কোন কর্ম করে, তখন সে ফলের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য নিয়েই করে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মনে প্রথমে লিপ্ততা (ভোগ ও সংগ্রহের ইচ্ছা) অর্থাৎ ভোক্তৃত্বের ভাব আসে এবং পরে কর্তৃত্ব আসে অর্থাৎ কর্মের আরম্ভ হয়। অতএব ভগবান প্রথম উদাহরণে ভোক্তৃত্বের এবং দ্বিতীয় উদাহরণে কর্তৃত্বের নিষেধ করেছেন। কারণ ভোক্তৃত্ব ত্যাগ হলে কর্তৃত্বের ত্যাগ স্বতঃই হয় অর্থাৎ ফলেচ্ছা সর্বতোভাবে বর্জিত হলে ক্রিয়া করলেও তাতে আর কর্তৃত্ব থাকে না।

(৮) চতুর্দশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান **'প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ'** পদটিতে প্রমাদকে সর্বপ্রথমে এবং নিদ্রাকে সর্বশেষে রেখেছেন, এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের উনচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান **'নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থম্'** পদে নিদ্রাকে সবার আগে এবং প্রমাদকে সবার শেষে রেখেছেন। এই বিপরীত ক্রম কেন ?

চতুর্দশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে বন্ধনের প্রকরণ দেওয়া হয়েছে; তাই প্রমাদকে সর্বপ্রথমে দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রমাদ হতে যতটা বন্ধন হয় ততটা আলস্য দ্বারা হয় না, আবার আলস্য দ্বারা যত বন্ধন হয় নিদ্রাতে তত হয় না অর্থাৎ প্রমাদ থেকেই বন্ধন বেশী হয়, তার থেকে কম হয় আলস্য হতে এবং তার চেয়েও কম হয় অতিনিদ্রা থেকে। কিন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ের ঊনচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে সুখের প্রকরণ দেওয়া হয়েছে; সেইজন্য নিদ্রাকে সবার আগে বলা হয়েছে। কারণ প্রয়োজনীয় নিদ্রাতে শরীরে হাল্কাভাব আসে, বৃত্তিগুলি স্বচ্ছ হয়, যার ফলে লেখাপড়া করা অথবা শুনে ধারণা করাতে সাহায্য পাওয়া যায়। সুতরাং প্রয়োজনীয় নিদ্রার সুখ ততো ত্যাজ্য নয়। এর চেয়ে বেশী আলস্যের সুখ এবং আলস্যের বেশী হয় প্রমাদের সুখ। এইভাবে চতুর্দশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে প্রমাদকে শুরুতে দেওয়ায় এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ঊনচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকের শেষে প্রমাদের বর্ণনা করায় সব থেকে বেশী বন্ধনের কারণ যে প্রমাদ—তা প্রমাণিত হয়। মহাভারতেও প্রমাদকে মৃত্যু বলে অভিহিত করা হয়েছে—**'প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি'** (উদ্যোগপর্ব ৪২।৪)।

(৯) ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ—এই দুটি অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করবার কথা এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে প্রকৃতির কার্য গুণের থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করবার কথা হয়েছে। এই দুটি অধ্যায়ের আরম্ভের বর্ণনা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আরম্ভে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের আরম্ভে মহদ্‌ব্রহ্ম (মূলপ্রকৃতি) এবং পরমাত্মার বর্ণনা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হওয়া উচিত ছিল ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে মূলপ্রকৃতি ও পরমাত্মার বর্ণনা এবং পরে চতুর্দশ অধ্যায়ের শুরুতে হওয়া উচিত ছিল ঐ প্রকৃতির ক্ষুদ্র অংশ ক্ষেত্র ও পরমাত্মার অংশ ক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনা। কিন্তু এরূপ ক্রমানুসারে না দেওয়ার কারণ এই যে, ক্ষেত্র ও মহদ্‌ব্রহ্ম এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মা যথাক্রমে আসলে একই, দুই নয়। তাই দুইয়ের পার্থক্য দূর করার জন্যই ভগবান এরূপ বর্ণনা করেছেন।

(১০) অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুন প্রথমে সন্ন্যাস ও পরে ত্যাগের তত্ত্ব জানতে চেয়েছিলেন; কিন্তু উত্তরে ভগবান প্রথমে ত্যাগের বিষয় বলতে শুরু করেন। এই বিপরীত ক্রম কেন?

অষ্টাদশ অধ্যায়ের পূর্বে ভগবান 'সন্ন্যাস' শব্দের প্রয়োগ কর্মযোগ (৪।৪১), জ্ঞানযোগ (৫।১৩) এবং ভক্তিযোগ (৯।২৮; ১২।৬) এই তিনটিতে করেছেন; এবং 'ত্যাগ' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন কর্মযোগে (২।৪৮; ৪।২০; ৫।১১) প্রভৃতিতে। অর্জুন সন্ন্যাস এবং ত্যাগ —দুইয়ের তত্ত্ব জানতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তিনটি যোগেই 'সন্ন্যাস' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় সন্ন্যাসের তত্ত্ব জানা অর্জুনের পক্ষে শক্ত মনে হয়েছিল। অর্থাৎ অর্জুনের মনে সন্ন্যাসের বিষয়ে যত বেশী সন্দেহ ছিল, তত ত্যাগের বিষয়ে ছিল না। তাই অর্জুন প্রধানতঃ সন্ন্যাসেরই তত্ত্ব জানতে চেয়েছিলেন এবং ত্যাগের তত্ত্ব গৌণভাবে জানতে চেয়েছিলেন। এইজন্য ভগবান **'সূচীকটাহন্যায়'**[১] পন্থায় প্রথমে ত্যাগের বর্ণনা দিয়েছেন; কারণ ত্যাগের সম্বন্ধে ভগবানের সামান্যই বলার ছিল; কিন্তু সন্ন্যাসের বিষয়ে অনেক কিছু বলার ছিল, যাতে অর্জুনের সন্ন্যাস-বিষয়ক সন্দেহ দূরীভূত হয়।

(১১) গীতায় (৭।১২; ১৪।৫-১৮, ২২ ইত্যাদি) সর্বত্র তিনগুণের বর্ণনায় 'সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস' এইক্রম দেওয়া আছে; কিন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক থেকে নবম শ্লোক পর্যন্ত 'তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক' —এইভাবে ক্রম করা হয়েছে, এই বিপরীত ক্রমের কী অর্থ?

এর কারণ হচ্ছে যে (১) ভগবান যদি ষষ্ঠ শ্লোকের পরেই সপ্তম শ্লোকে সাত্ত্বিক ত্যাগের বর্ণনা করতেন তাহলে ভগবানের নিশ্চিত মত এবং সাত্ত্বিক ত্যাগের পুনরুক্তি দোষ এসে যেত; কারণ, ভগবানের নিশ্চিত মত ও সাত্ত্বিক ত্যাগ একই জিনিস। (২) কোন বস্তুর বিশেষত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব তখনই প্রমাণিত হয় যখন সেই বস্তুটির

[১]একব্যক্তি কামারের কাছে কড়াই তৈরী করার জন্য লোহা দিয়েছিল। কামার কড়াই তৈরী করতে লাগল। এর মধ্যে আর একজন সূচ তৈরী করার জন্য একটুকরো লোহা কামারের কাছে নিয়ে এল। কামার কড়াই তৈরীর বড় কাজটি বন্ধ করে দিল এবং সূচ তৈরীর ছোট কাজটিতে হাত দিল—একেই বলা হয় 'সূচীকটাহন্যায়'।

পূর্বে অপর কোন অনুত্তম, নিকৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা করা হয়। অতএব সাত্ত্বিক ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করার জন্য ভগবান প্রথমে অনুত্তম, তামস ও রাজস ত্যাগের বর্ণনা করেছেন। (৩) এর পরে দশম থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত সাত্ত্বিক ত্যাগের বর্ণনা আছে। সাত্ত্বিক ত্যাগের বর্ণনা যদি সাত্ত্বিক ত্যাগীর কাছে (নবম শ্লোকে) না দেওয়া হোত, তাহলে তামস ত্যাগ পাশে থাকায় সাত্ত্বিক ত্যাগের শ্লোকগুলির সঙ্গে নবম শ্লোক সম্বন্ধযুক্ত হোত না। এইসব দিকে দৃষ্টি রেখেই ভগবান এখানে গুণগুলির বিপরীত ক্রম করেছেন।

(৯০) গীতায় উক্ত 'মত্তঃ' পদের তাৎপর্য

মত্ত এতৎপদৈঃ কৃষ্ণো মহিমানং স্বমব্রবীৎ।
তেষাং প্রোক্তং চ তাৎপর্যং ভাবগাম্ভীর্যপূর্বকম্॥

সবকিছুর মূলে পরমাত্মাই আছেন। পরমাত্মা ছাড়া অপর কোন কারণ নেই এবং হতেও পারে না। সৃষ্টিরচনা, প্রলয় ইত্যাদি কার্য করবার কালে ভগবান কারও সাহায্য নেন না ; কারণ, তিনি সর্বদা সর্বতোভাবে সমর্থ এবং স্বাধীন। সমস্ত কিছু করায় বা সবকিছু ওলট-পালট করতে তিনি পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। জগৎ সংসারে যা কিছু প্রভাব দেখা যায়, তা সমস্তই পরমাত্মার ; বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির নয়। রাবণ হনুমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে বানর ! তুমি কার দূত ? কার শক্তিতে তুমি এই লঙ্কাপুরী নষ্ট করলে ?' উত্তরে হনুমান বললেন, 'যার শক্তিতে তুমি সমস্ত চর-অচর জয় করেছ, সকলকে নিজ বশীভূত করেছ, আমি তাঁরই দূত।' হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, —'তুমি যার নাম করছ, তিনি কে ?' প্রহ্লাদ উত্তরে জানালেন যে, 'বাবা ! যাঁর শক্তিতে আপনি দেবতা, দানব প্রভৃতি সকলকে জয় করেছেন, আমি তাঁরই নাম করছি।' এর তাৎপর্য এই যে, সবেতেই সেই পরমাত্মারই শক্তি রয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এরূপ স্বাধীনভাবে শক্তিশালী হয় না। এই কথাটির বর্ণনা ভগবান গীতায় 'মত্তঃ' পদ দ্বারা করেছেন ; যেমন—

'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি' (৭।৭) 'জগতে আমা অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ কারণই নেই।'

'মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি' (৭।১২) 'এই সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস-ভাব আমা হতেই জাত।'

'ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ' (১০।৫)। 'প্রাণীদের বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ ইত্যাদি সকল ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়।'

'মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে' (১০।৮)। 'সমস্ত জগত আমা হইতেই প্রবর্তিত হয়।'

'মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ' (১৫।১৫)। 'স্মৃতি, জ্ঞান ইত্যাদি আমা হতেই উৎপন্ন হয়।'

এর তাৎপর্য এই যে, জগৎ-সংসারে যা কিছু ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি আছে, তার সবেতেই ভগবানের প্রভাব আছে, শক্তি আছে। এ সকলই ভগবান হতে জাত, ভগবানে স্থিত এবং ভগবানেই বিলীন হয়।

জগতে দুইটি কথা আছে—করা এবং হওয়া। মানুষ কর্ম 'করে' এবং তার ফল 'হয়'। 'করা' মানুষের হাতে এবং 'হওয়া' ভগবানের উপর নির্ভর করে। অতএব করার সময় সাবধান এবং হওয়াতে প্রসন্ন থাকা উচিত।

(৯১) গীতায় উক্ত 'অবশঃ' পদের তাৎপর্য

সম্বন্ধঃ প্রকৃতের্যাবত্তাবজ্জীবোঽবশো ভবেৎ।
প্রকৃতের্বশতাত্যাগে জীবস্তু স্ববশস্তদা॥

শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি থেকে সুখগ্রহণের যে অভ্যাস হয়ে আছে, তাকে বলা হয় স্বভাব। এই স্বভাবের পরবশ, অবশ, অধীন হয়ে থাকা প্রাণীদের দ্বারা প্রকৃতিজাত গুণ কর্ম করাতে বাধ্য করে। **'কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ'** (৩।৫) এটি স্বভাবের অবশতা।

শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ভোগের বাহুল্যের জন্য ভোগের পরবশ হয়ে পড়ে, ভোগে আকৃষ্ট হয়। ভোগের পরবশ হলেও পূর্বজন্মের অভ্যাসের জন্য সেই ব্যক্তি পুনরায় সাধন-পথে আকর্ষিত হয়—**'পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ'** (৬।৪৪)। এটি ভোগের অবশতা।

একসহস্র চতুর্যুগ অতিক্রান্ত হলে যখন ব্রহ্মার রাত্রি আরম্ভ হয়, তখন প্রলয় হয়। সেই প্রলয়ে প্রকৃতি, গুণ এবং স্বভাবের পরবশ জীব ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীরে লীন হয়ে যায়। আবার যখন ব্রহ্মার দিনের আরম্ভ হয়, তখন কল্পারম্ভ হয়। এই কল্পারম্ভে সমস্ত পরবশ জীব ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীর থেকে উৎপন্ন হয়—**'রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।'** (৮।১৯)। এটি প্রলয় এবং কল্পের অবশতা।

ব্রহ্মার শতবর্ষ পূর্ণ হলে যখন মহাপ্রলয় হয়, তখন সমস্ত জীব প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। প্রকৃতিতে লীন ঐসকল জীবের যখন কর্ম পরিপক্ক হয়, তখন ভগবান প্রকৃতিকে তাঁর বশে রেখে মহাসর্গের আদিতে ঐ পরবশ জীবের সৃষ্টি করেন—**'ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ'** (৯।৮)। এটি মহাপ্রলয় এবং মহাসর্গের অবশতা।

পূর্বকর্ম অনুযায়ী এই জীব যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করে এবং সেখানে মাতা-পিতার রজো-বীর্য অনুযায়ী তার যে স্বভাব সৃষ্টি হয়, সে সেই স্বভাবের পরবশ হয়ে থাকে এবং সেই অনুযায়ী সে বাধ্য হয়ে কর্ম করে—**'কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ'** (১৮।৬০)। এটি স্বভাবের অবশতা।

স্বভাব সৃষ্টি হয় বৃত্তির দ্বারা, বৃত্তি সৃষ্টি হয় গুণগুলির থেকে এবং গুণ সৃষ্টি হয় প্রকৃতির থেকে। অতএব একে স্বভাবের পরবশ বা গুণের পরবশ অথবা প্রকৃতির পরবশ যাই বলা হোক সব একই কথা। প্রকৃতপক্ষে সকলের আদিতে প্রকৃতিজাত পদার্থের পরবশতাই রয়েছে। এই পরবশতা থেকেই সকল পরবশতার উৎপত্তি। অতএব প্রকৃতিজাত পদার্থের পরবশতাকেই কোথাও কালের, কোথাও স্বভাবের, কোথাও কর্মের এবং কোথাও গুণগুলির পরবশতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর তাৎপর্য এই যে, যতক্ষণ জীব প্রকৃতি এবং তার গুণগুলি থেকে মুক্ত না হয়, পরমাত্মাকে লাভ না করে, ভগবানের শরণাগত না হয়, ততক্ষণ গুণ, কাল, ভোগ এবং স্বভাবের বশ (পরবশ) হয়েই থাকে অর্থাৎ জীব যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে সম্পর্ক-যুক্ত মনে করে, প্রকৃতিতে স্থিত থাকে, ততক্ষণ সে আসক্তির জন্য কখনো গুণগুলিতে, কখনো কালে, কখনো ভোগাদিতে এবং কখনও স্বভাবের পরবশ হতে থাকে। কখনো নিজবশে (স্বাধীন) থাকে না। তা ছাড়াও সে পরিস্থিতি, ব্যক্তি, স্ত্রী, পুত্র, ধন, গৃহাদিতেও পরবশ হতে থাকে। কিন্তু সে যখন গুণগুলির অতীত নিজ স্বরূপের অথবা পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করে, তখন তার আর পরবশতা থাকে না এবং সে স্বতঃ স্বাভাবিক স্বতন্ত্রতা প্রাপ্ত হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে জ্ঞানী স্ববশ হন কিন্তু ভক্ত স্ববশ হন না, বরং ভগবানের পরবশ হন। এর উত্তর হচ্ছে এই যে, ভগবান 'পর' নন, তিনি 'স্ব', স্বকীয়, আপনজন। অতএব যিনি স্বকীয় হন, তাঁর পরবশ হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে স্ববশ হওয়াই বোঝায়। ভক্তের এই পরবশতা জ্ঞানীর স্ববশতার থেকেও শ্রেষ্ঠ। কারণ জ্ঞানীর বহুদূর পর্যন্ত সূক্ষ্ম অহংকার (ব্যক্তিত্ব) থাকার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ভক্তের প্রথম থেকেই কোন অহংকার থাকে না। ভগবানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় ভক্তের রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি হয় না। ভগবান স্বয়ং তাকে জ্ঞান দান করেন (১০।১১) এবং স্বয়ং তাকে উদ্ধারও করেন (১২।৭)।

(৯২) গীতায় ব্যবহৃত 'তত্ত্বতঃ' পদের তাৎপর্য

পঞ্চকৃত্বঃ পদং প্রোক্তং তত্ত্বতঃ কৃষ্ণগীতয়া।
উদীরিতং চতুঃ কৃষ্ণে সকৃৎপ্রোক্তং তথাত্মনি॥

চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে **'তত্ত্বতঃ'** পদটি ভগবানের অবতারকে তত্ত্বতঃ জানবার অর্থাৎ দৃঢ়তাপূর্বক মানবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পদটির ব্যাখ্যা চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে করা হয়েছে যে ভগবান অজ হয়েও জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ ভগবানের অজ-ভাব নিরন্তর থাকে, নষ্ট হয় না। তিনি অব্যয় (অবিনাশী)-স্বরূপ হলেও অন্তর্ধান করেন অর্থাৎ তাঁর অব্যয়ভাব নিরন্তর থাকে। তিনি প্রাণিমাত্রেরই মহেশ্বর (প্রভু) হয়েও মাতাপিতার আজ্ঞা পালন করেন, তাঁদের অধীন হন, এরূপ করলেও তাঁর ঈশ্বরত্ব (আধিপত্য) নষ্ট হয় না। তিনি প্রকৃতিকে স্ববশে এনে নিজে যোগমায়ার দ্বারা প্রকটিত হন। তাঁর জন্মগ্রহণ জীবেদের মতো কর্মের অধীন নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক শ্লোকে **'তত্ত্বতঃ'** পদটি নিজ স্বরূপ ঠিকমতো জানার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার নিজ স্বরূপের বোধ ঠিকমতো হয়ে যায়, সে আর কখনো নিজ স্থিতিতে বিচলিত হয় না অর্থাৎ অতি অনুকূল কিংবা অতি প্রতিকূল পরিস্থিতি এলেও সে নিজ স্থিতিতে অবিচল থাকে (৬।২২)। কারণ তার প্রকৃতি এবং গুণের পরবশতা চলে যায় অর্থাৎ সে কখনো কিছুমাত্রও প্রকৃতির গুণে পরবশ হয় না।

সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে **'তত্ত্বতঃ'** পদটি ভগবৎতত্ত্বের ঠিকঠিক অনুভব করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ সবকিছুই ভগবান। ভগবান ভিন্ন অন্য কারো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। এইরূপে তত্ত্বতঃ ভগবানকে যে জানে, তার আর কিছু জানার বাকী থাকে না।

দশম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে **'তত্ত্বতঃ'** পদটি ভগবানের প্রভাব, সামর্থ্য ইত্যাদি অর্থাৎ ঐসবে প্রকটিত হওয়া বিভূতিগুলিকে জানা এবং দৃঢ়ভাবে মানার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এইরূপে যে অটলভাবে মেনে নেয়, ভগবানে তার ভক্তিও অটল হয় অর্থাৎ তার কাছে স্বপ্নেও ভগবান ভিন্ন অন্য কিছুর পৃথক্ সত্তা, গুরুত্ব বা বিশেষত্ব থাকে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্ন সংখ্যক শ্লোকে **'তত্ত্বতঃ'** পদটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমবার 'তত্ত্বতঃ' পদটি পরমাত্মাকে তত্ত্বত জানার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে এই পরমাত্মাই অনেক রূপে, অনেক আকৃতিতে, বিভিন্ন কার্যসিদ্ধির জন্য বারংবার আবির্ভূত হন এবং সাধকদের নিজ-নিজ চিন্তা অনুযায়ী নানাপ্রকার ইষ্টদেবের রূপে ব্যক্ত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা একই। দ্বিতীয়বার **'তত্ত্বতঃ'** পদটি পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ পরমাত্মাকে তত্ত্বের দ্বারা জানার পরে ভক্ত তৎকালে পরমাত্মায় প্রবিষ্ট হয়ে যায়, পরমাত্মার সঙ্গে নিজ বাস্তবিক অভিন্নতা অনুভব করে নেয়।

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে, সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে, দশম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্ন সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত 'তত্ত্বতঃ' পদটি ভগবৎ তত্ত্ব ঠিকমতো জানার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে[১] এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক শ্লোকে ব্যবহৃত **'তত্ত্বতঃ'** পদটি নিজস্বরূপকে ঠিকমতো জানার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তত্ত্বতঃ জানবার অর্থ হচ্ছে—যেমন আছে, ঠিক তেমনি জেনে নেওয়া। এই জানা দুই প্রকারের হয়—(১) নিজ শুদ্ধ-বুদ্ধ স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করা, তাকে ঠিকমতো অনুভব করা, এবং (২) সবেরই মূলে পরমেশ্বর আছেন, সেই পরমেশ্বর থেকেই সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হয়—এটি দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেওয়া। জ্ঞানযোগে নিজ স্বরূপের সাক্ষাৎকার করাই তত্ত্বতঃ জানা

---

[১]নবম অধ্যায়ের চব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে এবং একাদশ অধ্যায়ের চুয়ান্ন সংখ্যক শ্লোকে ব্যবহৃত 'তত্ত্বেন' পদটিও ভগবৎ-তত্ত্বকে ঠিকমতো না জানা এবং জানার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এবং ভক্তিযোগে 'সবের মূলে ভগবানই আছেন'—এটি দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেওয়াই হল তত্ত্বতঃ জানা ; কারণ, সবের মূলে যথার্থই ভগবান আছেন। দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেওয়া তত্ত্বতঃ জানার থেকে কিছু কম নয় অর্থাৎ তত্ত্ব দ্বারা জানার যে ফল হয় সেই একই ফল হয় দৃঢ়তার সঙ্গে মানলে। ভক্তগণ 'সবের মূলে ভগবানই আছেন'—এটিই প্রথমে দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেন, পরে তত্ত্বতঃ জেনে নেন যে, 'সবকিছু বাসুদেবই', অর্থাৎ তাঁদের এটি অনুভূত হয়। সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে এই মানাকে বলা হয়েছে 'জ্ঞান' নামে এবং অনুভব করাকে বলা হয়েছে 'বিজ্ঞান' নামে।

'সবকিছুই ভগবান বাসুদেব'—এটি অনুভূত হলে ভক্তের নিজ স্বরূপের অনুভব স্বতঃই হয়ে যায়। এই কথাটি ভগবান গীতায় **'যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে'** (৭।২), **'স সর্ববিৎ'** (১৫।১৯) পদ দ্বারা বলেছেন। রামচরিতমানসে ভগবান রামও বলেছেন যে—

মম দরসন ফল পরম অনূপা।
জীব পাব নিজ সহজ সরূপা॥

(৩।৩৬।৫)

(৯৩) গীতায় 'যৎ' শব্দ দু'বার প্রয়োগের তাৎপর্য

দ্বির্যচ্ছব্দপ্রয়োগস্তু গীতায়াং যত্র কুত্রচিৎ।
যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধাৎতাৎপর্যমিহ কথ্যতে॥

(১) **'যৎ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ ....'** (৩।২১)—জনসাধারণের ওপর শ্রেষ্ঠ পুরুষদের আচরণের প্রভাবই পড়ে। কারণ সাধারণ ব্যক্তিগণ কোন সময় কিভাবে কিরূপ ক্রিয়া করে—সেদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি প্রায়শঃই যায় না। ভগবান সেইজন্য নিজের উদাহরণ দিয়েছেন যে, 'ত্রিলোকে আমার করণীয় কিছু নেই, তথাপি আমি কর্তব্য-কর্ম করি' (৩।২২)। জ্ঞানীদেরও ভগবান লোকসংগ্রহের জন্য কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন (৩।২৫)। অতএব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ কর্ম করেন জনসাধারণের ওপর প্রথমে সেইগুলিরই প্রভাব পড়ে। এরপর তাঁর বাক্যের প্রভাব পড়ে। প্রভাবও সেই বাক্যেরই কার্যকরী হয়, যে বাক্যানুসারে তিনি আচরণ করেন। যে বাক্যের সঙ্গে তাঁর আচরণ মেলে না, সেই বাক্যের তত প্রভাব পড়ে না ; কারণ, সেই বাক্যে শক্তি থাকে না। কিন্তু সাধক গুরু, সন্ত-মহাত্মার বাক্যের ন্যায় সাধারণ মানুষের উপদেশ থেকেও উপকৃত হতে পারে।

(২) **'যদা যদা হি ধর্মস্য ....'** (৪।৭)—ভগবান কোন যুগে একাধিকবার অবতার হয়ে আসবেন অথবা কোন যুগে একবারও অবতার গ্রহণ করবেন না—এরূপ কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণ করার নির্দিষ্ট কোন যুগ, বছর, মাস, দিন ইত্যাদির বাধ্যবাধকতা নেই। যখন যখন ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সময় ভগবান অবতীর্ণ হন অর্থাৎ যে যুগে মানুষের যেমন আচার-ব্যবহার হওয়া উচিত তা না হয়ে যখন তার চেয়ে বেশী অধঃপতন হয় এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন ভগবান অবতীর্ণ হন। কি পরিমাণে ধর্মের হ্রাস এবং অধর্মের বৃদ্ধি হলে ভগবান অবতার হয়ে আসবেন—এ বিষয়ে মানুষ কোন অনুমান করতে পারে না। এই ব্যাপারটি ভগবানই ঠিকমতো জানেন। তবে এরূপ ধারণা করা যায় যে, যে যুগে ধর্মের যেরূপ মর্যাদা থাকা উচিত, সেরূপ না হয়ে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে যখন অধঃপতন হয় তখন ভগবান অবতীর্ণ হন। ত্রেতাযুগে রাক্ষসেরা ঋষিদের বধ করে অস্থির (হাড়ের) পাহাড় তৈরি করেছিল, কিন্তু বর্তমান কলিযুগে সাধু-ব্রাহ্মণগণ ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করেন এবং নিজধর্ম প্রচার করতে পারেন। বিপদ এলেও তা খুব কম জনের

ওপর বর্তায়। কলিযুগে ত্রেতাযুগের থেকেও বেশী পরিমাণে পতন হওয়ার কথা, কিন্তু ততটা পতন এখনো চোখে পড়ে না।

(৩) 'যতো যতো নিশ্চরতি ......' (৬।২৬)—এখানে 'যতঃ যতঃ' পদ দ্বারা শুধু যেখান যেখান থেকে এই পঞ্চমী বিভক্তির অর্থই হয় না বরং এই অর্থ হয় যে, মন যখন, যেখানে, যে যে প্রয়োজনে, যখন যেমন ধাবিত হয়, তখনই মনকে সেখান থেকে প্রত্যাহার করে পরমাত্মাতেই স্থিত করা উচিত। এখানে এই কথাটি সাধকদের বিশেষভাবে সতর্ক এবং সজাগ থাকার জন্য বলা হয়েছে ; কারণ, সাবধানতাই সাধকদের সিদ্ধির হেতু হয়ে থাকে।

(৪) ' যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ ....' (৭।২১) —এখানে 'যঃ যঃ' পদটিতে উপাসকের এবং 'যাং যাং' পদটিতে উপাস্যের কথা বলা হয়েছে—যে যে উপাসক যে যে উপাস্যকে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করতে চায়, সেই সেই সাধকের শ্রদ্ধাকে ভগবান সেই সেই উপাস্যের প্রতি দৃঢ় করে দেন। ভগবানের এরূপ বলার এই তাৎপর্য মনে হয় যে, 'আমি সকল উপাসনাকারীকে কেবল নিজের প্রতিই আকৃষ্ট করি না, তাদের ধরে রাখি না, বরং উপাসকের রুচি, শ্রদ্ধা কোন্ উপাস্যের প্রতি রয়েছে, সেটিও আমি লক্ষ্য করি। অন্তর্যামী ও সর্বসমর্থ হয়েও আমি ঐ উপাসকদের ঐ স্থান থেকে বিচলিত না করে সেখান থেকে না সরিয়ে সেই উপাস্যতেই তাদের শ্রদ্ধা দৃঢ় করে দিই।' ভগবানের এরূপ কৃপা অনুভব করে উপাসকের আকর্ষণ, শ্রদ্ধা, প্রেম শুধু ভগবানের প্রতিই হওয়া উচিত, কারণ জীবের কল্যাণ ও হিত প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্মুখী হলেই হয়। তাদের ভেবে দেখা উচিত যে যদি ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে আমার রুচি বজায় রাখেন, তাহলে আমারও ভগবানের রুচিমতো চলা উচিত ; কারণ, তাঁর মতো দয়ালু, হিতৈষী আর কে আছেন বা হতে পারেন ? এর তাৎপর্য এই যে, ভগবানের এই পক্ষপাতশূন্য ব্যবহার দ্বারা তাঁর নির্লিপ্ততা, কৃপাশীলতা এবং প্রাণীমাত্রেরই যে তিনি হিতৈষী—সেই জ্ঞান হয়।

উপরিউক্ত পদটির দ্বারা আর একটি কথা পরিষ্কার হয় যে, উপাসনাতে উপাসকের রুচি এবং শ্রদ্ধাই মুখ্য ; সে যে কাউকেই উপাসনা করতে পারে ; এতে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

(৫) 'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ....' (৮।৬)—ভগবান জীবের ভবিষ্যতের সমস্ত জন্মের অন্তকারী এই অন্তিম মনুষ্যশরীর দিয়ে তাকে এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, 'সে সারাজীবন সাধনা করে, আমার শরণাগত হয়ে যেন পরের সমস্ত জন্মগুলির অন্ত করতে পারে এবং সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। যদি তার এই চেতনা সারাজীবনেও না হয়, তবুও শুধু অন্তিম সময়েও যদি সে আমাকে স্মরণ করে, তাহলেই সে আমাকে প্রাপ্ত হবে।' কারণ জীব মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করে, সেই স্মরণ অনুসারে সেই সেই ভাব অর্থাৎ জন্ম প্রাপ্ত হয়। ভগবানের এটি অত্যন্ত দয়া যে, যে অন্তকালীন চিন্তার দ্বারা অন্য (কুকুর আদি) যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই অন্তকালীন চিন্তার দ্বারা (ভগবানের চিন্তা করলে) ভগবানকে পর্যন্ত পেতে পারে।

(৬) 'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং ......' (১০।৪১)—সাধকদের ভাব, রুচি, শ্রদ্ধা, স্বভাব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, সুতরাং কেউ কোন এক বিষয়ে বিশেষত্ব দেখে আবার অন্য কেউ দেখে অন্য কিছুতে। সেইজন্য ভগবান বিভূতির রূপে তাঁকে চিন্তা করার কথা বলে সাধকদের এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, 'সাধকরা যে বস্তুতে, যেখানে যেখানে এবং যখন যখন কোন মহত্ত্ব দেখে বা বিশেষত্ব দেখে, সেই মহত্ত্ব বা বিশেষত্বকে সেই পদার্থের না ভেবে যেন সেটি আমারই বলে ভাবে।' অর্থাৎ সাধকদের দৃষ্টি আমার দিকেই থাকা উচিত, কোন ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদির দিকে নয়।

(৯৪) গীতায় ব্যবহৃত 'কৃত্বা', 'জ্ঞাত্বা' এবং 'মত্বা' পদগুলির তাৎপর্য

ত্রিষু যোগেষু গীতায়াং মুখ্যত্বেন পদত্রয়ম্।
জ্ঞানে জ্ঞাত্বা ব্রজেদ্ ভক্তৌ মত্বা কৃত্বা চ কর্মণি॥[১]

গীতায় '**কৃত্বা**' (করা), '**জ্ঞাত্বা**' (জানা) এবং '**মত্বা**' (মানা)—এই তিনটি পদ মুখ্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কর্মযোগে নিষ্কামভাবে কর্ম করাই মুখ্য। অতএব গীতায় যে যে স্থানে কর্মযোগের প্রকরণ আছে, সেখানে মুখ্যতঃ কর্তব্য-কর্ম করার কথাই আছে, যেমন—'কর্ম করলেও আবদ্ধ হয় না' (৪।২২) ইত্যাদি। এইরূপ '**কুরু**', '**করোতি**', '**কুর্বন্**' ইত্যাদি পদও করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যদিও কর্মযোগে 'করাই' মুখ্য, তাহলেও সেখানে '**জ্ঞাত্বা**' অর্থাৎ জানার কথাও এসেছে। কারণ শুধু কর্ম করলেই শরীর এবং সংসার থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয় না, সম্পর্ক-ছেদ তখনই হতে পারে যখন নিষ্কামভাবে এবং কর্মের তত্ত্ব জেনে কর্ম করা হয়। সুতরাং গীতায় কর্মের তত্ত্ব জানবার কথা বলা হয়েছে যেমন—'এইরূপে কর্মতত্ত্ব জেনে মোক্ষাভিলাষিগণ কর্ম করেছেন' (৪।১৫); 'যা জানলে তুমি অশুভ সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে' (৪।১৬); 'এইরূপ সমস্ত যজ্ঞকে কর্মোদ্ভূত জেনে তুমি অশুভ সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হবে' (৪।৩২)।

জ্ঞানযোগে নিজ স্বরূপকে জানাই মুখ্য। সুতরাং গীতায় যে যে স্থানে জ্ঞানযোগের কথা বলা হয়েছে, সেখানে মুখ্যতঃ জানার কথাই আছে; যেমন—'যাঁকে জানলে আর মোহাদি উৎপন্ন হয় না' (৪।৩৫) ইত্যাদি। জ্ঞানযোগের প্রকরণে যেখানে '**মত্বা**' অর্থাৎ মেনে নেওয়ার কথা এসেছে, তাও প্রকৃতপক্ষে 'জানা'র অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন—'গুণ এবং কর্মের বিভাগকে যাঁরা জানেন তাঁরা গুণই গুণের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে এইরূপ মেনে নিয়ে তাতে আসক্ত হন না' (৩।২৮)। এইরূপ '**বেত্তি**', '**পশ্যতি**' ইত্যাদি পদও জানার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভক্তিযোগে ভগবানকে মানাই মুখ্য। সুতরাং গীতায় যে যে স্থানে ভক্তিযোগের প্রকরণ আছে সেখানে মুখ্যতঃ মানার কথা বলা হয়েছে; যেমন—'ভগবান সর্বভূতের আদি' (৯।১৩), তাহলে আমার আদিও ভগবান। 'সর্বভূতে ভগবান স্থিত' (৬।৩০; ১০।২০; ১৫।১৫), তবে আমাতেও তিনি স্থিত। 'সব ভগবানে অবস্থিত' (৭।৭; ৮।২২) তাহলে আমিও ভগবানে অবস্থিত। 'সকলের অধীশ্বর ভগবান' (৪।৬; ৫।২৯; ৯।১১; ২৪), তাহলে আমার অধীশ্বরও ভগবান। 'সবকিছু ভগবান দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছে' (৭।১২; ১০।৫; ৮), তবে আমাদ্বারা যা কিছু হচ্ছে, তা সবই ভগবানের সত্তা-স্ফূর্তি থেকেই হচ্ছে। 'ভগবান সবার বিধায়ক' (৭।২২; ১৮।৬১), তাহলে আমারও বিধায়ক তিনি। 'ভগবান সকল প্রাণীর সুহৃদ' (৫।২৯), তাহলে তিনি আমারও সুহৃদ। 'ভগবান ভক্তদের যোগক্ষেম বহন করেন' (৯।২২), তবে তিনি আমারও যোগক্ষেম নিশ্চয়ই বহন করবেন; ইত্যাদি। এইসব পদগুলিতে 'মানা'কেই মুখ্যরূপে দেখানো হয়েছে।

ভক্তিযোগের প্রকরণে যেখানে '**জ্ঞাত্বা**' অর্থাৎ জানার কথা আছে, তাও প্রকৃতপক্ষে মানার অর্থেই ব্যবহৃত। যেমন—'ভক্তগণ আমাকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত প্রাণিজগতের সুহৃদ জেনে পরম শান্তি লাভ করেন' (৫।২৯); 'মহাত্মা পুরুষগণ আমাকে সমস্ত প্রাণীর আদি এবং অবিনাশী জেনে আমার ভজনা করেন' (৯।১৩)। এইরূপ '**বেত্তি**', '**জানাতি**' ইত্যাদি পদও 'মানা'র অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে (১০।৭; ১৫।১৯ ইত্যাদি)।

ভক্তদের যে দৃঢ় বিশ্বাস, তা তত্ত্বজ্ঞান থেকে কম নয়, বরং কিয়দংশে তত্ত্বজ্ঞান হতেও শ্রেষ্ঠ। কারণ তত্ত্বজ্ঞান হলেও সাধকদের মধ্যে সূক্ষ্ম অহংভাব থাকতে পারে, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস হলে অহংভাব থাকতেই পারে না। ভক্তের এই দৃঢ় বিশ্বাসকে 'ভগবন্নিষ্ঠা' বলা হয়। ভগবান যেমন

[১]'কর্মণি' ইতি কর্মযোগে।

সমস্ত গুণের অতীত (৭।১৩), তেমনি ভগবন্নিষ্ঠাও গুণাতীত। জ্ঞানী যেমন সর্বত্র ভগবৎতত্ত্ব অনুভব করেন, তেমনি ভক্তও 'সর্বত্র ভগবান বিরাজিত'—এটি কেবল বিশ্বাসরূপে নয়, বরং প্রত্যক্ষ করতে থাকেন।

জ্ঞানমার্গে 'জানার' মুখ্যতা থাকায় জ্ঞানযোগী সাধক জড়ত্ব থেকে পৃথক্ হন ; সুতরাং তাঁদের শরীর চিন্ময় হয় না। কিন্তু ভক্তদের ভগবানে বিশ্বাস, ভগবদ্ভাব এতো বৃদ্ধি পায় যে তাঁদের শরীরে জড়ত্বের অভাবও ঘটতে পারে এবং শরীরও চিন্ময় হতে পারে। শরীর চিন্ময় হওয়ার জন্যই প্রহ্লাদের শরীর অগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করা যায় নি, শস্ত্রদ্বারা ছেদন করা যায় নি এবং বিষ দিয়ে মারা যায় নি ; ভক্তিমতী মীরার দেহ ভগবানের বিগ্রহে মিলিয়ে গিয়েছিল ; তুকারাম মহারাজ সশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করেছিলেন।

♠ ♠ ♠

(৯৫) গীতায় 'তৎ' এবং 'অস্মৎ' পদ দ্বারা ভগবানের বর্ণনা

অস্মচ্ছব্দেন গীতায়াং শ্রীকৃষ্ণো বর্ণ্যতে স্বয়ম্।
তচ্ছব্দেনাপি তস্যৈব বর্ণনং বর্ততে বিভোঃ॥

গীতায় এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায় যে, ভগবান একই তত্ত্বের বর্ণনা বিভিন্ন রীতিতে করেছেন। যেমন, ভগবান নিজের বর্ণনা 'তৎ' পদের দ্বারা করেছেন আবার 'অস্মৎ' পদ দ্বারাও করেছেন। কারণ সাধকদের আগ্রহ, বিশ্বাস, যোগ্যতা ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ হয় ; সুতরাং কারও আগ্রহ 'তৎ'-পদবাচী পরমাত্মার এবং কারও আগ্রহ 'অস্মৎ' পদবাচী পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য হয়।

'যাঁর থেকে অনাদিকাল হতে এই সৃষ্টি বিস্তার লাভ করেছে তাঁর শরণ নেওয়া উচিত', **'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী'** (১৫।৪) ; 'যে পরমাত্মা হতে সমস্ত জগৎ-সংসারের উৎপত্তি এবং যার দ্বারা এই সমস্ত সংসার পরিব্যাপ্ত, সেই পরমাত্মাকে নিজ কর্ম দ্বারা অর্চনা করা উচিত' **'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্। স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'** (১৮।৪৬)—এইরূপ বলে 'তৎ' পদ দ্বারা এবং 'আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির মূল, আমা হতেই সমস্ত জগৎ প্রবর্তিত হয়', **'অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে'** (১০।৮)—এই বলে 'অস্মৎ' পদ দ্বারা ভগবান নিজের দ্বারা সমস্ত জগৎ সংসারের উৎপত্তির রহস্য জানালেন এবং নিজেও যে জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন তাও জানালেন।

'তুমি অনন্যভাবে তাঁরই শরণ নাও' **'তমেব শরণং গচ্ছ'** (১৮।৬২)—এই বলে 'তৎ' পদ দ্বারা এবং তুমি অনন্যভাবে আমার শরণাগত হও' **'মামেকং শরণং ব্রজ'** (১৮।৬৬) এই বলে 'অস্মৎ' পদ দ্বারা ভগবান তাঁর শরণ নেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

'সকল প্রাণী যাঁর অন্তর্গত এবং যাঁর দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, সেই পরমাত্মাকে অনন্য ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়', **'পুরুষঃ স পরঃ ....সর্বমিদং ততম্'** (৮।২২) এই বলে 'তৎ' পদ দ্বারা এবং, 'আমি অব্যক্ত মূর্তিতে এই জগতে ব্যাপ্ত এবং সকল প্রাণী আমাতেই অবস্থিত', **'ময়া ততমিদং........মৎস্থানি সর্বভূতানি'** (৯।৪)—এই বলে 'অস্মৎ' পদ দ্বারা ভগবান তাঁর মধ্যে সকল প্রাণী অবস্থিত এবং তিনিই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত—এই কথা জানালেন।

'যা জ্ঞাতব্য (জ্ঞেয়-তত্ত্ব), আমি তার বর্ণনা করব, এটি জ্ঞাত হলে অমরত্ব লাভ হয়', **'জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে'** (১৩।১২)—এই বলে 'তৎ' পদ দ্বারা এবং 'আমিই বেদসমূহের একমাত্র জ্ঞাতব্য', **'বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ'** (১৫।১৫) এই বলে 'অস্মৎ' পদ দ্বারা ভগবান তাঁকে জ্ঞাতব্য তত্ত্বরূপে জানবার জন্য বলেছেন।

'ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন', **'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি'** (১৮।৬১)—এই বলে 'তৎ' পদ দ্বারা এবং 'আমিই সবার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত

আছি', 'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' (১৫।১৫) এই বলে 'অস্মৎ' পদে ভগবান যে সমস্ত প্রাণীর হৃদয়েই অবস্থিত, তা জানিয়েছেন।

'যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে সর্বজ্ঞ, পুরাণ, অনুশাসিতা ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত সগুণ-নিরাকার পরমাত্মার চিন্তা করতে করতে শরীর ত্যাগ করে, সে সেই পরম দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হয়' **'কবিং পুরাণং ... ... পুরুষমুপৈতি দিব্যম্'** (৮।৯-১০)—এই বলে 'তৎ' দ্বারা এবং 'যে ব্যক্তি অন্তকালে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে, সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়', **'অন্তকালে চ মামেব ... ... মদ্ভাবং যাতি'** (৮।৫)—এই বলে 'অস্মৎ' পদ দ্বারা ভগবান অন্তসময়ে তাঁকে যারা স্মরণ করে, তাদের তাঁকে প্রাপ্তির কথা বলেছেন।

এর তাৎপর্য এই যে, গীতায় 'তৎ' এবং 'অস্মৎ' পদ দ্বারা একই পরমাত্মার বর্ণনা করা হয়েছে। 'যা প্রাপ্ত হলে জীব আর সংসারে ফিরে আসে না, তাই আমার পরমধাম **'যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'** (৮।২১), **'যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'** (১৫।৬)—এই বলে 'তৎ' এবং 'অস্মৎ' পদবাচী পরমাত্মা যে একই সেকথা বোঝানো হয়েছে।

(৯৬) গীতার প্রতি বিহঙ্গ-দৃষ্টি

অষ্টাদশাদ্ যে বিষয়াস্তু পূর্বমুক্তাশ্চ কৃষ্ণেন কিরীটিনে বৈ।
অষ্টাদশে তে চ বিধান্তরেণ ব্যাসেন সর্বে হি সমাসতশ্চ॥

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ গীতার সার। এতে ভগবান কর্তৃক পূর্বে কথিত সমস্ত বিষয়গুলির উপসংহার করা হয়েছে, যার মধ্যে তিনটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়—(১) পূর্বের অধ্যায়গুলিতে যে বিষয় সংক্ষেপে বলা হয়েছে, এই অধ্যায়ে সেগুলির বিস্তারিতভাবে উপসংহার করা হয়েছে ; (২) পূর্বের অধ্যায়গুলিতে যে সব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে, সেগুলির উপসংহার এখানে সংক্ষেপে করা হয়েছে ; (৩) পূর্বের অধ্যায়গুলিতে বর্ণিত বিষয়গুলিও এখানে প্রকারান্তরে অর্থাৎ কিছুটা অন্যভাবে বলা হয়েছে।

ভগবানের উপদেশে দুই প্রকারের নিষ্ঠা প্রধানভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেটি ভগবান **'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু'** (২।৩৯), পদটিতে সঙ্কেতরূপে এবং **'লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা ... ... জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্'** (৩।৩) পদে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। ঐ দুটি নিষ্ঠার তত্ত্ব জানার জন্য অর্জুন অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই প্রশ্ন করেছেন। সুতরাং ঐ দ্বিবিধ নিষ্ঠায় উল্লিখিত বিষয়গুলির এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে সংক্ষেপে, বিস্তারিতভাবে অথবা প্রকারান্তরে উপসংহার করা হয়েছে।

যে ভগবদ্ভক্তির বর্ণনা সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত বিশেষভাবে করা হয়েছে, সেটি ভগবানের হৃদয়ের কথা এবং ওই দুটি নিষ্ঠা থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি সাংখ্যনিষ্ঠা বা যোগনিষ্ঠা নয়, বরং এটি হল ভগবদ্‌নিষ্ঠা, যাতে কেবল ভগবৎপরায়ণতা থাকে। এই ভগবদ্‌নিষ্ঠার বর্ণনা করে ভগবান নিজ উপদেশাবলীর উপসংহার করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঊনচল্লিশ সংখ্যক শ্লোক থেকে অধ্যায়টির শেষ পর্যন্ত কর্মযোগের বর্ণনা আছে। আবার তৃতীয় অধ্যায়েও প্রধানভাবে তারই বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একষট্টি সংখ্যক শ্লোকে **'মৎপরঃ'** পদটি ভগবৎপরায়ণতার জন্য ব্যবহৃত। এটিকেই তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে কর্মযোগে উপাসনার কথাও কিছুটা যুক্ত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান কর্মযোগের ক্রম বলতে গিয়ে নিজ জন্ম এবং কর্মের তত্ত্ব জানিয়েছেন এবং তাঁর কর্ম আদর্শরূপে চিহ্নিত করে কর্মযোগের বর্ণনা করেছেন। আবার পঞ্চম অধ্যায়ে ঐ কর্মযোগ এবং

সাংখ্যযোগের বারংবার (একবার কর্মযোগের এবং আর একবার সাংখ্যযোগের) আলোচনা করেছেন এবং শেষে ভক্তিসম্বন্ধে আলোচনা করে অধ্যায়ের সমাপ্তি করেছেন। এইপ্রকারে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত কর্মযোগের বর্ণনা করা হয়েছে। এটিই আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত প্রকারান্তরে বলা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের তেরো থেকে ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোক এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উনিশ থেকে চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত বিচার-প্রধান সাংখ্যযোগের বর্ণনা করা হয়েছে। সেটিই অষ্টাদশ অধ্যায়ের তেরো থেকে আঠারো সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত প্রকারান্তরে বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে যে নিয়ত কর্মের (শাস্ত্রোক্ত নির্দিষ্ট কর্মের) কথা বলা হয়েছে, সেটিই অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ থেকে আটচল্লিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তিযোগের যে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেটিকে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছাপান্ন থেকে ছেষট্টি সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত পূর্বের চেয়ে কিছু সংক্ষেপে এবং কিছুটা প্রকারান্তরে বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে চারটি বর্ণের বিষয়ে যা সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, সেটিই অষ্টাদশ অধ্যায়ের একচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ শ্লোক পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বলা আছে। এখানে (১৮।৪১-৪৪এ) সপ্তদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোকে ব্যবহৃত স্বভাবজা শ্রদ্ধারও উপসংহার করা হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে।

ভগবান গীতায় সাংখ্যযোগের বর্ণনা করতে গিয়ে কোথাও বলেছেন যে প্রকৃতি এবং তার গুণগুলির দ্বারাই সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয় (৩।২৭ ; ১৩।২৯), কোথাও আবার বলেছেন যে, দ্রষ্টা গুণগুলি ভিন্ন অন্য কাহাকেও কর্তা দেখেন না (১৪।১৯) ; আবার কোথাও বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির মধ্যে প্রবর্তিত হচ্ছে (৫।৯) ইত্যাদি। এইগুলিই অষ্টাদশ অধ্যায়ের তেরো থেকে আঠারো সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত সংক্ষেপে এবং প্রকারান্তরে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়ের পঞ্চম থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত যে গুণগুলির বর্ণনা আছে, সেগুলিই অষ্টাদশ অধ্যায়ের কুড়ি সংখ্যক শ্লোক থেকে চল্লিশ সংখ্যা শ্লোক পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে এবং প্রকারান্তরে বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ এবং অষ্টম অধ্যায়ে যে ধ্যানের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেটিই অষ্টাদশ অধ্যায়ের একান্ন সংখ্যক থেকে তিপ্পান্ন সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত প্রকারান্তরে এবং সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এখানে (১৮।৫১-৫৩ তে) ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত বর্ণিত জ্ঞানযোগের কুড়িটি সাধনেরও উপসংহার করা হয়েছে বলেও ধরা যেতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত, নবম অধ্যায়ের ষোড়শ থেকে উনিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত, দশম অধ্যায়ের বিশ সংখ্যক থেকে আটত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত যে বিভূতিগুলি ভগবান বর্ণনা করেছেন, সেইগুলিই অষ্টাদশ অধ্যায়ের আটাত্তর সংখ্যক শ্লোকে সঞ্জয় সংক্ষেপে উপসংহার করেছেন।

একাদশ অধ্যায়ে ভগবানের বিশ্বরূপের যে বর্ণনা আছে, সেটিকেই অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাতাত্তর সংখ্যক শ্লোকে সঞ্জয় তাঁর স্মৃতি হিসাবে বর্ণনা করতে গিয়ে সংক্ষেপে উপসংহার করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে, চতুর্থ অধ্যায়ের উনচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে এবং সপ্তদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে যে শ্রদ্ধার বর্ণনা আছে, সেটিকেই অষ্টাদশ অধ্যায়ের একাত্তর সংখ্যক শ্লোকে ভগবান সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের একত্রিশ সংখ্যক থেকে আটত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত যে ক্ষাত্রধর্মের বর্ণনা আছে, সেটিই অষ্টাদশ অধ্যায়ের তেতাল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের তেত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে যে স্বভাবের পরবশতার কথা বলা হয়েছে, সেটিরই অষ্টাদশ অধ্যায়ের উনষাট এবং ষাট সংখ্যক শ্লোকে উপসংহার করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের একত্রিশ সংখ্যক থেকে ছেচল্লিশ

সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত মোহসম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে সেটিরই অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাত, ষাট, বাহাত্তর এবং তিয়াত্তর সংখ্যক শ্লোকে সংক্ষেপে উপসংহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চান্ন থেকে বাহাত্তর সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণগুলির বর্ণনা করা হয়েছে, সেইগুলিই অষ্টাদশ অধ্যায়ের দশ-এগারো সংখ্যক শ্লোকে সংক্ষেপে উপসংহার করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে মৃত্যুকালে স্মরণ করার যে কথাটি বলা হয়েছে, সেটিরই অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাতান্ন-আটান্ন সংখ্যক এবং পঁয়ষট্টি সংখ্যক শ্লোকে সংক্ষেপে উপসংহার করা হয়েছে।

ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত যে দৈবী সম্পদের লক্ষণগুলির বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, সেই লক্ষণগুলিরই অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত প্রকারান্তরে বর্ণনা করা হয়েছে।

ষোড়শ অধ্যায়ের সপ্তম থেকে কুড়ি সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত যে আসুরী সম্পদের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাতষট্টি সংখ্যক শ্লোকে গীতাশ্রবণের অনধিকারী ব্যক্তিদের বর্ণনা করতে গিয়ে সেটি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের আটাশ সংখ্যক শ্লোকে যে স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, অষ্টাদশ অধ্যায়ের সত্তর সংখ্যক শ্লোকে **'জ্ঞানযজ্ঞেন'** পদ দ্বারা তারই উপসংহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ থেকে ত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত যে শোকের নিষেধ আছে, অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টি সংখ্যক শ্লোকে **'মা শুচঃ'** পদ দ্বারা তারই উপসংহার করা হয়েছে।

এইভাবে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতার সাররূপে পরিচিত। এই অধ্যায়টি ঠিকমতো চিন্তা করলে গীতার সার অনুধাবন করা যায়।

সমস্ত গ্রন্থের সার বেদ, বেদের সার উপনিষদ, উপনিষদের সার হচ্ছে ভগবদ্গীতা এবং ভগবদ্গীতার সার হল সর্বগুহ্যতম তত্ত্ব অর্থাৎ সগুণ ভগবানের শরণাগতি, যার বর্ণনা অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টি সংখ্যক শ্লোকে করা হয়েছে।

(৯৭) গীতা-পাঠের বিধি

বাঞ্ছন্তি পঠিতুং গীতাং ক্রমেণ বিক্রমেণ বা।
তদর্থং বিধয়ঃ প্রোক্তাঃ করন্যাসাদিনা সহ॥

মানুষ পছন্দমতো কোন কাজ যখন করে তখন সে স্বভাবতঃই সেই কাজে একেবারে লীন, তন্ময় এবং তৎস্বরূপ হয়ে যায়। এরূপ স্বভাব হওয়া সত্ত্বেও সে প্রকৃতি এবং তার কার্যের (পদার্থ এবং ভোগের) সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না ; কারণ, সে সর্বদাই এগুলি থেকে পৃথক্। কিন্তু পরমাত্মার নাম-জপ, চিন্তন, সিদ্ধান্ত ইত্যাদির সঙ্গে মানুষ যেমন যেমন আগ্রহ সহকারে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তেমন তেমনই সে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে থাকে। তাঁর মধ্যে তল্লীন, তন্ময় এবং তৎস্বরূপ হতে থাকে ; কারণ সে পরমাত্মার সঙ্গে সর্বদাই স্বতঃ একাত্ম। অতএব মানুষ যখন ভগবচ্চিন্তন, ভগবদ্বিষয়ক গ্রন্থের পঠন-পাঠন, গীতা, রামায়ণ, ভাগবত আদি গ্রন্থের পাঠ, স্বাধ্যায়াদি করবে তখন তা যেন অত্যন্ত রুচিপূর্বক তৎপরতার সঙ্গে, তল্লীন হয়ে উৎসাহ সহকারে করে। এবারে গীতা পাঠের বিধি জানানো হচ্ছে।

গীতা পাঠ করার জন্য কুশ, উল অথবা চটের আসন বিছিয়ে তার ওপর পূর্ব বা উত্তর মুখে বসা উচিত।

গীতা পাঠের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করতে হবে—

'ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য ভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা॥ অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ইতি

বীজম্।। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ইতি শক্তিঃ। অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ইতি কীলকম্'।।

এই মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা এইরূপ—

মালায় যেমন অনেক মণি বা গুটিকা গাঁথা থাকে, তেমনি ভগবদুক্ত যত শ্লোক বা মন্ত্র আছে তা সমস্তই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী মালার মণি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী মালার মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ সর্বপ্রথম এই মন্ত্রগুলি যিনি জেনেছেন, তিনি হলেন ঋষি ভগবান বেদব্যাস—'ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মালামন্ত্রস্য ভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ।'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অনুষ্টুপ্ ছন্দই বেশী আছে। এর আরম্ভ (ধর্মক্ষেত্রে ----) এবং শেষ (যত্র যোগেশ্বরঃ ----) এবং উপদেশেরও আরম্ভ (অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং ----) এবং সমাপন (সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য ----) অনুষ্টুপ্ ছন্দেই হয়েছে। অতএব এর ছন্দগুলি হল অনুষ্টুপ্ ছন্দ—'অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ'।

যিনি মানুষমাত্রেরই পরম প্রাপণীয়, পরম ধ্যেয়, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এর দেবতা (অধিপতি)—'শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা।'

উপদেশ কেবলমাত্র অজ্ঞানদেরই দেওয়া হয় এবং অজ্ঞানীরাই উপদেশের অধিকারী। অর্জুন মুখে ধর্মের কথা বললেও কুটুম্বদের মোহে অন্ধ হয়ে শোক করছিলেন। যখন শোকান্বিত হয়ে তিনি নিজ কর্তব্য-কর্মরূপ ধর্মের নির্ণয় করতে পারছিলেন না, তখন তিনি ভগবানের শরণাগত হলেন। ভগবান তখন অর্জুনের বিষাদ দূর করার জন্য উপদেশ দিতে শুরু করলেন, যেটি গীতার বীজ মন্ত্র—'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ইতি বীজম্।'

সমস্ত সাধন এবং সর্ব উপদেশের সারকথা হল ভগবানের শরণাগত হওয়া ; কারণ ভগবানের শরণাগত হওয়ার তুল্য এত সহজ, শ্রেষ্ঠ অথচ শক্তিশালী সাধন আর নেই। অতএব সকল সাধনের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানের শরণাগত হওয়াই জীবের সব থেকে বড় শক্তি, সামর্থ্য—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ইতি শক্তিঃ।'

ভগবান পণ করে, প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলেছেন যে, 'যে আমার শরণাগত হবে, তাকে আমি সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করে দেব, তাকে আমি উদ্ধার করব।' ভগবানের এই প্রতিজ্ঞা কখনো নড়চড় হতে পারে না ; কারণ এটি কীলক—'অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ইতি কীলকম্।'

—এইভাবে 'ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মালামন্ত্রস্য... ... ইতি কীলকম্' এই উচ্চারণ করে 'ন্যাস' (করন্যাস এবং হৃদয়ন্যাস) করতে হয়।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে দেবতা হয়ে অর্থাৎ শুদ্ধ, পবিত্র হয়ে দেবতার পূজন, গ্রন্থের পঠন-পাঠন করা উচিত—'দেবো ভূত্বা যজেদ্দেবম্' এই দৈবীভাব, শুদ্ধতা, পবিত্রতা, দিব্যতা আসে নিজ অঙ্গে মন্ত্রগুলি স্থাপন করলে। যে মন্ত্র বা স্তোত্র পাঠ করতে হবে তাকে নিজ অঙ্গে স্থাপন করে নিতে হয়, সেগুলি স্থাপনা করাকে বলা হয় ন্যাস (করন্যাস এবং হৃদয়ন্যাস)।

করন্যাস

দুই হাতের দশটি আঙুল এবং দুই হাতের সামনের এবং পিছনের ভাগগুলিকে ক্রমশঃ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক পরস্পর স্পর্শ করার নামই 'করন্যাস' ; যেমন—

(১) 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ইতি অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ'—এই বলে দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠ আঙুল পরস্পর স্পর্শ করাতে হয়।

(২) 'ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত ইতি তর্জনীভ্যাং নমঃ'—এই বলে দুই হাতের তর্জনী পরস্পর স্পর্শ করাতে হয়।

(৩) 'অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ'—এইরূপ বলে দুই হাতের মধ্যম আঙুল পরস্পর স্পর্শ করতে হবে।

(৪) 'নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন ইত্যনামিকাভ্যাং নমঃ'—এই বলে দুই হাতের অনামিকার আঙুল পরস্পর স্পর্শ করাতে হবে।

(৫) 'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ'—এই বলে দুই হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলি

পরস্পর স্পর্শ করাতে হবে।

'নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ইতি করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ'—এই বলে দুই হাতের করতল এবং করপৃষ্ঠ স্পর্শ করতে হবে।

হৃদয়াদিন্যাস

ডান হাতের পাঁচ আঙুলের দ্বারা ক্রমশঃ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক হৃদয়াদি স্পর্শ করার নামই 'হৃদয়াদিন্যাস', যেমন—

(১) **'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ইতি হৃদয়ায় নমঃ'**—এই বলে ডান হাতের পাঁচটি আঙুলের দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করবে।

(২) **'ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত ইতি শিরসে স্বাহা'**—এই বলে ডান হাতের পাঁচটি আঙুলের দ্বারা মাথা স্পর্শ করবে।

(৩) **'অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ইতি শিখায়ৈ বষট্'**—এই বলে ডান হাতের পাঁচটি আঙুলের দ্বারা শিখা স্পর্শ করবে।

(৪) **'নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন ইতি কবচায় হুম্'**—এই বলে ডান হাতের পাঁচটি আঙুল দ্বারা বাঁ কাঁধ এবং বাঁ হাতের পাঁচটি আঙুল দ্বারা ডান কাঁধ স্পর্শ করবে।

(৫) **'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্'**—এই বলে ডান হাতের পাঁচটি আঙুলের অগ্রভাগ দ্বারা দুই নেত্র এবং ললাটের মধ্যভাগে অর্থাৎ গুপ্তভাবে অবস্থিত তৃতীয় নেত্র (জ্ঞাননেত্র) স্পর্শ করবে।

(৬) **'নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ইতি অস্ত্রায় ফট্'**—এই বলে ডান হাতকে মাথার উপর দিয়ে উল্টো অর্থাৎ বাঁদিক দিয়ে পিছনে নিয়ে গিয়ে ডানদিক দিয়ে সামনে নিয়ে আসবে এবং তর্জনী ও মধ্যম আঙুল দিয়ে বাঁ করতলে তালি বাজাবে।

করন্যাস এবং হৃদয়াদিন্যাস করার পর বলতে হবে **'শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ'** অর্থাৎ 'আমি যে গীতা পাঠ করতে চাই তার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ভগবানকে প্রসন্ন করা'।

গীতা পাঠের তিন প্রকারের ক্রম আছে—সৃষ্টিক্রম, সংহারক্রম এবং স্থিতিক্রম। গীতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক পর্যন্ত টানা পাঠ করা অথবা প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক থেকে সেই অধ্যায়ের শেষ শ্লোক পর্যন্ত একটানা পাঠ করাকে বলা হয় **'সৃষ্টিক্রম'**। অষ্টাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোক থেকে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পর্যন্ত অথবা প্রতিটি অধ্যায়ের শেষ শ্লোক থেকে আরম্ভ করে সেই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পর্যন্ত উল্টো পাঠ করাকে বলা হয় **'সংহারক্রম'**। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক থেকে শেষ শ্লোক পর্যন্ত একটানা পাঠ করা এবং পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ শ্লোক থেকে প্রথম শ্লোক পর্যন্ত উল্টোভাবে পাঠ করাকে বলে **'স্থিতিক্রম'**। ব্রহ্মচারীদের সৃষ্টিক্রমে, সন্ন্যাসীদের সংহারক্রমে এবং গৃহস্থগণের স্থিতিক্রমে গীতা পাঠ করা উচিত।

গীতা-পাঠ সম্পুট দ্বারা, সম্পুটবল্লী দ্বারা অথবা বিনা সম্পুটে করা যায়। গীতার যে শ্লোকে সম্পুট দিতে হবে, প্রথমে সেই শ্লোকটি পাঠ করে, পরে অধ্যায়ের একটি শ্লোক পাঠ করবে। তারপরে সম্পুট শ্লোক পাঠ করে অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক পাঠ করবে। এইভাবে সম্পুট-সহ পুরো গীতা সোজা বা উল্টোভাবে পাঠ করাকে **'সম্পুট-পাঠ'** বলা হয়। সম্পুটের শ্লোক দুবার পাঠ করে পরে অধ্যায়ের একটি শ্লোক পাঠ করবে। পরে সম্পুটের শ্লোকটি দুবার পাঠ করে অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকটি পাঠ করবে। এইপ্রকার সম্পুট-সহ পুরো গীতা সোজা বা উল্টো পাঠ করাকে **'সম্পুটবল্লী পাঠ'** বলা হয়। গীতার পুরো শ্লোকগুলি সম্পুট এবং সম্পুটবল্লী দ্বারা পাঠ করলে এক বিশেষ শক্তি আহরণ করা যায়, গীতা বিশেষভাবে মনন করা যায়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, শান্তি পাওয়া যায় এবং পরমাত্মপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয়।

সম্পুট না করে পাঠ করাকে 'বিনা সম্পুট-পাঠ' বলা হয়। মানুষ প্রতিদিন বিনা সম্পুট অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করবে অথবা নয় অধ্যায় করে দুই দিনে অথবা ছয় অধ্যায় করে তিন দিনে অথবা তিন অধ্যায় করে ছয় দিনে অথবা দুই অধ্যায় করে নয় দিনে গীতা পাঠ করবে। যদি পনেরো দিনে গীতা পাঠ পূর্ণ করতে হয় তবে প্রতিপদ্ থেকে

একাদশী পর্যন্ত এক-একটি অধ্যায়ের, দ্বাদশীতে দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের, ত্রয়োদশীতে চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের, চতুর্দশীতে ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়ের ও অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় অষ্টাদশ অধ্যায়ের পাঠ করতে হয়। কোন পক্ষে তিথি কম হয়ে গেলে সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় একসঙ্গে পাঠ করতে হয়। এইভাবে কোন পক্ষে তিথি বৃদ্ধি পেলে ষোড়শ ও সপ্তদশ—এই দুই অধ্যায় পৃথক্‌ভাবে দুই দিনে পাঠ করতে হবে।

সম্পূর্ণ গীতা কণ্ঠস্থ থাকলে প্রথম থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ক্রমশঃ প্রথম শ্লোকটি পাঠ করবে। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়—এই ক্রমানুসারে সোজাভাবে গীতা পাঠ করবে। এর পর অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক, পরে সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক —এইভাবে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষ শ্লোকগুলি পাঠ করবে। পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের উপান্ত (অন্তিম শ্লোকের আগের) শ্লোক, সপ্তদশ অধ্যায়ের উপান্ত শ্লোক—এইভাবে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষ শ্লোকগুলি পাঠ করবে। এইপ্রকারে সম্পূর্ণ গীতাটি উল্টোভাবে পাঠ করবে।

সংস্কৃতভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ করবার বিধি

শব্দের যেরকম রূপ, সেই রূপের মধ্যে ছেদ করে পড়বেন না এবং লঘু ও গুরু স্বর, বিসর্গ এবং অনুস্বার আর শ, ষ, স কে লক্ষ্য রেখে পড়লে ভাষার উচ্চারণ শুদ্ধ হয়ে যায়।

১—উচ্চারণকালে ই, উ, ঋ—এই তিন অক্ষরের লঘু ও গুরুর চিন্তা বিশেষভাবে রাখবেন। কারণ অ এবং আ—এই দুটির উচ্চারণভেদ তো স্পষ্টভাবে স্বতই হয়ে যায়। ৯ কারের উচ্চারণ বহু কম পাওয়া যায় আর ৯ কার দীর্ঘই হয় না। এইরূপ এ, ঐ, ও, ঔ—এই অক্ষরগুলি কখনও লঘু হয় না।

২—সংযুক্ত বর্ণের পূর্বস্বর, বিসর্গের পূর্বস্বর গুরু হয়। কারণ, সংযুক্তবর্ণ উচ্চারিত হলে সংযুক্তবর্ণের পূর্বস্বরের উপর জোর পড়ে। বিসর্গ উচ্চারণকে অর্দ্ধ 'হ' সদৃশ বলা হয়। তার উচ্চারণ হলে বিসর্গের পূর্বস্বরের উপর জোর পড়ে। তাই বিসর্গের পূর্বস্বর গুরু হয়। ব্যঞ্জনবর্ণ-সমূহের উচ্চারণ বিনা স্বরে সুখপূর্বক হয় না এবং ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে অন্য ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে প্রথম স্বরের অধীনেই তার উচ্চারণ হয়, সেজন্য প্রথম স্বর গুরু হয়।

৩—অনুস্বার ও বিসর্গ কোন না কোন স্বরেরই আশ্রয়ে থাকে ; স্বরের পর উচ্চারণ করলেই এদের অনুস্বার ও বিসর্গ সংজ্ঞা হয়। অতএব এদের উচ্চারণকালে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম স্বর গুরু হয়ে যায়। এস্থলে অনুস্বারের বিষয়ে এই চিন্তা রাখতে হবে যে, তার উচ্চারণ পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের অনুরূপ হয় অর্থাৎ পূর্বস্থিত ব্যঞ্জন যে বর্গের হবে, সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণের অনুসারে অনুস্বারের উচ্চারণ হবে। যেরূপ ক, খ, গ, ঘ, ঙ পরে থাকলে অনুস্বারের উচ্চারণ 'ঙ' সদৃশ হবে। এইরূপ চ, ছ, জ, ঝ, ঞ পরে থাকলে 'ঞ' সদৃশ ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ পরে থাকলে 'ণ' সদৃশ ; ত, থ, দ, ধ, ন পরে থাকলে 'ন্' সদৃশ ; আর প, ফ, ব, ভ, ম পরে থাকলে 'ম্' সদৃশ উচ্চারণ করতে হবে। এই নিয়ম কেবল এই পঁচিশটি অক্ষরকে নিয়েই হবে। য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ—এই আটটি অক্ষর পরে থাকলে শুদ্ধ অনুস্বারেরই উচ্চারণ করতে হবে, যা কেবল নাসিকা দ্বারা হয়।

৪—শ, ষ, স—এই তিনটির উচ্চারণ-ভেদ বুঝতে হলে এদের নিম্নলিখিত রীতিতে পড়তে হবে। মূর্ধা হতে উঁচু তালুতে জিভ লাগিয়ে 'শ'-এর উচ্চারণ করলে তালব্য শকারের প্রকৃত উচ্চারণ হবে। জিভকে দাঁতগুলির অল্প নীচেতে রেখে 'ষ'-এর উচ্চারণ করলে মূর্ধন্য ষকারের প্রকৃত উচ্চারণ হবে এবং উপর ও নীচুপাটির দাঁতগুলিকে মিলিত করে 'স'-কারের উচ্চারণ করলে জিভ স্বাভাবিকভাবেই দাঁতগুলিতে লেগে যাবে, তখন দন্ত্য সকারের প্রকৃত উচ্চারণ হবে।

(৯৮) গীতোক্ত শ্লোকগুলির অনুষ্ঠান বিধি

শ্লোকা মন্ত্রময়াঃ প্রোক্তাঃ সর্বে চ সিদ্ধিদায়কাঃ।
অভীষ্টকার্যসিদ্ধ্যর্থং বিধিস্তেষাং নিগদ্যতে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কোন শ্লোক যদি সিদ্ধ করতে হয় তবে সেই শ্লোকটির সম্পুট দিয়ে সম্পূর্ণ গীতা পাঠ করা উচিত। যেমন, আমার যদি **'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ... ... শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'** (২।৭) এই শ্লোকটি সিদ্ধ করার উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে প্রথমে এই শ্লোকটি একবার পাঠ করে পরে **'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ... ...'** (১।১) —এই শ্লোকটি পাঠ করতে হবে। পুনরায় **'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ... ...'** শ্লোকটি পাঠ করে **'দৃষ্ট্বা তু ... ...'** (১।২) এই শ্লোকটি পাঠ করতে হবে। এইরূপে প্রতিটি শ্লোকের আগে ও পরে সম্পুট চিহ্নিত শ্লোকটি পাঠ করে সম্পূর্ণ গীতাটি পাঠ করলে সেই শ্লোকটি (মন্ত্রটি) সিদ্ধ হয়।

সম্পুটের চেয়েও সম্পুটবল্লীসহ গীতা পাঠ করা আরো ভাল[১]। যেমন, **'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ... ...'** শ্লোকটি সিদ্ধ করতে চাইলে প্রথমে এই শ্লোকটি দুবার পাঠ করে তারপর **'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ... ...'** শ্লোকটি পাঠ করতে হবে। আবার সম্পুটবল্লীসম্পন্ন শ্লোকটি দুবার পাঠ করে **'দৃষ্ট্বা তু ... ...'** শ্লোকটি পাঠ করবে। এইভাবে সম্পূর্ণ গীতা পাঠ করলে অভীষ্ট শ্লোক সিদ্ধ হয়[২]।

অভীষ্ট কার্যে সাফল্যের জন্য উপরিউক্ত প্রকারে সিদ্ধ করা মন্ত্রটিকে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে জপ করতে হয়। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে গঙ্গাজলের ওপর পাথরের বেদী করে তার ওপরে উলের আসন পেতে, সেখানে বসে জপ করা উচিত। তাও করতে না পারলে গঙ্গার ধারে বালির ওপর নিজের উলের আসন পেতে মন্ত্রজপ করা উচিত। যদি গঙ্গার কিনারায় বসে জপ করার সুযোগ না থাকে, তাহলে নিজগৃহের একটি কোণ পরিষ্কার করে, গোময় ও গোমূত্র জলে মিশিয়ে স্থানটি লেপন করে, তার উপরে উলের আসন পেতে বসে মন্ত্র জপ করতে হবে।

গীতোক্ত সিদ্ধ মন্ত্রগুলি নিম্নলিখিত কার্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে—

(১) কোনো কথা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করতে হলে, কোনো সমস্যার সমাধান পেতে গেলে, 'আমি জ্ঞান-পথে যাব না ভক্তি পথে'—এই সংশয় দূর করার জন্য রাত্রিকালে নির্জন ঘরে আসন পেতে বসে পড়বে। ঘরের আলো নিভিয়ে দেবে। শুধু একটি ধূপ জ্বালিয়ে রাখবে। অন্ধকারে ধূপের অগ্নিবিন্দুর উপর নিজ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এইভাবে ভগবানের ধ্যান করবে, 'ভগবান আমার সামনে উপস্থিত আর আমি অর্জুন, ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছি' —এই মনোভাব নিয়ে **'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ। যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥'** (২।৭)—এই শ্লোকটি আবৃত্তি করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থটিও চিন্তা করতে থাকবে। পাঠ করতে করতে শ্লোকটির যে পংক্তিতে বা পদে মন নিবিষ্ট হয়, সেটি পাঠ করতে শুরু করবে, যেমন—**'পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ'** অথবা **'নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'**, **'নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'**, **'নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'** বা **'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'**, **'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'** ইত্যাদি কোন একটি পংক্তি বারংবার আবৃত্তি

---

[১]সিদ্ধ করা হবে যে শ্লোকটি, সেটি প্রত্যেক শ্লোকের আগে ও পরে একবার পাঠ করাকে 'সম্পুট-পাঠ' এবং দুইবার পাঠ করাকে 'সম্পুটবল্লী পাঠ' বলা হয়।

[২]কোন কারণবশতঃ মন্ত্রকে সিদ্ধ না করতে পারলেও অভীষ্ট কার্যে সফল হওয়ার যদি তীব্র উৎকণ্ঠা থাকে, তাহলে শুধুমাত্র সেটি জপ করলেও কার্য সিদ্ধ হতে পারে।

করতে থাকবে। এইরূপ পাঠ করতে করতে যদি নিদ্রা আসে, তবে পাঠ করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়বে। এইভাবে স্বপ্নে ভগবানের সংকেত পাওয়া যায়। সেই সংকেত দ্বারা ভগবানের মনোভাব বুঝে নিতে হবে। প্রথম দিনে সঙ্কেত বুঝতে না পারলে দ্বিতীয় দিন পুনর্বার সমস্ত বিধি পালন করতে হয় এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলতে হয় যে, 'হে প্রভু ! আপনি আমাকে লিখে জানান।' তাহলে স্বপ্নে লেখা দেখতে পাওয়া যাবে। এতেও যদি না বোঝা যায়, তবে তৃতীয় দিন পুনরায় আগের মতো বিধি পালন করে বলতে হবে, 'হে প্রভু ! আপনি কথা বলে আমাকে জানান।' তাহলে স্বপ্নের মধ্যে তাঁর কথার ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

যদি প্রথম রাতে এইরূপ স্বপ্ন না হয়, তাহলে যতদিন না এরূপ স্বপ্নাদেশ হয় ততদিন উপরিউক্ত বিধি পালন করে যেতে হয়। এগারো বা একুশ দিন পর্যন্ত পাঠ করা যেতে পারে। এতে যতো বেশী আন্তরিকতা থাকে, তত শীঘ্র কাজ হয়।

(২) মনে কোনো সমস্যা থাকলে তার সমাধান পেতে হলে উপরিউক্ত বিধি পালনপূর্বক '**ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥**' (৩।২)—এই শ্লোকটি পাঠ করা উচিত।

(৩) ভূত-প্রেতের বাধা দূর করতে হলে '**স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ। রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ**' (১১।৩৬)—এই মন্ত্রটি পূর্বোক্ত বিধি দ্বারা সিদ্ধ করে নেওয়া উচিত। পরে যে ব্যক্তি ভূতাবিষ্ট হয়েছে, তাকে এই মন্ত্র পাঠ করতে করতে ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা আঘাত করতে হবে অথবা নিজ হাতে শুদ্ধ জলভরা ঘটি নিয়ে উপরোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে জলে ফুঁ দিতে হবে এবং ঐ জল পূর্বোক্ত ব্যক্তিটিকে পান করতে দেবে। এই দুই বিধি প্রয়োগের কালে ঐ মন্ত্রটি সাত, একুশ অথবা একশো আটবার পাঠ করা যেতে পারে। এই মন্ত্রটি ভূর্জপত্রে বা সাদা কাগজে বেদানার কলমে অষ্টগন্ধ দ্বারা লিখতে হবে এবং তাবিজের মধ্যে পুরে রোগীর গলায় লালসূতায় বেঁধে পরাতে হবে।

শাস্ত্রার্থে বা বাদ-প্রতিবাদে বিজয়ী হবার জন্য '**যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥**' (১৮।৭৮)—এই মন্ত্রটি জপ করতে হবে।

(৪) সর্বত্র ভগবদ্ভাব প্রাপ্তির জন্য সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম বা উনিশ সংখ্যা শ্লোক পাঠ করা উচিত।

(৫) ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্তির জন্য নবম অধ্যায়ের চৌত্রিশ, একাদশ অধ্যায়ের চুয়ান্ন বা পঞ্চান্ন, দ্বাদশ অধ্যায়ের অষ্টম এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টি সংখ্যক—এর মধ্যে কোন একটি শ্লোক পাঠ করা উচিত।

এইরূপে যে কার্যের জন্য যে শ্লোকটি ঠিক মনে হবে, সেটি পাঠ করতে থাকলে কার্যসিদ্ধি হবে। যদি সেটি অর্জুনের বলা হয়, তবে নিজের মধ্যে অর্জুনের ভাব এনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে আর ভগবানের বলা শ্লোক হলে, 'ভগবান আমাকে বলছেন'—এইরূপ ভাব রেখে পাঠ করতে হবে। গীতার শ্লোকের ওপর যত বেশী শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হবে, তত শীঘ্র কার্যসিদ্ধি হবে।

উত্তরার্ধ

(৯৯) গীতায় ঈশ্বর, জীবাত্মা এবং প্রকৃতির অলিঙ্গতা

ঈশ্বরশ্চৈব জীবাত্মা তৃতীয়া প্রকৃতিস্তথা।
এতে ত্রয়োঽপি গীতায়াং ত্রিষু লিঙ্গেষু দর্শিতাঃ॥

সাধারণভাবে মনে হয় যে ঈশ্বর এবং জীবাত্মা পুরুষরূপে আছেন ও প্রকৃতি স্ত্রীরূপে আছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'ঈশ্বর', ঈশ্বরের অংশ 'জীবাত্মা' এবং ঈশ্বরের শক্তি 'প্রকৃতি'—এই তিনই অলিঙ্গ অর্থাৎ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ—এই তিন লিঙ্গ হতে রহিত। অতএব এই তিনটিকেই পুরুষ, স্ত্রী এবং ক্লীব কোনটিই বলা যায় না।

পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ—এই তিনটি লিঙ্গের পার্থক্য শুধু স্থাবর জঙ্গম প্রাণীদের শরীর ধরে হয়, যাতে ঐ প্রাণীদের 'এটি পুরুষ-জাতি, এটি স্ত্রীজাতি বা এটি নপুংসক জাতি' রূপে চেনা যায়। কিন্তু ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি—এই তিনটিই লিঙ্গাতীত বিশেষ তত্ত্বরূপে পরিগণিত। অতএব গীতায় এই তিনটির জন্য পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ—এই তিনটি লিঙ্গেরই প্রয়োগ করা হয়েছে ; যেমন—

(১) ঈশ্বরের জন্য—

পুংলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ—'পিতা, পিতামহঃ' (৯।১৭) ; 'ভর্তা, প্রভুঃ' (৯।১৮) ; 'পুরুষঃ' (১১।১৮) ; 'আদিদেবঃ, পুরুষঃ' (১১।৩৮) ; 'ঈশ্বরঃ' (১৫।১৭) ; 'পুরুষোত্তমঃ' (১৫।১৮) ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ—'অনুত্তমাং গতিম্' (৭।১৮) ; 'মাতা' (৯।১৭) ; 'গতিঃ' (৯।১৮) ; 'বিভূতিরূপে কীর্তিঃ, শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতিঃ, মেধা, ধৃতিঃ, ক্ষমা' (১০।৩৪) ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ—'ব্রহ্মণি' (৫।১০) ; 'বীজম্', (৭।১০) 'শরণম্, স্থানম্, বীজম্, অব্যয়ম্' (৯।১৮) ; 'ব্রহ্ম, ধাম, পবিত্রম্' (১০।১২) ; 'অক্ষরম্' (১১।১৮) ইত্যাদি।

(২) জীবাত্মার জন্য—

পুংলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ—'অজঃ, নিত্যঃ, শাশ্বতঃ, পুরাণঃ' (২।২০) ; 'সর্বগতঃ, স্থাণুঃ, অচলঃ, সনাতনঃ' (২।২৪) ; 'জীবভূতঃ' (১৫।৭) ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ—'পরাং প্রকৃতিম্', 'জীবভূতাম্' (৭।৫) ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ—'অবিনাশি' (২।১৭), 'অধ্যাত্মম্' (৭।২৯ ; ৮।১, ৩) ইত্যাদি।

(৩) প্রকৃতির জন্য—

পুংলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ—'ক্ষরো ভাবঃ' (৮।৪) ; 'পুরুষৌ, ক্ষরঃ' (১৫।১৬) ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ—'প্রকৃতিঃ' (৭।৪ ; ৯।১০) ; 'অপরাম্' (৭।৫) ; 'প্রকৃতিম্' (৯।৭) ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ—'অধিভূতম্' (৮।১, ৪) ; 'অব্যক্তম্' (১৩।৫) ; 'মহদ্ব্রহ্ম' (১৪।৩-৪) ইত্যাদি।

♠ ♠ ♠

(১০০) গীতার অনুবন্ধ-চতুষ্টয়

বিষয়শ্চাধিকারী চ প্রয়োজনম্।
সম্বন্ধশ্চ চতুর্থোঽস্ত্রীতানুবন্ধচতুষ্টয়ম্॥

প্রত্যেক গ্রন্থে চারটি দিক থাকে—গ্রন্থের বিষয়, তার প্রয়োজন, তার অধিকারী এবং প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদকের সম্পর্ক। এর চারটিকে 'অনুবন্ধ-চতুষ্টয়' নামে বলা হয়। এই অনুবন্ধ-চতুষ্টয় গীতায় এইরূপ—

(১) বিষয়—জীবের যাতে উদ্ধারলাভ হয়, এরূপ পথ—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি সমস্ত সাধন-পথ গীতায় বর্ণিত হয়েছে।

(২) প্রয়োজন—যেটি লাভ করলে আর কিছু জানার এবং পাওয়ার বাকী থাকে না তাকে প্রাপ্ত করানো অর্থাৎ জীবের উদ্ধার করা হল গীতার 'প্রয়োজন'।

(৩) অধিকারী—যারা নিজের কল্যাণ চায়, তারা প্রত্যেকেই গীতা পাঠ করার অধিকারী। মানুষ, যে কোনো দেশের হোক, যে কোন পোষাক পরিধানকারী হোক, যে কোন সম্প্রদায়ের হোক, যে কোন বর্ণ বা আশ্রমের হোক, যে কোন অবস্থাসম্পন্ন হোক এবং যে কোন পরিস্থিতিতে থাকুক না কেন—তারা সকলেই গীতা পাঠের অধিকারী।

(৪) সম্বন্ধ—গীতার বিষয়ে এবং গীতায়—পরস্পর প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকের সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ গীতার বিষয় 'প্রতিপাদ্য' এবং গীতা স্বয়ং 'প্রতিপাদক'। যা বোঝানো হয়, সেই বিষয়কে 'প্রতিপাদ্য' বলা হয় এবং যে বোঝায় তাকে 'প্রতিপাদক' বলে। জীবের কল্যাণ কী করে হবে—এটি গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় এবং কল্যাণসম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শনকারী হওয়ায় গীতা স্বয়ং প্রতিপাদক।

(১০১) গীতার ষড়্‌লিঙ্গ (ছটি অঙ্গ)

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যনির্ণয়ে॥

কোন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের নির্ণয় করার জন্য উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি—এই ছটি লিঙ্গ (অঙ্গ) লক্ষ্য করা হয় অর্থাৎ গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহার কিসে হয়েছে, গ্রন্থটিতে বারবার কোন্ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, গ্রন্থটিতে কি বিশেষত্ব, ফল হিসাবে কি বলা হয়েছে, কার প্রশংসা করা হয়েছে এবং কি কি যুক্তি দেওয়া হয়েছে—এ ছ'টি লিঙ্গের দ্বারা গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়েরও নির্ণয় করা যায়।

(১) উপক্রম-উপসংহার—গীতার উপক্রম ও উপসংহার হয়েছে শরণাগতিতে। আরম্ভে **'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'** (২।৭) 'আমি আপনার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দিন' বলে অর্জুন ভগবানের শরণাগত হলেন ; এবং উপসংহারে **'মামেকং শরণং ব্রজ'** (১৮।৬৬) 'শুধু আমার শরণ লও—বলে ভগবান তাঁর শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

(২) অভ্যাস—গীতায় শরণাগতির কথাই বারংবার বলা হয়েছে ; যেমন—**'তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ'** (২।৬১), ইন্দ্রিয়-সমূহকে বশীভূত করে আমার পরায়ণ হয়ে অবস্থান কর ; **'মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ'** (৬।১৪) 'মন সংযত করে, আমাতে যুক্তচিত্ত হয়ে আমার পরায়ণ হয়ে অবস্থান কর।' **'ময্যাসক্তমনাঃ'** (৭।১), আমাতে আসক্ত মনসম্পন্ন হও ; **'অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ'** (৮।১৪), 'অনন্যচিত্ত যে ব্যক্তি আমাকে নিত্য-নিরন্তর স্মরণ করে' ; **'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে'** (৯।২২), 'যে অনন্য ভক্ত আমার চিন্তা করতে করতে আমার উপাসনা করে' ; **'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ'** (৯।৩৪), 'তুমি আমার ভক্ত এবং মদ্‌গতচিত্ত হও' ; **'মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ'** (১১।৫৫), 'যে আমার জন্যই কর্ম করে, আমারই পরায়ণ হয় ও আমারই ভক্ত হয়' ; **'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়'** (১২।৮), 'তুমি আমাতেই মন যুক্ত কর ও বুদ্ধি নিবিষ্ট কর' ; **'মৎকর্মপরমো ভব'** (১২।১০), 'আমার জন্য

কর্মের পরায়ণ হও' ; **'মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে'** (১৪।২৬), 'যে ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা আমার সেবা করে' ইত্যাদি।

(৩) অপূর্বতা—শরণাগতির বিষয়ে ভগবান অর্জুনের কাছে নিজের হৃদয়ের গুহ্য অলৌকিক কথা জানালেন। শরণাগত হলে ভক্তের নিজ উদ্ধারের জন্য কিছুই করতে হয় না ; সব ভার ভগবানের ওপর গিয়ে পড়ে। ভগবান স্বয়ং ভক্তদের যোগ ও ক্ষেম বহন করেন—**'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'** (৯।২২)। ভগবান বলেছেন যে 'আমি নিজেই ভক্তদের বুদ্ধিযোগ (সমত্বজ্ঞান) দিই, যার দ্বারা তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়', —**'দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে'** (১০।১০) ; 'আমি স্বয়ং ভক্তের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনষ্ট করি'—**'নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা'** (১০।১১) ; 'শরণাগত ভক্তদের কাছে আমি সুলভ' **'তস্যাহং সুলভঃ'** (৮।১৪) ; 'আমি স্বয়ং ভক্তদের মৃত্যু-সংসার-সাগর থেকে অচিরাৎ উদ্ধার করে থাকি'—**'তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ'** (১২।৭) ইত্যাদি।

(৪) ফল—শরণাগতির ফল হিসাবে ভগবান তাঁর প্রাপ্তি জানিয়েছেন ; যেমন—'আমাকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং সর্বলোকের মহেশ্বর মেনে নিয়ে ভক্ত পরমশান্তি লাভ করে'—**'শান্তিমৃচ্ছতি'** (৫।২৯) ; 'আমারই কর্ম বোধে সমুদয় কর্ম যে ভক্ত করে, সে আমাকে প্রাপ্ত হয়' **'স মামেতি'** (১১।৫৫) ; 'মৎকর্মপরায়ণ হলে তুমি সিদ্ধি প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ আমাকে লাভ করবে' **'সিদ্ধিমবাপ্স্যসি'** (১২।১০) ; 'সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে'—**'বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি'** (৯।২৮) ; 'পাপযোনি সম্ভূত জীবও আমার আশ্রয় গ্রহণ করলে পরমগতি অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হয়' **'তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্'** (৯।৩২) ; 'আমার কৃপায় ভক্ত শাশ্বত অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়' **'মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্'** (১৮।৫৬) ; 'তুমি একমাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হতে মুক্ত করব' **'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি'** (১৮।৬৬) ; ইত্যাদি।

(৫) অর্থবাদ—গীতায় ভগবান তাঁর শরণাগত ভক্তদের প্রশংসা করেছেন ; যেমন—'সকল যোগীর মধ্যে আমার ভক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ' **'স মে যুক্ততমো মতঃ'** (৬।৪৭) ; 'শ্রদ্ধাবান ভক্তেরাই আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী'—**'তে মে যুক্ততমা মতাঃ'** (১২।২) 'আমাতে শ্রদ্ধাবান, আমার পরায়ণ ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয়'—**'তেঽতীব মে প্রিয়াঃ'** (১২।২০) ; যে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানতে পারে, সে সর্বজ্ঞ হয়ে যায়—**'স সর্ববিৎ'** (১৫।১৯) ; ইত্যাদি।

(৬) 'উপপত্তি'—শরণাগত ভক্ত হওয়ার বিষয়ে ভগবান গীতায় নানাপ্রকার যুক্তি প্রয়োগ করেছেন ; যেমন—'আমাতে চিত্ত রাখলে আমার কৃপায় তুমি সমস্ত সঙ্কট অতিক্রম করবে আর যদি তুমি অহংকারবশতঃ আমার কথা না শোন, তবে তোমার পতন হবে'—**'ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি'** (১৮।৫৮) ; 'ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমনকারী সমস্ত জীবকেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়, কিন্তু আমাকে যে ভক্তরা পায়, তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না'—**'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'** (৮।১৬) ; 'দেবোপাসকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন'—**'দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি'** (৭।২৩) ; ইত্যাদি।

উপরিউক্ত ছয়টি বাক্যের তাৎপর্য এই যে, ভগবানের শরণাগত হলে লৌকিক-পারলৌকিক সর্বপ্রকারই লাভ এবং শরণাগত না হলে লৌকিক-পারলৌকিক সর্বপ্রকারেই ক্ষতি হয়।

(১০২) গীতায় কাব্যগত বৈশিষ্ট্য

সৃষ্টৌ যাবন্তি কাব্যানি গীতা সর্বোত্তমা ততঃ।
কাব্যেভ্য ঐহিকো লাভো গীতা সর্বত্র লাভদা॥

(ক)

গীতা একটি দার্শনিক গ্রন্থ ; কাব্যগ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থ শুধু জীবের কল্যাণের জন্যই ; সুতরাং এখানে কাব্যের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তবুও এই গ্রন্থে স্বাভাবিকভাবে কাব্যগত বিশেষত্ব এসে পড়েছে। কাব্যগত বিশেষত্ব ছয় প্রকারের হয়—

'কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিতয়োপদেশযুজে'॥

অর্থাৎ কাব্যরচনার প্রয়োজন হয়—যশ প্রাপ্তির জন্য, ধন প্রাপ্তির জন্য, ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য, অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্য, শীঘ্র পরমশান্তি প্রাপ্তির জন্য এবং স্নেহপূর্বক উপদেশ প্রদানের জন্য।

কাব্যের রচনা ও পঠন-পাঠন শুধু সাংসারিক যশোলাভ করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, কিন্তু গীতার উপদেশ অনুযায়ী কাজ করলে সাংসারিক যশও প্রাপ্ত হয় —'পণ্ডিত ব্যক্তিরাও তাঁদের পণ্ডিত বলে থাকেন'— **'তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ'** (৪।১৯) এবং ভগবানের কাছেও তাঁদের আদর হয়—'জ্ঞানী (প্রেমী) আমারই স্বরূপ'—**'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্'** (৭।১৮), 'যে আমার ভক্ত সে আমার প্রিয়'—**'যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ'** (১২।১৪, ১৬), **'স চ মে প্রিয়ঃ'** (১২।১৫) **'ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ'** (১২।১৭), **'ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ'** (১২।১৯), 'সে সর্বজ্ঞ হয়'—**'স সর্ববিৎ'** (১৫।১৯)। সে যোগী, গুণাতীত এবং ভগবদ্‌ভক্ত হয়। সে নিজে তো উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ই, তার কথা শুনলে অন্যেরাও উদ্ধার প্রাপ্ত হয়—**'তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ'** (১৩।২৫)। এইভাবে সে সব থেকে শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র হয়ে যায়।

কাব্যরচনা যখন সাংসারিক অর্থ প্রাপ্তির জন্য করা হয়, তখন সেই অর্থ জীবন-নির্বাহের সহায়ক হয়। সেই অর্থের দ্বারা তৃষ্ণা, কামনা মেটে না। যতোই অর্থ-প্রাপ্তি হোক, তবু অপূর্তি (অভাব) থেকেই যায়, কখনো পূরণ হয় না। কিন্তু যদি গীতার উপদেশ অনুযায়ী জীবন নির্বাহ করা হয়, তাহলে সন্তোষরূপী মহৎ ধন প্রাপ্তি হয়— **'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ'** (৪।২২), **'সন্তুষ্টঃ সততং যোগী'** (১২।১৪), **'সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ'** (১২।১৯)। তখন অর্থের আশা, তৃষ্ণা, কামনা ইত্যাদি দোষগুলি সর্বকালের জন্য দূর হয়ে যায়—**'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ'** (২।৭১) চিরকালের জন্য অভাব দূর হয় এবং পূর্ণতা লাভ হয়।

সাংসারিক ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য কাব্য উপযোগী। সাংসারিক ব্যবহারাদিতে স্বার্থ, পক্ষপাত, কামনা, ক্রোধ, মোহ, ঈর্ষা ইত্যাদি দোষ থাকে, যা প্রকৃতপক্ষে উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। কিন্তু গীতার নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করলে স্বার্থ, পক্ষপাত, কামনা, ক্রোধ ইত্যাদি দোষরহিত হয়ে মানুষের জীবন সর্বতোভাবে শুদ্ধ হয়ে যায়। এর পর তার দ্বারা যে কর্ম সম্পাদিত হয় তা সর্বদা নির্মলই হয়। তাঁর সমত্ব অনুভূত হওয়ায় তিনি সকলের মধ্যে সমরূপ এক পরমাত্মাকেই দর্শন করেন— **'পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ'** (৫।১৮), কিন্তু তাঁর ব্যবহার সবার সঙ্গে যথাযোগ্য হয়ে থাকে। তাঁর ব্যবহারে প্রাণিমাত্রেরই হিত সাধিত হয়—**'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (৫।২৫ ; ১২।৪)। অর্থাৎ শুধু কাব্য দ্বারা জীবনে এত নির্মলতা আসে না, যতো আসে গীতার নির্দেশ অনুযায়ী জীবনধারণে।

কাব্যরচনা করা হয় দুঃখনাশের ও সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ; কিন্তু কাব্যরচনা বা তার পঠন-পাঠনে সমস্ত দুঃখ দূর হয় না এবং চিরসুখ প্রাপ্তি হয় না। তবে নিজ ইষ্টের স্তুতি ও প্রার্থনা দ্বারা তাৎক্ষণিক শান্তির প্রাপ্তি হয় বা রোগ আদিও দূরীভূত হয়, কিন্তু চিরকালের জন্য দুঃখরহিত বা নিরতিশয় সুখলাভ হয় না। কিন্তু গীতার নির্দেশ অনুসারে চালিত ব্যক্তিগণের রোগ, অপমান ইত্যাদির দুঃখ কখনও হয় না। সে অক্ষয় সুখ লাভ করে **'সুখমক্ষয়মশ্নুতে'** (৫।২১), **'সুখমাত্যন্তিকম্'**

(৬।২১), 'অত্যন্তং সুখমশ্নুতে' (৬।২৮)। গীতা পাঠ করলে প্রত্যক্ষ শান্তি লাভ হয়, হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর হয়, হৃদয়ের শঙ্কা দূর হয়ে তার সমাধান পাওয়া যায়। গীতা অধ্যয়ন করলেই ভগবান মনে করেন তাঁকে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা অর্চিত করা হল (১৮।৭০)। গীতা পাঠ শোনেন যে ব্যক্তিগণ তাঁরা সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ, সাকেত, গোলোকে গমন করেন (১৮।৭১)।

কাব্য দ্বারা স্নেহপূর্বক, প্রীতিপূর্বক উপদেশ দেওয়া হয়। গীতা 'প্রভুসম্মিত' বাক্য[১] হওয়া সত্ত্বেও এর দ্বারা অর্জুনকে অত্যন্ত প্রীতিভরে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। যেমন অর্জুন উৎকণ্ঠিত হয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন যে জীবনের অন্তিমক্ষণে কোন কারণবশতঃ যদি সাধন থেকে মন বিচ্যুত হয়, তবে কি সাধক ছিন্ন মেঘের মতো নষ্ট হয়ে যাবে (৬।৩৭-৩৮), ভগবান তখন অত্যন্ত স্নেহভরে জানালেন, 'হে প্রিয় ! কল্যাণকর্মকারী কোন ব্যক্তির কখনও দুর্গতি হয় না'—'**ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি**' (৬।৪০)। যিনি যোগ (সমত্ব) প্রাপ্ত হতে ইচ্ছুক, তিনিও বেদোক্ত সকাম অনুষ্ঠানের ফল অতিক্রম করেন, তাহলে যোগভ্রষ্টদের সম্বন্ধে আর কি কথা ?—'**জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে**' (৬।৪৪)। গীতা উপদেশের শেষে ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি আমার ভক্ত হও, আমাতে চিত্ত রাখ, আমাকে পূজা কর এবং আমাকেই নমস্কার কর, তাহলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে এই সত্য আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলছি, কেননা তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়' (১৮।৬৫)। 'তুমি সমস্ত ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে শুধু আমার শরণাগত হও ; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি শোক কোরো না' (১৮।৬৬)।

এর তাৎপর্য এই যে, কাব্য দ্বারা শুধুমাত্র সাংসারিক লাভ হতে পারে, যা অনিত্য এবং অস্থায়ী। কিন্তু গীতার পঠন-পাঠন, শ্রবণ-অধ্যয়ন, বিচার-মনন, অনুষ্ঠানাদি করলে কোন কিছু করার, জানার বা পাওয়ার আর বাকী থাকে না। এর দ্বারা সেই পারমার্থিক লাভ প্রাপ্তি হয়, যার থেকে বেশী অন্য কোন লাভ হতে পারে না (৬।২২) ; কারণ এই পারমার্থিক লাভ হল নিত্য, অবিনাশী।

এই জগৎ-চরাচরে যতপ্রকার কাব্য আছে, সাহিত্য আছে, তার মধ্যে গীতারূপ গ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ গীতার এমনই বিশেষত্ব যে, যে কোন সম্প্রদায় বা ভাষা বা দেশেরই মানুষ হোক না কেন প্রত্যেকেই এতে মুগ্ধ হয়, এর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং গীতাগ্রন্থ দ্বারা তার পারমার্থিক লাভ হয়। গীতা স্বয়ং ভগবানের বাণী। আজ পর্যন্ত গীতার ওপর যত টীকা বা ভাষ্য লেখা হয়েছে, এত টীকা বা ভাষ্য অন্য কোন গ্রন্থের ওপর লেখা হয় নি। তাই গীতা সব থেকে বেশী আদরণীয়।

যে কাব্যে ভগবান এবং তাঁর চরিত্রের বর্ণনা থাকে, তার পঠন-পাঠনেও মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু এটি হল ভগবান এবং তাঁর চরিত্রের মহিমা, কাব্যের নয়। অন্য কাব্য গ্রন্থ সুন্দর হতে পারে, তার পঠনে তাৎকালিক তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা কল্যাণ হয় না। কারণ সেই সব কাব্যের সাংসারিক প্রয়োজনীয়তা থাকে। সেইজন্য তাতে শুধু সীমিত লাভই হতে পারে, অসীম লাভ নয়।

(খ)

কাব্যে শ্লোকগুলির অন্বয়ের চারটি বিভাগ মানা হয়েছে—যুগ্ম, বিশেষক, কলাপ এবং কুলক—

দ্বাভ্যাং যুগ্মমিতি প্রোক্তং ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্বিশেষকম্।
চতুর্ভিঃ কলাপং জ্ঞেয়ং তদূর্ধ্বং কুলকং স্মৃতম্॥

যেখানে দুটি শ্লোককে একসঙ্গে অন্বয় করা হয়, তাকে 'যুগ্ম' বলা হয়। যেখানে তিনটি শ্লোক একসঙ্গে অন্বয় করা হয়, তাকে বলা হয় '**বিশেষক**'। চারটি শ্লোককে যেখানে একসঙ্গে অন্বয় করা হয়, তাকে বলে '**কলাপ**' এবং চারের অধিক শ্লোক যেখানে একত্রে অন্বয় করা হয়,

[১]বাক্য তিন প্রকারের হয়—প্রভুসম্মিত (প্রভুত্বব্যঞ্জক), মিত্রসম্মিত (মৈত্রীব্যঞ্জক) এবং কান্তাসম্মিত (কান্তব্যঞ্জক)। বেদের বাণীকে 'প্রভুসম্মিত' বলা হয় অর্থাৎ বেদে নির্দেশ আছে যে 'এইরূপ কাজ করো, ঐরূপ কাজ কোরো না' ; সুতরাং এতে নিজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে নেই, বরং বেদে যেমন নির্দেশ আছে তেমনই করতে হয়। গীতাও বেদের মত 'প্রভুসম্মিত'। পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি ইত্যাদি 'মিত্রসম্মিত' ; কারণ এগুলি মিত্রের ন্যায় বুঝিয়ে দেয়। সাহিত্য, কাব্য 'কান্তাসম্মিত' ; কারণ এগুলি পত্নীর ন্যায় প্রীতিপূর্বক বাক্য দ্বারা বোঝায়।

তাকে বলা হয় '**কুলক**'। গীতাতে এই চারটিরই প্রয়োগ আছে ; যেমন—

প্রথম অধ্যায়ের চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ সংখ্যক, দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাষট্টি-তেষট্টি সংখ্যক, তৃতীয় অধ্যায়ের চর্তুদশ, পঞ্চদশ এবং বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ সংখ্যক, পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম-নবম, অষ্টম অধ্যায়ের দ্বাদশ-ত্রয়োদশতম, নবম অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম, দশম অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ, একাদশ অধ্যায়ের একচল্লিশ বিয়াল্লিশ সংখ্যক, দ্বাদশ অধ্যায়ের আঠার-উনিশ সংখ্যক, চতুর্দশ অধ্যায়ের চব্বিশ-পঁচিশতম ইত্যাদি শ্লোকগুলিতে '**যুগ্ম**' অন্বয়ের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত এবং ষোল থেকে আঠারো শ্লোক পর্যন্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ সংখ্যাক শ্লোক পর্যন্ত, ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত, অষ্টাদশ অধ্যায়ের একান্ন থেকে তিপ্পান্ন সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত '**বিশেষক**' অন্বয়ের প্রয়োগ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কুড়ি সংখ্যক শ্লোক থেকে তেইশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ সংখ্যক থেকে পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত '**কলাপ**' অন্বয়ের প্রয়োগ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশ থেকে ত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত '**কুলক**' অন্বয়ের প্রয়োগ করা হয়েছে।

(১০৩) গীতায় অলঙ্কার

অলঙ্কারবিশিষ্টস্য শোভা গ্রন্থস্য বর্ধতে।
ভাবজ্ঞানাম্বিকা গীতাঽলঙ্কারা যত্র কুত্রচিৎ॥

যা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাকে অলঙ্কার বলা হয়। কাব্যের সৌন্দর্য দুই প্রকারের হয়—শব্দ দ্বারা এবং অর্থ দ্বারা। যে শ্লোকে বা বাক্যে শব্দ অর্থাৎ অক্ষরগুলি নিয়ে সৌন্দর্য হয়, তাকে 'শব্দালঙ্কার' বলে ; যেমন—'তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্' (১।২৬)—এই বাক্যটিতে 'প' ব্যঞ্জনবর্ণটি দ্বারা সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে। যে শ্লোক বা বাক্যে অর্থ-ধরে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তাকে 'অর্থালঙ্কার' বলা হয় ; যেমন—'বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি' (২।৬৭)।

শব্দালঙ্কারে অনুপ্রাস, যমক ইত্যাদি এবং অর্থালঙ্কারে উপমা রূপক ইত্যাদি কয়েক প্রকার ভাগ থাকে। গীতাতেও কয়েকপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে ; যেমন—

(১) অনুপ্রাস—যেখানে 'অ, আ......' ইত্যাদি স্বরবর্ণের বিভিন্নতা থাকলেও 'ক, খ .....' ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ সম অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেখানে 'অনুপ্রাস অলঙ্কার' হয়। পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম-নবম শ্লোকে 'পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্......' ইত্যাদি পদে 'ন' ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার আছে। এইরূপেই পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকের '**তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানঃ** ......' ইত্যাদি পদেও 'ত' ব্যঞ্জনবর্ণের সাদৃশ্য আছে।

(২) **যমক**—যেখানে একই শব্দ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু অর্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত, সেখানে 'যমক অলঙ্কার' হয়। অষ্টম অধ্যায়ের কুড়িতম শ্লোকে '**ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎসনাতনঃ**' পদটিতে 'অব্যক্ত' শব্দটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে প্রথম 'অব্যক্ত' শব্দটি পরমাত্মা এবং দ্বিতীয় 'অব্যক্ত' শব্দটি ব্রহ্মার উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) **উপমা**—যাকে উপমা দেওয়া হয় তাকে বলে '**উপমেয়**' এবং যার উপমা দেওয়া হয় তাকে '**উপমান**'। যেখানে উপমেয়কে উপমানের সদৃশ বলা হয়, সেটি 'উপমা-অলঙ্কার' হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোকে উপমেয়রূপে মনকে উপমানরূপ প্রদীপের শিখার উপমা দেওয়া হয়েছে।

(৪) **রূপক**—যেখানে উপমানের পূর্ণরূপ উপমেয়তে ব্যবহার করে উপমেয়কে উপমানের সমরূপে

দেখানো হয়, সেখানে 'রূপক অলঙ্কার' হয়। পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উপমানরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের সমস্ত রূপটি উপমেয়রূপ জগৎ-সংসারের সঙ্গে সাদৃশ্য ঘটিয়ে জগৎ-সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

(৫) **দৃষ্টান্ত**—দৃষ্টান্তকে দার্ষ্টান্তিকে (অর্থাৎ দৃষ্টান্তের লক্ষ্যভূত বস্তুতে) প্রতিবিম্বিত করা অর্থাৎ দৃষ্টান্তের যা ধর্ম, সেইরূপ ধর্মই দার্ষ্টান্তিকে দেখানোকে 'দৃষ্টান্ত অলঙ্কার' বলা হয়। নবম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে আকাশে স্থিত বায়ুর দৃষ্টান্ত দিয়ে উদাহরণে সমস্ত প্রাণীকে ভগবানে স্থিত বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সত্তর সংখ্যক, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বত্রিশ সংখ্যক-তেত্রিশ সংখ্যক ইত্যাদি শ্লোকগুলিতেও এই অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয়েছে।

(৬) **সম্ভাবনা**—এরূপ না করলে ঐরূপ হয়ে যাবে—এই প্রকারের তর্ককে 'সম্ভাবনা অলঙ্কার' বলা হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের আটান্ন সংখ্যক শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 'যদি তুমি অহঙ্কারবশতঃ আমার কথা না শোন, তবে তোমার পতন হবে'।

(৭) **অনন্বয়**—যেখানে উপমেয় এবং উপমান এক হয়ে যায়, যেখানে উপমেয়কে উপমা দেবার জন্য অন্য কোন উপমান না থাকে, সেখানে 'অনন্বয় অলঙ্কার' হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের উনচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে বলেছেন যে, 'আপনি ভিন্ন আমার এই সংশয় ছেদন করার আর কেউ নেই।'

(৮) **উৎপ্রেক্ষা**—যে জিনিসটির কল্পনা করা হয়েছে, সেরূপ কোন পদার্থ না থাকলে তাকে বলে 'উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার'। একাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে বিরাটরূপের প্রকাশের সঙ্গে হাজার-হাজার সূর্যের দীপ্তি সমকক্ষ না হলেও এরূপ দীপ্তির কল্পনা করা হয়েছে।

(৯) **বিষাদ**—যেটি বাস্তবে সেরূপ নয়, তবুও তাকে সেরূপে কল্পনা করাকে 'বিষাদ অলঙ্কার' বলা হয়। প্রথমে অর্জুন অত্যন্ত শৌর্য-বীর্য সহকারে যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু মোহগ্রস্ত হয়ে ধনুর্বাণ ত্যাগ করে বিষাদমগ্ন হয়ে রথের মধ্যে উপবেশন করলেন (১।৪৭)।

(১০) **কারণমালা**—যেখানে কোন একটিকে অপর একটির কারণ হিসাবে পরপর দেখানো হয়, সেখানে 'কারণমালা' অলঙ্কার হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাষট্টি-তেষট্টি শ্লোকগুলিতে বিষয় চিন্তা থেকে নিয়ে পতন হওয়া পর্যন্ত এক একটিকে অপর একটির কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। এরূপ বর্ণনা প্রথম অধ্যায়ের চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ সংখ্যক পর্যন্ত শ্লোকেও দেখা যায়।

(১১) **বিরোধাভাস**—যেখানে পদগুলির পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ভাষিত হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ থাকে না, সেখানে 'বিরোধাভাস অলঙ্কার' প্রযুক্ত হয়। অষ্টম অধ্যায়ের বিশ সংখ্যক শ্লোকে '**নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি**' (বিনাশশীল বস্তুতে থেকেও ইনি বিনষ্ট হন না) পদ দ্বারা '**নশ্যৎসু**' পদটি প্রাণীদের শরীর ইত্যাদির বাচক যা বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং '**ন বিনশ্যতি**' পদটি পরমাত্মার বাচক যার বিনাশ হয় না। এই কথাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সাতাশ সংখ্যক শ্লোকে '**বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং**' পদ দ্বারাও বলা হয়েছে।

(১২) **দীপক**—যেখানে অনেক প্রকার ক্রিয়াতে একই কারকের প্রয়োগ হয়, সেখানে 'দীপক অলঙ্কার' হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে '**পশ্যতি**', '**বদতি**' এবং '**শৃণোতি**'—এই সমস্ত ক্রিয়াতে একটি কারক '**এনম্**' এর ব্যবহার হয়েছে।

(১৩) **উল্লেখ**—যেখানে একটি বিষয় অনেক ভাবে উল্লেখ (বলা) করা যায়, সেখানে 'উল্লেখ অলঙ্কার' হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের চব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে একই 'দেহী'র অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য ইত্যাদি পদ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে।

(১৪) **সার**—যেখানে কোন বস্তুর একটির অপরটি থেকে উৎকর্ষ (শ্রেষ্ঠত্ব) জানানো হয়, সেখানে 'সার-অলঙ্কার' হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে অভ্যাস থেকে জ্ঞানকে, জ্ঞান থেকে ধ্যানকে এবং ধ্যান থেকে কর্মফলত্যাগকে শ্রেষ্ঠ বলে জানানো হয়েছে।

(১০৪) গীতায় অভিধা ইত্যাদি শক্তিগুলির বর্ণনা

অভিধা লক্ষণা চান্যা তাৎপর্যা ব্যঞ্জনা তথা।
গৌণরূপেণ গীতায়াং প্রাপ্যন্তে যত্র কুত্রচিৎ॥

শব্দ এবং অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কোনো কথা বা অর্থকে বোঝাতে হলে শব্দের দ্বারাই সেটি বোঝানো হয় এবং শব্দের দ্বারা সে-ই বুঝতে পারে যার সেই শব্দের অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। এই শব্দের এটি অর্থ—এর জ্ঞান করাবার জন্য চারটি শক্তি আছে—অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা এবং তাৎপর্যা। এর মধ্যে অভিধা শক্তি সর্বত্র থাকে, এর সঙ্গে লক্ষণা ইত্যাদি শক্তিগুলিও কাজ করে থাকে। গীতায় অভিধা শক্তি সর্বত্রই আছে, কোনও কোনও স্থানে লক্ষণা প্রভৃতি শক্তিও আছে। এটি জানবার জন্য অভিধা, লক্ষণা ইত্যাদি শক্তিগুলির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করানো হচ্ছে।

(১) **অভিধা**—যা শব্দের অর্থকে সোজাসুজি প্রকাশিত করে, তাকে 'অভিধা শক্তি' বলে অর্থাৎ বাচ্য-বাচকের সম্পর্কে বাচক (শব্দ) নিজ বাচ্য (বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি) কে যে শক্তির দ্বারা প্রকাশ করে, তাকে 'অভিধা' বলা হয়। যেমন, ভগবান বললেন যে, 'অর্জুন! এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয়'—'**ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে**' (১৩।১)। এখানে 'ক্ষেত্র' হল অভিধা শক্তি।

(২) **লক্ষণা**—যে শব্দ অথবা বাক্যের অর্থকে প্রকাশ করতে অভিধা শক্তি কাজ করে না, সেই শব্দ অথবা বাক্যের অর্থ যার দ্বারা প্রকটিত হয়, তাকে 'লক্ষণা শক্তি' বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বাক্য দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য জানাবার যে বৃত্তি থাকে, তাকে 'লক্ষণা শক্তি' বলা হয়। যেমন, অর্জুন বলেছেন যে, 'যে আত্মীয়-স্বজনের জন্য আমি রাজ্য, ভোগ, সুখাদি কামনা করি, তারাই ধন ও প্রাণের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধার্থে এখানে উপস্থিত'—'**প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ**' (১।৩৩)। যদি এখানে অভিধা শক্তি দ্বারা সোজা অর্থ করা হয় যে, 'প্রাণত্যাগ করে উপস্থিত' তবে তা অসম্ভব ; কারণ, যিনি প্রাণত্যাগ করেছেন, তিনি উপস্থিত হবেন কীভাবে আর যদি উপস্থিত আছেন তাহলে প্রাণই বা কীরূপে ত্যাগ করলেন ? অতএব এখানে লক্ষণা শক্তি দ্বারা 'এঁরা প্রাণের (বাঁচার) আশা ত্যাগ করে উপস্থিত হয়েছেন'—এই অর্থ বুঝতে হবে। এইরূপ '**মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ**' (১।৯) ইত্যাদি উদাহরণও ঠিকমতো বুঝে নিতে হবে।

(৩) **ব্যঞ্জনা**—যে শব্দ বা বাক্যের অর্থ অভিধা বা লক্ষণা শক্তি দ্বারা প্রকটিত হয় না বরং ব্যঙ্গ্য বৃত্তিতে প্রকটিত হয়, তাকে 'ব্যঞ্জনা শক্তি' বলা হয়। যেমন, ভগবান বললেন যে, 'হে পার্থ! যে ব্যক্তি সৃষ্টি-চক্র অনুসারে নিজ কর্তব্য পালন করে না, সেই ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত পাপাচারী ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারণ করে'—'**মোঘং পার্থ স জীবতি**' (৩।১৬)। এখানে ব্যঞ্জনা শক্তিতে এই অর্থ করা যায় যে 'তার মরে যাওয়াও এর চেয়ে ভালো'।

(৪) **তাৎপর্যা**—যেখানে বক্তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, ভাব ইত্যাদি প্রকাশ করতে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা শক্তি সমর্থ হয় না, সেখানে যে বৃত্তি দ্বারা বক্তার অন্তর্নিহিত, ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে 'তাৎপর্যা শক্তি' বলা হয় অর্থাৎ প্রকরণ বা ভাব অনুযায়ী বক্তার ভাব প্রকাশ করার বৃত্তির নাম 'তাৎপর্যা শক্তি'। যেমন, ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ থেকে ত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্যের বর্ণনা করেছেন এবং এখানে দেহীকে নিত্য এবং দেহকে অনিত্য বলার তাৎপর্য হচ্ছে শোক দূর করার জন্য। এইরূপ 'এই জ্ঞেয় তত্ত্বকে সৎ বা অসৎ কোনোটাই বলা যায় না'—'**ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে**' (১৩।১২), এখানে এইরূপ বলার তাৎপর্য জ্ঞেয় তত্ত্বকে করণ-নিরপেক্ষ বলা।

(১০৫) গীতা-সম্বন্ধীয় ব্যাকরণের কয়েকটি কথা

শব্দশাস্ত্রেণ গীতায়া রহস্যং প্রকটীকৃতম্।
তস্মাৎ কেচিৎ প্রয়োগা হি বোধার্থং লিখিতা ইহ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সংস্কৃত ভাষাতে রচিত। সুতরাং গীতাকে গভীরভাবে বুঝতে হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের বোধ থাকা প্রয়োজন। যে শ্লোক বা পদের অর্থ, ভাব বুঝতে অসুবিধা হয়, এখানে সেগুলি ব্যাকরণের সাহায্যে বোঝানো হচ্ছে।

(১)

উক্তানুক্ততয়া দ্বিধা কারকাণি ভবন্তি ষট্।
উক্তে তু প্রথমৈব স্যাদনুক্তে তু যথাক্রমম্॥

উক্ত (অভিহিত, কথিত) এবং অনুক্ত (অনভিহিত, অকথিত)—দ্বিবিধ ভেদযুক্ত কারক ছয় প্রকারের হয়। কিন্তু উক্ততে **'প্রাতিপদিকার্থ-লিঙ্গ-পরিমাণ-বচনমাত্রে প্রথমা'** (পাণি. অ. ২।৩।৪৬)—এই সূত্র দ্বারা প্রাতিপদিকার্থে কেবল প্রথমা বিভক্তিই হয়, এবং অনুক্তে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি বিভক্তি হয়। যেমন, **'ময়া গ্রামঃ গম্যতে'** এই বাক্যে কর্মে লকার হওয়ায় কর্ম উক্ত হয়েছে; সুতরাং গ্রাম শব্দে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা বিভক্তি হয়েছে এবং কর্তা অনুক্ত থাকায় অর্থাৎ লকারের দ্বারা উক্ত না হওয়ায় **'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া'** (পাণি. অ. ২।৩।১৮)—এই সূত্র দ্বারা কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে।

যে সকল ধাতুর ফল এবং ব্যাপার (ক্রিয়া) পৃথক্ অবস্থায় থাকে সেই সকল ধাতুকে 'সকর্মক' বলা হয়, যেমন—**'দেবদত্তঃ ওদনং পচতি'**। এখানে 'পচ্' ধাতুর চালের সিদ্ধ হওয়ারূপ ফল চালে এবং পাক করার ক্রিয়া (ব্যাপার) দেবদত্তে আছে।

যে সকল ধাতুর ফল এবং ব্যাপারের (ক্রিয়ার) আশ্রয় একই হয়, সেই ধাতুগুলিকে 'অকর্মক' বলা হয়, যেমন—**'পুরুষঃ শেতে'**, এই বাক্যটিতে **'শীঙ্'** ধাতুর ফল বিশ্রাম এবং শয়নরূপ ব্যাপার (ক্রিয়া) কর্তাতেই আছে।

'লঃ কর্মণি চ ভাবে চাকর্মকেভ্যঃ' (পাণি. অ. ৩।৪।৬৯)—এই সূত্র দ্বারা লট্, লিট্ (বর্তমান, অতীত) ইত্যাদি লকার সকর্মক ধাতুর উত্তর কর্ম এবং কর্তায় হয়ে থাকে, যেমন—**'ময়া গীতা পঠ্যতে'** এখানে 'পঠ্' ধাতুর উত্তর বর্তমান অর্থে 'লট্' লকার কর্মে প্রযুক্ত হয়েছে। কর্ম উক্ত হওয়ায় গীতাতে প্রথমা বিভক্তি হয়েছে এবং কর্ম অনুসারে 'পঠ্যতে' ক্রিয়া একবচনে হয়েছে। এই বাক্যকে 'কর্মবাচ্য' বলা হয়। গীতাতেও **'ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ। যথোল্বেনাবৃতো গর্ভঃ.......'** (৩।৩৮), **'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানম্'** (৫।৫) ইত্যাদি প্রয়োগ হয়েছে। কর্মবাচ্যের নিয়ম হচ্ছে এই যে কর্তায় তৃতীয়া এবং কর্মে প্রথমা হয় এবং কর্ম অনুসারে ক্রিয়া হয়ে থাকে।

সকর্মক ধাতুর উত্তর যেখানে কর্তায় লকার হয়, সেখানে কর্তা উক্ত হওয়ায় কর্তায় প্রথমা এবং কর্ম অনুক্ত হওয়ায় কর্মে **'কর্মণি দ্বিতীয়া'** (পাণি.অ.২।৩।২)—এই সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্তা অনুসারে হয়ে থাকে। এই বাক্যকে কর্তৃবাচ্য বলে; যেমন—**'অহং গীতাং পঠামি'**। গীতাতেও **'সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ'** (৫।৪), **'ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি'** (৪।১৪) ইত্যাদি প্রয়োগ হয়েছে।

লট্, লিট ইত্যাদি লকার অকর্মক ধাতুর উত্তর ভাবে এবং কর্তায় প্রযুক্ত হয়, যেমন—**'ময়া ভূয়তে'** এখানে ভাবে লকার হওয়ায় ক্রিয়াতে প্রথম পুরুষের একবচনই হয়েছে এবং কর্তা অনুক্ত হওয়ায় এতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। এই বাক্যকে 'ভাববাচ্য' বলে। কিন্তু যেখানে অকর্মক ধাতুর উত্তর লকার কর্তায় প্রযুক্ত হয়, সেখানে কর্তা উক্ত হওয়ায় কর্তায় প্রথমা হয় এবং ক্রিয়া কর্তানুযায়ী হয়ে থাকে; এই বাক্যকে কর্তৃবাচ্য বলে। যেমন—**'অহং ভবামি'**।

'তয়োরেব কৃত্যক্তখলর্থাঃ' (পাণি.অ. ৩।৪।৭০)—এই সূত্র দ্বারা কৃদন্তের 'কৃত্য', 'ক্ত' এবং 'খল্' প্রত্যয় কর্মে এবং ভাবেই প্রযুক্ত হয়। 'কৃত্য' প্রত্যয় 'করা উচিত', 'করার যোগ্য', 'করা যেতে পারে' ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**'ময়া হরিঃ সেবনীয়ঃ'** (হরিকে আমার

সেবা করা উচিত)। 'ক্ত' প্রত্যয় অতীত কালের অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যেমন—**'ময়া হরিঃ সেবিতঃ'** (আমি হরির সেবা করেছি), 'খল্' প্রত্যয় কঠিন এবং সহজ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**'ভবতা কটঃ দুষ্করঃ'** (আপনার দ্বারা মাদুর তৈরী করা কঠিন)।

কৃত্য প্রত্যয়—বিধি অর্থে অর্থাৎ 'করা উচিত, করার যোগ্য, করা যেতে পারে' ইত্যাদি অর্থে **'তব্যত্তব্যানীয়রঃ'** (পাণি. অ. ৩।১।৯৬), **'অচো যৎ'** (পাণি. অ. ৩।১।৯৭) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'তব্য', 'অনীয়র্', 'যৎ' ইত্যাদি প্রত্যয় হয়, যেমন—কর্মে—'ত্বয়া সেবিতব্যঃ, সেব্যো হরিঃ সদা'। ভাবে—'এধিতব্যং, এধনীয়ং ত্বয়া'। গীতাতেও এই প্রত্যয়গুলির উদাহরণ এইভাবে রয়েছে—**'কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ'** (১।৩৮), **'জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী'** (৫।৩), **'সাধুরেব স মন্তব্যঃ'** (৯।৩০), **'যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ'** (১৮।৫), **'এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ, কর্তব্যানি'** (১৮।৬) ইত্যাদি। এই কৃত্য প্রত্যয়ের যোগে **'কৃত্যানাং কর্তরি বা'** (পাণি. অ. ২।৩।৭১)—এই সূত্র দ্বারা কর্তায় তৃতীয়া অথবা ষষ্ঠী দুই বিভক্তিই হয়। **'কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ'**—এতে 'অস্মাভিঃ' (কর্তা) তে তৃতীয়া বিভক্তি করা হয়েছে এবং **'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যম্........নানবাপ্তমবাপ্তব্যম্'** (৩।২২), **'ত্বমস্য পূজ্যঃ'** (১১।৪৩)—এতে 'মে, অস্য' (কর্তা) তে ষষ্ঠী বিভক্তি করা হয়েছে।

ক্ত প্রত্যয়—অতীতকালের অর্থে 'ক্তক্তবতূ নিষ্ঠা' (পাণি. অ. ১।১।২৬) এবং নিষ্ঠা (পাণি. অ. ৩।২।১০২)—এই দুই সূত্র দ্বারা 'ক্ত' এবং 'ক্তবতু'—এই দুটি প্রত্যয় হয়। 'ক্ত' প্রত্যয় ভাব ও কর্মে এবং 'ক্তবতু' প্রত্যয় কর্তায় হয়। যদিও 'ক্ত' এবং 'ক্তবতু'—এই কৃদন্ত প্রত্যয় যোগে **'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি'** (পাণি. অ. ২।৩।৬৫)—এই সূত্র দ্বারা কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হওয়া উচিত, কিন্তু **'ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাম্'** (পাণি. অ. ২।৩।৬৯)—এই সূত্র দ্বারা ষষ্ঠীর নিষেধ করা হয়েছে। এই প্রত্যয়ের যোগে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন—**'স্নাতং ময়া'**, **'স্তুতঃ বিষ্ণুঃ ত্বয়া'** এই 'ক্ত' প্রত্যয়ের যোগে কর্তা অনুক্ত হওয়ায় কর্তায় **'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া'** (পাণি.অ. ২।৩।১৮)—এই সূত্র দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তি হয়, এবং **'বিশ্বং কৃতবান্ বিষ্ণুঃ'** এই 'ক্তবতু' প্রত্যয়ের যোগে কর্তা উক্ত হওয়ায় **'প্রাতিপদিকার্থ'**, (পাণি.অ. ২।৩।৪৬)— এই সূত্র দ্বারা প্রথমা বিভক্তি হয়। গীতাতেও এই দুটি প্রত্যয়ের উদাহরণ আছে ; যেমন—**'উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ'** (২।১৬), **'যেন সর্বমিদং ততম্'** (২।১৭), **'তেনেদমাবৃতম্'** (৩।৩৮), **'আবৃতং জ্ঞানমেতেন'** (৩।৩৯), **'স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ'** (৪।৩), **'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্'** (৪।১৩), **'এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ'** (৪।১৫), **'প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া'** (১০।৪০) ইত্যাদিতে 'ক্ত' প্রত্যয় এবং তার যোগে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে, এবং **'সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম'** (১১।৫২), **'দৃষ্টবানসি মাং যথা'** (১১।৫৩), **'প্রোক্তবানহমব্যয়ম্'** (৪।১) **'শ্রুতবান্'** (১৮।৭৫) ইত্যাদিতে 'ক্তবতু' প্রত্যয় ও তার যোগে কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়েছে।

উপরিউক্ত 'ক্ত' প্রত্যয় ভাব এবং কর্মে তো হয়ই, উপরন্তু এটি কর্তায় বর্তমানে এবং ক্লীবলিঙ্গ বিশিষ্ট ভাবেও হয়। যেমন—**'গত্যর্থাকর্মকশ্লিষশীঙ্স্থাসবসজনরুহজীর্যতিভ্যশ্চ'** (পাণি. অ. ৩।৪।৭২)—এই সূত্র দ্বারা গত্যর্থক, অকর্মক ইত্যাদি ধাতুর উত্তর কর্তাতেও 'ক্ত' প্রত্যয় হয়ে থাকে ; যেমন—**'স গঙ্গাং গতঃ'**, **'স মোক্ষং প্রাপ্তঃ'** **'স নিবৃত্তঃ'** ইত্যাদি। এই কৃদন্ত 'ক্ত' প্রত্যয় কর্তায় হওয়ায় কর্তা উক্ত হয়ে যায় ; অতএব সেখানে প্রথমা বিভক্তি হয়। গীতাতেও এর প্রয়োগ আছে ; যেমন—**'নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ'** (৮।১৫), **'ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ'** (১১।৫১), **'স্থিতোঽস্মি'** (১৮।৭৩) ইত্যাদি।

'মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ' (পাণি. অ. ৩।২।১৮৮)—এই সূত্র দ্বারা মতি, বুদ্ধি, পূজার্থক ধাতুগুলির উত্তর বর্তমান অর্থে 'ক্ত' প্রত্যয় হয় এবং এই 'ক্ত' প্রত্যয়ের যোগে **'ক্তস্য চ বর্তমানে'** (পাণি. অ. ২।৩।৬৭)—এই সূত্র দ্বারা কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয় ; যেমন—**'রাজ্ঞাং মতঃ ইষ্টঃ'**, **'বুদ্ধঃ'**, **'বিদিতঃ'**, **'পূজিতঃ'**, **'অর্চিতঃ'**। গীতায়ও **'স মে যুক্ততমো মতঃ'** (৬।৪৭), **'তে মে যুক্ততমা মতাঃ'** (১২।২), **'যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম'**

(১৩।২), **'কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্'** (১৮।৬) ইত্যাদির প্রয়োগে উপরিউক্ত সূত্রে 'ক্ত' প্রত্যয় এবং 'মে, মম' কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়েছে।

ভাবে 'ক্ত' প্রত্যয়—**'নপুংসকে ভাবে ক্তঃ'** (পাণি. অ. ৩।৩।১১৪)—এই সূত্র দ্বারা নপুংসকত্ব (ক্লীবত্ব)-বিশিষ্ট ভাবে ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় হয় এবং কর্তায় শেষ বিবক্ষার কারণে **'ষষ্ঠী শেষে'** (পাণি.অ. ২।৩।৫০) এই সূত্র দ্বারা ষষ্ঠী বিভক্তি হয় ; যেমন—**'তস্য হসিতম্'** (তাঁর হাসা), **'তস্য শয়িতম্'** (তার শোওয়া) ইত্যাদি। গীতায়ও **'নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন'** (৩।১৮) ইত্যাদি প্রয়োগ রয়েছে।

খলর্থ প্রত্যয়—**'ঈষদ্দুঃসুষু কৃচ্ছ্রাকৃচ্ছ্রার্থেষু খল্'** (পাণি. অ. ৩।৩।১২৬)—এই সূত্র দ্বারা কঠিন এবং সুগম অর্থে, ভাব কর্মে 'খল্' প্রত্যয় হয় ; যেমন—**'ত্বয়া ইদং কার্যং দুষ্করম্, তেন ইদং কার্যং সুকরম্'**। গীতায়ও এই প্রত্যয়ের উদাহরণ আছে ; যেমন—**'অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপঃ'** (৬।৩৬)।

(২)

কর্তার বিবক্ষার কারণে যে ধাতুগুলির যোগে দুটি কর্ম হয় সেগুলিকে দ্বিকর্মক ধাতু বলে[1]। যেমন **'সঃ গোঃ পয়ঃ দোগ্ধি'** এই প্রয়োগে কর্তার গাভীকে কর্ম করাবার বিবক্ষা রয়েছে, এইজন্য 'গোঃ' পদে পঞ্চমী বিভক্তি হলেও কর্ম সংজ্ঞা হওয়ায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। সুতরাং 'স গাং পয়ঃ দোগ্ধি' এই প্রয়োগে 'পয়ঃ' প্রধান কর্ম এবং 'গাম্' অপ্রধান কর্ম। এইরূপে সমস্ত দ্বিকর্মক প্রয়োগ ধরে নিতে হবে। গীতায়ও 'বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ' (২।১) ইত্যাদি দ্বিকর্মক ধাতুগুলির প্রয়োগ আছে।

প্রেরণার্থক ক্রিয়াগুলির প্রয়োগে দুটি কর্তা হয়—প্রযোজক এবং প্রযোজ্য অর্থাৎ ণ্যন্ত কর্তা এবং অণ্যন্ত কর্তা। ণ্যন্ততে লকার দ্বারা প্রযোজক (প্রেরণাদানকারী) কর্তা হয়। তিনি উক্ত হওয়ায় তাতে প্রথমা বিভক্তি হয়। কিন্তু যে প্রযোজ্য (যাকে প্রেরণা দেওয়া হয়) তিনি অণ্যন্ত কর্তা, তিনি লকার দ্বারা অনুক্ত থাকেন। অতএব তাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয় ; যেমন—**'দেবদত্তঃ ওদনং পচতি, তং যজ্ঞদত্তঃ প্রেরয়তি'** (দেবদত্ত অন্ন পাক করছে, অন্ন পাক করার জন্য যজ্ঞদত্ত দেবদত্তকে প্রেরণা দিচ্ছে)—**'যজ্ঞদত্তঃ দেবদত্তেন ওদনং পাচয়তি'** (যজ্ঞদত্ত দেবদত্তের দ্বারা অন্ন পাক করাচ্ছে)। এখানে যজ্ঞদত্ত প্রযোজক কর্তা এবং দেবদত্ত প্রযোজ্য কর্তা।

ণিজন্ততে যদি মূলধাতু গত্যর্থক, জ্ঞানার্থক, ভক্ষণার্থক, শব্দ কর্মক এবং অকর্মক হয় তাহলে প্রযোজ্য কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি না হয়ে **'গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থ-শব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ'** (পাণি. অষ্টা. ১।৪।৫২) —এই সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় ; যেমন— **(১) গত্যর্থক**—**'দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি, তং যজ্ঞদত্তঃ প্রেরয়তি'**—**'যজ্ঞদত্তো দেবদত্তং গ্রামং গময়তি'** (যজ্ঞদত্ত দেবদত্তকে গ্রামে পাঠাচ্ছে)। **(২) জ্ঞানার্থক**—**'ছাত্রো বেদার্থং বেত্তি, তং গুরুঃ প্রেরয়তি'**,—**'গুরুঃ ছাত্রং বেদার্থং বেদয়তি'** (গুরু ছাত্রকে বেদার্থ জানাচ্ছেন)। **(৩) ভক্ষণার্থক**—**'বালকো ভোজনম্ অশ্নাতি, তং মাতা প্রেরয়তি'**—**'মাতা বালকং ভোজনম্ আশয়তি'** (মাতা বালককে ভোজন করাচ্ছেন)। **(৪) শব্দকর্মক**—**'শিষ্যো বেদম্ অধীতে, তং গুরুঃ প্রেরয়তি'**—**'গুরুঃ শিষ্যম্ বেদম্ অধ্যাপয়তি'**—(গুরু শিষ্যকে বেদ অধ্যয়ন করাচ্ছেন)। **(৫) অকর্মক**—**'শিশুঃ শেতে, তং মাতা প্রেরয়তি'**—**'মাতা শিশুং শায়য়তি'** (মা শিশুকে শয়ন করাচ্ছেন)।

যখন দ্বিকর্মক ধাতু ভাবকর্ম প্রক্রিয়াতে আসে, তখন দ্বিকর্মক 'দুহ' 'যাচ্' ইত্যাদি ধাতুগুলির অপ্রধান কর্মে লকার হয়, যেমন—**'তেন গৌঃ পয়ঃ দুহ্যতে'** ইত্যাদি ; এবং 'নী', 'হৃ' ইত্যাদি ধাতুর প্রধান কর্মে লকার হয়[2] যেমন—**'তেন গ্রামম্ অজা নীয়তে'** ইত্যাদি। কিন্তু যখন ণ্যন্ত ধাতু ভাবকর্ম প্রক্রিয়াতে আসে, তখন জ্ঞানার্থক,

---

[1]'দুহ্যাচ্পচ্দণ্ড্রুধিপ্রচ্ছিচিব্রূশাসুজিমথ্মুষাম্। কর্মযুক্স্যাদকথিতং তথা স্যান্নীহৃকৃষ্বহাম্'—এই কারিকাতে উল্লিখিত সমস্ত ধাতুই দ্বিকর্মক।

[2]গৌণে কর্মণি দুহ্যাদেঃ প্রধানে নীহৃকৃষ্বহাম্।

ভক্ষণার্থক এবং শব্দকর্মক ধাতুগুলির যে কোন (প্রযোজ্য বা অপ্রযোজ্য) কর্মে লকার করা যায়[১] যেমন—'**গুরুণা ছাত্রো বেদার্থং**'—'ছাত্রং বেদার্থঃ বেদ্যতে ; মাত্রা বালকঃ ভোজনং'—'বালকং ভোজনং আশ্যতে' ইত্যাদি। এই ধাতুগুলি ছাড়া যত (গত্যর্থক, অকর্মক ইত্যাদি)ণ্যন্ত ধাতু আছে, সেগুলিতে প্রযোজ্য কর্মেই লকার করা উচিত[২] ; যেমন—'**যজ্ঞদত্তেন দেবদত্তো গ্রামং গম্যতে**' ইত্যাদি। গীতাতেও তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে অণ্যন্ত থেকে ণ্যন্ত এবং ণ্যন্ত থেকে ভাবকর্ম প্রক্রিয়ার প্রয়োগ হয়েছে ; যেমন—'**অণ্যন্ত**'—'**অবশঃ সর্বঃ কর্ম করোতি**' (স্বভাবের পরবশ হয়ে সকল জীব কর্ম করে)। '**ণ্যন্ত**'—'**তং প্রকৃতিজা গুণাঃ প্রেরয়ন্তি**' (তাকে প্রকৃতিজাত গুণ কর্ম করার জন্য প্রেরণা করে)—'**প্রকৃতিজা গুণা অবশং সর্বং কর্ম কারয়ন্তি**' (প্রকৃতিজাত গুণ অবশ প্রাণীগণের দ্বারা কর্ম করায়)। '**ভাবকর্ম প্রক্রিয়ান্ত**'—'**প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ অবশঃ সর্বঃ কর্ম কার্যতে**' (প্রকৃতিজাত গুণ স্বভাবের পরবশ হয়ে থাকা প্রাণীদের দ্বারা কর্ম করায়)।

জ্ঞাতব্য

দ্বিকর্মক ধাতুর ভাবকর্মে প্রয়োগ—যে ধাতুগুলি দ্বিকর্মক, সেগুলির ভাবকর্মে প্রয়োগ করলে '**দুহ্**', '**যাচ্**' ইত্যাদি ধাতুগুলির গৌণকর্মে লকার হয়, যেমন—'গোবিন্দঃ গাং দোগ্ধি পয়ঃ' (গোবিন্দ গাভীর দুগ্ধ দোহন করছে) এই দ্বিকর্মক 'দুহ্' ধাতুর ভাবকর্মে প্রয়োগ হলে '**গৌণে কর্মণি দুহ্যাদেঃ**' এই নিয়ম অনুসারে গৌণকর্ম 'গাম্'-এ লকার হয়। লকার দ্বারা উক্ত হওয়ায় 'গো' শব্দে প্রথমা হয় ; সুতরাং '**গোবিন্দেন গৌঃ পয়ঃ দুহ্যতে**'। এইভাবে দ্বিকর্মক 'দুহ্' 'যাচ্' ইত্যাদি দ্বাদশটি ধাতুর প্রয়োগ বুঝতে হবে।

'**কৃষ্ণঃ গাং ব্রজং নয়তি**'—এই দ্বিকর্মক ধাতুটিকে ভাবকর্মে নিয়ে গেলে '**প্রধানে নীহৃকৃষবহাম্**' এই নিয়মে প্রধান কর্মে লকার হবে ; যেমন—'**কৃষ্ণেন গৌঃ ব্রজং নীয়তে**'। এইরূপ দ্বিকর্মক 'নী' 'হৃ' ইত্যাদি চারটি ধাতুর প্রয়োগ বুঝতে হবে।

দ্বিকর্মক ধাতুগুলির ণ্যন্ত এবং ণ্যন্ত হতে ভাবকর্মে প্রয়োগ—তিঙন্ত 'গোবিন্দঃ গাং দোগ্ধি পয়ঃ'। ণ্যন্ত—'তং কৃষ্ণঃ প্রেরয়তি ইতি কৃষ্ণঃ গোবিন্দেন গাং দোহয়তি পয়ঃ'। এতে প্রযোজ্য কর্তা গোবিন্দের কোনো সূত্র দ্বারা কর্মসংজ্ঞা না হওয়ায় অনুক্ত গোবিন্দতে তৃতীয়া বিভক্তি হল। **ভাবকর্ম**—'**কৃষ্ণেন গোবিন্দেন গৌঃ দোহ্যতে পয়ঃ**'। এতে '**গৌণে কর্মণি দুহ্যাদেঃ**' নিয়মই প্রযোজ্য হবে। অতএব গৌণ কর্ম 'গৌঃ' উক্ত কর্মে লকার হয়েছে। এইপ্রকার **তিঙন্ত** '**দেবদত্তঃ শালীনা ওদনং পচতি**', **ণ্যন্ত**—'**তং যজ্ঞদত্তঃ প্রেরয়তি, যজ্ঞদত্তঃ দেবদত্তেন শালীনা ওদনং পাচয়তি**', **ভাবকর্ম**—'**যজ্ঞদত্তেন দেবদত্তেন শালয়ঃ ওদনং পাচ্যন্তে**'।

তিঙন্ত—'গোবিন্দঃ গাঃ ব্রজং নয়তি'। ণ্যন্ত—'তং কৃষ্ণঃ প্রেরয়তি, কৃষ্ণঃ গোবিন্দং গাঃ ব্রজং নায়য়তি'। এতে '**গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ**' (পাণি. অ. ১।৪।৫২)—এই সূত্র দ্বারা গত্যর্থক ধাতু 'নী'র প্রযোজ্য কর্তার কর্ম সংজ্ঞা হওয়ায় এতে দ্বিতীয়া হয়েছে। ণ্যন্তে ভাবকর্ম—'কৃষ্ণেন গোবিন্দঃ গাঃ ব্রজং নায্যতে'। এতে '**প্রযোজ্য-কর্মণ্যন্যেষাং ণ্যন্তানাং লাদয়ো মতাঃ**' অনুসারে প্রযোজ্য কর্ম গোবিন্দতে লকার হয়েছে। এইপ্রকার 'গুরুঃ বালকং ধর্মং বদতি, তং শ্রীহরিঃ প্রেরয়তি' এখানে 'জল্পতিপ্রভৃতীনামুপ-সংখ্যানম্' এই বার্তিকে প্রযোজ্য কর্তার কর্ম সংজ্ঞা হওয়ায় প্রযোজ্য কর্তা গুরুর কর্ম সংজ্ঞা হয়ে সেখানে দ্বিতীয়া হয়েছে, অতএব '**শ্রীহরিঃ গুরুং বালকং ধর্মং বাদয়তি**'। ণ্যন্তের ভাবকর্ম—'**প্রযোজ্য-কর্মণি**' এই নিয়মে প্রযোজ্য কর্ম গুরুতে লকার হবে। সুতরাং 'শ্রীহরিণা গুরুঃ বালকং ধর্মং বাদ্যতে' এইরূপ বাক্য হবে।

এককর্মক ধাতুগুলি ণ্যন্ত এবং ণ্যন্তের ভাবকর্ম—যে ধাতুগুলির প্রযোজ্য কর্তার '**গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থ-শব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ**' (পাণি.অ. ১।৪।৫২), '**জল্পতিপ্রভৃতীনামুপসংখ্যানম্**', '**দৃশেশ্চ**', '**হৃক্রোরন্য-**

[১]বুদ্ধিভক্ষার্থয়োঃ শব্দকর্মকাণাং নিজেচ্ছয়া।

[২]প্রযোজ্যকর্মণ্যন্যেষাং ণ্যন্তানাং লাদয়ো মতাঃ।

তরস্যাম্' (পাণি.অ.১।৪।৫৩) ইত্যাদি সূত্র এবং বার্তিক দ্বারা কর্ম সংজ্ঞা হয় ; তন্মধ্যে বুদ্ধ্যর্থক, ভক্ষণার্থক এবং শব্দকর্মক ধাতুগুলির প্রযোজ্য কর্মে **'বুদ্ধিভক্ষার্থয়োঃ শব্দকর্মকাণাং নিজেচ্ছয়া'** এই নিয়মে নিজেচ্ছা মত এবং এর অতিরিক্ত ধাতুগুলির ভাবকর্মে, প্রযোজ্য কর্মে লকার হয়। নিজেচ্ছার উদাহরণ—'মাণবকঃ ধর্মং বুধ্যতে', 'তং প্রেরযতি গুরুঃ ইতি গুরুঃ মাণবকং ধর্মং বোধয়তি', 'গুরুণা মাণবকঃ ধর্মং'—'মাণবকং ধর্মঃ বোধ্যতে'। প্রযোজ্য কর্মের উদাহরণ—'দেবদত্তঃ গ্রামং গচ্ছতি', 'যজ্ঞদত্তঃ তং প্রেরয়তি', 'যজ্ঞদত্তঃ দেবদত্তেন গ্রামং গময়তি', 'যজ্ঞদত্তেন দেবদত্তঃ গ্রামং গম্যতে'।

যে ধাতুগুলির প্রযোজ্য কর্তার কর্ম সংজ্ঞা হয় না, সেগুলির তিঙন্ত কর্মে লকার হবে ; যেমন—'বালকঃ ভগবন্তং স্মরতি', 'তং গুরুঃ প্রেরয়তি ইতি গুরুঃ বালকেন ভগবন্তং স্মারয়তি', 'গুরুণা বালকেন ভগবান্ স্মার্যতে'।

অকর্মক এবং কালাদিকর্মক ধাতুগুলির ভাবকর্ম—অকর্মক ধাতুগুলির প্রয়োগ—'দেবদত্তঃ কুরুষু শেতে, মাসে আস্তে, দশ মাসেষু তিষ্ঠতি, গোদোহে আস্তে, ক্রোশে আস্তে'—এখানে **'অকর্মকধাতুভির্যোগে দেশঃ কালো ভাবো গন্তব্যোঽধ্বা চ কর্মসংজ্ঞক ইতি বাচ্যম্'** এই বার্তিক দ্বারা দেশ ইত্যাদির কর্মসংজ্ঞা হওয়ায় ওগুলিতে দ্বিতীয়া হয় ; 'দেবদত্তঃ কুরূন্ শেতে, মাসমাস্তে, দশ মাসান্ তিষ্ঠতি, গোদোহমাস্তে, ক্রোশমাস্তে'—এই প্রয়োগগুলি হয়েছে। এইপ্রকার কালাদিকর্মক ধাতুগুলির প্রয়োগ—'দ্বিজঃ মাসে বেদম্ অধীতে'—এতে **'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে'** (পাণি.অ. ২।৩।৫)—এই সূত্র দ্বারা কালবাচক মাসের কর্ম সংজ্ঞা হওয়ায় 'দ্বিজঃ মাসং বেদম্ অধীতে' হয়। উপরিউক্ত ধাতুগুলির ভাবকর্মে ঐ ধাতুগুলির কর্ম অথবা ভাবে লকার হয় ; কেননা অকর্মক এবং কালাদিকর্মক ধাতুগুলির যোগে আমরা দেশ, কাল ইত্যাদিকে কর্ম করেছি ; সুতরাং এগুলি মুখ্যকর্ম নয়। যেমন, অকর্মক—'দেবদত্তেন কুরবঃ—কুরূন্ শীয়তে, মাসো—মাসমাস্যতে, দশ মাসাঃ—মাসান্ স্থীয়ন্তে, গোদোহঃ—গোদোহমাস্যতে, ক্রোশঃ ক্রোশমাস্যতে'। **'কালাদিকর্মক'**—মাসো-মাসম্, বেদো—বেদম্ বা অধীয়তে।

অকর্মক এবং কালাদিকর্মক ধাতুগুলির ণ্যন্ত এবং ণ্যন্তের ভাবকর্ম—'যজ্ঞদত্তঃ দেবদত্তং মাসং আসয়তি, যজ্ঞদত্তেন দেবদত্তঃ মাসং আস্যতে। যজ্ঞদত্তঃ দেবদত্তং মাসং বেদম্ অধ্যাপয়তি, যজ্ঞদত্তেন দেবদত্তঃ মাসং বেদম্ অধ্যাপ্যতে'। এই সকল প্রয়োগে ণ্যন্তের প্রযোজ্য কর্মে লকার হয়। গীতাতেও অকর্মক ধাতুর ণ্যন্ত এবং ণ্যন্তের ভাবকর্মে প্রয়োগ দেখা যায় ; যেমন **তিঙন্ত**—'যস্মিন্ স্থিতঃ ন বিচলতি', 'যো ন বিচলতি', **ণ্যন্ত**—'যস্মিন্ স্থিতং গুরুদুঃখং ন বিচালয়তি।' 'যং গুণাঃ ন বিচালয়ন্তি', **ভাবকর্ম**—**'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'** (৬।২২), **'গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে'** (১৪।২৩) ইত্যাদি[১]।

তিঙন্ত থেকে সন্নন্ত, সন্নন্ত থেকে ণ্যন্ত এবং ণ্যন্ত হতে ভাবকর্ম—উদাহরণার্থ, **তিঙন্ত**—'ভক্তঃ হরিং দ্রষ্টুমিচ্ছতি' **সন্নন্ত**—'ভক্তঃ হরিং দিদৃক্ষতে', **ণ্যন্ত**—

---

[১]গীতায় ব্যবহৃত 'যয়েদং ধার্যতে জগৎ' (৭।৫) 'সর্বাণীত্যুপধারয়' (৭।৬), 'মৎস্থানীত্যুপধারয়' (৯।৬) তে 'ধৃ' ধাতুর উত্তর স্বার্থে 'ণিচ্' বুঝতে হবে, প্রেরণাতে নয় ; কারণ প্রেরণায় 'ণিচ্' ধরলে তার অর্থ ঠিক হয় না ; যেমন—'যয়েদং ধার্যতে জগৎ' এখানে প্রেরণার্থক 'ণিচ্' ধরলে তার অর্থ হয়—'ভগবান পরাপ্রকৃতি (জীব) দ্বারা জগৎ ধারণ করান।' কিন্তু এরূপ অর্থ করা যায় না। কারণ ভগবান কারোর কর্তৃত্ব এবং কর্মফল সংযোগের সৃষ্টি করেন না এবং 'এই কাজ তোমাকে করতে হবে'—এরূপ বিধানও দেন না—'ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্মফল-সংযোগম্,......।' (৫।১৪) ভগবান যদি উপর্যুক্ত বিধান দেন তাহলে কেউই কর্তৃত্ব এবং কর্মফল ত্যাগ করতে পারবে না। যদি ভগবানই কর্ম করান তবে 'শুভকর্ম করো এবং অশুভ কর্ম কোরো না'—এই বিধিনিষেধ জীবের পক্ষে প্রযোজ্য হবে না। তাহলে 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।' (২।৪৭) এই শ্লোকের সার্থকতা কী করে হবে ? জীবের কর্ম করার এবং কর্মফল ত্যাগ করার স্বাধীনতা থাকে কোথায় ? প্রকৃতপক্ষে এই জীবই স্বভাবের পরবশ হয়ে কর্ম করে, নিজেকে কর্তা বলে মনে করে এবং কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করে—'স্বভাবস্তু প্রবর্ততে' (৫।১৪)। এইপ্রকার 'উপধারয়' তে ণ্যন্ত অর্থ গ্রহণ করলে, তুমি ধারণ করাও, জানাও—তাহলে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে কাকে ধারণ করাবেন বা জানাবেন ?

'গুরুঃ ভক্তেন হরিং দিদৃক্ষয়তে', ভাবকর্ম—'গুরুণা ভক্তেন হরিঃ দিদৃক্ষ্যতে'।

(৩)

'সপ্তম্যধিকরণে চ' (পাণি. অ. ২।৩।৩৬)—এই সূত্র দ্বারা অধিকরণে (আধারে) সপ্তমী বিভক্তি হয়। আধার তিন প্রকারের—(১) ঔপশ্লেষিক (২) বৈষয়িক এবং (৩) অভিব্যাপক।

(১) যেখানে আধারের আধেয়ের সঙ্গে সংযোগাদি সম্পর্ক থাকে, তাকে 'ঔপশ্লেষিক আধার' বলে (এই আধার একদেশীয় হয়) ; যেমন—'কটে আস্তে' (মাদুরে বসে)—এখানে 'কট'-এর উপবেশনকারীর সঙ্গে সংযোগ সম্পর্ক আছে, সুতরাং 'কট' ঔপশ্লেষিক আধার। এইপ্রকার 'স্থাল্যাং পচতি' ইত্যাদি উদাহরণ বুঝতে হবে। গীতাতে এর প্রয়োগ এইরূপ হয়েছে 'শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ' (৬।১১), 'উপবিশ্যাসনে' (৬।১২) ইত্যাদি। সামীপ্যের কারণেও ঔপশ্লেষিক আধার হয়ে থাকে ; যেমন—'গুরৌ বসতি' (গুরুর নিকটে থাকে), 'বটে গাবঃ শেরতে' (বটের নিকট গাভীগুলি শুয়ে আছে), 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' (গঙ্গার নিকট ঘোষপল্লী আছে) ইত্যাদি।

(২) বিষয়রূপে যখন কাউকে আধার মনে করা হয়, তখন সেটি 'বৈষয়িক আধার' হয়। এই আধার হয় বৌদ্ধিক। যেমন—'মোক্ষে ইচ্ছাস্তি' (মোক্ষের বিষয়ে ইচ্ছা আছে) এখানে ইচ্ছার বিষয় হচ্ছে মোক্ষ। ভিন্ন কথায় সত্তারূপ ক্রিয়া (অস্তি)র আধার 'ইচ্ছা' হচ্ছে কর্তা এবং ঐ কর্তারও বিষয়ত্বের আধার হচ্ছে 'মোক্ষ'। এইপ্রকার 'ব্যাকরণে রুচিঃ', 'শিবে ভক্তিঃ' ইত্যাদি উদাহরণ বুঝতে হবে। গীতায়ও এর প্রয়োগ আছে ; যেমন—'নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে' (১৮।৪), 'তত্র' (১৪।৬) ইত্যাদি।

(৩) যেখানে আধারের প্রত্যেক অবয়বে আধেয়ের সত্তা বিদ্যমান, সেখানে 'অভিব্যাপক আধার' মনে করা উচিত। যেমন, 'সর্বস্মিন্ আত্মা অস্তি' (সর্বত্র আত্মা বিদ্যমান)—এখানে সত্তারূপ ক্রিয়া (অস্তি)র আধার 'আত্মা' হচ্ছে কর্তা এবং সেই কর্তারও অভিব্যাপক আধার হচ্ছে 'সর্ব'। এইরূপ 'তিলেষু তৈলম্', 'দধ্নি সর্পিঃ', 'পয়সি ঘৃতম্' ইত্যাদি উদাহরণ বুঝতে হবে। গীতায়ও 'সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্' (১৩।২৭), 'সমোঽহং সর্বভূতেষু' (৯।২৯) ইত্যাদি প্রয়োগ আছে।

উপর্যুক্ত তিন প্রকার আধার ছাড়া 'যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্' (পাণি. অ. ২।৩।৩৭)—এই সূত্র অনুসারে যার প্রসিদ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা অন্যের (অপর) ক্রিয়া লক্ষিত হয়, সেই ক্রিয়াকারীতেও সপ্তমী বিভক্তি হয় অর্থাৎ এই সপ্তমী 'হলে আমি গিয়েছিলাম', 'হচ্ছিল সে গেল', 'হতে যাচ্ছে সে যাবে', 'হয়ে গিয়েছিল সে গেল' ইত্যাদি বাক্যে হয়। এই সপ্তমী অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—তিন কালেই প্রযুক্ত হয় ; যেমন বর্তমান কালে 'বর্ষায়াং সত্যাং দেবদত্তঃ সমায়াতঃ' (বৃষ্টি হচ্ছিল ; দেবদত্ত এসে গেল), অতীত কালে—'ধর্মে নষ্টে কুলম্ অধর্মঃ অভিভবতি' (ধর্ম নষ্ট হলে অধর্ম কুলকে অভিভূত করে) ; ভবিষ্যতে কালে—'ধর্মে বিনঙ্ক্ষ্যমাণে কৃষ্ণোঽবতরিষ্যতি' (ধর্মের বিনাশ হতে যাচ্ছে, কৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করবেন)।

এই সপ্তমী কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য দুইয়েই হয় ; যেমন—কর্তৃবাচ্যে—'দেবদত্তঃ গ্রামং গতঃ' (দেবদত্ত গ্রামে গেছে), এতে সপ্তমী করলে 'দেবদত্তে গ্রামং গতে চৌরাঃ প্রাবিশন্' (দেবদত্ত গ্রামে চলে যাবার পর চোর ঢুকেছিল)—এইরূপ বাক্য হল। 'কোশগতঃ দ্বিরেফঃ ইত্থং বিচিন্তয়ন্ আসীৎ' (কোশে উপবিষ্ট হয়ে ভ্রমর ঐরূপ চিন্তা করছিল)। এতে সপ্তমী করলে 'কোশগতে দ্বিরেফে ইত্থং বিচিন্তয়তি নলিনীং গজ উজ্জহার' (কমলের পাপড়িতে উপবিষ্ট হয়ে ভ্রমর ঐরূপ চিন্তা করছিল, হাতী কমলটিকে উপড়ে নিল)—এইরূপ বাক্য হল। কর্মবাচ্যে—'গোপৈঃ গাবঃ দুহ্যন্তে' (গোপগণ গাভীগুলির দুগ্ধ দোহাচ্ছে), এতে সপ্তমী করলে বাক্য এইরূপ হয়, 'গোপৈঃ গোষু দুহ্যমানেষু শ্রীকৃষ্ণঃ গতঃ' (গোপেদের দ্বারা গাভীগুলি দোহন করা হচ্ছিল, শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলেন)। 'ময়া কার্যং কৃতম্' (আমি কাজ করেছি), এতে সপ্তমী করলে হয়, 'ময়া কার্যে কৃতে সতি সর্বে প্রসন্না অভবন্' (আমি কাজ করায় সকলে প্রসন্ন হয়েছে)।

'শান্ত' কর্মবাচ্যে ; যেমন—'কেনচিৎ রজকৈঃ বাসাংসি প্রক্ষাল্যন্তে' (কোন একজন রজকদের দ্বারা

কাপড় ধৌত করাচ্ছে), এতে সপ্তমী হলে বাক্য এইরূপ হয় 'রজকৈঃ বস্ত্রেষু প্রক্ষাল্যমানেষু অহং গতঃ' (রজকদের দ্বারা বস্ত্র ধৌত করানো হচ্ছিল, আমি চলে গেলাম)।

(৪)

কর্ম দুই প্রকারে হয়—(১) তিঙন্ত কর্ম ; যেমন—'কৃষ্ণ গাঃ চারয়তি' এবং (২) বাক্য কর্ম ; যেমন—**'মহাত্মানঃ মান্যাঃ'**, **'মনীষিণঃ প্রবদন্তি'**। কর্তার নিজ ক্রিয়া দ্বারা প্রাপ্তি করার অত্যন্ত ইচ্ছা হওয়ায় তার কর্ম সংজ্ঞা হয়ে তাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়ে যায়। সুতরাং তিঙন্ত কর্মে কোনো প্রশ্নই থাকে না। কিন্তু বাক্য কর্মের (সমস্ত বাক্যটির আলাদা) প্রাতিপাদিক সংজ্ঞা না হওয়ায় সেটি কর্ম হলেও তার কর্ম সংজ্ঞা হয় না এবং কর্ম সংজ্ঞা না হওয়ায় এতে দ্বিতীয়াও হয় না, বরং প্রথমাই থাকে। যেমন **'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ'** এর যতক্ষণ সমাস না হয় ততক্ষণ প্রাতিপাদিক সংজ্ঞা হয় না, সেটি বাক্যই থাকে। এইভাবেই এখানে **'মহাত্মানঃ মান্যাঃ'**—এই বাক্যের কর্মের কর্ম সংজ্ঞা হয় না, তা বাক্যই থাকে। বাক্যকর্মে **'ইতি'** অব্যয় অধ্যাহার করতে হয়, যেমন—**'মহাত্মানঃ মান্যাঃ'** (মহাত্মাগণকে মান্য উচিত)—আমরা এইরূপ বললে সেখানে **'ইতি'** অধ্যাহার করেই বলতে হয়—**'ইতি মনীষিণঃ প্রবদন্তি'** (মনীষীরা এইরূপ বলে থাকেন)। গীতায়ও এইরূপ বাক্যকর্মের প্রয়োগ আছে ; যেমন—**'বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ'** (১০।১৬), **'হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ'** (১০।১৯)। এখানে **'বক্তুম্'** এবং **'কথয়িষ্যামি'** ক্রিয়াগুলির **'দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ'** তে কর্মসংজ্ঞা এবং দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়ে **'দিব্যা আত্মবিভূতীঃ'**—এইরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু বাক্যকর্মের কর্ম সংজ্ঞা না হওয়ায় প্রথমা বিভক্তিই থাকে এবং এতে **'ইতি'** অধ্যাহার করতে হয়।

(৫)

কারক বক্তার ইচ্ছা অনুসারে হয়ে থাকে—**'বিবক্ষাতঃ কারকাণি ভবন্তি'**। অর্থাৎ কখনো কখনো বক্তা কোন প্রয়োজনবিশেষে করণ, কর্ম ইত্যাদিকেও কর্তারূপে প্রয়োগ করে ; যেমন—'অসিশ্ছিনত্তি' (তরবারি কাটে), 'অগ্নিঃ পচতি' (আগুন পাক করে), 'কাষ্ঠং ভিদ্যতে' (কাঠ ভাঙ্গে), 'স্থালী পচতি' (হাঁড়ি রান্না করে)। এখানে তরবারি এবং আগুন হচ্ছে করণ, কাঠ হচ্ছে কর্ম এবং হাঁড়ি হচ্ছে অধিকরণ। কিন্তু বক্তা হাঁড়ি প্রভৃতিকে কর্তৃরূপে ব্যবহার করতে চায়। সেইজন্য এগুলিকে করণ, কর্ম ইত্যাদি রূপে প্রয়োগ না করে কর্তৃরূপে প্রয়োগ করা হয়েছে। এইরূপ বিবক্ষা (ইচ্ছা)য় প্রায়শঃই অত্যধিক সৌকর্য প্রকাশ করাই বক্তার প্রয়োজন—**'অসিশ্ছিনত্তি'**তে তরবারির ধার তীক্ষ্ণ হওয়ার দরুণ তাতে কাটতে অত্যন্ত সৌকর্যের দ্যোতন করাই বক্তার উদ্দেশ্য এবং ইহাই **'অগ্নিঃ পচতি'**তেও অভীষ্ট। **'কাষ্ঠং ভিদ্যতে'**-তে কাষ্ঠ শুষ্ক হওয়ার দরুণ সেটি ভাঙ্গতে অত্যন্ত সুকর, এইটি জানানোই বক্তার লক্ষ্য। **'স্থালী পচতি'** তে হাঁড়ির তলা পাতলা হওয়ার দরুণ তাতে রাঁধা সুকর জানানোই বক্তার অভীষ্ট। এইরূপ প্রয়োগ শুধু সংস্কৃত ভাষাতেই নয়, অন্যান্য ভাষাতেও পাওয়া যায়।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী যখন করণ বা অধিকরণ ইত্যাদিকে কর্তা করা হয়, তখন কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় না। সাধারণতঃ এগুলিকে কর্তা ধরে নিয়ে তদনুসারে লকার বিধান করে সহজেই প্রয়োগ হয়ে থাকে। কিন্তু অত্যন্ত সৌকর্য দেখাবার জন্য যখন কর্মকে কর্তা করা হয়, তখন তাতে কোনও কোনও স্থানে বিশেষ পরিবর্তন হয়। কর্ম যখন কর্তা হয়, তখন সকর্মক ধাতুও অকর্মক হয়ে যায় ; যেমন—**'কাষ্ঠং ভিদ্যতে'** (কাঠ ভাঙ্গে) **'দেবদত্তঃ কাষ্ঠং ভিনত্তি'**। **'দেবদত্তঃ কাষ্ঠং কিং ভিনত্তি, কাষ্ঠং তু স্বয়মেব ভিদ্যতে'**। অর্থাৎ এক ব্যক্তি বলছে যে 'দেবদত্ত কাঠ ভাঙ্গছে' ; তাতে অপর ব্যক্তি বলছে যে, 'দেবদত্ত কি ভাঙ্গছে, কাঠ তো নিজে নিজেই ভেঙ্গে যাচ্ছে !' এখানে সকর্মক ধাতু 'ভিদ্' ছিল, কিন্তু কর্ম কর্তা হওয়ায় সেটি অকর্মক হয়ে গেছে। সকর্মক অবস্থায় 'ভিদ্' ধাতুর অর্থ ছিল 'ভেঙ্গে ফেলা', কিন্তু অকর্মক অবস্থায় এর অর্থ হল 'ভেঙ্গে পড়া'। ঐ কর্মক ধাতুর উত্তর যে 'লকার' হয় তাহা **'লঃ কর্মণি চ ভাবে চাকর্মকেভ্যঃ'** (পাণি. ৩।৪।৬৯)—এই সূত্র অনুসারে কর্তায় এবং ভাবে হবে।

কর্মের কর্তা হওয়ার পূর্বে যে ক্রিয়া কর্মে স্থিত রয়েছে, সেই ক্রিয়া যদি ঐ কর্মভূত কর্মে স্থিত হয় তাহলে ঐ কর্তা কর্মবৎ (লক্ষিত) হয়। যেমন—**'কালঃ ফলং পচতি'**, **'দেবদত্তঃ কাষ্ঠং ভিনত্তি'** ইত্যাদিতে 'পচ্' ধাতুর

'পাক হওয়া' রূপ ক্রিয়া এবং 'ভিদ্' ধাতুর 'ভেঙ্গে পড়া' রূপ ক্রিয়া, যা কর্মে স্থিত, সেই ক্রিয়া কর্মকর্তৃ-প্রক্রিয়ায় 'ফলং পচ্যতে', 'কাষ্ঠং ভিদ্যতে' বাক্যগুলির কর্তায়ও বিদ্যমান ; তাতে কোন পার্থক্য হয়নি। অতএব এখানে কর্তা কর্মবৎ হয়েছে। কর্তাকে কর্মবৎ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, কর্ম অর্থাৎ কর্মবাচ্যে আত্মনেপদ, যক্, চিণ্বদিট্ ইত্যাদি যে কার্য হয়, সে সব কার্য কর্ম কর্তা হলেও হবে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই যে, ঐ ক্রিয়ারই কর্তা কর্মবদ্ ভাবকে প্রাপ্ত হয়, যে ক্রিয়া কর্মে স্থিত হলেও কর্মে স্পষ্টতঃ কিছু বিকার দেখা যায়। যেমন, পচ্ ধাতুর কর্ম পক্ক ফলে এবং ভিদ্ ধাতুর কর্ম ভেঙ্গে যাওয়া কাষ্ঠে স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় যে এতে পাক এবং ভেদন ক্রিয়ার প্রভাব হয়েছে। অতএব এই ধাতুগুলির কর্ম কর্তা হওয়ায় কর্মস্থ ক্রিয়াতে কর্মবদ্‌ভাব হয় ; যেমন—'ফলং পচ্যতে', 'কাষ্ঠং ভিদ্যতে' ইত্যাদি[১]। কিন্তু 'গম্' 'দৃশ্' 'জ্ঞা' ইত্যাদি ধাতুগুলির কর্মস্থ ক্রিয়ার কর্মে এইপ্রকার কোন স্পষ্ট বিকার দেখা যায় না ; কারণ কোন গ্রামে গেলে, সেই গ্রামে বাইরে থেকে কোন পরিবর্তন হয় না।

কোন শ্লোকের অর্থ জেনে নিলে সেই অর্থের স্পষ্টতঃ কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং এই ধাতুগুলির কর্ম কর্তা হলেও কর্মবদ্‌ভাব হয় না।

গীতার প্রথম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে 'বাজনা বাজানো হল' এইরূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাজনা বাজার সহায়তা জ্ঞাপনের জন্য ও সৈন্যদলের উৎসাহ প্রকাশের জন্য 'বাজনা বেজে উঠল' (অভ্যহন্যন্ত)—এইরূপ প্রয়োগ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতষট্টি সংখ্যক শ্লোকের পূর্বার্ধে কর্মকর্তৃ প্রয়োগ করার পূর্বে কর্তৃবাচ্য ছিল অর্থাৎ 'চরতাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ ইন্দ্রিয়ম্ যৎ মনঃ অনুবিদধাতি'—এইরূপ বাক্য ছিল, এই বাক্যে ইন্দ্রিয় ছিল কর্তা এবং মন ছিল কর্ম। কিন্তু যখন বাক্যকে সহজ করার জন্য 'কর্মকর্তৃ'র প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ কর্মকে কর্তা করা হয়, তখন সেখানে নির্বর্ত্য এবং বিকার্য কর্মে কর্মবদ্‌ভাব হয়, অন্য স্থানে (প্রাপ্য কর্মে) হয় না। তাতে কর্মকে নিয়ে যে কার্য-সকল হয় তা সবই কর্তাকে ধরে হয়। এখানে মনের প্রাধান্য দেখাবার জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যতীত মনই সমস্ত করে—তা দেখাবার উদ্দেশ্যেই কর্মরূপ মনকে কর্তৃরূপে দেখানো হয়েছে। মন প্রথম পুরুষ হওয়ায় প্রথম পুরুষ 'অনুবিধীয়তে' ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়েছে। এখন যে কর্তৃবাচ্যের কর্তা ছিল ইন্দ্রিয়, তার প্রয়োজনীয়তা না থাকায় সে আর থাকে না, তখন সম্পূর্ণ বাক্য এইরূপ হয়—'ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে', যা উপর্যুক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে। এই কর্মকর্তৃ-প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে ইন্দ্রিয়গুলি যে বিষয়ে বিচরণ করে, সেই বিষয়গুলির মধ্যে মন যে যে বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, রসাস্বাদন করে, মনই নিজেই বুদ্ধিকে হরণ করে অর্থাৎ মনেই বিষয়-ভোগের প্রাধান্য হয়।

(৬)

ধাতুগুলির উত্তর যত লকার হয়, তা সব 'লঃ কর্মণি চ ভাবে চাকর্মকেভ্যঃ' (পাণি.অ.৩।৪।৬৯) এই সূত্র

---

[১]নির্বর্ত্যে চ বিকার্যে চ কর্মবদ্‌ভাব ইষ্যতে। ন তু প্রাপ্যে কর্মণীতি সিদ্ধান্তোঽত্র ব্যবস্থিতঃ॥ (বৈয়া, ভূষণসার)

অর্থাৎ কর্ম তিন প্রকারের হয়—নির্বর্ত্য, বিকার্য এবং প্রাপ্য। এর মধ্যে নির্বর্ত্য এবং বিকার্য কর্মে কর্মবদ্‌ভাব হয়, প্রাপ্য কর্মে হয় না—এইরূপ সিদ্ধান্ত বৈয়াকরণগণ ব্যবস্থা করেছেন।

যা উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্নের মতো দেখায়, তা হচ্ছে 'নির্বর্ত্য কর্ম'। যেমন কুমোর ঘট তৈরী করছে ও ঘট তৈরী হচ্ছে দেখা যাচ্ছে, কেউ বাড়ী তৈরী করছে এবং বাড়ী তৈরী হওয়া সকলে দেখতে পাচ্ছে। সুতরাং ঘট ও বাড়ী হচ্ছে নির্বর্ত্য কর্ম।

যা বিকার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাতে বিকার হয়, তা হচ্ছে 'বিকার্য কর্ম'। যেমন, কাঠের ছোট ছোট টুকরো করলে, ঘট এবং কাপড়কে ছিঁড়ে ফেললে কাঠ ও কাপড় বিকার প্রাপ্ত হয়। অতএব কাঠ ও কাপড় হল বিকার্য কর্ম।

যাতে দর্শনে বা অনুমানে কোনও ক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না, তা হচ্ছে 'প্রাপ্য কর্ম'। যেমন—কোন এক ব্যক্তি গ্রাম দেখে এসেছে, কিন্তু গ্রামটিকে দেখাতে সেই গ্রামের কোন বিকার হয়নি। সুতরাং গ্রাম হল প্রাপ্য কর্ম।

ক্রিয়াগতবিশেষাণাং সিদ্ধির্যত্র ন গম্যতে। দর্শনাদনুমানাদ্বা তৎপ্রাপ্যমিতি কথ্যতে॥ (বাক্যপদীয় ৩।৭।৫১)

অর্থাৎ যেখানে কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে, সেখানে কর্মবদ্‌ভাব হয়, অন্যত্র হয় না।

অনুসারে সকর্মক ধাতুগুলির উত্তর কর্তায় এবং কর্মে হয় এবং অকর্মক ধাতুগুলির উত্তর কর্তায় ও ভাবে হয়।

সংস্কৃতে 'করতে করতে, খেতে খেতে, পান-ভোজনকারী' ইত্যাদি অর্থে লট্ লকারের স্থানে '**লটঃ শতৃশানচাবপ্রথমাসমানাধিকরণে**' (পাণি. অ. ৩।২। ১২৪)—এই সূত্র অনুসারে পরস্মৈপদী ধাতুগুলির উত্তর '**শতৃ**' এবং আত্মনেপদী ধাতুগুলির উত্তর '**শানচ্**' প্রত্যয় হয়। এই দুটি প্রত্যয় '**লট্**'-এর স্থানে হওয়ায় কর্তায়, কর্মে এবং ভাবে হয় এবং এই দুটি প্রত্যয়ান্ত শব্দ কর্তা ও কর্মের বিশেষণ হয় এবং এই দুটি প্রত্যয় কৃৎপ্রত্যয় হওয়ায় এদের যোগে '**কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি**' (পাণি. অ. ২।৩।৬৫) এই সূত্রে কর্তা ও কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হওয়ার কথা। যেমন—সকর্মক ধাতুগুলির উত্তর কর্তায় হওয়া '**কৃষ্ণঃ বনং গচ্ছন্**' (কৃষ্ণ বনে যেতে যেতে) '**গোবিন্দঃ কার্যং কুর্বাণঃ**' (গোবিন্দ কার্য করতে করতে) '**শতৃ**' (গচ্ছন্) এবং '**শানচ্**' (কুর্বাণঃ)—এই দুইটির যোগে '**বনম্**' এবং '**কার্যম্**'-এ ষষ্ঠী হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু '**ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাম্**' (পাণি. অ. ২।৩।৬৯)—এই সূত্রে ষষ্ঠীর নিষেধ হয় বলে অনুক্ত কর্মে '**কর্মণি দ্বিতীয়া**' দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়েছে। এরূপ প্রয়োগ গীতাতেও আছে ; এবং তাদের যোগে কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়েছে যেমন—'**শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্**' (৪।২১), '**লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্**' (৩।২০), '**অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম**' (৩।১৯), '**গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্**' (১১।৩০), '**সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ**' (১৮।৫৬), '**বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি**' (১১।২৭), '**শ্রদ্দধানা মৎপরমা**' (১২।২০) ইত্যাদি। ঐ প্রত্যয়ান্ত শব্দ কর্তার বিশেষণ হওয়ায় যখন কর্তা দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি বিভক্তিতে যায় তখন ঐ প্রত্যয়ান্ত শব্দও ঐগুলির বিশেষণরূপে ঐগুলির সঙ্গেই দ্বিতীয়াদি বিভক্তিতে যায় ; যেমন—'**গ্রামং গচ্ছন্তং কৃষ্ণং পশ্য**', '**কার্যং কুর্বাণং গোবিন্দং পশ্য**' ; '**কৃষ্ণেন গ্রামং গচ্ছতা**', '**গোবিন্দেন কার্যং কুর্বাণেন**', ইত্যাদি। গীতাতেও '**সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্....যঃ পশ্যতি**' (১৩।২৭), '**কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ....কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ**' (১।৩৯) ইত্যাদিতে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে কর্তায় বিহিত '**শতৃ**' এবং '**শানচ্**' প্রত্যয়ান্ত শব্দ, কর্তা যে প্রকারের, যে বিভক্তিতে হয়, তার বিশেষণ হয়ে সেই বিভক্তিতেই থাকে। কিন্তু এই (দুই) প্রত্যয়ান্ত শব্দের কর্মভূত শব্দগুলিতে দ্বিতীয়াই হয়ে থাকে, যেমন—'গোবিন্দঃ কার্যং কুর্বন্-কুর্বাণঃ বদতি', কার্যং কুর্বন্তং / কুর্বাণং গোবিন্দং পশ্য', 'কার্যং কুর্বতা/কুর্বাণেন গোবিন্দেন ইদং কথিতম্', 'কার্যং কুর্বতে/কুর্বাণায় গোবিন্দায় পুষ্পং দেহি', 'কার্যং কুর্বতঃ/কুর্বাণাৎ গোবিন্দাৎ গীতাং শৃণু', কার্যং কুর্বতঃ/কুর্বাণস্য গোবিন্দস্য ইয়ং গীতা বর্ততে', 'কার্যং কুর্বতি/কুর্বাণে গোবিন্দে কশ্চিদ্ গতঃ'।

কর্মবাচ্যে বিহিত '**শানচ্**' প্রত্যয়ান্ত শব্দ, কর্ম যে প্রকারের এবং যে বিভক্তিতে হয় তারই বিশেষণ হয়ে সেই বিভক্তিতেই থাকে। কিন্তু তার কর্তায় সর্বদা তৃতীয়াই হয় ; যেমন—'গোপৈঃ গাবঃ দহ্যমানাঃ সন্তি'; 'গোপৈঃ গাঃ দুহ্যমানান্ পশ্য' ; 'গোপৈঃ দুহ্যমানৈঃ গোভিঃ ইয়ং ভূমিঃ অতীব দুর্লভা' ; 'গোপৈঃ দুহ্যমানেভ্যঃ গোভ্যঃ গুড়ং যচ্ছ' ; 'গোপৈঃ দুহ্যমানেভ্যঃ গোভ্যঃ দূরে তিষ্ঠ' ; 'গোপৈঃ দুহ্যমানানাং গবাং দর্শনং কুরু'; 'গোপৈঃ গোষু দুহ্যমানেষু কৃষ্ণঃ গতঃ'। গীতাতেও এর ব্যবহার আছে ; যেমন—'**ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে**' (২।২০) ইত্যাদি।

কর্মে বিহিত '**শানচ্**' প্রত্যয়ের যোগে কর্ম উক্ত হওয়ায় কর্মে প্রথমা এবং অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয় ; যেমন—'কৃষ্ণেন বৃন্দাবনং গম্যমানম্', 'হরিণা জগৎ ক্রিয়মাণম্' ইত্যাদি। গীতাতেও '**প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ**' (৩।২৭), '**প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ**' (১৩।২৯), '**প্রোচ্যমানমশেষেণ**' (১৮।২৯) ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যায়।

অকর্মক ধাতুর উত্তর কর্তায় '**শতৃ**' এবং '**শানচ্**' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির যোগে কর্তা উক্ত হওয়ায় প্রথমা বিভক্তি হয় ; যেমন—'কৃষ্ণ তিষ্ঠন্ খাদতি' ; 'গোবিন্দঃ শয়ানঃ বদতি' ইত্যাদি। গীতায়ও '**অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্**' (৪।৬), '**তত্ত্ববিৎ ......স্বপন্**' (৫।৮) ইত্যাদি '**শতৃ**'র এবং '**বেপমানঃ কিরীটী**' (১১।৩৫), '**প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী**' (৬।৪৫) ইত্যাদি '**শানচ্**'-এর প্রয়োগ বুঝতে হবে।

যদিও **'ন লোকাব্যয়'** সূত্র দ্বারা ষষ্ঠীর নিষেধ থাকায় কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, তবুও এই নিষেধ কারকষষ্ঠীরই হয়, শেষষষ্ঠীর নয়। তাই **'শানচ্'** এবং **'শতৃ'**র যোগে কর্মে কখনো শেষষষ্ঠী হয়ে যায়, যেমন—'ব্রাহ্মণস্য কুর্বন্ কুর্বাণঃ' ইত্যাদি। গীতায় **'শানচ্'** প্রত্যয়ের যোগে শেষষষ্ঠী ধরে কর্মে ষষ্ঠী হয়েছে দেখা যায় ; যেমন— **'অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য'** (৯।৩) ইত্যাদি।

(৭)

ব্যাকরণে **'করে'**, **'গিয়ে'**, **'খেয়ে'**, 'পান করে' ইত্যাদি অর্থে **'সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে'** (পাণি.অ. ৩।৪।২১)—এই সূত্র দ্বারা ধাতুর উত্তর **'ক্ত্বা'** প্রত্যয় হয় এবং সেটি অব্যয় হয়ে যায় অর্থাৎ তার সকল বিভক্তিতেই এক সমান রূপ থাকে এবং সকর্মক ধাতুর উত্তর বিহিত 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের যোগে কর্মে দ্বিতীয়া হয় ; যেমন—**'স জলং পীত্বা গচ্ছতি'** (সে জল পান করে যাচ্ছে), **'ভক্তঃ বিষ্ণুং নত্বা স্তৌতি'** (ভক্ত বিষ্ণুকে নমস্কার করে স্তুতি করছে) ইত্যাদি। গীতায়ও এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়েছে ; যেমন—**'দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্'** (পাণ্ডবদের সেনাকে দেখে) (১।২) ; **'যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে'** (যাঁকে জেনে আর কিছু জানার বাকী থাকে না) (৭।২) ; **'এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা'** (এইভাবে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জেনে) (৩।৪৩) ; **'ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ'** (মনীষী ব্যক্তিগণ ফলত্যাগ করে) (২।৫১) **'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা'** (আসক্তি ত্যাগ করে যোগস্থিত হয়ে কর্ম কর) (২।৪৮) ইত্যাদি।

অকর্মক ধাতুগুলির উত্তর বিহিত **'ক্ত্বা'** প্রত্যয়ের যোগে কর্তা যেমন ছিল তেমনই থাকে ; যেমন—**'কৃষ্ণঃ শয়িত্বা বনং গমিষ্যতি'** (কৃষ্ণ শয়ন করে বনে চলে যাবেন), **'গোপঃ স্থিত্বা অবদৎ'** (গোপ দাঁড়িয়ে থেকে বলতে লাগল) ইত্যাদি। গীতায়ও এইপ্রকার প্রয়োগ আছে ; যেমন—**'নায়ং ভূত্বা ভবিতা'** (এই শরীরী বা দেহী দেহ গ্রহণ করে অস্তিত্ববান হন না) (২।২০) ; **'যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্'** (যাঁদের কাছে তুমি বহুমান্য হয়ে লঘুতা প্রাপ্ত হবে) (২।৩৫) ইত্যাদি।

'ক্ত্বা' প্রত্যয়ান্ত ধাতুর পূর্বে যদি **'নঞ্'** সমাস না থাকে এবং তার পূর্বে কোন অব্যয় যদি যুক্ত হয়, তাহলে **'সমাসেঽনঞ্পূর্বে ক্ত্বো ল্যপ্'** (পাণি. অ. ৭।১।৩৭) —এই সূত্র দ্বারা 'ক্ত্বা'-এর স্থানে 'ল্যপ্' প্রত্যয় হয়, যেমন—**'কৃষ্ণঃ বৃন্দাবনং প্রাপ্য প্রসন্নোঽভবৎ'** (কৃষ্ণ বৃন্দাবন প্রাপ্ত হয়ে প্রসন্ন হলেন), **'ভক্তঃ কৃষ্ণং প্রণম্য আগতঃ'** (ভক্ত কৃষ্ণকে প্রণাম করে এসেছে) ইত্যাদি। গীতায় এর প্রয়োগ এইভাবে আছে—**'সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বম্'** (নিজ নাসিকার অগ্রভাগ দেখে) (৬।১৩) ; **'উপবিশ্যাসনে'** (নিজ আসনে বসে) (৬।১২) ; **'মনঃ সংযম্য'** (মনের সংযম করে) (৬।১৪) ; **'মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য'** (মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে) (৬।২৪) ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত সূত্র দ্বারা 'নঞ্' সমাস পূর্বে হলে 'ক্ত্বা'র স্থানে 'ল্যপ্'-এর নিষেধ হয়, কিন্তু 'নঞ্' সমাসপূর্বক ল্যবন্তের অনেক উদাহরণ দেখা যায়, তা কি করে হয় ? অব্যয় পূর্বে থাকলে 'ক্ত্বা'র স্থানে 'ল্যপ্' করতে হয়। 'ল্যপ্' করে পরে 'নঞ্' সমাস করা যায়, যেমন, **'অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজযুগ্মং অনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীম্'** (শ্রীরাধার চরণযুগলের আরাধনা না করে এবং বৃন্দাবনের আশ্রয় না নিয়ে) ইত্যাদি। গীতাতেও এরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়—**'অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্'** (অনুবন্ধ, ক্ষয়, হিংসা ইত্যাদি না দেখে) ; (১৮।২৫) **'অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে'** (আমাকে না পেয়ে মৃত্যু সংসার-পথে পরিভ্রমণ করে) (৯।৩) ; **'মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়'** (আমাকে প্রাপ্ত না হয়েই) (১৬।২০) ইত্যাদি।

বারংবার অর্থের প্রতীতিতে 'ক্ত্বা'-এর অর্থে **'আভীক্ষ্ণ্যে ণমুল্ চ'** (পাণি. অ. ৩।৪।২২)-এই সূত্র দ্বারা 'ণমুল্' তথা 'ক্ত্বা' প্রত্যয় হয় ধাতুর উত্তর। যেমন—'স্মারং স্মারং শিবং নমতি, স্মৃত্বা স্মৃত্বা শিবং নমতি' (স্মরণ করে করে শিবকে নমস্কার করছে) 'শ্রাবং শ্রাবং বদতি, শ্রুত্বা শ্রুত্বা বদতি' (শুনে শুনে বলে) ইত্যাদি। গীতায় 'ণমুল' প্রত্যয়ান্তের দ্বিরুক্তি পাওয়া যায় না, তবে 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ান্তের দ্বিরুক্তি পাওয়া যায়, যেমন—**'ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে'** (সেই প্রাণিগণ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে লয় পায়) (৮।১৯), **'রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্'** (এঃ

অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করে করে) (১৮।৭৬) ; 'তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য[১] রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ' (ভগবানের সেই অত্যন্ত অদ্ভুত রূপ স্মরণ করে করে) (১৮।৭৭) ইত্যাদি।

(৮)

গৌণ এবং মুখ্য ক্রিয়ার ব্যাপারে মুখ্য ক্রিয়ার সম্বন্ধই মুখ্য থাকে—এই নিয়মানুসারে কর্তৃবাচ্যে '**ভক্তঃ হরিং দ্রষ্টুং শক্নোতি**' এবং কর্মবাচ্যে '**ভক্তেন হরিঃ দ্রষ্টুং শক্যতে**' প্রয়োগ হয়। কৃদন্ত 'দ্রষ্টুম্' এবং 'তিঙন্ত', 'শক্নোতি'/'শক্যতে'—এই ক্রিয়া দুটিতে 'দ্রষ্টুম্' গৌণ ক্রিয়া এবং 'শক্নোতি'/'শক্যতে' মুখ্য ক্রিয়া। অতএব 'হরি' শক্ ধাতুরই কর্মরূপে প্রতীয়মান হয়, 'দ্রষ্টুম্'-এর নয়। সেইজন্য '**অহং বেদং পঠিতুং শক্নোমি, ময়া বেদঃ পঠিতুং শক্যতে**' ইত্যাদি প্রয়োগগুলিতে 'শক্' ধাতুর ক্রিয়াই মুখ্য থাকে এবং তার যোগে কর্ম সংজ্ঞা হয়। কিন্তু '**অহং শ্রীহরিং দ্রষ্টুং গচ্ছামি, ময়া শ্রীহরিং দ্রষ্টুং গম্যতে**', '**অহং বেদং পঠিতুং গ্রামং গচ্ছামি, ময়া বেদং পঠিতুং গ্রামঃ গম্যতে**' ইত্যাদি প্রয়োগে 'গচ্ছামি' মুখ্য ক্রিয়া, কিন্তু এর কর্ম গ্রাম, বেদ নয়। অতএব কর্মবাচ্যে বেদ উক্ত হয় না এবং তা 'পঠিতুম্'-এরই কর্ম হয়ে থাকে। সেখানে গ্রাম উক্ত হয় এবং তা কর্ম 'গচ্ছামি'র।

গীতাতেও 'শক্' ধাতুর ক্রিয়াযোগেই কর্ম হয় ; যেমন—'**নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া**'। '**শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুম্**' (১১।৫৩)। এর কর্তৃবাচ্যে এই প্রকারের বাক্য ছিল '**(ত্বং) এবংবিধং মাং বেদৈঃ তপসা দানেন ইজ্যয়া চ দ্রষ্টুং ন শক্নুয়াঃ**' (তুমি এইরূপ আমাকে বেদ, তপ, দান এবং যজ্ঞের দ্বারা দেখতে পারবে না) কিন্তু যখন এর কর্মবাচ্য করা হল, তখন বাক্যটি হল—'**(ত্বয়া) এবংবিধঃ অহং বেদৈঃ তপসা দানেন ইজ্যয়া চ দ্রষ্টুং ন শক্যঃ**'[২]। এইরূপ—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥ (১১।৫৪)
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো। (১১।৪)
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ (৬।৩৬)

—ইত্যাদি শ্লোকগুলিতে 'শক্' ধাতুর যোগে কর্ম সম্পাদিত বলে ধরতে হবে। তাছাড়া '**ন তু মাং শক্যসে[৩] দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা**' (১১।৮), '**শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীর-বিমোক্ষণাৎ। কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্**' (৫।২৩), '**অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্**' (১২।৯) ইত্যাদি শ্লোকগুলির কর্তৃবাচ্য প্রয়োগেও উপরিউক্ত কথাই ধরা উচিত।

'শক্' ধাতুর মতই 'অর্হ্' ধাতুর যোগেও কর্ম হয় ; যেমন—'**ত্বং গীতাং বক্তুম্ অর্হসি**' এই কর্তৃবাচ্য বাক্য থেকে যখন কর্মবাচ্য করা হয়, তখন '**ত্বয়া গীতা বক্তুম্ অর্হ্যতে**' এতে অর্হ্ ধাতুর যোগে কর্ম হয়েছে, কিন্তু অন্য ধাতুর যোগে নয়। যেমন—'**ত্বং গীতাং পঠিতুং সমর্থঃ**' এই কর্তৃবাচ্য বাক্য থেকে যখন কর্মবাচ্য করা হয়, তখন '**ত্বয়া গীতাং পঠিতুং সমর্থেন ভূয়তে**'—এই বাক্যে 'অস্' ধাতু অকর্মক হওয়ায় তার যোগে কর্ম হয় না। গীতায়ও এর প্রয়োগ আছে ; যেমন—'**এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ**' (৬।৩৯) '**প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্**' (১১।৪৪) ইত্যাদি।

(৯)

সংস্কৃত-ব্যাকরণ অনুযায়ী কর্তার নিজ ক্রিয়া দ্বারা যা অত্যন্ত প্রাপণীয় হয়, তার কর্ম সংজ্ঞা হয়ে তাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন—'**কৃষ্ণো গ্রামং গচ্ছতি**'—এই বাক্যে কৃষ্ণের গমনরূপ ক্রিয়ার দ্বারা গ্রাম অত্যন্ত প্রাপণীয়। অতএব এখানে গ্রামের কর্ম সংজ্ঞা হয়ে অনুক্ত

---

[১]'ল্যপ্' হলে যদি 'ল্যপ্'-এর যকার হ্রস্ব স্বরের পরে হয় তাহলে হ্রস্ব স্বরের তুক্ আগম হয়ে তকার 'ল্যপ্'-এর যকারের সঙ্গে যুক্ত হয় ; যেমন—'নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ' (১।৩৬)।

[২]'ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ' (১৮।১১)—এখানেও উপর্যুক্ত প্রকারে 'শক্' (শক্যম্) ধাতুর যোগে কর্মসংজ্ঞা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখানে 'অশেষতঃ' এই অব্যয়ের যোগে কর্ম উক্ত হওয়ায় এতে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা বিভক্তি হয়েছে ; সুতরাং 'কর্মাণি অশেষতঃ' প্রয়োগ হয়েছে। যদি 'শক্' (শক্যম্) ধাতুর যোগে কর্ম সংজ্ঞা হোত, তাহলে 'কর্মাণি শক্যানি' হোত।

[৩]এখানে 'শক্যসে' দিবাদিগণের 'শক্' ধাতু, ভাবকর্মে 'যগন্ত' ধাতু নয়।

হওয়ায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে সকর্মক ধাতুগুলির যোগেও কর্মে চতুর্থী বিভক্তি দেখা যায়। চতুর্থী বিভক্তির ব্যবহারে এখানে কোন ভুল নেই, বরং তা ব্যাকরণসিদ্ধ এবং ঐ চতুর্থী বিভক্তি দ্বারা এক বিশেষ অর্থও প্রকাশ পায়।

যেখানে তিঙন্ত ক্রিয়ার পূর্বে উপপদরূপে কৃদন্ত 'তুমুন্' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া থাকে, সেখানে ঐ 'তুমুন্' প্রত্যয়ান্ত কর্মে **'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ'** (পাণি. অ. ২।৩।১৪)—এই সূত্র দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি হয়ে যায় এবং সেই উপপদক্রিয়া সেখান থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন—**'ফলেভ্যো যাতি'** এতে প্রথমে ছিল **'ফলানি আহর্তুং যাতি'**, কিন্তু উপপদ **'আহর্তুম্'** ক্রিয়ার কর্মে 'ফলানি' তে চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে এবং ঐ ক্রিয়া সেখান থেকে লুপ্ত হয়েছে। এইভাবে **'নমস্কুর্মঃ নৃসিংহায়'** (নৃসিংহমনুকূলয়িতুং বয়ং নমস্কুর্মঃ) ইত্যাদি প্রয়োগ বুঝতে হবে। গীতাতেও এইরূপ কয়েকটি প্রয়োগ দেখা যায় ; যেমন—**'ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ । বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥'** (৪।১) এখানে 'বিবস্বন্তম্, মনুম্, এবং ইক্ষ্বাকুং বোধয়িতুং প্রোক্তবান্ অব্রবীৎ' (আমি সূর্যকে, সূর্য মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বোঝাবার জন্য এই যোগ বলেছিলাম)—এরূপ বাক্য ছিল, কিন্তু উপপদ ক্রিয়ার কর্মে উপর্যুক্ত সূত্র দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি হয়ে গেল।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥

(গীতা ১৮।৬৭)

(এই শরণাগতিরূপ গোপনীয় রহস্য অতপস্বী, অভক্ত এবং যাদের শ্রবণ করার ইচ্ছা নেই ও আমাতে দোষদৃষ্টি থাকে যাদের, তাদের কখনো বলবে না।)

—এই শ্লোকটির যদি এরূপ অর্থ করা হয় তাহলে অতপস্বী ইত্যাদি ব্যক্তিগণ কখনও ভগবৎসম্বন্ধীয় কথা শুনতে পাবারই যোগ্য নয়, তবে তাদের উদ্ধার পাওয়াও কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং ভগবানের তাদের মনুষ্যদেহ দানের সার্থকতা থাকে কিভাবে ? এই জিজ্ঞাসার সমাধান এই শ্লোকেরই চতুর্থ্যন্ত পদসমূহে হয়ে যায়। এই শ্লোকে **'শ্রাবয়িতুম্'** উপপদ ক্রিয়া ধরা উচিত। 'ইদম্ অতপস্কম্, অভক্তম্, অশুশ্রূষুং এবং অনসূয়কং শ্রাবয়িতুং ন বাচ্যম্' অর্থাৎ এই রহস্য অতপস্বী, অভক্ত আদিকে শোনাবার জন্য কখনো বলা উচিত নয়। কিন্তু কোন বক্তা যখন ভগবানের শরণাগতির গুহ্যকথা বলেন এবং সেস্থানে কোন অতপস্বী বা অভুক্ত ইত্যাদি অনধিকারী ব্যক্তিও তা শোনে, তাহলে বক্তার ভগবানের নিষেধরূপ বাক্য অবহেলা করার দোষ হয় না ; তার উদ্দেশ্য ছিল অধিকারী, ভগবানে শ্রদ্ধা-ভক্তিযুক্ত সাধকদের, অতপস্বী প্রভৃতিদের শোনাবার নয়। এই কথা জানাবার জন্য ভগবান এখানে চতুর্থী বিভক্তি প্রয়োগ করেছেন[১]।

'তুমুন্'-এর অর্থে **'ভাববচনাশ্চ'** (পাণি.অ. ৩।৩।১১) অনুসারে যে **'ঘঞাদি'** প্রত্যয় হয়, সেই প্রত্যয়ান্ত শব্দে **'তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ'** (পাণি.অ. ২।৩।১৫)—এই সূত্র দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি হয় ; যেমন **'যাগায় যাতি'** অর্থাৎ **'যষ্টুং যাতি'** (যজ্ঞ করার জন্য যাচ্ছে) ইত্যাদি। গীতাতেও **'তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব'** অর্থাৎ **'যোক্তুং যুজ্যস্ব'** (যোগ অর্থাৎ সমতার জন্য সচেষ্ট হও) (২।৫০) ইত্যাদি প্রয়োগে উপরিউক্ত চতুর্থী বুঝতে হবে[২]।

(১০)

সংস্কৃতে 'বিংশতি' (কুড়ি) থেকে 'নবনবতি'

[১]রামায়ণের কথা সমাপ্ত করে শ্রীশঙ্কর পার্বতীকে জানালেন যে, এই কথা শঠ, হঠকারী ইত্যাদিদের বলা উচিত নয়—

যহ ন কহিঅ সঠহী হঠসীলহী। জো মন লাই ন সুন হরিলীলহী॥
কহিঅ ন লোভিহি ক্রোধিহি কামিহি। জো ন ভজই সচরাচর স্বামিহি॥
দ্বিজ দ্রোহিহি ন সুনাইঅ কবহুঁ। সুরপতি সরিস হোই নৃপ জবহুঁ॥

(রামচরিতমানস, উত্তর কাণ্ড ১২৮।২-৩)

এই চৌপদীগুলির তাৎপর্যও এই যে এই সব ব্যক্তিদের কেবল শোনাবার জন্য বা নিজের স্বার্থের জন্য কখনো বলা উচিত নয়।

[২]'যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ' (২।৩৭), 'ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব' (২।৩৮) ইত্যাদি তাদর্থ্যে চতুর্থী বুঝতে হবে ; কেননা 'যুদ্ধ' শব্দ 'ঘঞন্তাদি' প্রত্যয়ান্ত নয়।

(নিরানব্বই) পর্যন্ত সমস্ত শব্দের প্রয়োগ স্ত্রীলিঙ্গে এবং শত, সহস্র ইত্যাদি শব্দগুলির প্রয়োগ ক্লীবলিঙ্গে হয়। এই সব শব্দের প্রয়োগ দু'ভাবে করা যায়—বিশেষণরূপে এবং সংখ্যারূপে। যখন এই শব্দগুলির বিশেষ্যের সঙ্গে সামানাধিকরণ্য হয়, তখন বিশেষণরূপে প্রযুক্ত এই শব্দগুলি সংখ্যেয় বলে গণ্য হয়। যেমন—'বিংশতির্গাবঃ (কুড়িটি গাভী),' 'ত্রিংশচ্ছাত্রাঃ' (ত্রিশটি ছাত্র), 'পঞ্চাশৎ ফলানি' (পঞ্চাশটি ফল), 'বিংশতয়ে গোভ্যঃ' (কুড়িটি গাভীর জন্য), 'ত্রিংশতা ছাত্রৈঃ' (ত্রিশটি ছাত্র দ্বারা) ইত্যাদি।এই অবস্থায় বিংশতি প্রভৃতি সমস্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং একবচনান্ত হয়। বিশেষ্য অনুযায়ী এদের শুধু বিভক্তির পরিবর্তন হয়, বচনের নয়। কিন্তু যখন এদের বিশেষ্যের সঙ্গে সামানাধিকরণ্য হয় না অর্থাৎ এই শব্দগুলি বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় না, বরং সংখ্যারূপে ব্যবহৃত হয় তখন এদেরকে সব বচনে প্রয়োগ করা যায় এবং এদের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়ে থাকে। কিন্তু এদের লিঙ্গ তখনও স্ত্রীলিঙ্গই থাকে। যেমন—'ব্রাহ্মণানাং বিংশতিঃ' (কুড়িজন ব্রাহ্মণ), 'ছাত্রাণাং দ্বে বিংশতী' (চল্লিশজন ছাত্র), 'তিস্রো বিংশতয়ো গবাম্' (ষাটটি গাভী), 'দাসীনাং সুকুমারীণাং দ্বে শতে সমলঙ্কৃতে' (অলঙ্কারে সুসজ্জিতা দুই শত সুকুমারী দাসী) (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১।৩২)।

গীতাতেও **'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে'** (৭।৩)—এখানে **'মনুষ্যাণাম্'** পদে সহস্র সংখ্যার যোগে ষষ্ঠী হয়েছে এবং 'সহস্রাণি' পদে নির্ধারণ অর্থে সপ্তমীর বহুবচন (**সহস্রেষু**) হয়েছে। অতএব উপর্যুক্ত পদগুলির অর্থ হল—**'মনুষ্যাণাং সহস্রাণি ভগবতি রুচিং কুর্বন্তি, সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি চ'** অর্থাৎ হাজার হাজার মানুষ ভগবানে রুচি রাখেন এবং সেই হাজার হাজার ব্যক্তির মধ্যে কোন একজন সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করেন।

(১১)

গীতায় অর্জুন নিজের সম্পর্কে কখনও একবচন আবার কখনও বহুবচনের প্রয়োগ করেছেন ; যেমন—**'মে'** (১।২১), **'অহম্'** (১।২২-২৩ ; ৩।২), **'ময়া'** (১১।৪) প্রভৃতি পদগুলিতে একবচন আছে; এবং **'নঃ'** (১।৩২, ৩৩), **'অস্মান্'** (১।৩৬), **'বয়ম্'** (১।৩৭), **'অস্মাভিঃ'** (১।৩৯) প্রভৃতি পদগুলিতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এক সংখ্যা বোঝাবার জন্য একবচন এবং তিন অথবা তিনের অধিক বোঝাবার জন্য বহুবচনের প্রয়োগ হয়। কিন্তু পাণিনি ব্যাকরণ অনুসারে একা নিজের জন্য বা নিজেদের দুজনের জন্যও বহুবচনের প্রয়োগ করা যেতে পারে—**'অস্মদো দ্বয়োশ্চ'** (পাণি.অ. ১।২।৫৯)।

(১২)

'কালেনাত্মনি বিন্দতি' (গীতা ৪।৩৮)—এখানে **'কালেন'** শব্দে **'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে'** (পাণি.অ. ২।৩।৫)—সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত দ্বিতীয়া বিভক্তির নিষেধ করে **'অপবর্গে তৃতীয়া'** (পাণি.অ.২।৩।৬) অনুসারে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। তৃতীয়া বিভক্তি সেখানেই হয় যেখানে ফলপ্রাপ্তি নিশ্চিত অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে কার্য সিদ্ধি হয়, কিন্তু যেখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, সেখানে ফলপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী নয় ; যেমন—**'মাসম্ অধীতে নায়াতঃ'** এখানে দ্বিতীয়া প্রযুক্ত হয়েছে এবং এর অর্থ হল এই যে এক মাস ধরে পড়েছে, কিন্তু সফল হয় নি। এইভাবে ভগবান এখানে দ্বিতীয়ান্ত **'কালম্'** পদ না দিয়ে তৃতীয়ান্ত **'কালেন'** পদ ব্যবহার করেছেন, যাতে এই অর্থ পাওয়া যায় যে কর্মযোগ দ্বারা অবশ্যই ফলপ্রাপ্তি (সিদ্ধি) হয়।

(১৩)

লুম্পেদবশ্যমঃ কৃত্যে তুম্কামমনসোরপি।
সমো হিততততয়োর্বা মাংসস্য পচিযুড্ঘঞোঃ॥

১—কৃত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দের পূর্বে থাকলে 'অবশ্যম্' অব্যয়ের মকারের লোপ হয় ; যেমন—অবশ্যকার্যম্ অবশ্যকর্তব্যম্।

২—'কাম' এবং 'মনস্' শব্দের পূর্বে থাকলে 'তুমুন্' প্রত্যয়ের মকারের লোপ হয়ে যায় ; যেমন—গন্তুকামঃ, গন্তুমনাঃ।

৩—'হিত' এবং 'তত' শব্দের পূর্বে থাকলে 'সম্' অব্যয়ের মকারের বিকল্পে লোপ হয় ; যেমন—সহিত-সংহিত, সতত-সন্তত।

৪—**যুড়ন্ত (ল্যুড়ন্ত)** অথবা ঘঞন্ত 'পচ্' ধাতুর পূর্বে থাকলে 'মাংস' শব্দের অকারের বিকল্পে লোপ হয় ;

যেমন—মাংস্পচনম্—মাংসপচনম্, মাংস্পাকঃ—মাংসপাকঃ।

গীতাতেও এই কারিকার কিছু উদাহরণ পাওয়া যায় ; যেমন—প্রথম অধ্যায়ের বাইশ সংখ্যক শ্লোকে **'যোদ্ধুকামান্'** পদে 'কাম' শব্দের পূর্বে থাকায় 'তুমুন্' প্রত্যয়ান্ত **'যোদ্ধুম্'** অব্যয়ের মকার লুপ্ত হয়েছে। অষ্টম, নবম এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে **'সততম্'** পদে 'তত' শব্দের পূর্বে থাকায় 'সম্' অব্যয়ের ম-কারের লোপ হয়েছে[১]।

যেখানে প্রথম ('স গচ্ছতি'— সে যাচ্ছে), মধ্যম ('ত্বং গচ্ছসি'—তুমি যাচ্ছ) এবং উত্তম ('অহং গচ্ছামি'—আমি যাচ্ছি)—এই তিন পুরুষের একসঙ্গে প্রয়োগ হয়, সেখানে উত্তম পুরুষেরই প্রাপ্তি হয়। যদিও এখানে **'যুষ্মদ্যুপপদে সমানাধিকরণে স্থানিন্যপি মধ্যমঃ'** (পাণি. ১।৪।১০৫) এবং **'অস্মদ্যুত্তমঃ'** (পাণি. ১।৪।১০৭)—এই সূত্রগুলি হইতে **'শেষে প্রথমঃ'** (পাণি. ১।৪।১০৮)—এই সূত্র পর হওয়ায় প্রথম পুরুষ হওয়া উচিত ; তবুও এরূপ হয় না ; কারণ 'শেষে প্রথমঃ' এই সূত্রের প্রবৃত্তি সেখানেই হয়, যেখানে উত্তম এবং মধ্যম পুরুষের সূত্রের অস্মদ্-যুস্মদ্ শব্দ সঙ্গে না থাকে, এই দুটি সূত্রের প্রাপ্তি না ঘটে। অতএব তিন পুরুষের মধ্যে (স গচ্ছতি, ত্বং চ গচ্ছসি, অহং চ গচ্ছামি) উত্তম পুরুষই ('বয়ং গচ্ছামঃ' আমরা সবাই যাচ্ছি) শক্তিশালী হয় ; কারণ **'অস্মদ্যুত্তমঃ'** সূত্র পর[২] হওয়ায় উত্তম পুরুষই হবে।

যেখানে প্রথম এবং মধ্যম পুরুষের একসঙ্গে প্রয়োগ হয়, সেখানে মধ্যম পুরুষেরই প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ মধ্যম পুরুষই বলবান হয়। এইভাবেই যেখানে প্রথম এবং উত্তম পুরুষের একসঙ্গে প্রয়োগ হয়, সেখানে উত্তম পুরুষেরই প্রাপ্তি ঘটে। যেমন—'স গচ্ছতি', 'ত্বং চ গচ্ছসি'—এরূপ প্রয়োগ হলে **'যুবাং গচ্ছথঃ'** হয় এবং 'স গচ্ছতি', 'অহং চ গচ্ছামি' এইরূপ প্রয়োগে **'আবাং গচ্ছাবঃ'** হয়। প্রথম পুরুষের সঙ্গে মধ্যম এবং উত্তম পুরুষ থাকলে প্রথম পুরুষ বলবান্ হয় না। প্রথম পুরুষ সেখানেই বলবান হয় যেখানে মধ্যম ও উত্তম পুরুষ মোটেই থাকে না, কারণ শেষে প্রথম হয়—'শেষে প্রথমঃ'।

যেখানে মধ্যম এবং উত্তম পুরুষের একসঙ্গে প্রয়োগ হয়, সেখানে 'আবাং গচ্ছাবঃ'-ই বলবান্ ; কারণ 'যুষ্মদ্যুপপদে......'—এই সূত্র হইতে **'অস্মদ্যুত্তমঃ'**—এই সূত্র পর হওয়ায় উত্তম পুরুষই বলবান।

গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে প্রথম পুরুষ **(ইমে জনাধিপাঃ)**, মধ্যম পুরুষ **(ত্বম্)** এবং উত্তম পুরুষ **(অহম্)**—এই তিনটির একসঙ্গে প্রয়োগ হয়েছে অর্থাৎ 'এই রাজন্যবর্গ, তুমি এবং আমি যে পূর্বে ছিলাম না, তা নয়'। অতএব শ্লোকের উত্তরার্ধে বলবত্তার দরুন উত্তম পুরুষের প্রয়োগ হয়েছে—**'ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়ম্'** অর্থাৎ 'আমরা যে পরে থাকবো না, তাও নয়'।

তৃতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে প্রথম পুরুষ **'তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ'** (সেই দেবতাগণ তোমাদের উন্নত করুন) এবং মধ্যম পুরুষ **'(যূয়ম্) অনেন দেবান্ ভাবয়ত'** (তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের উন্নত করো)—এই দুটির একসঙ্গে প্রয়োগ হয়েছে। অতএব শ্লোকের উত্তরার্ধে বলবত্তার দরুণ মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ হয়েছে—**'শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ'** (তোমরা পরম কল্যাণ লাভ করবে)।

(১৫)

সংস্কৃত-ভাষা এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সমাসের বিশেষ স্থান আছে। সুতরাং সমাসের জ্ঞান থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। যাতে দুই বা তার অধিক পদ (শব্দ) মিলিত হয়ে একটি পদে পরিণত হয়, তাকে সমাস বলে। সমাস প্রধানতঃ পাঁচপ্রকার—

১. কেবল সমাস

যার কোন বিশেষ সংজ্ঞা হয় না, তাকে 'কেবল

[১]'বিজ্ঞানসহিতম্' (৯।১)এ 'সম্'এর ম-কারের লোপ করে 'বিজ্ঞানসহিত' হয় এবং 'সহ' অব্যয়ের স্থানে 'স' ভাব করে 'সবিজ্ঞান' হয়। তাৎপর্য এই যে দুটিরই অর্থ এক।

[২]অপর থেকে পর, পর থেকে নিত্য, নিত্য থেকে অন্তরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ থেকে অপবাদ—একটি অন্যটির চেয়ে উত্তরোত্তর শক্তিশালী—'পরনিত্যান্তরঙ্গাপবাদানামুত্তরোত্তরং বলীয়ঃ'।

সমাস' বলা হয়। যেমন, 'পূর্বং ভূতঃ' (যা পূর্বে হয়ে গেছে)—এতে 'পূর্বম্' ক্রিয়া-বিশেষণ হওয়ায় দ্বিতীয়ান্ত পদ। এই লৌকিক বিগ্রহে 'সহ সুপা' (পাণি.অ.২।১।৪)—এই সূত্র দ্বারা সমাস হয়ে 'কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ' (পাণি.অ.১।২।৪৬) সূত্র দ্বারা প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হয়ে 'সুপো ধাতুপ্রাতিপদিকয়োঃ' (পাণি.অ.২।৪।৭১) সূত্র দ্বারা 'পূর্বম্'-এর 'অম্' এবং 'ভূতঃ'র 'সু' বিভক্তির লোপ হয় এবং 'ভূতপূর্বে চরট্' (পাণি.অ.৫।৩।৫৩)—এই নির্দেশ অনুসারে 'ভূত' শব্দের পূর্বপ্রয়োগ হয়। এইরূপে 'ভূতপূর্বঃ' এইরূপে 'কেবল' সমাসযুক্ত পদ সৃষ্ট হয়। গীতাতেও **'অদৃষ্টপূর্বম্'** (১১।৪৫), **'দৃষ্টপূর্বম্'** (১১।৪৭), **'নিত্যযুক্তাঃ'** (১২।২) প্রভৃতি 'কেবল' সমাসযুক্ত পদ দেখা যায়।

২. অব্যয়ীভাব সমাস

যাতে প্রায়শঃ পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্য দেখা যায় তাকে 'অব্যয়ীভাব সমাস' বলে। যেমন বিভক্তির অর্থে **'হরৌ ইতি'** বিগ্রহে **'অব্যয়ং বিভক্তিং ....'** (পাণি. অ. ২।১।৬) এই সূত্র দ্বারা সমাস হয়ে **'অধি'**র পূর্ব প্রয়োগ হয়ে **'অধিহরি'** রূপ সিদ্ধ হয়। এতে যে অর্থ শুধু **'হরৌ'** (হরিতে) ছিল, সেই অর্থই 'অধিহরি'রও হল। গীতাতেও এর ব্যবহার দেখা যায় ; যেমন—**'আত্মনি'** বিগ্রহে সমাস হয়ে **'অধ্যাত্মন্'** পদ হয়েছে। আবার **'অনশ্চ'** সূত্র দ্বারা অন্নন্ত অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর **'টচ্'**, **'যচি ভম্'** সূত্র দ্বারা **'ভসংজ্ঞা'** এবং **'নস্তদ্ধিতে'** সূত্র দ্বারা টি ভাগের লোপ হয়ে রূপ হল—**'অধ্যাত্মম্'** (৭।২৯ ; ৮।১, ৩)। এইভাবে ভাগম্ অনতিক্রম্য **'যথাভাগম্'** (১।১১) হয়েছে বুঝতে হবে।

৩. তৎপুরুষ সমাস

যাতে প্রায়শঃ উত্তরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে 'তৎপুরুষ সমাস' বলে। সর্বপ্রথম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বিধান করা হয়—

(ক) 'কৃষ্ণং শ্রিতঃ, সুখং প্রাপ্তঃ, দুঃখমাপন্নঃ' প্রভৃতিতে **'দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ'** (পাণি. অ. ২।১।২৪)—এই সূত্র দ্বারা সমাস হয়ে 'কৃষ্ণশ্রিতঃ, সুখপ্রাপ্তঃ, দুঃখাপন্নঃ' ইত্যাদি রূপ গঠিত হয়। গীতাতেও এই দ্বিতীয়া সমাসের কিছু উদাহরণ দেখা যায় ; যেমন—**'শ্রুতিবিপ্রতিপন্না'** (২।৫৩), **'গুণাতীতঃ'** (১৪।২৫), **'সর্বগতঃ'** (২।২৪), **'পরম্পরাপ্রাপ্তম্'** (৪।২), **'অস্তগতম্'** (৭।২৮) ইত্যাদি।

(খ) 'হরিণা ত্রাতঃ, লক্ষ্মা সেবিতঃ' এই বিগ্রহে **'কর্তৃকরণে কৃতা বহুলম্'** (পাণি. অ. ২।১।৩২)—এই সূত্র দ্বারা সমাস হয়ে 'হরিত্রাতঃ, লক্ষ্মীসেবিতঃ' ইত্যাদি শব্দ গঠিত হয়। গীতাতেও এই তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় ; যেমন—**'অহংকারবিমূঢ়াত্মা'** (৩।২৭), **'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্'** (৪।১৯), **'যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ'** (৪।৩০), **'জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্'** (৪।৪১), **'যোগসংসিদ্ধঃ'** (৪।৩৮) ইত্যাদি।

(গ) **'দ্বিজায় ইদম্, ভূতেভ্যঃ বলিঃ, গবে হিতম্'** প্রভৃতিতে **'চতুর্থী তদর্থার্থবলিহিতসুখরক্ষিতৈঃ'** (পাণি. অ. ২।১।৩৬)—এই সূত্র দ্বারা সমাস হয়ে 'দ্বিজার্থম্, ভূতবলিঃ, গোহিতম্' ইত্যাদি গঠিত হয়। গীতাতেও **'তদর্থং কর্ম'** (তস্মৈ ইদং কর্ম) (৩।৯), **'মদর্থমপি কর্মাণি'** (মহ্যমপি ইমানি কর্মাণি) (১২।১০), **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (সর্বভূতেভ্যঃ হিতম্, হিতে রতাঃ) (৫।২৫ ; ১২।৪) ইত্যাদি প্রয়োগে চতুর্থী সমাস বুঝতে হবে।

(ঘ) 'চোরাদ্ ভয়ম্' ইত্যাদি বাক্যে **'পঞ্চমী ভয়েন'** (পাণি. অ. ২।১।৩৭)—এই সূত্র দ্বারা পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়ে 'চোরভয়ম্' ইত্যাদি রূপ গঠিত হয়। গীতাতেও পঞ্চমী সমাসের উদাহরণ পাওয়া যায় ; যেমন—'অমৃতাৎ সমুদ্ভবঃ', 'তৃষ্ণায়াঃ সঙ্গাচ্চ সমুদ্ভবঃ'—এই বিগ্রহে পঞ্চমী যোগ-বিভাগ দ্বারা সমাস এবং 'আদ্‌গুণঃ' দ্বারা গুণ হয়ে রূপ হয়—**'অমৃতোদ্ভবম্'** (১০।২৭) 'অমৃত হতে উৎপন্ন' এবং **'তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্'** (১৪।৭) 'তৃষ্ণা এবং সঙ্গ হতে উৎপন্ন'।

(ঙ) 'রাজ্ঞঃ পুরুষ, কৃষ্ণস্য মুরলী' ইত্যাদি বিগ্রহে **'ষষ্ঠী'** (পাণি. অ. ২।২।৮)—এই সূত্র দ্বারা ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়ে 'রাজপুরুষঃ, কৃষ্ণমুরলী' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। গীতাতেও **'শরীরযাত্রা'** (শরীরস্য যাত্রা) (৩।৮), **'আত্মমায়য়া'** (আত্মনঃ মায়য়া) (৪।৬) ইত্যাদি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ বুঝতে হবে।

চ) 'অক্ষেষু শৌণ্ডঃ' (অক্ষশৌণ্ডঃ) ইত্যাদি বাক্যে **'সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ'** (পাণি. অ. ২।১।৪০)—এই সূত্র দ্বারা সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হয়। গীতাতেও **'ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্'** (ভোগৈশ্বর্যেষু প্রসক্তানাম্) (২।৪৪), **'আত্মরতিঃ'** (আত্মনি রতিঃ) (৩।১৭), **'যুদ্ধবিশারদাঃ'** (যুদ্ধে বিশারদাঃ) (১।৯) ইত্যাদিতে 'সপ্তমী যোগবিভাগাৎ' সপ্তমী তৎপুরুষ বুঝতে হবে।

এতক্ষণ ব্যধিকরণ তৎপুরুষের উদাহরণ বলা হল, এখন সমানাধিকরণ তৎপুরুষের উদাহরণ বলা হচ্ছে—

তৎপুরুষের প্রকারবিশেষকেই **'কর্মধারয় সমাস'** বলে। তৎপুরুষ সমাসে যখন পূর্বপদ এবং উত্তরপদ সমান বিভক্ত্যন্ত হয়ে একই বাচ্যকে বলে, তখন তাকে কর্মধারয় সমাস বলা হয় অর্থাৎ এই সমাস বিশেষণ এবং বিশেষ্যের সমানাধিকরণে হয়। যেমন—**'নীলোৎপলম্'** (নীলং চ তৎ উৎপলম্) **'সর্বকলাঃ'** (সর্বাশ্চ তাঃ কলাঃ) ইত্যাদি বাক্যে **'বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্'** (পাণি. অ. ২।১।৫৭)—এই সূত্র দ্বারা কর্মধারয় সমাস হয়। গীতায়ও **'সর্বকর্মাণি'** (সর্বাণি চ তানি কর্মাণি) (৩।২৬; ৫।১৩), **'পরমাত্মা'** (পরমশ্চাসৌ আত্মা) (৬।৭), **'পরধর্মাৎ'** (পরশ্চাসৌ ধর্মঃ তস্মাৎ) (৩।৩৫; ১৮।৪৭) ইত্যাদি কর্মধারয় সমাসের প্রয়োগ বলে বুঝতে হবে।

কর্মধারয় সমাসের এক প্রভেদ হল **'দ্বিগু সমাস'**। যেখানে বিশেষণ—বিশেষ্যের সমানাধিকরণে সংখ্যা পূর্বে থাকে, তাকে দ্বিগু সমাস বলা হয়। যেমন, 'ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহারঃ', 'চতুর্ণাং যুগানাং সমাহারঃ'—এই বাক্যে **'তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ'** (পাণি. অ. ২।১।৫১)—এই সূত্র দ্বারা দ্বিঘর্থ সমাহার সমাস হয়ে **'দ্বিগুরেকবচনম্'** (পাণি. অ. ২।৪।১)—এই সূত্র দ্বারা **'একত্ব'** হয়ে **'স নপুংসকম্'** (পাণি. অ. ২।৪।১৭)—এই সূত্র দ্বারা ক্লীবলিঙ্গ হয়ে এইপ্রকারে হয়েছে—'ত্রিভুবনম্' এবং 'চতুর্যুগম্'। গীতাতেও এই ধরণের দ্বিঘর্থ সমাহার সমাসের উদাহরণ পাওয়া যায়; যেমন—'ত্রয়াণাং গুণানাং **সমাহারঃ**'; 'চতুর্ণাং বর্ণানাং **সমাহারঃ**' এই বিগ্রহবাক্যে উপর্যুক্ত প্রকারে সমাস হয়ে রূপ হয়—'ত্রিগুণম্', 'চতুর্বর্ণম্' এবং এর উত্তর স্বার্থে তদ্ধিতের ষ্যঞ্ প্রত্যয় হয়ে 'ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ' (২।৪৫), **'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্'** (৪।১৩) রূপ হয়।

'পূর্বং স্নাতঃ পশ্চাদনুলিপ্তঃ', 'পূর্বং ভুক্তঃ পশ্চাৎ পীতঃ', 'পূর্বং যাতং পশ্চাদ্ আয়াতম্' ইত্যাদি বাক্যে **'পূর্বকালৈকসর্বজরৎপুরাণনবকেবলাঃ সমানাধিকরণেন'** (পাণি.অ. ২।১।৪৯)—এই সূত্র দ্বারা পূর্বকাল অর্থে সমাস হয়ে **'স্নাতানুলিপ্তঃ'**, **'ভুক্তপীতঃ'**, **'যাতায়াতম্'** ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। গীতাতেও 'পূর্বং গতং পশ্চাদ্ আগতম্' এই বাক্যে পূর্বোক্ত সূত্র দ্বারা সমাস হয়ে **'গতাগতম্'** (৯।২১) রূপ সিদ্ধ হয়েছে।

নিষেধাদি অর্থে **'নঞ্'** সমাস হয়। যেমন—'ন ব্রাহ্মণঃ, ন সাধুঃ' ইত্যাদি বাক্যে **'নঞ্'** (পাণি.অ. ২।২।৬)—এই সূত্র দ্বারা **'নঞ্'** অব্যয়ের সুবন্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে সমাস হয় এবং **'ন লোপো নঞঃ'** (পাণি. অ. ৬।৩।৭৩)—এই সূত্র দ্বারা উত্তরপদের পূর্বে থাকায় **'নঞ্'**-এর ন-কারের লোপ হয়ে 'অব্রাহ্মণঃ অসাধুঃ' প্রভৃতি রূপ হয়। কিন্তু **'নঞ্'** সমাসে যদি উত্তরপদ অজাদি হয়, তাহলে অজাদির **'নুট্'** আগম হয় এবং **'নঞ্'** এর ন-কার লোপ হয় যেমন—'অনেকঃ' (ন একঃ) 'অনুৎসাহঃ' (ন উৎসাহঃ) ইত্যাদি। গীতাতেও **'অবিনাশি'** (ন বিনাশি) (২।১৭), **'অকীর্তিম্'** (ন কীর্তিম্) (২।৩৪) এবং **'অনহংকারঃ'** (ন অহংকারঃ) (১৩।৮), **'অনভিষ্বঙ্গঃ'** (ন অভিষ্বঙ্গঃ) (১৩।৯), **'অনভিস্নেহঃ'** (ন অভিস্নেহঃ) (২।৫৭) ইত্যাদি প্রয়োগ এইরূপ বুঝতে হবে।

যেমন 'নঞ্' অব্যয়ের সঙ্গে সমাস হয়, তেমনি 'ন' অব্যয়ের সঙ্গেও সমাস হয়; কিন্তু ঐ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে। 'নঞ্'-এর সঙ্গে 'নঞ্' সূত্র দ্বারা তৎপুরুষ সমাস হলে 'ন লোপো নঞঃ'—এই সূত্র দ্বারা 'ন'-এর নকারের লোপ হয় এবং 'ন' অব্যয়ের সঙ্গে 'সহ সুপা'—এই সূত্র দ্বারা কেবল সমাস হওয়ায় 'ন'-এর নকারের লোপ না হয়ে সন্ধি হয়; যেমন—'ন একধা', 'ন একঃ' ইত্যাদি বাক্যে সমাস হয়ে সন্ধি হয়ে রূপ দাঁড়ায়—'নৈকধা', 'নৈকঃ' ইত্যাদি। গীতাতেও 'ন চিরেণ', 'ন চিরাৎ', 'ন অন্যগামিনা', 'ন অতিমানিতা' ইত্যাদি বাক্যে 'সহ সুপা' সূত্র দ্বারা সমাস এবং সন্ধি হয়ে 'নচিরেণ' (৫।৬), 'নচিরাৎ', (১২।৭), 'নান্যগামিনা' (৮।৮), 'নাতিমানিতা' (১৬।৩) ইত্যাদি 'ন' অব্যয়ের

সঙ্গে সমাস দেখা যায়।

'অহশ্চ রাত্রিশ্চ অনয়োঃ সমাহারঃ' এই বাক্যে 'চার্থে দ্বন্দ্বঃ' (পাণি. অ. ২।২।২৯)—এই সূত্র দ্বারা সমাহার অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস হলে **'অহঃ সর্বৈকদেশসংখ্যাতপুণ্যাচ্চ রাত্রেঃ'** (পাণি. অ. ৫।৪।৮৭)—এই সূত্র দ্বারা সমাসান্ত 'অচ্' প্রত্যয় হয়ে ভসংজ্ঞা এবং ইকারের লোপ এবং 'অহন্'এর নকারের 'রূপরাত্রিরথন্তরেষু রুত্বং বাচ্যম্' এই বার্তিক দ্বারা রুত্ব 'হশি চ' দ্বারা উত্ব 'আদ্গুণঃ' দ্বারা গুণ হয়ে **'রাত্রাহ্নাহাঃ পুংসি'** (পাণি. অ. ২।৪।২৯)—এই সূত্র দ্বারা পুংলিঙ্গ হয়ে 'অহোরাত্রঃ' প্রয়োগ হয়েছে। গীতাতেও 'তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ' (৮।১৭) পদে 'অহোরাত্রঃ'-এর প্রয়োগ হয়েছে। এইভাবে 'পরমশ্চাসৌ রাজা', 'কৃষ্ণস্য সখা' ইত্যাদি বাক্যে 'রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্' সূত্র দ্বারা সমাসান্ত 'টচ্' হয়ে 'পরমরাজঃ' 'কৃষ্ণসখঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ হয়[১]।

৪. বহুব্রীহি সমাস

যাতে সমস্যমান পদ হতে ভিন্ন অন্য পদার্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে এবং ঐ সমাসে সমস্তপদের লিঙ্গ এবং বচনও ঐ অন্য পদ অনুযায়ীই হয়। যেমন, 'পীতম্ অম্বরং যস্য সঃ, বিকসিতানি কমলানি যস্যাং সা, বহূনি কুঞ্জানি যস্মিন্ তৎ' ইত্যাদি বাক্যে **'অনেকমন্যপদার্থে'**, (পাণি. অ. ২।২।২৪)—এই সূত্র দ্বারা প্রথমান্ত অনেক পদের অন্য-পদের অর্থে সমাস হওয়ায় 'পীতাম্বরো হরিঃ, বিকসিতকমলা যমুনা, বহুকুঞ্জং বৃন্দাবনম্' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। গীতাতেও 'মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ', 'মুক্তঃ সঙ্গঃ যেন সঃ', 'কৃতঃ নিশ্চয়ঃ যেন সঃ', 'ক্ষীণানি কল্মষাণি যেষাং তে' ইত্যাদি বাক্যে সমাস হয়ে **'মহাবাহো'** (১৮।১), **'মুক্তসঙ্গঃ'** (১৮।২৬), **'কৃতনিশ্চয়ঃ'** (২।৩৭), **'ক্ষীণকল্মষাঃ'** (৫।২৫) ইত্যাদি রূপ দেখা যায়।

(ক) প্রাদি বহুব্রীহি—প্র, পরা, অপ্, সম্ প্রভৃতি প্রাদি (উপসর্গে)-র সঙ্গে যে ধাতুজ রূপ থাকে, বহুব্রীহি সমাস হলে তার বিকল্পে লোপ হয়ে যায়। যেমন, 'প্রপতিতানি পর্ণানি যস্য সঃ' এই বাক্যে **'প্রাদিভ্যো ধাতুজস্য বাচ্যো বা চোত্তরপদলোপঃ'**—এই বার্তিক দ্বারা সমাস এবং উত্তরপদের বিকল্পে লোপ হয়ে 'প্রপর্ণঃ'—'প্রপতিতপর্ণঃ বৃক্ষঃ' রূপ হয়। গীতাতে এর কয়েকটি উদাহরণ দেখা যায় ; যেমন—দুষ্টা বুদ্ধির্যস্য তস্য **'দুর্বুদ্ধেঃ'** (১।২৩), **'দুর্মতি'** (১৮।১৬), বিগতঃ মৎসরঃ যস্মাৎ সঃ **'বিমৎসরঃ'** (৪।২২), বিগতা স্পৃহা যস্মাৎ **'বিগতস্পৃহঃ'** (১৮।৪৯), নির্গতং মম যস্মাৎ সঃ **'নির্মমঃ'** (২।৭১), বিগত জ্বরঃ যস্মাৎ সঃ **'বিগতজ্বরঃ'** (৩।৩০) ইত্যাদি।

(খ) নঞ্ বহুব্রীহি—**'নঞোঽস্ত্যর্থানাং বাচ্যো বা চোত্তরপদলোপঃ'**—এই বার্তিক দ্বারা উত্তরপদ পরে থাকলে নঞ্ এর সঙ্গে সমাস হয় এবং অস্ত্যর্থক (বিদ্যমানার্থক) পদের বিকল্পে লোপ হয় ; যেমন—'অবিদ্যমানঃ পুত্রঃ যস্য সঃ অপুত্রঃ'—'অবিদ্যমানপুত্রঃ', 'অবিদ্যমানঃ ক্রোধঃ যস্য সঃ অক্রোধঃ'—'অবিদ্যমানক্রোধঃ', 'নাস্তি দাসো যস্য সঃ অদাসঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ বুঝতে হবে। গীতাতেও—'অবিদ্যমানঃ পরিগ্রহঃ যস্য সঃ **অপরিগ্রহঃ**' (৬।১০), 'নাস্তি উত্তমং যস্মাৎ তম্ **অনুত্তমম্**' (৭।২৪) 'অবিদ্যমানং কুশলং যস্মাৎ তৎ **অকুশলম্**' (১৮।১০), 'নাস্তি প্রতীকারঃ যস্মাৎ তম্ **অপ্রতীকারম্**' (১।৪৬) ইত্যাদি প্রয়োগে 'নঞ্'-এর সঙ্গে সমাস এবং অস্ত্যর্থক

---

[১]'দ্বয়োঃ অহ্নোঃ সমাহারঃ', 'নবানাম্ অহ্নাং সমাহারঃ' (দুই দিনের সমষ্টি, নয় দিনের সমষ্টি)—এই অর্থে **'তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ'** (পাণি. অ. ২।১।৫১)—এই সূত্র দ্বারা দ্বিগুসমাস হয়। **'রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্'** (৫।৪।৯১)—এই সূত্র দ্বারা সমাসান্ত 'টচ্', 'অহ্নোঽহ্ন এতেভ্যঃ' (৫।৪।৮৮)—এই সূত্র দ্বারা 'অহন্'-এর স্থানে 'অহ্নঃ' আদেশ প্রাপ্ত কিন্তু 'ন সংখ্যাদেঃ সমাহারে' সমাহার সমাস হওয়ার জন্য 'অহ্ন' আদেশের নিষেধ হয়েছে। **'অহ্নষ্টখোরেব'** (৬।৪।১৪৫)—এই সূত্রের নিয়মানুসারে 'অহন্'-এর 'ওটি' (অন্)-এর লোপ হয়ে 'দ্ব্যহঃ, নবাহঃ'—রূপ গঠিত হয় যেখানে দুই দিনের, তিন দিনের, সাত দিনের, আট দিনের সমূহ অর্থ হবে, সেখানে 'দ্ব্যহঃ' প্রভৃতি রূপই হবে। কিন্তু যেখানে 'দুই দিনে হবে, তিন দিনে হবে, এরূপ অর্থে সমাস হবে', সেখানে 'দ্ব্যহ্নঃ, নবাহ্নঃ' ইত্যাদি রূপ হবে। যেমন 'দ্বয়োঃ অহ্নোঃ ভবঃ', 'নবসু অহঃসু ভবঃ' এই বাক্যে 'তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ' এই সূত্র দ্বারা সমাস হলে **'কালাট্ঠঞ্'** (৪।৩।১১)—এই সূত্র দ্বারা কালবাচী 'অহন্' শব্দের 'ঠঞ্' এবং **'দ্বিগোর্লুগনপত্যে'** (৪।১।৮৮)—এই সূত্র দ্বারা 'ঠঞ্'-এর লোপ হয়ে **'রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্'**—এই সূত্র দ্বারা 'টচ্' **'অহ্নোঽহ্ন এতেভ্যঃ'**—এই সূত্র দ্বারা 'অহন্'-এর স্থানে 'অহ্ন' আদেশ হয়ে 'দ্ব্যহ্নঃ' 'নবাহ্নঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ হয়।

'বিদ্যমান', 'অস্তি'র লোপ হয়েছে।

(গ) **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি**—বহুব্রীহি সমাসে যদিও প্রথমান্ত পদগুলিরই সমাস বিধান করা হয়েছে এবং এতে সমস্যমান কোন পদ সপ্তম্যন্ত হতে পারে না, তবুও পাণিনি **'সপ্তমীবিশেষণে বহুব্রীহৌ'** (পাণি.অ. ২।২।৩৫) এই সূত্রে সপ্তমী পদের পূর্বনিপাত বিধান কি করে বলেছেন ? সপ্তমী পদের পূর্ব নিপাত বিধান করায় জ্ঞাপিত হয় যে ব্যধিকরণ পদগুলির **'অনেকমন্যপদার্থে'** (পাণি.অ.২।২।২৪) —এই সূত্র দ্বারা বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন, 'পাণৌ চক্রং যস্য সঃ' এই বাক্যে উপর্যুক্ত সূত্র দ্বারা সমাস এবং **'প্রহরণার্থেভ্যঃ পরে নিষ্ঠাসপ্তম্যৌ'** এই বার্তিক দ্বারা 'পাণি' শব্দের পরনিপাত হয়ে 'চক্রপাণিঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। গীতাতেও পাণিষু শস্ত্রাণি যেষাংতে **'শস্ত্রপাণয়ঃ'** (১।৪৬), হস্তে চক্রং যস্য তম্ 'চক্র-হস্তম্' (১১।৪৬) ইত্যাদি প্রয়োগ উপরিউক্ত সূত্র এবং বার্তিকের দ্বারা সিদ্ধ হয়।

(ঘ) **'সহ' অব্যয় বহুব্রীহি সমাস**—'সহ' অব্যয়ের সঙ্গে বহুব্রীহি সমাস হয় এবং 'সহ' অব্যয়ের স্থানে বিকল্পে 'স' হয়। যেমন, 'পুত্রেণ সহ আগতঃ', 'বৎসেন সহ আগতা' ইত্যাদি বাক্যে **'তেন সহেতি তুল্যযোগে'** (পাণি. অ. ২।২।২৮)—এই সূত্র দ্বারা সমাস **বোপসর্জনস্য** (পাণি. ৬।৩।৮২) এই সূত্র দ্বারা 'সহ'-এর স্থানে বিকল্পে 'স' হয়ে 'সপুত্রঃ'/'সহপুত্রঃ আগতঃ' 'সবৎসা'/'সহ-বৎসা আগতা' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ হয়। গীতাতেও 'শরেণ সহ চাপম্', 'যজ্ঞেন সহ প্রজাঃ', 'চরাচরেণ সহ জগৎ' ইত্যাদি উপর্যুক্ত সূত্র দ্বারা সমাস এবং 'স'—'সহ' ভাব হয়ে **'সশরং চাপম্'** (১।৪৭), **'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ'** (৩।১০), **'সচরাচরং জগৎ'** (৯।১০) ইত্যাদি রূপ হয়েছে।

৫. দ্বন্দ্ব সমাস

যেখানে 'চ' এর অর্থে দুই বা দুয়ের অধিক সুবন্ত পদ বিকল্পে সমাস প্রাপ্ত হয় এবং যাতে সমস্যমান সকল পদেরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে বলা হয় 'দ্বন্দ্ব সমাস' যেমন, 'মাতা চ পিতা চ', 'হর্ষশ্চ শোকশ্চ' ইত্যাদি বাক্যে **'চার্থে দ্বন্দ্বঃ'** (পাণি. অ. ২।২।২৯)—এই সূত্র দ্বারা সমাস হয়ে 'মাতা-পিতরৌ', **'হর্ষশোকৌ'** প্রয়োগ হয়। গীতাতেও 'রাগশ্চ দ্বেষশ্চ', 'প্রমাদশ্চ মোহশ্চ', 'কার্যং চ অকার্যং চ', 'ভয়ং চ অভয়ং চ' ইত্যাদি স্থলে উপরিউক্ত সূত্র দ্বারা সমাস হওয়ায় **'রাগদ্বেষৌ'** (৩।৩৪), **'প্রমাদমোহৌ'** (১৪।১৭), **'কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে'** (১৮।৩০) ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সমাসের প্রয়োগ বলে বুঝতে হবে।

(১৬)

'নঞ্'-এর ছটি অর্থ হয়—

তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ॥

(১) **তৎসাদৃশ্য**—'নঞ্'-এর সঙ্গে সমাস হয়ে যে সব পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদির বোধ হয় তা ভিন্ন হলেও তৎসদৃশ হয়ে থাকে। যেমন **'অব্রাহ্মণেন সহ গচ্ছ'** এখানে ব্রাহ্মণ হতে ভিন্ন, কিন্তু ব্রাহ্মণ মনুষ্য বলে তার সমান ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদির সঙ্গে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে, পশু ইত্যাদির সঙ্গে নয়। গীতাতে এর প্রয়োগ এইরূপ আছে—**'ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু'**—'আমি সেই সব অপবিত্র মানুষদের বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।' এইসব ব্যক্তিগণ ক্রূর স্বভাবের জন্য অপবিত্র হওয়ায় পবিত্র মানুষ থেকে ভিন্ন হলেও এরাও মনুষ্যজাতিভুক্তই। **'অপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে'** (১৭।২২) **'অপাত্রে দান করা হয়'** এই অপাত্র দানযোগ্য পাত্র থেকে ভিন্ন বটে, কিন্তু মনুষ্যজাতিভুক্ত হওয়ায় পাত্রসদৃশ বলে পরিগণিত। অতএব এখানে 'অপাত্র' এই 'নঞ্' সমাস তৎসাদৃশ্য অর্থে হয়েছে। এইরূপ গীতায় তৎসাদৃশ্যের আরও উদাহরণ আছে।

(২) **অভাব**—'নঞ্'-এর সঙ্গে যে পদের সমাস হয় সেই পদের অর্থের অভাব বোঝায়। যেমন, **'অপাপম্'** পদে পাপের অভাব বোঝায়। গীতায় এর অনেক ব্যবহার আছে। যেমন—**'অভয়ম্'** (১৬।১)—এখানে **'অভয়'** পদে ভয়ের অভাব বোঝায়। **'অহিংসা, অক্রোধ, অপৈশুনম্, অলোলুপত্বম্, অচাপলম্'** (১৬।২)—এখানে 'অহিংসা' পদে হিংসার, 'অক্রোধ' পদে ক্রোধের, 'অপৈশুনম্' পদে কুৎসা আদি দোষের, 'অলোলুপত্ব' পদে লোভের এবং 'অচাপল' পদে চপলতার অভাব সূচিত হয়েছে। **'অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ'** (২।২৪)—এখানে 'অচ্ছেদ্য' পদে ছেদন ক্রিয়ার, 'অদাহ্য' পদে দহন

ক্রিয়ার, 'অক্লেদ্য' পদে আর্দ্রীকরণ এবং 'অশোষ্য' পদে শোষণক্রিয়ার' অভাব জ্ঞাপিত হয়েছে। 'অনঘ' (১৫।২০), 'অনসূয়বে' (৯।১), 'অনাময়ম্' (২।৫১)—এখানে 'অনঘ' পদে পাপের, 'অনসূয়ু' পদে দোষ-দৃষ্টির এবং 'অনাময়' পদে বিকারের অভাব সূচিত হয়েছে।

(৩) তদন্যত্ব—'নঞ্'-এর সঙ্গে যার সমাস হয় সেই শব্দের অর্থ থেকে ভিন্ন এক অর্থের গ্রহণ হয়। যেমন, 'অনশ্বমানয়' 'অশ্ব ভিন্ন অন্য প্রাণীকে আনয়ন কর'—এখানে অশ্ব ভিন্ন বলদ, উট ইত্যাদি প্রাণী আনয়ন করার কথা বলা হয়েছে। গীতাতেও এই তদন্যত্বের উদাহরণ আছে। যেমন—'**কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ**' (৪।১৮) 'যে কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখে অর্থাৎ যে কর্ম করেও নির্লিপ্ত থাকে এবং নির্লিপ্ত থাকলেও কর্ম করে'—এখানে 'অকর্ম' শব্দ কর্মের অভাব অথবা বিরোধের বাচক নয়, বরং কর্ম হইতে ভিন্ন আসক্তি, মমতা, কামনা, লিপ্ততা প্রভৃতি থেকে রাহিত্যের অর্থাৎ ভিন্নতার বাচক। '**ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে**' (১৮।১০) 'যে অকুশল কর্মে দ্বেষ করে না এবং কুশল কর্মে আসক্ত হয় না' (যে সকল কর্ম দ্বারা জন্ম-মৃত্যু-চক্রে আবর্তিত হতে হয়, নরক এবং চুরাশী লক্ষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয় সেইসব কর্মকে অকুশলকর্ম বলা হয় এবং যে কর্ম করলে কল্যাণ হয়, তত্ত্ববোধ হয়, সেগুলিকে কুশল কর্ম বলা হয়।)—এখানে 'অকুশল কর্মে' কুশল কর্মের নিষেধ এবং অভাব বোঝায় নি, বরং ইহা কুশল কর্ম থেকে ভিন্নতার বাচক। 'অশ্বত্থং প্রাহুঃ' (১৫।১)—যা আগামী কাল পর্যন্ত থাকে না তাকে বলা হয় 'অশ্বত্থ' (**ন শ্বঃ তিষ্ঠতি ইতি অশ্বত্থঃ**) ; অতএব এই নঞ্ সমাস ভিন্নতার বাচক বলে সংসাররূপ বৃক্ষের বাচক।

(৪) অল্পতা—'নঞ্'-এর সঙ্গে সমাসবদ্ধ শব্দে সেই অর্থের স্বল্পতা বোঝায়। যেমন, '**অনুদরা কন্যা**' 'উদররহিতা কন্যা'—উদর সকলেরই থাকে, কিন্তু এখানে উদরের যে নিষেধ করা হয়েছে, তার তাৎপর্য উদরের স্বল্পতা সূচিত করা অর্থাৎ এখানে উদরের নিষেধদ্বারা ক্ষুদ্র উদর অভিব্যক্ত করা হয়েছে। গীতায় এর উদাহরণ এই রূপ আছে—'**অবুদ্ধয়ঃ**' (৭।২৪) 'বুদ্ধিরহিত মনুষ্য'—প্রত্যেক ব্যক্তিরই বুদ্ধি থাকে, কিন্তু এখানে যে বুদ্ধিহীনতা বলা হয়েছে, তা কমবুদ্ধির পরিচায়ক। অল্পবুদ্ধি হওয়ায় মানুষ ভগবানকে নিজের মতো করে শরীরধারী বলে মনে করে। '**অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ**' (১৭।২৮) 'শ্রদ্ধারহিত হয়ে যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং আরও যা কিছু করা হয়'—এখানে শ্রদ্ধার সম্পূর্ণ অভাবের কথা বলা হয়নি, শ্রদ্ধার অল্পতার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। কারণ শ্রদ্ধার অভাব হলে সে যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি করবেই বা কেন ? '**অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য**' (৯।৩)। এই ধর্মের মহিমায়, শ্রদ্ধা রাখে না ব্যক্তিগণ—এখানে শ্রদ্ধার অভাব নয়, বরং শ্রদ্ধার স্বল্পতার কথা বলা হয়েছে। তারা বিজ্ঞানসহ জ্ঞানরূপ ধর্মের মহিমাতে শ্রদ্ধা রাখে না—এটি তাদের শ্রদ্ধার স্বল্পতা।

(৫) অপ্রাশস্ত্য—'নঞ্'-এর সঙ্গে সমাসবদ্ধ পদগুলির অর্থ প্রশস্ত হয় না অর্থাৎ অপ্রশংসনীয় হয়। যেমন, '**অপশূন্ আনয়**' অর্থাৎ গরু এবং ঘোড়ার তুলনায় অপ্রশংসনীয় পশুদের নিয়ে এস। গীতাতেও এর প্রয়োগ দেখা যায় ; যেমন—'**দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ**' (২।৪৯) অর্থাৎ সমতাপূর্বক কৃতকর্মগুলি অপেক্ষা সকাম কর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট (নিন্দনীয়)। '**অশুচিব্রতাঃ**' (১৬।১০) অর্থাৎ শুদ্ধ-ব্রতসম্পন্ন দৈবী সম্পৎসমৃদ্ধ ব্যক্তিগণের তুলনায় আসুরী-সম্পৎ-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্রতাদি অত্যন্ত অপবিত্র (নিন্দনীয়) হয়ে থাকে। '**অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্**' (৭।৫) অর্থাৎ পরা প্রকৃতি চেতন অপেক্ষা অপরা (জড় প্রকৃতি) নিকৃষ্ট হয়।

(৬) বিরোধ—'নঞ্'-এর সঙ্গে সমাসবদ্ধ শব্দের অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ এতে হয়। যেমন, 'অধর্মঃ' পদ ধর্মের বিরোধী। গীতায় এর উদাহরণ আছে ; যেমন—'**গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ**' (১১।২২) এখানে ব্যবহৃত 'অসুর' পদটি দেবতাদের বিরোধী রাক্ষসদের বাচক। '**অজ্ঞানবিমোহিতাঃ**' (১৬।১৫)—এখানে ব্যবহৃত 'অজ্ঞান' শব্দ জ্ঞানের বিরোধী। '**তবাহিতাঃ**' (২।৩৬)

—'অহিতাঃ' (১৬।৯)—এখানে ব্যবহৃত 'অহিত' শব্দ হিতকর্মকারীদের বিরোধী অর্থাৎ শত্রুদের বাচক।

(১৭)

'**দ্বন্দ্বান্তে দ্বন্দ্বাদৌ বা শ্রূয়মাণং পদং প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে**' অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তে অথবা আদিতে প্রযুক্ত পদ সকল পদের সঙ্গে সমানভাবে সম্বন্ধ হয়। গীতায় '**কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ**' (১৭।৯)—এই সমাসযুক্ত পদে ব্যবহৃত 'অতি' শব্দের সম্বন্ধ সকল শব্দগুলির সঙ্গে সমানভাবে আছে। যেমন, প্রথমে কটু প্রভৃতি তিনটি পদের দ্বন্দ্ব সমাস করা হল '**কটুশ্চ অম্লশ্চ লবণশ্চ**'—'**কট্বম্ললবণাঃ**'। আবার উষ্ণাদি চারটি পদেরও দ্বন্দ্ব সমাস করা হল—'**উষ্ণশ্চ তীক্ষ্ণশ্চ রূক্ষশ্চ** বিদাহী চ'—'**উষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষ**বিদাহিনঃ'। এখন 'অতি'র সঙ্গে উষ্ণতীক্ষ্ণাদির সমাস হলে হল 'অত্যন্তম্ উষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ'—'অত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ' আবার এদের দ্বন্দ্ব সমাস করে হল—'**কট্বম্ললবণাশ্চ অত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনশ্চ**' '**কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ**'। এইভাবে প্রথম দ্বন্দ্বের অন্তে এবং দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের আদিতে থাকার জন্য 'অতি' শব্দটি প্রত্যেক **শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে তার অর্থ দাঁড়ায় 'অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রূক্ষ ও** অতি জ্বালাকর।'

গীতায় 'ত্যক্ত্বা **কর্মফলাসঙ্গম্**' (৪।২০) এই দ্বন্দ্ব সমাসটির শেষে যুক্ত 'আসঙ্গ' শব্দের সম্বন্ধ 'কর্ম' এবং 'ফল'—দুটি শব্দের সঙ্গেই রয়েছে। সুতরাং এর অর্থ হল—'কর্ম এবং তার ফলের আসক্তি ত্যাগ করে।' '**শুভাশুভপরিত্যাগী**' (১২।১৭)—এই দ্বন্দ্ব সমাসটির শেষে যুক্ত 'পরিত্যাগী' শব্দের সম্পর্ক 'শুভ' এবং 'অশুভ'—দুটি শব্দের সঙ্গেই আছে। সুতরাং এর অর্থ হচ্ছে শুভ এবং অশুভের পরিত্যাগী। '**তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ**' (১২।১৯) এই দ্বন্দ্ব সমাসের আদিতে যুক্ত 'তুল্য' শব্দের সম্বন্ধ 'নিন্দা'এবং 'স্তুতি'—দুটি শব্দের সঙ্গেই আছে। সুতরাং এর অর্থ হল—নিন্দা এবং স্তুতিতে তুল্য (সম)।

(১৮)

'**সহচরিতাসহচরিতয়োঃ সহচরিতস্যৈব গ্রহণম্**'—এই পরিভাষা এবং 'দেহলীদীপকন্যায়' অনুসারে যে পদ (শব্দ) সমাসের মধ্যে বসে, ঐ পদের পূর্ব এবং উত্তর পদের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে থাকে। গীতায় 'তুল্যনিন্দাত্ম-সংস্তুতিঃ' (১৪।২৪)—এর মধ্যে ব্যবহৃত '**আত্ম**' পদের সম্বন্ধ 'নিন্দা' এবং 'সংস্তুতি'—এই দুটি পদেরই সঙ্গে আছে; যেমন—'আত্মনঃ সংস্তুতি আত্মসংস্তুতিঃ। নিন্দা চ আত্মসংস্তুতিশ্চ নিন্দাত্মসংস্তুতী। তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তুতী যস্য সঃ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।' সুতরাং 'তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ' পদটির অর্থ হচ্ছে যার কাছে নিজ নিন্দা ও সংস্তুতি সমান।

(১৯)

মতুপ, ইনি প্রভৃতি প্রত্যয় ছয়টি অর্থে হয়—

ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নে।
সংসর্গেঽস্তিবিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ॥

'অস্তিবিবক্ষায় যে মতুপ্ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়, সেগুলি বহুত্ব, নিন্দা, প্রশংসা, নিত্যযোগ, আতিশয্য এবং সংসর্গ—এই বিষয়গুলিতে হয়ে থাকে।'

(১) ভূমা—(বহুত্ব) অর্থে; যেমন 'ভূঃ অস্য অস্তি' এই অর্থে 'তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্' (পাণি.অ. ৫।২।৯৪) এই সূত্র দ্বারা 'মতুপ্' প্রত্যয় হয়ে 'ভূমান্' (যার অনেক জমি আছে), গাবোঽস্য সন্তি গোমান্ (যার অনেক গাভী আছে), যবাঃ অস্য সন্তি 'যবমান্' (যার অনেক যব আছে) ইত্যাদি শব্দ গঠিত হয়। গীতাতেও বহুত্ব অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় হয়েছে; যেমন—'**অভিজনবান্ অস্মি**' (১৬।১৫) (আসুরী সম্পৎ সম্পন্নদের মনোগত ইচ্ছা এই যে, 'আমি অনেক পরিজন পরিবৃত আছি অর্থাৎ আমার অনেক লোকবল রয়েছে') 'অভিজনাঃ অস্য সন্তি' এখানে বহুত্ব অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় হয়েছে। '**যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমৎ**' (১০।৪১)—যেখানে যা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত এবং শোভাযুক্ত বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতি আছে সেই সব ঐশ্বর্য আমারই এবং (শোভা) সৌন্দর্যও আমার—এখানে এই বহুত্ব অর্থে 'বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ' ইত্যাদিতে 'মতুপ্' প্রত্যয় হয়েছে।

(২) নিন্দা—যেমন, 'ককুদাবর্তম্ অস্যাম্ অস্তীতি ককুদাবর্তিনী' অর্থাৎ যে কন্যার ঘাড় এবং পিঠের মধ্যবর্তী অংশ উঁচু সেই কন্যা নিন্দিত। গীতাতেও নিন্দিত অর্থে

'ইনি' এবং 'মতুপ্' প্রত্যয় করা হয়েছে ; যেমন— **'দুষ্কৃতিনঃ'** (৭।১৫) অর্থাৎ যার মধ্যে দুষ্কৃত ভরা ; যে ব্যক্তি কুকর্ম করে (দুষ্কৃতানি সন্তি এষু তে দুষ্কৃতিনঃ)। 'পুনরাবর্তিনঃ' (৮।১৬) অর্থাৎ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোক পুনরাবর্তী এবং বিনাশশীল। যে মনুষ্যদেহ দ্বারা নিষ্কামভাবে সুকর্ম করে জীব ভগবদ্ধামে যেতে সক্ষম, জন্ম-মৃত্যুরহিত হতে সক্ষম, সেই মনুষ্যদেহ দ্বারা সকামভাবে শুভ কর্ম করে মানুষ ব্রহ্মলোক, স্বর্গলোক প্রভৃতি সেই সব লোকে যায়, যেখান থেকে পুনরায় তাকে জন্ম-মৃত্যু চক্রে ফিরে আসতে হয়, কাজেই তারা অবশ্যই নিন্দনীয়। **'অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্'** (৭।২৩) অর্থাৎ 'যারা কামনার বশীভূত হয়ে অন্য দেবতাদের উপাসনা করে, সেই তুচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের অন্তবান, জন্ম-মৃত্যুরূপ ফলই প্রাপ্য হয়, অথচ যারা আমাকে ভক্তি করে তারা আমাকেই পায়'। এইভাবে **'বাদিনঃ'** (২।৪২) (বাদঃ অস্তি এষু তে বাদিনঃ), **'বৈরিণম্'** (৩।৩৭) (বৈরম্ অস্তি অস্মিন্ তম্ বৈরিণম্)—এসবেও নিন্দার্থে 'ইনি' প্রত্যয় হয়েছে।

(৩) প্রশংসা—প্রশংসা-অর্থে ; যেমন 'রূপম্ অস্তি অস্মিন্, গুণাঃ সন্তি অস্মিন্' এই অর্থে 'রসাদিভ্যশ্চ' (পাণি. অ. ৫।২।৯৫) এই সূত্র দ্বারা 'মতুপ্' এবং **'মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ'** (পাণি. অ. ৮।২। ৯) এই সূত্র দ্বারা 'মতুপ্'-এর ম-কার স্থানে ব-কার হয়ে 'রূপবান্' (যার রূপ আছে), 'গুণবান্' (যার গুণ আছে) ইত্যাদি রূপ হয়। গীতাতেও প্রশংসার্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় হয়েছে ; যেমন—**'বুদ্ধিমান্'** (৪।১৮) যে কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখে অর্থাৎ কর্ম করার সময়ে নির্লিপ্ত থাকে এবং নির্লিপ্ত থেকেও কর্ম করে, সেই বুদ্ধিমান্। এখানে 'বুদ্ধিঃ অস্মিন্ অস্তি' এই অর্থে উপর্যুক্ত সূত্র দ্বারা 'মতুপ্' প্রত্যয় হয়ে 'বুদ্ধিমান্' শব্দ হয়েছে। এইভাবে **'বলবতাম্'** (৭।১১) 'সংসারে যত বলবান্ শক্তিমান্ লোক আছে, তাদের শক্তি আমি'— এখানে 'বলম্ অস্য অস্তি' এই অর্থে উপর্যুক্ত সূত্র দ্বারা 'মতুপ্' প্রত্যয় এবং মকার স্থানে ব-কার হয়ে 'বলবতাম্' হয়েছে। এইরূপেই **'সুকৃতিনঃ'** (৭।১৬) যার অনেক পুণ্য আছে। এখানে 'সুকৃতানি এষাং সন্তি' এই অর্থে **'অত ইনিঠনৌ'** (পাণি. অ. ৫।২।১১৫) এই সূত্র দ্বারা 'ইনি' প্রত্যয় হয়ে 'সুকৃতিনঃ' রূপ হয়েছে।

(৪) নিত্যযোগ—যার সঙ্গে নিত্যযোগ অর্থাৎ সর্বদা সম্পর্ক থাকে সেই অর্থে ; যেমন—'ক্ষীরম্ এষাং সন্তি তে' এই অর্থে 'অত ইনিঠনৌ'-এই সূত্র দ্বারা 'ইনি' প্রত্যয় হয়ে 'ক্ষীরিণো বৃক্ষাঃ' (থুহর, ইক্ষু ইত্যাদি বৃক্ষে (ক্ষীর) রসের নিত্যযোগ থাকে, তাই এগুলিকে ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষ বলা হয়) রূপ হয়। গীতাতেও নিত্যযোগ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় ; যেমন—'ভগাঃ সন্তি অস্মিন্', 'জ্ঞানম্ অস্মিন্ অস্তি', 'জ্ঞানম্ এষু বা অস্তি'—এই অর্থে 'মতুপ্' এবং 'ইনি' প্রত্যয় এবং 'মতুপ্'-এর ম-কার স্থানে ব-কার হয়ে **'ভগবান্'**—সম্বোধনে **'ভগবন্'** (১০।১৪।১৭) (যাতে ছয় প্রকারের ঐশ্বর্য সর্বদা বিদ্যমান থাকে), **'জ্ঞানবান্'** (৩।৩৩) এবং **'জ্ঞানিনঃ'** (৪।৩৪) (যাতে তত্ত্বের জ্ঞান, অনুভব সদা বিদ্যমান থাকে) রূপ হয়েছে।

(৫) অতিশায়ন—যে বস্তু মাত্রা থেকে অধিক সেই অর্থে ; যেমন—'উদরম্ অস্যা অস্তি' এই অর্থে ইনি প্রত্যয় এবং 'ঋন্নেভ্যো ঙীপ্' (পাণি. অ. ৪।১।৫) এই সূত্র দ্বারা 'ঙীপ্' এবং 'অট্‌কুপ্বাঙ্‌নুম্ব্যবায়েঽপি' (পাণি.অ.৮।৪।২) এই সূত্র দ্বারা 'ণ-ত্ব' হয়ে 'উদরিণী কন্যা' (যে কন্যার পেট স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বড়) রূপ হয়। গীতাতেও অতিশয় অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় হয়েছে ; যেমন—'অংশবঃ সন্তি অস্য' এই অর্থে উপর্যুক্ত সূত্র দ্বারা 'মতুপ্' প্রত্যয় হয়ে **'অংশুমান্'** (১০।২১) (কিরণ বা জ্যোতি তো চন্দ্র, তারা প্রভৃতিরও থাকে, কিন্তু বেশী কিরণ বা জ্যোতি কেবল সূর্যেরই হয়) রূপ হয়েছে।

(৬) সংসর্গ—কোন বস্তু পদার্থ ইত্যাদির সম্বন্ধের দ্বারা যাকে উল্লেখ করা হয় ; যেমন—'দণ্ডম্ অস্য অস্তি', 'ছত্রম্ অস্য অস্তি' এই অর্থে 'ইনি' প্রত্যয় হওয়ায় 'দণ্ডী' (যার কাছে দণ্ড আছে, অর্থাৎ দণ্ডের সম্বন্ধের দরুণ তাকে দণ্ডী বলা হয়) ; 'ছত্রী' (যার কাছে ছাতা আছে অর্থাৎ ছাতার সম্বন্ধের দরুণ তাকে ছত্রী বলা হয়) রূপ হয়। গীতাতেও সংসর্গ (সম্বন্ধ) অর্থে 'মতুপ্' প্রভৃতি প্রত্যয় দেখা যায় ; যেমন—'দেহঃ অস্য— এষাং বা অস্তি', 'শরীরম্ অস্য অস্তি' এই অর্থে 'মতুপ্' এবং 'ইনি' প্রত্যয় হওয়াতে **'দেহবদ্ভিঃ'** (১২।৫),

'দেহী' (২।২২) **'শরীরিণঃ'** (২।১৮) (আত্মার যদিও কোন নাম নেই তবুও তা যখন দেহ, শরীরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, সংসর্গ করে নেয়, তখন তাকে দেহবান, দেহী, শরীরী বলা হয়) রূপ হয়েছে[১]।

(২০)

গুহ্য বা গোপনীয় তিন প্রকারের হয়—গুহ্য, গুহ্যতর ও গুহ্যতম। সাধারণভাবে বললে 'গুহ্য' হয়; দুইয়ের মধ্যে একটিকে অত্যন্ত গোপনীয় বলতে হলে 'গুহ্যতর' হয় এবং সকলের মধ্যে একটিকে অত্যন্ত গোপনীয় বলতে হলে 'গুহ্যতম' বলা হয়। এইরূপেই দুর্লভ, দুর্লভতর, দুর্লভতম ; যোগবিত্তর এবং যোগবিত্তম ইত্যাদি বুঝতে হবে।

দুইয়ের মধ্যে একটিকে অপেক্ষাকৃত লঘু ইত্যাদি জানাতে হলে **'দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ'** (পাণি. অ. ৫।৩।৫৭)—এই সূত্র দ্বারা 'তরপ্' প্রত্যয় হয় ; যেমন—'অয়ম্ অনয়োঃ অতিশয়েন লঘুঃ লঘুতরঃ' (এটি এই দুইয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত লঘু) ইত্যাদি। গীতাতেও এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়েছে। যেমন, যোগভ্রষ্ট দুই প্রকারের হয়—এক, কিছু সাংসারিক বাসনা থেকে যাওয়ায় অন্তিমকালে সাধন ভজন থেকে যারা বিচ্যুত হয়ে যায়, তারা শরীর ত্যাগের পর স্বর্গাদি লোকে বহুকাল বাস করে পুনরায় পবিত্র শ্রীমান্‌দের গৃহে জন্মগ্রহণ করে এবং দ্বিতীয়, সাংসারিক বাসনা না থাকলেও কোন কারণবশতঃ অন্তিম সময়ে নিজ স্থিতি থেকে বিচলিত হয়ে, দেহত্যাগের পর যারা সরাসরি যোগীদের কুলে জন্মগ্রহণ করে (গীতা ৬।৪১-৪২)। যদিও সাধারণ কুলে জন্মানোর চেয়ে শুদ্ধ শ্রীমান ব্যক্তিদের গৃহে জন্মানো দুর্লভ ভাগ্যের কথা, কিন্তু ভগবান তার চেয়েও যোগীদের কুলে জন্মগ্রহণ করাকে দুর্লভতর বলে জানাচ্ছেন—**'এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্'** (৬।৪২)। কর্মযোগ এবং সগুণ-নিরাকার পরমাত্মার শরণাগতি—এই দুইয়ের মধ্যে কর্মযোগের চেয়ে সগুণ-নিরাকার পরমাত্মার শরণাগতি বেশী মহত্ত্বপূর্ণ (গুহ্যতর) ; সুতরাং এখানে 'তরপ্' প্রত্যয় করা হয়েছে—**'ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া'** (১৮।৬৩)। একজন গীতার প্রচারকারী, অন্যজন প্রচারকারী নয়—এই দুজনের মধ্যে গীতার প্রচারকারীর মতো আর কেউই ভগবানের তত প্রিয় নয় ; সুতরাং

---

[১]বুদ্ধিমান্, মতিমান্ ইত্যাদি পুংলিঙ্গ রূপগুলি যেখানে মতুপ্-এর ম-কার ব-কার না হয়ে ম-কারই থাকে, সেখানে এবং 'বতি' প্রত্যয়যোগে সৃষ্ট শত্রুবৎ প্রভৃতি প্রয়োগে স্বরূপ দ্বারা এবং অর্থ দ্বারা 'মতুবন্ত' এবং 'বত্যন্ত' শব্দগুলিতে পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কিন্তু যেখানে মতুপ্-এর মকার বকার হয়ে যায়, সেখানে ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ 'মতুপ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং 'বতি' প্রত্যয়ান্ত শব্দে অর্থের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও স্বরূপে কোন প্রকার পার্থক্যই বোঝা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ দুই প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিতে অনেক পার্থক্য আছে; যেমন —(১) 'মতুপ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ কোন বিশেষ্যের বিশেষণ হয় এবং 'বতি' প্রত্যয়ান্ত শব্দ শুধু ক্রিয়ার বিশেষণ হয়। (২) 'মতুপ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্যের সকল লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয় এবং 'বতি' প্রত্যয়ান্ত শব্দ অব্যয় হয়ে থাকে। তাই সকল লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচনে একই রূপ থাকে। (৩) 'মতুপ্' প্রত্যয়ের অর্থ হয় সম্পন্ন ; যেমন—বুদ্ধিসম্পন্ন ইত্যাদি। 'বতি' প্রত্যয়ের অর্থ 'সদৃশ'। যেমন—শত্রুর মতো ইত্যাদি। গীতা অনুসারে 'মতুপ্' প্রত্যয়ান্ত এবং 'বতি' প্রত্যয়ান্তের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল—যেমন, ক্লীবলিঙ্গে 'মতুপ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ 'বলবদ্দৃঢ়ম্' (৬।৩৪) ; 'অন্তবত্তু ফলম্' (৭।২৩), 'দোষবৎ' (১৮।৩) ইত্যাদি এবং 'বতি' প্রত্যয়ান্ত শব্দ—'শত্রুবৎ' (৬।৬) ; 'উদাসীনবৎ' (৯।৯, ১৪।২৩) ইত্যাদি। এই দুয়েতে স্বরূপে পার্থক্য না থাকলেও অর্থ প্রভৃতিতে পার্থক্য আছে।

এইভাবে তাচ্ছীল্য অর্থে কৃদন্ত ণিনি প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিতে এবং 'সেটি তার বা তাতে আছে' এই অর্থে তদ্ধিত 'ইনি' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিতে স্বরূপে কোন পার্থক্য বোঝা যায় না। কিন্তু অর্থে স্পষ্ট পার্থক্য বোঝা যায় এবং বিচার করলে স্বরূপেও বেশ পার্থক্য বোঝা যায় ; কেননা 'ণিনি' প্রত্যয় পূর্বে উপপদ থাকলে ধাতুর উত্তর হয় এবং 'ইনি' প্রত্যয় যে শব্দের সঙ্গে হয়, তার পূর্বে উপপদ প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা থাকে না অর্থাৎ এই প্রত্যয় যে কোন শব্দেরই হতে পারে। গীতার প্রয়োগগুলিতে এই প্রত্যয়গুলির স্পষ্ট পার্থক্য বোঝা যায় ; যেমন—'বিবিক্তং সেবিতুং শীলম্, লঘু অশীতুং শীলম্'—এই তাচ্ছীল্য অর্থে 'সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে' (পাণি. অ. ৩।২।৭৮) এই সূত্র দ্বারা 'ণিনি' প্রত্যয় হয়ে 'বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী' (১৮।৫২) রূপ সিদ্ধ হয়। 'বাদঃ এষু অস্তি', 'দেহঃ অস্য অস্তি' এই অর্থে 'অত ইনিঠনৌ' এই সূত্র দ্বারা 'ইনি' প্রত্যয় হয়ে 'বাদিনঃ' (২।৪২) এবং 'দেহী' (২।৩০) প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

ভগবান তাকে প্রিয়তর বলেছেন—'**ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি**' (১৮।৬৯)।

বহুর মধ্যে একজনকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলার জন্য '**অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ**' (পাণি. অ. ৫।৩।৫৫)—এই সূত্র দ্বারা 'তমপ্' প্রত্যয় হয়; যেমন—'অয়ং এষাম্ অতিশয়েন আঢ্যঃ আঢ্যতমঃ' (এ এদের সকলের মধ্যে অত্যন্ত ধনবান্) ইত্যাদি। গীতায় এই 'তমপ্' প্রত্যয়ের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়; যেমন—'যদি তুমি সমস্ত পাপীদের থেকেও অত্যধিক পাপকারী হও'—'**অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ**' (৪।৩৬)। 'সকল যোগীদের মধ্যে যারা শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক আমার ভজন করে আমি তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি' '**যোগিনামপি সর্বেষাং......স মে যুক্ততমো মতঃ॥**' (৬।৪৭)। অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, 'যে নিরন্তর আপনাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে আপনার উপাসনা করে এবং যে অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করে তাদের মধ্যে কোন যোগীকে যোগবিত্তম বলা হয়?'—'**এবং সততযুক্তা যে .... তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥**' (১২।১)। এর উত্তরে ভগবান জানিয়েছেন যে তাঁতে নিবিষ্ট চিত্ত ভক্তই যুক্ততম—'**ময্যাবেশ্য ...... তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥**' (১২।২)। সপ্তম অধ্যায়ের অবশিষ্ট বিষয়ের আরম্ভ করতে গিয়ে ভগবান নবম অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলছেন যে, 'তুমি দোষদৃষ্টিরহিত বলে আমি তোমাকে অত্যন্ত গোপনীয় বিজ্ঞান-সহ জ্ঞানের কথা জানাব'—'**ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে**' (৯।১)। পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিষয়ের উপসংহার করার সময় ভগবান জানাচ্ছেন যে, 'এই সম্পূর্ণ অধ্যায়ের মধ্যে অত্যন্ত গোপনীয় শাস্ত্র আমি তোমাকে জানিয়েছি'—'**ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ**' (১৫।২০)।

(২১)

সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতূপসর্গয়োঃ।
নিত্যা সমাসে বাক্যে তু সা বিবক্ষামপেক্ষতে॥

'একপদে, ধাতু ও উপসর্গে এবং সমাসে সংহিতা (সন্ধি) নিত্য হয়; কিন্তু বাক্যে সেটি হবে কি হবে না তা নির্ভর করে বক্তার ইচ্ছার ওপরেই।'

একপদে—যেমন, নায়কঃ, পাবকঃ—এই প্রয়োগগুলিতে নৈ অকঃ, পৌ অকঃ এই অবস্থায় আয়াদেশ এবং আবাদেশ একপদে হওয়ার দরুণ নিত্য হয়। গীতায় এর উদাহরণ এইরকম পাওয়া যায়—'নায়কাঃ' (১।৭) প্রভৃতি।

ধাতু এবং উপসর্গে—যেমন, প্র ঋচ্ছতি, উপ ঋচ্ছতি—এখানে ধাতু এবং উপসর্গে সংহিতা নিত্য হওয়ায় বৃদ্ধি নিত্য হয়; সুতরাং 'প্রার্চ্ছতি' 'উপার্চ্ছতি' রূপ নিত্য হবে। গীতায় এর রূপ এইভাবে আছে—'উপৈতি' (৮।২৭), 'প্রোক্তঃ' (৪।৩) ইত্যাদি।

সমাসে—যেমন, 'পুরুষোত্তম'-এ সমাস হওয়ায় গুণাদেশ নিত্য হয়। গীতায় এর উদাহরণ এইরূপ—'**ব্রহ্মোদ্ভবম্**' (৩।১৫), '**অমৃতোদ্ভবম্**' (১০।২৭), '**গুড়াকেশ**' (১০।২০) ইত্যাদি।

বাক্যে—যেমন, 'ন অহং গচ্ছামি'—'নাহং গচ্ছামি' তে সন্ধি করা বক্তার বিবক্ষার উপর নির্ভর করায় দুটি বাক্যই শুদ্ধ। গীতায় এর উদাহরণ এইপ্রকার—'**নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ**' (১২।৮), '**নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া**' (১১।৫৩), '**ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন**' (১১।৫৪), '**জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে**' (২।৫০) ইত্যাদি।

(২২)

ইদমস্তু সংনিকৃষ্টং সমীপতরবর্তি চৈতদো রূপম্।
অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টং তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ॥

এই উক্তি অনুযায়ী '**ইদম্**' শব্দ সমীপের জন্য, '**এতৎ**' শব্দ অত্যন্ত সমীপের জন্য, '**অদস্**' শব্দ দূরের জন্য এবং '**তৎ**' শব্দ পরোক্ষের জন্য প্রযুক্ত হয়। গীতায় এই শব্দগুলির প্রয়োগ এই দৃষ্টিতেই হয়েছে; যেমন—

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে নিকটে দৃশ্যমান শরীরের জন্য '**ইদম্**' পদ ব্যবহৃত হয়েছে—'**ইদং শরীরম্**' এবং অত্যন্ত নিকটে দৃষ্ট অহং ভাবের জন্য '**এতৎ**' পদ ব্যবহৃত হয়েছে—'**এতদ্ যো বেত্তি**', কারণ অহং ভাব স্বয়ং এর অত্যন্ত নিকটে থাকে।

একাদশ অধ্যায়ের একান্ন সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন নিজ সম্মুখস্থ ভগবানের মনুষ্য রূপের জন্য '**ইদম্**' শব্দ প্রয়োগ করেছেন—'**দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপম্**' এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের উনচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে নিজ হৃদয়ে অবস্থিত সন্দেহের জন্য '**এতৎ**' শব্দের প্রয়োগ করেছেন—'**এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ**'।

বিশ্বরূপ নিকটস্থ হওয়ায় তার জন্য অর্জুন একাদশ অধ্যায়ের উনিশ, কুড়ি প্রভৃতি অনেক শ্লোকে 'ইদম্' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধারা বিশ্বরূপ ভগবানের অত্যন্ত নিকটস্থ হওয়ায় অর্থাৎ বিশ্বরূপেই অঙ্গীভূত হওয়ায় ভগবান তাঁদের জন্য 'এতৎ' (এতে) শব্দের প্রয়োগ করেছেন—**'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব'** (১১।৩৩)।

ভগবানের দেওয়া দিব্যদৃষ্টির দ্বারা বিরাটরূপ অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল এবং তাতে দেবতাদিকেও অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। অতএব অর্জুন তাঁদের জন্য একাদশ অধ্যায়ের একুশ, ছাব্বিশ এবং আটাশ সংখ্যক শ্লোকগুলিতে **'অদস্'** (অমী) শব্দের প্রয়োগ করেছেন।

বিরাটরূপের প্রারম্ভিক দৃশ্যে দেখা চতুর্ভুজ-বিষ্ণুরূপ (বিরাটরূপের দৃশ্যপট বদলে যাওয়ায়) দৃষ্টির সামনে না থাকায় অর্থাৎ পরোক্ষ হয়ে যাওয়ায় অর্জুন সেই বিষ্ণুরূপের জন্য একাদশ অধ্যায়ের পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে তৎ (তৎ এবং তেন) শব্দের প্রয়োগ করেছেন।

(২৩)

কোন অজ্ঞাত কার্য বা কোন অপূর্ব বিষয় জানবার জন্য বা বিধান করার জন্য যা একবার পূর্বে গ্রহণ করা হয়েছিল, যদি দ্বিতীয় অজ্ঞাত কার্য বা অপূর্ব বিষয় জানবার জন্য বা বিধান করবার জন্য তার পুনরায় গ্রহণ করা হয়, তাহলে সেই পুনর্গ্রহণকে 'অন্বাদেশ' বলা হয়—**'কিঞ্চিৎকার্যং বিধাতুমুপাত্তস্য কার্যান্তরং বিধাতুং পুনরুপাদানমন্বাদেশঃ'**। উদাহরণ—

(১) **'অনেন ব্যাকরণমধীতম্, এনং ছন্দোঽধ্যাপয়'** —এ ব্যাকরণ পড়েছে, এখন একে ছন্দশাস্ত্র পড়াও— এখানে 'ব্যাকরণ পড়ে নিয়েছে' এই কার্যের জন্য **'অনেন'** পদ গ্রহণ করা হয়েছে। আবার অজ্ঞাত বা অপূর্ব কার্য 'এখন ছন্দশাস্ত্র পড়াও'-এর জন্য পুনরায় এর গ্রহণ হয়েছে। এইভাবে পুনরায় (দ্বিতীয়বার) এর গ্রহণকে 'অন্বাদেশ' বলা হয়।

(২) **'অনয়োঃ কুলং পবিত্রম্, এনয়োঃ প্রভূতং স্বম্'** 'এই দুজনের কুল পবিত্র এবং এঁদের নিকট প্রভূত ধন-সম্পদ আছে'—এখানে 'প্রভূত ধন সম্পত্তি আছে' বলবার জন্য পুনরায় তাদের গ্রহণ 'অন্বাদেশ'।

(৩) **'অনেন বিদ্যার্থিনা, রাত্রিরধীতা, এনেনাহরপ্যধীতম্'** এই বিদ্যার্থী সারারাত পড়াশুনা করেছে এবং সে সারাদিনও পড়াশুনা করেছে— এখানে 'সারাদিনও পড়াশুনা করেছে', বলার জন্য পুনরায় তার গ্রহণ 'অন্বাদেশ'।

(৪) **'অনয়োর্বিদ্যার্থিনোঃ শোভনং শীলম্, এনয়োঃ কুশাগ্রা মেধা'**—এই দুই বিদ্যার্থী সু-আচরণ সম্পন্ন এবং এদের বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ—এখানে 'বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ' এই কথা জানবার জন্য পুনরায় তাদের গ্রহণ হচ্ছে 'অন্বাদেশ'।

অন্বাদেশের সময় 'ইদম্' এবং 'এতৎ' শব্দগুলির স্থানে, দ্বিতীয়ার (অম্, ঔট এবং শস্), তৃতীয়ার (টা) এবং ষষ্ঠী-সপ্তমীর (ওস্) বিভক্তি পরে থাকলে **'দ্বিতীয়াটৌস্স্বেনঃ'** (পাণি. অষ্টা. ২।৪।৩৪)—এই সূত্র দ্বারা **'এন'** আদেশ হয়। গীতাতেও উপর্যুক্ত অর্থে **'ইদম্'** এবং **'এতৎ'** শব্দের স্থানে অন্বাদেশ দেখা যায় ; যেমন —**'অস্য-এনম্'** (২।১৭, ১৯), **'অয়ম্-এনম্'** (২।২০-২১), **'অয়ম্-এনম্'** (২।২৪-২৬), **'এষা-এনাম্'** (২।৭২) **'এষ-এনম্'** (৩।৩৭), **'এষ-এনম্'** (৩।৪০-৪১), **'অস্য-এনম্'** (১৫।৩)—এই পদগুলিতে **'ইদম্'** এবং **'এতৎ'** শব্দগুলির স্থানে **'এন'** অন্বাদেশ হয়েছে।

অন্বাদেশের পূর্বে **'ইদম্'** এবং **'এতৎ'** শব্দগুলি যে ব্যবহৃত হতেই হবে এমন কোন নিয়ম নেই। যদি পূর্বে **'যদ্'**, **'তদ্'** ইত্যাদি অন্য কোন শব্দের দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে গ্রহণ হয় তাহলেও অপর গ্রহণে **'ইদম্'** এবং **'এতৎ'**-এর **'এন'** অন্বাদেশ হয়ে থাকে। যেমন— গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের তেইশ এবং উনত্রিশ সংখ্যক, চতুর্থ অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ সংখ্যক, ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাতাশ সংখ্যক এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের একাদশ সংখ্যক শ্লোকে **'ইদম্'** এবং **'এতৎ'** শব্দের **'এনম্'** অন্বাদেশ হয়েছে।

যেখানে কোন অপূর্ব বা অজ্ঞাত বিষয়ের বোধন বা জ্ঞাপন হয় না, সেখানে অন্বাদেশ হয় না ; যেমন— **'নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়'** (গীতগোবিন্দ) 'এই কৃষ্ণ রাত্রে ভয় পায় ; অতএব রাধে ! তুমিই একে গৃহে পৌঁছে দাও'—এই পদ্যাংশে

জ্ঞাত, পূর্ব বিষয় তারই অনুবাদমাত্র হয়েছে, সেইজন্য এখানে অন্বাদেশ হয় নি। এইরূপ গীতায় ব্যবহৃত **'ইমে-এতান্'** (১।৩৩, ৩৫), **'এষা-ইমাম্'** (২।৩৯), **'এষা-এতাম্'** (৭।১৪), **'ইদম্-এতৎ'** (১৩।১), **'ইদম্-এতৎ'** (১৬।২১) **'ইদম্-ইমম্'** (১৮।৬৭-৬৮), **'ইমম্-এতৎ'** (১৮।৭৪-৭৫)—এই পদগুলিতে পূর্ব জ্ঞাত বিষয়ের অনুবাদ মাত্রই করা হয়েছে, নতুন বোধন বা জ্ঞাপন করা হয় নি। অতএব এই পদগুলিতে অন্বাদেশ হয় নি।

(২৪)

ক্লীবলিঙ্গ শব্দের সঙ্গে যদি পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ থাকে তাহলে তাদের মধ্যে ক্লীবলিঙ্গ শব্দ শেষ থাকে এবং তাতে একবদ্ ভাব বিকল্পে হয়—**'নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চাস্যান্যতরস্যাম্'** (পাণি.অ. ১।২।৬৯)। যেমন, **'শুক্লঃপটঃ, শুক্লা শাটিকা, শুক্লং বস্ত্রম্'**—'তানি ইমানি শুক্লানি অথবা তদিদং শুক্লম্'। গীতাতেও এর প্রয়োগ আছে; যেমন—**'যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্'** (১৮।৫)—এতে **'যজ্ঞঃ'** শব্দের প্রয়োগ পুংলিঙ্গে এবং **'দানম্'** ও **'তপঃ'** শব্দের প্রয়োগ ক্লীবলিঙ্গে হয়েছে; সুতরাং একশেষে ক্লীবলিঙ্গ এবং বহুবচন **'পাবনানি'** শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। এইরূপ **'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ'** (২।৩৮)—এই পদগুলিতে 'সুখ-দুঃখ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ এবং 'লাভ-অলাভ' ও 'জয়-অজয়' শব্দ পুংলিঙ্গ। অতএব একশেষে **'সমে'** ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ করা হয়েছে। **'কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি'** (৫।১১)— এই পদগুলিতে 'কায়েন' শব্দ পুংলিঙ্গ, 'মনসা' এবং 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ও 'বুদ্ধ্যা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। সুতরাং এক-শেষে **'কেবলৈঃ'** ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ করা হয়েছে। **'অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ'** (১০।২০) এখানে **'আদিঃ'** এবং **'অন্তঃ'** শব্দের প্রয়োগ পুংলিঙ্গে রয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে সৃষ্টির আদিতে পরমপুরুষ ভগবান একাই ছিলেন—**'অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ'** (গীতা ১০।২) এবং শেষেও পরমপুরুষ ভগবান একাই থাকেন—**'শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩। ২৫)। এইজন্য ভগবান আদি ও অন্ত শব্দের প্রয়োগ পুংলিঙ্গে করেছেন। কিন্তু মধ্যে অর্থাৎ সৃষ্টির সময় পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ—তিন পদেরই ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থ, ক্রিয়া, ভাব ইত্যাদি থাকে। অতএব এই তিন লিঙ্গের মধ্যে ক্লীবলিঙ্গই শেষে থাকে (মধ্যঃ, মধ্যা, মধ্যম্—তদিদং মধ্যম্) অর্থাৎ তিনটি লিঙ্গই ক্লীবলিঙ্গের অন্তর্গত। এইজন্য ভগবান এখানে এবং পরে বত্রিশ সংখ্যক শ্লোকেও 'মধ্য' শব্দের প্রয়োগ ক্লীবলিঙ্গে করেছেন।

(২৫)

'সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ' (গীতা ৫।৬) যদিও এখানে **'সন্ন্যাসঃ'** পদ **'আপ্তুম্'** ক্রিয়ার কর্ম হওয়ায় তাতে দ্বিতীয়া হওয়া উচিত, তবুও 'তু' পদ নিপাত-সংজ্ঞক বলে এর দ্বারা কর্ম উক্ত হওয়ায় **'সন্ন্যাসঃ'** পদটিতে প্রথমা হয়েছে।

'তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি' (গীতা ১৩।১)—যদিও এখানে **'প্রাহুঃ'** ক্রিয়ার কর্ম হওয়ায় **'ক্ষেত্রজ্ঞ'** শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পরে **'ইতি'** পদ থাকায় **'ইতি'** পদের দ্বারা উক্ত হওয়ায় **'ক্ষেত্রজ্ঞ'** শব্দে প্রথমা বিভক্তি হয়েছে।

(২৬)

'অনার্যজুষ্টম্' (গীতা ২।২)—এই পদে যে 'নঞ্' সমাস আছে, তা 'আর্যৈর্জুষ্টমার্যজুষ্টম্'—এই তৃতীয়া সমাসের পরে করা উচিত; যেমন—'ন আর্যজুষ্টম্-অনার্যজুষ্টম্'। যদি 'নঞ্' সমাস তৃতীয়া সমাসের পূর্বে করা হয় 'ন আর্যা অনার্যাঃ অনার্যৈর্জুষ্টমনার্যজুষ্টম্' তাহলে এখানে এটা বলাই যায় না; কারণ অনার্যপুরুষদের দ্বারা যা সেবিত, তা অপরের কাছে আদর্শ হতে পারে না।

(২৭)

'ধার্তরাষ্ট্রাণাম্' (গীতা ১।১৯)—'অন্যায়েন ধৃতং রাষ্ট্রং যৈস্তে ধৃতরাষ্ট্রাঃ' (যারা অন্যায়পূর্বক রাজ্য ধারণ করেছে)—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করার পর 'ধৃতরাষ্ট্রা এব' এই বাক্যে স্বার্থে তদ্ধিতের 'অণ্' প্রত্যয় করে 'ধার্তরাষ্ট্রাঃ' রূপ তৈরি হয়েছে। এখানে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা থাকায় ষষ্ঠীতে 'ধার্তরাষ্ট্রাণাম্' এইরূপ প্রয়োগ করা হয়েছে।

(২৮)

'মহিমানং তবেদম্' (গীতা ১১।৪১)—এতে

ব্যবহৃত 'ইদম্' পদ 'মহিমানম্'-এর বিশেষণ নয় ; কারণ 'মহিমানম্' পদটি পুংলিঙ্গ এবং 'ইদম্' পদ ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এখানে 'ইদম্' অর্থে 'স্বরূপ' গ্রহণ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিতে 'মহিমানং তবেদম্' পদগুলির অর্থ হল—আপনার মহিমা এবং স্বরূপ।

(২৯)

'ইষ্টকামধুক্' (গীতা ৩।১০)—**'ইষ্ট'** শব্দ 'যজ্' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করে হয়, যা যজ্ঞ (কর্তব্য-কর্ম)-এর বাচক ; এবং **'কাম'** শব্দ 'কম্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করে হয়, যা পদার্থ (সামগ্রী)র বাচক। সুতরাং 'ইষ্টকামধুক্' পদের অর্থ হল—কর্তব্য-কর্ম করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানকারী।

(৩০)

'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে' (গীতা ৫।৫) এবং **'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপাঃ'** (গীতা ৩।১৩)—এখানে 'অর্শআদিভ্যোঽচ্' (পাণি. অ. ৫।২।১২৭) এই সূত্র দ্বারা 'অচ্' প্রত্যয় করে 'সাংখ্য' শব্দ সাংখ্যযোগীর, 'যোগ' শব্দ কর্মযোগীর এবং 'পাপ' শব্দ পাপীর বাচক হয়েছে।

(৩১)

'অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ' (গীতা ৬।৪৫) অনেকজন্মের অর্থ হচ্ছে—'ন একজন্ম ইতি অনেকজন্ম'—অর্থাৎ একের অধিক জন্ম। যোগভ্রষ্টের অনেক জন্ম হয়েই গেছে। **'সংসিদ্ধঃ'** পদে অতীতকালে 'ক্ত' প্রত্যয় হওয়ায় এর অর্থ হচ্ছে—এই যোগী অনেক জন্মে সংসিদ্ধ (শুদ্ধ) হয়ে গেছে।

(৩২)

'অনুশুশ্রুম' (গীতা ১।৪৪)—যাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় নি, তাকে পরোক্ষ বলে এবং পরোক্ষার্থেই 'লিট্' লকার হয়, তবুও অর্জুন এখানে পরোক্ষ 'লিট্'-এর প্রয়োগ করেছেন, যা করা উচিত ছিল না। কিন্তু শোকাবিষ্ট থাকায় অর্জুন এই পদটিতে পরোক্ষ 'লিট্'-এর (ক্রিয়ার) প্রয়োগ করেছেন।

(৩৩)

'কৌরব্য' শব্দের বহুবচনে 'তদ্রাজস্য বহুষু তেনৈবাস্ত্রিয়াম্' (পাণি. অ. ২।৪।৬২)— এই সূত্র দ্বারা 'ণ্য' প্রত্যয় লোপ হয়ে **'কুরূন্'** (গীতা ১।২৫) পদ গঠিত হয়েছে, যা কুরুবংশীয়দের বাচক।

(৩৪)

'পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্' (পাণি. অ. ৬।৩।১০৯)— এই সূত্র দ্বারা 'ভবিষ্যৎ' শব্দের 'ত্' কারের লোপ হয়ে 'ভবিষ্যাণি' (গীতা ৭।২৬) রূপ হল।

(৩৫)

'চাতুর্বর্ণ্যম্' (গীতা ৪।১৩) 'চত্বারো বর্ণাশ্চাতুর্বর্ণ্যম্' —এখানে 'চতুর্বর্ণাদীনাং স্বার্থে উপসংখ্যানম্' এই বার্তিক অনুসারে স্বার্থে 'ষ্যঞ্' প্রত্যয় করা হয়েছে।

(৩৬)

'মা শুচঃ' (গীতা ১৬।৫ ; ১৮।৬৬)—এই দুটি ক্রিয়া দিবাদিগণে 'ঈশুচির্ পূতীভাবে' ধাতুর লুঙ্ লকারের রূপ।

(৩৭)

'ইকো হ্রস্বোঽঙ্যো গালবস্য' (পাণি. অ. ৬।৩।৬১) অর্থাৎ উত্তর পদের পরে থাকলে ঙীপ্-রহিত 'ইক্' অঙ্গের বিকল্পে হ্রস্ব হয়ে যায় ; যেমন—গ্রামণ্যঃ পুত্রঃ গ্রামণিপুত্রঃ/গ্রামণীপুত্রঃ। এই উদাহরণে 'গ্রামণী' শব্দ ঙীপ্-রহিত। অতএব এখানে উপরিউক্ত সূত্রে হ্রস্ব হয়েছে। গীতাতেও **'কাশিরাজঃ'** এবং **'কুন্তিভোজঃ'** (১।৫-৬)—এই দুই শব্দে উপরিউক্ত সূত্র দ্বারা হ্রস্ব হয়েছে, কিন্তু এই দুই শব্দে উপরিউক্ত সূত্র দ্বারা হ্রস্ব হতে পারে না ; কারণ এই দুটি শব্দের মূলেই হ্রস্ব-ইকার আছে। এমনিতে এই দুটি শব্দ হ্রস্ব এবং দীর্ঘ (কাশি-কাশী, কুন্তি-কুন্তী) দুই প্রকারেরই হয়, কিন্তু গীতাতে এগুলি মূলতঃ হ্রস্বই রয়েছে। যদি এই দুটি শব্দকে দীর্ঘ ঈকারান্ত মনে করে হ্রস্ব করতে যাওয়া যায় তাহলে হ্রস্ব হয় না ; কারণ দীর্ঘ 'কাশী' এবং 'কুন্তী' শব্দ ঙীবন্ত হওয়ায় উপরিউক্ত সূত্র দ্বারা হ্রস্ব হয় না।

গীতাবিষয়ক ব্যাকরণের এই লেখায় কোথাও কোথাও 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী'র 'ভৈমী ব্যাখ্যা' থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

(১০৬) গীতার ছন্দ

মুখ্যত্বেন তু গীতায়াং দ্বিধা ছন্দঃ প্রযুজ্যতে।
অনুষ্টুপ্ ত্রিষ্টুবিত্থং চ ভেদা হি বিবিধাস্তয়োঃ॥

ছন্দ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য

বর্ণোচ্চারণ মাত্রেই দুটি পার্থক্য হয়—লঘু (I) এবং গুরু (S)। যত গ্রন্থ আছে তা হয় গদ্যাত্মক বা পদ্যাত্মক অথবা উভয়াত্মক (গদ্য-পদ্য মিশ্রিত)।

পদ্যের নাম হল 'ছন্দ'। প্রত্যেক ছন্দের প্রায়শঃ চারটি চরণ (পাদ) হয়। ছন্দ তিন প্রকারের হয়—গণছন্দ (যেমন উপেন্দ্রবজ্রা ইত্যাদি), অক্ষরছন্দ (যেমন পথ্যাবক্ত্র ইত্যাদি) এবং মাত্রাছন্দ (যেমন আর্যা ইত্যাদি)। এর মধ্যে মাত্রাছন্দ গীতায় নেই ; সুতরাং এখানে তার আলোচনা করা হয়নি।

গণছন্দ এক অক্ষর থেকে ছাব্বিশ অক্ষর পর্যন্ত হয়, যার পৃথক্ পৃথক্ ছাব্বিশটি নাম আছে।

তিন অক্ষরের সমূহকে 'গণ' বলা হয়। আদি, মধ্য এবং অন্তের অক্ষরগুলির গুরু-লঘু বিচার দ্বারা গণগুলিকে আটভাগে ভাগ করা হয়। এর নাম এবং লক্ষণ এইপ্রকার—

আদি-মধ্যাবসানেষু য-র-তা যান্তি লাঘবম্।
ভ-জ-সা গৌরবং যান্তি ম-নৌ তু গুরুলাঘবম্॥

(পিঙ্গলছন্দঃ সূত্রম্ ১।৯)

আদি মধ্য অরু অন্ত লঘু য-র-ত-ভ-জ-স গুরু জান।
মগণ সর্ব গুরু লঘু নগণ ইহি বিধি গণ অঠ মান॥

সংখ্যা	গণ-নাম	চিহ্ন	লক্ষণ
১	যগণ	ISS	প্রথম অক্ষর লঘু, অন্য দুটি গুরু।
২	রগণ	SIS	দ্বিতীয় অক্ষর লঘু, অন্য দুটি গুরু।
৩	তগণ	SSI	তৃতীয় অক্ষর লঘু, অন্য দুটি গুরু।
৪	ভগণ	SII	প্রথম অক্ষর গুরু, শেষ দুটি লঘু।
৫	জগণ	ISI	দ্বিতীয় অক্ষর গুরু, প্রথম ও শেষ লঘু।
৬	সগণ	IIS	তৃতীয় অক্ষর গুরু, প্রথম দুটি লঘু।
৭	মগণ	SSS	তিন অক্ষরই গুরু।
৮	নগণ	III	তিন অক্ষরই লঘু।

কোন ছন্দের কতটা পার্থক্য হতে পারে, তা জানার প্রণালীকে 'প্রস্তার' বলা হয় অর্থাৎ উপরিউক্ত গণগুলির ক্রমানুলেখন প্রকারকেই 'প্রস্তার' বলে।

এক অক্ষরের ছন্দের প্রস্তারের দুটি ভেদ, দু অক্ষরের প্রস্তারের চারটি ভেদ এবং তিন অক্ষরের প্রস্তারের আটটি ভেদ হয়। এইপ্রকারে সংখ্যা বাড়তে থাকে অর্থাৎ ছন্দে এক অক্ষর বাড়লে আগের ছন্দের সংখ্যাতে প্রস্তারের দু'গুণ ভেদ হয়। এইপ্রকার গণছন্দের এক থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত অক্ষরে কয়েক কোটি ভেদ হয়ে যায়।

প্রস্তার লেখার কয়েক প্রকার বিধি আছে। তাতে দুটি প্রধান বিধি আছে। যেমন—

(১) তিন অক্ষর যুক্ত গণছন্দের প্রস্তার লিখতে হলে প্রথম পংক্তিতে (উপর থেকে নীচে) ক্রমশঃ একটি গুরু এবং একটি লঘু লিখতে হবে ; দ্বিতীয় পংক্তিতে ক্রমশঃ দুটি গুরু ও দুটি লঘু করে লিখতে হবে ; এবং তৃতীয় পংক্তিতে ক্রমশঃ চারটি গুরু এবং চারটি লঘু লিখতে হবে। এইপ্রকার তিন অক্ষর সম্পন্ন গণছন্দের প্রস্তারের আটটি ভেদ হয়ে যায়।

(২) **'গুরুর নীচে লঘু অঙ্ক, আগে নকল পিছে বঙ্ক'** অর্থাৎ তিন অক্ষর সম্পন্ন গণছন্দের প্রস্তার লিখতে হলে প্রথম পংক্তিতে (বাঁদিক থেকে ডানদিকে) ক্রমশঃ তিনটি গুরু লিখতে হবে। এখন পরের পংক্তিতে ওপরে প্রথমে

গুরুর নীচে লঘু লিখতে হবে ; আবার তার বাঁদিকে সমস্ত গুরু লিখতে হবে এবং ডানদিকে ওপরের মত (গুরু বা লঘু) লিখতে হবে। এইভাবে লিখতে লিখতে যখন সবই লঘু হবে, তখন (অষ্ট ভেদ পুরো হলে) প্রস্তার পুরো হবে।

উপরিউক্ত দুই বিধির দ্বারা ঠিক করা প্রস্তারের রূপ এইপ্রকার হবে—

SSS	ISS	SIS	IIS
SSI	ISI	SIS	III

প্রস্তারের সংখ্যা এবং রূপ ঠিক করার নিয়ম—যে ছন্দের প্রস্তারের সংখ্যা স্মরণে থাকে কিন্তু তার প্রস্তারের রূপ জানা নেই, সেই প্রস্তারের রূপ সৃষ্টির বিধিকে **'নষ্ট'** বলা হয়। যে ছন্দের প্রস্তারের রূপ স্মরণে থাকে আর প্রস্তারের সংখ্যা স্মরণে থাকে না, সেই প্রস্তার-সংখ্যা তৈরীর বিধিকে **'উদ্দিষ্ট'** বলা হয়।

'নষ্ট' বিধি (সংখ্যা দ্বারা রূপ সৃষ্টি)—**যেমন**, তিন অক্ষর যুক্ত ছন্দের ষষ্ঠ সংখ্যার রূপ তৈরী করতে হলে সর্বপ্রথম দেখতে হবে এর ছটি সংখ্যা সম অথবা বিষম। উদাহরণ—দুই, চার, ছয়, আট ইত্যাদি সংখ্যাগুলি **'সম'**। আর এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয় ইত্যাদি সংখ্যা **'বিষম'**। সম সংখ্যার নীচে লঘু (I) লিখতে হবে এবং বিষম সংখ্যার নীচে গুরু (S) লিখতে হবে। ছয় সংখ্যা সম, অতএব ছয়-এর নীচে লঘু লিখতে হবে। ছয়ের অর্ধেক তিন হয়, যেটি বিষম সংখ্যা ; অতএব তিনের নীচে গুরু লিখতে হয়। তিনের অর্ধেক দেড়। কিন্তু যেখানে সংখ্যা ভেঙ্গে যায়, সেখানে সেই সংখ্যায় আরও একটি যোগ করতে হয়। এখানে তিনের অর্ধেক করলে সংখ্যা ভেঙ্গে যায় সুতরাং তিনের সঙ্গে আরও এক যোগ করতে হয়, যাতে সংখ্যাটি চার হয়। চারের অর্ধেক দুই হয়, যেটি সমসংখ্যা, অতএব দুইয়ের নীচেই লঘু হবে। এইভাবে তিন অক্ষর সম্পন্ন সংখ্যার ছটি রূপ (প্রস্তার) দেখা যায় ৬ ৩ ২ ISI

এর অর্থ এই যে যতক্ষণ প্রস্তারের সম্পূর্ণ রূপ না দেখা যায়, ততক্ষণ ঐ সংখ্যার অর্ধেক করে যেতে হবে এবং সংখ্যা ভেঙ্গে গেলে তাতে এক যোগ করে তার অর্ধেক করে যেতে হবে।

'উদ্দিষ্ট' বিধি (রূপ দ্বারা সংখ্যা গঠন)—**যেমন**, তিন অক্ষর যুক্ত ছন্দের ISI—এই রূপের সংখ্যা বলতে গেলে এই রূপের ওপর ক্রমশঃ দ্বিগুণ সংখ্যা (যেমন ১,২,৪,৮,১৬ ইত্যাদি) লিখতে হবে ১ ২ ৪ ISI এখন এইরূপে (প্রস্তারে) যত লঘু আছে, সেই সবগুলির উপরের সংখ্যা যোগ করে তাতে আরও এক যোগ করতে হবে। এখানে লঘুর ওপর ১ এবং ৪ সংখ্যা আছে, যেটি জুড়লে ৫ সংখ্যা হয়। এই সংখ্যায় এক আরও যোগ করলে ছয় হয়। অতএব রূপ (প্রস্তার)-এর সংখ্যা হল ছয়।

এইপ্রকারে গণগুলি অনুযায়ী ছন্দের ভেদ হয়। এটি গণছন্দ লেখার রীতি বা প্রকার। ছন্দের আরও তিনটি ভাগ হয়—**সম**, অর্ধসম এবং বিষম। যে শ্লোকের চারটি চরণের ছন্দের লক্ষণ সমান হয় তাকে **'সম'** ছন্দ বলা হয়। যাতে প্রথম এবং তৃতীয় পংক্তি এক প্রকারের এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তি এক প্রকারের, এগুলিকে **'অর্ধসম'** ছন্দ বলা হয়। যাতে চারটি পংক্তির লক্ষণই পৃথক্ পৃথক্ হয়, তাকে **'বিষম'** বলা হয়।

এইসকল ছন্দই দু'প্রকারের হয়—লৌকিক এবং বৈদিক।

গীতায় প্রযুক্ত ছন্দের ওপর আলোচনা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পদাত্মক গ্রন্থ এবং ভগবদ্বাণী হওয়ায় এটি বেদস্বরূপ[1]। যদিও এটিতে বৈদিক ছন্দের

[1]'ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৭।১।২)—এই উপনিষদ্-বাক্যানুসারে যদিও মহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলা হয়, তবুও মহাভারত এবং তার অন্তর্গত গীতার পড়ার বা শোনার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে। মানুষ যে কোন দেশ, বেশ, সম্প্রদায়, জাতির হোক না কেন সে মহাভারত অধ্যয়ন করে তার উত্তমোত্তম উপদেশগুলির যথাধিকার আচরণ করে নিজ কল্যাণ সাধন করতে পারে। মহর্ষি বেদব্যাসের মহাভারত রচনা করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই যে যারা শাস্ত্র, বেদ পড়বার অধিকারী নয় সেইসকল নারী, শূদ্র এবং পতিত ব্যক্তিগণ যাতে বেদের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত না হন। এই জ্ঞান ভগবানের দেওয়া গীতার সাররূপে বর্ণিত। ভগবান স্বয়ং গীতাতে জানিয়েছেন যে স্ত্রীজাতি, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি সকলেই (নিজ শরণাগতির দ্বারা) পরমগতি প্রাপ্তির অধিকারী (৯।৩২) এবং গীতা অধ্যয়নেও ('যঃ' পদদ্বারা) সকলের অধিকার আছে বলে স্বীকার করা হয়েছে (১৮।৭০)।

নিয়মই প্রযোজ্য এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এর সম্বন্ধে কোন বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন নেই, তবুও লৌকিক দৃষ্টিতেও এর আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথমে বলা হয়েছে গীতায় গণছন্দ এবং অক্ষরছন্দ—এই দু'প্রকারের ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে।

এক অক্ষর থেকে ছাব্বিশ অক্ষর পর্যন্ত ছন্দগুলির ছাব্বিশটি নাম। তার মধ্যে শুধু চারটি ছন্দ গীতায় ব্যবহৃত হয়েছে।

১) আট অক্ষরযুক্ত **'অনুষ্টুপ্'** ছন্দ।

২) নয় অক্ষরযুক্ত **'বৃহতী'** ছন্দ।

৩) এগার অক্ষরযুক্ত **'ত্রিষ্টুপ্'** ছন্দ।

৪) বার অক্ষরযুক্ত **'জগতী'** ছন্দ।

এর মধ্যে নয় অক্ষরযুক্ত **'বৃহতী'** ছন্দের একটিই চরণ গীতায় ব্যবহৃত হয়েছে—একাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের প্রথম চরণ। এইরূপ বার অক্ষরযুক্ত **'জগতী'** ছন্দেরও পাঁচটি চরণ গীতায় ব্যবহৃত হয়েছে—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের প্রথম এবং দ্বিতীয় চরণ এবং ঊনত্রিশ সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ; অষ্টম অধ্যায়ের দশম শ্লোকের চতুর্থ চরণ এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের প্রথম চরণ।

বৈদিক দৃষ্টিতে ছন্দের নিয়ম হচ্ছে—**'ঊনাধিকেনৈকেন নিচৃদ্‌ভুরিজৌ'** (পিঙ্গল. ৩।৫৯) অর্থাৎ এক অক্ষর কম হলে তার **'নিচৃৎ'** এবং এক অক্ষর বেশী হলে **'ভুরিক্'** সংজ্ঞা হয়ে ছন্দের আগের সংজ্ঞাই থেকে যায়। এই অনুযায়ী নয় অক্ষরযুক্ত বৃহতী ছন্দের এক চরণ আট অক্ষরযুক্ত অনুষ্টুপ্ ছন্দে এবং দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত জগতী ছন্দের পাঁচ চরণ একাদশ অক্ষরযুক্ত **'ত্রিষ্টুপ্'** ছন্দে সম্মিলিত হয়ে যায়। সুতরাং বৈদিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় গীতায় দুই প্রকারের ছন্দই আছে—অনুষ্টুপ্ ও ত্রিষ্টুপ্।

সম্পূর্ণ গীতাতে সাতশত শ্লোক আছে। এর মধ্যে ছয়শত পঁয়তাল্লিশটি শ্লোক **'অনুষ্টুপ্'** ছন্দে এবং পঞ্চান্নটি শ্লোক **'ত্রিষ্টুপ্'** ছন্দে রচিত।

অনুষ্টুপ্ ছন্দ

অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রত্যেক চরণে আট অক্ষর হয় এবং সম্পূর্ণ শ্লোকটি বত্রিশ অক্ষরে রচিত।

অনুষ্টুপ্ ছন্দের দুটি ভাগ থাকে—অনুষ্টুপ্ গণছন্দ ও অনুষ্টুপ্ অক্ষরছন্দ। প্রস্তারভেদে অনুষ্টুপ্ গণছন্দের দুইশত ছাপ্পান্নটি ভাগ হয় এবং অনুষ্টুপ্ অক্ষরছন্দের কয়েক লাখ ভাগ হয়। গীতাতে **'অনুষ্টুপ্ গণছন্দ'** নেই। ছন্দগুলির—সম, অর্ধসম ও বিষম—এই তিন ভাগ সম্বন্ধে প্রথমে যা বলা হয়েছে, তার মধ্যে গীতার অনুষ্টুপ্ ছন্দের মধ্যে **'অর্ধসম'** ছন্দ প্রযুক্ত হয়েছে।

ছন্দঃশাস্ত্রে এই অর্ধসম অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রথম এবং অষ্টম অক্ষরগুলির উপর কোন বিচার বিবেচনা করা হয়নি; সেগুলি গুরু বা লঘু যাই হোক—দুই ছন্দকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে। চারটি চরণে প্রথম অক্ষরের পরে (দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অক্ষরের গণ) 'সগণ' এবং 'নগণ' হওয়া উচিত নয়—**'ন প্রথমাৎ স্নৌ'** (পিঙ্গল. ৫।১১) এবং দ্বিতীয় তথা চতুর্থ চরণগুলিতে প্রথম অক্ষরের পরে (দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অক্ষরের গণ) 'রগণ'ও না হওয়া উচিত—**'দ্বিতীয়চতুর্থয়োঃ রশ্চ'** (পিঙ্গল. ৫।১২)।

যদি চার চরণের চতুর্থ অক্ষরের পর 'যগণ' হয়, তাহলে ঐ শ্লোকটির ছন্দের নাম 'অনুষ্টুব্‌বক্ত্র' হয়—'যশ্চতুর্থাৎ' (পিঙ্গল. ৫।১৪), **'পাদস্যানুষ্টুব্‌বক্ত্রম্'** (পিঙ্গল. ৫।১০)।

যদি প্রথম এবং তৃতীয় চরণের চতুর্থ অক্ষরের পরে 'যগণ' এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের চতুর্থ অক্ষরের পরে 'জগণ' হয়, তাহলে তার **'পথ্যাবক্ত্র'** সংজ্ঞা হবে—**'পথ্যা যুজো জ্'** (পিঙ্গল ৫।১৫) **'যুজোর্জেন সরিদ্ভর্তুঃ পথ্যাবক্ত্রং প্রকীর্তিতম্'** (বৃত্তরত্নাকর ২।২২)। এটিকে 'অর্ধসম' ছন্দ বলে।

গীতায় এই অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোকগুলির দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণগুলির চতুর্থ অক্ষর ছাড়া সমস্ত স্থানেই **'জগণ'** যুক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রথম এবং তৃতীয় চরণগুলিতে কয়েকটি শ্লোকে **'যগণ'**-এর স্থানে অন্য গণও ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের জন্য নিয়ম হচ্ছে এই যে; এইপ্রকার যে গণযুক্ত হয়, সেইসব নামের শুরুতে অক্ষরের সঙ্গে **'বিপুলা'** সংজ্ঞা মানতে হবে। যদি প্রথম চরণে বা তৃতীয় চরণে অথবা প্রথম ও তৃতীয়—দুটি চরণেই **'যগণ'**-এর অতিরিক্ত দ্বিতীয় গণ হয়, তাহলে সেই শ্লোক ঐ গণের নাম দ্বারা যুক্ত বিপুলান্ত সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দের হয়। গীতায় এইরূপ ন-বিপুলা, ভ-বিপুলা, র-বিপুলা, ম-বিপুলা

এবং স-বিপুলা ছন্দের প্রয়োগ ঘটেছে। এর অন্তর্গত আর একটি নিয়ম আছে—যদি কেবল প্রথম ও তৃতীয় কোন এক চরণে 'যগণ'- এর অতিরিক্ত দ্বিতীয় গণ হয়, তাহলে তা **'ব্যক্তিপক্ষ-বিপুলা'**, দুটি চরণে ('যগণ'-এর অতিরিক্ত) একপ্রকার গণ হলে তা সেই **'জাতিপক্ষ-বিপুলা'** এবং দুটি চরণে ('যগণ'-এর অতিরিক্ত) পৃথক্ পৃথক্ গণ হলে, তাকে **'সঙ্কীর্ণ-বিপুলা'** ছন্দ বলা হয়। এ সমস্ত **'পথ্যাবক্ত্র'**-এরই অবান্তর (গৌণ) ভাগ।

গীতায় অনুষ্টুপ্ ছন্দের ছয়শত পঁয়তাল্লিশ শ্লোকে পাঁচশত সাতটি শ্লোক ঠিকঠিক 'পথ্যাবক্ত্র'-এর লক্ষণযুক্ত। এর মধ্যে প্রথম এবং তৃতীয় চরণে 'যগণ' যুক্ত হয়েছে ; অতএব একে **'য-বিপুলা'**ও বলা যায়—'য-বিপুলা যকারোঽব্ধেঃ' (বাধাভ)। শেষ একশো আটত্রিশ শ্লোকের মধ্যে (১) একশত সাতাশ শ্লোকের প্রথম বা তৃতীয় কোন এক চরণে 'যগণ'-এর অতিরিক্ত গণ প্রযুক্ত হয়েছে, সেগুলি **'ব্যক্তিপক্ষ-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত শ্লোক, (২) তিনটি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় চরণগুলিতে ('যগণ'-এর অতিরিক্ত) একই প্রকারের অন্য গণ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি **'জাতিপক্ষ-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত শ্লোক এবং (৩) আটটি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় চরণে ('যগণ'-এর অতিরিক্ত) পৃথক্ পৃথক্ গণ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি **'সঙ্কীর্ণ-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত শ্লোক।

নিম্নলিখিত তালিকাতে কোন শ্লোকে কি বিপুলা হয়েছে, তা অধ্যায় ক্রমে দেখানো হচ্ছে—

'ব্যক্তিপক্ষ-বিপুলা' সংজ্ঞাযুক্ত ১২৭ শ্লোকের তালিকা

[যার মধ্যে প্রথম বা তৃতীয় কোন এক চরণে 'নগণ', 'ভগণ', 'রগণ', 'মগণ' এবং 'সগণ' যুক্ত হয়েছে।]

অধ্যায়	শ্লোক	ছন্দের নাম		শ্লোক-প্রতীক
		প্রথম চরণ	তৃতীয় চরণ	
১	৫	র-বিপুলা	—	ধৃষ্টকেতু.
,,	৯	—	ন-বিপুলা	অন্যে চ.
,,	২৫	ন-বিপুলা	—	ভীষ্মদ্রোণ.
,,	৩৩	র-বিপুলা	—	যেষামর্থে.
,,	৪৩	—	র-বিপুলা	দোষৈরেতৈঃ.
২	২	ন-বিপুলা	—	কুতস্ত্বা.
,,	১২	র-বিপুলা	—	ন ত্বেবাহং.
,,	২৬	র-বিপুলা	—	অথ চৈনং.
,,	৩১	—	ম-বিপুলা	স্বধর্মমপি.
,,	৩২	র-বিপুলা	—	যদৃচ্ছয়া.
,,	৩৬	ভ-বিপুলা	—	অবাচ্য.
,,	৪৬	স-বিপুলা	—	যাবানর্থ.
২	৫২	ন-বিপুলা	—	যদা তে.
,,	৫৬	ভ-বিপুলা	—	দুঃখেষনু.
,,	৬১	—	র-বিপুলা	তানি সর্বাণি.
,,	৬৩	—	র-বিপুলা	ক্রোধাদ্ভবতি.
,,	৬৭	ন-বিপুলা	—	ইন্দ্রিয়াণাং.

অধ্যায়	শ্লোক	ছন্দের নাম		শ্লোক-প্রতীক
		প্রথম চরণ	তৃতীয় চরণ	
২	৭১	ম-বিপুলা	—	বিহায় কামান্.
৩	১	র-বিপুলা	—	জ্যায়সী.
,,	৫	ন-বিপুলা	—	ন হি কশ্চিৎ.
,,	৮	—	ভ-বিপুলা	নিয়তং কুরু.
,,	১১	—	র-বিপুলা	দেবান্ ভাব.
,,	১৯	ভ-বিপুলা	—	তস্মাদসক্তঃ.
,,	২১	—	ভ-বিপুলা	যদ্যদাচরতি.
,,	২৬	ভ-বিপুলা	—	ন বুদ্ধিভেদং.
,,	৩৫	ভ-বিপুলা	—	শ্রেয়ান্ স্ব.
,,	৩৭	র-বিপুলা	—	কাম এষ ক্রোধ.
৪	২	—	ন-বিপুলা	এবং পরম্পরা.
,,	৬	র-বিপুলা	—	অজোঽপি.
,,	১০	—	ন-বিপুলা	বীতরাগভয়.
,,	১৩	—	ন-বিপুলা	চাতুর্বর্ণ্যং.
,,	২৪	ভ-বিপুলা	—	ব্রহ্মার্পণং.
,,	৩০	—	ভ-বিপুলা	অপরে নিয়তা.
,,	৩১	ন-বিপুলা	—	যজ্ঞশিষ্টামৃত.
,,	৩৮	ন-বিপুলা	—	ন হি জ্ঞানেন.
,,	৪০	—	ন-বিপুলা	অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধান.
৫	১৩	ন-বিপুলা	—	সর্বকর্মাণি.
,,	২২	—	ম-বিপুলা	যে হি সংস্পর্শজা.
,,	২৯	ন-বিপুলা	—	ভোক্তারং যজ্ঞ.
৬	১	ভ-বিপুলা	—	অনাশ্রিতঃ.
,,	১০	ন-বিপুলা	—	যোগী যুঞ্জীত.
,,	১১	—	র-বিপুলা	শুচৌ দেশে.
,,	১৪	ন-বিপুলা	—	প্রশান্তাত্মা.
,,	১৫	—	ন-বিপুলা	যুঞ্জন্নেবং.
,,	২৫	ন-বিপুলা	—	শনৈঃ শনৈঃ.
,,	২৬	ভ-বিপুলা	—	যতো যতো.
,,	২৭	—	ন-বিপুলা	প্রশান্তমনসং.
,,	৩৬	—	ন-বিপুলা	অসংযতাত্মনা.
,,	৪২	—	ন-বিপুলা	অথবা যোগি.
৭	৬	—	ন-বিপুলা	এতদ্যোনীনি.

অধ্যায়	শ্লোক	ছন্দের নাম		শ্লোক-প্রতীক
		প্রথম চরণ	তৃতীয় চরণ	
৭	১১	—	ম-বিপুলা	বলং বলবতাং.
,,	১৪	ন-বিপুলা	—	দৈবী হ্যেষা.
,,	১৭	র-বিপুলা	—	তেষাং জ্ঞানী.
,,	১৯	—	ভ-বিপুলা	বহূনাং জন্মনা.
,,	২৫	ম-বিপুলা	—	নাহং প্রকাশঃ.
,,	৩০	—	ভ-বিপুলা	সাধিভূতাদি.
৮	২	—	ভ-বিপুলা	অধিযজ্ঞঃ.
,,	১৪	ভ-বিপুলা	—	অনন্যচেতাঃ.
,,	২৪	—	ম-বিপুলা	অগ্নির্জ্যোতি.
,,	২৭	র-বিপুলা	—	নৈতে সৃতী.
৯	২	র-বিপুলা	—	রাজবিদ্যা.
,,	৩	ভ-বিপুলা	—	অশ্রদ্দধানাঃ.
,,	১০	ভ-বিপুলা	—	ময়াধ্যক্ষেণ.
,,	১৩	—	ন-বিপুলা	মহাত্মানস্তু.
,,	১৭	ন-বিপুলা	—	পিতাহমস্য.
,,	২৬	—	ন-বিপুলা	পত্রং পুষ্পং ফলং.
১০	২	ন-বিপুলা	—	ন মে বিদুঃ.
,,	৫	—	ম-বিপুলা	অহিংসা সমতা.
,,	৬	র-বিপুলা	—	মহর্ষয়ঃ.
,,	৭	ম-বিপুলা	—	এতাং বিভূতিং.
,,	৮	ভ-বিপুলা	—	অহং সর্বস্য.
,,	২৫	ন-বিপুলা	—	মহর্ষীণাং.
,,	২৬	—	ভ-বিপুলা	অশ্বত্থঃ সর্ব.
,,	৩২	—	ম-বিপুলা	সর্গাণামাদি.
১১	১	ভ-বিপুলা	—	মদনুগ্রহায়.
,,	১১	ন-বিপুলা	—	দিব্যমাল্যাম্বর.
,,	৫৩	ন-বিপুলা	—	নাহং বেদৈর্ন.
,,	৫৫	ভ-বিপুলা	—	মৎকর্মকৃন্ম.
১২	৯	—	ভ-বিপুলা	অথ চিত্তং.
,,	১৯	—	ন-বিপুলা	তুল্যনিন্দা.
১৩	১	ম-বিপুলা	—	ইদং শরীরং.
,,	১৭	—	র-বিপুলা	জ্যোতিষামপি.
,,	১৮	—	ম-বিপুলা	ইতি ক্ষেত্রং.

অধ্যায়	শ্লোক	ছন্দের নাম		শ্লোক-প্রতীক
		প্রথম চরণ	তৃতীয় চরণ	
,,	২৩	ন-বিপুলা	—	য এবং বেত্তি.
,,	৩১	র-বিপুলা	—	অনাদিত্বান্নি.
১৪	৫	ন-বিপুলা	—	সত্ত্বং রজস্তম.
,,	৬	র-বিপুলা	—	তত্র সত্ত্বং.
,,	১০	র-বিপুলা	—	রজস্তমশ্চা.
,,	১৫	—	ভ-বিপুলা	রজসি প্রলয়ং.
,,	১৭	—	ভ-বিপুলা	সত্ত্বাৎ সংজায়তে.
,,	১৯	ম-বিপুলা	—	নান্যং গুণেভ্যঃ.
১৫	৯	র-বিপুলা	—	শ্রোত্রং চক্ষুঃ.
,,	১৮	—	ম-বিপুলা	যস্মাৎ ক্ষর.
,,	১৯	—	ন-বিপুলা	যো মামেব.
,,	২০	—	র-বিপুলা	ইতি গুহ্যতমং.
১৬	৬	ম-বিপুলা	—	দ্বৌ ভূতসর্গৌ.
,,	১০	—	ম-বিপুলা	কামমাশ্রিত্য.
,,	১১	—	ন-বিপুলা	চিন্তামপরি.
,,	১৩	—	ন-বিপুলা	ইদমদ্য ময়া.
,,	১৯	—	ন-বিপুলা	তানহং দ্বিষতঃ.
,,	২২	ম-বিপুলা	—	এতৈর্বিমুক্তঃ.
১৭	১০	ন-বিপুলা	—	যাতযামং.
,,	১১	—	ভ-বিপুলা	অফলাকাঙ্ক্ষি.
,,	১২	ন-বিপুলা	—	অভিসন্ধায়.
,,	১৬	ম-বিপুলা	—	মনঃপ্রসাদঃ.
,,	১৯	র-বিপুলা	—	মূঢ়গ্রাহেণা.
,,	২২	ম-বিপুলা	—	অদেশকালে.
,,	২৫	—	ন-বিপুলা	তদিত্যনভি.
,,	২৬	—	ন-বিপুলা	সদ্ভাবে সাধু.
১৮	১২	ম-বিপুলা	—	অনিষ্টমিষ্টং.
,,	১৩	—	ম-বিপুলা	পঞ্চৈতানি.
১৮	২৩	ন-বিপুলা	—	নিয়তং সঙ্গ.
,,	২৬	—	র-বিপুলা	মুক্তসঙ্গঃ.
,,	৩২	ন-বিপুলা	—	অধর্মং.
,,	৩৩	ভ-বিপুলা	—	ধৃত্যা যয়া.
,,	৩৬	ভ-বিপুলা	—	সুখং ত্বিদানীং.

অধ্যায়	শ্লোক	ছন্দের নাম		শ্লোক-প্রতীক
		প্রথম চরণ	তৃতীয় চরণ	
১৮	৩৭	ন-বিপুলা	—	যত্তদগ্রে বিষ.
,,	৩৮	—	ন-বিপুলা	বিষয়েন্দ্রিয়.
,,	৪১	ন-বিপুলা	—	ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়.
,,	৪৫	ন-বিপুলা	—	স্বে স্বে কর্মণ্য.
,,	৪৬	ম-বিপুলা	—	যতঃ প্রবৃত্তিঃ.
,,	৪৭	ভ-বিপুলা	—	শ্রেয়ান্ স্ব.
,,	৫২	ম-বিপুলা	—	বিবিক্তসেবী.
,,	৫৬	ন-বিপুলা	—	সর্বকর্মাণ্যপি.
,,	৬৪	—	ন-বিপুলা	সর্বগুহ্যতমং.
,,	৭০	ন-বিপুলা	—	অধ্যেষ্যতে.
,,	৭৫	ভ-বিপুলা	—	ব্যাসপ্রসাদাৎ.

'জাতিপক্ষ-বিপুলা' সংজ্ঞাযুক্ত ৩টি শ্লোকের তালিকা

(যার প্রথম ও তৃতীয়—দুটি চরণে একই প্রকারের গণ প্রয়োগ হয়েছে।)

অধ্যায়	শ্লোক	প্রথম চরণ	তৃতীয় চরণ	শ্লোক-প্রতীক
২	৩৫	ন-বিপুলা	ন-বিপুলা	ভয়াদ্রণা.
৮	৩	ন-বিপুলা	ন-বিপুলা	অক্ষরং.
১৫	৭	র-বিপুলা	র-বিপুলা	মমৈবাংশো.

'সংকীর্ণ-বিপুলা' সংজ্ঞাযুক্ত ৮টি শ্লোকের তালিকা

(যার প্রথম ও তৃতীয়—দুটি চরণে পৃথক্-পৃথক্ গণ প্রয়োগ হয়েছে।)

অধ্যায়	শ্লোক	প্রথম চরণ	তৃতীয় চরণ	শ্লোক-প্রতীক
২	৪৩	ভ-বিপুলা	ন-বিপুলা	কামাত্মানঃ.
৩	৭	ন-বিপুলা	র-বিপুলা	যস্ত্বিন্দ্রি.
৯	১	ভ-বিপুলা	ন-বিপুলা	ইদং তু তে.
১১	১০	ন-বিপুলা	ভ-বিপুলা	অনেকবক্ত্র.
১২	২০	ন-বিপুলা	ভ-বিপুলা	যে তু ধর্ম্যা.
১৪	৯	ভ-বিপুলা	ন-বিপুলা	সত্ত্বং সুখে.
১৭	৩	ম-বিপুলা	ভ-বিপুলা	সত্ত্বানুরূপা.
১৮	৪৯	ম-বিপুলা	ভ-বিপুলা	অসক্তবুদ্ধিঃ.

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের প্রত্যেক চরণে এগারটি অক্ষর হয় এবং সম্পূর্ণ শ্লোকটি চুয়াল্লিশ অক্ষরের হয়। প্রস্তারে এটি দু-হাজার আটচল্লিশ প্রকার হয় ; কিন্তু এর সব নাম পাওয়া যায় না। ছন্দ-গ্রন্থ 'বাম্বল্লভ'-এ এই প্রকারের শুধুমাত্র একশত বারোটি নাম দেওয়া হয়েছে। গীতায় ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, শালিনী, ঈহামৃগী, প্রাকারবন্ধ, বাতোর্মী, সংশ্রয়শ্রী, গুণাঙ্গী ইত্যাদি ছন্দ প্রযুক্ত

হয়েছে। দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত জগতী ছন্দকে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দেই মানা হয়েছে, তারও একটি চরণ 'বংশস্থ' ছন্দে প্রযুক্ত হয়েছে। এর স্বরূপ এবং লক্ষণ এই প্রকার—

প্রস্তার সংখ্যা	ছন্দ-নাম	রূপ	লক্ষণ	প্রমাণ
৩৫৭	ইন্দ্রবজ্রা	SSI SSI ISI SS	স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌগঃ	বৃত্তরত্নাকর
৩৫৮	উপেন্দ্রবজ্রা	ISI SSI ISI SS	উপেন্দ্রবজ্রা জতজাস্ততো গৌ	,,
২৮৯	শালিনী	SSS SSI SSI SS	শালিন্যুক্তা ম্তৌ তগৌ গোঽব্ধিলোকৈঃ	,,
৩০৯	ঈহামৃগী	SSI SII SSI SS	ঈহামৃগী কিল চেত্তো ভতৌ গৌ	বাণভট্ট
২৯৩	প্রাকারবন্ধ	SSI SSI SSI SS	প্রাকারবন্ধস্তকারত্রয়ং গৌ	,,
৩০৫	বাতোর্মী	SSS SII SSI SS	বাতোর্মীয়ং কথিতাম্ভৌ তগৌ গঃ	বৃত্তরত্নাকর
১৩১৭	সংশ্রয়শ্রী	SSI SSI SSI SI	তাঃ স্যুস্ত্রয়ঃ সংশ্রয়শ্রীর্গলৌ চ	বাণভট্ট
৩৫৩	গুণাঙ্গী	SSS SSI ISI SS	ম্তৌ জগৌগঃ স্যাদব্ধির্নগগুণাঙ্গী	কাব্যমালা
১৩৮২	বংশস্থ	ISI SSI ISI SIS	জতৌ তু বংশস্থমুদীরিতং জরৌ	বৃত্তরত্নাকর
৬১০	রাধা	ISS SSI ISS ISS	যতৌ যৌ রাধা শরলোকৈ যতিঃ স্যাৎ	[1]
৬২৯	গঙ্গা	SSI SII ISS ISS	গঙ্গা তভৌ যযুগলা পূর্ববৎ স্যাৎ	,,
৭৫৭	রতি	SSI SII IIS ISS	বেদোরগৈস্তভসযুগ্ রতিঃ স্যাৎ	,,
৭৫৮	গতি	ISI SII IIS ISS	যুগোরগৈর্জভসযযুগ্ গতিঃ স্যাৎ	,,
২৯০	বিশাখা	ISS SSI SSI SS	বিশাখোক্তা যতৌ তগৌ গোঽব্ধিলোকৈঃ	,,
২৯৪	যশোদা	ISS SSI SSI SS	জতৌ তগৌ গোঽব্ধিকৈর্যশোদা	,,
৩০৬	ললিতা	ISS SII SSI SS	যভৌ তগৌ গো ললিতা সাঽব্ধিলোকৈঃ	,,
৩১০	শারদা	ISI SII SSI SS	জভৌ তগৌ গ-যুতা শারদা চ	,,
৩৩৭	চিত্রা	SSS SIS ISI SS	চিত্রা প্রোক্তাঃ মরৌ জগৌ গ-যুক্তা	,,
৩৭৩	ইষ্ট	SSI SII ISI SS	বাণর্তুভিস্তভজগা গ ইষ্টম্	,,
৩৭৪	ঈষ	ISI SII ISI SS	শরর্তুভির্জভজগা গ ঈষম্	,,

বৈদিক এবং লৌকিক—দুই দৃষ্টিতেই একাদশ অক্ষর সমন্বিত সমস্ত ছন্দই ত্রিষ্টুপ্।

কোন শ্লোকে এক, দুই, তিন অথবা চার চরণের ভিন্ন ভিন্ন জাতির ছন্দ হলে, তাকে 'উপজাতি' ছন্দ বলা হয়।

উপজাতি ছন্দ

(১) যে শ্লোকের কোন চরণ ইন্দ্রবজ্রা আর কোনটি উপেন্দ্রবজ্রার লক্ষণযুক্ত হয়, তাকে মুখ্য উপজাতি ছন্দ বলা হয়। এর চৌদ্দটি ভাগ হয়—

চেদিন্দ্রবজ্রাচরণানি যস্যামুপেন্দ্রবজ্রাচরণানি চ স্যুঃ
তদোপজাতিঃ কথিতা কবীন্দ্রৈর্ভেদা ভবন্তীহ চতুর্দশাস্যাঃ।

(বাণভট্টঃ)

(২) যে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ হয়, এরূপ ছন্দের সংজ্ঞাও উপজাতি হয়—

ইত্থং কিলান্যাস্বপি মিশ্রিতাসু স্মরন্তি জাতিষ্বিদমেব নাম।

(বৃত্তরত্নাকর ৩।৩১)

(৩) বিষম অক্ষরযুক্ত ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতীর মিলনে এর সংজ্ঞাকেও উপজাতি বলা হয়েছে। প্রাচীন আচার্যগণ একে 'গাথা' নামে অভিহিত করেছেন—

[1] প্রাচীন ছন্দ-গ্রন্থে এই ছন্দের নাম জানতে পারা যায়নি ; তাই এদের নাম ও লক্ষণ মহাকবি শ্রীবনমালী দাস শাস্ত্রী দ্বারা তৈরী করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

'আদ্যন্তবাবুজাতয়ঃ' (পিঙ্গল. ৬।২৩)

এই সূত্রের ওপর 'হলায়ুধ-বৃত্তি' এবং তার ওপর শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগরের টীকা 'সুবোধিনী'তে লেখা আছে—

তত্রোপজাতিবিবিধা বিদগ্ধৈঃ সংযোজ্যতে তু ব্যবহারকালে।

গীতায় এইপ্রকার ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের পঞ্চান্নটি শ্লোক আছে। তার মধ্যে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের তিন, উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের তিন, ইন্দ্রবজ্রা-উপেন্দ্রবজ্রা-মিশ্রিত মুখ্য উপজাতির পনেরো এবং ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ-মিশ্রিত উপজাতির চৌত্রিশটি শ্লোক আছে। নীচের তালিকায় এইসব শ্লোক দেখানো হল—

ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের তিন শ্লোক

অধ্যায়	শ্লোক	শ্লোক-প্রতীক
৮	২৮	বেদেষু যজ্ঞেষু.
১৫	৫	নির্মানমোহা.
১৫	১৫	সর্বস্য চাহং.

উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের তিন শ্লোক

অধ্যায়	শ্লোক	শ্লোক-প্রতীক
১১	২৮	যথা নদীনাং.
১১	২৯	যথা প্রদীপ্তং.
১১	৪৫	অদৃষ্টপূর্বং.

ইন্দ্রবজ্রা-উপেন্দ্রবজ্রা-মিশ্রিত মুখ্য উপজাতির পনেরোটি শ্লোক

অধ্যায়	শ্লোক	ছন্দের নাম				শ্লোক-প্রতীক
		প্রথম চরণ	দ্বিতীয় চরণ	তৃতীয় চরণ	চতুর্থ চরণ	
২	৮	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	ন হি প্রপশ্যামি.
,,	২২	ইন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	বাসাংসি জীর্ণানি.
১১	১৫	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	পশ্যামি দেবাং.
,,	১৯	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	অনাদিমধ্যান্ত.
,,	২৪	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	নভঃস্পৃশং.
,,	২৫	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	দ্রংষ্টাকরালানি.
,,	৩৪	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	দ্রোণং চ ভীষ্মং.
,,	৩৬	ইন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	স্থানে হৃষীকেশ.
,,	৩৮	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	ত্বমাদিদেবঃ.
,,	৩৯	ইন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	বায়ুর্যমোঽগ্নিঃ.
,,	৪০	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	নমঃ পুরস্তাদথ.
,,	৪২	ইন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	যচ্চাবহাসার্থ.

অধ্যায়	শ্লোক	ছন্দের নাম				শ্লোক-প্রতীক
		প্রথম চরণ	দ্বিতীয় চরণ	তৃতীয় চরণ	চতুর্থ চরণ	
১১	৪৩	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	পিতাসি লোকস্য.
,,	৪৪	ইন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	তস্মাৎ প্রণম্য.
,,	৪৭	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	ময়া প্রসন্নেন.

ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দ-মিশ্রিত উপজাতির চৌত্রিশটি শ্লোক

অধ্যায়	শ্লোক	ছন্দের নাম				শ্লোক-প্রতীক
		প্রথম চরণ	দ্বিতীয় চরণ	তৃতীয় চরণ	চতুর্থ চরণ	
২	৫	উপেন্দ্রবজ্রা	গুণাঙ্গী	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	গুরূনহত্বা.
,,	৬	রাধা	গঙ্গা	ইন্দ্রবজ্রা	ঈহামৃগী	ন চৈতদ্বিদ্মঃ.
,,	৭	ইন্দ্রবজ্রা	শালিনী	শালিনী	শালিনী	কার্পণ্যদোষো.
,,	২০	শারদা	বাতোর্মী	বিশাখা	যশোদা	ন জায়তে.
,,	২৯	ইন্দ্রবজ্রা	রতি	সংশ্রয়শ্রী	গুণাঙ্গী	আশ্চর্যবৎ পশ্যতি.
,,	৭০	ইষ্ট	উপেন্দ্রবজ্রা	গুণাঙ্গী	উপেন্দ্রবজ্রা	আপূর্যমাণ.
৮	৯	ঈষ	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	কবিং পুরাণ.
,,	১০	উপেন্দ্রবজ্রা	গুণাঙ্গী	বিশাখা	গতি	প্রয়াণকালে.
,,	১১	উপেন্দ্রবজ্রা	শারদা	বিশাখা	প্রাকারবন্ধ	যদক্ষরং বেদবিদো.
৯	২০	শালিনী	শালিনী	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	ত্রৈবিদ্যা মাং.
,,	২১	শালিনী	শালিনী	ইন্দ্রবজ্রা	যশোদা	তে তং ভুক্ত্বা.
১১	১৬	উপেন্দ্রবজ্রা	শালিনী	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	অনেকবাহু.
,,	১৭	শারদা	শালিনী	শালিনী	ইন্দ্রবজ্রা	কিরীটিনং গদিনং.
,,	১৮	শারদা	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	ত্বমক্ষরং পরমং.
,,	২০	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	প্রাকারবন্ধ	ইন্দ্রবজ্রা	দ্যাবাপৃথিব্যৌ.
,,	২১	ললিতা	গুণাঙ্গী	চিত্রা	ললিতা	অমী হি ত্বাং.
,,	২২	বাতোর্মী	ঈহামৃগী	ইন্দ্রবজ্রা	শালিনী	রুদ্রাদিত্যা.
,,	২৩	ইন্দ্রবজ্রা	ললিতা	শারদা	গুণাঙ্গী	রূপং মহত্তে.
,,	২৬	ললিতা	ইন্দ্রবজ্রা	শালিনী	উপেন্দ্রবজ্রা	অমী চ ত্বাং.
,,	২৭	ঈহামৃগী	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	শালিনী	বক্ত্রাণি তে.
,,	৩০	ঈহামৃগী	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	লেলিহ্যসে.

অধ্যায়	শ্লোক	ছন্দের নাম				শ্লোক-প্রতীক
		প্রথম চরণ	দ্বিতীয় চরণ	তৃতীয় চরণ	চতুর্থ চরণ	
১১	৩১	প্রাকারবন্ধ	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	আখ্যাহি মে.
,,	৩২	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	ললিতা	প্রাকারবন্ধ	কালোঽস্মি.
,,	৩৩	ইন্দ্রবজ্রা	শালিনী	ললিতা	উপেন্দ্রবজ্রা	তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ.
,,	৩৫	বাতোর্মী	যশোদা	বিশাখা	যশোদা	এতচ্ছ্রুত্বা.
,,	৩৭	ঈহামৃগী	যশোদা	উপেন্দ্রবজ্রা	শারদা	কস্মাচ্চ তে.
,,	৪১	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	শারদা	উপেন্দ্রবজ্রা	সখেতি মত্বা.
,,	৪৬	শারদা	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	কিরীটিনং গদিনং.
,,	৪৮	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	গুণাঙ্গী	ইন্দ্রবজ্রা	ন বেদযজ্ঞা.
,,	৪৯	ইন্দ্রবজ্রা	শালিনী	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	মা তে ব্যথা.
,,	৫০	প্রাকারবন্ধ	বিশাখা	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	ইত্যর্জুনং.
১৫	২	ললিতা	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	অধশ্চোর্দ্ধং.
,,	৩	বংশস্থ	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	ন রূপমস্যেহ.
,,	৪	উপেন্দ্রবজ্রা	ঈহামৃগী	উপেন্দ্রবজ্রা	উপেন্দ্রবজ্রা	ততঃ পদং.

নোট—(১) দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ জগতী ছন্দের, শেষ চরণ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের।

(২) দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ জগতী ছন্দের, শেষটি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের।

(৩) অষ্টম অধ্যায়ের দশম শ্লোকের চতুর্থ চরণ জগতী ছন্দের, শেষ চরণ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের।

(৪) পঞ্চদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে প্রথম চরণ জগতী ছন্দের, শেষ চরণ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের।

(এখানে গীতা-সম্বন্ধীয় ছন্দের বিষয় আবশ্যকতানুসারে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে। অগ্নিপুরাণ, নারদ-পুরাণ এবং অন্যান্য ছন্দ-গ্রন্থে ছন্দগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।)

(১০৭) গীতায় আর্ষ-প্রয়োগ

বেদমন্ত্রা যথা প্রোক্তা গীতাশ্লোকাস্তথৈব চ।
গীতাধিকারিণঃ সর্বে দ্বিজা বেদাধিকারিণঃ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে ইতিহাস এবং পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে—**'ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্'** (৭।১।২)। **'ভারতং পঞ্চমো বেদঃ'**—এই উক্তিটিও প্রসিদ্ধ। পঞ্চম বেদ মহাভারতের অন্তর্গত গীতা এক স্বতঃ-প্রামাণিক উপনিষদ্। একথা গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে দেওয়া পুষ্পিকায় **'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু'** পদ দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া আছে। সেই দৃষ্টিতে গীতার প্রত্যেকটি শ্লোক বৈদিক মন্ত্রস্বরূপ। বেদে মন্ত্র, বাক্য বা ছন্দ যেরূপে ব্যবহৃত হয়েছে তা সেইরূপেই শুদ্ধ। তার ওপর কোন লৌকিক অনুশাসন কিংবা ব্যাকরণের নিয়ম জারী হয় না। তবুও লৌকিক অনুশাসনের দৃষ্টিতে যা সাধু প্রয়োগ নয় বা যা সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয় না, তার জন্য বৈয়াকরণেরা **'ছন্দসি দৃষ্টানুবিধিঃ'** (বেদে যেরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, তা সেই রূপেই বিহিত)—এই সিদ্ধান্ত করে দিয়েছেন। এছাড়া লৌকিক ব্যাকরণের সমস্ত নিয়ম এবং বিধান বেদে বিকল্পরূপে হয়ে থাকে, যেমন **'সর্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে'**—এই পরিভাষার দ্বারা সিদ্ধ হয়। এই পরিভাষার মূল **'ষষ্ঠীযুক্তশ্ছন্দসি বা'** (পাণিনি অষ্টা. ১।৪।৯)—এটিই সূত্র। এই সূত্রে **'বা'** শব্দ পৃথক্ করে তাকে পৃথক্ সূত্র বলে মেনে নেওয়া হয়। এই ক্রিয়াকে যোগবিভাগ বলে। **'বা'** তে **'ছন্দসি'** পদের অনুবৃত্তি হয়। তখন তার অর্থ হয়—'সমস্ত বিধি বেদে বিকল্প দ্বারা হয়'। এই বিকল্প বাহুলকরূপ হয়। **'বহুলং ছন্দসি'** ইত্যাদি সমস্ত বৈদিক প্রক্রিয়া এরই বিস্তার।

ব্যাকরণ-শাস্ত্রে বাহুলক চার প্রকারের বলে মানা হয়েছে—(১) কোথাও প্রবৃত্তি, (২) কোথাও অপ্রবৃত্তি, (৩) কোথাও বিকল্প অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি দুই-ই এবং (৪) কোথাও সূত্রে অপেক্ষিত নিমিত্ত দ্বারা অন্য, সর্বথা, ভিন্ন, বিপরীত এবং তার অভাবেও কার্য পূর্ণ হওয়া।

এই প্রসঙ্গে **'ব্যত্যয়ো বহুলম্'** (পাণিনি. অষ্টা. ৩।১।৮৫)—এই সূত্র দ্বারা ছন্দে বিকরণের বহু প্রকার ব্যত্যয়ের কথা বলা হয়েছে। এই স্থানে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির বক্তব্য এই যে বিকরণের অতিরিক্ত সুপ্, তিঙ্, উপগ্রহ (আত্মনেপদ-পরস্মৈপদ), লিঙ্গ, প্রথম আদি পুরুষ, ভূতাদি কালবাচী প্রত্যয়, হল্, অচ্ উদাত্তাদি স্বর, কর্তা আদি কারক, যঙ্ অর্থাৎ **'ধাতোরেকাচো হলাদেঃ ক্রিয়াসমভিহারে যঙ্'** (পাণিনি. অষ্টা. ৩।১।২২) সূত্রঘটক 'যঙ্' এর যকার থেকে নিয়ে **'লিঙ্যাশিষ্যঙ্'** (পাণিনি. অষ্টা. ৩।১।৮৬) সূত্রঘটক 'অঙ্'-এর ঙকার পর্যন্ত প্রত্যাহার মেনে নিয়ে তার মধ্যবর্তী স্য-তাসি-শপ্-শান্ ইত্যাদি বিকরণ, চ্লিস্থানীয় সিজাদি আদেশ, আম্, যঙ্, ণিচ্, ণিঙ্, আয়্, ঈয়ঙ্-এর ব্যত্যয়ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রকর্তা আচার্য পাণিনির অভীষ্ট এবং তা বাহুলক দ্বারা সিদ্ধ ; অতএব সূত্রে **'বহুলম্'** পদ প্রযুক্ত হয়।

'সুপাং সুলুক্পূর্বসবর্ণাচ্ছেয়াডাড্যাযাজালঃ'(পাণিনি. অষ্টা. ৭।১।৩৯)—এই সূত্রে বেদে সুপ্ এর স্থানে সুলুক্, পূর্বসবর্ণ, আ আৎ শে, যা, ড্যা, আচ্ এবং আল্ আদেশ হয়।

উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের আধারে গীতা-সম্বন্ধীয় আর্ষ (বৈদিক) প্রয়োগের তালিকা নীচে দেওয়া হল—

ক্রমিক সংখ্যা	শ্লোকাংশ	অধ্যায়	শ্লোক	বিবরণ
১	ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ	১	৩২	পরস্মৈপদের স্থানে আত্মনেপদের আর্ষ প্রয়োগ হয়েছে।
২	ব্রজেত	২	৫৪	,, ,, ,, ,, ,, ,,
৩	নমেরন্ মহাত্মন্	১১	৩৭	,, ,, ,, ,, ,, ,,

ক্রমিক সংখ্যা	শ্লোকাংশ	অধ্যায়	শ্লোক	বিবরণ
৪	বিশতে তদনন্তরম্	১৮	৫৫	,, ,, ,, ,, ,, ,,
৫	ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্	১১	৮	পরস্মৈপদের স্থানে আত্মনেপদ এবং বিকরণ ব্যত্যয় আর্ষ প্রয়োগ করা হয়েছে।
৬	ইষুভিঃ প্রতি যোৎস্যামি	২	৪	আত্মনেপদের স্থানে পরস্মৈপদের আর্ষ প্রয়োগ হয়েছে।
৭	যততো[১] হ্যপি	২	৬০	আত্মনেপদের স্থানে পরস্মৈপদের আর্ষ প্রয়োগ হয়েছে।
৮	যদি হ্যহং ন বর্তেয়ম্	৩	২৩	,, ,, ,, ,, ,, ,,
৯	নোদ্বিজেৎ	৫	২০	,, ,, ,, ,, ,, ,,
১০	বশ্যাত্মনা তু যততা	৬	৩৬	,, ,, ,, ,, ,, ,,
১১	কশ্চিদ্ যততি	৭	৩	,, ,, ,, ,, ,, ,,
১২	যততামপি সিদ্ধানাম্	৭	৩	,, ,, ,, ,, ,, ,,
১৩	মামাশ্রিত্য যতন্তি যে	৭	২৯	,, ,, ,, ,, ,, ,,
১৪	যুধ্য চ	৮	৭	,, ,, ,, ,, ,, ,,
১৫	যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ	৯	১৪	,, ,, ,, ,, ,, ,,
১৬	প্রতিজানীহি	৯	৩১	,, ,, ,, ,, ,, ,,
১৭	রমন্তি চ	১০	৯	,, ,, ,, ,, ,, ,,
১৮	প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ	১৪	২	,, ,, ,, ,, ,, ,,
১৯	অবতিষ্ঠতি	১৪	২৩	,, ,, ,, ,, ,, ,,
২০	নিবর্তন্তি ভূয়ঃ	১৫	৪	,, ,, ,, ,, ,, ,,
২১	যতন্তঃ, যতন্তঃ	১৫	১১	,, ,, ,, ,, ,, ,,
২২	নৈব ত্যাগফলং লভেৎ	১৮	৮	,, ,, ,, ,, ,, ,,
২৩	অশোচ্যানন্বশোচঃ	২	১১	লুঙ্-এর স্থানে লঙ্-এর আর্ষ প্রয়োগ হয়েছে।
২৪	প্রসবিষ্যধ্বম্	৩	১০	লোট্-এর স্থানে এই আর্ষ প্রয়োগ হয়েছে।
২৫	অশ্বমেধসাম্	৭	২৩	শাস্ত্রে অপেক্ষিত নিমিত্তের অভাবে 'অসিচ্'-এর আর্ষ প্রয়োগ হয়েছে।
২৬	হে সখেতি	১১	৪১	এখানে সন্ধির আর্ষ প্রয়োগ হয়েছে।
২৭	প্রিয়ায়ার্হসি	১১	৪৪	,, ,, ,, ,,
২৮	তস্যারাধনম্	৭	২২	,, ,, ,, ,,

[১]গীতায় প্রযুক্ত হওয়া ধাতুগুলির মধ্যে 'যতী প্রযত্নে', 'বৃতু বর্তনে' ইত্যাদি ধাতু 'অনুদাত্তেৎ' হওয়ায় স্বতঃ আত্মনেপদে চলে যায় এই দৃষ্টিতে 'যততি, যততাম্, যততঃ, নিবর্তন্তি' ইত্যাদি ক্রিয়া এবং পদগুলিকে আর্ষ বলে মানা হয়। কিন্তু 'অনুদাত্তেত্ত্বলক্ষণমাত্মনেপদমনিত্যং চক্ষিঙ্ ঙিৎ করণাদ্ জ্ঞাপকাৎ'—এই জ্ঞাপক (নিয়ম) দ্বারা (আত্মনেপদে ব্যবহারকারী) সমস্ত ধাতুই অনিত্য হয়। এই দৃষ্টি দ্বারা 'যততি, নিবর্তন্তি' ইত্যাদি ক্রিয়া এবং পদগুলিকে আর্ষ বলে মনে করা উচিত নয়।

ক্রমিক সংখ্যা	শ্লোকাংশ	অধ্যায়	শ্লোক	বিবরণ
২৯	শক্য অহং নৃলোকে	১১	৪৮	এখানে সন্ধির অভাব আর্য প্রয়োগ হয়েছে।
৩০	ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন	১১	৫৪	” ” ” ”
৩১	নিবসিষ্যসি	১২	৮	'ইট্'-এর আগম আর্য প্রয়োগ হয়েছে।
৩২	নমস্কৃত্বা	১১	৩৫	'ল্যপ্'-এর স্থানে 'ক্ত্বা'-এর আর্য প্রয়োগ হয়েছে।
৩৩	এতন্মে সংশয়ম্	৬	৩৯	এখানে ক্লীবলিঙ্গ আর্য প্রয়োগ হয়েছে।
৩৪	সংপ্রবৃত্তানি, নিবৃত্তানি	১৪	২২	” ” ” ”
৩৫	সেনানীনাম্	১০	২৪	'যণ্'-এর স্থানে 'নুট্'-এর আর্য প্রয়োগ হয়েছে।
৩৬	শাশ্বতে	৮	২৬	'ঙীপ্'-এর স্থানে 'টাপ্'-এর আর্য প্রয়োগ হয়েছে।

ছন্দঃ শাস্ত্রে দুটি প্রকারকে আর্য বলে মানা হয়—নিচৃৎ আর ভুরিক্। ছন্দের নিয়মানুসারে যে ছন্দে অক্ষর কম হয়, তাকে 'নিচৃৎ আর্য'; এবং যে ছন্দে অক্ষর বেশী হয় তাকে 'ভুরিক্ আর্য' বলা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে 'জগতী' ছন্দের নিয়মানুসারে তৃতীয় এবং চতুর্থ চরণে এক অক্ষর কম হওয়ায় অর্থাৎ একাদশ অক্ষর হওয়ায় এটি 'নিচৃৎ আর্য' ছন্দ হয়। আবার ঐ শ্লোকেই 'ত্রিষ্টুপ্' ছন্দের নিয়মানুসারে প্রথম এবং দ্বিতীয় চরণে এক অক্ষর বেশী হওয়ায় অর্থাৎ বারো অক্ষর হওয়ায় এটি 'ভুরিক্ আর্য ছন্দ' হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঊনত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে 'জগতী' ছন্দের নিয়মানুসারে প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ চরণগুলিতে এক অক্ষর কম হওয়ায় এটি 'নিচৃৎ আর্য' ছন্দ হয় এবং এই শ্লোকেই 'ত্রিষ্টুপ্' ছন্দের নিয়মানুসারে দ্বিতীয় চরণে এক অক্ষর বেশী হওয়ায় এটি 'ভুরিক্ আর্য' ছন্দ হয়।

অষ্টম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে 'জগতী' ছন্দের নিয়মানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চরণে এক অক্ষর কম হওয়ায় এটি 'নিচৃৎ আর্য' ছন্দ হয়েছে। 'ত্রিষ্টুপ্' ছন্দের নিয়মানুসারে ঐ শ্লোকের চতুর্থ চরণে এক অক্ষর বেশী হওয়ায় সেটি 'ভুরিক্ আর্য' ছন্দ হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অনুষ্টুপ্ ছন্দের নিয়মানুসারে এক অক্ষর বেশী হওয়ায় অর্থাৎ তেত্রিশ অক্ষর হওয়ায় এটি 'ভুরিক্ আর্য' ছন্দ হয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে 'জগতী' ছন্দের নিয়মানুসারে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ চরণগুলিতে এক অক্ষর কম হওয়ায় এটি 'নিচৃৎ আর্য' ছন্দ হয়েছে এবং 'ত্রিষ্টুপ্' ছন্দের নিয়মানুসারে এই শ্লোকেরই প্রথম চরণে এক অক্ষর বেশী হওয়ায় এটি 'ভুরিক্ আর্য' ছন্দ হয়েছে।

(১০৮) গীতার শ্লোকের পরিমাণ এবং পূর্ণ শরণাগতি

ভগবন্তং প্রপন্নাস্তু তদভিন্না হি সর্বথা।
ভক্তাঃ কৃষ্ণে বিলীয়ন্তে কৃষ্ণ একো হি শিষ্যতে॥

মহর্ষি শ্রীবেদব্যাসরচিত মহাভারতে ঋষিবর শ্রীবৈশাম্পায়ন গীতার (শ্লোকের) পরিমাণ জানাতে গিয়ে বলেছেন এতে মোট সাতশত পঁয়তাল্লিশটি শ্লোক আছে—

ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ।
অর্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়া মানমুচ্যতে॥
(ভীষ্মপর্ব. ৪৩।৪-৫)

'গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছয়শত কুড়িটি শ্লোক বলেছেন, অর্জুন বলেছেন সাতান্নটি শ্লোক, সঞ্জয় সাতষট্টিটি শ্লোক বলেছেন আর ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন একটিমাত্র শ্লোক। এটিকেই গীতার পরিমাণ বলা হয়।'[১]

গীতার প্রচলিত গ্রন্থ অনুযায়ী অষ্টাদশ অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক যোগ করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাঁচশত চুয়াত্তরটি শ্লোক, অর্জুনের চুরাশী শ্লোক, সঞ্জয়ের একচল্লিশটি শ্লোক এবং ধৃতরাষ্ট্রের একটি শ্লোক, যার মোট সংখ্যা হয় সাতশত। এই সাতশত শ্লোকের ছয়শত চুয়াল্লিশ শ্লোক বত্রিশ অক্ষরযুক্ত, একটি শ্লোক (১১।১) তেত্রিশ অক্ষরের, একান্নটি শ্লোক চুয়াল্লিশ অক্ষরযুক্ত, তিনটি শ্লোক (২।২৯, ৮।১০ এবং ১৫।৩) পঁয়তাল্লিশ অক্ষরের এবং একটি শ্লোক (২।৬) ছেচল্লিশ অক্ষরের। এইভাবে গীতার শ্লোকগুলির মোট অক্ষর হল ২৩০৬৬ (তেইশ হাজার ছেষট্টি)। পুষ্পিকা-গুলিতে মোট আটশত তিয়াত্তর অক্ষর আছে। উবাচতে মোট তিনশত তিরাশী অক্ষর আছে। **'অথ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা', 'অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ'** ইত্যাদির মোট একশত সাঁইত্রিশ অক্ষর আছে। এইভাবে গীতায় মোট অক্ষর সংখ্যা ২৪৪৫৯ (চব্বিশ হাজার চারশত উনষাট)।

প্রাচীনকাল থেকে এই পরম্পরা চলে আসছে যে বত্রিশ অক্ষরকে একটি শ্লোক মনে করে যে কোন পুরাণ

[১]মহাভারত (আদিপর্ব ১।৭৪৮৩) তে আছে যে শ্রীব্রহ্মা বলায় মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীগণেশকে অনুরোধ করলেন তাঁর মহাভারত গ্রন্থের লেখক হতে। গণেশ এতে শর্ত করলেন যে লেখবার সময় তাঁকে একক্ষণের জন্যও যেন থামতে না হয়—তবেই তিনি লিখবেন। বেদব্যাসও শর্ত রাখলেন যে গণেশ না বুঝে এক অক্ষরও লিখতে পারবেন না। গণেশ স্বীকৃত হয়ে মহাভারত লিখতে বসলেন। লেখার সময় মাঝে মাঝে বেদব্যাস এমন কূট শ্লোক (গূঢ় অর্থবহ) রচনা করতে থাকেন যে তা বুঝতে গণেশের কিছুটা লেখনী থামাতে হয়, সেই সময়টুকুর মধ্যে বেদব্যাস আরও বহু শ্লোক রচনা করে ফেলতেন। গীতা-পরিমাণ সম্বন্ধীয় শ্লোকও এইরূপ কূট শ্লোক বলে ধারণা জন্মায়। সেইজন্য কোন কোন টীকাকার গীতা-পরিমাণের সঙ্গতি রাখতে অসমর্থ হয়ে এই শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত (ক্ষেপক) বলে মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে এগুলি মহাভারতের শ্লোক বলেই মনে হয়, কারণ প্রথমত এগুলি অত্যন্ত পুরাতন গীতাতেও পাওয়া যায় আর দ্বিতীয়ত, গীতাকে গভীরভাবে বিচার করলে এই শ্লোকগুলি অনুযায়ী গীতা-পরিমাণের উপযুক্ত মনে হয়।

মহাভারতের যেসকল গ্রন্থে আমরা গীতা-পরিমাণ সম্বন্ধীয় শ্লোক পেয়েছি তার পরিচয় এইরূপ—

(১) গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত—পাণ্ডেয় শ্রীরামনারায়ণ দত্ত শাস্ত্রীকৃত হিন্দী-টীকা পৃষ্ঠা ২৮১৩।
(২) সনাতন ধর্ম প্রেস, মুরাদাবাদ থেকে প্রকাশিত— শ্রীরামস্বরূপকৃত হিন্দী-টিকা, পৃষ্ঠা ১৮৪।
(৩) মহাভারত প্রকাশক মণ্ডল মালীবাড়া, দিল্লী থেকে প্রকাশিত—শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ শাস্ত্রীকৃত হিন্দী-টীকা পৃঃ ৩৮৭।
(৪) স্বাধ্যায়-মণ্ডল দ্বারা প্রকাশিত — শ্রীপাদ দামোদর সাতবলেকরকৃত হিন্দী-টীকা, পৃঃ ২২১।
(৫) শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ শর্মাকৃত — মহাভারতের হিন্দী অনুবাদ পৃঃ ১৪৬।
৬) মহাভারতের নীলকণ্ঠী টিকা—মূলে গীতা-পরিমাণ সম্বন্ধীয় শ্লোক দেওয়া আছে ; কিন্তু তার টীকা না করে 'গীতা সুগীতা কর্তব্যা ইত্যাদয়ঃ সার্ধাঃ পঞ্চ শ্লোকাঃ গৌড়ৈর্ন পঠ্যন্তে' এইরূপ লেখা আছে।

ইত্যাদি গ্রন্থের শ্লোকের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়[১]। সেই অনুযায়ী গীতার শ্লোকগুলির সমস্ত অক্ষরগুলির যদি পরিমাণ বার করা যায় তাহলে ৭২০$\frac{২৬}{৩২}$ শ্লোক হয়। যদি এর সঙ্গে 'উবাচ'-এর তিনশত তিরাশী অক্ষর যুক্ত করা হয়, তাহলে ৭৩২$\frac{২৫}{৩২}$ শ্লোক হয়। আবার যদি এর (শ্লোকের অক্ষরের) সঙ্গে 'পুষ্পিকা'র আটশত তিয়াত্তর অক্ষর যোগ করা হয় তাহলে ৭৪৮$\frac{৩}{৩২}$ শ্লোক হয়। যদি শ্লোকগুলির সমস্ত অক্ষরগুলির সঙ্গে 'উবাচ', 'পুষ্পিকা' এবং **'অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ'** ইত্যাদির মোট ১৩৯৩ (এক হাজার তিনশত তিরানব্বই) অক্ষর আরও যুক্ত হয়, তবে ৭৬৪$\frac{১১}{৩২}$-শ্লোক হয়। এইপ্রকারে কোনো ভাবেই মহাভারতকথিত গীতার পরিমাণের সঙ্গতি থাকে না। তবুও পরিমাণ-সূচক শ্লোক পাওয়ার জন্য পরিমাণের সঙ্গতি ঠিক রাখা আবশ্যক মনে করে জনৈক সাধুর কাছে পাওয়া সঙ্কেত অনুসারে চেষ্টা করা হয়েছে। বিদ্বজ্জনের কাছে অনুরোধ যে তাঁরা যেন গুরুত্ব দিয়ে এটি বিচার-বিবেচনা করে নিজ নিজ সম্মতি কৃপা করে জানান।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় পড়লে জানা যায় যে, অর্জুন যুদ্ধ করবার জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈরী ছিলেন। তিনি নিজে রথী ছিলেন এবং সারথিরূপী ভগবানকে আদেশ করলেন দুইপক্ষের সেনাদলের মধ্যে রথ স্থাপন করতে—**'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত'** (১।২১)। সারথিরূপী ভগবানও রথটিকে দুই সেনার মধ্যস্থলে—পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণের রথ দুটির ঠিক সম্মুখে এক বিশেষ কৌশলে স্থাপন করলেন। ভগবানের এই কৌশল আসলে যুদ্ধোন্মুখ অর্জুনকে কল্যাণে উন্মুখ করার জন্য এক শক্তির প্রকাশ (যা সিদ্ধ হয়েছে অষ্টাদশ অধ্যায়ের তিয়াত্তর সংখ্যক শ্লোকে)। জীবকল্যাণের উদ্দেশ্যে অর্জুনকে নিমিত্ত করে ভগবানের গীতারূপ মহান উপদেশাবলী দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, সেইজন্যই অর্জুনকে এইরূপ পাত্র হিসাবে রেখেছিলেন। সুতরাং যুদ্ধস্থলে পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য-দ্রোণকে নিজ সম্মুখে বিপক্ষদলে দেখে অর্জুনের সুপ্ত মোহ জাগরিত হল। শুধু তাই নয়, ভগবান নিজেও বলেছেন, 'হে পার্থ! যুদ্ধের জন্য সমবেত কুরুবংশীয়দের দেখ'—**'উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি'** (১।২৫)। এখানে ভগবান, 'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের দেখ', না বলে, 'কুরুবংশীয়দের দেখ' বললেন। এইরূপ বলাতেই অর্জুনের মোহ জাগরিত হয় বলে মনে হয়। ভগবান যদি **'উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি'** স্থানে **'উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ সমানিতি'** বলতেন তাহলে হয়তো অর্জুনের এই কৌটুম্বিক মোহ জাগ্রত না হয়ে যুদ্ধ করার উৎসাহই বাড়তো। কারণ অর্জুন প্রথমেই বলেছিলেন, **'ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ'** (১।২৩)। পাণ্ডব এবং দুর্যোধন ইত্যাদি—উভয়েই কুরুবংশীয় ছিলেন; সুতরাং **'কুরু'** শব্দ দ্বারা অর্জুনের মোহ জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। প্রথমে যুদ্ধ-চিন্তায় যাদের অর্জুন **'ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধেঃ'** বলেছিলেন, এখন তাদেরই স্বজন বলতে লাগলেন—**'দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ'** (১।২৮)। যুদ্ধে স্বজনবধের ভয় আছে। এই মোহে অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তখনই তিনি ভগবানের শরণাগত হয়ে শ্রেয় (কল্যাণ)-এর কথা জিজ্ঞাসা করলেন (২।৭)। উত্তরে ভগবান দিব্য গীতা উপদেশ করলেন। এতে বোঝা যায় যে গীতা শোনার জন্য অর্জুন নিজে আগ্রহী ছিলেন না, বরং ভগবানই তাঁর আগ্রহ জাগিয়েছিলেন। সেইজন্য এটি 'ভগবদ্গীতা'। 'অর্জুনগীতা' বা 'কৃষ্ণার্জুনগীতা' নয়। এটিকে ভগবদ্গীতা বলার তাৎপর্য এই যে এটি 'শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ' হওয়া সত্ত্বেও অর্জুন ভগবৎপ্রেরিত হয়েই কথা

---

[১]শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের 'অন্বিতার্থপ্রকাশিকা' টীকার লেখক পণ্ডিত শ্রীগঙ্গাসহায় শর্মাও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের গণনার জন্য এই অক্ষর-গণনার (সমস্ত অক্ষরগুলির মধ্যে বত্রিশ ভাগকারী) পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে সেই শ্লোকগুলির গণনাকে শ্লোকবদ্ধ করে লেখা হয়েছে। এটি পৃথক্ কথা যে তাঁর গণনা অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের আঠারো হাজার শ্লোকের মধ্যে কেবল দেড়খানি শ্লোক মাত্র কম।

এই অক্ষর গণনার জন্য কোনো গ্রন্থের লেখককে পারিশ্রমিক দেবার রীতিও প্রাচীনকাল থেকে পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে।

বলেছিলেন। অর্থাৎ এতে কেবলমাত্র ভগবানের বচনই আছে।

উবাচও শ্লোক

এবার গীতার শ্লোকের পরিমাণের ওপর বিচার করা হচ্ছে। মহাভারতের বক্তা মহর্ষি বৈশম্পায়ন এবং শ্রোতা হলেন মহারাজ জনমেজয়। মহর্ষি বৈশম্পায়ন সঞ্জয় এবং ধৃতরাষ্ট্রের কথোপকথনকে স্মরণে রেখেই গীতার পরিমাণ উল্লেখ করেছেন।

গীতায় **'শ্রীভগবানুবাচ'** আটাশবার, **'অর্জুন উবাচ'** একুশবার, **'সঞ্জয় উবাচ'** নয়বার, **'ধৃতরাষ্ট্র উবাচ'** একবার ব্যবহৃত হয়েছে। **'শ্রীভগবানুবাচ'** এবং ভগবৎ-শরণাগতির পরে ভগবৎপ্রেরিত **'অর্জুন উবাচ'** কে শ্লোকাত্মক মেনে নিলে গীতার পরিমাণ (৭৪৫ শ্লোক) প্রমাণিত হয়।

পিঙ্গলাচার্য-রচিত **'পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্'** গ্রন্থ অনুযায়ী এক অক্ষর ও এক পদেরও ছন্দ হয়। গাথাছন্দ নামে একপ্রকার ছন্দ আছে যার অক্ষর এবং মাত্রার কোন নিয়ম নেই। 'দুর্গাসপ্তশতী'তেও 'উবাচ'কে সম্পূর্ণ শ্লোক বলে মানা হয়েছে। সেই দৃষ্টিতে দেখলে গীতাতেও 'উবাচ'কে সম্পূর্ণ শ্লোক বলে মেনে নিতে কোন আপত্তি হওয়া উচিত নয়। তবে কোন কোন স্থানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এর সমাধান পরে করা হচ্ছে।

গীতা-পরিমাণ অনুযায়ী ভগবানের ছয়শত কুড়িটি শ্লোক আছে, কিন্তু গীতার প্রচলিত গ্রন্থ অনুযায়ী পাঁচশত চুয়াত্তরটি শ্লোক হয়। অতএব এখন শেষ ছেচল্লিশ শ্লোকের ওপর আলোচনা করতে হবে।

সমগ্র গীতা পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে ভগবানের হৃদয়ে আঠাশবার বলার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। এই আঠাশ উবাচগুলিকে শ্লোকের গণনায় ধরে নেওয়া উচিত। এটি **'শ্রীভগবানুবাচ'** হওয়ায় এটি মন্ত্রস্বরূপ। এই ভাবগম্ভীর ভগবৎ-শ্লোকের মন্ত্র-দ্রষ্টা ছিলেন সঞ্জয়। এইপ্রকার ভগবৎ-শরণাগতির পরে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর রূপে ভগবৎপ্রেরিত হয়ে অর্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের চুয়ান্ন সংখ্যক শ্লোক থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পর্যন্ত সতেরোবার কথা বলেছেন। অতএব পঁয়তাল্লিশটি (২৮+১৭=৪৫) উবাচ অপৌরুষেয় মন্ত্রবৎ। এই পঁয়তাল্লিশ উবাচগুলি গীতার প্রচলিত গ্রন্থ অনুযায়ী ভগবান কথিত পাঁচশত চুয়াত্তর শ্লোকের সঙ্গে যুক্ত করলে ছয়শত উনিশটি শ্লোক ভগবান দ্বারা কথিত হয়।

গীতার প্রচলিত গ্রন্থে শেষের দিকে **'অর্জুন উবাচ'** (১৮।১) এর পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের তিয়াত্তর সংখ্যক শ্লোকও অর্জুনকথিত। কিন্তু গীতার শ্লোকের পরিমাণ গণনায় **'অর্জুন-উবাচ'**কে অন্তর্গত ধরে কথিত শ্লোকটিকে একটি শ্লোক ধরে নিয়ে এটিকে ভগবানের শ্লোকগুলির মধ্যে সম্মিলিত করা হয়েছে। এর কারণ পরে উল্লেখ করা হচ্ছে।

ভগবদনুপ্রাণিত অর্জুন

ভগবানের অথবা কোন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের, অধিকারী কারক পুরুষের ভাবনা যখন কোন জীবের কল্যাণের জন্য হয়, তখন সেই সময়েই তার কল্যাণ নিশ্চিত বলে বুঝতে হবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তির তা সেই সময় অনুভব হয় না। সে পরে তা বুঝতে পারে। কারণ তার যা কিছু দোষ-ত্রুটি থাকে ভগবান অথবা মহাপুরুষ তা শঙ্কারূপে প্রকটিত করে দূর করেন। তখনই সে তার নিজ কল্যাণ সম্বন্ধে (ভগবানের দ্বারা সাধর্ম্যসম্বন্ধে) অবহিত হয়।

অর্জুন যখন এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনাকে ছেড়ে শুধুমাত্র নিরস্ত্র ভগবানকেই গ্রহণ করেছিলেন[১] সেই সময়েই ভগবানের হৃদয়ে অর্জুনের জন্য কল্যাণ করার ভাব জাগরিত হয়েছিল। কারণ সাধক যখন বৈভব পরিত্যাগ করে শুধু ভগবানকে চায়, তখন তার কল্যাণের দায়িত্ব ভগবানের ওপর এসে পড়ে। ভগবানের ভাব যখন অর্জুনের কল্যাণের দিকে ধাবিত হয়েছিল, তখনই অর্জুনের কল্যাণও নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অর্জুনের মধ্যে অভাব যতটুকু ছিল তা দূরীভূত করার জন্য ভগবান তাঁর মধ্যে কিছু সংশয় জাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং ভগবান স্বয়ং তার সমাধানও করে দেন, যেরূপে আগুন তার ইন্ধনকে ধ্বংস করে।

গীতা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে ভগবৎ-শরণাগতির পরে ভগবদনুপ্রাণিত হয়ে অর্জুন সতের বার

---

[১]এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ। অযুধ্যমানং সংগ্রামে বরয়ামাস কেশবম্॥ (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৭।২১)

কথা বলেছেন। শরণাগতির পরে অর্জুন সর্বপ্রথম দ্বিতীয় অধ্যায়ের চুয়ান্ন সংখ্যক শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। এখানে অর্জুন ভগবদ-নুপ্রাণিত হয়েই বলেছেন। তিনি যদি ভগবদনুপ্রাণিত না হতেন, তাহলে তাঁর প্রশ্ন যুদ্ধের বিষয়েই হোত। তিনি এই প্রশ্নই করতেন যে, যুদ্ধ করা উচিত কি না অথবা যুদ্ধ কেমন করে করবেন ইত্যাদি। কারণ তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিয়েই যুদ্ধভূমিতে এসেছিলেন। অথচ এখানে তিনি উচ্চ হতে উচ্চতর অধ্যাত্ম-তত্ত্বের (স্থিতপ্রজ্ঞের বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় অর্জুনের অন্তঃকরণে যে অধ্যাত্ম-বিষয়ক প্রশ্নগুলি প্রচ্ছন্নভাবে ছিল তা ভগবানের প্রেরণাতেই জেগে ওঠে। ভগবদনুপ্রাণিত হয়ে অর্জুন সেইসকল জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্য ভগবানকেই বললেন।

ভগবানের শরণাগতি স্বীকার করে নেওয়ার পরে ভগবদনুপ্রাণিত অর্জুন দ্বারা লোককল্যাণার্থে করা প্রশ্ন-গুলির আরম্ভে **'অর্জুন উবাচ'** শ্লোক মহর্ষি বেদব্যাস লিখিত এবং এই শ্লোকগুলিকে তিনি 'গীতার পরিমাণ'-এ ভগবানের শ্লোক বলেই মনে করেছেন বলে ধারণা হয়। মহর্ষি বেদব্যাস ছিলেন অধিকারী কারক-পুরুষ। তাঁর কথিত শ্লোকগুলির প্রকারান্তর করার কারোর অধিকার নেই। তাঁর দ্বারা কৃত বেদের চারটি ভাগ এখনও চার ভাগ হিসাবেই গৃহীত। ভগবান গীতায় তাঁর উপদেশ ক্রমান্বয়ে বলতে থাকলেও তাঁর উপদেশগুলি স্পষ্টরূপে অনুধাবন করাবার জন্য শ্রীবেদব্যাস এটি ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম, দশম, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ অধ্যায়ের প্রারম্ভে পুনর্বার **'শ্রীভগবানুবাচ'** রূপ শ্লোকটি দিয়ে এটি ভগবানের শ্লোকগুলিতে সম্মিলিত করেছেন। এইভাবেই ভগবদ-নুপ্রাণিত হয়ে অর্জুনের করা প্রশ্নের শ্লোকগুলির আরম্ভেও **'অর্জুন উবাচ'** রূপ শ্লোকগুলি ভগবানের শ্লোকগুলির সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু ঐ শ্লোকের প্রশ্নগুলি অর্জুনের নিজস্ব হওয়ায় ঐ শ্লোকগুলি অর্জুনের শ্লোকের সঙ্গেই যুক্ত করা হয়েছে।

শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেই মানুষ গুরুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়—**'সাহ হী কো গোতু গোতু হোত হ্যায় গুলামকো'** (কবিতাবলী, উত্তর. ১০৭)। কিন্তু শিষ্যের মনে যতক্ষণ প্রশ্ন থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার গুরুর সঙ্গে একটা পৃথক্ ভাব থাকে। শিষ্যের প্রশ্নগুলি ব্যক্তিগত হওয়াতেই তার গুরুর সঙ্গে প্রশ্নোত্তর রূপ আলোচনা হয় অর্থাৎ গুরুর সঙ্গে অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও গুরু-শিষ্যের আলোচনা হয়, সেখানে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে। সেইরূপ শরণাগত হওয়ার পরে অর্জুন ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেলেন। কিন্তু যতক্ষণ তাঁর মধ্যে সংশয় ছিল, ততক্ষণ তাঁর ভগবানের সঙ্গে একটা পার্থক্য ছিল। কারণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের চুয়ান্ন সংখ্যক শ্লোক থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পর্যন্ত ব্যবহৃত **'অর্জুন উবাচ'**র পরে কথিত শ্লোক অর্জুনের ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলির দ্যোতক যদি না হয়, তাহলে **'শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ'** সিদ্ধই হয় না। সুতরাং **'অর্জুন উবাচ'** ভগবৎ-প্রেরিত এবং প্রশ্নগুলি শুধু অর্জুনের। পরে যখন তাঁর প্রশ্নগুলির সমাধান হয়ে যায়, তখন তিনি ভগবানের সঙ্গে সর্বতোভাবে অভিন্ন অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপ হয়ে যান (১৮।৭৩)।

লোক-সংগ্রাহক শ্রীভগবান

অষ্টাদশ অধ্যায়ের বাহাত্তর সংখ্যক শ্লোকে ভগবান নিজেই প্রশ্ন করছেন এবং তিয়াত্তর সংখ্যক শ্লোকে লোকসংগ্রহের জন্য অর্জুনের মাধ্যমে নিজেই উত্তর দিচ্ছেন।

ভগবান এবং সন্ত-মহাপুরুষদের বাণীতে বিভিন্ন স্থানে এরূপ দেখা যায় যে তিনি স্বয়ং সাধক হয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং গুরু হয়ে তার সমাধান করেছেন। যেমন, 'অনুগীতা' (মহাভারতে)-তে ভগবান স্বয়ং অর্জুনের কাছে এই রহস্য প্রকটিত করেন—

অহং গুরুর্মহাবাহো মনঃ শিষ্যং চ বিদ্ধি মে।
ত্বৎপ্রীত্যা গুহ্যমেতচ্চ কথিতং তে ধনঞ্জয়॥

(মহাভারত. আশ্বমেধিক ৫১।৪৬)

'হে মহাবাহো ! আমিই গুরু এবং আমার মনকেই শিষ্য মনে করো। হে ধনঞ্জয় ! তোমার প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে আমি এই রহস্যের বর্ণনা করলাম।'

শ্রীশঙ্করাচার্যের বাণীতেও এরূপ দেখা যায় যে তিনি নিজে শিষ্য হয়ে প্রশ্ন করছেন এবং নিজেই গুরুরূপে তার সমাধান করছেন—

অপারসংসারসমুদ্রমধ্যে সম্মজ্জতো মে শরণং কিমস্তি।
গুরো কৃপালো কৃপয়া বদৈতদ্বিশ্বেশপাদাম্বুজদীর্ঘনৌকা॥

(প্রশ্নোত্তরী ১)

'হে দয়াময় গুরুদেব ! কৃপা করে বলুন যে এই অপার সংসাররূপ সমুদ্রে যে আমি ডুবে যাচ্ছি, আমার আশ্রয় কি ?' (গুরু উত্তর দিয়েছেন)—'বিশ্বপতি পরমাত্মার চরণকমলরূপ অর্ণবপোত।'

এইরূপ অষ্টাদশ অধ্যায়ের বাহাত্তর সংখ্যক শ্লোকেও অর্জুনের মোহ দূরীভূত হয়েছে কিনা—তা জানার জন্য ভগবানের জিজ্ঞাসা নেই। কারণ ভগবান সর্বজ্ঞ। নাটকের সূত্রধরের মতো সংসাররূপ নাটকটি তাঁর সম্পূর্ণ জানা। তিনি জানেন যে অর্জুনের মোহ দূর হয়েছে। সেইজন্যই তিনি অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টি সংখ্যক শ্লোকে তাঁর উপদেশের উপসংহার করে দিলেন এবং গীতাশ্রবণের অনধিকারী ও অধিকারীর বর্ণনা করে গীতার মাহাত্ম্য জানালেন। এতেই বোঝা যায় যে ভগবান প্রথম থেকেই জেনে গিয়েছিলেন যে অর্জুনের মোহ এবার সর্বতোভাবে দূর হয়েছে। তাই অর্জুন তাঁর মোহ দূর হয়েছে না বলা সত্ত্বেও ভগবান তাঁর উপদেশাবলীর উপসংহার করলেন।

সাধারণতঃ পরীক্ষকগণ পরীক্ষার্থীরা কতটা জানে তা জানার জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করেন, কিন্তু ভগবানের পরীক্ষা জীব (ভক্ত)-কে তার বাস্তবিক স্থিতি জানাবার জন্য অর্থাৎ তিনি দেখান যে, 'তুমি দেখ তোমার সঠিক স্থিতি কোথায়।' ভগবান সর্বজ্ঞ, তিনি সবই জানেন। এর প্রমাণ গীতাতেই পাওয়া যায়। যেমন, একাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে '**মোহোঽয়ং বিগতো মম**' বলে অর্জুন নিজ-মোহ দূর হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন ; কিন্তু ভগবান সর্বজ্ঞ হওয়ায় তিনি জানেন যে তখনো অর্জুনের মোহ দূর হয় নি। তাই অর্জুনকে জানাবার জন্য তিনি একাদশ অধ্যায়েরই উনপঞ্চাশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন যে—'**মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবঃ**' অর্থাৎ 'মোহ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হলে ব্যাকুলতা এবং বিমূঢ়ভাব (মোহ) আর উৎপন্নই হয় না ; কিন্তু ভাই অর্জুন ! তোমার মধ্যে ব্যাকুলতা ও বিমূঢ়ভাব দুইই আছে ; সুতরাং তোমার মোহ এখনও সর্বতোভাবে দূরীভূত হয় নি।'

পশ্চাৎ (১৮।৬৬ র পরে) অর্জুন স্বীকার না করলেও ভগবান জানতে পারেন যে, তখন অর্জুনের মোহ সম্পূর্ণ দূর হয়েছে এবং তিনি ভগবানের সাধর্ম্য প্রাপ্ত হয়েছেন। তবুও লোকসংগ্রাহকের দৃষ্টিতে ভগবান বাহাত্তর সংখ্যক শ্লোকে প্রশ্ন করেছেন এবং তিয়াত্তর সংখ্যক শ্লোকে নিজেই অর্জুনের মাধ্যমে তার সমাধান করেছেন, যাতে মানুষের মনে হয় যে একাগ্রভাবে গীতা শ্রবণ করলেই মোহ সম্পূর্ণ নাশ হয় এবং তত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটে। অতএব ভগবৎ-সাধর্ম্য প্রাপ্ত (ভগবৎস্বরূপ) অর্জুনের এই শ্লোক (১৮।৭৩)-টিকে ভগবানের বলেই মনে করা উচিত। অর্থাৎ ভগবান লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই অর্জুনের দ্বারা এই শ্লোকটি বলালেন।

ভগবৎ-স্বরূপ অর্জুন

যেভাবে ভগবৎশরণাগতিপ্রাপ্ত অর্জুন 'ভগবদনুপ্রাণিত' হওয়ায় 'অর্জুন উবাচ' শ্লোকগুলিকে ভগবৎ-কথিত বলে মানা হয়, সেইভাবেই মোহ নাশ হওয়ার পরে অর্জুন 'ভগবৎ-স্বরূপ' হয়েছেন এবং তাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের তিয়াত্তর সংখ্যক শ্লোকটিকেও ভগবানের কথিত বলে মানা হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের তিয়াত্তর সংখ্যক শ্লোকটি ভগবান বলেছেন বলে মেনে নিলে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভগবান নিজেই '**নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ ....**' ইত্যাদি পদগুলি নিজের প্রতি কীভাবে বললেন ? এই উক্তিটি সাধক (অর্জুন)-এরই হওয়া উচিত। এর উত্তর হচ্ছে এই যে, মোহ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হওয়ায় অর্জুন ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অর্জুনের নিজের বলে আর কিছু ছিল না, তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দ্বারা কৃত সমস্ত ক্রিয়াই ভগবানের হয়ে যায়। অতএব জীব-ভাবমুক্ত ভগবৎ-সাধর্ম্য-প্রাপ্ত অর্জুনের এই শ্লোকটি আত্মিক দৃষ্টি দ্বারা ভগবানেরই বলা বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কারণ মোহ সম্পূর্ণ দূর হলে ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে কোন বিভেদ থাকে না '**তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।**' (নারদভক্তিসূত্র ৪১)। ভগবান নিজে জানিয়েছেন—'**জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্**' (গীতা ৭।১৮) 'জ্ঞানী (প্রেমী) ভক্তগণ আমারই স্বরূপ হন—এটিই আমার মত' এবং '**মম সাধর্ম্যমাগতাঃ**' (গীতা ১৪।২) 'ভক্ত আমার সাধর্ম্য প্রাপ্ত হয়েছে।' সেইজন্য ভগবৎ-সাধর্ম্যপ্রাপ্ত ভক্তের বচন ভগবানের বচন বলে মানা উচিত।

গুরুর শক্তি যখন শিষ্যে সঞ্চারিত হয়, তখন শিষ্যের মধ্যে গুরুর অবতরণ ঘটে অর্থাৎ শিষ্য গুরুর স্বরূপ হয়ে

যায়। 'অদ্বৈতামৃতবল্লরী' নামক বেদান্ত গ্রন্থে চার প্রকারে শক্তি সঞ্চারিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(১) স্পর্শ দ্বারা—যেমন, মুরগী নিজ ডিমের ওপর বসে থাকে এবং এইভাবে তার স্পর্শে (সম্বন্ধে) ডিম স্ফুটিত হয়।

(২) শব্দ দ্বারা—যেমন, কুররী পাখী আকাশে আওয়াজ করে ঘুরতে থাকে এবং তার শব্দে ডিম স্ফুটিত হয়ে যায়।

(৩) দৃষ্টি দ্বারা—যেমন, মাছ একটু পরে পরেই নিজ ডিমের দিকে দৃষ্টিপাত করে, এতেই তার ডিম স্ফুটিত হয়।

(৪) স্মরণ দ্বারা—যেমন, কচ্ছপ নদীর চড়াতে ডিম পাড়ে, কিন্তু নিজে জলের মধ্যে থেকে ঐ ডিমগুলির কথা সর্বক্ষণ চিন্তা করতে থাকে, তাতেই ঐ ডিমগুলি স্ফুটিত হয়ে যায়[১]।

ভগবানের স্মরণ মাত্রেই জীবের কল্যাণ হতে পারে, কিন্তু গীতা পর্যালোচনার দ্বারা জানা যায় যে, ভগবান চার প্রকারেই অর্জুনের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন। ভগবান এবং অর্জুনের সম্পর্ক হওয়াটাই স্পর্শের দ্বারা শক্তিপাত রূপে সূচিত হওয়ার যোগ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে অর্জুন ভগবানের সঙ্গে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের তিয়াত্তর সংখ্যক শ্লোকে ভগবান অর্জুনের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, গীতা হচ্ছে 'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ' এবং যেখানে সংবাদ হয় সেখানে সম্বন্ধ তো থাকবেই। ভগবান অর্জুনের প্রশ্নগুলির সমাধান করেছেন — এটি শব্দ দ্বারা শক্তিসঞ্চার। কৃপা দৃষ্টির দ্বারা প্রকটিত হয়। ভগবান অর্জুনকে কৃপাপূর্বক দেখেন—এটি দৃষ্টি দ্বারা শক্তিসঞ্চার। ভগবান অর্জুনের কল্যাণ করতে চান—এটি মন দ্বারা শক্তিসঞ্চার।

সমস্ত জীবই ভগবানের অংশ হওয়াতে মনে করা যাক যে তারা তাঁরই ডিম। জীব যদি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হয়, তবে মোহরূপ আবরণ ঘুচে যায় এবং তার ভগবৎ-সাধর্ম্য স্মৃতি জাগরিত হয়। অর্জুনের মোহরূপ আবরণ দূর হয়েছে —'**নষ্টো মোহঃ**' এবং তিনি স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন '**স্মৃতির্লব্ধা**' ; সুতরাং এখন আর তাঁর সঙ্গে ভগবানের কোন বিভেদ নেই।

দ্বিতীয়তঃ—যদি শ্রোতা বক্তার বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে অভিন্ন না হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে শোনেই নি। বিদ্যার্থী পণ্ডিতের নিকট পড়াশোনা করে যদি পণ্ডিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে প্রকৃতপক্ষে সে পড়াশোনা করেই নি। তেমনই গুরুর কাছে গিয়েও যদি শিষ্য সংসারের গুরু অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত না হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে গুরুর উপদেশ শোনেই নি বা সত্যিকার গুরু মেলে নি।[২]

এখন প্রশ্ন থাকে যে ভগবান '**নষ্টো মোহঃ ....**' ইত্যাদি পদ নিজেকে লক্ষ্য করে কি করে বললেন ? এর উত্তরে বলা যায় যে, ভগবানের সাধারণ মানুষকে বলার ছিল যে একাগ্রভাবে গীতা শ্রবণ, পঠন, মনন ইত্যাদির দ্বারা সাধকের স্বতঃই এইরূপ স্থিতি হয়ে যায়, কিন্তু এরূপ হলে সে নিজ সাধন, শ্রবণ, পঠন, মনন ইত্যাদিকে হেতু বলে মনে না করে ভগবৎ-কৃপাকেই তার কারণ বলে যেন মানে। সুতরাং সাধনের উচ্চ অবস্থাতেও সাধক যাতে অভিমানবশতঃ কোথাও বদ্ধ হয়ে না পড়ে, তার জন্য অর্জুনের মাধ্যমে মোহনাশের হেতু হিসাবে ভগবৎকৃপাকেই মানা হয়েছে।

মানুষ যতক্ষণ মনে করে যে তার নিজের উদ্যোগের ফলেই তার কল্যাণ হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার সঠিক বোধ না হয় ততক্ষণ তার মধ্যে অহং-কর্তৃত্ব ভাব দেখা যায়। অহং-কর্তৃত্ব ভাব সম্পূর্ণ নাশ হলে তার ভগবানের

[১] উদয়পুরে পিচোলা নামে একটি বিখ্যাত সরোবর আছে। একবার একজন সাধুপুরুষ সেখানে গিয়ে সেখানকার নাবিকদের কাছে কচ্ছপের স্মরণ করামাত্র ডিম পরিস্ফুট হওয়ার কথাটির সত্যতা যাচাই করেন। নৌচালকগণ এই কথা সমর্থন করেন। সেখানে নদীর চড়াতে কচ্ছপের একটি ডিম চাপা দেওয়া ছিল। যেটি নৌচালকগণ জানত। তারা নদীতে জাল ফেলতে তাতে সেই কচ্ছপটি ধরা পড়ে, তখন সেই সাধুপুরুষটি ডিমটির কাছে গিয়ে দেখলেন সেটি নষ্ট হয়ে গেছে। এতে জানা যায় যে জালে ধরা পড়ায় ভয়ে কচ্ছপের স্মরণ ডিমের ওপর থেকে সরে যায়, যার ফলে ডিমটি নষ্ট হয়ে যায়।

[২] পারস কেরা গুণ কিসা, পলটা নহীঁ লোহা। কই তো নিজ পারস নহীঁ, কই বীচ রহ্যা বিছোহা।
পারসমেঁ অরু সন্তমে, বহুত অন্তরৌ জান। বহ লোহা কঞ্চন করে, বহ করৈ আপু সমান।।

সঙ্গে অভিন্নতার অনুভূতি হয়। সে বুঝতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে আমি কিছুই করি নি, সবকিছু ভগবৎকৃপার দ্বারাই সাধিত হয়েছে। ভগবান যখন অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'তুমি একাগ্রতাপূর্বক গীতা শ্রবণ করেছ কি ?' অর্জুন তখন উত্তর দিলেন—**'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।'** এর অর্থ এই যে, অর্জুন উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর মোহনাশ গীতা শ্রবণে নয় বরং কেবলমাত্র ভগবৎ-কৃপাতেই সম্ভব হয়েছিল। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাঁর অহংভাব সম্পূর্ণ দূর হয়ে গিয়েছিল ; সেইজন্যই তাঁর দৃষ্টি ভগবৎকৃপার উপরে ছিল। তাই ভগবৎসাধর্ম্য প্রাপ্ত অর্জুনের উক্তি ভগবানের বলে মানা হয়।

সাধারণভাবে বিচার করলেও **'নষ্টো মোহঃ....... করিষ্যে বচনং তব'** পদটি ভগবৎ-সাধর্ম্যপ্রাপ্ত ভগবৎ-স্বরূপ মহাপুরুষেরই হতে পারে, সাধকের নয়। সাধনের অতি উচ্চ অবস্থায়ও সাধকের অহং-ভাব এবং স্বার্থ-ভাব কিছুটা থাকতে পারে, সেইজন্য তাকে সাধক বলা হয়। অতএব সে নিজের জন্য উপরিউক্ত পদের প্রয়োগ কি করে করবে ? এই পদটি কেবলমাত্র পূর্ণাবস্থাতেই বলা সম্ভব।

আর একটি প্রশ্ন এই হতে পারে যে **'অর্জুন উবাচ'** এবং তার পরের (১৮।৭৩) শ্লোকটি এই দুটিকে এক শ্লোক কেন মনে করা হয় ? 'উবাচ'টিকে পৃথক্ শ্লোক কেন মানা হয় না ? এর উত্তরে একটি কথা হচ্ছে এই যে, এখানে 'উবাচ' ভগবানের উক্তিরই অন্তর্গত, তার থেকে পৃথক্ নয়। দ্বিতীয়তঃ এখানে 'উবাচ'-কে পৃথক্ বলে মানলে পুনরুক্তি হয় ; কেননা অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক থেকে বাহাত্তর সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ভগবানই বলছিলেন। সেইজন্য সমস্ত গীতায় এই প্রথম পুনরুক্তি বাঁচাবার জন্যই এটি করা হয়েছে।

শরণাগতির পূর্বে অর্জুন উবাচ

একটি প্রশ্ন আসে যে গীতা-পরিমাপে ভগবৎ-শরণাগতির (২।৭) পরে আঠারোবার ব্যবহৃত **'অর্জুন-উবাচ'** (সতেরোবার 'উবাচ' এবং একবার শেষে 'উবাচ' সঙ্গে শ্লোক)কেই ভগবানের উক্তির অন্তর্গত কেন ধরা হয়েছে ? এবং শরণাগতির পূর্বে (১।২১ এবং ১।২৮ শ্লোকগুলির মধ্যে এবং ২।৩ শ্লোকের পরে) ব্যবহৃত তিনবার **'অর্জুন উবাচ'** কেন বাদ দেওয়া হল ?

তার উত্তর হচ্ছে এই যে, ভগবৎ-শরণাগতির আগে অর্জুন যে তিনবার বলেছেন, সেই তিনবার **'অর্জুন-উবাচ'** সঞ্জয়েরই উক্তির অন্তর্গত। অতএব সেইগুলি ভগবানের উক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে জানাচ্ছিলেন যে অর্জুন কি কি বলেছেন। প্রথম অধ্যায়ের **'অর্জুন উবাচ'**-এর আরম্ভে এবং শেষে ব্যবহৃত **'আহ'**, **'উক্ত্বা'**, **'অব্রবীৎ'** ইত্যাদি পদগুলি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অর্জুনের উক্তিগুলিই সঞ্জয় নিজ বক্তব্য হিসাবে বলেছিলেন ; যেমন **'পাণ্ডবঃ'** (১।২০), **'ইদমাহ মহীপতে'** (১।২১), **'এবমুক্তো হৃষীকেশঃ'** (১।২৪), **'কৌন্তেয়ঃ'** (১।২৭), **'ইদমব্রবীৎ'** (১।২৮), **'এবমুক্ত্বার্জুনঃ'** (১।৪৭) ইত্যাদি পদগুলি এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'অর্জুন-উবাচ'র পরে **'এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপ'** এবং **'ন যোৎস্য ইতি'** (২।৯)।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে **'অর্জুন উবাচ'**র পূর্বে এইরূপ পদ পাওয়া যায় না যাতে বলা যায় যে অর্জুনের উক্তিগুলি সঞ্জয় বলছেন। কারণ, প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন যুদ্ধ না করার জন্য ভগবানের সামনে যে সমস্ত যুক্তি উপস্থিত করেছেন সে সবের যুক্তিসঙ্গত উত্তর না দিয়েই ভগবান সহসা (২।২-৩এ) অর্জুনের কাপুরুষতার জন্য তাকে ভর্ৎসনা করেছেন এবং যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়েছেন। এই আজ্ঞায় অর্জুনের ভাব উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। তিনি কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ-বিমুখ হন নি, বরং ধর্মভীরু হয়ে, ধর্মের ভয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত হচ্ছিলেন। তিনি নিজ মৃত্যুভয়ে ভীত হন নি, স্বজনবধের পাপের ভয়ে ভীত হচ্ছিলেন। কাজেই দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান যেই **'কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং'** ইত্যাদি পদের দ্বারা অর্জুনকে জোরে ধমক দিলেন, তখনি অর্জুন নিজ ভাব ঠিক রাখতে না পেরে অকস্মাৎ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন—**'কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন। ইষুভিঃ প্রতি-যোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন'** (২।৪)। 'হে মধুসূদন ! আমি ভীষ্ম ও দ্রোণের সঙ্গে কী করে রণভূমিতে ধনুর্বাণ দিয়ে যুদ্ধ করব ? কেননা হে অরিসূদন ! দুজনেই আমার পূজনীয়।' এখানে 'মধুসূদন' এবং 'অরিসূদন' সম্বোধন করার তাৎপর্য এই যে, 'আপনি দৈত্য এবং শত্রু-বধকারী, কিন্তু আমার সামনে যুদ্ধে উপস্থিত আমার

পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণ (শিক্ষাগুরু)।' জগৎ-সংসারে মানুষের দুটিই প্রধান সম্পর্ক — কৌটুম্বিক সম্বন্ধ এবং বিদ্যা-সম্বন্ধ। দুই-ই অর্জুনের সামনে উপস্থিত। সম্পর্কে বড় হওয়ার জন্য দুজনই আদরণীয় এবং পূজনীয়। ভগবান তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আদেশ করায় উদ্বিগ্ন হয়ে অর্জুন একের পর এক বলতে থাকলেন ; এইজন্য সঞ্জয়ের **'ইদমাহ'**, **'উক্ত্বা'** ইত্যাদি পদ দ্বারা সঙ্কেত করার অবকাশ হয়নি।

বিশেষভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের বলার পর (২।৯-১০এ) যেখানে সঞ্জয় বলেছেন, সেখানে তিনি তাঁর উক্তি দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) **'এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপ'** পদ দ্বারা সঞ্জয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্লোক পর্যন্ত কথিত অর্জুনের বাক্যের দিকে লক্ষ্য করালেন এবং (২) **'ন যোৎস্যে'** পদটির দ্বারা সঞ্জয় অর্জুনের বাক্যটিকে স্পষ্টরূপে নিজের কথায় বললেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে যখন অর্জুনের শ্লোকগুলি এইভাবে সঞ্জয়ের শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত বলে মানা হয়, তাহলে আবার একাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয় উক্ত **'এবমুক্ত্বা'** (১১।৯) **'এতচ্ছ্রুত্বা'** (১১।৩৫) এবং **'ইত্যর্জুনম্'** (১১।৫০) এই পদগুলির পূর্বে ব্যবহৃত ভগবানের বচনগুলির এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয় দ্বারা উক্ত **'ইত্যহম্'** (১৮।৭৪) পদের পূর্বে ব্যবহৃত ভগবৎ-স্বরূপ অর্জুনের উক্তিও সঞ্জয়েরই উক্তির অন্তর্গত বলে কেন মানা হয় না ? এই প্রশ্নের উত্তর যদিও অন্য স্থানে সাধারণভাবে দেওয়া হয়েছে, তবুও এখানে বলা যায় যে ভগবানের উক্তি যে ভাবেই উপস্থাপিত করা হোক না কেন তা ভগবানের বচন বলেই মানা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সঞ্জয় শ্রীবেদব্যাসপ্রদত্ত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন এবং অর্জুনকেও ভগবান দিব্যদৃষ্টি দিয়েছেন (১১।৮)। তারই জন্য একাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি ভগবৎ-প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়, যার দ্বারা সঞ্জয় ভগবান এবং অর্জুনের উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, নিজের নয়।

আর একটি কথা এই যে, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদরূপ গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করাচ্ছিলেন, যেটি বলতে গিয়ে তিনি উপর্যুক্ত **'এবমুক্ত্বা'**, **'এতচ্ছ্রুত্বা'** ইত্যাদি পদগুলির প্রয়োগ করেছেন। সঞ্জয় ভগবদ্-বাণীরূপ মন্ত্রের দ্রষ্টামাত্র। সুতরাং ভগবান কথিত শ্লোক ভগবানের বলেই মানা উচিত।

একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে যেমন্ শরণাগতির আগে উল্লিখিত অর্জুনের শ্লোকগুলিকে সঞ্জয় কথিত বলে মানা হয়েছে, তেমনি শরণাগতির আগে উল্লিখিত ভগবানের শ্লোকগুলিকেও (২।২-৩) সঞ্জয়কথিত বলে কেন মনে করা হবে না ? কারণ ভগবানের উপদেশ দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে শুরু হয়েছে। এর উত্তরে বলা যায় যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয়—দুটি শ্লোকই গীতার মূল শ্লোক এবং এর মধ্যে ভগবান **'অনার্যজুষ্টম্'** **'অস্বর্গ্যম্'** **'অকীর্তিকরম্'** ইত্যাদি পদ দ্বারা স্বধর্ম ত্যাগের যে হানিগুলিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন, সেইগুলিই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যারূপে দ্বিতীয় অধ্যায়ের একত্রিশ থেকে আটত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই দুটি শ্লোকও (২।২-৩) সঞ্জয়ের না মেনে ভগবানের উক্তি বলেই মনে করা উচিত। এছাড়া ভগবান এই শ্লোকগুলিতে অর্জুনকে কাপুরুষতা ত্যাগপূর্বক যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে আদেশ দিয়েছেন, ভগবৎ-স্বরূপ (আশ্রিত) অর্জুন সমস্ত উপদেশের শেষে সেটিকেই শিরোধার্য করেছেন—**'করিষ্যে বচনং তব'** (১৮।৭৩)। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে এসব ভগবানেরই শ্লোক, সঞ্জয়ের নয়।

গভীরভাবে বিচার করলে বোঝা যায় যে ভগবদ্গীতার দুটি ভাগ আছে—(১) **'ইতিহাস-ভাগ'**, যা প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভ থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোক পর্যন্ত বর্ণিত এবং (২) **উপদেশ-ভাগ**, যা দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত। গীতার মূলই হচ্ছে ইতিহাস-ভাগ, যার আধারের ওপর উপদেশ-ভাগ অধিষ্ঠিত। এই দুটি ভাগের মধ্যে ইতিহাস-ভাগটি সঞ্জয়ের উক্তির অন্তর্গত এবং উপদেশ-ভাগের অন্তর্গত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণার্জুনের সংবাদ। ইতিহাস-ভাগে বর্ণিত অর্জুনের উক্তি সঞ্জয়ের বক্তব্যে লীন হয়, ভগবৎ-কথায় নয়। কারণ ইতিহাসই হোক বা উপদেশ হোক ভগবৎ-মহিমা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় না।

আরও একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে গীতায় উল্লিখিত সমস্ত ভগবদ্-বচন যদি ভগবানের শ্লোকের মধ্যে ধরা অপরিহার্য হয়, তাহলে প্রথম অধ্যায়ের পঁচিশ সংখ্যক

শ্লোকে বর্ণিত **'পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূন্'**—এই বাক্যটি গীতা-পরিমাণে ভগবানের শ্লোকের মধ্যে কেন গণ্য করা হয় নি ? এর উত্তরে প্রথম কথা হল এই যে, প্রথম অধ্যায়ের পঁচিশ সংখ্যক শ্লোকের সম্পূর্ণ অংশটি ভগবান-কথিত নয়, আসলে এই শ্লোকের উত্তরার্ধে বর্ণিত শুধুমাত্র এগারটি অক্ষর ভগবান-কথিত। সেইজন্য সম্পূর্ণ শ্লোকটি তাঁর কথিত না হওয়ায় এটিকে পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি। দ্বিতীয়তঃ মহর্ষি বেদব্যাস (শ্রীভগবানুবাচ পদটি না দিয়ে) এটিকে ভগবানের পৃথক্ শ্লোক বলে স্বীকার করেন নি, বরং এটিকে সঞ্জয়ের উক্তির মধ্যে ধরা হয়েছে। অতএব পৃথক্‌ভাবে ভগবৎ-কথিত শ্লোক না হওয়ায় এটিকে ভগবানের শ্লোকের অন্তর্গত করা হয় নি। তৃতীয়তঃ ভগবান এই শ্লোকটি (১।২১-২৩) অর্জুনের নির্দেশ মান্য করে সারথি হিসাবে বলেছিলেন। তাই এটি পৃথক্‌ভাবে ভগবদ্-বাণী না হওয়ায় ভগবানের শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

'শ্রীভগবানুবাচ'-এর পুনরুক্তি কেন ?

গীতা পরিমাণে (শ্লোকের-গণনায়) এটি একটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন হতে পারে যে অধ্যায়গুলির শুরুতে উল্লিখিত **'শ্রীভগবানুবাচ'** শব্দটি শ্লোকের গণনায় দ্বিতীয়বার কেন ধরা হয়েছে, যখন দেখা যাচ্ছে যে গোড়া থেকে ভগবানই বলছেন ? যেমন— তৃতীয় অধ্যায়ের সাঁইত্রিশ সংখ্যক শ্লোক থেকে ভগবানই বলেছেন, তবুও চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতে 'শ্রীভগবানুবাচ'টি শ্লোকের পরিমাণের গণনায় শ্লোকরূপে পুনঃ সংযুক্ত করা হয়েছে।

এর উত্তরে বলা যায় যে, স্বয়ং ভগবানের মুখপদ্ম-নিঃসৃত দিব্য বাণী গীতার সংকলক হলেন মহর্ষি বেদব্যাস এবং তিনিই এটিকে শ্লোকবদ্ধ করে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। ভগবান অবিরাম বলতে থাকলেও শ্রীবেদব্যাস চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম, দশম, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ের প্রারম্ভে **'শ্রীভগবানুবাচ'** রূপ শ্লোক যুক্ত করেছেন। অধিকার-প্রাপ্ত আপ্তকাম পুরুষ হওয়ায় মহর্ষি বেদব্যাসের বচন সকলেই সর্বদা মান্য করেন। তিনি কৃপাপরবশ হয়ে সাধারণের স্পষ্টভাবে বোঝার সুবিধার্থে বেদকে যেমন চারভাগে (ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ রূপে) বিভক্ত করেছেন, তেমনি ভগবানের উপদেশ তিনি যেমন উপলব্ধি করেছেন তা স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য গীতাকেও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, অধ্যায়ের শুরুতে কে কথা বলছেন, তা জানাবার জন্যই **'উবাচ'** দেওয়া আবশ্যক হয়। সুতরাং ভগবান অবিরাম বলে গেলেও অধ্যায়ের প্রারম্ভে পুনরায় **'শ্রীভগবানুবাচ'** দেওয়াতে পরিমাণে এগুলিকে ভগবানের শ্লোক বলেই মনে করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ অধ্যায়ের শেষে পুষ্পিকা রূপে **'ইতি'** বলায় নতুন বিষয় হিসাবেই পরের অধ্যায় শুরু হয়। সুতরাং অধ্যায়ের শুরুতে **'শ্রীভগবানুবাচ'** পুনরায় দেওয়া আবশ্যক হওয়াতে শ্রীবেদব্যাস এটিকে পুনরুক্তি বলে মনে করেনি নি। মহর্ষি বেদব্যাসের নির্ধারিত নিয়মসমূহ ব্যত্যয় করার অধিকার কারোরই নেই।

ভগবানের কথিত ছয়শত কুড়িটি শ্লোক

এইপ্রকার গীতার প্রচলিত গ্রন্থে ভগবান কথিত পাঁচশত চুয়াত্তর শ্লোকের সঙ্গে আঠাশটি **'শ্রীভগবানুবাচ'** রূপ শ্লোক, সতেরোটি ভগবদনুপ্রাণিত **'অর্জুন উবাচ'**-রূপ শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের **'অর্জুন উবাচ'**-এর তিয়াত্তর সংখ্যক শ্লোকটি আরও যোগ করলে ভগবানের ছয়শত কুড়িটি (৫৭৪+২৮+১৭+১= ৬২০) শ্লোক হয়। সুতরাং মহাভারতে উক্ত গীতা-পরিমাণের অর্থাৎ গণনার এই বচনটি প্রমাণিত হয়ে যায়—

'ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ'।

অর্জুনের সাতান্নটি শ্লোক

প্রচলিত গীতায় অর্জুনের চুরাশী শ্লোক এবং একুশটি উবাচ আছে ; কিন্তু মহাভারতে উক্ত গীতা-পরিমাণে অর্জুনের সাতান্নটি শ্লোকের কথা বলা হয়েছে। প্রথমে যেমন বলা হয়েছে, ভগবৎ-শরণাগতির পরে সতেরোটি **'অর্জুন উবাচ'** রূপ শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের **'অর্জুন উবাচ'**-এর সঙ্গে তিয়াত্তর সংখ্যক শ্লোকটি ভগবানের শ্লোকে যুক্ত করা হয়েছে আর ভগবৎ-শরণাগতির প্রথমে (২।৭) উল্লিখিত তিনটি **'অর্জুন উবাচ'** কে পরিমাণে আলাদা করে না দেখে **'সঞ্জয় উবাচ'**-এর অন্তর্গত ধরা হয়েছে।

গীতায় এই শৈলীও লক্ষ্য করা যায় যে, একজনের কথিত বাক্য অন্যজনের বাক্যের অন্তর্গত হয়ে যায় ;

যেমন—প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত কথিত দুর্যোধনের বাক্য সঞ্জয়ের বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে দশম থেকে দ্বাদশ শ্লোকের পূর্বার্ধ পর্যন্ত প্রজাপতি ব্রহ্মাকথিত বাক্য ভগবানের বচনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইরূপই অর্জুনের বাক্য **'ন যোৎস্যে'** (২।৯) সঞ্জয়ের বাক্যের অন্তর্গত হয়েছে এবং সাধকের বাক্য **'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে'** (১৫।৪) ভগবানের বাক্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইভাবে গীতা-পরিমাণে প্রথম অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক শ্লোকের উত্তরার্ধের থেকে তেইশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত এবং আঠাশ সংখ্যক শ্লোকের উত্তরার্ধ থেকে ছেচল্লিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক থেকে অষ্টম শ্লোক পর্যন্ত উল্লিখিত অর্জুনের বাক্যগুলি (মোট ছাব্বিশটি শ্লোক)-কে সঞ্জয়ের বাক্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিষয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে যে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদরূপ গীতাশাস্ত্র শোনাতে গিয়ে **'ইদমাহ মহীপতে'** (১।২১) ইত্যাদি পদ দ্বারা জানাচ্ছিলেন যে, 'রাজন্! যুদ্ধস্থলে অর্জুন এরূপ সমস্ত কথা বলেছেন।' সুতরাং ঐ ছাব্বিশটি শ্লোক সঞ্জয়ের শ্লোকের মধ্যেই যুক্ত করে গণনা করা উচিত, অর্জুনের শ্লোকে নয়।

এইপ্রকার গীতার প্রচলিত গ্রন্থে উল্লিখিত অর্জুনের চুরাশী শ্লোকের মধ্যে উপরিউক্ত ছাব্বিশ শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের তিয়াত্তর সংখ্যক শ্লোকটি সরিয়ে নিলে অর্জুনের সাতান্নটি (৮৪-২৭= ৫৭) শ্লোক থাকে। সুতরাং মহাভারতে উক্ত গীতা-পরিমাণে এই বাক্য প্রমাণিত হয় যে—**'অর্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ'**।

সঞ্জয়ের সাতষট্টিটি শ্লোক

গীতার প্রচলিত গ্রন্থ অনুযায়ী সঞ্জয়ের একচল্লিশটি শ্লোকই আছে এবং নয়টি হল **'সঞ্জয় উবাচ'**। কিন্তু গীতা-পরিমাণে সঞ্জয়ের সাতষট্টিটি শ্লোক বলা হয়েছে। গীতার পরিমাণে **'সঞ্জয় উবাচ'**কে পৃথক্ শ্লোক না মেনে সঞ্জয়ের শ্লোকের মধ্যেই ধরা হয়েছে। কারণ গীতায় শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ থাকায় **'শ্রীভগবানুবাচ'** এবং ভগবদনুপ্রাণিত **'অর্জুন উবাচ'**কেই পৃথক্ শ্লোকরূপে মেনে নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, ধৃতরাষ্ট্র এবং সঞ্জয়ের কথোপকথন হস্তিনাপুরে হয়েছিল, ভগবানের নিকটে নয়। যেসব কথা ভগবানের উপস্থিতিতে হয় নি সেই 'উবাচ'গুলিকে শ্লোক হিসাবে মানা হয়নি এবং **'অর্জুন উবাচ'**কে সেইজন্যই শ্লোকরূপে ধরা হয়েছে যে, তিনি তা ভগবানের উপস্থিতিতে বলেছিলেন। সেইজন্য পুষ্পিকাতে গীতাকে **'শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ'** বলা হয়েছে, **'ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় সংবাদ'** বলা হয় নি।

প্রথমেই জানানো হয়েছে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত অর্জুনের ছাব্বিশটি শ্লোক সঞ্জয়ের একচল্লিশ শ্লোকের সঙ্গে যুক্ত করলে সঞ্জয়ের সাতষট্টিটি (২৬+৪১=৬৭) শ্লোক হয়। সুতরাং মহাভারতোক্ত গীতা-পরিমাণের এই বাক্যটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়—**'সপ্তষষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ'**।

ধৃতরাষ্ট্রের একটি শ্লোক

গীতার প্রচলিত গ্রন্থে ধৃতরাষ্ট্রের মাত্র একটিই শ্লোক আছে এবং মহাভারতে উক্ত গীতা-পরিমাণেও ধৃতরাষ্ট্রের একটি শ্লোকই বলা হয়েছে **'ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকম্'**। অতএব এই শ্লোকের সংখ্যায় কোন মতভেদ নেই।

'সঞ্জয় উবাচ'-এর মতো **'ধৃতরাষ্ট্র উবাচ'**কেও পৃথক্‌ভাবে শ্লোক না মেনে ধৃতরাষ্ট্রের শ্লোকেই ধরা হয়েছে। **'ধৃতরাষ্ট্র উবাচ'** এবং **'সঞ্জয় উবাচ'** দুই-ই মহাভারতের বক্তা মহর্ষি বৈশম্পায়নের বাক্যের অন্তর্গত।

প্রশ্ন আসতে পারে যে ধৃতরাষ্ট্রকথিত শ্লোকটি কেন গীতায় সন্নিবেশিত হল? এর উত্তরে প্রথমতঃ বলা যায় যে ধৃতরাষ্ট্রের মূল প্রশ্নই (১।১) গীতা প্রকাশিত হওয়ার হেতু। যুদ্ধস্থলের সমস্ত ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ জানবার জন্যই ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করেছেন। তার উত্তরে মহর্ষি বেদব্যাসের কৃপাপাত্র সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদরূপ গীতাশাস্ত্রটি (যা যুদ্ধস্থলের সর্বপ্রথম ঘটনা ছিল) শ্রীবেদব্যাসেরই বিশেষ কৃপাপাত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাচ্ছেন।[১]

---

[১]মহাভারত পাঠে জানা যায় যে ধৃতরাষ্ট্রের ওপর মহর্ষি বেদব্যাসের বিশেষ কৃপা ছিল। যখন দুই পক্ষ যুদ্ধ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত তখন বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন যে, 'মহাভারতের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, তা হবেই। তুমি যদি এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে চাও, তাহলে আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করতে পারি' (ভীষ্ম. ২।৪-৬)। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ! আমি

অতএব গীতার প্রকাশে এটিই মূল প্রশ্ন হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের এই শ্লোকটি গীতায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রথম অধ্যায়ে যেমন অর্জুনের বিষাদ ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ যোগকারী এবং কল্যাণ পথে চালনাকারী হওয়ায় 'যোগ' (অর্জুন-বিষাদ যোগ) নামে অভিহিত হয়েছে, তেমনি ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নও ভগবদ্বাণী প্রকাশিত করার হেতু হওয়াতে ভগবদ্গীতায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

তাৎপর্য

যদি এই লেখাটি গভীরভাবে মনন ও বিচারপূর্বক এবং ভগবানে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রেখে পাঠ করা যায়, তাহলে মহাভারতে উক্ত গীতা-পরিমাণে সংগতি সঠিক অনুধাবন করা যায় এবং এই বিষয়ে জাগরিত সমস্ত প্রশ্নের সমাধানও হয়ে যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মহর্ষি বেদব্যাসরচিত মহাভারতে গীতার যে পরিমাণ জানানো হয়েছে তা ঠিক। সুতরাং পাঠ করার দৃষ্টিতে গীতার প্রচলিত পাঠই উপযুক্ত এবং পরিমাণের দৃষ্টিতে এই লেখাতে জানানো পদ্ধতি অনুযায়ী মহাভারতকথিত গীতা-পরিমাণই যথাযথ[১]।

গীতার আয়তনগত সঙ্গতি ঠিক ঠিক প্রমাণিত হওয়ায় এই অর্থ পরিস্ফুট হয় যে, মানুষ যখন সংসার থেকে বিমুখ হয়ে নিজ কল্যাণ কামনা করে এবং শুধুমাত্র বাক্য দ্বারাও যদি ভগবানের শরণাগত হয়, তখন (ভগবৎ-পরায়ণ হওয়ায়) তার কল্যাণ হওয়া সুনিশ্চিত হয়। পূর্ণ শরণাগত হলে এক ভগবানই থাকেন অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবানে তখন আর কোন ভেদ থাকে না।

গীতার (শ্লোকের) পরিমাণ অনুসারে তালিকা

অধ্যায়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	যোগ
ধৃতরাষ্ট্র	১																		১
সঞ্জয়	৪৬	৮									৮							৫	৬৭
অর্জুন		১ (২।৫৪)	৩	১	১	৫		২		৭	৩৩	১		১			১	১	৫৭
শ্রীভগবান		৬৭	৪৪	৪৪	৩০	৪৭	৩১	২৮	৩৫	৩৮	২২	২১	৩৫	২৯	২১	২৫	২৯	৭৪	৬২০
পূর্ণ সংখ্যা	৪৭	৭৬	৪৭	৪৫	৩১	৫২	৩১	৩০	৩৫	৪৫	৬৩	২২	৩৫	৩০	২১	২৫	৩০	৮০	৭৪৫

সারাজীবনই অন্ধ, এখন এই চোখে নিজের বংশেরই সংহার দেখতে চাই না। তবে যুদ্ধের ঘটনাগুলি যথাযথভাবে শুনতে চাই (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ২।৭)। বেদব্যাস জানতেনই যে যুদ্ধের প্রথমেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার মহান উপদেশ দান করবেন। তাই গীতার দিব্য উপদেশ ধৃতরাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য শোনাতে তাঁর মন্ত্রী মহাত্মা সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'সঞ্জয় তোমাকে যুদ্ধের সব বিবরণ জানাবেন ; ইনি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যুদ্ধের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ দেখতে, শুনতে এবং জানতে পারবেন। সামনে বা পিছনে, দিনে বা রাত্রে, গুপ্ত বা প্রকটিত ক্রিয়ারূপে পরিণত অথবা সৈনিকের মনে উদিত কোন কিছুই এঁর কাছে লুক্কায়িত থাকতে পারবে না।'

[১]গুজরাতী এবং বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত এরূপ গীতাও দেখতে পাওয়া যায়, যার মধ্যে গীতার ৭৪৫টি শ্লোক আছে। কিন্তু এতে প্রচলিত পাঠের অধিক যে ৪৫টি শ্লোক রয়েছে, সেগুলি গীতার ভাব এবং প্রসঙ্গ অনুযায়ী যথাযথ নয় এবং সেগুলির রচনাও মনে হয় কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির দ্বারা কৃত। সেইজন্য প্রক্ষিপ্ত ঐ ৪৫টি শ্লোক আমাদের উপযুক্ত মনে হয়নি।

॥ শ্রী হরিঃ ॥

গীতায় উক্ত সংক্ষিপ্ত সূক্তিরূপ সুভাষিত

যখন কোন বাক্য বা বাক্যাংশকে তার নিজের স্থান থেকে পৃথক্ করে দিলেও শোনামাত্র কোন অনুভব,-উপদেশ ইত্যাদির বোধ জেগে ওঠে, তখন তাকে '**সূক্তি**' বলা হয়। যদিও গীতার সকল শ্লোকই সূক্তিপদবাচ্য, তথাপি গীতা থেকে কিছু সূক্তি সংক্ষিপ্তাকারে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) 'ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ' (২।৩)
(২) 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' (২।৭)
(৩) 'গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ' (২।১১)
(৪) 'আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত' (২।১৪)
(৫) 'সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে' (২।১৫)
(৬) 'নাসতে বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' (২।১৬)
(৭) 'অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ' (২।১৮)
(৮) 'নায়ং হন্তি ন হন্যতে' (২।১৯)
(৯) 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' (২।২০)
(১০) 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি'।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।' (২।২২)
(১১) 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥' (২।২৩)
(১২) 'নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ' (২।২৪)
(১৩) 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ' (২।২৭)
(১৪) 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥' (২।৩৮)
(১৫) 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (২।৪০)
(১৬) 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' (২।৪৭)
(১৭) 'সমত্বং যোগ উচ্যতে' (২।৪৮)
(১৮) 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি' (২।৬৩)
(১৯) 'প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে' (২।৬৫)
(২০) 'অশান্তস্য কুতঃ সুখম্' (২।৬৬)
(২১) 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী' (২।৬৯)
(২২) 'স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী' (২।৭০)
(২৩) 'নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি' (২।৭১)
(২৪) 'তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্' (৩।২)
(২৫) 'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ' (৩।৫)
(২৬) 'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ' (৩।৯)
(২৭) 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ' (৩।১১)
(২৮) 'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ' (৩।১৩)

(২৯) 'অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥' (৩।১৪)
(৩০) 'এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥' (৩।১৬)
(৩১) 'নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন' (৩।১৮)
(৩২) 'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর' (৩।১৯)
(৩৩) 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥' (৩।২১)
(৩৪) 'অহংকারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে' (৩।২৭)
(৩৫) 'তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ। গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।' (৩।২৮)
(৩৬) 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' (৩।৩৫)
(৩৭) 'জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্' (৩।৪৩)
(৩৮) 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥' (৪।৭)
(৩৯) 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥' (৪।৮)
(৪০) 'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্' (৪।৯)
(৪১) 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (৪।১১)
(৪২) 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' (৪।১৩)
(৪৩) 'গহনা কর্মণো গতিঃ' (৪।১৭)
(৪৪) 'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে' (৪।২৩)
(৪৫) 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥' (৪।২৪)
(৪৬) 'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্' (৪।৩১)
(৪৭) 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে' (৪।৩৩)
(৪৮) 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥' (৪।৩৪)
(৪৯) 'যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহম্' (৪।৩৫)
(৫০) 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' (৪।৩৯)
(৫১) 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' (৪।৪০)
(৫২) 'কর্মযোগো বিশিষ্যতে' (৫।২)
(৫৩) 'নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে' (৫।৩)
(৫৪) 'ফলে সক্তো নিবধ্যতে' (৫।১২)
(৫৫) 'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ' (৫।১৯)
(৫৬) 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ' (৫।২০)
(৫৭) 'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে। আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥' (৫।২২)
(৫৮) 'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥' (৫।২৯)
(৫৯) 'ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন' (৬।২)
(৬০) 'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে' (৬।৩)
(৬১) 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ' (৬।৫)
(৬২) 'সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে' (৬।৯)
(৬৩) 'যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥' (৬।১৭)
(৬৪) 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥' (৬।২২)
(৬৫) 'তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্' (৬।২৩)

(৬৬) 'শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥' (৬।২৫)
(৬৭) 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥' (৬।৩০)
(৬৮) 'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥' (৬।৩২)
(৬৯) 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে' (৬।৩৫)
(৭০) 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি' (৬।৪০)
(৭১) 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি' (৭।৭)
(৭২) 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' (৭।১৪)
(৭৩) 'বাসুদেবঃ সর্বম্' (৭।১৯)
(৭৪) 'মদ্ভক্তা যান্তি মামপি' (৭।২৩)
(৭৫) 'মামনুস্মর যুধ্য চ' (৮।৭)
(৭৬) 'দুঃখালয়মশাশ্বতম্' (৮।১৫)
(৭৭) 'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' (৮।১৬)
(৭৮) 'ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে' (৮।১৯)
(৭৯) 'যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' (৮।২১)
(৮০) 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' (৯।২১)
(৮১) 'গতাগতং কামকামা লভন্তে' (৯।২১)
(৮২) 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' (৯।২২)
(৮৩) 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥' (৯।২৬)
(৮৪) 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥' (৯।২৭)
(৮৫) 'সমোঽহং সর্বভূতেষু' (৯।২৯)
(৮৬) 'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥' (৯।৩০)
(৮৭) 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥' (৯।৩১)
(৮৮) 'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্' (৯।৩৩)
(৮৯) 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।' (৯।৩৪ ; ১৮।৬৫)
(৯০) 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি' (১০।২৫)
(৯১) 'অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্' (১০।৩২)
(৯২) 'যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥' (১০।৪১)
(৯৩) 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্' (১১।৩৩)
(৯৪) 'নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে' (১১।৩৯)
(৯৫) 'ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো' (১১।৪৩)
(৯৬) 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ' (১২।৪)
(৯৭) 'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্' (১২।১২)
(৯৮) 'জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্' (১৩।৮)
(৯৯) 'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥' (১৩।১৩)
(১০০) 'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ' (১৩।১৭)
(১০১) 'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্' (১৩।২১)
(১০২) 'দেহঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ' (১৩।২২)

(১০৩) 'সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥' (১৩৷২৭)
(১০৪) 'ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্' (১৩৷২৮)
(১০৫) 'যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি। তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥' (১৩৷৩০)
(১০৬) 'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে' (১৩৷৩১)
(১০৭) 'ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥' (১৪৷১৮)
(১০৮) 'ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্' (১৫৷১)
(১০৯) 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥' (১৫৷৬)
(১১০) 'মমৈবাংশো জীবলোকে' (১৫৷৭)
(১১১) 'বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ' (১৫৷১০)
(১১২) 'সর্বস্য চাহং হৃদি সংনিবিষ্টঃ' (১৫৷১৫)
(১১৩) 'দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা' (১৬৷৫)
(১১৪) 'কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ' (১৬৷১১)
(১১৫) 'ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥' (১৬৷২১)
(১১৬) 'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ' (১৬৷২৪)
(১১৭) 'শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' (১৭৷৩)
(১১৮) 'দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে। দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥' (১৭৷২০)
(১১৯) 'অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥' (১৭৷২৮)
(১২০) 'যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে' (১৮৷১১)
(১২১) 'যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥' (১৮৷১৭)
(১২২) 'যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্' (১৮৷৩৭)
(১২৩) 'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ' (১৮৷৪৫)
(১২৪) 'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ' (১৮৷৪৬)
(১২৫) 'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ' (১৮৷৪৮)
(১২৬) 'মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি' (১৮৷৫৮)
(১২৭) 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি' (১৮৷৫৯)
(১২৮) 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥' (১৮৷৬১)
(১২৯) 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত' (১৮৷৬২)
(১৩০) 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥' (১৮৷৬৬)
(১৩১) 'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা' (১৮৷৭৩)
(১৩২) 'করিষ্যে বচনং তব' (১৮৷৭৩)
(১৩৩) 'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥' (১৮৷৭৮)

গীতার অনেকার্থ - শব্দকোষ

(গীতার 'সাধক-সঞ্জীবনী' টীকা অনুসারে)

অনেকার্থশ্চ যে শব্দা গীতায়াং সন্তি যত্র বৈ।
সর্বে কোশে গৃহীতাস্তে চৈকার্থা ন কদাচন॥

১. অকর্ম

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) কর্ম না করার বাচক	
২।৪৭	অকর্মণি	কর্মণ্যেবাধিকারস্তে.
৩।৫	অকর্মকৃৎ	ন হি কশ্চিৎ.
৩।৮	অকর্মণঃ ; অকর্মণঃ	নিয়তং কুরু কর্ম.
	(২) কামনা-বাসনা শূন্যের বাচক	
৪।১৬	অকর্ম	কিং কর্ম.
৪।১৭	অকর্মণঃ	কর্মণো হ্যপি.
৪।১৮	অকর্ম ; অকর্মণি	কর্মণ্যকর্ম.

২. অক্ষর

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) সগুণ-নিরাকারের বাচক	
৩।১৫	অক্ষরসমুদ্ভবম্	কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং.
	(২) নির্গুণ-নিরাকারের বাচক	
৮।৩	অক্ষরম্	অক্ষরং ব্রহ্ম.
৮।১১	অক্ষরম্	যদক্ষরং.
১১।১৮	অক্ষরম্	ত্বমক্ষরং পরমং.
১১।৩৭	অক্ষরম্	কস্মাচ্চ তে ন.
১২।১	অক্ষরম্	এবং সততযুক্তা.
১২।৩	অক্ষরম্	যে ত্বক্ষর.
	(৩) সগুণ-নিরাকার, নির্গুণ-নিরাকার আর সগুণ-নিরাকারের বাচক	
৮।২১	অক্ষরঃ	অব্যক্তোঽক্ষর.
	(৪) প্রণবের বাচক	
৮।১৩	একাক্ষরম্	ওমিত্যেকাক্ষরং.
১০।২৫	একমক্ষরম্	মহর্ষীণাং ভৃগুরহং.
	(৫) বর্ণমালার বাচক	
১০।৩৩	অক্ষরাণাম্	অক্ষরাণামকারোঽস্মি.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৬) জীবাত্মার বাচক	
১৫।১৬	অক্ষরঃ, অক্ষরঃ	দ্বাবিমৌ পুরুষৌ.
১৫।১৮	অক্ষরাৎ	যস্মাৎ ক্ষরম.

৩. অচল

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) জীবাত্মার বাচক	
২।২৪	অচলঃ	অচ্ছেদ্যোঽয়ম.
	(২) নির্গুণ-নিরাকারের বাচক	
১২।৩	অচলম্	যে ত্বক্ষরম.
	(৩) স্থিরতার বাচক	
২।৫৩	অচলা	শ্রুতিবিপ্রতিপন্না.
২।৭০	অচলপ্রতিষ্ঠম্	আপূর্যমাণমচল.
৬।১৩	অচলম্	সমং কায়শিরোগ্রীবং.
৭।২১	অচলাম্	যে যো যাং যাং.
৮।১০	অচলেন	প্রয়াণকালে.

৪. অচিন্ত্য

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) জীবাত্মার বাচক	
২।২৫	অচিন্ত্যঃ	অব্যক্তোঽয়ম.
	(২) সগুণ-নিরাকারের বাচক	
৮।৯	অচিন্ত্যরূপম্	কবিং পুরাণ.
	(৩) নির্গুণ-নিরাকারের বাচক	
১২।৩	অচিন্ত্যম্	যে ত্বক্ষরম্.

৫. অধ্যাত্ম

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) পরমাত্মার বাচক	
১০।৩২	অধ্যাত্মবিদ্যা	সর্গাণামাদি.
১১।১	অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্	মদনুগ্রহায়.
১৩।১১	অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্	অধ্যাত্মজ্ঞান.
১৫।৫	অধ্যাত্মনিত্যাঃ	নির্মানমোহা.
	(২) জীবাত্মার বাচক	
৭।২৯	অধ্যাত্মম্	জরামরণমোক্ষায়.
৮।১	অধ্যাত্মম্	কিং তদ্ব্রহ্ম.
৮।৩	অধ্যাত্মম্	অক্ষরং ব্রহ্ম.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৩) বিবেকবোধের বাচক	
৩।৩০	অধ্যাত্মচেতসা	ময়ি সর্বাণি.

৬. অপর

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) অপরের বাচক	
২।২২	অপরাণি	বাসাংসি জীর্ণানি.
৪।২৫	অপরে, অপরে	দৈবমেবাপরে.
৪।২৭	অপরে	সর্বাণীন্দ্রিয়.
৪।২৮	অপরে	দ্রব্যযজ্ঞাস্তপো.
৪।২৯	অপরে	অপানে জুহ্বতি.
৪।৩০	অপরে	অপরে নিয়তাহারাঃ.
৬।২২	অপরম্	যং লব্ধ্বা.
১৩।২৪	অপরে	ধ্যানেনাত্মনি.
১৬।১৪	অপরান্	অসৌ ময়া.
১৮।৩	অপরে	ত্যাজ্যং দোষ.
	(২) জড় প্রকৃতির বাচক	
৭।৫	অপরা	অপরেয়মিত.
	(৩) অর্বাচীন (বর্তমান) কালের বাচক	
৪।৪	অপরম্	অপরং ভবতো.

৭. অপ্রমেয়

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) জীবাত্মার স্বরূপের বাচক	
২।১৮	অপ্রমেয়স্য	অন্তবন্ত ইমে.
	(২) বিরাট্‌রূপ ভগবানের বাচক	
১১।১৭	অপ্রমেয়ম্	কিরীটিনং গদিনং.
১১।৪২	অপ্রমেয়ম্	যচ্চাবহাসার্থ.

৮. অমৃত

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) পরমাত্ম-তত্ত্বের বাচক	
২।১৫	অমৃতত্বায়	যং হি ন.
৪।৩১	যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ	যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো.
১৩।১২	অমৃতম্	জ্ঞেয়ং যত্তৎ.
১৪।২০	অমৃতম্	গুণানেতান.
১৪।২৭	অমৃতস্য	ব্রহ্মণো হি.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(২) সুধার বাচক	
১০।১৮	অমৃতম্	বিস্তরেণাত্মনো.
১০।২৭	অমৃতোদ্ভবম্	উচ্চৈঃশ্রব.
১৮।৩৭	অমৃতোপমম্	যত্তদগ্রে বিষমিব.
১৮।৩৮	অমৃতোপমম্	বিষয়েন্দ্রিয়.
	(২) অমরত্বের বাচক	
৯।১৯	অমৃতম্[১]	তপাম্যহমহং.

৯. অবশ

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) স্বভাবের পরবশতার বাচক	
৩।৫	অবশঃ	ন হি কশ্চিৎ.
১৮।৬০	অবশঃ	স্বভাবজেন.
	(২) ভোগের পরবশতার বাচক	
৬।৪৪	অবশঃ	পূর্বাভ্যাসেন.
	(৩) কর্মানুসারে সর্গ (ব্রহ্মার দিনের আরম্ভ কালের) এবং প্রলয়ের সময়ে পরবশতার বাচক	
৮।১৯	অবশঃ	ভূতগ্রামঃ স.
	(৪) কর্মানুযায়ী মহাসর্গ (সৃষ্টির) এবং মহাপ্রলয়-সময়ে পরবশতার বাচক	
৯।৮	অবশম্	প্রকৃতিং স্বাম.

১০. অব্যক্ত

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) জীবাত্মার বাচক	
২।২৫	অব্যক্তঃ	অব্যক্তোঽয়ম.
	(২) অপ্রকট ও লীন হওয়ার বাচক	
২।২৮	অব্যক্তদীনি, অব্যক্তনিধনানি	অব্যক্তদীনি.
	(৩) সগুণ-সাকারের বাচক	
৭।২৪	অব্যক্তম্	অব্যক্তং ব্যক্তি.
	(৪) ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীরের বাচক	
৮।১৮	অব্যক্তাৎ, অব্যক্তসংজ্ঞকে	অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ.
৮।২০	অব্যক্তাৎ	পরস্তস্মাৎ তু.

[১]সাধারণতঃ 'অমৃত' শব্দটি পরমাত্মারই বাচক, কিন্তু যেখানে মৃত্যু ও অমরত্বের বর্ণনা আসে, সেখানে 'অমৃত' শব্দ অমরত্বের বাচক।

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৫) প্রকৃতির বাচক	
১৩।৫	অব্যক্তম্	মহাভূতান্যহংকারো.
	(৬) সগুণ-নিরাকারের বাচক	
৮।২০	অব্যক্তঃ	পরস্তস্মাৎ তু.
৯।৪	অব্যক্তমূর্তিনা	ময়া ততমিদং.
	(৭) নির্গুণ-নিরাকারের বাচক	
১২।১	অব্যক্তম্	এবং সততযুক্তা.
১২।৩	অব্যক্তম্	যে ত্বক্ষর.
১২।৫	অব্যক্তচেতসাম্, অব্যক্তা	ক্লেশোঽধিকতর.
	(৮) সগুণ-নিরাকার, নির্গুণ-নিরাকার এবং সগুণ-সাকারের বাচক	
৮।২১	অব্যক্তঃ	অব্যক্তোঽক্ষর.

১১. অব্যয়

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) জীবাত্মার স্বরূপের বাচক	
২।১৭	অব্যয়স্য	অবিনাশি তু.
২।২১	অব্যয়ম্	বেদাবিনাশিনং.
১৩।৩১	অব্যয়ঃ	অনাদিত্বাৎ.
১৪।৫	অব্যয়ম্	সত্ত্বং রজস্তম.
	(২) ভগবৎ-স্বরূপের বাচক	
৪।৬	অব্যয়াত্মা	অজোঽপি.
৪।১৩	অব্যয়ম্	চাতুর্বর্ণ্যং.
৭।১৩	অব্যয়ম্	ত্রিভির্গুণ.
৭।২৪	অব্যয়ম্	অব্যক্তং ব্যক্তি.
৭।২৫	অব্যয়ম্	নাহং প্রকাশঃ.
৯।১৩	অব্যয়ম্	মহাত্মানস্ত.
৯।১৮	অব্যয়ম্	গতির্ভর্তা প্রভুঃ.
১১।৪	অব্যয়ম্	মন্যসে যদি.
১১।১৮	অব্যয়ঃ	ত্বমক্ষরং পরমং.
১৪।২৭	অব্যয়স্য	ব্রহ্মণো হি.
১৫।১৭	অব্যয়ঃ	উত্তমঃ পুরুষঃ.
	(৩) পরমাত্মার সত্তার বাচক	
১৮।২০	অব্যয়ম্	সর্বভূতেষু.
	(৪) চিরকালের বাচক	
২।৩৪	অব্যয়াম্	অকীর্তিং চাপি.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৫) অবিনাশিত্বের বাচক	
৪।১	অব্যয়ম্	ইমং বিবস্বতে.
৯।২	অব্যয়ম্	রাজবিদ্যা রাজগুহ্য.
১১।২	অব্যয়ম্	ভবাপ্যয়ৌ হি.
১৫।১	অব্যয়ম্	ঊর্ধ্বমূলমধঃ.
১৫।৫	অব্যয়ম্	নির্মানমোহা.
১৮।৫৬	অব্যয়ম্	সর্বকর্মাণ্যপি.

১২. অশুভ

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) সংসারের বাচক	
৪।১৬	অশুভাৎ	কিং কর্ম কিমকর্মেতি.
৯।১	অশুভাৎ	ইদং তু তে.
	(২) আসুরী সম্পদযুক্তের বাচক	
১৬।১৯	অশুভান্	তানহং দ্বিষতঃ.

১৩. অসৎ

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) নাশবানের বাচক	
২।১৬	অসৎ	নাসতো বিদ্যতে.
৯।১৯	অসৎ	তপাম্যহমহং.
১১।৩৭	অসৎ	কস্মাচ্চ তে.
১৩।১২	অসৎ	জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি.
১৭।২৮	অসৎ	অশ্রদ্ধয়া হুতং.
	(২) নীচ যোনির বাচক	
১৩।২১	অসৎ	পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো.

১৪. অহংকার

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) ব্যষ্টি (মনুষ্যনির্মিত)-অহংকারের বাচক	
৩।২৭	অহংকারবিমূঢ়াত্মা	প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি.
১৬।১৮	অহংকারম্	অহংকারং বলং দর্পং.
১৭।৫	দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ	অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং.
১৮।৫৩	অহংকারম্	অহংকারং বলং দর্পং.
১৮।৫৮	অহংকারাৎ	মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি.
১৮।৫৯	অহংকারম্	যদহংকারমাশ্রিত্য.
	(২) সমষ্টি-অহংকারের বাচক	
৭।৪	অহংকারঃ	ভূমিরাপোঽনলো.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
১৩।৫	অহংকারঃ	মহাভূতান্যহংকারো.

১৫. আত্মা

(১) স্বয়ং ভগবানের (সগুণ-সাকার) বাচক

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৪।৬	অব্যয়াত্মা, আত্মমায়য়া	অজোঽপি.
৪।৭	আত্মানম্	যদা যদা.
৭।১৮	আত্মা	উদারাঃ সর্ব.
১০।১৫	স্বয়মেবাত্মনাত্মানম্	স্বয়মেবাত্মনা.
১০।১৬	আত্মবিভূতয়ঃ	বক্তুমর্হস্য.
১০।১৮	আত্মনঃ	বিস্তরেণাত্মনো.
১০।১৯	আত্মবিভূতয়ঃ	হন্ত তে.
১১।৩	আত্মানম্	এবমেতদ্যথাত্থ.
১১।৪	আত্মানম্	মন্যসে যদি.
১১।৪৭	আত্মযোগাৎ	ময়া প্রসন্নেন.

(২) নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মার বাচক

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৬।২৫	আত্মসংস্থম্	শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্.
৬।২৬	আত্মনি	যতো যতো.
১৮।৩৭	[১]আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্	যত্তদগ্রে বিষমিব.

(৩) সগুণ-নিরাকার পরমাত্মার বাচক

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
২।৪৫	আত্মবান্	ত্রৈগুণ্যবিষয়া.
৯।৫	আত্মা	ন চ মৎস্থানি.
১৩।২৪	আত্মানম্	ধ্যানেনাত্মনি.

(৪) স্বয়ং (জীবাত্মা)-এর বাচক

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
২।৫৫	আত্মন্যেবাত্মনা	প্রজহাতি যদা.
৩।১৭	আত্মরতিঃ ; আত্মতৃপ্তঃ ; আত্মনি	যস্ত্বাত্মরতিরেব.
৩।৪৩	আত্মানমাত্মনা	এবং বুদ্ধেঃ পরং.
৪।৩৫	আত্মনি	যজ্জ্ঞাত্বা ন.
৪।৩৮	আত্মনি	ন হি জ্ঞানেন.
৪।৪১	আত্মবন্তম্	যোগসংন্যস্ত.
৪।৪২	আত্মনঃ	তস্মাদজ্ঞান.
৫।৭	সর্বভূতাত্মভূতাত্মা[২]	যোগযুক্তো.
৫।২১	অসক্তাত্মা ; ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা	বাহ্যস্পর্শেষ্ব.

[১]সাংখ্যযোগের বিষয় হওয়ায় এখানে 'আত্মা' শব্দটিকে নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মার বাচক ধরা হয়েছে।

[২]কর্মযোগের প্রকরণ হওয়ায় 'আত্মা' শব্দটি দুবারই 'স্বয়ং'-এর বাচকরূপে গৃহীত হয়েছে।

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৫।২৬	বিদিতাত্মনাম্	কামক্রোধবিযুক্তানাং.
৬।৫	আত্মনাত্মানম্ ; আত্মানম্ ; আত্মৈব ; আত্মনঃ ; আত্মৈব ; আত্মনঃ	উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং.
৬।৬	আত্মাত্মনঃ ; আত্মৈবাত্মনা ; আত্মৈব	বন্ধুরাত্মা.
৬।৭	জিতাত্মনঃ	জিতাত্মনঃ প্রশান্ত.
৬।৮	জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা	জ্ঞানবিজ্ঞান.
৬।১৮	আত্মন্যেব	যদা বিনিয়তং.
৬।২০	আত্মনাত্মানং ; আত্মনি	যত্রোপরমতে চিত্তং.
৬।২৮	আত্মানম্	যুঞ্জন্নেবং সদা.
৬।২৯	আত্মানম্ ; আত্মনি	সর্বভূতস্থমা.
৭।১৮	যুক্তাত্মা	উদারাঃ সর্ব.
৯।২৮	সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা	শুভাশুভফলৈরেবং.
৯।৩৪	আত্মানম্	মন্মনা ভব.
১০।১১	আত্মভাবস্থঃ	তেষামেবানুকম্পার্থ.
১৩।২৪	আত্মনি ; আত্মনা	ধ্যানেনাত্মনি.
১৩।২৮	আত্মনাত্মানম্	সমং পশ্যন্ হি.
১৩।২৯	আত্মানম্	প্রকৃত্যৈব চ.
১৫।১১	আত্মনি	যতন্তো যোগিন.
১৬।৯	নষ্টাত্মানঃ	এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য.
১৬।২১	আত্মনঃ	ত্রিবিধং নরকস্যেদং.
১৬।২২	আত্মনঃ	এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়.
১৮।১৬	আত্মানম্	তত্রৈবং সতি.
১৮।৩৯	আত্মনঃ	যদগ্রে চানুবন্ধে.
	(৫) স্বয়ং মানুষের বাচক	
২।৬৪	আত্মবশ্যৈঃ	রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু.
৩।১৩	আত্মকারণাৎ	যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ.
৬।১১	আত্মনঃ	শুচৌ দেশে.
৮।১২	আত্মনঃ	সর্বদ্বারাণি.
১৪।২৪	তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ	সমদুঃখসুখঃ.
১৬।১৭	আত্মসম্ভাবিতাঃ	আত্মসম্ভাবিতাঃ.
১৬।১৮	আত্মপরদেহেষু	অহংকারং বলং.
১৭।১৯	আত্মনঃ	মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো.
	(৬) শরীরের বাচক	
৪।২১	যতচিত্তাত্মা	নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৫।৭	বিজিতাত্মা	যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা.
৬।১০	যতচিত্তাত্মা	যোগী যুঞ্জীত.
৬।৩২	আত্মৌপম্যেন	আত্মৌপম্যেন সর্বত্র.
১৮।৪৯	জিতাত্মা	অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র.
	(৭) অন্তঃকরণের বাচক	
২।৬৪	বিধেয়াত্মা	রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু.
৩।২৭	অহংকারবিমূঢ়াত্মা	প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি.
৪।২৭	আত্মসংযমযোগাগ্নৌ	সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি.
৪।৪০	সংশয়াত্মা ; সংশয়াত্মনঃ	অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ.
৫।৭	বিশুদ্ধাত্মা	যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা.
৫।১১	আত্মশুদ্ধয়ে	কায়েন মনসা.
৫।২১	আত্মনি	বাহ্যস্পর্শেষ্ব.
৬।১২	আত্মবিশুদ্ধয়ে	তত্রৈকাগ্রং মনঃ.
৬।১৪	প্রশান্তাত্মা	প্রশান্তাত্মা.
৬।২৯	যোগযুক্তাত্মা	সর্বভূতস্থ.
৮।২	নিয়তাত্মভিঃ	অধিযজ্ঞঃ কথং.
৯।২৬	প্রয়তাত্মনঃ	পত্রং পুষ্পং ফলং.
১১।২৪	প্রব্যথিতান্তরাত্মা	নভস্পৃশম্.
১৫।১১	অকৃতাত্মানঃ	যতন্তো যোগিন.
	(৮) মনের বাচক	
৬।১০	আত্মানম্	যোগী যুঞ্জীত.
৬।১৫	আত্মানম্	যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং.
৬।১৯	আত্মনঃ	যথা দীপো.
৬।৩৬	অসংযতাত্মনা ; বশ্যাত্মনা	অসংযতাত্মনা.
৬।৪৭	অন্তরাত্মনা	যোগিনামপি.
১৩।৭	আত্মবিনিগ্রহঃ	অমানিত্বমদম্ভি.
১৭।১৬	আত্মবিনিগ্রহঃ	মনঃপ্রসাদঃ.
১৮।৫৪	প্রসন্নাত্মা	ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা.
	(৯) ইন্দ্রিয়সমূহের বাচক	
১৮।৫১	আত্মানম্	বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া.
	(১০) মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়সমূহের বাচক	
১২।১১	যতাত্মবান্	অথৈতদপ্যশক্তো.
১২।১৪	যতাত্মা	সংতুষ্টঃ সততং.
	(১১) তদাকার হওয়ার বাচক	
২।৪৩	কামাত্মানঃ	কামাত্মানঃ স্বর্গপরা.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
১৪।৭	রাগাত্মকম্	রজো রাগাত্মকং.
১৮।২৭	হিংসাত্মকঃ	রাগী কর্মফল.
১৮।৪৪	পরিচর্যাত্মকম্	কৃষিগৌরক্ষ্য.

১৬. ইষ্ট

(১) কর্তব্যকর্মের বাচক

৩।১০	ইষ্টকামধুক্	সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ.
৩।১২	ইষ্টান্	ইষ্টান্ ভোগান্ হি.

(২) অনুকূলতার বাচক

১৩।৯	ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু	অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ.
১৮।১২	ইষ্টম্	অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং.

(৩) রুচির বাচক

১৭।৯	ইষ্টাঃ	কট্বম্ললবণা.

(৪) প্রিয়তার বাচক

১৮।৬৪	ইষ্টঃ	সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ.

(৫) পূজার বাচক

১৮।৭০	ইষ্টঃ	অধ্যেষ্যতে চ.

১৭. ঈশ্বর

(১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাচক

৪।৬	ঈশ্বরঃ	অজোঽপি.
৫।২৯	সর্বলোকমহেশ্বরম্	ভোক্তারং যজ্ঞ.
৯।১১	ভূতমহেশ্বরম্	অবজানন্তি.
১০।৩	লোকমহেশ্বরম্	যো মামজমনাদিং.
১১।৩	পরমেশ্বর	এবমেতদ্যথাথ.
১১।৪	যোগেশ্বর	মন্যসে যদি.
১১।৯	মহাযোগেশ্বরঃ	এবমুক্ত্বা ততো.
১৫।১৭	ঈশ্বরঃ	উত্তমঃ পুরুষঃ.
১৮।৭৫	যোগেশ্বরাৎ	ব্যাসপ্রসাদাৎ.
১৮।৭৮	যোগেশ্বরঃ	যত্র যোগেশ্বরঃ.

(২) সগুণ-নিরাকার অন্তর্যামী পরমাত্মার বাচক

১৩।২৭	পরমেশ্বরম্	সমং সর্বেষু.
১৩।২৮	ঈশ্বরম্	সমং পশ্যন্ হি.
১৮।৬১	ঈশ্বরঃ	ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৩) জীবাত্মার বাচক	
১৩।২২	মহেশ্বরঃ	উপদ্রষ্টানুমন্তা.
১৫।৮	ঈশ্বরঃ	শরীরং যদবাপ্নোতি.
	(৪) আসুরী-সম্পদ্‌যুক্তের বাচক	
১৬।১৪	ঈশ্বরঃ	অসৌ ময়া হতঃ.
	(৫) শাসকের বাচক	
১৮।৪৩	ঈশ্বরভাবঃ	শৌর্যং তেজো.

১৮. এক

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) স্থিরতার বাচক	
৬।১২	একাগ্রম্	তত্রৈকাগ্রং মনঃ.
১৮।৭২	একাগ্রেণ	কচ্চিদেতচ্ছ্রুতম্.
	(২) অভাবের বাচক	
৬।১৬	একান্তম্	নাত্যশ্নতস্ত্ব.
	(৩) অভিন্নতার বাচক	
৫।৫	একম্	যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে.
৬।৩১	একত্বম্	সর্বভূতস্থিতং.
৯।১৫	একত্বেন	জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে.
	(৪) অনন্যতার বাচক	
৭।১৭	একভক্তিঃ	তেষাং জ্ঞানী.
১৮।৬৬	একম্	সর্বধর্মান্.
	(৫) একাকীর বাচক	
৬।১০	একাকী	যোগী যুঞ্জীত.
১১।২০	একেন	দ্যাবাপৃথিব্যো.
১১।৪২	একঃ	যচ্চাবহাসার্থ.
১৩।৩৩	একঃ	যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ.
	(৬) অন্যের বাচক	
১৮।৩	একে	ত্যাজ্যং দোষবদি.
	(৭) মনের বাচক	
১৩।৫	একম্	মহাভূতান্যহংকারো.
	(৮) প্রকৃতির বাচক	
১৩।৩০	একস্থম্	যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৯) সংখ্যার বাচক	
২।৪১	একা	ব্যবসায়াত্মিকা.
৩।২	একম্	ব্যামিশ্রেণেব.
৫।১	একম্	সন্ন্যাসং কর্মণাং.
৫।৪	একম্	সাংখ্যযোগৌ.
৮।১৩	একাক্ষরম্	ওমিত্যেকাক্ষরং.
৮।২৬	একয়া	শুক্লকৃষ্ণে গতী.
১০।২৫	একমক্ষরম্	মহর্ষীণাং ভৃগুরহং.
১০।৪২	একাংশেন	অথবা বহুনৈতেন.
১৮।২০	একম্	সর্বভূতেষু যেনৈকং.
১৮।২২	একস্মিন্	যত্তু কৃৎস্নবদেক.
	(১০) স্থানের বাচক	
১১।৭	একস্থম্	ইহৈকস্থং জগৎ.
১১।১৩	একস্থম্	তত্রৈকস্থং জগৎ.

১৯. কর্ম

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) শুধু কর্মের বাচক	
২।৩৯	কর্মবন্ধনম্	এষা তেঽভিহিতা.
৩।১	কর্মণঃ ; কর্মণি	জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে.
৩।৯	কর্মবন্ধনঃ	যজ্ঞার্থাৎ কর্মণো.
৩।২৮	গুণকর্মবিভাগয়োঃ	তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো.
৩।২৯	গুণকর্মসু	প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ.
৩।৩১	কর্মভিঃ	যে মে মতমিদং.
৪।১৬	কর্ম ; কর্ম	কিং কর্মকিমকর্মেতি.
৪।১৭	কর্মণঃ ; কর্মণঃ	কর্মণো হ্যপি.
৪।১৯	জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্	যস্য সর্বে.
৪।৩৩	কর্ম	শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়া.
৪।৩৭	সর্বকর্মাণি	যথৈধাংসি.
৪।৪১	যোগসন্ন্যস্তকর্মাণম্ ; কর্মাণি	যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং.
৫।১৩	সর্বকর্মাণি	সর্বকর্মাণি মনসা.
৫।১৪	কর্মাণি ; কর্মফলসংযোগম্	ন কর্তৃত্বং.
১৫।২	কর্মানুবন্ধীনি	অধশ্চোর্ধ্বং.
১৮।৩	কর্ম	ত্যাজ্যং দোষ.
১৮।১০	কর্ম	ন দ্বেষ্ট্যকুশলং.
১৮।১১	কর্মাণি	ন হি দেহভৃতা.
১৮।১২	কর্মণঃ	অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
১৮।১৩	সর্বকর্মণাম্	পঞ্চৈতানি মহাবাহো.
১৮।১৫	কর্ম	শরীরবাঙ্মনোভি.
১৮।১৮	কর্মচোদনা ; কর্ম, কর্মসংগ্রহঃ	জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা.
১৮।১৯	কর্ম	জ্ঞানং কর্ম চ.
১৮।২৩	কর্ম	নিয়তং সঙ্গরহিত.
১৮।২৪	কর্ম	যত্তু কামেপ্সুনা.
১৮।২৫	কর্ম	অনুবন্ধং ক্ষয়ং.
	(২) সৃষ্টি-রচনারূপ কর্মের বাচক	
৭।২৯	কর্ম	জরামরণমোক্ষায়.
৮।১	কর্ম	কিং তদ্ব্রহ্ম.
৮।৩	কর্মসংজ্ঞিতঃ	অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং.
	(৩) সকাম কর্মের বাচক	
২।৪৩	জন্মকর্মফলপ্রদাম্	কামাত্মানঃ স্বর্গপরা.
২।৪৯	কর্ম	দূরেণ হ্যবরং.
২।৫১	কর্মজম্	কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা.
৩।২৫	কর্মণি	সক্তাঃ কর্মণ্য.
৩।২৬	কর্মসঙ্গিনাম্	ন বুদ্ধিভেদং.
১৮।২	কর্মণাম্	কাম্যানাং কর্মণাং.
	(৪) শাস্ত্রবিহিত (শুভ) কর্মের বাচক	
২।৪৭	কর্মণি ; কর্মফলহেতুঃ	কর্মণ্যেবাধিকারস্তে.
২।৪৮	কর্মাণি	যোগস্থঃ কুরু.
২।৫০	কর্মসু	বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ.
৩।৪	কর্মণাম্	ন কর্মণামনারম্ভা.
৩।৭	কর্মযোগম্	যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি.
৩।৮	কর্ম ; কর্ম	নিয়তং কুরু কর্ম.
৩।৯	কর্মণঃ ; কর্ম	যজ্ঞার্থাৎ কর্মণো.
৩।১৪	কর্মসমুদ্ভবঃ	অন্নাদ্ভবন্তি.
৩।১৫	কর্ম	কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং.
৩।১৯	কর্ম ; কর্ম	তস্মাদসক্তঃ সততং.
৩।২২	কর্মণি	ন মে পার্থাস্তি.
৩।২৩	কর্মণি	যদি হ্যহং ন.
৩।২৪	কর্ম	উৎসীদেয়ুরিমে লোকা.
৩।২৬	সর্বকর্মাণি	ন বুদ্ধিভেদং.
৩।৩০	কর্মাণি	ময়ি সর্বাণি.
৪।১২	কর্মণাম্ ; কর্মজা	কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৪।১৪	কর্মফলে	ন মাং কর্মাণি.
৪।১৫	কর্ম, কর্ম	এবং জ্ঞাত্বা.
৪।১৮	কর্মণি, কর্ম	কর্মণ্যকর্ম যঃ.
৪।২০	কর্মফলাসঙ্গম্ ; কর্মণি	ত্যক্ত্বা কর্ম.
৪।২৩	কর্ম	গতসঙ্গস্য.
৪।২৪	ব্রহ্মকর্মসমাধিনা	ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম.
৪।৩২	কর্মজান্	এবং বহুবিধা.
৫।১	কর্মণাম্	সন্ন্যাসং কর্মণাং.
৫।২	কর্মসন্ন্যাসাৎ ; কর্মযোগঃ	সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ.
৫।১০	কর্মাণি	ব্রহ্মণ্যাধায়.
৫।১১	কর্ম	কায়েন মনসা.
৫।১২	কর্মফলম্	যুক্তঃ কর্মফলং.
৬।১	কর্মফলম্ ; কর্ম	অনাশ্রিতঃ কর্মফলং.
৬।৩	কর্ম	আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং.
৬।৪	কর্মসু	যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু.
৬।১৭	কর্মসু	যুক্তাহারবিহারস্য.
৭।২৮	পুণ্যকর্মণাম্	যেষাং ত্বন্তগতং.
৯।১২	মোঘকর্মাণঃ	মোঘাশা মোঘকর্মাণো.
১১।৫৫	মৎকর্মকৃৎ	মৎকর্মকৃন্মৎপরমো.
১২।৬	কর্মাণি	যে তু সর্বাণি.
১২।১০	মৎকর্মপরমঃ ; কর্মাণি	অভ্যাসেঽপ্যসমর্থো.
১২।১১	সর্বকর্মফলত্যাগম্	অথৈতদপ্যশক্তোঽসি.
১২।১২	কর্মফলত্যাগঃ	শ্রেয়ো হি জ্ঞানম্.
১৩।২৪	কর্মযোগেন	ধ্যানেনাত্মনি.
১৪।৭	কর্মসঙ্গেন	রজো রাগাত্মকং.
১৪।৯	কর্মণি	সত্ত্বং সুখে.
১৪।১২	কর্মণাম্	লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ.
১৪।১৫	কর্মসঙ্গিষু	রজসি প্রলয়ং.
১৬।২৪	কর্ম	তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং.
১৭।২৬	কর্মণি	সদ্ভাবে সাধুভাবে.
১৭।২৭	কর্ম	যজ্ঞে তপসি দানে.
১৮।২	সর্বকর্মফলত্যাগম্	কাম্যানাং কর্মণাং.
১৮।৩	যজ্ঞদানতপঃকর্ম	ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে.
১৮।৫	যজ্ঞদানতপঃকর্ম	যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন.
১৮।৬	কর্মাণি	এতান্যপি তু.
১৮।৮	কর্ম	দুঃখমিত্যেব.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
১৮।৯	কর্ম	কার্যমিত্যেব.
১৮।১১	কর্মফলত্যাগী	ন হি দেহভৃতা.
১৮।২৭	কর্মফলপ্রেপ্সুঃ	রাগীকর্মফলপ্রেপ্সু.
১৮।৪১	কর্মাণি	ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং.
১৮।৪২	ব্রহ্মকর্ম	শমো দমস্তপঃ.
১৮।৪৩	কর্ম	শৌর্যং তেজো.
১৮।৪৪	বৈশ্যকর্ম ; পরিচর্যাত্মকং কর্ম	কৃষিগৌরক্ষ্য.
১৮।৪৫	কর্মণি ; স্বকর্মনিরতঃ	স্বে স্বে কর্মণ্য.
১৮।৪৬	স্বকর্মণা	যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং.
১৮।৪৭	কর্ম	শ্রেয়ান্ স্বধর্মো.
১৮।৪৮	কর্ম	সহজং কর্ম কৌন্তেয়.
১৮।৫৬	সর্বকর্মাণি	সর্বকর্মাণ্যপি.
১৮।৫৭	সর্বকর্মাণি	চেতসা সর্বকর্মাণি.
১৮।৬০	কর্মণা	স্বভাবজেন কৌন্তেয়.
১৮।৭১	পুণ্যকর্মণাম্	শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ.
	(৫) ক্রিয়ার বাচক	
৩।৭	কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ	যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি.
৩।২৭	কর্মাণি	প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি.
৪।৯	কর্ম	জন্ম কর্ম চ.
৪।১৪	কর্মাণি, কর্মভিঃ	ন মাং কর্মাণি.
৯।৯	কর্মাণি	ন চ মাং তানি.
১৩।২৯	কর্মাণি	প্রকৃত্যৈব চ.

২০. কাম

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) কামনার বাচক	
২।৫	অর্থকামান্	গুরূনহত্বা হি.
২।৪৩	কামাত্মানঃ	কামাত্মানঃ স্বর্গপরা.
২।৫৫	কামান্	প্রজহাতি যদা.
২।৬২	কামঃ ; কামাৎ	ধ্যায়তো বিষয়ান্.
২।৭১	কামান্	বিহায় কামান্ যঃ.
৩।৩৭	কামঃ	কাম এষ ক্রোধ এষ.
৩।৩৯	কামরূপেণ	আবৃতং জ্ঞানমেতেন.
৩।৪৩	কামরূপম্	এবং বুদ্ধেঃ পরং.
৪।১৯	কামসংকল্পবর্জিতাঃ	যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ.
৫।১২	কামকারেণ	যুক্তঃ কর্মফলং.
৫।২৩	কামক্রোধোদ্ভবম্	শক্নোতীহৈব যঃ.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৫।২৬	কামক্রোধবিযুক্তানাম্	কামক্রোধবিযুক্তানাং.
৬।২৪	কামান্	সংকল্পপ্রভবান্.
৭।১১	কামরাগবিবর্জিতম্	বলং বলবতাং.
৭।২০	কামৈঃ	কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ.
৯।২১	(কাম-) কামাঃ	তে তং ভুক্ত্বা.
১৫।৫	বিনিবৃত্তকামাঃ	নির্মানমোহা.
১৬।১০	কামম্	কামমাশ্রিত্য.
১৬।১২	কামক্রোধপরায়ণাঃ	আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ.
১৬।১৮	কামম্	অহংকারং বলং দর্পং.
১৬।২১	কামঃ	ত্রিবিধং নরকস্যেদং.
১৮।৫৩	কামম্	অহংকারং বলং.
	(২) কামদেবের বাচক	
৭।১১	কামঃ	বলং বলবতাং.
১৬।৮	কামহৈতুকম্	অসত্যমপ্রতিষ্ঠং.
	(৩) পদার্থসমূহের বাচক	
২।৭০	কামাঃ, কাম-(কামী)	আপূর্যমাণমচলং.
৩।১০	ইষ্টকামধুক্	সহযজ্ঞাঃ প্রজা.
৬।১৮	সর্বকামেভ্যঃ	যদা বিনিয়তং.
৭।২২	কামান্	স তয়া শ্রদ্ধয়া.
৯।২১	কাম (-কামাঃ)	তে তং ভুক্ত্বা.
১০।২৮	কামধুক্	আয়ুধানামহং.
১৬।১১	কামোপভোগপরমাঃ	চিন্তামপরিমেয়াং.
১৬।১২	কামভোগার্থম্	আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ.
১৬।১৬	কামভোগেষু	অনেকচিত্তবিভ্রান্তা.
১৭।৫	কামরাগবলান্বিতাঃ	অশাস্ত্রবিহিতং.
১৮।২৪	কামেপ্সুনা	যত্তু কামেপ্সুনা.
	(৪) স্বেচ্ছাচারিতার বাচক	
১৬।২৩	কামকারতঃ	যঃ শাস্ত্রবিধি.
	(৫) সকাম পুরুষের বাচক	
৯।২১	(কাম-) কামাঃ	তে তং ভুক্ত্বা.

২১. কাল

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) সময়ের বাচক	
২।৭২	অন্তকালে	এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ
৪।২	কালেন	এবং পরম্পরাপ্রাপ্ত

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৪।৩৮	কালেন	ন হি জ্ঞানেন.
৭।৩০	প্রয়াণকালে	সাধিভূতাধি.
৮।২	প্রয়াণকালে	অধিযজ্ঞঃ কথং.
৮।৫	অন্তকালে	অন্তকালে চ.
৮।৭	কালেষু	তস্মাৎ সর্বেষু.
৮।১০	প্রয়াণকালে	প্রয়াণকালে মনসা.
৮।২৭	কালেষু	নৈতে সৃতী পার্থ.
১০।৩০	কালঃ	প্রহ্লাদশ্চাস্মি.
১৭।২০	কালে	দাতব্যমিতি.
১৭।২২	অদেশকালে	অদেশকালে যদ্দান.
	(২) মার্গের বাচক	
৮।২৩	কালে	যত্র কালে ত্বনাবৃত্তি.
	(৩) মহাপ্রলয়ের বাচক	
১১।২৫	কালানলসন্নিভানি	দংষ্ট্রাকরালানি.
	(৪) ভগবানের বাচক	
১০।৩৩	কালঃ	অক্ষরাণামকারোঽস্মি.
১১।৩২	কালঃ	কালোঽস্মি.

২২. কূটস্থ

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) নির্বিকারব্রহ্মের বাচক	
৬।৮	কূটস্থঃ	জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা.
	(২) নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের বাচক	
১২।৩	কূটস্থম্	যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্য.
	(৩) জীবাত্মার বাচক	
১৫।১৬	কূটস্থঃ	দ্বাবিমৌ পুরুষৌ.

২৩. গতি

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) পরমাত্মার বাচক	
৬।৪৫	গতিম্	প্রযত্নাদ্যতমানস্তু.
৭।১৮	গতিম্	উদারাঃ সর্ব এবৈতে.
৮।১৩	গতিম্	ওমিত্যেকাক্ষরং.
৮।২১	গতিম্	অব্যক্তোঽক্ষর.
৯।১৮	গতিঃ	গতির্ভর্তা প্রভু.
৯।৩২	গতিম্	মাং হি পার্থ.
১২।৫	গতিঃ	ক্লেশোঽধিকতর.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
১৩।২৮	গতিম্	সমং পশ্যন্ হি.
১৬।২২	গতিম্	এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়.
১৬।২৩	গতিম্	যঃ শাস্ত্রবিধি.
	(২) স্থানের বাচক	
৬।৩৭	গতিম্	অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো.
১৬।২০	গতিম্	আসুরীং যোনিমাপন্না.
	(৩) জানবার বাচক	
৪।১৭	গতিঃ	কর্মণো হ্যপি.
	(৪) প্রাপ্তির বাচক	
২।৪৩	ভোগৈশ্বর্যগতিম্	কামাত্মান.

২৪. গুণ

(১) সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই ত্রিগুণের বাচক

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৩।২৭	গুণৈঃ	প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি.
৩।২৯	গুণসম্মূঢ়াঃ	প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ.
৪।১৩	গুণকর্মবিভাগশঃ	চাতুর্বর্ণ্যং ময়া.
৭।১৩	গুণময়ৈঃ	ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ.
৭।১৪	গুণময়ী	দৈবী হ্যেষা গুণময়ী.
১৩।১৯	গুণান্	প্রকৃতিং পুরুষং চৈব.
১৩।২১	গুণসঙ্গঃ	পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো.
১৩।২৩	গুণৈঃ	য এবং বেত্তি.
১৪।৫	গুণাঃ	সত্ত্বং রজস্তম.
১৪।১৯	গুণেভ্যঃ, গুণেভ্যঃ	নান্যং গুণেভ্যঃ.
১৪।২০	গুণান্	গুণানেতানতীত্য.
১৪।২১	গুণান্ ; গুণান্	কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণা.
১৪।২৩	গুণৈঃ	উদাসীনবদাসীনো.
১৪।২৫	গুণাতীতঃ	মানাপমানয়োস্তুল্যঃ.
১৪।২৬	গুণান্	মাং চ যোঽব্যভিচারেণ.
১৫।২	গুণপ্রবৃদ্ধাঃ	অধশ্চোর্ধ্বং.
১৫।১০	গুণান্বিতম্	উৎক্রামন্তং স্থিতং.
১৮।১৯	গুণভেদতঃ ; গুণসংখ্যানে	জ্ঞানং কর্ম চ.
১৮।২৯	গুণতঃ	বুদ্ধের্ভেদং ধৃতে.
১৮।৪০	গুণৈঃ	ন তদস্তি.
১৮।৪১	গুণৈঃ	ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(২) পদার্থগুলির (বিষয়গুলির) বাচক	
৩।২৮	গুণকর্মবিভাগয়োঃ ; গুণেষু	তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো.
৩।২৯	গুণকর্মসু	প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ.
১৩।১৪	সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্ ; গুণভোক্তৃ	সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং.
১৪।২৩	গুণাঃ	উদাসীনবদাসীনো.
	(৩) ইন্দ্রিয়সমূহের বাচক	
৩।২৮	গুণাঃ	তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো.
	(৪) তমোগুণের বাচক	
১৪।১৮	জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ	ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি.

২৫. জগৎ

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) জড় সংসারের বাচক	
৭।৫	জগৎ	অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং.
	(২) জগৎ-চরাচরের বাচক	
৭।৬	জগতঃ	এতদ্যোনীনি.
৯।৪	জগৎ	ময়া ততমিদং.
৯।১০	জগৎ	ময়াধ্যক্ষেণ.
৯।১৭	জগতঃ	পিতাহমস্য জগতো.
১০।৪২	জগৎ	অথবা বহুনৈতেন.
১১।৭	জগৎ	ইহৈকস্থং জগৎ.
১১।১৩	জগৎ	তত্রৈকস্থং জগৎ.
১১।৩০	জগৎ	লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ.
১৬।৮	জগৎ	অসত্যমপ্রতিষ্ঠং.
	(৩) চেতন-সমুদয়ের বাচক	
৭।১৩	জগৎ	ত্রিভির্গুণময়ৈ.
৮।২৬	জগতঃ	শুক্লকৃষ্ণে গতী.
১১।৩৬	জগৎ	স্থানে হৃষীকেশ.
১৬।৯	জগতঃ	এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য.

২৬. জ্ঞান

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) সৎ-অসৎ-বিবেকবোধের বাচক	
৩।৩	জ্ঞানযোগেন	লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা.
৪।২৭	জ্ঞানদীপিতে	সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি.
৪।৩৩	জ্ঞানযজ্ঞঃ	শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়া.
৫।১৬	জ্ঞানেন ; জ্ঞানম্	জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৭।২০	হৃতজ্ঞানাঃ	কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ.
৯।১৫	জ্ঞানযজ্ঞেন	জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে.
১০।৪	জ্ঞানম্	বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ.
১৩।২	জ্ঞানম্ ; জ্ঞানম্	ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি.
১৩।৩৪	জ্ঞানচক্ষুষা	ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেব.
১৪।৯	জ্ঞানম্	সত্ত্বং সুখে.
১৪।১১	জ্ঞানম্	সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্.
১৪।১৭	জ্ঞানম্	সত্ত্বাৎ সংজায়তে.
১৫।১০	জ্ঞানচক্ষুষঃ	উৎক্রামন্তং স্থিতং.
১৫।১৫	জ্ঞানম্	সর্বস্য চাহং.
১৮।৫০	জ্ঞানস্য	সিদ্ধিং প্রাপ্তো.
	(২) কর্তব্য-অকর্তব্যবোধের বাচক	
৩।৩৯	জ্ঞানম্	আবৃতং জ্ঞানমেতেন.
৩।৪০	জ্ঞানম্	ইন্দ্রিয়াণি মনো.
৩।৪১	জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্	তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়া.
৪।৪১	জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্	যোগসংন্যস্তকর্মাণং.
৪।৪২	জ্ঞানাসিনা	তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং.
৬।৮	জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা	জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা.
	(৩) তত্ত্বজ্ঞানের বাচক	
৪।১৯	জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্	যস্য সর্বে.
৪।২৩	জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ	গতসঙ্গস্য মুক্তস্য.
৪।৩৩	জ্ঞানে	শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞা.
৪।৩৪	জ্ঞানম্	তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন.
৪।৩৬	জ্ঞানপ্লবেনৈব	অপি চেদসি.
৪।৩৭	জ্ঞানাগ্নিঃ	যথৈধাংসি সমিদ্ধো.
৪।৩৮	জ্ঞানেন	ন হি জ্ঞানেন.
৪।৩৯	জ্ঞানম্, জ্ঞানম্	শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে.
৫।১৭	জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ	তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মা.
১০।১১	জ্ঞানদীপেন	তেষামেবানুকম্পার্থ.
১৩।১৭	জ্ঞানম্	জ্যোতিষামপি.
১৪।১	জ্ঞানম্	পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি.
১৪।২	জ্ঞানম্	ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য.
১৬।১	জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ	অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ.
	(৪) সাধন-সমুদয়ের বাচক	
১৩।১১	জ্ঞানম্	অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্য.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
১৩।১৭	জ্ঞানগম্যম্	জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ.
১৩।১৮	জ্ঞানম্	ইতি ক্ষেত্রং তথা.
	(৫) শরণাগতির বাচক	
১৮।৬৩	জ্ঞানম্	ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং.
	(৬) গীতাধ্যয়নের বাচক	
১৮।৭০	জ্ঞানযজ্ঞেন	অধ্যেষ্যতে চ.
	(৭) শাস্ত্রজ্ঞানের বাচক	
৪।২৮	স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ	দ্রব্যযজ্ঞাস্তপো.
১২।১২	জ্ঞানম্ ; জ্ঞানাৎ	শ্রেয়োহি জ্ঞান.
১৮।৪২	জ্ঞানম্	শমো দমস্তপ.
	(৮) সাধারণ জ্ঞানের বাচক	
৩।৩২	সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্	যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো.
৯।১২	মোঘজ্ঞানা	মোঘাশা মোঘকর্মাণো.
১০।৩৮	জ্ঞানম্	দণ্ডো দময়তামস্মি.
১৪।১	জ্ঞানানাম্	পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি.
১৪।৬	জ্ঞানসঙ্গেন	তত্র সত্ত্বং নির্মল.
১৮।১৮	জ্ঞানম্	জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা.
১৮।১৯	জ্ঞানম্	জ্ঞানং কর্ম চ.
১৮।২০	জ্ঞানম্	সর্বভূতেষু যেনৈকং.
১৮।২১	জ্ঞানম্	পৃথক্ ত্বেন্ তু.
	(৯) দৃঢ়তা সহকারে মানার বাচক	
৪।১০	জ্ঞানতপসা	বীতরাগভয়ক্রোধা.
৭।২	জ্ঞানম্	জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞান.
৯।১	জ্ঞানম্	ইদং তু তে.

২৭. জ্ঞানী

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের বাচক	
৩।৩৩	জ্ঞানবান্	সদৃশং চেষ্টতে.
	(২) বিবেকবান সাধকের বাচক	
৩।৩৯	জ্ঞানিনঃ	আবৃতং জ্ঞানমেতেন.
	(৩) শাস্ত্রজ্ঞের বাচক	
৪।৩৪	জ্ঞানিনঃ	তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন.
	(৪) শাস্ত্রীয় জ্ঞানসম্পন্নের বাচক	
৬।৪৬	জ্ঞানিভ্যঃ	তপস্বিভ্যোঽধিকো.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৫) প্রেমিক ভক্তের বাচক	
৭।১৬	জ্ঞানী	চতুর্বিধা ভজন্তে.
৭।১৭	জ্ঞানী ; জ্ঞানিনঃ	তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত.
৭।১৮	জ্ঞানী	উদারাঃ সর্ব এবৈতে.

২৮. জ্ঞেয়

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) পরমাত্মার বাচক	
১৩।১২	জ্ঞেয়ম্	জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি.
১৩।১৭	জ্ঞেয়ম্	জ্যোতিষামপি.
১৩।১৮	জ্ঞেয়ম্	ইতি ক্ষেত্রং তথা.
	(২) দৃশ্যমান জগৎ-সংসারের বাচক	
১৮।১৮	জ্ঞেয়ম্	জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা.

২৯. তুষ্ট

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) পূর্ণত্বের বাচক	
২।৫৫	তুষ্টঃ	প্রজহাতি যদা.
৩।১৭	সন্তুষ্টঃ	যস্ত্বাত্মরতিরেব.
১২।১৪	সন্তুষ্টঃ	সন্তুষ্টঃ সততং.
	(২) সন্তুষ্টির বাচক	
৪।২২	সন্তুষ্টঃ	যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো.
১২।১৯	সন্তুষ্টঃ	তুল্যনিন্দাস্তুতি.

৩০. দেব

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) ইন্দ্রাদি দেবতাগণের বাচক	
৩।১১	দেবান্ ; দেবাঃ	দেবান্ ভাবয়তানেন.
৩।১২	দেবাঃ	ইষ্টান্ ভোগান্হি বো.
৭।২৩	দেবান্ ; দেবযজঃ	অন্তবত্তু ফলং.
৯।২০	দেবভোগান্	ত্রৈবিদ্যা মাং.
৯।২৫	দেবব্রতাঃ ; দেবান্	যান্তি দেবব্রতাঃ.
১০।২	দেবানাম্	ন মে বিদুঃ.
১০।১৪	দেবাঃ	সর্বমেতদৃতং মন্যে.
১০।১৫	দেব- (দেব)	স্বয়মেবাত্ম.
১০।২২	দেবানাম্	বেদানাং সামবেদোঽস্মি.
১১।১৫	দেবান্	পশ্যামি দেবাংস্তব.
১১।৫২	দেবাঃ	সুদুর্দর্শমিদং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
১৭।৪	[১]দেবান্	যজন্তে সাত্ত্বিকা.
১৭।১৪	[১]দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনম্	দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ.
১৮।৪০	দেবেষু	ন তদস্তি.
	(২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাচক	
১১।১১	দেবম্	দিব্যমাল্যাম্বরধরং.
১১।১৪	দেবম্	ততঃ স বিস্ময়া.
১১।১৫	দেব	পশ্যামি দেবাংস্তব.
১১।২৫	দেবেশ	দংষ্ট্রাকরালানি.
১১।৩১	দেববর	আখ্যাহি মে.
১১।৩৭	দেবেশ	কস্মাচ্চ তে.
১১।৪৪	দেব	তস্মাৎ প্রণম্য.
১১।৪৫	দেবেশ	অদৃষ্টপূর্বং.
	(৩) ভগবান বিষ্ণুর বাচক	
১১।৪৫	[২]দেবরূপম্	অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি.

৩১. ধর্ম

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) পুণ্যকর্মের বাচক	
১।১	ধর্মক্ষেত্রে	ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে.
১৮।৩১	ধর্মম্	যয়া ধর্মমধর্মং.
১৮।৩২	ধর্মম্	অধর্মং ধর্মমিতি.
১৮।৩৪	ধর্মকামার্থান্	যয়া তু ধর্মকামার্থান্.
	(২) বংশ-মর্যাদার বাচক	
১।৪০	কুলধর্মাঃ ; ধর্মে	কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি.
১।৪৩	কুলধর্মাঃ	দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং.
১।৪৪	উৎসন্নকুলধর্মাণাম্	উৎসন্নকুলধর্মাণাম্.
	(৩) কর্তব্য-কর্মের বাচক	
১।৪২	জাতিধর্মাঃ	দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং.
২।৭	ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ	কার্পণ্যদোষোপহত.
৩।৩৫	স্বধর্ম ; পরধর্মাৎ ; স্বধর্মে ; পরধর্মঃ	শ্রেয়ান্ স্বধর্মো.
১৮।৪৭	স্বধর্মঃ ; পরধর্মাৎ	শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ.
১৮।৬৬	সর্বধর্মান্	সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য.

[১]এস্থানে 'দেব' শব্দকে ঈশ্বরকোটি দেবতাগণেরও (বিষ্ণু, শঙ্কর, গণেশ, শক্তি ও সূর্য) বাচক বোঝা সঙ্গত।

[২]চতুর্ভুজরূপের বাচক হওয়াতে এখানে 'দেব' শব্দ ভগবান বিষ্ণুর জন্যই উল্লিখিত হয়েছে।

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৪) সমত্ববুদ্ধির বাচক	
২।৪০	ধর্মস্য	নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি.
	(৫) সদ্‌গুণ-সদাচারের বাচক	
৪।৭	ধর্মস্য	যদা যদা হি.
৪।৮	ধর্মসংস্থাপনার্থায়	পরিত্রাণায় সাধুনাং.
৭।১১	ধর্মাবিরুদ্ধঃ	বলং বলবতাং চাহং.
১১।১৮	শাশ্বতধর্মগোপ্তা	ত্বমক্ষরং পরমং.
১৪।২৭	ধর্মস্য	ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম.
	(৬) জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাচক	
৯।৩	ধর্মস্য	অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা.
	(৭) সকাম অনুষ্ঠানের বাচক	
৯।২১	ত্রয়ীধর্মম্	তে তং ভুক্ত্বা.

৩২. পর

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) পরায়ণতার বাচক	
২।৪৩	স্বর্গপরাঃ	কামাত্মানঃ স্বর্গপরা.
২।৬১	মৎপরঃ	তানি সর্বাণি.
৪।৩৯	তৎপরঃ	শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে.
৬।১৪	মৎপরঃ	প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ.
১২।৬	মৎপরাঃ	যে তু সর্বাণি.
১৮।৫২	ধ্যানযোগপরঃ	বিবিক্তসেবী.
১৮।৫৭	মৎপরঃ	চেতসা সর্বকর্মাণি.
	(২) পরমাত্মার বাচক	
২।৫৯	পরম্	বিষয়া বিনিবর্তন্তে.
৩।১৯	পরম্	তস্মাদসক্তঃ সততং.
৫।১৬	পরম্	জ্ঞানেন তু.
১১।৩৭	পরম্	কস্মাচ্চ তে.
১৩।৩৪	পরম্	ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেব.
	(৩) সূক্ষ্মতার বাচক	
৩।৪২	পরাণি ; পরম্ ; পরাঃ, পরতঃ	ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ.
৩।৪৩	পরম্	এবং বুদ্ধেঃ পরং.
	(৪) সর্বোৎকৃষ্টতার বাচক	
৩।১১	পরম্	দেবান্ ভাবয়তানেন.
৪।৩৯	পরাম্	শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৬।৪৫	পরাম্	প্রযত্নাদ্যতমানস্তু.
৭।১৩	পরম্	ত্রিভির্গুণময়ৈঃ.
৭।২৪	পরম্	অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং.
৮।১০	পরম্	প্রয়াণকালে মনসা.
৮।২০	পরঃ	পরস্তস্মাত্তু.
৮।২২	পরঃ	পুরুষঃ স পরঃ.
৮।২৮	পরম্	বেদেষু যজ্ঞেষু.
৯।১১	পরম্	অবজানন্তি মাং.
৯।৩২	পরাম্	মাং হি পার্থ.
১০।১২	পরম্ ; পরম্	পরং ব্রহ্ম পরং ধাম.
১১।৩৮	পরম্	ত্বমাদিদেবঃ.
১১।৪৭	পরম্	ময়া প্রসন্নেন.
১৩।১২	পরম্	জ্ঞেয়ং যত্তৎপ্রবক্ষ্যামি.
১৩।২২	পরঃ	উপদ্রষ্টানুমন্তা চ.
১৩।২৮	পরাম্	সমং পশ্যন্হি.
১৪।১	পরম্ ; পরাম্	পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি.
১৬।২২	পরাম্	এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়.
১৬।২৩	পরাম্	যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য.
১৮।৫০	পরা	সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা.
১৮।৫৪	পরাম্	ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা.
১৮।৬২	পরাম্	তমেব শরণং গচ্ছ.
১৮।৬৮	পরাম্	য ইমং পরমং.
১৮।৭৫	পরম্	ব্যাসপ্রসাদাৎ.
	(৫) ভবিষ্যকালের বাচক	
২।১২	পরম্	ন ত্বেবাহং জাতু.
	(৬) ভূতকালের বাচক	
৪।৪	পরম্	অপরং ভবতো জন্ম.
	(৭) পরলোকের বাচক	
৪।৪০	পরঃ	অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ.
	(৮) অন্যের বাচক	
৩।৩৫	পরধর্মাৎ ; পরধর্মঃ	শ্রেয়ান্ স্বধর্মো.
১৮।৪৭	পরধর্মাৎ	শ্রেয়ান্ স্বধর্মো.
	(৯) জীবাত্মার বাচক	
৭।৫	পরাম্	অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১০) নির্লিপ্ত ভাবের বাচক	
৮।৯	পরস্তাৎ	কবিং পুরাণমনুশাসিতার.
১৩।১৭	পরম্	জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি.
১৪।১৯	পরম্	নান্যং গুণেভ্যঃ.

৩৩. পরমাত্মা

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) নির্গুণ-নিরাকারের বাচক	
৬।৭	পরমাত্মা	জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য.
	(২) সগুণ-সাকারের বাচক	
১৫।১৭	পরমাত্মা	উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ.
	(৩) জীবাত্মার বাচক	
১৩।২২	পরমাত্মা	উপদ্রষ্টানুমন্তা চ.
১৩।৩১	পরমাত্মা	অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ.

৩৪. পুণ্য

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) পবিত্র কর্মসমূহের বাচক	
৬।৪১	পুণ্যকৃতাম্	প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং.
৭।২৮	পুণ্যকর্মণাম্	যেষাং ত্বন্তগতং পাপং.
৮।২৮	পুণ্যফলম্	বেদেষু যজ্ঞেষু.
৯।২০	পুণ্যম্	ত্রৈবিদ্যা মাং.
৯।২১	পুণ্যে	তে তং ভুক্ত্বা.
১৮।৭১	পুণ্যকর্মাণাম্	শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ.
	(২) পবিত্রতার বাচক	
৭।৯	পুণ্যঃ	পুণ্যো গন্ধঃ.
৯।৩৩	পুণ্যাঃ	কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ.
১৮।৭৬	পুণ্যম্	রাজন্ সংস্মৃত্য.

৩৫. পুরা

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) পূর্বোক্ত উপদেশের বাচক	
৩।৩	পুরা	লোকেঽস্মিন্দ্বিবিধা.
	(২) সর্গের (ব্রহ্মার দিনের আরম্ভকালের) বাচক	
৩।১০	পুরা	সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ.
	(৩) মহাসর্গের (সৃষ্টির আরম্ভকালের) বাচক	
১৭।২৩	পুরা	ওঁ তৎসদিতি.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	৩৬. পুরুষ	
	(১) সাধারণ মানুষের বাচক	
৩।৩৬	পুরুষঃ	অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং.
৯।৩	পুরুষাঃ	অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা.
১৭।৩	পুরুষঃ	সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য.
	(২) কর্মযোগী সাধকের বাচক	
২।৬০	পুরুষস্য	যততো হ্যপি কৌন্তেয়.
৩।৪	পুরুষঃ	ন কর্মণামনারম্ভা.
৩।১৯	পুরুষঃ	তস্মাদসক্তঃ সততং.
	(৩) সাংখ্যযোগী সাধকের বাচক	
২।১৫	পুরুষম্	যং হি ন ব্যথয়.
২।২১	পুরুষঃ	বেদাবিনাশিনং.
	(৪) জীবাত্মার বাচক	
১৩।১৯	পুরুষম্	প্রকৃতিং পুরুষম্.
১৩।২০	পুরুষঃ	কার্যকরণকর্তৃত্বে.
১৩।২১	পুরুষঃ	পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো.
১৩।২২	পুরুষঃ	উপদ্রষ্টানুমন্তা.
১৩।২৩	পুরুষম্	য এবং বেত্তি.
	(৫) ক্ষর-অক্ষর, বিনাশী-অবিনাশীর বাচক	
১৫।১৬	পুরুষৌ	দ্বাবিমৌ পুরুষৌ.
	(৬) ব্রহ্মার বাচক	
৮।৪	পুরুষঃ	অধিভূতং ক্ষরো.
	(৭) সগুণ-নিরাকারের বাচক	
৮।৮	পুরুষম্	অভ্যাসযোগযুক্তেন.
৮।১০	পুরুষম্	প্রয়াণকালে মনসা.
৮।২২	পুরুষঃ	পুরুষঃ স পরঃ.
১৫।৪	পুরুষম্	ততঃ পদং তৎপরিমার্গি.
	(৮) সগুণ-সাকারের বাচক	
১০।১২	পুরুষম্	পরং ব্রহ্ম পরং ধাম.
১১।১৮	পুরুষঃ	ত্বমক্ষরং পরমং.
১১।৩৮	পুরুষঃ	ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ.
১৫।১৭	পুরুষঃ	উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ.

৩৭. প্রকৃতি

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) সমষ্টি-প্রকৃতির (জড়ের) বাচক[১]	
৩।৫	প্রকৃতিজৈঃ	ন হি কশ্চিৎক্ষণমপি.
৩।২৭	প্রকৃতেঃ	প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি.
৩।২৯	প্রকৃতেঃ	প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়া.
৭।৪	প্রকৃতিঃ	ভূমিরাপোঽনলো.
৯।৭	প্রকৃতিম্	সর্বভূতানি কৌন্তেয়.
৯।৮	প্রকৃতিম্	প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য.
৯।১০	প্রকৃতিঃ	ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ.
১৩।১৯	প্রকৃতিম্ ; প্রকৃতিসম্ভবান্	প্রকৃতিং পুরুষং চৈব.
১৩।২০	প্রকৃতিঃ	কার্যকরণকর্তৃত্বে.
১৩।২১	প্রকৃতিজান্	পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো.
১৩।২৩	প্রকৃতিম্	য এবং বেত্তি.
১৩।২৯	প্রকৃত্যা	প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি.
১৩।৩৪	ভূতপ্রকৃতিমোক্ষম্	ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেব.
১৪।৫	প্রকৃতিসম্ভবাঃ	সত্ত্বং রজস্তম.
১৫।৭	প্রকৃতিস্থানি	মমৈবাংশো জীবলোকে.
১৮।৪০	প্রকৃতিজৈঃ	ন তদস্তি পৃথিব্যাং.
	(২) স্বভাবের বাচক	
৩।৩৩	প্রকৃতেঃ ; প্রকৃতিম্	সদৃশং চেষ্টতে.
৭।২০	প্রকৃত্যা	কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ.
৯।৮	প্রকৃতেঃ	প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য.
৯।১২	প্রকৃতিম্	মোঘাশা মোঘকর্মাণো.
৯।১৩	প্রকৃতিম্	মহাত্মানস্তু মাং.
১৮।৫৯	প্রকৃতিঃ	যদহংকারমাশ্রিত্য.
	(৩) ভগবানের দিব্য-চিন্ময়শক্তির বাচক	
৪।৬	প্রকৃতিম্	অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা.
	(৪) জীবাত্মার বাচক	
৭।৫	প্রকৃতিম্	অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং.
	(৫) স্বাভাবিক স্থিতির বাচক	
১১।৫১	প্রকৃতিম্	দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং.

[১]তত্ত্ব বিচারে সমষ্টি ও ব্যষ্টি দুটি পৃথক নয়, বরঞ্চ এক সমষ্টিই রয়েছে। সমষ্টিরই যে অংশের সঙ্গে মানুষ 'আমি' আর 'আমার' সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়, সেই অংশকেই ব্যষ্টি বলা হয় এবং তার দ্বারাই মানুষ বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হয়।

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৬) শরীরের বাচক	
১৩।২১	প্রকৃতিস্থঃ[১]	পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো.

৩৮. প্রসাদ

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) অন্তঃকরণের স্বচ্ছতার বাচক	
২।৬৪	প্রসাদম্	রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু.
২।৬৫	প্রসাদে	প্রসাদে সর্বদুঃখানাং.
১৮।৩৭	আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্	যত্তদগ্রে বিষমিব.
	(২) প্রসন্নভাবের বাচক	
১৭।১৬	মনঃপ্রসাদঃ	মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং.
	(৩) কৃপার বাচক	
১৮।৫৬	মৎ প্রসাদাৎ	সর্বকর্মাণ্যপি সদা.
১৮।৫৮	মৎ প্রসাদাৎ	মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি.
১৮।৬২	তৎ প্রসাদাৎ	তমেব শরণং.
১৮।৭৩	ত্বৎ প্রসাদাৎ	নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা.
১৮।৭৫	ব্যাসপ্রসাদাৎ	ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানে.

৩৯. প্রিয়

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) অনুকূল অবস্থার বাচক	
৫।২০	প্রিয়ম্	ন প্রহৃষ্যেৎপ্রিয়ং প্রাপ্য.
	(২) প্রেমিকের বাচক	
৭।১৭	প্রিয়ঃ, প্রিয়ঃ	তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত.
১২।১৪	প্রিয়ঃ	সন্তুষ্টঃ সততং.
১২।১৫	প্রিয়ঃ	যস্মান্নোদ্বিজতে.
১২।১৬	প্রিয়ঃ	অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ.
১২।১৭	প্রিয়ঃ	যো ন হৃষ্যতি.
১২।১৯	প্রিয়ঃ	তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী.
১২।২০	প্রিয়াঃ	যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং.
১৮।৬৫	প্রিয়ঃ	মন্মনা ভব.
১৮।৬৯	প্রিয়তরঃ	ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু.

[১]এখানে ব্যষ্টি শরীরে স্থিত হওয়াকেই 'প্রকৃতিতে স্থিত' বলা হয়েছে, কারণ সমষ্টি প্রকৃতিতে স্থিত হয়ে কেউ ভোক্তা হতে পারে না। যেমন একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ হলে তার সমগ্র পরিবারের সঙ্গেই মানুষটির স্বাভাবিকভাবে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তেমনি ব্যষ্টি (শরীর)-এর সঙ্গে সম্বন্ধিত হলে সমষ্টি (সমগ্র প্রকৃতি)এর সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিকভাবেই সম্বন্ধ গঠিত হয়ে যায়।

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৩) অনুরাগের বাচক	
৯।২৯	প্রিয়ঃ	সমোহহং সর্বভূতেষু.
	(৪) রুচির বাচক	
১৭।৭	প্রিয়ঃ	আহারস্ত্বপি সর্বস্য.
১৭।৮	সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ	আয়ুঃ সত্ত্বলারোগ্য.
১৭।১০	তামসপ্রিয়ম্	যাতযামং গতরসং.
	(৫) মধুরভাবের বাচক	
১৭।১৫	প্রিয়হিতম্	অনুদ্বেগকরং বাক্যং.
	(৬) পতির বাচক	
১১।৪৪	প্রিয়ঃ	তস্মাৎ প্রণম্য.
	(৭) পত্নীর বাচক	
১১।৪৪	প্রিয়ায়াঃ	তস্মাৎ প্রণম্য.
	(৮) হিতের বাচক	
১।২৩	প্রিয়চিকীর্ষবঃ	যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং.
	(৯) প্রিয় কার্যের বাচক	
১৮।৬৯	প্রিয়কৃত্তমঃ	ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু.

৪০. বল

সৈন্যবাহিনীর বাচক

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
১।১০	বলম্ ; বলম্	অপর্যাপ্তং তদস্মাকং.
	(২) পরবশতার বাচক	
৩।৩৬	বলাৎ	অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং.
	(৩) শক্তির বাচক	
৬।৩৪	বলবৎ	চঞ্চলং হি মনঃ.
৭।১১	বলম্	বলং বলবতাং.
৮।১০	যোগবলেন	প্রয়ানকালে মনসা.
১৬।১৪	বলবান্	অসৌ ময়া হতঃ.
১৭।৮	আয়ুঃসত্ত্বলারোগ্য.....	আয়ুঃসত্ত্বলারোগ্য.....
	(৪) হঠকারিতার বাচক	
১৬।১৮	বলম্	অহংকারং বলং দর্পং.
১৭।৫	কামরাগবলান্বিতাঃ	অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং.
১৮।৫৩	বলম্	অহংকারং বলং দর্পং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক

৪১. বীজ

(১) ভগবানের বাচক

৭।১০	বীজম্	বীজং মাং সর্বভূতানাং.
৯।১৮	বীজম্	গতির্ভর্তা প্রভুঃ.
১০।৩৯	বীজম্	যচ্চাপি সর্বভূতানাং.

(২) জীবাত্মার বাচক

১৪।৪	বীজপ্রদঃ	সর্বযোনিষু কৌন্তেয়.

৪২. বুদ্ধি

(১) অন্তঃকরণের সমভাবের বাচক

২।৩৯	বুদ্ধিঃ ; বুদ্ধ্যা	এষা তেঽভিহিতা.
২।৪৯	বুদ্ধৌ	দূরেণ হ্যবরং কর্ম.
২।৫০	বুদ্ধিযুক্তঃ	বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ.
২।৫১	বুদ্ধিযুক্তাঃ	কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা.

(২) অবিচল নিশ্চয়াত্মার বাচক

২।৫২	বুদ্ধিঃ	যদা তে মোহকলিলং.
২।৬৫	বুদ্ধিঃ	প্রসাদে সর্বদুঃখানাং.
২।৬৬	বুদ্ধিঃ	নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য.
১৮।১৭	বুদ্ধিঃ	যস্য নাহংকৃতো.

(৩) সাধারণ বুদ্ধির বাচক

২।৪১	বুদ্ধিঃ ; বুদ্ধয়ঃ	ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ.
২।৪৪	বুদ্ধিঃ	ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং.
২।৫৩	বুদ্ধিঃ	শ্রুতিবিপ্রতিপন্নাতে.
৩।২	বুদ্ধিম্	ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন.
৩।২৬	বুদ্ধিভেদম্	ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ.
৩।৪০	বুদ্ধিঃ	ইন্দ্রিয়াণি মনো.
৩।৪২	বুদ্ধিঃ ; বুদ্ধেঃ	ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ.
৩।৪৩	বুদ্ধেঃ	এবং বুদ্ধেঃ পরং.
৫।১১	বুদ্ধ্যা	কায়েন মনসা.
৫।২৮	যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ	যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনি.
৬।২৫	বুদ্ধ্যা	শনৈঃ শনৈরূপরমেদ্.
৮।৭	অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ	তস্মাৎসর্বেষু কালেষু.
১০।৪	বুদ্ধিঃ	বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ.
১২।৮	বুদ্ধিম্	ময়্যেব মন আধৎস্ব.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
১২।১৪	অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ	সন্তুষ্টঃ সততং.
১৮।১৬	অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ	তত্রৈবং সতি কর্তার.
১৮।২৯	বুদ্ধেঃ	বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব.
১৮।৩০	বুদ্ধিঃ	প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং.
১৮।৩১	বুদ্ধিঃ	যয়া ধর্মমধর্মং.
১৮।৩২	বুদ্ধিঃ	অধর্মং ধর্মমিতি.
১৮।৪৯	অসক্তবুদ্ধিঃ	অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র.
১৮।৫১	বুদ্ধ্যা	বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া.
	(৪) বিবেকের বাচক	
২।৬৩	বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ	ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ.
৩।১	বুদ্ধিঃ	জ্যায়সী চেৎকর্মণস্তে.
৭।১০	বুদ্ধিঃ	বীজং মাং সর্বভূতানাং.
	(৫) সাত্ত্বিক বুদ্ধির বাচক	
৬।২১	বুদ্ধিগ্রাহ্যম্	সুখমাত্যন্তিকং.
	(৬) সমষ্টি-বুদ্ধির (মহত্তত্ত্বের) বাচক	
৭।৪	বুদ্ধিঃ	ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ.
১৩।৫	বুদ্ধিঃ	মহাভূতান্যহংকারো.

৪৩. ব্রহ্ম

(১) নির্গুণ-নিরাকারের বাচক

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
২।৭২	ব্রহ্মনির্বাণম্	এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ.
৪।২৫	ব্রহ্মাগ্নৌ	দৈবমেবাপরে যজ্ঞং.
৪।৩১	ব্রহ্ম	যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো.
৫।৬	ব্রহ্ম	সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো.
৫।১৯	ব্রহ্ম ; ব্রহ্মণি	ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো.
৫।২০	ব্রহ্মবিৎ ; ব্রহ্মণি	ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং.
৫।২১	ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা	বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা.
৫।২৪	ব্রহ্মনির্বাণম্ ; ব্রহ্মভূতঃ	যোহন্তঃসুখোহন্তরা.
৫।২৫	ব্রহ্মনির্বাণম্	লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণ.
৫।২৬	ব্রহ্মনির্বাণম্	কামক্রোধবিযুক্তানাং.
৬।২৭	ব্রহ্মভূতম্	প্রশান্তমনসং হ্যেনং.
৬।২৮	ব্রহ্মসংস্পর্শম্	যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং.
৭।২৯	ব্রহ্ম	জরামরণমোক্ষায়.
৮।১	ব্রহ্ম	কিং তদ্ব্রহ্ম.
৮।৩	ব্রহ্ম	অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৮।২৪	ব্রহ্ম ; ব্রহ্মবিদঃ	অগ্নির্জ্যোতিরহঃ.
১৩।১২	ব্রহ্ম	জ্ঞেয়ং যত্তৎপ্রবক্ষ্যামি.
১৩।৩০	ব্রহ্ম	যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবং.
১৪।২৬	ব্রহ্মভূয়ায়	মাং চ যোঽব্যভিচারেণ.
১৪।২৭	ব্রহ্মণঃ	ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠা.
১৮।৫০	ব্রহ্ম	সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা.
১৮।৫৩	ব্রহ্মভূয়ায়	অহংকারং বলং দর্পং.
১৮।৫৪	ব্রহ্মভূতঃ	ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা.
	(২) সগুণ-নিরাকারের বাচক	
৩।১৫	ব্রহ্ম	কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং.
৪।২৪	ব্রহ্মার্পণম্ ; ব্রহ্মহবিঃ ; ব্রহ্মাগ্নৌ ; ব্রহ্মণা ; ব্রহ্মৈব ; ব্রহ্মকর্মসমাধিনা	ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম.
৬।৩৮	ব্রহ্মণঃ	কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্ট.
১৭।২৩	ব্রহ্মণঃ	ওঁ তৎসদিতি.
	(৩) সগুণ-সাকারের বাচক	
৫।১০	ব্রহ্মণি	ব্রহ্মণ্যাধায়.
১০।১২	ব্রহ্ম	পরং ব্রহ্ম পরং.
	(৪) বেদের বাচক	
৩।১৫	ব্রহ্মোদ্ভবম্, ব্রহ্ম	কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং.
৪।৩২	ব্রহ্মণঃ	এবং বহুবিধা.
৬।৪৪	শব্দব্রহ্ম	পূর্বাভ্যাসেন.
১৭।২৪	ব্রহ্মবাদিনাম্	তস্মাদোমিত্যুদা.
	(৫) প্রণবের বাচক	
৮।১৩	ব্রহ্ম	ওমিত্যেকাক্ষরং.
	(৬) ব্রহ্মার বাচক	
৮।১৬	আব্রহ্মভুবনাৎ	আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ.
৮।১৭	ব্রহ্মণঃ	সহস্রযুগপর্যন্ত.
১১।১৫	ব্রহ্মাণম্	পশ্যামি দেবাংস্তব.
১১।৩৭	ব্রহ্মণঃ	কস্মাচ্চ তে ন.
	(৭) মূল প্রকৃতির বাচক	
১৪।৩	ব্রহ্ম	মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম.
১৪।৪	ব্রহ্ম	সর্বযোনিষু কৌন্তেয়.
	(৮) ব্রাহ্মণের বাচক	
১৮।৪২	ব্রহ্মকর্ম	শমো দমস্তপঃ.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	৪৪. ব্রাহ্মণ	
	(১) ব্রহ্মজ্ঞানীর বাচক	
২।৪৬	ব্রাহ্মণস্য	যাবানর্থ উদপানে.
	(২) বিপ্রের (ব্রাহ্মণের) বাচক	
৫।১৮	ব্রাহ্মণে	বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে.
৯।৩৩	ব্রাহ্মণাঃ	কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ.
১৭।২৩	ব্রাহ্মণাঃ	ওঁ তৎসদিতি.
১৮।৪১	ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাম্	ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং.
	৪৫. ভাব	
	(১) সত্তার বাচক	
২।১৬	ভাবঃ	নাসতো বিদ্যতে.
৮।৩	ভূতভাবোদ্ভবকরঃ	অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং.
১০।১১	আত্মভাবস্থঃ	তেষামেবানুকম্পার্থ.
১৭।২৬	সদ্ভাবে	সদ্ভাবে সাধুভাবে.
১৮।২০	ভাবম্	সর্বভূতেষু যেনৈকং.
১৮।২১	নানাভাবান্	পৃথক্ত্বেন তু.
	(২) পরমাত্মার স্বরূপের বাচক	
৪।১০	মদ্ভাবম্	বীতরাগভয়ক্রোধা.
৭।২৪	ভাবম্	অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং.
৮।৫	মদ্ভাবম্	অন্তকালে চ.
৮।২০	ভাবঃ	পরস্তস্মাত্তু.
৯।১১	ভাবম্	অবজানন্তি মাং.
১৩।১৮	মদ্ভাবায়	ইতি ক্ষেত্রং তথা.
১৪।১৯	মদ্ভাবম্	নান্যং গুণেভ্যঃ.
	(৩) গুণ, পদার্থ ও ক্রিয়ার বাচক	
৭।১২	ভাবাঃ	যে চৈব সাত্ত্বিকা.
৭।১৩	ভাবৈঃ	ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈ.
৮।৪	ভাবঃ	অধিভূতং ক্ষরো.
	(৪) স্বভাবের বাচক	
৭।১৫	ভাবম্	ন মাং দুষ্কৃতিনো.
	(৫) প্রাণী, পদার্থ প্রভৃতির বাচক	
৮।৬	ভাবম্ ; তদ্ভাবভাবিতঃ	যং যং বাপি.
১০।১৭	ভাবেষু	কথং বিদ্যামহং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৬) মনোবৃত্তির (ভাবের) বাচক	
১০।৫	ভাবাঃ	অহিংসা সমতা.
১৭।১৬	ভাবসংশুদ্ধিঃ	মনঃপ্রসাদঃ.
১৭।২৬	সাধুভাবে	সদ্ভাবে সাধুভাবে.
১৮।১৭	ভাবঃ	যস্য নাহংকৃতো.
	(৭) শ্রদ্ধা-প্রেমের বাচক	
১০।৬	মদ্ভাবাঃ	মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে.
১০।৮	ভাবসমন্বিতাঃ	অহং সর্বস্য.
	(৮) প্রাণীগণের শরীরাদির বাচক	
১৩।৩০	ভূতপৃথগ্‌ভাবম্	যদা ভূতপৃথগ্‌ভাব.

৪৬. ভূত

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) মনুষ্যের বাচক	
২।৬৯	সর্বভূতানাম্; ভূতানি	যা নিশা সর্বভূতানাং.
৭।১১	ভূতেষু	বলং বলবতাং.
১০।৫	ভূতানাম্	অহিংসা সমতা.
	(২) তদ্রূপ হবার বাচক	
৫।৭	(সর্বভূতাত্ম-) ভূতাত্মা	যোগযুক্তোবিশুদ্ধাত্মা.
৫।২৪	ব্রহ্মভূতঃ	যোঽন্তঃসুখোঃ.
৬।২৭	ব্রহ্মভূতম্	প্রশান্তমনসং.
৭।৫	জীবভূতাম্	অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং.
১৫।৭	জীবভূতঃ	মমৈবাংশো জীবলোকে.
১৮।৫৪	ব্রহ্মভূতঃ	ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা.
	(৩) সৃষ্টির বাচক	
৮।২২	ভূতানি	পুরুষঃ স পরঃ.
৯।৪	সর্বভূতানি	ময়া ততমিদং.
৯।৫	ভূতানি; ভূতভৃৎ; ভূতস্থঃ; ভূতভাবনঃ	ন চ মৎস্থানি.
৯।৬	ভূতানি	যথাকাশস্থিতো.
	(৪) প্রাণিগণের শরীরের বাচক	
৮।২০	ভূতেষু	পরস্তস্মাত্তু.
১৫।১৬	ভূতানি	দ্বাবিমৌ পুরুষৌ.
১৭।৬	ভূতগ্রামম্	কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং.
	(৫) ভূত-প্রেতের বাচক	
৯।২৫	ভূতানি	যান্তি দেবব্রতা.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
১৭।৪	ভূতগণান্	যজন্তে সাত্ত্বিকা.
	(৬) পঞ্চমহাভূতের বাচক	
১৩।৫	মহাভূতানি	মহাভূতান্যহংকারো.
১৩।৩৪	ভূতপ্রকৃতিমোক্ষম্	ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোরেব.
	(৭) মানুষ, দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতির বাচক	
২।৩৪	ভূতানি[1]	অকীর্তিং চাপি.
	(৮) প্রাণীমাত্রের বাচক	
২।২৮	ভূতানি	অব্যক্তাদীনি ভূতানি.
২।৩০	ভূতানি	দেহী নিত্যমবধ্যো.
৩।১৪	ভূতানি	অন্নাদ্ভবন্তি.
৩।১৮	সর্বভূতেষু	নৈব তস্য কৃতেনার্থো.
৩।৩৩	ভূতানি	সদৃশং চেষ্টতে.
৪।৬	ভূতানাম্	অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা.
৪।৩৫	ভূতানি	যজ্জ্ঞাত্বা ন.
৫।৭	সর্বভূতাত্ম (-ভূতাত্মা)	যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা.
৫।২৫	সর্বভূতহিতে	লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং.
৫।২৯	সর্বভূতানাম্	ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং.
৬।২৯	সর্বভূতস্থম্; সর্বভূতানি	সর্বভূতস্থমাত্মানং.
৬।৩১	সর্বভূতস্থিতম্	সর্বভূতস্থিতং যো মাং.
৭।৬	ভূতানি	এতদ্যোনীনি ভূতানি.
৭।৯	সর্বভূতেষু	পুণ্যো গন্ধঃ.
৭।১০	সর্বভূতানাম্	বীজং মাং সর্বভূতানাং.
৭।২৬	ভূতানি	বেদাহং সমতীতানি.
৭।২৭	সর্বভূতানি	ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন.
৮।৩	ভূতভাবোদ্ভবকরঃ	অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং.
৮।১৯	ভূতগ্রামঃ	ভূতগ্রামঃ স এবায়ং.
৯।৭	সর্বভূতানি	সর্বভূতানি কৌন্তেয়.
৯।৮	ভূতগ্রামম্	প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য.
৯।১১	ভূতমহেশ্বরম্	অবজানন্তি মাং.
৯।১৩	ভূতাদিম্	মহাত্মানস্তু মাং.
৯।২৯	সর্বভূতেষু	সমোঽহং সর্বভূতেষু.

[1]অর্জুনের অপকীর্তির সমালোচনা মানুষ, দেবতাগণই করতে সক্ষম; পশু, পাখীরা নয়, সুতরাং এখানে 'ভূতানি' পদ দ্বারা মানুষ, দেবতা আদিকেই বুঝতে হবে।

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
১০।১৫	ভূতভাবন ; ভূতেশ	স্বয়মেবাত্মনাত্মানং.
১০।২০	সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ; ভূতানাম্	অহমাত্মা গুড়াকেশ.
১০।২২	ভূতানাম্	বেদানাং সামবেদোঽস্মি.
১০।৩৯	সর্বভূতানাম্ ; ভূতম্	যচ্চাপি সর্বভূতানাং.
১১।২	ভূতানাম্	ভবাপ্যযৌ হি.
১১।১৫	ভূতবিশেষসঙ্ঘান্	পশ্যামি দেবাংস্তব.
১১।৫৫	সর্বভূতেষু	মৎকর্মকৃন্মৎপরমো.
১২।৪	সর্বভূতহিতে	সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং.
১২।১৩	সর্বভূতানাম্	অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং.
১৩।১৫	ভূতানাম্	বহিরন্তশ্চ ভূতানাং.
১৩।১৬	ভূতেষুঃ ; ভূতভর্তৃ	অবিভক্তং চ.
১৩।২৭	ভূতেষু	সমং সর্বেষু.
১৩।৩০	ভূতপৃথগ্‌ভাবম্	যথা ভূতপৃথগ্‌ভাব.
১৪।৩	সর্বভূতানাম্	মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম.
১৫।১৩	ভূতানি	গামাবিশ্য চ.
১৬।২	ভূতেষু	অহিংসা সত্যমক্রোধ.
১৬।৬	ভূতসর্গৌ	দ্বৌ ভূতসর্গৌ.
১৮।২০	সর্বভূতেষু	সর্বভূতেষু যেনৈকং.
১৮।২১	ভূতেষু	পৃথক্ত্বেন তু.
১৮।৪৬	ভূতানাম্	যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং.
১৮।৫৪	ভূতেষু	ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা.
১৮।৬১	সর্বভূতানাম্ ; সর্বভূতানি	ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং.

৪৭. মন

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) অন্তঃকরণের বাচক	
১।৩০	মনঃ	গাণ্ডীবং স্রংসতে.
৫।১৩	মনসা	সর্বকর্মাণি মনসা.
৫।১৯	মনঃ	ইহৈব তৈর্জিতঃ.
	(২) সমষ্টি-মনের বাচক	
৭।৪	মনঃ	ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ.
	(৩) অন্তঃকরণের মনোবৃত্তির বাচক	
২।৬০	মনঃ	যততো হ্যপি.
২।৬৭	মনঃ	ইন্দ্রিয়াণাং হি.
৩।৬	মনসা	কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য.
৩।৭	মনসা	যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৩।৪০	মনঃ	ইন্দ্রিয়াণি মনো.
৩।৪২	মনঃ ; মনসঃ	ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ.
৫।১১	মনসা	কায়েন মনসা.
৫।২৮	যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ	যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ.
৬।১২	মনঃ	তত্রৈকাগ্রং মনঃ.
৬।১৪	মনঃ	প্রশান্তাত্মা বিগতভী.
৬।২৪	মনসা	সঙ্কল্পপ্রভবান্.
৬।২৫	মনঃ	শনৈঃ শনৈরূপরমেদ্.
৬।২৬	মনঃ	যতো যতো নিশ্চরতি.
৬।২৭	প্রশান্তমনসম্	প্রশান্তমনসং হ্যেনং.
৬।৩৪	মনঃ	চঞ্চলং হি মনঃ.
৬।৩৫	মনঃ	অসংশয়ং মহাবাহো.
৮।৭	অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ	তস্মাৎসর্বেষু কালেষু.
৮।১০	মনসা	প্রয়াণকালে মনসা.
৮।১২	মনঃ	সর্বদ্বারাণি সংযম্য.
৯।৩৪	মন্মনাঃ	মন্মনা ভব.
১০।২২	মনঃ	বেদানাং সামবেদোঽস্মি.
১১।৪৫	মনঃ	অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি.
১২।২	মনঃ	ময্যাবেশ্য মনো.
১২।৮	মনঃ	ময্যেব মন.
১২।১৪	অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ	সন্তুষ্টঃ সততং.
১৫।৭	মনঃষষ্ঠানি	মমৈবাংশো জীবলোকে.
১৫।৯	মনঃ	শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং.
১৭।১১	মনঃ	অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো.
১৭।১৬	মনঃপ্রসাদঃ	মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং.
১৮।৩৩	মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ	ধৃত্যা যয়া ধারয়তে.
১৮।৬৫	মন্মনাঃ	মন্মনা ভব.

৪৮. মহাত্মা

(১) প্রেমিক ভক্তগণের বাচক

৭।১৯	মহাত্মা	বহূনাং জন্মনামন্তে.
৮।১৫	মহাত্মানঃ	মামুপেত্য পুনর্জন্ম.
১৮।৭৪	মহাত্মনঃ	ইত্যহং বাসুদেবস্য.

(২) সাধক ভক্তগণের বাচক

৯।১৩	মহাত্মানঃ	মহাত্মানস্তু মাং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৩) বিরাট্‌রূপ ভগবানের বাচক	
১১।১২	মহাত্মনঃ	দিবি সূর্যসহস্রস্য..
১১।২০	মহাত্মন্	দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং.
১১।৩৭	মহাত্মন্	কস্মাচ্চ তে ন.
	(৪) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাচক	
১১।৫০	মহাত্মা	ইত্যর্জুনং বাসুদেব.

৪৯. মৌন

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) বাণীর সংযমের বাচক	
১০।৩৮	মৌনম্	দণ্ডো দময়তামস্মি.
	(২) মননশীলতার বাচক	
১৭।১৬	মৌনম্	মনঃপ্রসাদঃ.

৫০. যজ্ঞ

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) সমস্ত কর্তব্য-কর্মের বাচক	
৩।৯	যজ্ঞার্থাৎ	যজ্ঞার্থাৎকর্মণোঽন্যত্র.
৩।১০	সহযজ্ঞাঃ	সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা.
৩।১২	যজ্ঞভাবিতাঃ	ইষ্টান্ভোগান্হি.
৩।১৩	যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ	যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো.
৩।১৪	যজ্ঞাৎ, যজ্ঞঃ	অন্নাদ্ভবন্তি.
৩।১৫	যজ্ঞে	কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং.
৪।২৩	যজ্ঞায়	গতসঙ্গস্য.
৪।২৮	যোগযজ্ঞাঃ	দ্রব্যযজ্ঞাস্তপো.
৪।৩১	যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ	যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো.
১৬।১	যজ্ঞঃ	অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি.
	(২) অর্পণের বাচক	
৪।২৫ পূর্বার্ধ	যজ্ঞম্	দৈবমেবাপরে.
	(৩) জীবাত্মার বাচক	
৪।২৫ উত্তরার্ধ	যজ্ঞম্	দৈবমেবাপরে.
	(৪) বিবেক-বিচারের বাচক	
৪।২৫	যজ্ঞেন	দৈবমেবাপরে.
৪।৩৩	জ্ঞানযজ্ঞঃ	শ্রেয়ান্দ্রব্যময়া.
	(৫) দানাদির বাচক	
৪।২৮	দ্রব্যযজ্ঞাঃ	দ্রব্যযজ্ঞাস্তপো.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৪।৩৩	যজ্ঞাৎ	শ্রেয়ান্দ্রব্যময়া.
	(৬) স্বাধ্যায়ের বাচক	
৪।২৮	স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ	দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা.
১৮।৭০	জ্ঞানযজ্ঞেন	অধ্যেষ্যতে চ য.
	(৭) সহ্যশক্তির বাচক	
৪।২৮	তপোযজ্ঞাঃ	দ্রব্যযজ্ঞাস্তপো.
	(৮) সাধনগুলির বাচক	
৪।৩০	যজ্ঞবিদঃ, যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ	অপরে নিয়তাহারাঃ.
৪।৩২	যজ্ঞাঃ	এবং বহুবিধা.
১০।২৫	যজ্ঞানাম্	মহর্ষীণাং ভৃগুরহং.
	(৯) যজ্ঞ (হোম) আদির বাচক	
৫।২৯	যজ্ঞতপসাম্	ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং.
৮।২৮	যজ্ঞেষু	বেদেষু যজ্ঞেষু.
৯।১৬	যজ্ঞঃ	অহং ক্রতুরহং.
৯।২০	যজ্ঞৈঃ	ত্রৈবিদ্যা মাং.
১১।৪৮	বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ	ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈ.
১৭।৭	যজ্ঞঃ	আহারস্ত্বপি.
১৭।১১	যজ্ঞঃ	অফলাকাঙ্ক্ষিভি.
১৭।১২	যজ্ঞম্	অভিসংধায় তু.
১৭।১৩	যজ্ঞম্	বিধিহীনমসৃষ্টান্নং.
১৭।২৩	যজ্ঞাঃ	ওঁ তৎসদিতি.
১৭।২৪	যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ	তস্মাদোমিত্যুদা.
১৭।২৫	যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ	তদিত্যনভিসংধায়.
১৭।২৭	যজ্ঞে	যজ্ঞে তপসি.
১৮।৩	যজ্ঞদানতপঃকর্ম	ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে.
১৮।৫	যজ্ঞদানতপঃকর্ম, যজ্ঞঃ	যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন.
	(১০) নামজপের বাচক	
১০।২৫	জপযজ্ঞঃ	মহর্ষীণাং ভৃগুরহং.
	(১১) লোক দেখানো কর্মের বাচক	
১৬।১৭	নামযজ্ঞৈঃ	আত্মসম্ভাবিতাঃ.

৫১. যুক্ত

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) একত্রতার বাচক	
১।১৪	যুক্তে	ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
২।৫০	বুদ্ধিযুক্তঃ	বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ.
২।৫১	বুদ্ধিযুক্তাঃ	কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা.
৫।৬	যোগযুক্তঃ	সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো.
৫।৭	যোগযুক্তঃ	যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা.
৭।২২	যুক্তঃ	স তয়া শ্রদ্ধয়া.
৮।৮	অভ্যাসযোগযুক্তেন	অভ্যাসযোগযুক্তেন.
৮।১০	যুক্তঃ	প্রয়াণকালে মনসা.
৯।২৮	সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা[১]	শুভাশুভফলৈরেবং.
১৫।১৪	প্রাণাপানসমাযুক্তঃ	অহং বৈশ্বানরো.
১৭।১৭	যুক্তৈঃ	শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং.
১৮।৫১	যুক্তঃ	বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া.
	(২) নিত্য-সংযুক্ত থাকার বাচক	
২।৩৯	যুক্তঃ	এষা তেঽভিহিতা.
৬।২৯	যোগযুক্তাত্মা	সর্বভূতস্থমাত্মানং.
৭।১৭	নিত্যযুক্তঃ	তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত.
৭।১৮	যুক্তাত্মা	উদারাঃ সর্বে.
৭।৩০	যুক্তচেতসঃ	সাধিভূতাধিদৈবং.
৮।১৪	নিত্যযুক্তস্য	অনন্যচেতাঃ সততং.
৮।২৭	যোগযুক্তঃ	নৈতে সৃতী পার্থ.
৯।১৪	নিত্যযুক্তাঃ	সততং কীর্তয়ন্তো.
৯।২২	নিত্যাভিযুক্তানাম্	অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো.
১০।১০	সততযুক্তানাং	তেষাং সততযুক্তানাং.
১২।১	সততযুক্তাঃ	এবং সততযুক্তা.
১২।২	নিত্যযুক্তাঃ	ময্যাবেশ্য মনো.
	(৩) সমতায় স্থিতির বাচক	
৩।২৬	যুক্তঃ	ন বুদ্ধিভেদং.
৫।২৩	যুক্তঃ	শক্নোতীহৈব যঃ.
৬।৮	যুক্তঃ	জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা.
	(৪) যথাবিহিত করার বাচক	
৬।১৭	যুক্তাহারবিহারস্য ; যুক্তচেষ্টস্য ; যুক্তস্বপ্নাববোধস্য	যুক্তহারবিহারস্য.

[১]সংস্কৃত বিভক্তি অনুসারে যদি সংস্কৃত শব্দের অর্থ করা হয় তাহলে তা হিন্দী আদি অন্য ভাষায় কোথাও কোথাও ঠিকমতো হয় না। কারণ সকল ভাষাতেই নিজস্ব শৈলীতে বাক্যরচনা করা হয়। অতএব এই কোশে শব্দগুলির হিন্দী অর্থ সংস্কৃত বিভক্তি অনুসারেই করার চেষ্টা করা হয়েছে ; কিন্তু যেখানে সংস্কৃতের সমাসগত পদ বা বাক্যের হিন্দী অর্থ করা হয়েছে সেখানে হিন্দী বাক্যরচনা অনুসারেই করা হয়েছে। (বাংলা অনুবাদেও সেই শৈলীতে অনুসরণ করা হয়েছে—অনুবাদিকা)

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৫) কর্মযোগীর বাচক	
২।৬১	যুক্তঃ	তানি সর্বাণি.
৪।১৮	যুক্তঃ	কর্মণ্যকর্ম যঃ.
৫।১২	যুক্তঃ	যুক্তঃ কর্মফলং.
	(৬) সাংখ্যযোগীর বাচক	
৫।৮	যুক্তঃ	নৈব কিঞ্চিৎ করোমিতি.
	(৭) ধ্যানযোগীর বাচক	
৬।১৪	যুক্তঃ	প্রশান্তাত্মা বিগতভী.
৬।১৮	যুক্তঃ	যদা বিনিয়তং.
	(৮) ভক্তিযোগীর বাচক	
৬।৪৭	যুক্ততমঃ	যোগীনামপি সর্বেষাং.
১২।২	যুক্ততমাঃ	ময্যাবেশ্য মনো.

৫২. যোগ

('যুজির্ যোগে' ধাতু দ্বারা নির্মিত 'যোগ' শব্দ)

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) কর্মযোগের বাচক	
২।৩৯	যোগে	এষা তেঽভিহিতা.
৪।১	যোগম্	ইমং বিবস্বতে.
৪।২	যোগঃ	এবং পরম্পরাপ্রাপ্ত.
৪।৩৮	যোগসংসিদ্ধঃ	ন হি জ্ঞানেন.
৫।১	যোগম্	সন্ন্যাসং কর্মণাং.
৫।৪	সাংখ্যযোগৌ	সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ.
৫।৫	যোগম্	যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে.
৬।২	যোগম্	যং সন্ন্যাসমিতি.
	(২) অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির বাচক	
২।৪৫	নির্যোগক্ষেমঃ	ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা.
৯।২২	যোগক্ষেমম্	অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো.
	(৩) অন্তঃকরণের সমভাবের বাচক	
২।৪৮	যোগস্থঃ ; যোগঃ	যোগস্থঃ কুরু.
২।৫০	যোগায় ; যোগঃ	বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ.
৪।২৮	যোগযজ্ঞাঃ	দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা.
৪।৪১	যোগসন্ন্যস্তকর্মাণম্	যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং.
৪।৪২	যোগম্	তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৫।৬	যোগযুক্তঃ	সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো.
৫।৭	যোগযুক্তঃ	যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা.
৬।৩	যোগম্, যোগারূঢ়স্য	আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং.
৬।৪	যোগারূঢ়ঃ	যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু.
৬।৪৪	যোগস্য	পূর্বাভ্যাসেন.
৮।৮	অভ্যাসযোগযুক্তেন	অভ্যাসযোগযুক্তেন.
৮।২৭	যোগযুক্ত	নৈতে সৃতী পার্থ.
১২।৯	অভ্যাসযোগেন	অথ চিত্তং সমাধাতুং.
১২।১১	মদ্যোগম্	অথৈতদপ্যশক্তোঽসি.
১৬।১	জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ	অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ.
১৮।৩৩	যোগেন	ধৃত্যা যয়া.
	(৪) সাধ্যরূপ সমভাবের বাচক	
২।৫৩	যোগম্	শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে.
৬।২৩	যোগসংজ্ঞিতম্	তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ.
	(৫) ভক্তিযোগের বাচক	
৭।১	যোগম্	ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ.
১০।৭	যোগেন	এতাং বিভূতিং.
১২।৬	যোগেন	যে তু সর্বাণি.
১৩।১০	অনন্যযোগেন	ময়ি চানন্যযোগেন.
	(৬) কর্মযোগীর বাচক	
৫।৫	যোগৈঃ	যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে.
	(৭) গীতা-গ্রন্থের বাচক	
১৮।৭৫	যোগম্	ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুত.
	(৮) সম্পর্কের বাচক	
৯।২৮	সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা	শুভাশুভফলৈরেবং.
	(৯) সাংখ্যযোগী ও ভক্তিযোগীর বাচক	
১২।১	যোগবিত্তমাঃ	এবং সততযুক্তা.
	('যুজ্ সমাধৌ' ধাতু থেকে নির্মিত 'যোগ' শব্দ)	
	(১) চিত্তবৃত্তি নিরোধের বাচক	
৪।২৭	আত্মসংযমযোগাগ্নৌ	সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি.
৮।১২	যোগধারণাম্	সর্বদ্বারাণি সংযম্য.
	(২) ধ্যানযোগের বাচক	
৬।১২	যোগম্	তত্রৈকাগ্রং মনঃ.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৬।১৬	যোগঃ	নাত্যশ্নতস্তু.
৬।১৭	যোগঃ	যুক্তাহারবিহারস্য.
৬।১৯	যোগম্	যথা দীপো নিবাতস্থো.
৬।২০	যোগসেবয়া	যত্রোপরমতে চিত্তং.
৬।২৩	যোগঃ	তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ.
৬।২৯	যোগযুক্তাত্মা	সর্বভূতস্থমাত্মানং.
৬।৩৩	যোগঃ	যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া.
৬।৩৬	যোগঃ	অসংযতাত্মনা.
৬।৩৭	যোগাৎ	অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো.
	(৩) সাধনের বাচক	
৬।৪১	যোগভ্রষ্টঃ	প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং.
	(৪) প্রাণায়ামের বাচক	
৮।১০	যোগবলেন	প্রয়াণকালে মনসা.
	('যুজ্ সংযমনে' ধাতু থেকে নির্মিত 'যোগ' শব্দ)	
	(১) ভগবানের সামর্থ্যের বাচক	
৯।৫	যোগম্	ন চ মৎস্থানি.
১০।৭	যোগম্	এতাং বিভূতিং যোগং.
১০।১৮	যোগম্	বিস্তরেণাত্মনো.
১১।৮	যোগম্	ন তু মাং শক্যসে.
১১।৪৭	আত্মযোগাৎ	ময়া প্রসন্নেন.

৫৩. যোগী

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) কর্মযোগী সাধকের বাচক	
৩।৩	যোগিনাম্	লোকেঽস্মিন্দ্বিবিধা.
৫।১১	যোগিনঃ	কায়েন মনসা.
৬।১	যোগী	অনাশ্রিতঃ কর্মফলং.
	(২) সিদ্ধ কর্মযোগীর বাচক	
৬।৮	যোগী	জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা.
	(৩) সাংখ্যযোগী সাধকের বাচক	
৫।২৪	যোগী	যোঽন্তঃসুখোঽন্তরা.
১৫।১১	যোগিনঃ	যতন্তো যোগিনশ্চৈনং.
	(৪) সিদ্ধ সাংখ্যযোগীর বাচক	
৬।৩২	যোগী	আত্মৌপম্যেন সর্বত্র.
৬।৪২	যোগিনাম্	অথবা যোগিনামেব.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৫) ভক্তিযোগী সাধকের বাচক	
৮।১৪	যোগিনঃ	অনন্যচেতাঃ সততং.
	(৬) সিদ্ধ ভক্তিযোগীর বাচক	
৬।৩১	যোগী	সর্বভূতস্থিতং যো.
১২।১৪	যোগী	সন্তুষ্টঃ সততং.
	(৭) ধ্যানযোগী সাধকের বাচক	
৬।১০	যোগী	যোগী যুঞ্জীত.
৬।১৫	যোগী	যুঞ্জন্নেবং.
৬।১৯	যোগিনঃ	যথা দীপো.
৬।২৭	যোগিনম্	প্রশান্তমনসং.
৬।২৮	যোগী	যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং.
	(৮) সকলপ্রকারের যোগিগণের বাচক	
৬।২	যোগী	যং সন্ন্যাসমিতি.
৬।৪৭	যোগিনাম্	যোগিনামপি সর্বেষাং.
৮।২৭	যোগী	নৈতে সৃতী পার্থ.
	(৯) যোগভ্রষ্টের বাচক	
৬।৪৫	যোগী	প্রয়ত্নাদ্যতমানস্তু.
	(১০) নিষ্কাম সাধকের বাচক	
৬।৪৬	যোগী ; যোগী ; যোগী	তপস্বিভ্যোঽধিকো.
৮।২৮	যোগী	বেদেষু যজ্ঞেষু.
	(১১) সকাম মানুষের বাচক	
৮।২৫	যোগী	ধূমো রাত্রিস্তথা.
	(১২) নিষ্কাম ও সকাম—উভয় প্রকার মানুষের বাচক	
৮।২৩	যোগিনঃ	যত্র কালে ত্বনাবৃত্তি.
	(১৩) ভগবানের বাচক	
১০।১৭	যোগিন্	কথং বিদ্যামহং.

৫৪. লোক

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) মনুষ্যলোকের বাচক	
২।৫	লোকে	গুরূনহত্বা হি.
৩।৩	লোকে	লোকেঽস্মিন্দ্বিবিধা.
৩।৯	লোকঃ	যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র.
৪।১২	লোকে	কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৪।৩১	লোকঃ	যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো.
৪।৪০	লোকঃ	অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ.
৬।৪২	লোকে	অথবা যোগিনামেব.
	(২) মনুষ্যের বাচক	
৩।২০	লোকসংগ্রহম্	কর্মণৈব হি.
৩।২১	লোকঃ	যদ্যদাচরতি.
৩।২৪	লোকাঃ	উৎসীদেয়ুরিমে.
৩।২৫	লোকসংগ্রহম্	সক্তাঃ কর্মণ্য.
৫।১৪	লোকস্য	ন কর্তৃত্বং.
৭।২৫	লোকঃ	নাহং প্রকাশঃ.
	(৩) মনুষ্য শরীরের বাচক	
৯।৩৩	লোকম্	কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ.
	(৪) প্রাণিগণের বাচক	
১১।২৩	লোকাঃ	রূপং মহত্তে.
১১।৩০	লোকান্	লেলিহ্যসে.
১২।১৫	লোকঃ, লোকাৎ	যস্মান্নোদ্বিজতে.
১৮।১৭	লোকান্	যস্য নাহংকৃতো.
	(৫) যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান সৈনিকদের বাচক	
১১।২৯	লোকাঃ	যথা প্রদীপ্তং.
১১।৩২	লোকান্	কলোঽস্মি.
	(৬) সংসারের বাচক	
৫।২৯	সর্বলোকমহেশ্বরম্	ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং.
১০।৩	লোকমহেশ্বরম্	যো মামজমনাদিং.
১০।৬	লোক	মহর্ষয়ঃ সপ্ত.
১০।১৬	লোকান্	বক্তুমর্হস্যশেষেণ.
১১।৩২	লোকক্ষয়কৃৎ	কালোঽস্মি.
১১।৪৩	লোকস্য	পিতাসি লোকস্য.
১৩।১৩	লোকে	সর্বতঃ পাণিপাদং.
১৩।৩৩	লোকম্	যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ.
১৫।৭	জীবলোকে	মমৈবাংশো জীবলোকে.
১৫।১৬	লোকে	দ্বাবিমৌ পুরুষৌ.
১৬।৬	লোকে	দ্বৌ ভূতসর্গৌ.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৭) ত্রিলোকের বাচক[১]	
৩।২২	লোকেষু	ন মে পার্থাস্তি.
১১।২০	লোকত্রয়ম্	দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং.
১১।৪৩	লোকত্রয়ে	পিতাসি লোকস্য.
১৫।১৭	লোকত্রয়ম্	উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ.
	(৮) বৈকুণ্ঠাদি লোকের বাচক	
১৮।৭১	লোকান্	শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ.
	(৯) স্বর্গাদি ভোগ-ভূমির বাচক	
৬।৪১	লোকান্	প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং.
৮।১৬	লোকাঃ	আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ.
১৪।১৪	লোকান্	যদা সত্ত্বে.
	(১০) শাস্ত্রের বাচক	
১৫।১৮	লোকে	যস্মাৎ ক্ষরমতীতো.

৫৫. শান্তি

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) অন্তঃকরণের শান্তির বাচক	
২।৬৬	শান্তিঃ	নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য.
১৬।২	শান্তিঃ	অহিংসা সত্য.
	(২) পরমাত্মা প্রাপ্তির বাচক	
২।৭০	শান্তিম্	আপূর্যমাণমচল.
২।৭১	শান্তিম্	বিহায় কামান্যঃ.
৪।৩৯	শান্তিম্	শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে.
৫।১২	শান্তিম্	যুক্তঃ কর্মফলং.
৫।২৯	শান্তিম্	ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং.
৬।১৫	শান্তিম্	যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং.
৯।৩১	শান্তিম্	ক্ষিপ্রং ভবতি.
১২।১২	শান্তিঃ	শ্রেয়ো হি জ্ঞানম্.
	(৩) সংসার থেকে সর্বথা উপরতির বাচক	
১৮।৬২	শান্তিম্	তমেব শরণং.

৫৬. শৌচ

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) অন্তঃকরণ ও শরীরের শুদ্ধির বাচক	
১৩।৭	শৌচম্	অমানিত্বমদম্ভিত্ব.

[১]প্রকৃতপক্ষে 'লোক' শব্দ শুধুমাত্র সংসারেরই বাচক কিন্তু এই শ্লোকগুলিতে তিনলোকেরই উল্লেখ হওয়ায় 'লোক' শব্দটিকে ত্রিলোকের বাচকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
১৮।৪২	শৌচম্	শমো দমস্তপঃ.
	(২) শরীরের শুদ্ধির বাচক	
১৬।৩	শৌচম্	তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ.
১৬।৭	শৌচম্	প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং.
১৭।১৪	শৌচম্	দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ.

৫৭. শ্রেয়

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) লাভের বাচক	
১।৩১	শ্রেয়ঃ	নিমিত্তানি চ.
	(২) শ্রেষ্টত্বের বাচক	
২।৫	শ্রেয়ঃ	গুরূন্ হত্বা হি.
৩।৩৫	শ্রেয়ান্	শ্রেয়ান্ স্বধর্মো.
৪।৩৩	শ্রেয়ান্	শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়া.
১২।১২	শ্রেয়ঃ	শ্রেয়ো হি জ্ঞান.
১৬।২২	শ্রেয়ঃ	এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়.
১৮।৪৭	শ্রেয়ান্	শ্রেয়ান্ স্বধর্মো.
	(৩) কল্যাণের (মুক্তির) বাচক	
২।৭	শ্রেয়ঃ	কার্পণ্যদোষোপহত.
২।৩১	শ্রেয়ঃ	স্বধর্মমপি.
৩।২	শ্রেয়ঃ	ব্যামিশ্রেণেব.
৩।১১	শ্রেয়ঃ	দেবান্ভাবয়তানেন.
৩।৩৫	শ্রেয়ঃ	শ্রেয়ান্ স্বধর্মো.
৫।১	শ্রেয়ঃ	সন্ন্যাসং কর্মণাং.

৫৮. সৎ

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) সত্তার বাচক	
২।১৬	সতঃ	নাসতো বিদ্যতে.
৯।১৯	সৎ	তপাম্যহমহং বর্ষং.
১১।৩৭	সৎ	কস্মাচ্চ তে.
১৩।১২	সৎ	জ্ঞেয়ং যত্তৎপ্রবক্ষ্যামি.
১৭।২৩	সৎ	ওঁ তৎসদিতি.
১৭।২৬	সদ্ভাবে ; সৎ ; সৎ	সদ্ভাবে সাধুভাবে.
১৭।২৭	সৎ, সৎ	যজ্ঞে তপসি দানে.
	(২) ক্রিয়ার বাচক	
৩।১৩	সন্তঃ	যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
৪।৬	সন্ ; সন্	অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা.
১৮।১৬	সতি	তত্রৈবং সতি.
	(৩) দেবাদি যোনিসমূহের বাচক	
১৩।২১	সৎ	পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো.

৫৯. সত্ত্ব

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) চিন্ময় তত্ত্বের বাচক	
২।৪৫	নিত্যসত্ত্বস্থঃ	ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা.
১৮।১০	সত্ত্বসমাবিষ্টঃ	ন দ্বেষ্ট্যকুশলং.
	(২) সত্ত্বগুণের বাচক	
১০।৩৬	সত্ত্ববতাম্ ; সত্ত্বম্	দ্যূতং ছলয়তামস্মি.
১৪।৫	সত্ত্বম্	সত্ত্বং রজস্তম.
১৪।৬	সত্ত্বম্	তত্র সত্ত্বং.
১৪।৯	সত্ত্বম্	সত্ত্বং সুখে.
১৪।১০	সত্ত্বম্ ; সত্ত্বম্ ; সত্ত্বম্	রজস্তমশ্চাভি.
১৪।১১	সত্ত্বম্	সর্বদ্বারেষু.
১৪।১৪	সত্ত্বে	যদা সত্ত্বে.
১৪।১৭	সত্ত্বাৎ	সত্ত্বাৎসংজায়তে.
১৪।১৮	সত্ত্বস্থাঃ	ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি.
১৭।১	সত্ত্বম্	যে শাস্ত্রবিধি.
১৭।৮	আয়ুঃসত্ত্ব	আয়ুঃসত্ত্ববলা.
	(৩) বস্তু, ব্যক্তি আদির বাচক	
১০।৪১	সত্ত্বম্	যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং.
১৮।৪০	সত্ত্বম্	ন তদস্তি.
	(৪) প্রাণিমাত্রের বাচক	
১৩।২৬	সত্ত্বম্	যাবৎ সংজায়তে.
	(৫) অন্তঃকরণের বাচক	
১৬।১	সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ	অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ.
১৭।৩	সত্ত্বানুরূপা	সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য

৬০. সম

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) পরমাত্মার বাচক	
৫।১৮	সমদর্শিনঃ	বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে.
৫।১৯	সমম্	ইহৈব তৈর্জিতঃ.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(২) আত্মস্বরূপের বাচক	
৬।২৯	সমদর্শনঃ	সর্বভূতস্থমাত্মানং.
	(৩) অন্তঃকরণের সমত্বের বাচক	
২।৪৮	সমত্বম্	যোগস্থঃ কুরু.
১০।৫	সমতা	অহিংসা সমতা.
১৮।৫৪	সমঃ	ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা.
	(৪) সমভাবের বাচক	
২।১৫	সমদুঃখসুখম্	যং হি ন ব্যথয়.
২।৩৮	সমে	সুখদুঃখে সমে.
২।৪৮	সমঃ	যোগস্থঃ কুরু.
৪।২২	সমঃ	যদৃচ্ছালাভ.
৬।৮	সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ	জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা.
৬।৯	সমবুদ্ধিঃ	সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীন.
৬।৩২	সমম্	আত্মৌপম্যেন.
৯।২৯	সমঃ	সমোঽহং সর্বভূতেষু.
১২।৪	সমবুদ্ধয়ঃ	সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়.
১২।১৩	সমদুঃখসুখঃ	অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং.
১২।১৮	সমঃ ; সমঃ	সমঃ শত্রৌ চ.
১৩।৯	সমচিত্তত্বম্	অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ.
১৩।২৭	সমম্	সমং সর্বেষু.
১৩।২৮	সমম্	সমং পশ্যন্হি.
১৪।২৪	সমদুঃখসুখঃ ; সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ	সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ.
	(৫) সোজাভাবে বসার বাচক	
৬।১৩	সমম্	সমং কায়শিরোগ্রীবং.

৬১. সর্গ

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) সংসারের বাচক	
৫।১৯	সর্গঃ	ইহৈব তৈর্জিতঃ.
৭।২৭	সর্গে	ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন.
	(২) সর্গ ও মহাসর্গের বাচক	
১০।৩২	সর্গাণাম্	সর্গাণামাদিরন্তশ্চ.
	(৩) মহাসর্গের বাচক	
১৪।২	সর্গে	ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক

৬২. সর্বগত

(১) জীবাত্মার স্বরূপের বাচক

২।২৪	সর্বগতঃ	অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যো.

(২) সগুণ-নিরাকার পরমাত্মার বাচক

৩।১৫	সর্বগতম্	কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং.

(৩) আকাশের বাচক

১৩।৩২	সর্বগতম্	যথা সর্বগতং.

৬৩. সিদ্ধ

(১) সাধকের বাচক

৭।৩	সিদ্ধানাম্	মনুষ্যাণাং সহস্রেষু.

(২) জ্ঞানী-মহাত্মার বাচক

১০।২৬	সিদ্ধানাম্	অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং.
১১।২১	মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ	অমী হি ত্বাং.
১১।২২	অসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ	রুদ্রাদিত্যা বসবো.
১১।৩৬	সিদ্ধসঙ্ঘাঃ	স্থানে হৃষীকেশ.

(৩) অভিমানীর বাচক

১৬।১৪	সিদ্ধঃ	অসৌ ময়া হতঃ.

৬৪. সিদ্ধি

(১) কার্যের পূর্তি, ফলের প্রাপ্তির বাচক

২।৪৮	সিদ্ধ্যসিদ্ধয়োঃ	যোগস্থঃ কুরু.
৪।১২	সিদ্ধিম্ ; সিদ্ধিঃ	কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং.
৪।২২	সিদ্ধৌ	যদৃচ্ছালাভ.
১৮।২৬	সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ	মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী.

(২) পরমাত্মা প্রাপ্তির বাচক

৩।৪	সিদ্ধিম্	ন কর্মণামনারম্ভা.
৩।২০	সংসিদ্ধিম্	কর্মণৈব হি.
১২।১০	সিদ্ধিম্	অভ্যাসেঽপ্য.
১৪।১	সিদ্ধিম্	পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি.
১৮।৪৫	সিদ্ধিম্ ; সংসিদ্ধিম্	স্বে স্বে কর্মণ্য.
১৮।৪৬	সিদ্ধিম্	যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং.
১৮।৪৯	নৈষ্কর্মসিদ্ধিম্	অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৩) অন্তঃকরণের শুদ্ধির বাচক	
১৬।২৩	সিদ্ধিম্	যঃ শাস্ত্রবিধি.
১৮।৫০	সিদ্ধিম্	সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা.

৬৫. সুখ

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) সাধারণ সুখের বাচক	
১।৩২	সুখানি	ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং.
১।৩৩	সুখানি	যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং.
২।১৪	শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ	মাত্রাস্পর্শাস্তু.
২।১৫	সমদুঃখসুখম্	যং হি ন ব্যথয়.
২।৩৮	সুখদুঃখে	সুখদুঃখে সমে.
৬।৩২	সুখম্	আত্মৌপম্যেন সর্বত্র.
১০।৪	সুখম্	বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ.
১৩।৬	সুখম্	ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং.
১৩।২০	সুখদুঃখানাম্	কার্যকরণকর্তৃত্বে.
১৪।২৪	সমদুঃখসুখঃ	সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ.
১৫।৫	সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ	নির্মাণমোহা.
১৮।৩৬	সুখম্	সুখং ত্বিদানীং.
১৮।৩৭	সুখম্	যত্তদগ্রে বিষমিব.
১৮।৩৮	সুখম্	বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগা.
১৮।৩৯	সুখম্	যদগ্রে চানুবন্ধে.
	(২) অনুকূল পরিস্থিতির বাচক	
২।৫৬	সুখেষু	দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ.
৬।৭	শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু	জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য.
১২।১৮	শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু	সমঃ শত্রৌ চ.
	(৩) সাত্ত্বিক সুখের বাচক	
২।৬৬	সুখম্	নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য.
৫।২১ (পূর্বার্ধ)	সুখম্	বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা.
৫।২৪	অন্তঃসুখঃ	যোঽন্তঃ সুখো.
৬।২৭	সুখম্	প্রশান্তমনসং.
১৪।৬	সুখসঙ্গেন	তত্র সত্ত্বং.
১৪।৯	সুখে	সত্ত্বং সুখে.
১৬।২৩	সুখম্	যঃ শাস্ত্রবিধি.
১৭।৮	সুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ	আয়ুঃ সত্ত্বলারোগ্য.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(৪) সহজতার বাচক	
৫।৩	সুখম্	জ্ঞেয়ঃ স নিত্য.
৬।২৮	সুখেন	যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং.
৯।২	সুসুখম্	রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং.
	(৫) স্বাভাবিকতার বাচক	
৫।১৩	সুখম্	সর্বকর্মাণি মনসা.
	(৬) পারমার্থিক সুখের বাচক	
৫।২১ (উত্তরার্ধ)	সুখম্	বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা.
৬।২১	সুখম্	সুখমাত্যন্তিকং.
৬।২৮	সুখম্	যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং.
১৪।২৭	সুখস্য	ব্রহ্মণো হি.

৬৬. সন্ন্যাস

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) সাংখ্যযোগের বাচক	
৫।১	সন্ন্যাসম্	সন্ন্যাসং কর্মণাং.
৫।২	সন্ন্যাসঃ	সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ.
৫।৬	সন্ন্যাসঃ	সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো.
৬।২	সন্ন্যাসম্	যং সন্ন্যাসমিতি.
১৮।১	সন্ন্যাসস্য	সন্ন্যাসস্য মহাবাহো.
১৮।২	সন্ন্যাসম্	কাম্যানাং কর্মণাং.
১৮।৪৯	সন্ন্যাসেন	অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র.
	(২) সমর্পণের বাচক	
৯।২৮	সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা	শুভাশুভফলৈরেবং.
	(৩) ত্যাগের বাচক	
১৮।৭	সন্ন্যাসঃ	নিয়তস্য তু.

৬৭. সন্ন্যাসী

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	(১) কর্মযোগীর বাচক	
৫।৩	নিত্যসন্ন্যাসী	জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী.
৬।১	সন্ন্যাসী	অনাশ্রিতঃ কর্মফলং.
	(২) ত্যাগীর বাচক	
১৮।১২	সন্ন্যাসিনাম্	অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং.

অধ্যায়-শ্লোক	পদ	শ্লোক-প্রতীক
	৬৮. স্থান	
	(১) পরমাত্মতত্ত্বের বাচক	
৫।৫	স্থানম্	যৎ সাংখ্যৈ প্রাপ্যতে.
৮।২৮	স্থানম্	বেদেষু যজ্ঞেষু.
১৮।৬২	স্থানম্	তমেব শরণং.
	(২) সগুণ ভগবানের বাচক	
৯।১৮	স্থানম্	গতির্ভর্তা প্রভুঃ.
	(৩) ঔচিত্যের বাচক	
১১।৩৬	স্থানে	স্থানে হৃষীকেশ.
	৬৯. স্বভাব	
	(১) মনুষ্যের প্রকৃতির (স্বভাবের) বাচক	
৫।১৪	স্বভাবঃ	ন কর্তৃত্বং.
১৭।২	স্বভাবজা	ত্রিবিধা ভবতি.
১৮।৪১	স্বভাবপ্রভবৈঃ	ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং.
১৮।৪২	স্বভাবজম্	শমো দমস্তপঃ.
১৮।৪৩	স্বভাবজম্	শৌর্যং তেজো.
১৮।৪৪	স্বভাবজম্ ; স্বভাবজম্	কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং.
১৮।৪৭	স্বভাবনিয়তম্	শ্রেয়ান্ স্বধর্মো.
১৮।৬০	স্বভাবজেন	স্বভাবজেন কৌন্তেয়.
	(২) জীবাত্মার বাচক	
৮।৩	স্বভাবঃ	অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং.

গীতাদর্পণমেতদ্ধি জনানামুপকারকম্।
সর্বাং দর্পণবদ্ গীতাং দর্শকং ভবিতা সদা॥
নেত্রবেদখযুগ্মে হি বৎসরে[1] লিখিতং চ যৎ।
রামসুখেন বোধার্থং গীতায়াঃ পাঠকস্য চ॥

[1] বিক্রমসংবৎসরে ২০৪২ (তদনুসারে বাংলা ১৩৯২ সালে)।

॥ শ্রীহরিঃ ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র—

Sl. Code
No. No.

(১) 1118 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎআকারে**
লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা
গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্যা

(২) 763 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)**
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।

(৩) 556 **গীতা-দর্পণ**
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের দর্শনভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৪) 13 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**
অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থ সহ সরল অনুবাদ।

(৫) 496 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**
মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(৬) 1393 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (বোর্ড বাইন্ডিং)

(৭) 395 **গীতা-মাধুর্য**
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ— সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

(৮) 957 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**
অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

(৯) 1455 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (লঘু আকারে)

(১০) 954 **শ্রীরামচরিতমানস (রামায়ণ)**
তুলসীদাসের অমরকৃতি, মূল দোঁহা, চৌপাই-এর সরল বঙ্গানুবাদ।

(১১) 275 **কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়**
লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা
সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

(১২) 1456 **ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়**
লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা
ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

(১৩) 1119 **ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?**
লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা
বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

(১৪) 1305 **প্রশ্নোত্তর মণিমালা**
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক বিষয়ের ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

(১৫) 1102 **অমৃত-বিন্দু**
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

(১৬) 1115 **তত্ত্বজ্ঞান কি করে হবে ?**
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

(১৭) 1358 **কর্ম-রহস্য**
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
ভগবান গীতায় বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'**—সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(১৮) 1368 **সাধনা**
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
সাধনপথের জিজ্ঞাসুর পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তিকা।

(১৯) 1122 **মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?**
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
গুরু-বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্যই পড়া কর্তব্য।

Sl. No.	Code No.	
(২০)	276	পরমার্থ পত্রাবলী লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।
(২১)	816	কল্যাণকারী প্রবচন লেখক —স্বামী রামসুখদাস সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি ভাষণের অমূল্য সংস্করণ।
(২২)	1460	বিবেক চূড়ামণি (মূল সহ সরল টীকা) শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।
(২৩)	1454	স্তোত্ররত্নাবলি প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।
(২৪)	903	সহজ সাধনা লেখক —স্বামী রামসুখদাস সাধনার সহজ দিগ্‌-দর্শন।
(২৫)	312	আদর্শ নারী সুশীলা লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবনচরিত।
(২৬)	1306	কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা কর্ম-তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা।
(২৭)	955	তাত্ত্বিক-প্রবচন লেখক —স্বামী রামসুখদাস গভীর তত্ত্বের সরলতম ব্যাখ্যা।
(২৮)	428	আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন লেখক —স্বামী রামসুখদাস বর্তমানের অশান্ত পারিবারিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সুচিন্তিত শান্তি পুস্তিকা।
		জয়দয়াল গোয়েন্দকা প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—
(২৯)	296	সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা
(৩০)	1359	পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি
(৩১)	1140	ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব
		স্বামী রামসুখদাস প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—
(৩২)	1303	সাধকদের প্রতি
(৩৩)	1452	আদর্শ গল্প সংকলন
(৩৪)	1453	শিক্ষামূলক কাহিনী
(৩৫)	625	দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম
(৩৬)	956	সাধন এবং সাধ্য
(৩৭)	1293	আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য
(৩৮)	450	ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি
(৩৯)	449	দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব
(৪০)	451	মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া
(৪১)	443	সন্তানের কর্তব্য
(৪২)	469	মূর্তিপূজা
(৪৩)	849	মাতৃশক্তির চরম অপমান
(৪৪)	1319	কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা
		অন্যান্য
(৪৫)	762	গর্ভপাত করানো কি উচিত —আপনিই ভেবে দেখুন
(৪৬)	1075	ওঁ নমঃ শিবায়
(৪৭)	1043	নবদুর্গা
(৪৮)	1096	কানাই
(৪৯)	1097	গোপাল
(৫০)	1098	মোহন
(৫১)	1123	শ্রীকৃষ্ণ
(৫২)	1292	দশাবতার
(৫৩)	1103	মূল রামায়ণ ও রামরক্ষাস্তোত্র
(৫৪)	330	ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৫৫)	626	হনুমানচালীসা
(৫৬)	848	আনন্দের তরঙ্গ
(৫৭)	1356	সুন্দরকাণ্ড
(৫৮)	1322	শ্রীশ্রীচণ্ডী
(৫৯)	1439	দশমহাবিদ্যা
(৬০)	1469	সর্বসাধনার সারকথা
(৬১)	1455	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (লঘু আকারে)